ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোঃ আলমগীর

GIFT

Dhaka University Library
382374

382374

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অক্টোবর-১৯৯৯

বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঃ

ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর, ১৯৯৯

382374

গবেষক ঃ

মোঃ আলমগীর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি জনাব মোঃ আলমগীর-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং এটি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য।

(ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান)
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।
বিশ্ববিদ্যালয়

382374

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

 Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়নপত্র .... ক

সূচীপত্র .... খ-চ

চিত্র সূচী.. ছ-ঝ

পরিশিষ্ট সমূহ (তালিকা).. ঞ-ট

উপক্রমণিকা..ঠ-ড

ভূমিকা ১-৮

১। প্রথম অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াব পরিবার ও তাঁদের কর্মকান্ড।

(১) নওয়াব পরিবারের ঢাকায় আগমন ও তাঁদের ইতিহাস ৯

(২) নওয়াব পরিবারের খাজা উপাধি ১৪

(৩) আর্থিক উন্নয়ন, জমিদারি ক্রয় ও পরিচালনা ১৭

(ক) খাজা হাফিজুল্লাহ ও তাঁর জমিদারি ক্রয় ১৮

(খ) খাজা আব্দুল গফুর ও তাঁর জমিদারি ১৯

(গ) খাজা আলীমুল্লাহ ও তাঁর জমিদারি (মোতাওয়াল্লী)............................ ২০

(ঘ) নওয়াব আব্দুল গণির জমিদারি (মোতাওয়াল্লী)................................. ২৫

(ঙ) নওয়াব আহসানুল্লাহর জমিদারি (মোতাওয়াল্লী)................................ ২৬

(৪) নওয়াবদের জমিদারি পরিচালনায় কর্মকর্তাগণ ২৮

(ক) কতিপয় হিন্দু কর্মচারী ২৯

(খ) কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী ৩০

(গ) কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে ঢাকা নওয়াব এস্টেট ৩২

(৫) ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক, প্রতিপত্তিলাভ ও নওয়াব উপাধি অর্জন ৩৪

(৬) সামাজিক মর্যাদা ও ঢাকার কর্তৃত্ব লাভ ৪২

(৭) ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগাদমনে নওয়াব পরিবার ৪৮

২। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নওয়াবদের জনকল্যাণ কার্যাবলী।

(১) ঢাকার উৎকর্ষ সাধনে পৌর উন্নয়ন কার্যাবলী ৬৬

(২) ঢাকার পৌর উন্নয়নে খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজান ৭৪

(৩) ঢাকায় পানীয় জলের কল স্থাপন ৭৯

(৪) ঢাকায় বিজলী বাতির ব্যবস্থাকরণ ৮৫

(৫) স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ৮৯

(৬) বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণে অবদান ৯২

(৭) নর্থব্রুক হল নির্মাণে অবদান.. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৩। তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

(১) নওয়াব আব্দুল গণির দানশীলতা ১০৮
(২) নওয়াব আহসানুল্লাহর দানশীলতা ১১১
(৩) নওয়াব সলিমুল্লাহর দানশীলতা ১১৪
(৪) নওয়াব হাবিবুল্লাহর দানকাজ ১১৮
(৫) নওয়াব পরিবারের অন্যান্যদের দানকাজ ১১৯
(৬) নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা ১২০

৪। চতুর্থ অধ্যায় ঃ জনকল্যাণে বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

(১) নওয়াব আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড গঠন ১২৭
(২) নওয়াব আব্দুল গণি প্লেগ ফান্ড গঠন ১৩০
(৩) মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতা ১৩২
(৪) সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতা ১৩৪
(৫) ঢাকায় সমাজ সম্মিলনী এবং মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী-এর পৃষ্ঠপোষকতা ১৩৫
(৬) সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়নে নওয়াব আহসানুল্লাহর ভূমিকা..১৩৬
(৭) দেশীয় মদ তৈরীর কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে সহায়তা ১৩৯
(৮) বারবনিতা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে ঢাকার নওয়াবদের ভূমিকা..১৪০

৫। পঞ্চম অধ্যায় ঃ জনস্বার্থে হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ।

(১) মিটফোর্ড হাসপাতাল উন্নয়নে অবদান ১৪৫
(২) লেডী ডাফরিন মহিলা হাসপাতাল নির্মাণ ১৪৯
(৩) পটুয়াখালী বেগম হাসপাতাল নির্মাণ ১৫০
(৪) জামুর্কী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ ১৫০
(৫) আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতাল নির্মাণ ১৫১
(৬) ঢাকায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও ফার্মেসী স্থাপন ১৫৩
(৭) অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে অর্থদান ১৫৪

৬। ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ধর্মীয় ইমারত/প্রতিষ্ঠান তৈরী, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১) হোসেনী দালান সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ১৫৯
(২) কদম রসুলের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ১৬১
(৩) হযরত শাহ্ আলীর দরগাহ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ১৬২
(৪) সাত মসজিদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ১৬২
(৫) শাহ্ মালিক পীর ইয়ামেনীর দরগাহ সংস্কার ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

(৬) চিশ্‌তি বেহেশতীর মাজার সংস্কার ১৬৪
(৭) লালবাগ শাহী মসজিদ সংস্কার ১৬৪
(৮) খাজা আম্বরের মসজিদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ১৬৫
(৯) শাহজালাল দাখিনীর মসজিদ ও মাজার এবং শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকিনের মাজার সংস্কার ১৬৫
(১০) হযরত শাহ্ মাসউদ ও পীর জংগীর দরগাহ সংস্কার ১৬৬
(১১) বাইগুনবাড়ী মসজিদ নির্মাণ ১৬৬
(১২) মাদারীপুর খাজা হাফিজুল্লাহ মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ১৬৭
(১৩) নেত্রকোনা খাজা আহসানুল্লাহ মসজিদ নির্মাণ ১৬৮
(১৪) অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থদান ১৬৮

। সপ্তম অধ্যায় ঃ নওয়াবদের শিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী ।

(১) ঢাকার নওয়াবদের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা ১৭৩
(২) শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আব্দুল গণি ১৭৪
(৩) শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৭৫
(৪) মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৭৬
(৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব পরিবারের অবদান ১৮৩
(ক) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা ১৯০
(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন ঃ
(ক) আব্দুল গণি ফ্রী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা ১৯১
(খ) ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ১৯৪
(গ) আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা ১৯৭
(ঘ) মাদারীপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ১৯৯
(ঙ) নেত্রকোনা মাদ্রাসা স্থাপন ২০১
(চ) জামুর্কী আব্দুল গণি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা ২০১
(ছ) বিক্রমপুর দিঘীরপাড় ছলিমিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন ২০২
(জ) নওয়াব হাবিবুল্লাহ স্কুল প্রতিষ্ঠা ২০২
(ঝ) কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা ২০৩
(ঞ) নওয়াব সলিমুল্লাহ কলেজ উন্নয়ন ২০৪

। অষ্টম অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াবদের সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ।

(১) নওয়াব পরিবারের সাহিত্য চর্চা
(ক) উর্দু ফার্সী চর্চার কারণ ২১৭
(খ) নওয়াব পরিবারের সাহিত্যিকগণের তালিকা ২১৯
(গ) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব আব্দুল গণি ২২০

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) নওয়াব আহ্‌সানুল্লাহ্‌র সাহিত্য চর্চা ২২০

(ঙ) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ২২১

(২) সংগীত, নাটক, ফটোগ্রাফী ও সিনেমা চর্চায় নওয়াব পরিবার।

(ক) সংগীত চর্চা ২২২

(খ) নাট্য চর্চায় অবদান ২২৫

(গ) বায়োস্কোপ দেখানো ২২৭

(ঘ) ফটোগ্রাফী চর্চা ২২৮

(ঙ) সিনেমা চর্চায় অবদান ২২৯

(চ) নওয়াবজাদি মেহেরবানুর চিত্রকর্ম ২৩০

(৩) নওয়াব পরিবারের উৎসব পালন, ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি এবং মেলার আয়োজন।

(ক) ঈদ উৎসব ২৩১

(খ) মহররম উৎসব ২৩৪

(গ) মিলাদ মাহফিল ২৩৫

(ঘ) প্রদর্শনীর আয়োজন ২৩৭

(৪) ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় অবদান ২৩৮

(৫) কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব পরিবার.................... ২৩৯

(৬) নওয়াবদের জাঁকজমক ও সাজ সরঞ্জাম ২৪৩

(৭) ঢাকার নওয়াবদের অলংকারাদি ২৪৫

(৮) দরিয়া-ই-নূর ২৪৮

৯। নবম অধ্যায় ঃ চিত্তবিনোদন ও ক্রীড়াচর্চায় নওয়াব পরিবার।

১। ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন ২৬৫

২। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা ২৬৮

৩। হকি খেলা চর্চায় নওয়াব পরিবার ২৭২

৪। বিলিয়ার্ড ও টেনিস খেলায় পৃষ্ঠপোষকতা ২৭৫

৫। তাস ও দাবা খেলা চর্চা ২৭৫

৬। ক্রিকেট খেলা চর্চা ২৭৬

৭। ঢাকায় ঘুড়ি উড়ানো ২৭৭

১০। দশম অধ্যায় ঃ আহসান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠা, সংস্কার এবং সেখানে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

(১) আহসান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠা ২৮১

(২) পুনর্নির্মাণ ২৮২

(৩) নির্মাণ তারিখ ২৮৩

(৪) তৎকালীন ভবনের বৈশিষ্ট্য ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

(৫) টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিল ২৮৪
(৬) পুনঃসংস্কার ২৮৫
(৭) ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি ও সংস্কার ২৮৬
(৮) আহসান মঞ্জিলে জাদুঘর স্থাপন ২৮৭
(৯) আহসান মঞ্জিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড ২৮৮

১১। একাদশ অধ্যায় ঃ বিনোদনমূলক পার্ক, বাগান ও বাগানবাড়ী, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি নির্মাণ।

(১) বাগান ও বাগানবাড়ী ৩০৩
(ক) শাহবাগ বাগানবাড়ী ৩০৩
(খ) শাহবাগে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ৩০৮
(গ) পরীবাগ বাগানবাড়ী ৩১৫
(ঘ) দিলখুশা বাগানবাড়ী ৩১৬
(ঙ) বাইগুনবাড়ী শিকারগৃহ ৩১৯
(চ) কোম্পানী বাগান ৩২০
(ছ) হাজিগঞ্জ দূর্গ বাগানবাড়ী ৩২২
(জ) জিঞ্জিরা ফলের বাগান ৩২৩
(ঝ) শ্যামপুর ফলের বাগান.................... ৩২৩
(ঞ) হোসেনী দালানের বাগান ৩২৩
(ট) বেগম বাজার ফলের বাগান ৩২৩
(ঠ) গোলাম মোস্তফা লেনের বাগান ৩২৪
(ড) জুরাইনের আম বাগান ৩২৪
(ঢ) মাতুয়াইল ফলের বাগান ৩২৪
(ণ) আজিমপুরে শাহজাদা মিয়ার বাগান ৩২৪
(ত) মীর্জা ফকির মোহাম্মদের বাগানবাড়ী....................৩২৪
(থ) নওয়াব ইউসুফজানের বাগানবাড়ী ৩২৫
(২) ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্ক উন্নয়ন ৩২৪
(৩) পশুপাখী পালন ও চিড়িয়াখানা তৈরী ৩২৭

* উপসংহার ঃ ৩৩৮
* চিত্র ঃ ৩৪৩
* পরিশিষ্ট ঃ ৩৮৬
* গ্রন্থপঞ্জি ঃ ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র সূচী

চিত্র নং		চিত্রের বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	ঃ	প্রতিকৃতি - খাজা আলীমুল্লাহ (মৃত্যু- ১৮৫৪)	৩৪৩
২।	ঃ	প্রতিকৃতি - নওয়াব আব্দুল গণি (১৮১৩-১৮৯৬)	৩৪৩
৩।	ঃ	অলংকৃত চেয়ার, রৌপ্য	৩৪৩
৪।	ঃ	প্রতিকৃতি - নওয়াব আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১)	৩৪৪
৫।	ঃ	প্রতিকৃতি - নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)	৩৪৪
৬।	ঃ	প্রতিকৃতি - নওয়াব হাবিবুল্লাহ (১৮৯৫-১৯৫৮)	৩৪৪
৭।	ঃ	প্রতিকৃতি - নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ	৩৪৫
৮।	ঃ	রেসকোর্স ময়দানে খাজা আলীমুল্লাহ ও আব্দুল গণি	৩৪৫
৯।	ঃ	প্রতিকৃতি - নওয়াব খাজা মোহাঃ ইউসুফ জান (১৮৫০-১৯২৩)	৩৪৫
১০।	ঃ	ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্ক্স	৩৪৬
১১।	ঃ	ঢাকায় বিজলী বাতির উদ্বোধন দৃশ্য (কল্পিত)	৩৪৬
১২।	ঃ	নওয়াবজাদি মেহেরবানু ও এতিম শিশুরা	৩৪৭
১৩।	ঃ	বাকল্যান্ড বাঁধের ধারে নর্থব্রুক হল	৩৪৭
১৪।	ঃ	মিটফোর্ড হাসাপাতাল, নদীর দিক থেকে	৩৪৮
১৫।	ঃ	মিটফোর্ড হাসপাতাল, সম্মুখ (উত্তর) দিক থেকে	৩৪৮
১৬।	ঃ	আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতাল	৩৪৯
১৭।	ঃ	ঐ হাসপাতালে ব্যবহৃত সার্জিকেল যন্ত্রপাতি	৩৪৯
১৮।	ঃ	হোসেনী দালান, দক্ষিণ দিক	৩৫০
১৯।	ঃ	হোসেনী দালানের নক্করখানা (গেটওয়ে)	৩৫০
২০।	ঃ	কদম রসুলের নহবত খানা	৩৫১
২১।	ঃ	লালবাগ শাহী মসজিদ	৩৫১
২২।	ঃ	বাইগুনবাড়ী মসজিদ (আদিরূপ)	৩৫২
২৩।	ঃ	বাইগুনবাড়ী মসজিদ (বর্তমান রূপ)	৩৫২
২৪।	ঃ	শিলালিপি, রামকৃষ্ণ মিশনের ভবন গাত্রে স্থাপিত	৩৫৩
২৫।	ঃ	প্রতিকৃতি, জুলেখাবানু (১৯০৪-১৯৭৪)	৩৫৩
২৬।	ঃ	প্রাসাদ লাইব্রেরী কক্ষ, ১৯০৪ সাল	৩৫৪
২৭।	ঃ	মুসলিম লীগের সভায় ভাষণদানরত নওয়াব সলিমুল্লাহ	৩৫৪
২৮।	ঃ	নওয়াবজাদা খাজা মোহাম্মদ আফজাল (১৮৭৫-১৯৪০)	৩৫৫
২৯।	ঃ	ঢাকা মাদ্রাসা ভবন (১৮৮০ সালে নির্মিত)	৩৫৫
৩০।	ঃ	কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল	৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৩১। ঃ হিন্দুস্থানী কক্ষ, ১৯০৪ সাল ৩৫৬

৩২। ঃ নওয়াবজাদী মেহের বানু, ছবি অঙ্কনরত..৩৫৭

৩৩। ঃ নওয়াবজাদি মেহের বানু, স্বামী ও সন্তানদের সাথে ৩৫৭

৩৪। ঃ নওয়াবদের ব্যবহৃত ফেজ টুপি..৩৫৮

৩৫। ঃ আতরদান, রৌপ্য, তারজালি কাজ।..৩৫৮

৩৬। ঃ আহসান মঞ্জিলের মডেল, তারজালি কাজ (১৮৮৮ খ্রীঃ পূর্ববর্তীরূপ) ৩৫৯

৩৭। ঃ আহসান মঞ্জিলের মডেল, তারজালি কাজ (১৮৮৮ খ্রীঃ পরবর্তীরূপ) ৩৫৯

৩৮। ঃ হাতির দাঁতের কয়েকটি শিল্পকর্ম ৩৬০

৩৯। ঃ গাহপাত্র, ধাতব, শিকার দৃশ্যের অলংকরণযুক্ত ৩৬০

৪০। ঃ কাঠের দরমা- বেড়া, ছিদ্র অলংকরণযুক্ত..৩৬১

৪১। ঃ চীনামাটির তৈজসপত্র, নওয়াবদের মনোগ্রামযুক্ত..৩৬১

৪২। ঃ প্রাসাদে ড্রইং রুম, ১৯০৪ সাল ৩৬২

৪৩। ঃ প্রসাদে স্টেট বেড রুম, ১৯০৪ সাল..৩৬২

৪৪। ঃ প্রাসাদে ডাইনিং রুম, ১৯০৪ সাল ৩৬২

৪৫। ঃ প্রাসাদে বল রুম, ১৯০৪ সাল ৩৬৩

৪৬। ঃ ক্রিস্টাল চেয়ার, নওয়াবদের ব্যবহৃত..৩৬৩

৪৭। ঃ ক্রিস্টাল টেবিল, নওয়াবদের ব্যবহৃত..৩৬৪

৪৮। ঃ হাতির মাথার কংকাল, আহসান মঞ্জিলে প্রদর্শিত ৩৬৪

৪৯। ঃ বৃহদাকার লোহার সিন্দুক, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত..৩৬৪

৫০। ঃ দরিয়া-ই-নূর (বাস্তব পরিমাপে), ঢাকার নওয়াবদের ৩৬৫

৫১। ঃ দরিয়া-ই-নূর, ইরানের ৩৬৫

৫২। ঃ পারস্যে অবস্থানকালে ঢাকার দরিয়া-ই-নূর ৩৬৬

৫৩। ঃ বাজুবন্দরূপে কোহিনূর ঃ রণজিৎ সিংহের কাছে থাকাকালে ৩৬৬

৫৪। ঃ ঢাকা রেসকোর্স প্যাভিলিয়ন ৩৬৭

৫৫। ঃ ট্রফিকাপ, নওয়াবের ঘোড়া শাহানশাহ কর্তৃক জয়কৃত ৩৬৭

৫৬। ঃ ট্রফিকাপ, ভাওয়াল রাজ প্রদত্ত ৩৬৮

৫৭। ঃ রেসকোর্স ময়দানে নওয়াব সলিমুল্লাহ ৩৬৮

৫৮। ঃ মোহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলোয়াড়দের সাথে লর্ড এন্ডারসন ও খাজা নাজিমুদ্দিন (১৯৩৫)....৩৬৯

৫৯। ঃ মোহামেডান স্পোর্টিং- এর খেলোয়াড়দের সাথে খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা নুরুদ্দিন (১৯৩৬)...৩৬৯

৬০। ঃ মোহামেডানের খেলোয়াড়দের সাথে খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা নুরুদ্দিন ৩৭০

৬১। ঃ হকি খেলোয়াড়দের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ ৩৭০

৬২। ঃ নওয়াব বাড়ীর হকি খেলোয়াড়গণ ও বিজয়ী কাপ ৩৭১

৬৩। ঃ প্রাসাদে বিলিয়ার্ড কক্ষ, ১৯০৪ সাল ৩৭১

৬৪। ঃ প্রাসাদে কার্ডরুম, ১৯০৪ সাল ৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। ঃ খাজা আলীমুল্লাহর বাড়ী (১৮৩৫ আনুঃ) ৩৭২
৬৬। ঃ আহসান মঞ্জিল, রঙমহল ও অন্দরমহল (১৮৮০ আনুঃ) ৩৭৩
৬৭। ঃ টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিল (১৮৮৮) ৩৭৩
৬৮। ঃ আহসান মঞ্জিল, টর্নেডোর পর পুনর্নির্মাণ বৈশিষ্ট্যে যা এখনো বর্তমান ৩৭৪
৬৯। ঃ লর্ড কার্জনের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ, ১৯০৪ সাল ৩৭৪
৭০। ঃ আহসান মঞ্জিলে আগত লেঃ গভঃ ফুলারকে স্বাগত জানাচ্ছেন নওয়াব সলিমুল্লাহ ৩৭৫
৭১। ঃ প্রতিকৃতি, আলমাসী বানু (১৮৯৭-১৯১৭) ৩৭৫
৭২। ঃ আহসান মঞ্জিলে খাজা নাজিমুদ্দিনের সম্বর্ধনা (১৯৪৮) ৩৭৬
৭৩। ঃ আহসান মঞ্জিলের প্রধান সিঁড়িকক্ষ (১৯০৪) ৩৭৬
৭৪। ঃ খাজা মোঃ ইসমাইল, খাজা মোঃ আজম ও পরীবানু ৩৭৭
৭৫। ঃ শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিল ৩৭৭
৭৬। ঃ শাহবাগে স্কেটিং প্যাভিলিয়ন (বর্তমান-মধুর কেন্টিন) ৩৭৮
৭৭। ঃ সরোবরের মধ্যস্থিত দ্বীপের সাথে সংযোগ সেতু ৩৭৮
৭৮। ঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন সভা ৩৭৯
৭৯। ঃ দানা দিঘীর ঘাটে নির্মিত হাওয়াখানা ৩৭৯
৮০। ঃ মানুক হাউস, দিলখুশা ৩৮০
৮১। ঃ দিলখুশার প্রধান ভবন....৩৮০
৮২। ঃ বুলবুলাইয়া টাওয়ার, দিলখুশা....৩৮১
৮৩। ঃ দিলখুশায় মার্বেল চন্দ্রাতপে হুরবানু ৩৮১
৮৪। ঃ বাইগুনবাড়ীতে অন্দরমহল ৩৮২
৮৫। ঃ বাইগুনবাড়ীর দিঘী ও মসজিদ (১৯৯৮ সাল) ৩৮২
৮৬। ঃ বাইগুনবাড়ীর সদর কোঠা....৩৮৩
৮৭। ঃ বাইগুনবাড়ীর আরেকটি ভবন....৩৮৩
৮৮। ঃ হাজীগঞ্জ দূর্গে হাফিজ মঞ্জিল....৩৮৪
৮৯। ঃ হাফিজ মঞ্জিল, সম্মুখভাগ....৩৮৪
৯০। ঃ নওয়াবজাদা খাজা হাফিজুল্লাহ (১৮৬৮-১৮৮৪) ৩৮৫
৯১। ঃ খাজা হাফিজুল্লাহ স্মৃতি স্তম্ভ....৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট সমূহ (তালিকা)

পরিশিষ্ট নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	১২৫৩ সালের ২৭ বৈশাখ মোতাবেক ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৮মে সম্পাদিত খাজা পরিবারের প্রথম ওয়াকফনামা (ফার্সী)-এর ইংরেজী অনুবাদ।	৩৮৬
২।	ধনবিবি ওয়াকফ প্রপার্টি (পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি চতুষ্টয়) এর তালিকা।	৩৮৮
৩।	খাজা আলীমুল্লাহ- কে খাজা পরিবারের পক্ষ থেকে দেয়া লাদাবীপত্র (ফোরখাতনামা) তাং ২৭ বৈশাখ ১২৫৩ বাংলা-এর ইংরেজী অনুবাদ।	৩৮৯
৪।	পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি চতুষ্টয়ের জন্য খাজা আব্দুল গণি কর্তৃক খাজা আহসানুল্লাহর অনুকূলে সম্পাদিত তৌলিয়তনামা (দায়িত্ব পরিত্যাগ দলিল) তাং ২৭ ভাদ্র ১২৭৫ বাংলা (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ)-এর কপি (ইংরেজী)	৩৯১
৫।	খাজা আলীমুল্লাহ কর্তৃক আটিয়া পরগনার ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে খাজা আব্দুল গণির অনুকূলে সম্পাদিত তৌলিয়তনামা (১৪ রমজান ১২৭০ হিঃ মোতাবেক ৮জুন ১৮৫৪ খ্রীঃ)-এর ফার্সী অনুলিপি।	৩৯২
৬।	নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক আটিয়া পরগনার ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে খাজা আহসানুল্লাহর অনুকূলে সম্পাদিত তৌলিয়তনামা (২৮ মহররম ১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১২ আগষ্ট ১৮৯৩ খ্রীঃ)-এর ফার্সী অনুলিপি।	৩৯৭
৭।	নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক তাঁর সমুদয় নিজস্ব সম্পত্তি পরিচালনার জন্য পুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে মোতাওয়াল্লী করে ১৮৬৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সম্পাদিত ওয়াকফনামার ইংরেজী অনুলিপি।	৪০২
৮।	১৮৮১ সালের ২৬ আগষ্ট নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ এবং আব্দুল শফির নেতৃত্বে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা (মেমোরেন্ডাম অব এগ্রিমেন্ট)- এর কপি (ইংরেজী)।	৪০৫
৯।	নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য অর্থদানের তালিকা।	৪০৮
১০।	নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পরে তৈরী তাঁর অধিকারে থাকা নোট ও নগদ অর্থাদির হিসাব।	৪১০
১১।	নওয়াবদের দানকাজ সম্পর্কে চীফ ম্যানেজার, ঢাকা নওয়াব এস্টেট এবং মিঃ বি.সি.এ্যালেন আই.সি.এস-এর মধ্যে বিনিময়কৃত ২টি পত্র।	৪১২
১২।	ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা।	৪১৪
১৩।	আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ডের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব।	৪২৭
১৪।	সহবাস সম্মতি আইনের পক্ষে ২৩ জানুয়ারী ১৮৯১ তারিখে কলকাতায়, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে নওয়াব আহসানুল্লাহর দেয়া ভাষণ।	৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া তিনটি পত্র, তারিখ ৭, ৮ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ ।........................ ৪২৯

১৬। ১৯১২ সালের ৩-৪ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে দেয়া সভাপতির ভাষণে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নওয়াব সলিমুল্লাহর বক্তব্য (ইংরেজী)। ৪৩১

১৭। বিক্রমপুর ছলিমিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত নওয়াব সলিমুল্লাহর দান সম্বন্ধীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্র। ৪৩২

১৮। নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখা ব্যক্তিগত ডাইরীর পাতা। ৪৩৩

১৯। নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কবিতাছন্দে লেখা দাওয়াতপত্র (ফার্সী) এবং সেটার বঙ্গানুবাদ। ৪৩৪

২০। নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া খাজা আফজালের লেখা কবিতাসহ পত্র। ৪৩৬

২১। শাহবাগে নববর্ষের মেলা উপলক্ষে নওয়াবের বিজ্ঞাপন। ৪৩৯

২২। ১৮৯৫ সালে তৈরী ঢাকার নওয়াবদের অস্থাবর সম্পত্তি ও অলংকারাদির মূল্য সম্বলিত একটি তালিকা। ৪৪১

২৩। ঢাকার নওয়াবদের প্রকাশিত জুয়েলারী এ্যালবামে সংশ্লিষ্ট অলংকারগুলোর বর্ণনা। ৪৪৩

২৪। ১৯০৮ সালে সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণকালে হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর তৈরীকৃত ঢাকার নওয়াবদের জুয়েলারীর তালিকা। ৪৪৫

২৫। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ১৯১৫ সালের ২৬ জানুয়ারী হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর তৈরীকৃত জুয়েলারীর তালিকা। ৪৪৮

২৬। ঢাকা মোহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত ক্লাবের সভাপতিকে লেখা নওয়াব আহসানুল্লাহর পত্র। ৪৪৯

২৭। লেঃ গভঃ স্যার ল্যান্সলট হেয়ার- এর প্রতিকৃতি উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহর জারীকৃত পত্র। ৪৫০

২৮। এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক চীফ ম্যানেজারকে দেয়া পত্র। ৪৫১

২৯। চীফ ম্যানেজার কর্তৃক এ. কে. ফজলুল হককে দেয়া পত্রোত্তর। ৪৫২

৩০। ভাওয়াল রাজ রণেন্দ্র নারায়ণ রায় কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে লেখাপত্র, ৩০ অক্টো, ১৯০৪। ৪৫৩

৩১। শাহবাগ বাগানবাড়ীর ভূমি নক্শা। ৪৫৪

৩২। দিলখুশা বাগানবাড়ীর ভূমি নক্শা। ৪৫৫

৩৩। নওয়াবদের জিঞ্জিরা গার্ডেনের ভূমি নক্শা। ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমণিকা

'বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই "অভিসন্দর্ভটি" রচিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়কের পান্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতার ফলেই এই অভিসন্দর্ভটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী প্রায় এক'শ বছর ধরে ঢাকা নওয়াব পরিবারের লোকেরা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁদের নানাবিধ কার্যকলাপের মধ্যে প্রাসংগিক দিকগুলো এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সেগুলো এতদাঞ্চলের মুসলিমদের সমাজ গঠনে ও সংস্কৃতি পরিমার্জনায় কি কি অবদান রেখেছে সেটা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার পর আমি ঢাকার নওয়াবদের নানাবিধ কাজ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হই। এ অভিসন্দর্ভটি উক্ত অনুসন্ধিৎসু মনের বাস্তব ফসল। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকাশিত বই পুস্তক তেমন একটা না থাকায় মূল নথিপত্র, চিঠিপত্র, দলিল, ডাইরী, সমকালীন পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি ইতিহাসের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করেই রচিত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভ। উক্ত কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহদান ও সহায়তা করেছেন অত্র অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ গবেষণার কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে উর্দু-ফার্সী পান্ডুলিপি ও দলিলপত্রের মর্মানুধাবনে তিনি আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষকও কর্মচারীবৃন্দ আমার একাজে নানাভাবে সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এজন্য তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আমাকে এই গবেষণা কাজটি করার অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে জাতীয় জাদুঘরের বর্তমান মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান একাজে আমাকে শিক্ষা ছুটি দিয়ে বড় উপকার করেছেন। উক্ত জাদুঘরের উপ-কীপার (ইতিহাস) জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম আমাকে একাজে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আহসান মঞ্জিল জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের অফিসার ও কর্মচারীগণ আমার এই গবেষণার কাজে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের জনাব মোঃ এমরান শেখ এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের জনাব মোঃ বেলাল হোসেন কষ্ট করে এই থিসিসের খসড়া টাইপ করে দিয়েছেন। জাতীয় জাদুঘরের উর্ধতন ফটোগ্রাফার জনাব মোঃ আব্দুস সাদেক ও তাঁর সহকর্মী জনাব এ.টি.এম.হারুনার রশিদ ও জনাব আসাদুজ্জামান মিন্টু ছবিগুলো তৈরী করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেটের প্রাক্তণ চীফ ম্যানেজার, জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন এবং এ্যাসিষ্ট্যান্ট চীফ ম্যানেজার, জনাব মোহাম্মদ রেজাউল হক, বিভিন্ন সময় পুরানো নথিপত্র ও দলিলাদি দেখতে দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সেগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ ছাড়া এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রবীণ ও বহুদর্শী সদস্য খাজা মোহাম্মদ হালিমের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি তাঁর সংগ্রহে থাকা দলিলপত্র এবং নওয়াব পরিবারের বিভিন্ন নামকরা লোকের লেখা প্রাচীন ডাইরীগুলো আমাকে সানন্দে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। উক্ত পরিবারের অন্যান্য প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজেও তিনি আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। নওয়াব পরিবারের খাজা লতিফুল্লাহ এবং খাজা আব্দুল হালিম আমাকে অনেকগুলো তথ্য ও ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে নওয়াব পরিবারের বেগম ইয়াসমিন মোর্শেদ ও বেগম আলমাস জকিউদ্দিন আন্তরিকভাবে আমাকে এই গবেষণার কাজে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ শাখা, মাইক্রোফিল্ম ও পান্ডুলিপি শাখার অফিসার কর্মচারীগণ তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা দান করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ আরকাইভস-এর অফিসার কর্মচারীগণ আমাকে তথ্য সংগ্রহে বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণ বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই পূর্বক সঠিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও পরিবেশন করাই ঐতিহাসিক গবেষকের কাজ। স্থান, কাল, পাত্রের প্রেক্ষিতে ঘটনাবলীর বিচার করা হয়। সেখানে আবেগ কিংবা উচ্ছাসের কোন স্থান নেই। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে এই অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে যদি কিছু মৌলিক তথ্যাবলী ও গুণাবলী থাকে তবে সেটা বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পন্ডিতদের জন্য বিবেচ্য। এর মধ্যে যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কেবল মাত্র আমিই দায়ী।

তারিখ ঃ ৭ অক্টোবর, ১৯৯৯

মোঃ আলমগীর

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের নিকট অতীতের ইতিহাস নির্মাণে এবং বাঙালী মুসলমানদের সংস্কৃতি পরিমার্জনায় ঢাকার নওয়াব পরিবারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নানা কারণে আজো তাঁদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। বাংলার মুসলিমদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উক্ত অবদানের কথা সার্বিকভাবে তুলে ধরাই এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। যদিও মূলত বাংলাভাষী পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশ নিয়েই বাংলার বিস্তৃতি, কিন্তু এখানে বাংলা বলতে কেবল পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশকেই বুঝানো হয়েছে।

বাংলার সমাজ ক্ষেত্রে ও রাজনীতির বিভিন্ন অঙ্গনে প্রভূত অবদান থাকা সত্ত্বেও ঢাকা নওয়াব পরিবারের কর্মকান্ড ও চিন্তাচেতনা নিয়ে গবেষণা তেমন হয়নি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কয়েকজন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান লেখক ঢাকার নওয়াবদের সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ব্রেডলী বার্ট তাঁর *'রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল'* এবং *'টুয়েলভ মেন অব বেংগল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী'*-শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ে এবং সি. ই. বাকল্যান্ড তাঁর *'বেংগল আন্ডার দি লেঃ গভর্নরস'* নামক গ্রন্থে এবং ক্লাউড ক্যাম্পবেল তাঁর *'গ্লীম্পসেস অব বেংগল'* নামক গ্রন্থে-ঢাকার নওয়াবদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। দেশীয় লেখকদের মধ্যে লোকনাথ ঘোষ তাঁর *'ইন্ডিয়ান চীফস, রাজাস, জমিন্দারস এন্ড সি'* নামক গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ খ্রীঃ) এবং রহমান আলী তায়েশ তাঁর *'তাওয়ারিখে ঢাকা'* শীর্ষক গ্রন্থে (১৯১০ খ্রীঃ প্রকাশিত) তাঁদের সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করেছেন। এরপর দীর্ঘকাল ধরে এই পরিবার সম্পর্কে তেমন কোন রচনা পাওয়া যায়না। আধুনিক লেখকদের মধ্যে এস. এম. তৈফুর এবং এ. এইচ. দানী তাঁদের গ্রন্থে প্রাসংগিকতার কারণে ঢাকার নওয়াব পরিবার সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্যাদি দিয়েছেন। হাকিম হাবিবুর রহমানও অনুরূপ তাঁদের কিছু সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কথা লিখেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম, মুনতাসীর মামুন, হারুনার রশীদ তাঁদের বিভিন্ন রচনায় ঢাকার নওয়াবদের সম্পর্কে কিছু বিবরণাদি পেশ করেছেন। প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর 'নওয়াব সলীমুল্লাহ জীবন ও কর্ম' এবং 'ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ে এই পরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির রাজনীতি ও সমাজকর্ম নিয়ে বেশকিছু মৌলিক তথ্যের অবতারণা করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে ঢাকার নওয়াব পরিবারের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক পুস্তক আজো রচিত হয়নি। অত্র গবেষণায় সেই শূন্যতাই পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঢাকা থেকে মোগল বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের ফলে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই ঢাকার অবনতি শুরু হয়। রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঢাকার এই ক্রমাবনতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। মোগল সমৃদ্ধির যুগে ঢাকায় বসবাসরত প্রায় নয় লক্ষ লোক[১] কমতে কমতে উনিশ শতকে এসে ৬০/৭০ হাজারে দাঁড়ায়।[২] শহরের নানা অংশ জংগলাকীর্ণ হয় এবং পয়প্রণালী মজে দূষিত জলাশয়ে পরিণত হয়। মোগল আমলের ইমারতগুলো সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে।[৩] অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশের কারণে ঢাকায় তৎকালে মহামারী লেগেই থাকতো। ঢাকার এই চরম দূর্দিনে নওয়াব পরিবারের লোকেরা যদি এই শহর উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশেষভাবে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়তো সোনারগাঁও রামপালের মত ঢাকা শহরও একদিন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতো।

ঢাকা নওয়াব পরিবারের পূর্বপুরুষ মৌলভী আব্দুল্লাহ ১৭৩০ সালের দিকে তাঁর বড় ভাই খাজা আব্দুল ওহাবের সাথে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। বড় ভাই এখানেই বৈষয়িক ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। কিন্তু ছোট ভাই মৌলভী

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ পীর-মুরিদী প্রথায় ইসলামের খেদমত করতে থাকেন। তাঁর পান্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত দরবেশ শাহ্ নূরী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মৌলভী আব্দুল্লাহর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহও একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ১৭৯৫ সালে মক্কায় হজ্বে গিয়ে ইন্তেকাল করেন।[৪] খাজা আহসানুল্লাহর পুত্র খাজা আলীমুল্লাহই ছিলেন ঢাকার নওয়াব পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে তিনি পিতৃব্য খাজা হাফিজুল্লাহর তত্ত্বাবধানে থেকে ব্যবসা বাণিজ্য ও জমিদারি পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে কারবার করে প্রভূত উন্নতি করেন। তাঁর অনেক নীলকুঠি ছিল এবং তিনি চামড়া ও লবনের ব্যবসার পাশাপাশি মহাজনী কারবারও করতেন। তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল এলাকায় প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। তিনি হাতী-ঘোড়া ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করে অভিজাত চাল-চলন শুরু করেন। খাজা আলীমুল্লাহর সময়েই ঢাকার এ পরিবারটির খ্যাতি বাংলার সীমা অতিক্রম করে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ইউরোপীয় চাল-চলন পছন্দ করতেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ইউরোপীয় শিক্ষা ও কৃষ্টি উপেক্ষা করে সেযুগে উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি ইংরেজ শাসক ও কর্মকর্তাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।[৫]

ইংরেজদের সহায়তায় তিনি ঢাকা পৌর উন্নয়নসহ নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর আটিয়া পরগনার জমিদারি দরিদ্রদের জন্য আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করে দেন।[৬] খাজা আলীমুল্লাহর সাফল্য দেখে খাজা পরিবারের অন্যান্য সবাই তাঁদের ভূসম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৪৬ খ্রীঃ একটি ওয়াক্ফনামা সম্পাদন করে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খাজা আব্দুল গণিকে খাজা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। এই বিখ্যাত ওয়াক্ফনামাটিই ছিল ঢাকার খাজা পরিবারের উন্নতির মূল চাবিকাঠি। এর ফলে মোতাওয়াল্লী পরিবারের সব সম্পত্তি একক হাতে পরিচালনা করতেন এবং অন্যান্যরা ভাতা পেতেন।[৭] ঢাকা নওয়াব পরিবারের ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠা লাভের সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং তাঁদের জমিদারি পরিচালনার বিষয়ে এই অভিসন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকা নওয়াব পরিবারের ব্যবহৃত খাজা উপাধিটি আর্মেনীয়দের ব্যবহৃত কোজা উপাধি থেকে উৎসারিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কাশ্মীরে থাকাকালেই তাঁদের এই উপাধিটি ছিল এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কারণে ধর্মগুরু হিসেবে তাঁরা যে এই উপাধিটি পেয়েছিলেন-তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়েও তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নওয়াব আব্দুল গণি ছিলেন ঢাকার খাজা পরিবারের সর্বাপেক্ষা সফলকাম পুরুষ। তিনি তাঁর পিতার ধন সম্পত্তি ও জমিদারি আরো বৃদ্ধি করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এ অঞ্চলে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় জমিদার।[৮] ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে খাজা আব্দুল গণি ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেন। ঐ সময় নানা রকম গুজবে ঢাকা শহরের শান্তি শৃঙ্খলা ভংগের উপক্রম হলে আব্দুল গণি সেটা রক্ষার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।[৯] সমকালীন প্রেক্ষাপটে আব্দুল গণির সরকার পক্ষ সমর্থনের কারণগুলো এখানে বর্ণিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন আব্দুল গণি শালিশীর মাধ্যমে দেশবাসীর বড় বড় সমস্যা সমাধান করে দিতেন। তাঁর জমিদারিতে কড়া নির্দেশ ছিল যে, তাঁর শালিশী শেষ না করে কেউ যেন সরকারের আদালতে না যায়। শালিশীর এই ঐতিহ্যটি তাঁর উত্তরাধীকারীগণও টিকিয়ে রেখেছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় পর্যন্ত লোকেরা ন্যায় বিচারের আশায় আহসান মঞ্জিলে এসে ভীড় করতো।

নওয়াব আব্দুল গণির চেষ্টায় ঢাকায় পঞ্চায়েত প্রথা পুর্নাংগরূপে বিকশিত হয়। পঞ্চায়েতের সভাপতিরূপে ঢাকার নওয়াবগণ প্রত্যেক মহল্লার সর্দারকে স্বীকৃতি পাগড়ী দিতেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। পূর্ববংগ জমিদার সভার সভাপতি রূপে ঢাকার নওয়াব এ অঞ্চলের ভূস্বামীদের নানা সমস্যা সমাধানে যোগ্য নেতৃত্ব দিতেন।

জনসেবা ও রাজানুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার খাজা আব্দুল গণিকে অনেকগুলো উচ্চ সম্মানবাহী খেতাব প্রদান করেন। খেতাবগুলোর মধ্যে ১৮৭৫ সালে তাঁকে দেয়া নওয়াব খেতাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত খেতাবটি

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৭ সালে তাঁর বংশানুক্রমে ব্যবহারের অধিকার দেয়া হয়। অর্থ-সামর্থ, বিদ্যা-বুদ্ধির সাথে এই উপাধিটি তাঁদেরকে সম্মান ও খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন করেছিল।

জনকল্যাণ ও দান ধ্যানের কাজে ঢাকার নওয়াবদের কোন জুড়ি ছিল না। ঢাকার পৌর উন্নয়নে নওয়াব পরিবারের গৃহীত ব্যবস্থাদি ঢাকা শহরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে। এ শহরে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত গোরস্তান নির্মাণে ঢাকার নওয়াবের অবদানটি স্মরণীয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে খাজা পরিবারের লোকেরা এর সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে বিজয়ী মুসলমানদের প্রায় সবাই হতেন নওয়াবের আত্মীয় কিংবা বন্ধুভাবাপন্ন লোক। তাঁদের মাধ্যমে তিনি ঐ স্থানীয় সরকারের উপর প্রভাব রাখতেন। ঢাকা নওয়াব পরিবারের খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজান দীর্ঘদিন যাবৎ মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থেকে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। ঢাকার রাস্তাঘাট, পয়প্রণালী, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নয়নে তিনি কি কি কাজ করেছেন তাও এখানে আলোচিত হয়েছে।

নওয়াব আব্দুল গণি পানীয় জলের কল স্থাপন করে এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ বিজলী বাতির ব্যবস্থা করে ঢাকা শহরবাসীর নিকট স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু কোন্ প্রেক্ষিতে এবং কিভাবে তাঁরা সেগুলো সম্পাদন করেছেন, সেটা আজো পূর্ণাংগভাবে তুলে ধরা হয়নি। এখানে সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী যেমনঃ স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, বাকল্যান্ড বাঁধ ও নর্থব্রুক হল নির্মাণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া দেশে বিদেশে বিভিন্ন জনকল্যাণ কাজে ঢাকার নওয়াবগণ যেসব অর্থদান করেছেন, তার বিবরণাদিসহ একটি তালিকা এখানে সন্নিবেসিত করা হয়েছে।

ঢাকার নওয়াবগণ কেবল অর্থদান করেই ক্ষান্ত হননি বরং বিপুল পরিমানে অর্থ বিনিয়োগ করে তাঁরা জনকল্যাণার্থে কয়েকটি স্থায়ী ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড এবং প্লেগ ফান্ড ট্রাষ্ট দুটো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত ফান্ডের অর্থ থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র, দুস্থ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়মিত সহায়তা দেয়া হতো।[১০] কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুধী সমাজের কাছে আজো প্রায় অজানা রয়েছে। উক্ত ফান্ডগুলোর স্বরূপ ও কার্যাবলী এখানে বর্ণিত হয়েছে। ঢাকার নওয়াবগণ সমকালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন খ্যাতনামা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন এবং সেগুলোর স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশবাসীকে সংগঠনগুলোর সুফল ভোগ করার সুযোগ করে দিতেন। ঢাকাস্থ এরূপ জনকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' ছাড়াও কলকাতায় নওয়াব আব্দুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' এবং সৈয়দ আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'- এর সাথে ঢাকার নওয়াবদের সম্পৃক্ততার কথা এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঢাকার নওয়াবদের সমকালে পূর্ববাংলার মুসলমানদের বেশীরভাগই ছিল অজ্ঞ-অশিক্ষিত। তাঁদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীরা সমাজে অনেক অনৈসলামিক প্রথা চালিয়ে জনসাধারণকে শোষণ করতো। অন্যদিকে কঠোর ইসলামি মতাদর্শে বিশ্বাসী ফারাজীরা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে দারুল হরব মনে করে মুসলমানদেরকে জেহাদে অনুপ্রেরণা দিতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার নওয়াবগণ নওয়াব আব্দুল লতিফ এবং মওলানা জৌনপুরীর ন্যায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম করার মতাদর্শ প্রচার করতেন।[১১] এতদাঞ্চলের প্রায় সব মুসলমান তাঁদের এই মতাদর্শে প্রভাবিত হয়।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলো দূর করার জন্য উদারমনা ও কুসংস্কারমুক্ত মনীষীরা চেষ্টা চালাতেন। ব্রিটিশ সরকারও কুপ্রথাগুলো দূর করার পক্ষপাতি ছিলেন। ঢাকার নওয়াবগণ সমাজের কুপ্রথাগুলো দূরীকরনের জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছেন। বাল্য বিবাহ নিরোধ এবং সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়ন,[১২] দেশী মদ তৈরীর কারখানা নিয়ন্ত্রণ, বারবণিতা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আইন প্রণয়নে ঢাকার নওয়াবদের ভূমিকা এখানে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ঐসব আইন কানুন ছিল এদেশবাসীর জন্য আধুনিক ও সুশৃংখল বিশ্বে উত্তোরণের সোপান স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে তৎকালে এতদাঞ্চলের বহু লোক ধুকে ধুকে মরতো। এজন্য ঢাকার নওয়াবগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা বিদেশ থেকে আধুনিক ঔষধপত্র আমদানি করে তা দেশবাসীর নিকট সহজলভ্য করতেন। ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে তাঁরা অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন।[১৩] অত্র অভিসন্দর্ভে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোর বিবরণ ও সেগুলোর সাথে নওয়াবদের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এতদাঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আয়োজন এবং ধর্মীয় উৎসব পালনে ঢাকার নওয়াবগণ ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। এজন্য তাঁরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বহু সংখ্যক পুরানো মসজিদ, দরগাহ ও ইমামবাড়া মেরামত করে সচল রাখেন। নওয়াব এস্টেট থেকে প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে ঐসব মসজিদ ও দরগাহ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠানগুলো আজো এতদাঞ্চলের মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ওৎপ্রতভাবে জড়িত। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের শুরুতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা স্থানীয় দরিদ্র লোকদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সেই সন্ধিক্ষণে ঢাকার নওয়াবগণ রক্ষণাবেক্ষণ না করলে হয়তো সেগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট মুসলমানেরাও তাঁদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি চর্চার যথাযথ সুযোগ পেতেন না। অত্র অভিসন্দর্ভে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ঢাকার নওয়াবদের সম্পৃক্ততা ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা আলোচিত হয়েছে।

জনশিক্ষা বিস্তারে ঢাকার নওয়াবগণ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তাঁরা অনেকগুলো মাদ্রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ-বিদেশে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন। মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব এবং নিজেদের আরবী-ফার্সী প্রীতির কারণে ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলার মুসলমানরাও আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে ছিলেন। ঢাকার নওয়াবরা আরবী-ফার্সী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা গ্রহণেও আগ্রহী ছিলেন। দেশবাসী বাংলার মুসলামানদেরকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তাঁরা বহু প্রচেষ্টা চালান। তৎকালীন মুসলমানদের মানসিকতা বুঝতে পেরে ঢাকার নওয়াব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।[১৪] সাধারণ ও গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে তাঁরা যুগপোযোগি ও কারিগরী শিক্ষা বেশি প্রয়োজন মনে করতেন। এজন্য তাঁরা ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠায় সরকারকে অর্থাদি দিয়ে সহায়তা করেন। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তাঁদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। তাঁরা মুসলিম নারীদের শিক্ষাদানেরও পক্ষপাতি ছিলেন।[১৫] মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারে ঢাকার নওয়াবদের গৃহীত নানা ক্রিয়াকলাপের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত আচার আচরণের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বহিরাগত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মুসলমানগণ তাঁহাদের নিজস্ব কৃষ্টির উপাদান সংগে করে আনেন। ঐসব উপাদানের সাথে স্থানীয় কৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে একটি নতুন কৃষ্টির উদ্ভব হয় যাকে বাঙালী মুসলমান কৃষ্টি বলা যেতে পারে। কিন্তু বর্ণপ্রথা ও অশিক্ষার কারণে এঅঞ্চলে উক্ত কৃষ্টির সার্বজনীনতা পেতে বহুদিন লেগে যায়। এই বাঙালী মুসলিম কৃষ্টির প্রসার ও জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান অবিস্মরণীয়। এ বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এক সময় ঢাকার নওয়াব পরিবারকে বলা হতো পূর্ব বাংলার কমনওয়েলথ। কারণ এদেশের সবশ্রেণীর লোকদের অভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাঁদের জুড়ি ছিলনা। বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশের সর্বস্তরের লোক ঢাকার নওয়াবের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে আসতো। এছাড়া নওয়াবের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসবে সর্বস্তরের লোকের যোগদান করা একটি প্রচলিত রীতি বলে মনে করা হতো। বিশেষ করে এতদাঞ্চলের মুসলিম সমাজের নানা উৎসব পালনে এদেশবাসীরা ঢাকার নওয়াবকে অলিখিত অভিভাবক বলে মনে করতো। ঐসব কাজকর্মের সময় তাঁরা নওয়াবের দেয়া সাহায্য সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ফলে ঐসব আচার অনুষ্ঠানের নানা লৌকিকতায় ঢাকার নওয়াবের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটতো এবং সেখানে নওয়াব বাড়ির কৃষ্টির প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। যদিও ঢাকার নওয়াবগণ ছিলেন সুন্নী

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান। কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতির কারণে এতদাঞ্চলের শিয়ারাও তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল।[১৬] উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ঢাকার মোগল নায়েবে নাজিমগণ শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়ায় তাঁরাই শিয়াদের নেতৃত্ব দিতেন। কোন্ প্রেক্ষিতে শিয়ারা ঢাকার নওয়াবের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং শিয়াদের সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে তাঁরা কি ভূমিকা রেখেছেন তাও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

উর্দুই ছিল ঢাকার নওয়াবদের পারিবারিক ভাষা এবং সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম। এজন্য তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় তেমন কোন অবদান রাখতে পারেননি। কেন বাঙালী হয়েও ঢাকার নওয়াবরা উর্দূ প্রীতি দেখিয়েছিলেন তার একটি ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে খাজা পরিবারের খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের একটি তালিকাসহ ঢাকার নওয়াবদের সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতার নানাদিক বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সংগীত, নাটক, ফটোগ্রাফী, বায়োস্কোপ এবং সিনেমা চর্চায় খাজা পরিবারের সম্পৃক্ততার কথাও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এতদাঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব পালনে ঢাকার নওয়াবরা নেতৃত্ব দিতেন। মোগল যুগীয় নওয়াবদের ঈদ, মহররম উৎসব ও মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার ঐতিহ্যটি ঢাকার নওয়াবরা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পান।[১৭] ঈদের দিনে লোকেরা কুশল বিনিময় করতে নওয়াব বাড়ীতে ভিড় করতো। সেদিন আগত সবাইকে ভূরিভোজে আপ্যায়ন করা হতো। ঢাকার নওয়াবগণ যেমন অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের ধর্ম বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতেন, তেমনি গরু কোরবানী করে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই এতদাঞ্চলে গরু কোরবানী নির্বিঘ্ন করতে তাঁরা সচেষ্ট হন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করতেন। ঐসব মেলায় কুটির শিল্পসহ রকমারী দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হতো। খ্রীস্টিয় নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিবছর নওয়াবের শাহবাগ বাগান বাড়িতে ঘটা করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। উক্ত মেলায় সারাদেশ থেকে লোকেরা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং গবাদি পশুপাখী প্রদর্শনের জন্য নিয়ে আসতেন। শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের জন্য নওয়াবের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেয়া হতো।[১৮] ফলে উন্নত জাতের ফসল ও গবাদি পশু উৎপাদনে লোকেরা উৎসাহিত হতো।

এককালে ঢাকার চারু ও কারু শিল্পের ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু শহর সংকোচনের কারণে ঢাকার নওয়াবদের আমলে সেটা দূর্দশায় পতিত হয়। ধাতব শিল্পকর্মের উন্নয়নে নওয়াব সাহেবগণ সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ছাড়াও সেগুলোর জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন।[১৯] ফলে ঢাকায় ঐসব উন্নতমানের শিল্পকর্মের ব্যবহার ও চর্চা বেশ কিছুদিন টিকেছিল। বিশ্বজোড়া মসলিনের ক্ষুদ্র সংস্করণ জামদানি ঢাকার নওয়াবদের আমলে কোন রকমে টিকে ছিল। জামদানি শিল্পের উন্নয়নে ও পুনরুজ্জীবনে নওয়াব সলিমুল্লাহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ফলে বৈচিত্রপূর্ণ রঙ ও নক্শায় সজ্জিত হয়ে জামদানি আজো স্বগৌরবে টিকে আছে।[২০]

এদেশে আধুনিক ক্রীড়া প্রচলনে ঢাকার নওয়াবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা ও কলকাতায় মুসলমানদের ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিষ্ঠান মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে এই পরিবারের ব্যাপক অবদান রয়েছে।[২১] উল্লেখ্য, বিগত ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে ভারতবর্ষে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধ আন্দোলনে উক্ত ক্রীড়া সংগঠনগুলো ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। খাজা পরিবারে বেশ ক'জন নামকরা খেলোয়াড়ও জন্মেছিলেন। এদেশে হকি খেলাটি জনপ্রিয় করতে তাঁদের অবদানটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২২] অত্র অভিসন্দর্ভে তাঁদের বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং ক্রীড়া সংগঠন তৈরী করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঢাকার নওয়াবদের বাসভবন 'আহসান মঞ্জিল' এমন একটি ইমারত যার সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের বহু ঘটনা জড়িত। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে পাকিস্তান আমলের প্রথমকাল পর্যন্ত প্রায় একশত বছর ধরে পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকে মূলত এই প্রাসাদ থেকেই নেতৃত্ব দেয়া হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকে উপমহাদেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এখানে এমন কিছু গঠনমুলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় যার সূত্র ধরে উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ উপ্ত হয়। সেই বীজ একদিন ভারতবর্ষে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধের ধারণাকে পুস্ট করে এবং ক্রমান্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাতিয়তাবাদকে পূর্ণতা দিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাস্ট্রের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের পূর্বাংশই আজ স্বাধীন বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও পূর্ববাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রকৃতিও এখান থেকেই নির্ধারিত হতো। এছাড়া এখানে অনুষ্ঠিত ঐ ধরণের অনুষ্ঠানগুলোতে সমাজের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত স্তরের গন্যমান্য লোকেরা অংশগ্রহণ করতো। তাঁদের মাধ্যমে নওয়াব পরিবারের কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যাবলী দেশের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তো। উল্লিখিত কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ ভবনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ে সংস্কারসাধন এবং সেখানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অত্র অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঢাকার নওয়াবগণ যে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিতে অবিসংবাদিতভাবে নেতৃত্ব দিতেন সেটা আহসান মঞ্জিলে সংঘটিত উক্ত ঘটনাবলী থেকেই স্পস্টভাবে বুঝা যায়।

ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাগানবাড়ী ও পার্ক নির্মাণ করে ঢাকার নওয়াবগণ পরিবেশ নির্মল এবং লোকদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতেন। ঢাকায় নির্মিত এরূপ শাহবাগ ও দিলখুশা বাগানবাড়ী দুটো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশক পর্যন্ত এই বাগানবাড়ী দুটো ঢাকার যাবতীয় উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল।[২৩] উক্ত বাগানবাড়ী দুটোর বর্ণনা এবং সেখানে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে ঝোঁপ জংগল পরিস্কার করে, ফুল ফলের গাছ লাগিয়ে তাঁরা পরিবেশকে নির্মল করার চেষ্টা চালান। দেশব্যাপী বিস্তৃত জমিদারি এলাকায় বিভিন্ন স্থানে তাঁরা দীঘি খনন করে জনগণের জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেন।

ঢাকার নওয়াবগণ নানা জাতের দুর্লভ প্রাণির সমাবেশে চিড়িয়াখানা তৈরী করেছিলেন। জনসাধারণ সেগুলি দেখে চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানাহোরণ করতেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করার জন্য ঢাকার নওয়াবগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংরক্ষিত বনএলাকা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সাভারের বাইগুনবাড়ী ছিল এরূপ একটি স্থান যেখানে তাঁদের শিকারগৃহ ছিল। তাঁদের এসব পশুপাখী পালন ও সংরক্ষণ কাজটি সমকালীন লোকদের অনুরূপ কাজে অনুপ্রাণিত করতো।

ঢাকার নওয়াব পরিবারের অনুসৃত উল্লিখিত কার্যকলাপ এতদাঞ্চলের মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে যে ব্যাপক অবদান রেখেছিল সেকথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উক্ত আলোচনায় আরো জানা যায় যে, পূর্ববাংলার এক যুগ সন্ধিক্ষণে ঢাকার নওয়াবদের গৃহীত সমাজ হিতৈষী ব্যবস্থাদি এতদাঞ্চলের মুসলমানদের যেমন আর্থসামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করেছিল তেমনি তাদের জীবন চলার পথের দিক নিদের্শনাও দিয়েছিল। এজন্য তাঁরা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট ১১টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াব পরিবারের পূর্ব পুরুষদের কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আগমনের ইতিহাস, তাঁদের খাজা উপাধি, আর্থিক উন্নয়ন ও জমিদারি ক্রয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার নওয়াবদের সাথে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও ঢাকার নেতৃত্বলাভ এবং ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগা দমনে তাঁদের গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াবদের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকায় পৌর উন্নয়ন, ঢাকায় পানীয় জল ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা। এ ছাড়াও আছে ঢাকায় মুসলিম এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, বাকল্যান্ড বাঁধ ও নর্থব্রুক হল নির্মাণে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের বর্ণনা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দেশে বিদেশে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ঢাকার নওয়াবদের আর্থিক সহায়তাদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের অর্থদানের একটি তালিকাও উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জনকল্যাণে ঢাকার নওয়াবদের গঠিত বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ডের বর্ণনাসহ সমকালীন বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের কথা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়নে সরকারকে দেয়া তাঁদের সহায়তার কথাও এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ জনস্বার্থে ঢাকার নওয়াবগণ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াবগণ কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় ইমারত তৈরী, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াব পরিবারের শিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো-মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব সলিমুল্লাহর অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব পরিবারের ভূমিকা এবং ঢাকার নওয়াবগণ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের বর্ণনা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াবদের সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর কথা আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো-নওয়াব পরিবারের সাহিত্য চর্চা, তাঁদের সংগীত, নাটক, ফটোগ্রাফী ও সিনেমা চর্চার কথা এবং উৎসব পালন, ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ও মেলা আয়োজনের কথা। এছাড়াও এ অধ্যায়ে আছে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা এবং চারু ও কারুশিল্পের বিকাশে ঢাকার নওয়াবদের অবদানের কথা এবং তাঁদের জাঁকজমক, সাজ সরঞ্জাম ও অলংকারাদির বর্ণনা।

নবম অধ্যায় ঃ এতদাঞ্চলে বিভিন্ন ক্রীড়া চর্চায় ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদানের কথা আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন এবং এতদাঞ্চলে হকি খেলা জনপ্রিয় করায় তাঁদের অবদানের কথা। এছাড়া ঘুড়ি উড়ানো, বিলিয়ার্ড, টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় তাঁদের সম্পৃক্ততার কথাও এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

দশম অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াবদের প্রাসাদ ভবন আহসান মঞ্জিলের প্রতিষ্ঠা, সংস্কার এবং সেখানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায় ঃ ঢাকার নওয়াবগণ কর্তৃক বিনোদনমূলক পার্ক, বাগান ও বাগানবাড়ী এবং চিড়িয়াখানা নির্মাণের কথা আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে নওয়াবদের শাহবাগ ও দিলখুশা বাগানবাড়ীর বর্ণনা এবং সেখানে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনে-প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত যেসব গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও দলিলপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তথ্যসূত্রে তার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা প্রকাশ প্রভৃতি পুরোনো আমলের পত্রিকা থেকে তথ্যের উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সেগুলো সহজবোধ্য করার জন্য অনেক সময় বাক্যের সংক্ষিপ্ত ও চলতিরূপ দেয়া হয়েছে। যেসব বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, চিঠিপত্র, ডাইরী ও দলিলপত্র থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য নেয়া হয়েছে সে সবের তালিকা গ্রন্থপঞ্জিতে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্টে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কয়েকটি বিখ্যাত ওয়াকফনামার ফার্সী অনুলিপি এবং ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হলো। এছাড়া এ অভিসন্দর্ভের মূলপাঠ ও বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ তথ্যাদি যেমনঃ নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা, তাঁদের কিছু জমিদারি পরগনার বিবরণ, জুয়েলারীর তালিকা, বড়লাট আইন সভায় নওয়াব আহসানুল্লাহর ভাষণ, নওয়াবদের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রের কপি পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হলো। বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ বেশ কিছু আলোকচিত্রও পরিশিষ্টে দেয়া হলো। ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট অফিস থেকে সংগৃহীত নওয়াবদের পুরোনো এ্যালবাম (বর্তমানে সেগুলো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত), বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থ এবং নওয়াব পরিবারের কয়েকজন প্রবীন সদস্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে চিত্রগুলো সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

(১) যদিও কোন কোন লেখক মোগল সমৃদ্ধির কালে ঢাকার লোকসংখ্যা ৯ লক্ষে উন্নীতের কথা বলেছেন। (যেমন- ব্রেডলী বার্ট, *রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল*, লন্ডন ১৯০৬ পৃঃ ২৪০ এবং সউদ হোসেন, *ইকোস ফ্রম ওল্ড ঢাকা*- কলকাতা ১৯০৯ পৃঃ ২০) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ আমলেও ঢাকার লোকসংখ্যা ৪/৫ লক্ষের বেশী ছিল না। দেখুন- আব্দুল করিম, *ঢাকা দি মোগল ক্যাপিটাল*, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৬৪ পৃঃ ৯২।

(২) এ. এইচ. দানী, *ঢাকা এ রেকর্ড অব ইটস চেঞ্জিং ফরচুনস*, ২য় সংস্করণ ১৯৬২ পৃঃ ১০৪ এবং এস.এম. তৈফুর, *গ্লীম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা*, ২য় সংস্করণ ১৯৫৬ পৃঃ ২০, ৬৭, ১৭৮ এবং জেমস টেইলর, *টপোগ্রাফী অব ঢাকা*, মোঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক বংগানুবাদ, কোম্পানী আমলে ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩ পৃঃ ১৫৯।

(৩) টেইলর, *টপোগ্রাফী*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২৫০ ও ২৮০ এবং ব্রেডলী বার্ট, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৮।

(৪) নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তাওয়ারিখে খান্দানে কাশ্মীরিয়াহ*, অপ্রকাশিত উর্দু পান্ডুলিপি পৃঃ ৪৪-৫৪ এবং রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, ডঃ আ.ম.ম.শরফুদ্দিন কর্তৃক বংগানুবাদ, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃঃ ১৮১।

(৫) আব্দুর রহিম সাবা, *তারিখে কাশ্মীরিয়ানে ঢাকা*, অপ্রকাশিত ফার্সী পান্ডুলিপি, পৃঃ ৩৪-৩৮ এবং ১৩০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ পৃঃ ৪ এবং ব্রেডলী বার্ট, *ট্রয়েলভ মেন অব বেংগল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী*, ৩ সংস্করণ, কলকাতা ১৯২৫ পৃঃ ১৭৪-৭৮।

(৬) তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ১৮১।

(৭) ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৮৮০ এবং ১৩ মে ১৮৯৪ এবং ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ এবং *পুরানো দলিলপত্র*, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, পৃঃ এ-৭, ১৯, ৩০ ও ৪২।

(৮) ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭

(৯) ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ এবং বার্ট, *ট্রয়েলভ মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮।

(১০) *পুরানো নথি, ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেটের* পুরানো অফিসে রক্ষিত, পৃঃ ডি-১৬-২৪ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোবর ১৮৯৬ এবং ২ অক্টোবর ১৮৯৮।

(১১) সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পাক বাংলার ইসলামী বিপ্লব, মাসে নও, ২০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৮ পৃঃ ৮-৯।

(১২) *এ্যাবস্ট্রাক্ট অব প্রসিডিংস অব দি কাউন্সিল অব দি গভঃ জেনারেল অব ইন্ডিয়া এ্যাসেমব্রেড ফর দি পারপাস অব মেকিং লজ এন্ড রেগুলেশনস*, ১৮৯১ পৃঃ ৩০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৮ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১।

(১৩) ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগষ্ট ১৮৯৬ এবং ২৮ ডিসেঃ ১৯০২ এবং ১৪ আগস্ট ১৯১০।

(১৪) নওয়াব আহসানুল্লাহর সহস্তে লেখা ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজী ভাষায়, অপ্রকাশিত, ১৮৭৪ সাল, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত (সংগ্রহ নং আ-৯৩.২৭৪) তাং ২ ফেব্রুয়ারী ১৮ ও ২৮ এপ্রিল ১৮৭৪ খ্রীঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগষ্ট ১৮৯৬ এবং ২৬ সেপ্টেঃ ১৮৮০ পৃঃ ৩৩৯ এবং শরিফুদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা এ স্টাডি ইন আরবান হিস্টরী এন্ড ডেভলপমেন্ট*, ১ম প্রকাশ,লন্ডন-১৯৮৬পৃঃ ৭৯-৮০

(১৫) *প্রসিডিংস অব দি লেজিসলেটিব কাউন্সিল অব ইস্টার্ন বেংগল এন্ড আসাম*, ৬ এপ্রিল ১৯০৮, পার্ট-৬ পৃঃ ৭১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব সলীমুল্লাহ জীবন ও কর্ম, ঢাকা ১৯৮৬ পৃঃ ১৪৯ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৮ ফাল্গুন ১৩১৪ বাংলা (১৯০৮) পৃঃ ৫

(১৬) যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, ১ম খন্ড, ১৩১১ বাংলা পৃঃ ৪২১।

(১৭) ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯১২ পৃঃ ৪ এবং ২৬ অক্টোবর ১৮৮৬ পৃঃ ৭ এবং ৮ মার্চ ১৯০৮ পৃঃ ৩।

(১৮) হাকিম হাবিবুর রহমান, *ঢাকা পাচাস বরস পাহলে*, মোঃ রেজাউল করিম কর্তৃক বংগানুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫ পৃঃ ১০৪। এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ও ২৩ নভেম্বর ১৮৭৮ এবং ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮১ এবং ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

(১৯) ঢাকা প্রকাশ, ৪ ফেব্রুয়ারী এবং ৪ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৩-৪ এবং ২৫ আগস্ট ১৯১৯ পৃঃ ৪ এবং রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখের ঢাকা*, প্রাগুক্ত বংগানবাদ, পৃঃ ১১৩ ও ১৮৩।

(২০) হাকিম হাঃ রহমান, *ঢাকা পাচাস বরস পাহলে*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১০।

(২১) সাপ্তাহিক *মোসলেম ক্রনিকেল*, ১৭ জানুয়ারী ১৮৯৫ পৃঃ ১৬ এবং ১২ আগস্ট ১৮৯৯ পৃঃ ৪৫৬।

(২২) এস. কে. রুকুদ্দিন, *হকি ইন ঢাকা, ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজলেটার*, করাচী, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ পৃঃ ১১-১২। খাজা ইব্রাহিম এবং কে. এম. শাহেদ, *ঐ নিউজ লেটার*, ১ জানুয়ারী ১৯৯৪ পৃঃ ১১।

(২৩) আজিমুশ্শান হায়দার, *ঢাকা হিস্টরী এন্ড রোমান্স ইন প্লেস নেমস*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৬৭ পৃঃ ৩৬ এবং ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট- এর পুরানো অফিস এডওয়ার্ড হাউসে প্রাপ্ত *পুরাতন নথিপত্র*, নথি নং-ডি. পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ঢাকার নওয়াব পরিবার ও তাঁদের কর্মকান্ড

১ (১) নওয়াব পরিবারের ঢাকায় আগমণ ও তাঁদের ইতিহাস ঃ

মোগল যুগীয় নওয়াব তথা নিমতলীর নায়েবে নাজিম বংশের বিলুপ্তির পর ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে এগিয়ে আসেন তৎকালীন নবোত্থিত খাজা পরিবার। বৃটিশ সরকার থেকে বংশ পরম্পরায় নওয়াব উপাধি ব্যবহারের অধিকার পেয়ে উক্ত খাজা পরিবারটি পরবর্তীকালে ঢাকার নওয়াব পরিবার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আদিতে সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁরা ব্যাপক ভূসম্পত্তি ক্রয় করে পূর্ব বংগের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদারে পরিণত হন। আর্থিক সমৃদ্ধি ও বিবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর দরুণ বৃটিশ সরকার তাঁদেরকে নওয়াব উপাধি ছাড়াও আরো কয়েকটি উচ্চ সম্মানবাহী খেতাব প্রদান করেছিলেন।

ঢাকার নওয়াব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা তথা আদি পূরুষের পরিচয় ও তাঁর বাংলাদেশে প্রথম আগমণের স্থান ঢাকা না সিলেট, এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।[১] তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এই পরিবারের আদি পুরুষ কাশ্মীর থেকে এদেশে এসেছিলেন। সংশ্লিষ্ট মতানৈক্য অনুধাবনের জন্য এ বিষয়ে নিম্নে কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকদের মতামত বর্ণনা করা হলো।

লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন, "জনৈক খাজা আবদুল হাকিম তাঁর আদি নিবাস কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে দিল্লীতে এসে মোগল বাদশাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ ও বসবাস শুরু করেন। নাদির শাহ্ দিল্লী দখল করলে, খাজা আবদুল হাকিম সহায়-সম্পত্তি নিয়ে স্বপরিবারে পূর্বাঞ্চলের সিলেটে চলে আসেন। সিলেটে তিনি আশাতীত উন্নতি করেন। তাঁর সৌভাগ্যের সুফল ভোগ করতে তিনি পিতা মৌলভী আবদুল কাদের এবং দুই ভাই মৌলভী আব্দুল্লাহ ও আব্দুল ওহাবকে ডেকে নিয়ে আসেন। খাজা আবদুল হাকিম সিলেটে বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি রেখে যান। সেখানে তাঁর কবরও রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর মৌলভী আব্দুল্লাহ তাঁর এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব পান। আরো উন্নতির লক্ষ্যে তিনি স্বপরিবারে সিলেট ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন।"[২]

ক্লাউড ক্যাম্পবেল বলেন, "এই পরিবারের প্রথম পুরুষ খাজা আব্দুল হাকিম ছিলেন কাশ্মীরের গভর্ণর। সম্রাট শাহ্ আলম তাঁকে সরিয়ে নতুন একজনকে নিয়োগ দিয়ে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু খাজা আব্দুল হাকিম সেনাদল সংগ্রহ করে নতুন শাসকের নেতৃত্বে আগত বাহিনীকে পরাজিত করেন। সম্রাট দ্বিতীয়বার আরো শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। খাজা আব্দুল হাকিম তখন সংঘর্ষ এড়িয়ে পালিয়ে দিল্লীতে চলে যান। নাদির শাহের দিল্লী আক্রমনে নির্যাতিত হয়ে আরো অনেকের মত আব্দুল হাকিম ভাগ্যোন্নয়নে স্বপরিবারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সিলেটে চলে আসেন।[৩] এই নতুন জায়গায় তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন হয়। তিনি বর্তমান সিলেট কালেক্টরেট ভবনের স্থানে তাঁর বসতবাড়ী নির্মাণ করেন। মৃত্যুর পর সেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইতোমধ্যে কাশ্মীরের নতুন গভর্নরের উৎপীড়ণ এড়ানোর জন্য জনৈক খাজা আব্দুল কাদিরও তাঁর জ্ঞাতি আব্দুল হাকিমের পদাঙ্ক অনুসরণে মনস্থ করেন। তিনি তাঁর দুইপুত্র মৌলভী আব্দুল্লাহ ও মৌলভী আব্দুল ওহাবকে নিয়ে প্রথমে সিলেটে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকায় চলে আসেন।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ইতিহাস লেখক মুন্সী রহমান আলী তায়েশ খাজা আব্দুল হাকিম ও আব্দুল্লাহর কথা উল্লেখ করেননি। তিনি খাজা হাফিজুল্লাহকে এ বংশের আদি পুরুষ রূপে মনে করেন। তিনি লিখেছেন, খাজা হাফিজুল্লাহ নায়েবে নাজিম নুসরাত জঙ্গের আমলে ব্যবসা বাণিজ্যপোলক্ষ্যে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ধর্মীয় ও পার্থিব বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এজন্য কাশ্মীরের শাসকদের নিকট তাঁদের উচ্চ মান-মর্যাদা ছিল।[৫] খাজা হাফিজুল্লাহ ঢাকায় পীর-মুরিদী প্রথা চালু করেন। ঢাকা শহরের অধিকাংশ লোক তাঁর মুরীদ হয়। এ ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে খাজা হাফিজুল্লাহ বিপুল ধন সম্পত্তির মালিক হন। এ সব অর্থ দিয়ে তিনি ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও বরিশালে বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করেন।[৬]

ব্রেডলী বার্ট বলেন, 'ঢাকা নওয়াব পরিবারের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌলভী আব্দুল্লাহ। তিনি সম্রাট মোহাম্মদ শাহের আমলে আরো অনেকের মতো ভাগ্যোন্নয়নে কাশ্মীর থেকে দিল্লী চলে আসেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতন কালে মৌলভী আব্দুল্লাহ অনেকটা দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েই সাম্রাজ্যের একেবারে পূর্ব সীমান্তে সিলেটে চলে আসেন। সেখানে তিনি নিজকে একজন সফলকাম ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কাশ্মীর থেকে তাঁর পিতা ও ভাইকে নিয়ে আসেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারীরা সিলেট থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং বেগম বাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করেন'।[৭] অন্য একটি গ্রন্থে ঐ একই গ্রন্থকার (ব্রেডলী বার্ট) কিছুটা ভিন্ন সুরে বলেন, "ঢাকার নওয়াব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ খাজা আবদুল হাকিম কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেশের আরো অনেকের মত তিনি ভাগ্যান্বেষণে দিল্লীর শাহী দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন হলো। কিন্তু অচিরেই মোগল শক্তির পতন ঘটলো। বাংলাদেশের ধন সম্পদের খ্যাতি তাঁকে এই দেশে আসতে প্রলুব্ধ করে তুললো। তিনি সিলেটে এসে ব্যবসা শুরু করেন। অচিরেই তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি করেন এবং কাশ্মীর থেকে পিতা ও ভাইদের এখানে নিয়ে এসে জন্মভূমির সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর ভূসম্পত্তি খরিদ করেন"।[৮] এখানে উল্লেখ্য যে, বার্ট তাঁর প্রথমোক্ত গ্রন্থে মৌলভী আব্দুল্লাহকে খাজা পরিবারের প্রতিষ্ঠা পুরুষরূপে বর্ণনা করলেও শেষোক্ত গ্রন্থে আবার খাজা আব্দুল হাকিমকে এই পরিবারের আদি পুরুষ রূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে তিনি উভয়েরই আদি নিবাস যে কাশ্মীর ছিল, সেটা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন।

সি.ই. বাকল্যান্ড এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাশ্মীরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী খাজা আব্দুল হাকিম কয়েক পুরুষ আগে দিল্লীর দরবারে এসে এক সম্মানজনক চাকুরী লাভ করেন। মোগলদের পতন কালে তিনি ভাগ্যান্বেষণে বের হয়ে সিলেট এসে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমান সিলেট কালেক্টরেট অফিসের সামনে তিনি তাঁর বাসভবন নির্মাণ করেন। তখন থেকেই এই পরিবারটি কাশ্মীরের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে এদেশে থেকে যায়। পরবর্তীকালে এই পরিবারের প্রধান সিলেট থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং বেগম বাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। মৌলভী হাফিজুল্লাহ নামক তাঁর জনৈক বংশধর ব্যবসায় প্রচুর উন্নতি সাধন করেন। তিনি ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এলাকায় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং পরিবারটিকে একটি সম্পদশালী জমিদার পরিবাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৯]

এস.এম. তৈফুর বলেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকা, সিলেট ও বাকেরগঞ্জ জেলার সাথে কাশ্মীরী এবং পারসিক বণিকদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। নওয়াব পরিবারের পূর্ব পুরুষ খাজা আব্দুল ওহাব ছিলেন একজন কাশ্মীরী ব্যবসায়ী। তিনি ১৭৫৬ সালের দিকে দিল্লী থেকে সিলেটে এসে বসতি স্থাপন করেন। সিলেটে আব্দুল ওহাব শাল, পশুলোম ও চামড়ার সফল ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে কয়েকজন ইউরোপীয়র সঙ্গে নীলের ব্যবসায় যোগ দেন এবং আরো উন্নতি করেন। সিলেটে কোর্ট বিল্ডিং-এর একাংশে তাঁর বাসভবন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে এই পরিবারের খাজা হাফিজুল্লাহ ও খাজা আহসানুল্লাহ নামক দুই ভাই সিলেট থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং পূর্ব দরওয়াজা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।"[১০]

Dhaka University Institutional Repository

এ.এইচ.দানী বলেছেন, এই প্রদেশের প্রাচীন মুসলিম শাসক বংশের সাথে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কোন সম্পর্ক নেই। এঁদের আদি পুরুষ কাশ্মীরী বংশদ্ভূত খাজা আব্দুল হাকিম ব্যবসাপোলক্ষ্যে সিলেট এসে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত বণিক শ্রেণী থেকে ঢাকার নেতৃত্বদানকারী জমিদার পরিবারে পরিণত হন। খাজা আবদুল হাকিমের এক ভাই মৌলভী আবদুল্লাহ সিলেট থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁর পরিবারই পরবর্তীকালে ঢাকার নওয়াব পরিবার বলে পরিচিত হয়।[১১]

ঢাকার নওয়াব পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় এই পরিবারেই দু'জন লেখকের রচিত দু'টি মুল্যবান গ্রন্থে। এঁদের একজন হলেন, ঢাকার প্রখ্যাত ফার্সী কবি ও সাহিত্যিক খাজা আবদুর রহিম সাবা (মৃত্যু- ১২৮৮ হিঃ/১৮৭১ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন খাজা পরিবারের অন্যতম আদি পুরুষ খাজা আবদুল্লাহর পৌত্র এবং খাজা আলীমুল্লাহর ভাইপো ও জামাতা। তিনি খাজা আলীমুল্লাহর নির্দেশে ফার্সী ভাষায় *"তারিখ-এ-কাশ্মীরীয়ান-এ-ঢাকা"* নামে ঢাকাবাসী কাশ্মীরীদের একটি চমকপ্রদ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[১২] খাজা আলীমুল্লাহর মৌখিক ভাষ্য, বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ ও পাভুলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখ থেকে শ্রুত বিবরণী অবলম্বনে এ গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছিল। খাজা পরিবারের ইতিহাস সংক্রান্ত আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন স্বয়ং নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ। *'তাওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মীরীয়াহ'* শীর্ষক এ গ্রন্থখানি খাজা পরিবারের মাতৃভাষা তথা উর্দুতে রচিত। এই উভয় গ্রন্থই অপ্রকাশিত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পান্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত রয়েছে।[১৩] যদিও প্রফেসর এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ তাঁর রচিত উর্দূ-ফার্সী পান্ডুলিপির ক্যাটালগ সংক্রান্ত গ্রন্থে উক্ত পান্ডুলিপি দুটোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে ছিলেন।[১৪] কিন্তু প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহই প্রথম গ্রন্থ দুটোতে সন্নিবেশিত বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য সুধী সমাজের গোচরীভূত করতে প্রয়াস পান।[১৫] উল্লেখ্য যে, গ্রন্থ দুটোর মধ্যে ঢাকার নওয়াব পরিবারের আদি পুরুষের কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশে তথা ঢাকায় আগমণের বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রম বিকাশ, ধন সম্পদ ও জমিদারী অর্জনের বিবরণ, বংশের বিস্তৃতি ও পারস্পরিক কুটুম্বিতা, এই বংশের গণ্যমান্যদের চারিত্রিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, পরিবারের আচার অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সুতরাং নওয়াব পরিবারের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যথার্থতা ও অযথার্থতা নিরূপণে উল্লিখিত গ্রন্থ দুটোর ভাষ্যকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। কারণ, লেখকদ্বয় ছিলেন এই পরিবারেরই কৃতি সন্তান। তাঁরা নিজের চোখেই এই পরিবারের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পূর্ব পুরুষের কাছেও অনেক ঘটনার বিবরণ শুনেছেন। তবে নিজ বংশের গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াসে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে যে কিছুটা অতিশায়োক্তির আশ্রয় নেননি এ কথা বলা যায় না।[১৬] তথাপি সার্বিক বিবেচনায় গ্রন্থ দুটোকে খাজা পরিবারের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের বর্ণনা সম্বলিত একটি প্রামাণ্য দলিল বলা যেতে পারে।

নওয়াব পরিবারের আদি ইতিহাস বলতে গিয়ে খাজা আবদুর রহিম সাবা লিখেছেন, এই পরিবারের আদি পুরুষ খাজা আবদুল হাকিম কাশ্মীরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ন্যায়ভাবে শাসন কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) আদেশে তাঁর স্থলে অন্য একজন প্রশাসক অপ্রত্যাশিতভাবে কাশ্মীরে এসে হাজির হন।[১৭] আবদুল হাকিম তাঁকে বলপূর্বক কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেন। বাদশাহ খাজা আবদুল হাকিম- কে এই সাহস ও বীরত্বের জন্য পত্রযোগে অভিনন্দিত করলেও কয়েকদিন পর অন্য একজনকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। এই কথা শুনে খাজা আব্দুল হাকিম ভাবলেন, বার বার বাদশাহর প্রেরিত শাসনকর্তাকে অমান্য করার মানে হবে স্বয়ং বাদশাহর সাথে বিরোধ সৃষ্টি করা। এমতাবস্থায় খাজা আবদুল হাকিম জরুরী দ্রব্য সামগ্রী এবং পরিবার পরিজনকে তাঁর এক ভাইয়ের মাধ্যমে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিজে নবনিযুক্ত শাসনকর্তার আগমণের পূর্ব মুহূর্তে একদিন নিঃসঙ্গভাবে দিল্লী রওনা হন। প্রস্থানকালে তিনি তাঁর নিকট আত্মীয় খাজা আবদুল্লাহ ও আবদুল ওহাব নামক দুই ভাইকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতার লোভ নেই বিধায় সরকারের সাথে বিবাদের ভয়ও নেই, এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা খাজা আবদুল হাকিমের সাথে দেশ ত্যাগ করতে সম্মত হননি।[১৮]

কাশ্মীরের নব নিযুক্ত প্রশাসক শহরে প্রবেশ করে খাজা আবদুল হাকিমকে না পেয়ে তাঁর নিকট আত্মীয় উক্ত খাজা আবদুল্লাহ ও আবদুল ওহাবের উপর অত্যাচার শুরু করেন। নতুন শাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি কাশ্মীর ত্যাগ করে দূরদূরান্ত পাড়ি দিয়ে সরাসরি ঢাকায় উপনীত হন। তাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন।[১৯]

আবদুর রহিম সাবা তাঁর গ্রন্থে আরো বলেছেন, তৎকালে হাফেজ করমুল্লাহ নামক কাশ্মীরের জনৈক অধিবাসী বিহারের রাজধানী আজিমাবাদে (পাটনা) একজন সেরা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সাথে খাজা আবদুল্লাহর বড় ভাই খাজা আবদুল ওহাবের পরিচয় ঘটে। হাফেজ করমুল্লাহর পরামর্শে আবদুল ওহাব সামুদ্রিক কুকুরের চর্ম ও স্বর্ণের পাত বিক্রির ব্যবসা করে অল্প সময়ের মধ্যে বড় অংকের মূলধন গড়ে তোলেন। ছোট ভাই মৌলভী খাজা আবদুল্লাহ ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম ও খোদাভীরু লোক। তৎকালীন ঢাকার শ্রদ্ধাভাজন ওলি শাহ্নূরী (রঃ) (মৃত্যু ১৭৮৫ খ্রীঃ) তাঁর একজন মুরীদ ছিলেন।[২০] পীর শাহ্নূরী ভক্তি ভরে তাঁর বিছানায় বসতে সাহস করতেন না। খাজা আবদুল্লাহ ১৭৯৬ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। ঢাকার মগবাজারে শাহ্নূরীর দায়রায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২১] সাবা আরো বলেন, খাজা আবদুল হাকিম কাশ্মীর ত্যাগ করে প্রথমে দিল্লীতে যান। সেখানে পূর্বেই পাঠানো তাঁর আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলিত হয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ, গণহত্যা ও লুণ্ঠন করে সেখানকার জনজীবন বিপন্ন করে তোলেন। এই বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়ে খাজা আবদুল হাকিম দিল্লী ছেড়ে স্বপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় পৌঁছে তিনি বেগম বাজার মহল্লায় একটি বাড়ী কিনে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। তাঁর সাত পুত্র ও সাত মেয়ে ছিল।[২২] সাবার ভাষ্যমতে, খাজা আবদুল হাকিমের ঢাকা আগমণের কিছুদিন পরে পূর্বোক্ত খাজা আবদুল ওহাব ও খাজা আবদুল্লাহর পিতা খাজা আবদুল কাদেরও কাশ্মীর থেকে ঢাকায় এসে তাঁর পুত্রদ্বয়ের সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি আবদুল হাকিমের কন্যা আসুরী খানমকে বিয়ে করেন।[২৩]

খাজা পরিবারের অন্যতম আদি পুরুষ খাজা আবদুল হাকিম- এর কাশ্মীর ছেড়ে দিল্লী ও বাংলাদেশে আগমণের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবদুর রহিম সাবা ও নওয়াব আহসানুল্লাহ একই রকম তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় না সিলেটে এসে বসতি স্থাপন করেন, এনিয়ে তাঁদের পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে অমিল পরিলক্ষিত হয়। সাবা বলেছেন, তিনি সরাসরি ঢাকার বেগমবাজার এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১৭৩৯ খ্রীঃ নাদির শাহ দিল্লী দখল করে গণহত্যা ও লুঠপাট চালায়। লোকজন নিঃস্ব হয়ে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালায়। এই সন্ত্রাসের সময় খাজা আবদুল হাকিমও স্বপরিবারে দিল্লী ছেড়ে অতি কষ্টে সিলেটে গিয়ে উপস্থিত হন। সিলেটের আবহাওয়া তাঁর ভালো লাগে। সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর কবর এখনো তথায় বিদ্যমান।[২৪] অন্যদিকে খাজা আবদুল্লাহ ও আবদুল ওহাব সম্পর্কে আবদুর রহিম সাবার মতো নওয়াব আহসানুল্লাহ বলেছেন যে, তাঁরা আবদুল হাকিমের নিকটাত্মীয় ছিলেন। তাঁরা কাশ্মীরীরের নতুন প্রশাসকের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশ ত্যাগ করেন এবং অনেক পথ পেরিয়ে ঢাকায় এসে বেগম বাজার মহল্লায় বসতি ও ব্যবসা শুরু করেন।[২৫] অতএব, খাজা আবদুর রহিম সাবা এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ উভয়ের বর্ণনা থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ঢাকার খাজা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, খাজা আবদুল ওহাব ও খাজা আবদুল্লাহ নামক দুই ভাই। কাশ্মীর থেকে সর্ব প্রথম তাঁরা দু'জনেই সরাসরি ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, এ দু'জনের মধ্যে বড় ভাই আবদুল ওহাব, বিহারের হাফেজ করমুল্লাহর সহায়তায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। তাঁর ছোট ভাই মৌলভী আবদুল্লাহ একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি পীর-মুরিদ প্রথায়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং এতদাঞ্চলে অনেক অনুসারী আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।[২৬] তাঁরা দু'ভাই কখন ঢাকায় আসেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে উক্ত গ্রন্থ দুটো থেকে বোঝা যায় সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ সিংহাসন আরোহণের (১৭১৯ খ্রীঃ) পরে যখন কাশ্মীরে নতুন প্রশাসক প্রেরণ করেন তখন তাঁরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। এছাড়া তাঁরা যে ১৭৩৯ খ্রীঃ নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠনের বেশ আগেই ঢাকায় এসেছিলেন, তাও উক্ত গ্রন্থ থেকে বুঝা যায়। অতএব ধরে নেয়া যায়, উল্লিখিত দুটো সালের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৭৩০ সালের দিকে খাজা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা উপরোক্ত দুইভাই ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[২৭]

তবে সাবার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে নওয়াব আহসানুল্লাহ, খাজা আবদুল হাকিমের দিল্লী থেকে সরাসরি সিলেট গমন ও সেখানে বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যে তথ্যটি দিয়েছেন, সেটা সত্য বলে মনে হয়। কারণ নওয়াব আহসানুল্লাহসহ আধুনিক ও পশ্চিমা লেখকদের সবাই উল্লিখিত তথ্যটি বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে তাঁরা সিলেটে কালেক্টরেট ভবন এলাকায় আবদুল হাকিমের কবরও যে রয়েছে, একথাও বলেছেন। এছাড়া নওয়াব আবদুল গণির জীবদ্দশায়[২৮] তাঁরপুত্র ও পরিবারের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখায় খাজা পরিবারের ইতিহাস সাবা'র লেখার তুলনায় আরো সঠিক হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু খাজা আবদুল হাকিমের বংশের লোকেরাই পরবর্তীকালে সিলেট থেকে ঢাকায় এসে এখানে খাজা পরিবারের গোড়া পত্তন করেন বলে পশ্চিমা ও আধুনিক লেখকরা যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেকথা সাবা ও নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখায় পাওয়া যায় না। তবে তাঁদের লেখায় একথা জানা যায় যে, খাজা আবদুল ওহাব এবং আবদুল্লাহর পিতা আবদুল কাদের কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। আবদুল কাদের ঢাকায় আসার পর সিলেটের খাজা আবদুল হাকিমের এককন্যা আসুরী খানমকে বিয়ে করেন। এছাড়া আবদুল কাদেরের পুত্র খাজা আবদুল্লাহও সিলেটের জনৈক খাজা আবদুস সালামের কন্যাকে বিয়ে করেন। ইতোপূর্বে কাশ্মীর থেকে আগত খাজা আবদুস সালাম সিলেটে একজন ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। আবদুস সালামের কন্যার গর্ভে মৌলভী খাজা আবদুল্লাহর ছয় সন্তানের জন্ম হয়। উক্ত ছয় সন্তানের প্রথম দুইজন, খাজা আহসানুল্লাহ ও খাজা হাফিজুল্লাহ সিলেটে তাঁদের মাতামহের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিপালিত হন।[২৯] বয়োপ্রাপ্ত হলে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় মাতামহের গৃহ সিলেট থেকে পিত্রালয় ঢাকায় আগমণ করেন। এ ঘটনা থেকেই হয়তো কোন কোন লেখক অনুমান করেছেন খাজা পরিবারের আদি পুরুষ প্রথমে সিলেটে বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরীগণ ঢাকায় চলে আসেন।[৩০] এছাড়া উক্ত আহসানুল্লাহ ও হাফিজুল্লাহর বংশধরগণই পরবর্তীকালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ও আধিপত্য অর্জন করেন এবং শেষ পর্যন্ত নওয়াব উপাধি লাভ করেন। তাই তাঁদের শৈশবের ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আধুনিক লেখকগণ হয়ত ঐরূপ অনুমান করেছিলেন।[৩১]

সিলেটে খাজা আবদুল হাকিমের বংশধরদের বিষয়ে পরবর্তীকালে তেমন কিছু জানা যায় না। হয়তো তাঁদের কেউ ঢাকায় তাঁদের আত্মীয়দের ব্যবসায়িক উন্নতির কথা ভেবে সিলেট থেকে ঢাকায় চলেও আসতে পারেন। তবে সেসব ঘটনা খাজা পরিবারের ইতিহাসে গৌণ বিষয় বলেই হয়তো সাবা ও আহসানুল্লাহর পূর্বোক্ত গ্রন্থে স্থান পায়নি।

কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আগত খাজা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বড় ভাই খাজা আবদুল ওহাব ছিলেন এই পরিবারের প্রথম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র খলিলুল্লাহকে রেখে মারা যান। কিন্তু খলিলুল্লাহ ভোগ বিলাসে ধন সম্পদ উড়িয়ে দিতে থাকেন। এসময় আবদুল ওহাবের ব্যবসায়ী অংশীদার হাফেজ করমুল্লাহ বিহার থেকে এসে খলিলুল্লাহকে ব্যবসায়ী কারবারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি এই কারবারের দায়িত্ব খাজা আবদুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর হস্তে ন্যস্ত করেন। বৈষয়িক কার্যে দক্ষ খাজা হাফিজুল্লাহ ব্যবসায়ী কারবারে প্রভূত উন্নতি করেন। তিনি খলিলুল্লাহ ও তাঁর বংশধরদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।[৩২] এই সময় থেকেই ঢাকার খাজা পরিবারে আনুষ্ঠানিক মোতাওয়াল্লী প্রথা চালু হয়। এই প্রথায় বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হতো। পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই মোতাওয়াল্লীর উপর ন্যস্ত থাকতো। তিনি উক্ত সম্পত্তির আয় থেকে সকল অংশীদারকে যথাযথ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতেন।

খাজা হাফিজুল্লাহর তত্ত্বাবধানে তাঁর বড় ভাই খাজা আহসানুল্লাহর পুত্র খাজা আলীমুল্লাহ (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ১ দ্রঃ) ব্যবসায়ী কারবার করে খ্যাতি অর্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অন্যদিকে খাজা হাফিজুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল গফুর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী হন। কিন্তু আবদুল গফুর অকালে মারা যান। তাই পরিবারের সবাই মিলে তাঁদের সব ধন-সম্পত্তি খাজা আলীমুল্লাহর দায়িত্বে ন্যস্ত করেন।[৩৩] এভাবে খাজা আলীমুল্লাহ এই পরিবারের সমুদয় এজমালি সম্পত্তির মোতওয়াল্লী হন। তিনি নিজের যোগ্যতা বলে এই পরিবারটিকে সমকালীন পূর্ববংগের শ্রেষ্ঠ জমিদার পরিবারে উন্নীত করেন। তাঁর পুত্র আবদুল গণির সময়ে খাজা পরিবার গৌরব ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। ঢাকার খাজা পরিবারের ইতিহাস মূলত উপরোক্ত তিনজন মোতাওয়াল্লী তথা খাজা আবদুল ওহাব, খাজা হাফিজুল্লাহ ও খাজা আলীমুল্লাহর বংশধরদের কার্যকলাপের ইতিহাস। তাঁদের বংশধরেরাই নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পরবর্তীকালে একটি বিরাট জনসংখ্যা সম্বলিত নওয়াব পরিবারে পরিণত হয়।

১(২) নওয়াব পরিবারের খাজা উপাধি ঃ

ঢাকার নওয়াব পরিবারের ব্যবহৃত খাজা উপাধি প্রাপ্তির বিষয়ে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম যে তথ্য দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি তিনি তাঁর পরিবেশিত তথ্যের পিছনে কোন প্রামাণ্য সুত্র/দলিলের উল্লেখ করেননি।[৩৪] প্রফেসর ইসলাম বলেছেন, "নওয়াব পরিবারের পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহ কয়েকজন আর্মেনীয়দের সাথে লবণের ঠিকাদারী কারবার শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাফিজুল্লাহ কোজা উপাধিধারী কয়েকজন আর্মেনীয়দের সাথে একটি যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এদের নাম ছিল কোজা জোহানেস, কোজা ডাকোস্তা ও কোজা মাইকেল। কোজাদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে স্থানীয় লোকেরা এমনকি হাফিজুল্লাহ নিজেও তাঁর নামের আগে 'কোজা' ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই কোজাই পরে খাজায় রূপান্তরিত হয়।"[৩৫] এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত তথ্যমতে খাজা হাফিজুল্লাহ ছিলেন খাজা পরিবারের তৃতীয় প্রধান ব্যক্তি। এই হাফিজুল্লাহই যে প্রথম খাজা উপাধি ব্যবহার করেছেন এমন নয়। বরং তাঁর পিতা খাজা আবদুল্লাহ ও পিতামহ খাজা আবদুল কাদেরের নামের আগেও খাজা উপাধিটা ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়।[৩৬]

উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশেও খাজা উপাধিধারী বহুসংখ্যক পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। মধ্যযুগে সাধারণতঃ উচ্চপদস্থ বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে দেশের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে আনুগত্য, সাধুতা, বীরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মান সূচক'খাজা' উপাধি দেয়া হতো। এছাড়া উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর মুর্শিদগণ 'খাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতেন।[৩৭]

এস.এম. তৈফুর লিখেছেন, মুসলিম সম্রাট ও নওয়াবরা অনেক সময় এদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা ভূস্বামীরূপে বসবাসকারী খ্যাতনামা আর্মেনীয়দেরকে 'খাজা' উপাধি প্রদান করতেন। কিন্তু বিদেশী আর্মেনীয়রা অশুদ্ধরূপে সেটাকে 'কোজা' বলে উচ্চারণ করতো।[৩৮] ঢাকা শহরে এরূপ কোজা (খাজা) উপাধিধারী বেশ ক'জন আর্মেনীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোজা মিকাইল ও কোজা আরাটুনের[৩৯] জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ ও ভোলা অঞ্চলে বিস্তৃত জমিদারী ছিল। কোজা বাগদাসোর-এর নামানুসারে আর্মানীটোলার বাগদাসোর লেনের নামকরণ হয়েছিল।[৪০] এছাড়া 'কোজা পেরোস' নামক জনৈক আর্মেনীয়কে স্থানীয় জনগণ নিজেদের স্টাইলে ডাকতে গিয়ে তাঁকে 'খাজা ফিরোজ' নামে পরিচিত করে ফেলেছিলেন।[৪১] খাজা মানুকের বাড়ী যেটাতে বেশ কিছুদিন এম.পি. পোগজ সাহেব বাস করেছিলেন, সেটা কিনে নিয়ে ঢাকার নওয়াব তাঁর দেওয়ান্ন বাড়ী বানিয়েছিলেন।[৪২] আর্মেনীয় খাজা ইসরাইল সরহাদ সুবাদার আজিমুশ্শানের নিকট থেকে

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ক্রয়ে ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের আগে নওয়াব সিরাজদ্দৌলা প্রখ্যাত আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজেদ-কে ইংরেজদের সাথে আপোষ-মীমাংসার দৌত্য কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ঢাকায় বসবাসকারী আর্মেনীয়দের নামের সাথে যে 'কোজা' শব্দটি পাওয়া যায়, সেটা তাঁদের পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত মূল নামের অংশ নয় বরং মুসলিম শাসকদের প্রদত্ত 'খাজা' উপাধির অশুদ্ধ রূপমাত্র। প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের বর্ণিত কোজা নামধারী উপরোক্ত তিনজন আর্মেনীয়দের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এছাড়া উক্ত আলোচনা থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, বিদেশী আর্মেনীয়রা 'খাজা' উপাধিটিকে অশুদ্ধরূপে 'কোজা' বলে উচ্চারণ করলেও স্থানীয় লোকেরা শুদ্ধরূপে 'খাজা' বলেই উচ্চারণ করতো। এমনকি নিজেদের ষ্টাইলে শুদ্ধ করতে গিয়ে 'পেরোস'-কে তারা 'ফিরোজ'-এ পরিণত করে ফেলেছিল। অতএব এদেশে পূর্ব থেকে প্রচলিত যে 'খাজা' উপাধিটি প্রতিষ্ঠা লাভের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদেশী আর্মেনীয়গণ পর্যন্ত পেয়েছিল। সেই একই উপাধি একই কারণে নওয়াব পরিবারের পূর্ব পুরুষদেরও পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক দেশীয় গণ্যমান্যদের 'খাজা' উপাধি প্রদানের এরূপ ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠা লাভের পর নওয়াব পরিবারের আদি পুরুষকে আর্মেনীয়দের প্রাপ্ত উপাধিকে সম্বল করে 'খাজা' বনে যেতে হবে একথা যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া তাঁরা যদি অসদুপায়ে উচ্চ সম্মানবাহী উপাধি নেয়ার কথা ভাবতেন, তবে 'খাজা' উপাধির মত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের উপাধি না নিয়ে স্বভাবতই মুসলিম সমাজে প্রচলিত মীর্জা, মীর কিংবা সৈয়দ উপাধিই নিতেন। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে আলোচ্যযুগে এদেশের অনেক বনেদী জমিদার পরিবার তাঁদের জমিদারী হারায় এবং নব্য পুঁজিপতি, মহাজন, ব্যবসায়ী আমলারা নগদ অর্থবলে ঐসব জমিদারী কিনে নেয়। নব্য জমিদারগণ সমাজে সম্মান অর্জনের জন্য পূর্ব পুরুষের নিম্ন মানের উপাধি যেমন- দাস, বিশ্বাস, চন্দ্র, মন্ডল, দাই, সাহা, শুড়ী, লস্কর, মোল্লা, মুন্সী, জর্দার, ইত্যাদি পরিত্যাগ করে তদস্থলে ঘোষ, বোস, দত্ত, মিত্র কিংবা মীর্জা, খান, মীর, সৈয়দ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। এমনকি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম তাঁর উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন যে, নওয়াবদের পূর্বপুরুষ খাজা হাফিজুল্লাহ তাঁর বন্ধু কোজা মাইকেলের সাথে কথোপকথন কালে মোহাম্মদ শফি নামে যে পেয়াদাটি এসে কয়েকটি পরগণা নিলামের খবর দিয়েছিল, সেই পেয়াদা মোহাম্মদ শফিই পরে রমনা-বমনা নামক পরগণা কিনে জমিদার বনে যান এবং তাঁর বংশধরেরা সৈয়দ উপাধি গ্রহণ করেন।[৪৪]

'খাজা' এই ফার্সী শব্দটির অর্থ হলো মনিব বা নেতা। এর আরেক অর্থ ধনী ব্যবসায়ী।[৪৫] কাশ্মীর থাকাকালে খাজা পরিবার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে এদেশে এসে তাঁদের ব্যবসা করে সাফল্য অর্জনের কথা সবাই জানেন। ধারণা করা যেতে পারে, তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের পেশা কাজে লাগিয়েই এদেশে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ঐসব সফলতার জন্যই হয়তো একদিন তাঁদের কোন পূর্বপুরুষ 'খাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন।

তবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার কারণে ঢাকার নওয়াবদের কোন আদিপুরুষ 'খাজা' উপাধি পেয়েছিলেন এবং সেটা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে- একথাই বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।[৪৬] কারণ তাঁদের পরিবারে কয়েকজন বিশিষ্ট পীর-ওলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া পরবর্তীকালে বৈষয়িক কারবার করে সাফল্য লাভ করার পরও দেখা যায় তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি। কাশ্মীর থাকাকালে খাজা আবদুল হাকিম শাসনকার্যে জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিকটাত্মীয় খাজা আবদুল্লাহ ও আবদুল ওহাবের পেশা সেখানে কি ছিল, তা জানা যায়না। তায়েশ বলেছেন, ঢাকার নওয়াব পরিবারের আদিপুরুষ খাজা হাফিজুল্লাহর পূর্বপুরুষ কাশ্মীরে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কাশ্মীরের শাসনকর্তাদের নিকট তাঁদের উচ্চ মান-মর্যাদা ছিল।[৪৭] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাজা আবদুল্লাহ একজন বিজ্ঞ আলেম ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। ঢাকায় আগমণের পর মৌলভী আবদুল্লাহ একজন সফলকাম পীরের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এতদাঞ্চলে আলেম উলামাসহ

Dhaka University Institutional Repository

এক বিরাট সংখ্যক জনগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদানীন্তন ঢাকার মগবাজার দায়রার প্রখ্যাত আলেম ও পীর হজরত শাহ্নূরী (মৃত্যু- ১৭৮৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত তাঁর মুরীদ হতে পেরে গর্ব অনুভব করতেন। মৌলভী আবদুল্লাহর একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শাহ্নূরী ভক্তি করে কখনো তাঁর বিছানায় বসতে সাহস করতেন না। ১৭৯৬ খ্রীঃ এই পীর খাজা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করলে ঢাকার মগবাজার দায়রায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৪৮] সেখানে তাঁর মাজারটি আজো বিদ্যমান।

মৌলভী আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা আহসানুল্লাহও একজন উঁচু দরের আলেম, পীর ও সূফী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাভাজন ওলী পীর শাহ্নূরীর মুরিদ ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে খেলাফত অর্থাৎ মুরিদ করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৯৫ খ্রীঃ তিনি মক্কাশরীফে হজ্জে যাওয়ার পথে জেদ্দায় ইন্তেকাল করেন। ওয়াইস কারণীর মাজারের নিকট তাঁর কবর রয়েছে।[৪৯] মৌলভী আবদুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহও একজন বিশিষ্ট পীর ছিলেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে, তিনি ধর্মীয় শাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন এবং ঢাকা শহরে পীর-মুরিদী কাজ করেছেন। এ শহরের অধিকাংশ লোক তাঁর মুরিদ হন।[৫০] নওয়াব আহসানুল্লাহ লিখেছেন, মৌলভী আবদুল্লাহর সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই পরিবারের প্রতি আল্লাহ যেসব অনুগ্রহ করেছেন, আর এখনো করছেন, তা একমাত্র তাঁর এবং তাঁর পুত্রদের নেক নিয়ত ও সৎকর্মের ফলেই হয়েছে আর হচ্ছে।[৫১] পীর খাজা আহসানুল্লাহর পুত্র খাজা আলীমুল্লাহ পুরোপুরি একজন বৈষয়িক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি পারিবারিক বৈশিষ্ট্য তথা আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি পীরে কামেল হযরত শাহ্ ফোরাকীর নিকট মুরিদ হন। খাজা আলীমুল্লাহর পুত্র নওয়াব আবদুল গণিও এই পারিবারিক ঐতিহ্য তথা আধ্যাত্মিক সাধনার অনুশীলন করতেন বলে জানা যায়। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে এবং সন্ধ্যা রাত্রে যথারীতি ওয়াজিফা পাঠের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে পীর-মুরিদী প্রথা চর্চা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছিল এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য।[৫২]

জানা কথা, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র পীর-মুর্শিদেরাই সংশ্লিষ্টদের উপর নেতৃত্ব ও প্রভূত্ব করে থাকেন। সম্ভবত এই অর্থেই ঢাকার নওয়াব পরিবারটি তাঁদের আদি নিবাস কাশ্মীরে 'খাজা' তথা আধ্যাত্মিক নেতা বা আধ্যাত্মিক মনিবরূপে আখ্যায়িত ছিলেন।[৫৩] ঢাকা প্রকাশে বলা হয়েছে যে, সম্মানের দিক থেকে ঢাকার বর্তমান নওয়াবগণ এ শহরের পূর্ববর্তী মোগল নওয়াবদের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। কারণ এঁরা কাশ্মীর নিবাসী একটি বড় সম্মানিত বংশের বংশধর।[৫৪]

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, প্রাচীন ও আধুনিক লেখকেরা যেমন- লোকনাথ ঘোষ, ক্লাউড ক্যাম্পবেল, সি.ই. বাকল্যান্ড, ব্রেডলীবার্ট, তায়েশ, যতীন্দ্রমোহন, আওলাদ হাসান, হাকিম হাবিবুর রহমান, তৈফুর, দানী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের কেউই এঁদের খাজা উপাধির বিষয়ে কোন বিতর্ক তোলেননি। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় ১৯১০ খ্রীঃ শ্রীনগরের 'নসরতুল ইসলাম' সমিতির ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় আগত জনৈক মুন্সী গোলাম মোহাম্মদ খাদেম 'কাশ্মীরী ম্যাগাজিন' (লাহোর) পত্রিকায় ঢাকার নওয়াব পরিবারের সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। তখন তিনি এঁদের খাজা উপাধি ব্যবহারের বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন তোলেননি।[৫৫] নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধির পত্রালাপ থেকে বুঝা যায় কাশ্মীরে তখনো তাঁদের পূর্বপুরুষদের বংশধর ছিল এবং উক্ত প্রতিনিধি যাঁদের জানতেন।[৫৬] তাই ঢাকায় এঁদের খাজা উপাধির বিষয়ে তাঁর কোন সংশয় থাকলে তিনি এই উপাধির বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেন। অন্তত উপাধিটা এড়িয়ে যেতে পারতেন।

এছাড়া ঢাকার উক্ত নওয়াব পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকায় নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ-জানকে অনেকে এই পরিবারের সন্তান মনে করে থাকেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত পৃথক আরেকটি খাজা পরিবারের সন্তান। ঢাকায় উক্ত খাজা বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা খায়রুল্লাহ। তিনি কাশ্মীরের একজন ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। পিতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বাগদাদের শাহ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানীর এবং মাতার দিকে দিয়ে শাহ সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ আহরার তুসীর বংশধর।[৫৭] অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীরে দুটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে খাজা খায়রুল্লাহ তাঁর পুত্র খাজা আফজাল ও এক মেয়েকে নিয়ে কাশ্মীর ছেড়ে এসে কিছুদিন দিল্লীতে আশ্রয় নেন। পরিশেষে তিনি পুত্র খাজা আফজালকে নিয়ে পাটনায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং বিপুল সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। এই খাজা আফজালের একমাত্র পুত্র খাজা মোহাম্মদ মাহদী ১৮৪৯ খ্রীঃ নওয়াব আবদুল গণির এক সৎ বোনকে বিয়ে করেন এবং ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এই খাজা মাহদীর ছেলেই হলেন নওয়াব ইউসুফ জান। তিনি আবার নওয়াব আবদুল গণির কন্যা নুরজাহান খানমকে বিয়ে করেন।[৫৮] কাশ্মীর থেকে পৃথকভাবে আগত উক্ত খাজা পরিবারের লোকেরা ঢাকার নওয়াবদের উপাধি নিয়ে কোনরূপ প্রশ্ন তোলেননি। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় কাশ্মীর থাকাকালেই এঁদের খাজা উপাধি ছিল।[৫৯]

১ (৩) আর্থিক উন্নয়ন, জমিদারি ক্রয় ও পরিচালনা ঃ

বহুকাল পূর্ব থেকে খাজা পরিবারে একটি প্রথা ছিল এই যে, এই পরিবারের একজন যোগ্য ব্যক্তি পরিবার প্রধান হিসাবে সমুদয় এজমালি সম্পত্তি পরিচালনার কাজ করতেন এবং পরিবারের অন্যান্য সব সদস্যকে অংশমত ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।[৬০] কাশ্মীর থাকাকালে কে খাজা পরিবার প্রধান ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে খাজা আবদুল হাকিম যে উক্ত পরিবার প্রধান ছিলেন তা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কারণ প্রথমতঃ কাশ্মীর থাকাকালে তাঁকেই সেখানকার শাসনকর্তা বলা হয়েছে। তাঁর ভাগ্যের সাথেই সেখানে এই পরিবারের উত্থান-পতন হতে দেখা গেছে। কাশ্মীর থেকে আবদুল ওহাব এবং আবদুল্লাহ নামে যে দুই ভাই ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন তাঁরা উভয়েই ধার্মিক ও পীর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তবে বড় ভাই খাজা আবদুল ওহাব বৈষয়িক কর্মেও সুনিপুণ ছিলেন। উল্লেখিত কারণে ঢাকায় বসতি স্থাপনের পর খাজা আবদুল ওহাবই হলেন খাজা পরিবারের প্রথম প্রধান ব্যক্তি।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বিহারের হাফেজ করমুল্লাহ নামক এক ঝানু ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। কাশ্মীর থেকে আগত এই হাফেজ করমুল্লাহ একজন প্রভাবশালী ও সেরা ব্যবসায়ী ছিলেন। বাংলা থেকে তিব্বতের লাসা পর্যন্ত তাঁর ব্যবসা বিস্তৃত ছিল। তাঁর পরামর্শে খাজা আবদুল ওহাব সামদ্রিক কুকুরের (সিল/ভোঁদড়) চর্ম ক্রয় বিক্রয় শুরু করেন। এছাড়া তিনি লাসায় স্বর্ণের পাত বিক্রির ব্যবসাও জুড়ে দেন। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি স্ফীত অংকের মূলধন গড়ে তুলতে সক্ষম হন।[৬১] সাবা বলেন, খাজা আবদুল ওহাব একজন বিচক্ষণ, সৎ ও বৈষয়িক লোক ছিলেন। জীবিকা অর্জন ও ব্যবসা বাণিজ্যের কলা কৌশল তাঁর ভালভাবে জানা ছিল। তিনি দক্ষতার সংগে আড়তদারী ও কারবার চালিয়ে যান এবং লোক সমাজে উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করেন।[৬২]

খাজা আব্দুল ওহাব তাঁর একমাত্র পুত্র খাজা খলিলুল্লাহকে রেখে মারা যান। কিন্তু খাজা খলিলুল্লাহ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসা বাণিজ্য ও ধনসম্পদ ধরে রাখতে পারেননি। ভোগ বিলাসে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধন দৌলত উড়িয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বিহারের হাফেজ করমুল্লাহর সাথে খলিলুল্লাহর পিতা আব্দুল ওহাব অংশীদারীত্বে আড়ৎদারী ও ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে, তিনি খাজা খলিলুল্লাহর এই উশৃংখলতা ও পথ ভ্রষ্টতার কথা শুনে আড়ৎদারীর কারবার তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মৌলভী আব্দুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর হাতে ন্যাস্ত করেন। নগদ অর্থাদি শেষ হওয়ার পর খাজা খলিলুল্লাহ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে চাচাত ভাই হাফিজুল্লাহর দারস্থ হতে বাধ্য হন। খাজা হাফিজুল্লাহ তাঁর জন্য একটি ভাতার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ভাতা খাজা খলিলুল্লাহর বংশধরগণ পরবর্তীকালে খাজা আলীমুল্লাহ এবং নওয়াব আবদুল গণির আমলেও ভোগ করতেন।[৬৩] নিম্নে খাজা পরিবারের জমিদারি অর্জন ও পরিচালনাকারী মোতওয়াল্লীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১(৩)(ক) খাজা হাফিজুল্লাহ ও তাঁর জমিদারি ক্রয় ঃ

ঢাকার খাজা পরিবারের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন খাজা হাফিজুল্লাহ। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও বৈষয়িক বিষয়ে বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। এজন্য তাঁর উপর খাজা পরিবারের মোতওয়াল্লীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ধর্মীয় শাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন এবং ঢাকা শহরে পীর-মুরিদী কাজ করেছেন।[৬৪] তবে ধর্মকর্মের পাশাপাশি বৈষয়িক কাজে পারদর্শী খাজা হাফিজুল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্য ও মহাজনি কারবার করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্য দেখেই হাফেজ করমুল্লাহ পূর্বোক্ত আবদুল ওহাবের অপদার্থ পুত্র খাজা খলিলুল্লাহর নিকট থেকে ব্যবসার দায়িত্ব ছিনিয়ে এনে তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এসব ব্যবসা করে খাজা হাফিজুল্লাহ বিপুল অর্থের অধিকারী হন। তাঁর বড় ভাই সংসার বিমুখ খাজা আহসানুল্লাহ তাঁর তিন পুত্রকে খাজা হাফিজুল্লাহর তত্ত্বাবধানে রেখে হজ্বে গমন করার পথে মারা যান। ফলে এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রদের সম্পত্তি দেখাশুনার ভারও তাঁর উপর বর্তায়। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকেই কনিষ্ঠ ভাইপো খাজা আলীমুল্লাহ ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেন এবং তিনি পরবর্তীতে খাজা পরিবারের কর্তৃত্ব করার মত যোগ্যতা অর্জন করেন। ঢাকার খাজা পরিবারে খাজা হাফিজুল্লাহই প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবসার পাশাপাশি ভূসম্পত্তি ও জমিদারি ক্রয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। খাজা হাফিজুল্লাহর এই আর্থিক স্বচ্ছলতার কালেই ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগ শুরু হয়।এই নীতির ফল স্বরূপ খাজনা বাকীর দায়ে বহু বনেদী জমিদারের জমিদারি নিলামে উঠে। নগদ পয়সাধারী মহাজন, বেনিয়া ও পুঁজিবাদী আমলাগণ ঐসব জমিদারি নিলামে খরিদ করে নতুন নতুন ভূস্বামী বনে যেতে থাকেন।যুগের আবহাওয়া বুঝতে পেরে খাজা হাফিজুল্লাহ ঐসময় যে সব জমিদারি পরগনাগুলো ক্রয় করেন, সেগুলো হলোঃ-বরিশালের আয়লা টিয়রখালী ও ফুলঝুরি, ময়মনসিংহের ইটনা, ত্রিপুরা-কুমিল্লার বলদাখাল ও এলাহি খাল।[৬৫] খাজা হাফিজুল্লাহ ১৮১২ খ্রীঃ ২১,০০০ টাকায় বাকরগঞ্জ জেলার বুজর্গ-উমেদপুর পরগনাস্থিত আয়লা টিয়রখালি ও ফুলঝুরির বিস্তৃত অঞ্চল খরিদ করেন।[৬৬] এই মূল্যবান জমিদারি হতে তাঁদের বার্ষিক একলক্ষ টাকা মুনাফা হতো।[৬৭] উক্ত পরগনা দু'টো পূর্বে রাজা রাজবল্লভের পরিবারের নিয়ন্ত্রাধীনে ছিল বলে জানা যায়। এছাড়াও তিনি বরিশাল জেলার আওরঙ্গপুর পরগনা, কচুয়ার চন্দ্রদ্বীপ জমিদারি, সলিমাবাদ ও সুলতানপুর পরগনাও ক্রয় করেন।[৬৮] খাজা হাফিজুল্লাহ কর্তৃক প্রথম জমিদারি তথা বাকরগঞ্জের আয়লা-টিয়রখালী জমিদারি ক্রয়ের ঘটনাটি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম কাহিনীকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৮১২ খ্রীঃ খাজা হাফিজুল্লাহ বরিশালের ভোলা অঞ্চলে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁর ব্যবসায়ী অংশীদার কোজা মাইকেলের সাথে দেখা করতে যান। কোজা মাইকেল তাঁকে ব্যবসার বদলে জমিদারি কিনতে পরামর্শ দেন। অচিরেই বরিশাল কালেকটরেটে আয়লা টিয়রখালী ও ফুলঝুরি নামক পরগনাদ্বয় নিলামে উঠে। কিন্তু অনুর্বর জমির কারণে ঐ মহলগুলো কিনতে তেমন আগ্রহী ক্রেতা জোটেনি। হাফিজুল্লাহ তাঁর ভাইপো আলীমুল্লাহকে নিয়ে উক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি মাত্র একুশ হাজার টাকায় পরগনা দুটো নিলামে কিনেন। পরগনা দু'টোর সরকারী রাজস্বের পরিমান ছিল মাত্র ৩৭২ টাকা। অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে অচিরেই এলাকাটি শস্য শ্যামল হয়ে উঠে। ১৮২০ সালে ঐ অঞ্চলের আয় দাড়ায় প্রায় একলক্ষ টাকায়।[৬৯]

আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত পুরানো দলিলপত্র থেকে জানা যায়, খাজা হাফিজুল্লাহ তাঁর নিজের নামে ত্রিপুরার বলদাখাল[৭০] পরগনার ৮ গন্ডা ২ কড়া ১ ক্রান্তি ৩ ধুল পরিমাণ অংশ জামিদারী ক্রয় করেন। এ পরগনার জন্য ত্রিপুরা কালেকটরেটে তাঁকে ৪,৩১৭ টাকা ৭ আনা ৬ গন্ডা ১ কড়ি ১ ক্রান্তি পরিমাণ রাজস্ব পরিশোধ করতে হতো।

এছাড়া তিনি তাঁর ভাই মৌলভী খাজা আবদুল আজীমের নামে ঐ বলদাখাল পরগনার আরো ১০ গন্ডা জমিদারী কিনেন। এর জন্য সরকারী রাজস্ব জমার পরিমাণ ছিল ৪,৯৯৯ টাকা ১৪ আনা ৯ গন্ডা ১ কড়ি ১ ক্রান্তি। অনুরূপভাবে তাঁর নিজের নামে কেনা বাকরগঞ্জ জেলাধীন আয়লা টিয়রখালী ও ফুলঝুরি পরগনার ১৩ আনা অংশের জন্য সদর জমার পরিমাণ ছিল ৩০২ টাকা ৭ আনা ৩ কড়ি।[৭২] বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ হাফিজুল্লাহ এই সব জমিদারী সুষ্ঠু পরিচালনা

Dhaka University Institutional Repository

করে প্রচুর অর্থ ও সম্পদের মালিক হন। তায়েশ বলেছেন, ব্যবসার পাশাপাশি ঐসব জমিদারী ক্রয় করে খাজা হাফিজুল্লাহ আমীরানাশানে জীবন যাপন করতে থাকেন।[৭৩] খাজা হাফিজুল্লাহ বেগম বাজারে তাঁর পৈত্রিক নিবাসেই বসবাস করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর এক ভগ্নীর অকাল মৃত্যু হলে তাঁর মনে কিছুটা অনুৎসাহ ও নিস্পৃহতার সৃষ্টি হয়। পুরানো এই বাড়ী ও মহল্লার উপর থেকে তাঁর মন উঠে যায়। তিনি বুড়িগংগার তীরে সোয়ারী ঘাটে মীর্জা জাফর, মীর সিরাজ, বাবু মাখনমত ও ভোলানাথ প্রমুখের নিকট থেকে পরস্পর সংলগ্ন চারখন্ড জমি ক্রয় করেন। খাজা হাফিজুল্লাহ প্রচুর টাকা খরচ করে তথায় নতুন বাসভবন নির্মাণ করেন।[৭৪]

প্যানোরামা অব ঢাকার ৩৯ নম্বর চিত্রে জনৈক অনামা শিল্পী মৌলভী হাফিজুল্লাহর যে বাড়িটির ছবি এঁকেছেন সেটাই হলো খাজা হাফিজুল্লাহর বাড়ী। মুনতাসীর মামুন ভুলক্রমে সেটাকে জনৈক মৌলভী হোসেন উল্লাহর বাড়ী বলেছেন।[৭৪(ক)] উক্ত নতুন বাড়ীর কাছে খাজা হাফিজুল্লাহ একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পরিবারের সব সদস্য ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেগম বাজারের পুরানো বাড়ী পরিত্যাগ করে তিনি নতুন বাড়ীতে চলে যান।[৭৫] এই সময় তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর স্ত্রীর অসম্মতির কারণ দেখিয়ে বেগম বাজারেই থেকে যান। কিন্তু তিনিও পরবর্তীকালে পৃথকভাবে কুমারটুলীতে চলে যান।

খাজা হাফিজুল্লাহ কবিতা আবৃত্তি ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। তখন কবিতা প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল এই যে, দুই প্রতিযোগির কেউ একজন একটি চরণ বা শ্লোক উত্থাপন করে ছেড়ে দিতেন। অন্য জনকে উক্ত চরণটির শেষাংশ শব্দ দিয়ে অথবা পরবর্তী চরণ দিয়ে মিলাতে হতো।[৭৬] তাঁর রচিত কবিতা আঃ রহিম সাবার গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। খাজা হাফিজুল্লাহর আম বাগিচা তৈরী ও আম চাষের খুব শখ ছিল। তিনি ষোলঘরে দু'টি জোড়া বাগিচা ক্রয় করেন এবং তথায় বহু টাকা খরচ করে উৎকৃষ্ট জাতের আমের গাছ লাগান। কথিত আছে তিনি হাজার টাকা মূল্যে একটি উৎকৃষ্ট আম গাছ ক্রয় করে সেটার নাম রাখেন 'হাজারী'। এই বাগান থেকে তিনি বেপারীদের নিকট আম বিক্রিও করতেন। তবে তাঁর জীবদ্দশাই এই বাগানটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[৭৭] খাজা হাফিজুল্লাহর প্রায় ৮০ বছর বয়সে ১৮১৫ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন।[৭৮]

১(৩)(খ) খাজা আবদুল গফুর ও তাঁর জামিদারী ঃ

খাজা হাফিজুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র খাজা আবদুল গফুর খাজা পরিবার ও এষ্টেটের কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি ছিলেন খাজা পরিবারের তৃতীয় প্রধান ব্যক্তি। খাজা আবদুল গফুরও তাঁর পিতার ন্যায় বৈষয়িক কাজকর্মে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করেন।এছাড়া খাজা আবদুল গফুর তাঁর নিজের নামে ময়মনসিংহের আটিয়া পরগনার ২ আনা ৫ গন্ডা জমিদারীর শেয়ার ক্রয় করেন। এর জন্য বার্ষিক রাজস্ব হিসেবে ৬০৫৬ টাকা ৩ আনা ৬ পাই ময়মনসিংহের কালেক্টরেট অফিসে জমা দিতে হতো।[৭৯] তাঁর সময় এই পরিবারের সম্পত্তি আরো বেড়ে যায়। তিনি গরীব ও মোসাফিরদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি গ্রন্থ পাঠে অনেক সময় ব্যয় করতেন। তিনি মওলানা রুমীর মসনবী শরীফকে মনে প্রাণে পছন্দ করতেন এবং প্রায়শই তা পাঠ করতেন। তিনি সুন্দর সুন্দর ফার্সী ও হিন্দী গজল গাইতে পারতেন। কবিতা পাঠের সময় তাঁর হৃদয়ের কোমলতার আবেগ অনুভূত হতো।[৮০] শিকার করা এক সময় তাঁর খুব প্রিয় শখ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, নিজের উপভোগের জন্য প্রাণী বধ করা নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছু নয়। গান বাজনার প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল। ওস্তাদ ছাড়াই নিজের চেষ্টায় তিনি সঙ্গীতে ভাল দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময় খাজা পরিবারে বিশেষত বিয়ে-শাদীর আসরে নাচ-গানের প্রচলন হয়।[৮১] ইতোপূর্বে খাজা পরিবারের নিজস্ব বাড়ীতে কোনরূপ নাচ-গান করতে দেয়া হতো না। প্রয়োজনে তাঁদের ব্যয়ে অন্যত্র নাচ-

Dhaka University Institutional Repository

গানের ব্যবস্থা করা হতো। তাঁর সময় খাজা পরিবারে মহররমে এবং শবেবরাতে জাগতিক উৎসবাদিরও প্রচলন করা হয়।[৮২] খাজা আবদুল গফুর তাঁর চাচা মৌলভী আবদুল আজিমের কন্যা খাদিজা খানমকে বিয়ে করেন। ইসমাতুন্নেছা নামে তাঁর এক কন্যা ও খাজা আবদুল গাফফার নামে তাঁর এক পুত্র জন্মে। আবদুল গফুর ১২৩৮ হিঃ মোতাবেক ১৮২২ খ্রীঃ মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান।[৮৩] খাজা আবদুল গফুর একজন জনদরদী ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং যথারীতি ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন এবং কুরআন শরীফ তেলোয়াত করতেন।[৮৪] খাজা আবদুল গফুরের মৃত্যুতে খাজা পরিবারের জামিদারীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তথা খাজা হাফিজুল্লাহর প্রত্যক্ষ শাখার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায় এবং তাঁর ভাই খাজা আহসানুল্লাহর বংশধরের উপর এই পরিবারের কর্তত্ব করার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১(৩)(গ) খাজা আলীমুল্লাহ ও তাঁর জমিদারী (মোতাওয়াল্লী) ঃ

খাজা হাফিজুল্লাহর পুত্র খাজা আবদুল গফুরের মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র নাবালক ছিলেন। তাছাড়া খাজা পরিবারের এই শাখায় এমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না যিনি তাঁদের এ্যাজমালি সম্পত্তির কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করতে পারেন। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে খাজা আহসানূল্লাহর পুত্র খাজা আলীমুল্লাহকে তাঁদের সম্পত্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।[৮৫] খাজা আলীমুল্লাহর পিতা খাজা আহসানুল্লাহ, সিলেটে বসবাসরত পূর্বোক্ত আবদুল হাকিমের পুত্র বাহাদ্ধু মিয়ার কন্যা ফাতেমা খানমকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে তিন পুত্র খাজা আতিকুল্লাহ, খাজা সলীমুল্লাহ ও খাজা আলীমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।[৮৬] ধর্মভীরু খাজা আহসানুল্লাহ বৈষয়িক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, খাজা আহসানুল্লাহ নিজের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ভার এবং কনিষ্ঠ পুত্র খাজা আলীমুল্লাহর লালন পালনের দায়িত্ব, ছোট ভাই হাফিজুল্লাহর উপর অর্পন করে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওনা হন এবং পথে তিনি মারা যান।[৮৭] হজ্বযাত্রা কালে খাজা আহসানুল্লাহর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রও নাবালক ছিলেন। তাই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও খাজা হাফিজুল্লাহর উপর বর্তায়। ফলে তিনি এদের সব সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করতেন এবং সম্পত্তির লাভালাভ অনুসারে ভাতাদি দিতেন।

এদিকে খাজা আলীমুল্লাহ (পরিশিষ্টে চিত্র নং ১ দ্রঃ) তাঁর চাচা হাফিজুল্লাহর তত্ত্বাবধানে ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি করেন। পিতৃব্য হাফিজুল্লাহ কর্তৃক এ্যাজমালি ব্যবসায়ী কারবার ও সম্পত্তির কর্তৃত্ব কালেই বিচক্ষণ খাজা আলীমুল্লাহ নিজে পৃথকভাবে ব্যবসা করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন।[৮৯] তৎকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে অধিকতর প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জনের জন্য তাঁর চাচা খাজা হাফিজুল্লাহর ন্যায় খাজা আলীমুল্লাহও জমিদারী ক্রয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরায় বিস্তর জমিদারী এবং বহুসংখ্যক নীলকুঠি ক্রয় করেন। খাজা আলীমুল্লাহ মহাজনী কারবারও করতেন। তিনি ঢাকা ব্যাংকের একজন প্রধান অংশীদার ও পরিচালক ছিলেন।[৯০] আঃ রহিম সাবা বলেন, খাজা আলীমুল্লাহ অন্যের সাথে অংশীদারীত্বে না জড়িয়ে নিজের প্রচেষ্টায়ই ঢাকা শহরে রমনার বাগান, বুড়িগংগা তীরস্থ অনেক কুঠিবাড়ী, চান্দিনা এলাকায় অনেক ভূখন্ড ক্রয় করেন। এছাড়াও তিনি আটিয়া পরগনা, বলদাখাল পরগনা, সলিমাবাদ পরগনা, সুলতানাবাদ, সুবিদখালী, রানীপুর, চালনা, লক্ষ্মীপুর, মেলীখালী ইত্যাদি জমিদারী ও তালুক খরিদ করেন।[৯১] খাজা আবদুল গফুরের মৃত্যুর পর ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তিগণ খাজা আলীমুল্লাহকে তাঁদের সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে তিনি প্রথমে সম্মত হননি। কারণ তাঁর নিজস্ব কাজ কারবার এত অধিক ছিল যে, তিনি তাঁদের আবেদনে সাড়া দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, যদি তিনি তাঁদের ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ না করেন, তাহলে ঐ পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কারণ একেতো তাঁদের মধ্যে কেউ কর্তৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলনা। তদুপরি খাজা হাফিজুল্লাহ ও আবদুল গফুরের সময় থেকে তাঁরা বিপুল ঋণের ভারে জর্জরিত ছিলেন।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় খাজা আলীমুল্লাহ এই শর্তে উক্ত এ্যাজমালি সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণে রাজী হলেন যে, পরিবারের সদস্যরা যতশীঘ্রই পারেন তাঁদের মধ্যে থেকে একজন মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে তাঁকে অব্যাহতি দেবেন।[৯৩] খাজা আবদুল গফুরের সব ওয়ারিশ ও আত্মীয় স্বজন খাজা আলীমুল্লাহর শর্ত এবং কর্তৃত্ব মেনে নেন।

১৮৪৬ খ্রীঃ খাজা আলীমুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র খাজা আবদুল গণি নিজগুনে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বিবেচিত হওয়ায় তিনি তাঁর অনুকুলে ঐ এ্যাজমালি সম্পত্তির কর্তৃত্ব পরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই পেক্ষিতে উক্ত সম্পত্তির অংশীদারগণ ও পরিবারের সব প্রধান ব্যক্তি একমত হয়ে খাজা আবদুল গণিকে উক্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা একটি ওয়াকফনামা তৈরী করে খাজা আব্দুল গণিকে স্থায়ীভাবে ঐ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন।[৯৪] ঢাকার খাজা পরিবারের ইতিহাসে বিখ্যাত ঐ ওয়াকফনামাটি বাংলা ১২৫৩ সালের ২৭ শে বৈশাখ মোতাবেক ৮মে ১৮৪৬ খ্রীঃ সম্পাদিত হয়। উক্ত এ্যাজমালি সম্পত্তির তখন বাৎসরিক আয় ছিল মোট ৩,৪৮,৭৪০/- টাকা।[৯৫] পরিশিষ্ট নং-১ পৃঃ৩৮৬-৩৮৭তে উক্ত ওয়াকফনামার ইংরেজি অনুবাদ দেয়া হলো।

উক্ত ওয়াকফনামার প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপঃ মোতাওয়াল্লী সম্পত্তির জন্য নিয়মিত সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করবেন। সম্পত্তির আয় ও মুনাফা থেকে নির্ধারিত তালিকা মোতাবেক অংশীদারদের ভাতা দেবেন।[৯৬] উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখা হবে এবং সুখদুঃখের সময় অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝে মোতাওয়াল্লী তা থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে অর্থ দেবেন। এক্ষেত্রে বেশি বা কম পরিমাণের বিষয়ে কোন আপত্তি করা যাবেনা। মোতাওয়াল্লীকে পরিবারের পূর্ব থেকে দায়ী থাকা ঋণগুলি পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণ পরিশোধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম তালিকায় নির্ধারিত পরিমাণ ভাতা দেয়া হবে। ছয় বছর পর ঋণ পরিশোধ হলে, দ্বিতীয় তালিকায় নির্ধারিত পরিমাণ মোতাবেক ভাতা দিতে হবে। মোতাওয়াল্লী ভাল মনে করলে ওয়াকফকৃত জমি বিক্রয় ও ক্রয় করতে পারবেন। ঐ ভাবে ক্রয়কৃত জমিও এই ওয়াকফের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে। পরিবারের লোকদের মোতাওয়াল্লীকে অপসারনের কোন ক্ষমতা থাকবেনা। তবে মোতাওয়াল্লী নিজেকে অক্ষম মনে করলে তদস্থলে উপযুক্ত অন্য কাউকে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারবেন। যদি কোন কারণে কোন মোতাওয়াল্লী জীবদ্দশায় তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যেতে না পারেন, তবে পরিবারের সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত কাউকে মোতাওয়াল্লী নির্বাচিত করবেন। মোতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে কোর্টে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। তবে মোতাওয়াল্লী ভাতা দেয়া বন্ধ করলে, পরিবারের অন্ততঃ তিন জনের সম্মতিতে ঐ বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কোর্টে যাওয়া যাবে।[৯৭] খাজা আবদুল গফুরের বিধবা স্ত্রী খাদিজা খানম ওরফে ধনবিবি-এর নেতৃত্বে পরিবারের অন্য সবাই উক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ করেন এবং তৌলিয়তনামা লিখে দিয়ে খাজা আবদুল গণিকে মোতাওয়াল্লী করেছিলেন। এজন্য পরবর্তীকালে এই এ্যাজমালি সম্পত্তিটি খাজা পরিবারে 'ধনবিবি ওয়াকফ প্রপার্টি' অথবা 'ধনবিবি ওয়াকফ এস্টেট' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৯৮] চারটি অঞ্চলে এই জমিদারীর সম্পত্তি বিস্তৃতি ছিল বলে একে অনেক সময় *'ফোর প্রপার্টি অব এনসেসটর্স'* (পূর্ব পুরুষদের সম্পত্তি চতুষ্টয়) ও বলা হতো। ঐ চারটি জমিদারী পরগনার পরিচিতি ও বর্ণনার জন্য পরিশিষ্ট নং ২ পৃঃ নং৩৮৮দ্রঃ।

খাজা আবদুল গণিকে ঐ এ্যাজমালি সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্তির জন্য ওয়াকফনামা তৈরী করা ছাড়াও ঐ একই তারিখে পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক খাজা আলীমুল্লাহকে একটি না-দাবীপত্র বা 'ফোরখাত নামা' লিখে দেয়া হয়। তাতে এতদিন খাজা আলীমুল্লাহর কর্তৃত্বে ঐ সম্পত্তি পরিচালনার বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি না রেখে পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পূর্ব পুরুষের সময়ে গৃহীত পরিবারের ঋণের বিষয়ে তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়ে ঋণের ভার অনেকটা লাঘব করতে পেরেছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।[১০০] উক্ত ফোরখাতনামার ইংরেজি অনুবাদ পরিশিষ্ট নং ৩ পৃঃ৩৮৯ তে দেয়া হলো। খাজা আলীমুল্লাহ ও আবদুল গণি উক্ত ধনবিবি এস্টেটের মোতাওয়াল্লী হলেও তাঁরা কেউই এই সম্পত্তির অংশীদার ছিলেননা। তবে পূর্বোক্ত আবদুল গফুর ও ধনবিবির মেয়ে আসমাতুন্নেসাকে বিয়ে করে খাজা আবদুল গণি এর

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য কিছু অংশের দাবীদার হয়েছিলেন।[১০১] উপরোক্ত ওয়াকফমূলে মরহুম খাজা আবদুল গফুরের পরিবারের পুর্বোক্ত সমুদয় ঋণ এবং ঐ পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের ভাতাদি, বিয়ে শাদীর ব্যয়ভার যা এতদিন খাজা আলীমুল্লাহর উপর ন্যস্ত ছিল, তা খাজা আবদুল গণির স্কন্ধে অর্পিত হয়। তবে খাজা আলীমুল্লাহ এরপর প্রায় ৭/৮ বছর বেঁচে ছিলেন এবং নেপথ্যে থেকে তিনিই মূলতঃ সবকিছু পরিচালনা করতেন। এভাবে খাজা আলীমুল্লাহর জীবিতকালেই তিনি পূর্ববর্তী ঋণগুলো পরিশোধ করে পাওনাদারের নিগ্রহের হাত থেকে পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করেন। এছাড়াও তিনি খাজা আবদুল গফুরের সব ওয়ারিশ ও আত্মীয়স্বজনের মাসিক ভাতাদি প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি করেন।[১০২] খাজা আলীমুল্লাহর মৃত্যুর (১৮৫৪ খ্রীঃ) পর খাজা আব্দুল গণি স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতায় ঐসব সম্পত্তির উন্নতি সাধন করেন। আবদুল গণির সুষ্ঠ তত্ত্বাবধানে উপরোক্ত ধনবিবি প্রপার্টির আয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বছরে সাড়ে চার লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়।[১০৩] পরবর্তীতে আবদুল গণির পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ জমিদারী পরিচালনার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে, তিনি তাঁর অনুকুলে উক্ত ধনবিবি এস্টেট ছেড়ে দিতে মনস্থ করেন। আব্দুল গণি পরিবারের সকলের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবে ১২৭৫ বাংলা সনের ২৭শে ভাদ্র (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ খ্রীঃ) একটি তৌলিয়তনামা (দায়িত্ব পরিত্যাগ দলিল) প্রস্তুত করে খাজা আহসানুল্লাহকে নতুন মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন এবং তাঁর উপর উক্ত ধনবিবি প্রপার্টি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।[১০৪] পরিশিষ্ট নং-৪ তে ফার্সীতে লেখা তৌলিয়তনামাটির ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হলো। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, পিতৃব্য হাফিজুল্লাহর জীবিতকালে খাজা আলীমুল্লাহ নিজে পৃথকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকারী হন। খাজা আলীমুল্লাহ চামড়ার ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন। তিনি পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচা চামড়া ক্রয় করে কলকাতার মাধ্যমে জাহাজযোগে ইংল্যান্ড পাঠাতেন। সেখানে চামড়গুলো পাকা হয়ে জুতো, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরীর জন্য পুনরায় ভারতে আসতো। আলীমুল্লাহ ঐ সময় এতদাঞ্চলে চামড়ার একক ব্যাবসায়ী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীতে অনেক মুসলমান চামড়ার ব্যবসা শুরু করলেও আলীমুল্লাহ্র মত কেউ এ পেশায় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।[১০৫]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, চাচা হাফিজুল্লাহর ন্যায় তিনিও ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর ভুসম্পত্তি ও নীলকুঠি ক্রয় করেন এবং তিনি ঢাকা ব্যাংকের প্রধান অংশীদারও ছিলেন।[১০৬] খাজা আলীমুল্লাহ্ তাঁর এই কষ্টার্জিত সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পরও অটুট রাখার বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর চোখের সামনেই অনেক বড় বড় জমিদারী উপযুক্ত রক্ষণাক্ষেণের অভাবে ও উত্তরাধিকারীদের দ্বন্দ্বে ধ্বংস হতে দেখেছেন। এ কারণে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি একটি ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে এনে একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর একক কর্তৃত্বাধীনে রেখে যেতে মনস্থ করেন। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাসহ নানাদিক বিচার করে খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র (দ্বিতীয় স্ত্রী জিনাত বিবির পুত্র) খাজা আব্দুল গনিকে তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী বলে নির্বাচিত করেন।[১০৭] খাজা আলীমুল্লাহ কয়েকটি দানপত্র দলিল (হেবা-বেল-এওয়াজ) করে জমিদারী ও কারবার পরিচালনার জন্য সব সম্পত্তি আবদুল গণির অধিকারে ছেড়ে দেন। এসব দানপত্র দলিলের কয়েকটি পূর্বোক্ত পুর্বপুরুষের সম্পদ চতুষ্টয়ের জন্য ১৮৪৬ সালে সম্পাদিত ওয়াকফ নামারও বেশ আগেই সম্পাদন করা হয়।[১০৮] উক্ত দানপত্র অনুযায়ী খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর পুত্র আবদুল গণিকে সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও নগদ দুইলক্ষ টাকা প্রদান করেন। তিনি তাঁকে তাঁর পুরো এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য ভাতা ধার্য্য করে দেন।[১০৯]

আবদুল গণির অনুকূলে উল্লিখিত ওয়াকফ দলিলাদি সম্পাদন করে খাজা আলীমুল্লাহ যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটাই পরবর্তীকালে খাজা পরিবারকে বিশ্ববিখ্যাত করার মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছিল। এর ফলে ঢাকার কাশ্মীরি খাজাদের এস্টেটের একতা লাভ করে। এদের সম্পত্তির ক্রমন্নোতির পথ প্রশস্ত করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এই পরিবারের পরবর্তী প্রধানদের উত্তোরত্তর সম্মান বৃদ্ধির পথ পরিস্কার হয়।[১১০] এই ব্যবস্থা গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

না হলে এস্টেট তথা সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বিভক্ত হয়ে পড়তো এবং বিভিন্ন অংশের মালিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ সৃষ্টি হয়ে তাঁদের ক্ষমতা ও জমিদারী ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতো।

পূর্বোক্ত ধনবিবি এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের আগেই খাজা আলীমুল্লাহ খেজরুন্নেসা নামক এক ধনবান মহিলাকে বিবাহ করে বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক হন।[১১১] এছাড়াও সুদর্শন আলীমুল্লাহ স্থানীয় এক ধনবান জমিদারের বিধবার দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক তাঁকে বিয়ে করেও প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন।[১১২] আলীমুল্লাহর যশ ও উন্নতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন বাংলার অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা তাঁকে তাঁদের ধন-দৌলত ও ওয়াকফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত করেন।[১১৩] যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে ঐ সময় পুর্ব বাংলার পুরানো অভিজাত জমিদারী সমুহ লাঠে উঠতে থাকে এবং বিচক্ষণ আলীমুল্লাহ সুযোগ বুঝে ঐ সব খরিদ করতে থাকেন। তাঁর সময় ঢাকার মোগল নায়েবে নাজিমদের বংশধরগণ চরিত্রহীন ও অমিতব্যয়িতার কারণে সহায় ও সম্ভ্রম দুইই হারান। তাঁরা ঋণগ্রস্থ হয়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হন। পুরানো অভিজাত পরিবারগুলো অপরিনাম দর্শিতার জন্য যত ঋণজালে[১১৪] জড়াচ্ছিল খাজা আলীমুল্লাহ তাঁদের ঋণমুক্ত করতে ততই সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছিলেন। তায়েশ বলেন, খাজা আলীমুল্লাহ বাকেগঞ্জের একটি বড় জমিদারী ক্রয় করেন এবং ব্যবসা করে প্রচুর বিত্তবান হন।[১১৫] তাঁর সময় খাজা পরিবারের ধনসম্পত্তি পুরোপুরি একটি যুক্ত এস্টেটে পরিণত হয়[১১৬]।

খাজা পরিবারের এই উত্থানকালে ঢাকায় যে ক'টি বিখ্যাত ও অভিজাত পরিবার পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তম্মধ্যে মীর আশরাফ আলী ও মীর কুতুবউদ্দিনের পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মীর আশরাফ আলী অষ্টাদশ শতকের শেষে ইরানের সিরাজ নগর থেকে ঢাকায় আগমন করেন এবং ইতিহাস খ্যাত আগাসাদেকের পৌত্রিকে বিয়ে করে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। বৈবাহিক সূত্রে ত্রিপুরার বলদাখাল পরগণার বিশাল জমিদারীর মালিক হয়ে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হন।[১১৭] রমনার দক্ষিণে ফুলবাড়ীয়ায় এক বিরাট এলাকা নিয়ে তাঁর প্রাসাদ ছিল। বিশপ হেবার তাঁকে এই জেলার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারকে ভারতে খান্দানী পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১১৮] ঢাকার নওয়াবদের পূর্বপুরুষ খাজা হাফিজুল্লাহ সাধারণতঃ পালকিতে চড়ে যাতায়াত করতেন। কিন্তু মীর আশরাফ আলীর সাথে সাক্ষাতকালে তিনি পালকী ছেড়ে একজন ভৃত্যসহ পদব্রজে তাঁর গৃহে গমন করতেন।[১১৯] মীর আশরাফ আলী ১৮২৯ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার কারণে তাঁর বিশাল জমিদারী অল্প দিনের মধ্যেই নিলামে বিক্রি হয়ে যায়।[১২০] মীর আশরাফ আলীর অধিকাংশ জমিদারীই খাজা পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ঐযুগে ঢাকায় আরেকজন পুরানো অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন মীর কুতুবউদ্দিন। যুগের সাথে তাল মিলাতে না পারায় তাঁর আর্থিক অবস্থাও অবনতির পথে যাচ্ছিল। খাজা আলীমুল্লাহর নব অর্জিত ঠাঁট-বাঁটের সামনে মান বাঁচাতে ঢাকা ছেড়ে তিনি লক্ষ্ণৌ চলে যান। তাঁর চলে যাওয়ার আগে খাজা আলীমুল্লাহ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন মোগল বাদশা কর্তৃক মীর সাহেবকে প্রদত্ত রূপার ছড়ি ও মুক্তার মালাটি তাঁর কাছে বিক্রি করে যান। কিন্তু মীর কুতুবউদ্দিন ঈর্ষাবশতঃ খাজা আলীমুল্লাহর পরিবর্তে সেগুলো মাত্র দু'হাজার টাকায় গোপালদাসের নিকট বিক্রয় করে যান। খাজা আলীমুল্লাহ পরে গোপালদাসের কাছ থেকে সেগুলো তেইশ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছিলেন।[১২১] উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় ছাড়াও এতদাঞ্চলে বেশ কিছু অভিজাত পরিবার খাজা আলীমুল্লাহর সমকালে পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এদের মধ্যে আবদুল্লাহপুর ও আটিয়া পরগনার জমিদার মীর নওয়াব, বলদাখাল পরগনার আরেকজন জমিদার মীর্জা মোহাম্মদ কাজিম খান, বিলিয়াটি পরগনার জমিদার মীর আতাউর রহমান, মসলিশপুর পরগনার জমিদার মীর্জা হাসান আলী, বাকেরগঞ্জের কুলুয়া পরগনার জমিদার মীর্জা হায়দার আলী, ত্রিপুরা জেলার তুরা পরগনার জমিদার শেখ গোলাম নবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নানা কারণে উল্লিখিত জমিদার পরিবারগুলোর পতন ত্বরান্বিত হলে ঢাকার খাজা পরিবারের পক্ষে তাঁদের কিছু কিছু সম্পত্তি ক্রয় করা

Dhaka University Institutional Repository

সহজ হয়। তৈফুর বলেন, খাজা আলীমুল্লাহর উত্তরাধিকারীরা আরো কিছু জমিদারী ক্রয় করে এবং পরবর্তীকালে তাঁদের জমিদারী এস্টেটের বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণ হয় প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা।[১২৩]

খাজা আলীমুল্লাহর সময়েই খাজা পরিবারের খ্যাতি বাংলার সীমা অতিক্রম করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ঐ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ী, প্রখর জ্ঞান দ্বারা সৌভাগ্য সূর্য্যকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন।[১২৪] তিনি প্রথম থেকেই ইউরোপীয় চাল চলন শুরু করেন। তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি উপেক্ষা করে সেযুগে উন্নতি সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অনুশাসন মেনে নিয়েও তিনি ইংরেজ শাসক ও কর্মকর্তাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করেন এবং বাস্তব কারণে তাঁদের সাথে শত্রুতা নয় বরং সখ্যতা স্থাপনের চেষ্ট করেন।

ঢাকায় ইসলামপুরস্থ কুমারটুলী মহল্লায় খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৩০ খ্রীঃ ফরাসীদের নিকট থেকে একটি বাণিজ্য কুঠি ক্রয় করেন।[১২৬] কুঠিটাকে তিনি বসবাসের উপযোগী করে সংস্কার করেন এবং বেগম বাজারস্থ পৈত্রিক বাসভবন থেকে উঠে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। ফরাসীদের সেই বাণিজ্যকুঠিই কালে পরিবর্তিতরূপে 'আহসান মঞ্জিল' বা ঢাকার নওয়াববাড়ী নামে খ্যাতি অর্জন করে। আর্থিক প্রাচুর্যের সাথে সাথে আভিজাত্য অর্জনের জন্য খাজা আলীমুল্লাহ আমীরানা চালচলন শুরু করেন। তিনি পশ্চিমা ঘোড়া ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কয়েক ডজন আরবী ঘোড়া ক্রয় করেন এবং সোনা-রূপাখচিত টমটমে চড়ে ভ্রমণ শুরু করেন।[১২৭] ১৮৩১ খ্রীঃ শীতকালে খাজা আলীমুল্লাহ লাহোরের প্রসিদ্ধ ঘোড়া ব্যবাসায়ী জবরদস্ত খানের মাধ্যমে ১২টি ভালো জাতের আরবীঘোড়া কেনেন এবং পর বৎসর আরো ১২টি ঘোড়া কেনার ফরমায়েশ দেন।[১২৮] এছাড়া আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে দুর্লভ মনিমুক্তা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৫২ খ্রীঃ কোহিনূরের সমগোত্রীয় বিখ্যাত হীরক খন্ড দরিয়া-ই-নূর ক্রয় করেন।[১২৯]

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট রাসেল মোরল্যান্ড স্কীনার সাহেব ১৮৪০ খ্রীঃ ঢাকায় প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপন করেন। উক্ত প্রথম কমিটিতে খাজা আলীমুল্লাহ একজন নামকরা সদস্য ছিলেন।[১৩০] শিক্ষানুরাগী খাজা আলীমুল্লাহ প্রাচীন দর্শন বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তদানিন্তন প্রখ্যাত সুফী শাহ্ ফোরাকী ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু ও মুর্শিদ।[১৩১] প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কৃতিত্বে তিনি সমকালীন স্থানীয় চিকিৎসকদের ছাড়িয়ে যান। স্থানীয় হেকিম জুলফিকার আলী ও হায়দার বক্স তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, প্লেটো বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক বড় হতে পারেন কিন্তু তিনি জ্ঞানের দিক থেকে হবেন আমার চেয়ে অধম।[১৩২] তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অদম্য। আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য খাজা আলীমুল্লাহ সুসজ্জিত হাতী ঘোড়া নিয়ে জৌলুস সহকারে শিকারে যেতেন। শিকার কালে তিনি পুত্র আবদুল গনি ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে সাথে নিতেন। চিত্তবিনোদন ও বিশ্রামের জন্য সাভারের সাদুল্লাপুরে খাজা আলীমুল্লাহ শিকারগৃহ নির্মাণের ব্যাপক কাজ শুরু করেন। তাঁর পুত্র আব্দুল গণির সময় সেটা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়।[১৩৩] খাজা আলীমুল্লাহ বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। আটিয়া পরগনার জমিদারি তিনি দরিদ্রদের জন্য আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দিয়ে যান।[১৩৪]

আটিয়ার বড়তরফের জমিদার, মুন্সী সাদত আলী খান পন্নী, পথম জীবনে বিমাতার অত্যাচারে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি শেষ পর্যন্ত খাজা আলীমুল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্পত্তি উদ্ধারে খরচাদির বিনিময়ে সাদত আলী খান তাঁর জমিদারীর অংশ বিশেষ খাজা আলীমুল্লাহকে লিখে দেবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। খাজা আলীমুল্লাহ সাদত আলী খাঁর পক্ষে মোকদ্দমা চালিয়ে তাঁকে জয়যুক্ত করেন। কিন্তু জমিদারী ফিরে পেয়ে সাদত আলী খান তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন। খাজা আলীমুল্লাহ পুনরায় এক মোকদ্দমায় তাঁকে পরাজিত করে তাঁর জমিদারীর ৭ আনা অংশ আদায় করেন।[১৩৫] জীবনের শেষপ্রান্তে অর্জিত উক্ত সম্পত্তি খাজা আলীমুল্লাহ জনকল্যাণে আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে যেতে মনস্থ করেন। ১৪ রমজান ১২৭০ হিঃ মোতাবেক ৮ জুন ১৮৫৪ খ্রীঃ তারিখে খাজা আলীমুল্লাহ করটিয়া জমিদারীর আটিয়া পরগনা থেকে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৭ আনা অংশ আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে তাঁর প্রিয়পুত্র খাজা আবদুল গনিকে এর মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন।[১৩৬] পরিশিষ্ট নং ৫ পৃঃ ৩৯২-৩৯৬-এ উক্ত ওয়াকফনামা (তৌলিয়তনামা)-এর একটি ফার্সি অনুলিপি দেয়া হল। তায়েশ বলেন, এই ওয়াকফ এস্টেটের আয় দ্বারা অসংখ্য দরিদ্র দুঃস্থ মানুষ লালিত-পালিত হয়ে থাকে।[১৩৭] এই ওয়াকফ সম্পত্তির আওতায় ঢাকা শহরে নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ী গড়ে উঠেছিল।[১৩৮] নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৬৮ খ্রীঃ সমুদয় জমিদারীর দায়িত্ব তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর অনুকূলে ছেড়ে দিলেও অতিবৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত এই ধর্মীয় ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী পদটি নিজের হাতেই রেখেছিলেন। অবশেষে বাধ্যর্কজনিত কারণে মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে ২৮শে মহররম, ১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১২ আগস্ট, ১৮৯৩ খ্রীঃ তিনি পুত্র নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহকে উক্ত ধর্মীয় ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত করেন।[১৩৯] পরিশিষ্ট নং ৬ পৃঃ ৩৯৭-৪০১-এ উক্ত তৌলিয়তনামার একটি ফার্সি অনুলিপি দেয়া হলো। ধর্মীয় ওয়াকফের কারণে উল্লিখিত সম্পত্তি কখনোই কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে যায়নি। পরবর্তীকালে উত্তরাধীকারী নওয়াবগণ উক্ত ওয়াকফকৃত এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হতেন। ১২৬১ বাংলা সালের ১৬ ভাদ্র মোতাবেক ১২৭০ হিজরীর ২১ সওয়াল (১৮৫৪ খ্রীঃ) খাজা আলীমুল্লাহ পরলোকগমন করেন।[১৪০] বেগমবাজারে তাঁর যে পৈত্রিকনিবাসকে তিনি পারিবারিক গোরস্তানে পরিণত করেছিলেন, সেখানে তাঁর কবর আজো বিদ্যমান। কলকাতায় দূরবীন পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়-'খাজা আলীমুল্লাহ ছিলেন ঢাকা তথা বাংলার মহৎ লোকদের শিরোমণি। তিনি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গুনাবলীতে বিভূষিত ছিলেন'।[১৪১]

১(৩) (ঘ) নওয়াব আব্দুল গণির জমিদারী (মোতাওয়াল্লী)ঃ

খাজা আব্দুল গণি (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ২ দ্রঃ) জমিদারী পরিচালনা ও সাংগঠনিক কাজকর্মে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধির জোরে পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত ধনসম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য ও জামিদারীর আয় চারগুনেরও বেশী বাড়াতে সক্ষম হন।[১৪২] জমিদারী পরিচালনার পাশাপাশি নওয়াব আবদুল গণি নানা ধরণের ব্যবসায়িক কারবার করতেন। বিশেষ করে পাট ও পাটজাতদ্রব্য এবং ঔষধের ব্যবসায় তৎকালে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। আব্দুল গণির পিতার আমলে যে চামড়ার ব্যবসা ছিল, সেটা তাঁর আমলেও লাভজনকভাবে অব্যাহত থাকে। ছোটকাটরার সাথে বুড়ীগংগার তীরে তাঁর প্রধান চামড়া গুদাম ছিল। পরবর্তীতে তিনি এ ব্যবসার ভার তাঁর প্রধান বাণিজ্য ম্যানেজার হাজী বট্টু সাহেবের উপর ন্যস্ত করেন। বট্টু হাজী পরে ঢাকার একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি ছোট কাটরা থেকে সোয়ারীঘাটে তাঁর চামড়ার কারবার স্থানান্তর করেন।[১৪৩] উল্লেখ্য, ১৮৫০ এর দশকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে ইউরোপে বাংলার উৎপাদিত চামড়ার চাহিদা অত্যধিক বেড়ে যায়। ফলে আব্দুল গণির ব্যবসায়ে প্রচুর সাফল্য আসে।

জমিদারীর ঐক্য বজায় রাখার নিমিত্তে খাজা আব্দুল গণি তাঁর পিতা আলীমুল্লাহর আদর্শ অনুসরণ করতেন। পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি তিনি একজন উপযুক্ত মোতাওয়াল্লীর কর্তৃত্বাধীনে রাখতে মনস্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে উত্তমরূপে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। দীর্ঘ ২২ বছর পরিবারের যাবতীয় এ্যাজমালি সম্পত্তির উপর সফলভাবে কর্তৃত্ব করার পর খাজা আব্দুল গণি সুস্থ্য দেহ-মন সত্ত্বেও পুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে মনস্থ করেন। এজন্য তিনি পরিবারের সকলের সম্মতি আদায় করেন।[১৪৪] এই উদ্দেশ্যে আব্দুল গণি স্থানীয় বারের কয়েকজন প্রবীন ও যোগ্য সদস্যের মতামত নেন। তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পদস্থ সরকারী কমকর্তাদের সাথেও পরামর্শ করেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন বাংলা সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার চার্লস পল-এর সাথেও এবিষয়ে পরামর্শ করেন।[১৪৫] আহসানুল্লাহকে বৈষয়িক দায়দায়িত্ব দেয়ার জন্য খাজা আব্দুল গণি ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ (২৭ ভাদ্র, ১২৭৫ বাংলা, ৩ জমাদি আউয়াল ১২৮৫ হিঃ) খাজা পরিবারের সকল

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদেরকে নিয়ে আহসান মঞ্জিল এলাকায় অবস্থিত তৎকালীন সুদৃশ্য আয়না মহলে এক সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় একটি ওয়াকফনামা তৈরী করে আব্দুল গণি তাঁর পিতার দেয়া এবং নিজের অর্জিত সমুদয় সম্পত্তির জন্য আহসানুল্লাহকে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন।[১৪৬] এছাড়াও উক্ত সভায়ই সর্বসম্মতিতে একটি তৌলিয়তনামা (দায়িত্বত্যাগপত্র) প্রস্তুত করে খাজা আহসানুল্লাহকে পূর্বোক্ত ধনবিবি ওয়াকফ এস্টেট (এ ফান্ড প্রপার্টি)-এর জন্য মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয় যা আগেই বর্ণিত হয়েছে। পরদিন আব্দুল গণির চা-খানায় আয়োজিত এক জন সমাবেশে জমিদারীর কার্যভার থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ এবং তদস্থলে আহসানুল্লাহর দায়িত্ব গ্রহণের কথা প্রকাশ করা হয়।[১৪৭] (পরিশিষ্ট নং ৭, পৃঃ নং ৪০২-৪০৪-তে উক্ত ওয়াকফনামা এবং তৌলিয়তনামার ইংরেজী অনুলিপি দ্রঃ) এরপর থেকে খাজা আহসানুল্লাহর নামেই জমির রেকর্ডপত্র তৈরী ও জমিদারী পরিচালিত হতে থাকে'। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত জমিদারী বিষয়ক বিজ্ঞাপনেও অতঃপর খাজা আহসানুল্লাহর নাম ব্যবহার হতে দেখা যায়।[১৪৮]

খাজা পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে খাজা আব্দুল গণি স্বীয় দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দ্বারা এই পরিবারের খ্যাতি বিশ্বজনীন করে তোলেন। মহানুভবতা ও সদাচরণের জন্য তিনি ঢাকাবাসী ও তাঁর বিশাল এস্টেটের প্রজাগণের কাছে অত্যন্ত প্রশংসিত ও জনপ্রিয় হন।[১৪৯] নওয়াব আব্দুল গণির সময় খাজা পরিবারের জমিদারী পূর্ব বংগের সবচেয়ে বড় জমিদারীতে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যতটা প্রয়োজন তা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। জ্ঞান গরিমায় ও দান দক্ষিণায় তিনি আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন। তিনি তাঁর জমিদারী এস্টেটের যে বিস্তৃতি সাধন করেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ খ্রীঃ) পর বাংলায় ততটা আর কেউই করতে পারেননি।[১৫০] ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ তারিখে ঢাকা প্রকাশের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আব্দুল গণির বিশাল বিত্ত ও সম্মান, তাঁর স্বভাব, জাঁক-জমক, দানশীলতা, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি উদারতা ইত্যাদি বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।[১৫১]

খাজা আহসানুল্লাহকে তৌলিয়তনামা সম্পাদন করে জমিদারীর দায়িত্বভার অর্পণ এবং আব্দুল গণির অবসর নেয়া উপলক্ষে খাজা পরিবারের সদস্যগণ এবং প্রজাগণ তাঁদেরকে অভিনন্দিত করেন। এ উপলক্ষে ১৮৭০ খ্রীঃ ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল দু'দিন আহসান মঞ্জিলে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্মকর্তাসহ শহরের ও দেশের নানা স্থান থেকে গণ্যমান্য অসংখ্য অতিথি আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১৫২] সাফল্যের সাথে জমিদারী পরিচালনার জন্য পরিবারের সদস্যগণ আব্দুল গণিকে একটি অভিনন্দনপত্র এবং একটি রৌপ্য নির্মিত অলংকৃত চেয়ার উপহার দেয়।[১৫৩] (পরিশিষ্টে চিত্র নং ৩ -এ উক্ত চেয়ারের চিত্র দেয়া হলো) এছাড়া এ উপলক্ষে তাঁর এস্টেটের কর্মচারী ও প্রজাকুলের পক্ষ থেকে একটি এবং ঢাকা শহরবাসীর পক্ষ থেকেও আরেকটি অভিনন্দন পত্র তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাচ-গানও কম হয়নি। এছাড়া উক্ত দু'দিন ধরে নওয়াব বাড়ীর প্রাসাদ ভবনাদি আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল এবং আশ্চর্য্য রকমের সব বাজীও জ্বালানো হয়েছিল।[১৫৪]

১(৩)(ঙ) নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর জমিদারী (মোতাওয়াল্লী)ঃ

নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৪ দ্রঃ) -এর সময়ে খাজা পরিবারের ধনসম্পত্তি আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঢাকার গোবিন্দপুর পরগনা তিনি নিলামে কিনে তাঁর জমিদারীর অর্ন্তভূক্ত করেন।[১৫৪(ক)] সোনারগাঁয়ের জনৈক শেখ মোঃ আজিমের স্ত্রী মজলিমুন্নেসা নওয়াব আহসানুল্লাহকে তাঁর ধনসম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে যান।[১৫৫]

খাজা আহসানুল্লাহ যখন মোতাওয়াল্লী ছিলেন তখন পূর্বোক্ত দু'টি তৌলিয়তনামায় উল্লেখিত সমগ্র সম্পত্তির অংশীদারদেরকে নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থাদি দেয়া হতো। এতদব্যতিত প্রতিমাসে প্রায় দুই হাজার টাকা দরিদ্র, এতিম ও পঙ্গুদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হতো। এছাড়া মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল,

Dhaka University Institutional Repository

এতিমখানা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচুর চাঁদা দেয়া হতো। প্রতিদিন ৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত মুসাফির, এতিম, গরীব ছাত্র, অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।[১৫৬]

কিন্তু ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিবারের অংশিদারদের মাসিক বৃত্তির টাকা তাঁদের আশানুরূপ বাড়ানো হয় না। বিক্ষুব্ধ সদস্যগণ একসংগে নওয়াব আহসানুল্লাহর সমালোচনা শুরু করেন। এজন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁদের অনেকের ভাতা দেয়া বন্ধ করে দেন। এমতাবস্থায় নওয়াব আব্দুল গণির বৈমাত্রিয় ভাই খাজা মনসুর ১৮৮০ খ্রীঃ মে মাসে লোকজনসহ নওয়াবের খাজাঞ্জিখানা থেকে এক হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন।[১৫৭] নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে খাজা মনসুরের বিরুদ্ধে এজন্য ফৌজদারী মামলা করেন। এ মামলায় খাজা মনসুরের একমাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। ঐ দন্ডটি হাইকোর্টে আপীলের বিচারেও বহাল থাকে।[১৫৮]

এদিকে সৈয়দ আবদুল শফি- এর নেতৃত্বে খাজা পরিবারের এক বিক্ষুব্ধ গ্রুপ পুর্বোক্ত ১৮৪৬ এবং ১৮৬৮ সালে সম্পাদিত ওয়াকফনামা এবং মোতাওয়াল্লী পদের বৈধতা অস্বীকার করেন। তাঁরা ঢাকার প্রথম সাব জজ আদালতে নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহর বিরুদ্ধে ১৮৮০ খ্রীঃ এক মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় তাঁরা উভয় ওয়াকফনামাকে অবৈধ বলে অভিযোগ করেন। তাঁরা উভয় ওয়াকফনামায় বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তির উপর পরিবারে সবার অধিকার দাবী করে। তাঁদের বর্ণনামতে খাজা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি মুলতঃ পূর্বোক্ত ধনবিবি এস্টেটের আয় থেকে সৃজিত।[১৫৯] এই মামলা পরিচালনার জন্য উভয় পক্ষেই বিপুল অর্থ ব্যয় হয়।[১৬০] অবশেষে রায় ঘোষণার আগে খাজা পরিবারের সুহৃদগণের প্রচেষ্টায় একটি সমঝোতা করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে তৎকালীন লেঃ গভর্নর স্যার এ্যাসলি ইডেন সাহেবের হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট জজ (পরে হাইকোর্টের জজ) মিঃ এফ. আর. রেম্পিনি সাহেব ও ঢাকা বেঞ্চের অধ্যক্ষ মিঃ ফ্রেজার সহেবের অনুরোধে ২৬ আগস্ট ১৮৮১ খ্রীঃ একটি চুক্তিনামা (মেমোরেন্ডাম অব এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়।[১৬১] পরিশিষ্টে নং ৮ পৃঃ ৪০৫-৪০৭-এ উক্ত চুক্তিনামার একটি অনুলিপি দেয়া হলো। উক্ত চুক্তিনামায় পরিবারের সদস্যগণ পূর্বোক্ত ১৮৪৬ সন ও ১৮৬৮ সনের ওয়াকফনামার বৈধতা স্বীকার করে। তাঁরা নওয়াব আহসানুল্লাহকে মোতাওয়াল্লী রূপে মেনে নেয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার অভিযোগসহ উক্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বিনিময়ে পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে মাসিক ১১,০৯০ টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা তথা বার্ষিক ১,৩৩,০৮৪ টাকা ১১ আনা ধার্য করা হয়। উক্ত চুক্তিনামায় আরো বলা হয়, উভয় পক্ষ থেকে দুইজন করে পরিবারের চারজন পুরুষ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি উল্লিখিত বৃত্তির অর্থ অংশীদারদের মধ্যে অংশানুপাতে বিভাজনের তালিকা তৈরী করবেন। নওয়াব সাহেব চুক্তি স্বাক্ষরের দুই সপ্তাহের মধ্যে আরো একটি অংগীকারপত্র প্রদান করবেন যে, প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তালিকানুযায়ী অংশীদারদের বৃত্তি পরিশোধ করা হবে। উক্ত অংগীকারপত্রটি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ খ্রীঃ সম্পাদিত হয়।[১৬২]

ইতোমধ্যে হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলের দেয়া অনুরূপ একটি মামলার রায় থেকে নওয়াব আব্দুল গণি জানতে পারেন যে, পারিবারিক সম্পত্তি চিরকালের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ওয়াকফ্ করা ইসলামী আইনে বৈধ নয়।[১৬৩] এ প্রেক্ষিতে নওয়াব আব্দুল গণি, নওয়াব আহসানুল্লাহর অনুকূলে তাঁর সমূদয় সম্পত্তির জন্য ১৮৬৮ খ্রীঃ সম্পাদিত ওয়াকফনামাটি (তৌলিয়তনামা) বাতিল করেন। তিনি তাঁর নিজস্ব সমুদয় সম্পত্তির ('বি-ফান্ড প্রপার্টি) অধিকাংশ (৮ লক্ষ টাকা আয়ের জমি) ২টি হীরার আংটির বিনিময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহকে ৫ই মাঘ ১৩০১ বাংলা মোতাবেক ১৮৯৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে 'হেবা-বেল-এওয়াজ' মুলে মালিকানা প্রদান করেন। এছাড়া নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর অপর পুত্র খাজা করিমুল্লাহকেও ১টি হীরার আংটির বিনিময়ে তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ (৭৫ হাজার টাকা আয়ের জমি) 'হেবা-বেল-এওয়াজ' মুলে প্রদান করেন। সামান্য কিছু সম্পত্তি তিনি নিজের অধিকারে রাখেন।[১৬৪]

প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের পর নওয়াব আহসানুল্লাহ 'পূর্ব পুরুষদের সম্পত্তি চতুষ্টয়' এর মালিকদের কাছ থেকে ইজারা নেয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে লীজ বা পাট্টা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি ঐ সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের মালিক হন।[১৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ খাজা আলীমুল্লাহর কয়েকজন মহিলা উত্তরাধিকারী নওয়াব আহসানুল্লাহর বিরুদ্ধে ঢাকার সাব জজ কোর্টে পৃথকভাবে তিনটি মামলা দায়ের করেন।[১৬৬] এসব মামলায় তাঁরা পূর্ব পুরুষদের সম্পত্তি এতকাল ভোগ দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেন এবং মালিকানাস্বত্ব ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানান। উভয় পক্ষ থেকেই জোরে শোরে মামলা পরিচালনার পাশাপাশি আপোষ রফারও প্রচেষ্টা চলছিল। ১৯০১ খ্রীঃ ১৬ ডিসেম্বর নওয়াব আহসানুল্লাহ আকস্মাৎ মারা গেলে, জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে খাজা সলিমুল্লাহ নওয়াব উপাধিতে ভূষিত হন। এ্যাজমালি সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নির্বাচনের জন্য পূর্ববর্তী নওয়াবের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সবাই মিলে তাঁর মৃত্যুর পরদিন আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের দোতলায় এক সভা করেন। উক্ত সভায় কয়েকজন স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি ও ইংরেজ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্তসভায় সর্বসম্মতিক্রমে নওয়াব সলিমুল্লাহকে উপরোক্ত এ্যাজমালি সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নির্বাচিত করা হয়।[১৬৭] নওয়াব সলিমুল্লাহ পরিবারের অংশীদারদের সাথে একটি আপোষ রফা করলে তাঁরা ইতোপূর্বেকার মোকদ্দমাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।[১৬৮]

জনকল্যাণমূলক কাজ ও রাজনীতি করতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৫ দ্রঃ) বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। অন্যদিকে তিনি জমিদারী পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে জমিদারির আয় হ্রাস পায়। তিনি ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়েন। ১৯০৭ সালের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ মাড়োয়ারী ও হিন্দু মহাজনদের নিকট থেকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা ঋণ নিতে বাধ্য হন। ঐ ঋণ গ্রহণের জন্য এস্টেট থেকে তাঁর নিজস্ব অংশ ১৯০৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনায় দায়বদ্ধ করতে হয়। এরপর নওয়াব এস্টেটের অন্যান্য অংশীদারগণও জমিদারী পরিচালনায় অক্ষম হয়। ক্রমান্বয়ে তাঁদের অংশও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তৃত্বে দিতে হয়।[১৬৯]

১৬ জানুয়ারী ১৯১৫ খ্রীঃ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করার মাত্র সাত দিন আগে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা হাবিবুল্লাহকে পূর্বপুরুষদের এ্যাজমালি সম্পত্তি তথা ধনবিবি প্রপার্টির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে যান।[১৭০] নওয়াব হাবিবুল্লাহর (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং৬ দ্রঃ) এই মোতাওয়াল্লী নিযুক্তিকে নওয়াব সলিমুল্লাহর ছোট ভাই খাজা আতিকুল্লাহ (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৭ দ্রঃ) অগ্রাহ্য করেন। তিনি নিজেকে নির্বাচিত মোতাওয়াল্লী বলে দাবী করে ১৯ এপ্রিল ১৯১৫ খ্রীঃ এক মোকদ্দমা দায়ের করে। কিন্তু উক্ত মামলায় তিনি পরজিত হন।[১৭১] ১৯১৪ খ্রীঃ খাজা সুলেমান কাদর ও খাজা হুমায়ুন কাদর নামক দুই ভাই পরিবারের আরো অনেকের সমর্থন নিয়ে পূর্বপুরুষদের ওয়াকফকৃত এ্যাজমালি সম্পত্তির বিষয়ে ঢাকা ১ম সাব জজ কোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের করেন। এই মামলা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত যায়। ১৯২২ সালে প্রিভি কাউন্সিল রায় দেন যে, যদিও উক্ত ওয়াকফনামাগুলো অসিদ্ধ, কিন্তু ১৮৮১ সালে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি অবশ্য পালনীয় এবং সে অনুযায়ী বৃত্তি প্রদান অপরিহার্য।[১৭২] উক্ত রায়ের পর উক্ত কাদর ভ্রাতৃদ্বয় ১৯২২ খ্রীঃ বোর্ড অব রেভিনিউয়ের নিকট ভাতাদি পুনর্বহাল করার জন্য আবেদন করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ বোর্ডের সাথে আপোষ চুক্তির মাধ্যমে একটি বৃত্তির তালিকা ধার্য করা হয়। ১৯৫২ সালের জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত বৃত্তির তালিকা বলবৎ থাকে।[১৭৩] এভাবেই নওয়াব আবদুল গণি, আহসানুল্লাহ ও তাঁর বংশধরগণই মূলতঃ নওয়াব এস্টেটের উপর কর্তৃত্ব করেছেন এবং অন্যান্য শরীকেরা ভাতা পেয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। ১৯৫২ সালের ১৪ এপ্রিল ইষ্ট পাকিস্তান স্টেট এ্যাকুইজিশন এন্ড টেনান্সি এ্যাক্ট-এর আওতায় ঢাকা নওয়াব এস্টেট সরকার অধিগ্রহণ করেন এবং অংশীদারদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।[১৭৪]

১(৪) নওয়াবদের জমিদারী পরিচালনায় কর্মকর্তাগণঃ

এস্টেটের মোতাওয়াল্লী হিসেবে খাজা আলীমুল্লাহ এবং পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ নওয়াব আব্দুল গণি, নওয়াব আহসানুল্লাহ ও সলিমুল্লাহ নিজের একক হস্তে জমিদারী পরিচালনা করতেন। এস্টেট পরিচালনায় সাহায্যকারী হিসেবে ম্যানেজার, দেওয়ান, খাজাঞ্চী, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি এদেশে প্রচলিত পদ সমূহ নওয়াব এস্টেটের বেলায়ও ছিল। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের জমিদারী পরিচালনায় মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু কর্মচারী বেশি

Dhaka University Institutional Repository

রাখতেন বলে কোন কোন মুসলিম মহল তাঁদের সমালোচনা করেছেন।[১৭৫] কিন্তু কালের প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, মোগল নওয়াব মুর্শিদকুলী খানই প্রথম এদেশের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্য দেওয়ানী বিভাগে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।[১৭৬] অন্যদিকে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় মুসলমান কর্মচারীদের প্রধান্য ছিল। মুর্শিদকুলীর অনুসৃত এই নীতি ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত মোটামুটি অনুসরণ হওয়ায় এদেশীয় হিন্দুরা রাজস্ব বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সৃষ্ট এদেশীয় অন্যান্য জমিদারীর ন্যায় নওয়াব এস্টেট মূলতঃ ছিল রাজস্ব সংগ্রাহক একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান। তাই তাঁরাও জমিদারী পরিচালনায় স্বভাবতই হিন্দু কর্মচারী নিয়োগে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে ব্রিটিশ সম্রাজ্যাধীনে জমিদারী পরিচালনায় শাসক গোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক রাখার সুবিধার্থে তাঁরাও সব সময় দুই-একজন জাঁদরেল গোছের ইংরেজ সাহেবকে তাঁদের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করতেন।[১৭৭] বিভিন্ন সূত্র থেকে নওয়াব এস্টেটে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ যেসব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় নিম্নে তাঁদের বিবরণ দেয়া হলো। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের দুস্প্রাপ্যতার কারণে নওয়াব এস্টেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি আজো জানা সম্ভব হয়নি।

১(৪)(ক) কতিপয় হিন্দু কর্মচারীঃ

প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্য নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার পদে ইংরেজদের নিয়োগ করা হলেও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে দেওয়ান পদে সব সময় হিন্দুরাই নিযুক্ত হতেন। ১৮৭২ খ্রীঃ বাবু চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নওয়াব আব্দুল গণির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত দেওয়ানের সাথে চীফ এ্যাকাউটেন্ট হিসেবে বাবু সদাচরণ বন্দোপাধ্যায় দীর্ঘদিন যোগ্যতার সাথে চাকুরী করে নওয়াব এস্টেটের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। নওয়াবের নিযুক্ত আইনজ্ঞ (সলিসিটর) মিঃ. জি. এল. গার্থ চাকুরী ছেড়ে দিলে বাবু চন্দ্র কান্তকে মাসিক আড়াই শত টাকা বৃদ্ধি করে উক্ত কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। অবশেষে ১৯০২ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় এঁরা উভয়ই অবসর গ্রহণ করেন।[১৮০] বাবু চন্দ্রকান্ত গাংগুলীর অবসর গ্রহণের পর উক্ত এস্টেটের জামুর্কী কাচারীর সুপারিনটেন্ডেন্ট বাবু প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়কে মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে এ পদে নিযুক্ত করা হয়।[১৮১] ঢাকা নওয়াব এস্টেটের সর্বপ্রধান হিন্দু কর্মচারী ছিলেন মানিকগঞ্জ নিবাসী বাবু গোবিন্দ প্রসাদ দাস। নওয়াব আব্দুল গণি প্রথমে তাঁকে পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর বাল্যশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি নওয়াব এস্টেটের প্রধান কর্মচারীরূপে উন্নীত হন।[১৮২] তিনি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরও একজন সদস্য ছিলেন। নওয়াবের বরিশাল এলাকার সুপারিনটেন্ডেন্ট রেলী সাহেব মারা গেলে গোবিন্দ বাবুকে তথায় পাঠানো হয়। এজন্য তাঁর বেতন বাড়িয়ে ৬০০ টাকার স্থলে ৭০০ টাকা করা হয় এবং সেখানে তাঁর উপযুক্ত প্রাসাদ ও গাড়ীর ব্যবস্থাদি করা হয়।[১৮৩] শারিরীক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণ দেখিয়ে উক্ত বাবু গোবিন্দ প্রসাদ বরিশালে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে ঢাকায় ফেরত আনা হয় এবং তদস্থলে মিঃ উইদ্রল নামক একজন ইংরেজকে তাঁর সমপরিমাণ তথা ৭০০ টাকা বেতনে বরিশালে পাঠানো হয়।[১৮৪] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নওয়াব এস্টেটের সমুদয় কর্মচারীর ঐ আমলে একমাসের বেতন ছিল প্রায় ৪১ হাজার টাকা।[১৮৫] ১৯০১ খ্রীঃ মার্চ মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক মিঃ.জি.এল. গার্থকে এস্টেটের প্রধান (চীফ) ম্যানেজার নিযুক্ত করা হলে বাবু গোবিন্দ প্রসাদ অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেন। তিনি মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে ধানকোড়ার জমিদার হেমচন্দ্র রায়ের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন।[১৮৬] ১৯০৭ খ্রীঃ ৫ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে বাবু গোবিন্দ প্রসাদ দাস তাঁর আরমানিটোলাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।[১৮৭]

নওয়াব এস্টেটের কুমিল্লার এজেন্ট বাবু যোগেশ্বর চক্রবর্তী প্রশংসার সাথে কাজ করায় নওয়াব সলিমুল্লাহ তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন।[১৮৮] নওয়াব এস্টেটের খাজাঞ্চীরূপে বাবু প্রসন্নকুমার সেন বহুদিন কাজ করেন। তাঁর কাজে

Dhaka University Institutional Repository

সন্তুষ্ট হয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর মাসিক বেতন ২০ টাকা বাড়িয়ে দেন।[১৮৯] উপরোক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছাড়াও নওয়াব এস্টেটের সর্বত্র যে বিপুল পরিমাণ নায়েব, গোমস্তা, আরদালী নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু কর্মচারী। বরিশালের আয়লা কাচারীর নায়েব ছিলেন কেদারনাথ সেন।[১৯০] ঢাকার নওয়াবদের প্রায় সব কাচারীতেই নায়েব ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। টাংগাইলের জামুর্কী নামক স্থানে ঢাকার নওয়াবদের বড় ধরণের যে কাচারী ছিল সেটার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাবু প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সেখানে পেসকার ছিলেন বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত।[১৯০(ক)] সেখানে নায়েব এবং তহশীলদাররূপে যথাক্রমে জগৎচন্দ্র ঘটক ও সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুরতা দীর্ঘদিন চাকুরী করেছিলেন। এছাড়া জামুর্কীতে ঢাকার নওয়াবদের পরিচালিত যে বিখ্যাত হাসপাতালটি ছিল সেটারও দায়িত্বে ছিলেন একজন হিন্দু, ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ।[১৯০(খ)]

ঢাকার রেনেসাঁ পুরুষ বলে খ্যাত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বাবু দীননাথ সেন, আর্থিক সুবিধার কারণে কিছুদিন নওয়াব এস্টেটের আটিয়া পরগনার তত্ত্বধায়কের চাকুরী করেছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ দীননাথ সেন দুই শত টাকা বেতনে ঢাকা নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বেশী বেতনের কারণে সরকারী চাকুরী থেকে বিনা বেতনে এক বছরের ছুটি নিয়ে মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিনি নওয়াব এস্টেটের উক্ত চাকুরী করেছিলেন।[১৯১] এককথায় নওয়াব এস্টেটের বেশীর ভাগ কর্মচারীই ছিলেন হিন্দু। এছাড়া ঢাকার নওয়াব যেসব ব্যবসা বাণিজ্য করতেন সেগুলোরও প্রধান প্রধান কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। নওয়াব আব্দুল গণি স্থানীয় খ্যাতনামা ফার্মাসিষ্ট শ্রী কৈলাশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে ঢাকায় 'ভিক্টোরিয়া মেডিক্যাল হল' নামে একটি বৃহৎ ঔষধের ফার্মেসী চালু করেন। শ্রী নবকান্ত চট্টপাধ্যায় ঐ ফার্মেসীর ম্যানেজার ছিলেন। ঔষধালয়টি বহুদিন সাফল্যের সাথে ব্যবসা করে। ঢাকা প্রকাশের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় উক্ত ফার্মেসী এবং এর ঔষধের গুণাগুণ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হতো।[১৯২] বাবু শশাঙ্ক মোহন দাস গুপ্ত বহুদিন নওয়াব সলিমুল্লাহর পার্সোনাল এসিসট্যান্ট পদে চাকুরী করেন। এছাড়া মীর্জা ফকির মোহাম্মদ নামক নিজ পরিবারের একজন ব্যক্তি নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় থেকে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় পর্যন্ত নওয়াবের ব্যক্তিগত একান্ত সচিবের কাজ করতেন।[১৯৩]

১(৪)(খ) কতিপয় ইংরেজ কর্মচারীঃ

নওয়াব এস্টেটের বিভিন্ন পদে যেসব ইংরেজ কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নাম ও তাঁদের কাজের বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজ কর্মকর্তাগণ সবসময়ই দেশীয়দের তুলনায় অধিক বেতনে নিযুক্ত হতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ মিঃ. জি. এল. গার্থ নামক এক ইংরেজ সাহেবকে ১৮৮৬ খ্রীঃ আইনজ্ঞ নিযুক্ত করেন। ইনি কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্ব চীফ জাস্টিস স্যার রিচার্ড গার্থের পুত্র ছিলেন।[১৯৪] কলকাতা অথবা শিলং-এ শাসকবর্গের সমীপে ভ্রমনকালে ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের ইংরেজ কর্মচারীদের সংগে নিতেন। এছাড়া ব্রিটিশ ভারতের শাসনকর্তা তথা লর্ডদের কেউ ঢাকায় এলে নওয়াবের ঐসব কর্মচারীরা তাঁদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে নিয়োজিত হতেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড ডাফরিন নওয়াব আব্দুল গণিকে প্রদত্ত কে. সি. এস. আই. খেতাব পরানোর জন্য ঢাকায় আসেন। মিঃ জি. এল. গার্থের পরামর্শ ও সহায়তায় নওয়াব সাহেব তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।[১৯৫] ১৮৮৬ খ্রী ঃ ডিসেম্বরে নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ সপরিবারে কলকাতায় ভ্রমনে গেলে মিঃ গার্থ তাঁদের সংগী হন। তিনি কলকাতায় তাঁদের ভ্রমনের যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু নওয়াবের এই সব ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি তাঁর হিন্দু কর্মচারীগণ প্রসন্ন ছিলেন না। ঢাকা প্রকাশে মন্তব্য করা হয়, অনেক টাকায় নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারী গার্থ সাহেবের জন্য নওয়াবের কলকাতা ভ্রমনের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নওয়াব তাঁর হিন্দু কর্মচারী বাবু গোবিন্দ প্রসাদ বা চন্দ্রকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের ন্যায় বিচক্ষণদের উপর নির্ভর করলে এরূপ হতো না।[১৯৬] গার্থ সাহেব খুবই রাগী

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবের লোক ছিলেন। একবার তাঁর অপেক্ষায় ট্রেন স্থগিত না রাখার জন্য তিনি হাজিগঞ্জের ষ্টেশন মাস্টারকে প্রহার করেন।[১৯৭] নওয়াব গার্থ সাহেবকে মাসিক ৭০০ টাকা বেতন দেয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর এস্টেটের কাজ ছেড়ে দিতে মনস্থ করেন। নওয়াব তাঁকে হাজার টাকা বেতন দিতে চাইলেও তিনি রাজী হননি। গার্থ সাহেব নিজেই অনেকগুলি জমিদারীর কর্তৃত্ব লাভ করেন। মিঃ গার্থের স্থলে নওয়াব তাঁর দেওয়ান চন্দ্রকান্তের বেতন বৃদ্ধি করে তাঁকে কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন।[১৯৮] গার্থ সাহেব চাকুরী ছেড়ে দিলেও নওয়াব তাঁর পেনশন ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় বৃদ্ধি করে তাঁকে পরামর্শদাতা হিসেবে হাতে রাখেন।[১৯৯] ১৮৯১ খ্রীঃ ডিসেম্বরে নওয়াব আহসানুল্লাহ ও আব্দুল গণি কলকাতা ভ্রমনকালেও তিনি যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন।[২০০] জেমস হেনরি থমাস নামে জনৈক ইংরেজ সাহেব ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত নওয়াব আহসানুল্লাহর সেক্রেটারী হিসেবে চাকুরী করেছিলেন।[২০০(ক)] নওয়াব এস্টেটের ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে মিঃ. আর. ডি. লায়াল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন।[২০১] পরে তিনি ঢাকার কমিশনার ও চীফ সেক্রেটারী বোর্ডের মেম্বার হয়েছিলেন।[২০২] নওয়াব আহসানুল্লাহর অনুরোধে মাসে দুই হাজার টাকা বেতনে লায়াল সাহেব নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের পদ গ্রহণে সম্মত হন। তিনি ১৯০০ খ্রীঃ শেষের দিকে এজন্য বিলাত থেকে ঢাকায় আসেন। বিলাত থেকে আসার সময় তিনি নওয়াবের পাঠানো ৮ হাজার টাকায় কয়েকটি বিলাতী কুকুর ও অন্যান্য পোষাপ্রাণী তাঁর চিড়িয়াখানার জন্য নিয়ে আসেন।[২০৩] কলকাতার দি বেংগলী পত্রিকা মিঃ লায়ালের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে চীফ ম্যানেজার নিয়োগ করায় বিরূপ মন্তব্য করে। উক্ত পত্রিকা বলেছিল যে, নওয়াব সাহেব ঢাকাস্থ ইউরোপীয় নব্য জমিদারদের ভয়েই হয়তো তাঁকে নিয়োগ করেছেন। মন্তব্যটি সত্য ছিল না, কারণ ঢাকাস্থ ঐসব ইংরেজ ভূমধ্যধিকারীদের প্রায় সবাই নওয়াবেরই কর্মচারী ছিলেন। ওদিকে মিঃ লায়ালের পুত্র ও আত্মীয়রা যাঁরা এদেশে ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের আপত্তির কারণে মাত্র তিন মাস নওয়াব এস্টেটের চাকুরী করে লায়াল সাহেব তা ছেড়ে যান। ১৯০১ খ্রীঃ মার্চ মাসে মিঃ আর. ডি. লায়াল-এর চুক্তিভিত্তিক চাকুরীর মেয়াদ শেষ হলে মিঃ জি. এল. গার্থকে পুনরায় মাসিক ১৭৫০ টাকা বেতনে নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হয়।[২০৪] তাঁকে ওয়াইজ হাউসে (বর্তমান বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ভবন) থাকতে দেয়া হয়। গার্থ সাহেবকে চীফ ম্যানেজার করায় নওয়াব এস্টেটের অনেক দিনের পুরানো কর্মচারীরা অসন্তুষ্ট হন। এজন্য বাবু গোবিন্দ প্রসাদের পদত্যাগ করে অনত্র চাকুরীগ্রহণের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। গার্থ সাহেব চীফ ম্যানেজার হয়ে সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা এবং বিকেল ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করা শুরু করেন। নওয়াব সরকারের মোহাফেজখানা তিনি নিজের অধীনে আনেন। এতে দেওয়ান চন্দ্রকান্ত বাবু অসন্তুষ্ট হয়ে খাজাঞ্চীখানাও তাঁর অধীনে ছেড়ে দিতে চান।[২০৬] ১৯০২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহর শিলং ভ্রমনকালে চীফ ম্যানেজার হিসেবে মিঃ গার্থ তাঁর সংগে ছিলেন।[২০৭] চীফ ম্যানেজার মিঃ জি. এল. গার্থ ১৫জুন ১৯০৪ খ্রীঃ বিকেলে ঢাকা রেসকোর্সে পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং পরদিন প্রাতে মারা যান। তাঁর বড়ভাই কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার খবর পেয়ে ছুটে আসেন। তাঁকে যথোচিত মর্যাদায় স্থানীয় সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়।[২০৮] মিঃ গার্থের মত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নওয়াব এস্টেটের ম্যানেজার থাকায় নওয়াব সাহেব এবং সেই সাথে ব্রিটিশ সরকার এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে পূর্ববংগের এই সুবৃহৎ ও প্রধান জমিদারীতে পাছে কোন অমংগল সংঘটিত হয়, এই আশংকায় বংগের ছোট লাট স্যার এন্ড্রুফ্রেজার ১১ জুলাই ১৯০৪ খ্রীঃ ঢাকা সফরে আসেন। তিনি নওয়াব এবং স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকদের সাথে নানাবিধ শলাপরামর্শ করে যান।[২০৯] নওয়াব এস্টেটের আর একজন ইংরেজ অফিসার ছিলেন মিঃ উইদ্রল। তিনি পূর্বে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন।[২১০] নওয়াব এস্টেটের অন্যতম ম্যানেজার থাকা অবস্থায়ই তিনি নারায়নগঞ্জের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি ১৮৯১ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারও হন। নওয়াব এস্টেটের বরিশাল এলাকার সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন মিঃ রেলী নামক একজন ইংরেজ সাহেব। ১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যু হলে ঢাকা থেকে প্রধান কর্মচারী

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ প্রসাদ দাসকে বরিশালে প্রেরণ করা হয়।[২১১] আগেই উল্লেখিত হয়েছে ১৯০১ সালে গোবিন্দ বাবু বরিশালে থাকতে নারাজ হলে তাঁকে ঢাকায় ফেরত এনে তদস্থলে উইদ্রল সাহেবকে পাঠানো হয়। ঐ সময় তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৭০০ টাকা।[২১২] বরিশালের স্থানীয় পত্রিকা উইদ্রল সাহেব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় তিনি ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে তাঁদের শায়েস্তা করেন।[২১৩] ১৯০২ খ্রীঃ মিঃ উইদ্রল বরিশাল জেলের বেসরকারী পরিদর্শক হওয়ার গৌরব লাভ করেন।[২১৪] ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকের সাথে শকটারোহনকালে মিঃ উইদ্রল দুর্ঘটনায় পতিত হন।[২১৫] তিনি বহুদিন যাবত নওয়াব এস্টেটের কার্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে অবসর নেন।

ডব্লিউ. সি. এডওয়ার্ড নামক এক ইংরেজ সাহেব নওয়াব সালিমুল্লাহর প্রাইভেট সেক্রিটারী ছিলেন। নওয়াব সাহেব ত্রিপুরা অঞ্চলে তাঁর কাছারি সমূহ পরিভ্রমন শেষে ১৯০৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে প্রাইভেট সেক্রেটারী উক্ত এডওয়ার্ড সাহেব তাঁকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। এই জন্য ডিঙ্গি নৌকায় করে নওয়াবের ষ্টিমারে উঠতে গিয়ে তিনি হঠাৎ নদীতে পড়ে যান। জনৈক খালাসী তাঁকে উদ্ধার করেন।[২১৬] ১৮৮৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকায় যে বরফের কল স্থাপন করেন, সেটা প্রথম থেকেই ইংরেজ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো।[২১৭] ডাঃ এবার ক্রমবি নামক একজন ইংরেজ সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকার নওয়াবদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন।[২১৮]

নওয়াবের চীফ ম্যানেজার মিঃ জি. এল. গার্থ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ ডি. গার্থ সহঃ ম্যানেজাররূপে সাময়িকভাবে কাজ চালাতে থাকেন। নওয়াব সাহেব মিঃ জি. এল. গার্থের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে ঢাকার ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ লটমন জনসনের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। এই ঘটনা থেকে কলকাতার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, নওয়াব মিঃ জনসনকে তাঁর এস্টেটের চীফ ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন।[২১৯] অতঃপর ১৯০৫ খ্রীঃ মে মাসে কর্নেল মিঃ জে. হডিং নামক জনৈক ইংরেজ সাহেবকে নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়।[২২০] জে. হডিং সাহেবও ওয়াইজ হাউসে থাকতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর ছোট ভাই খাজা আতিকুল্লাহ ১৯০৬ খ্রীঃ তাঁর নিজ জমিদারী পরিচালনার জন্য কর্নেল লকহার্ট নামক এক ইংরেজ সাহেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।[২২১] ১৯০৭ - ৮ খ্রীঃ মিঃ এইচ. সি. এফ.মায়ার নওয়াব এস্টেটের বরিশালস্থ এজেন্ট ছিলেন এবং মথুরা নাথ দাস গুপ্ত তাঁর পার্সোনাল এসিসট্যান্ট ছিলেন।[২২২] মিঃ জে. হডিং নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার থাকা কালেই ঋণের দায়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর অংশের জমিদারী ১৯০৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন।

১(৪)(গ) কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে ঢাকা নওয়াব এস্টেট ঃ

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকারের বংগবিভাগের সমর্থনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ জমিদারী পরিচালনায় তেমন মনোযোগ দিতে পারেননি। তদুপরি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ব্যয় বহন করতে গিয়ে তিনি হিন্দু মহাজনদের কাছে বিপুল পরিমানে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। উক্ত ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে ন্যস্ত করেন। অতঃপর পরিবারের অন্যান্য অংশীদারগণ ক্রমে ক্রমে তাঁদের অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পরিচালনায় দিয়ে দেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে জমিদারী পরিচালনার ভার কার্যত জেলা কালেক্টরের উপর ন্যস্ত থাকতো। তবে ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে নওয়াব এস্টেট প্রত্যক্ষ পরিচালনার জন্য একজন চীফ ম্যানেজার নিযুক্ত হতেন। নওয়াবের বদলে চীফ ম্যানেজারই হতেন এস্টটের প্রধান ব্যবস্থাপক। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নওয়াব এস্টেট পরিচালনায় প্রথম চীফ ম্যানেজার ছিলেন মিঃ এইচ. সি. এফ. মায়ার। তাঁর পরবর্তী চীফ ম্যানেজার হলেন মিঃ এল. জি. পিনেল (আই. সি. এস.) অতঃপর মিঃ পি.জে. গ্রিফিথ এবং মিঃ ডি. পি. মার্টিন প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজগণ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।[২২৪] এই দায়িত্বে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ ইংরেজ ছিলেন মিঃ মার্টিন। দেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম মৌলভী মোহাঃ ইয়াহিয়া এবং তাঁরপর আঃ রহমান সন্যামত চীফ ম্যানেজার নিযুক্ত হন। জনাব সন্যামতের সময় ১৪ এপ্রিল ১৯৫২ খ্রীঃ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নওয়াব এস্টেট অধিগ্রহণ করা হয়।[২২৫]

উল্লেখ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পরিচালনা কালেও নওয়াব এস্টেটের আয় বাড়েনি এবং সরকারের উক্ত ঋণও তেমন পরিশোধিত হয়নি। কিন্তু এসময় আগের নিয়মেই খাজা পরিবারের অংশিদারেরা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট থেকে ভাতা পেতেন। তবে এ সময়েও নওয়াব সাহেব এস্টেট থেকে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মোতাওয়ালীর দায়িত্ব পালন করতেন । তিনি উক্ত সম্পত্তির আয় থেকে দান খয়রাত এবং জনকল্যাণ কাজ করতে পারতেন । এস্টেট অধিগ্রহণের পর কেবলমাত্র নওয়াব পরিবারের বসতবাড়ী ও বাগানবাড়ী গুলো এবং খাসজমিসমূহ এই অধিগ্রহণের বাইরে থাকে। অধিগ্রহণ বহির্ভূত নওয়াব পরিবারের সম্পত্তির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল আহসান মঞ্জিলের প্রাসাদ ভবনাদি ও তৎসংলগ্ন এলাকা। এছাড়া দিলখুশা, শাহবাগ ও বাইগুনবাড়ী এলাকায় তাঁদের প্রাসাদ ভবনাদি ও সংলগ্ন এলাকা ইত্যাদি। এছাড়াও কয়েকটি জেলায় বিস্তৃত ২২০০ একরের মত খাসজমি অধিগ্রহণ বহির্ভূত ছিল। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই ছিল পুকুর, ডোবা, হালট ইত্যাদি।[২২৬] নওয়াব এস্টেট অধিগ্রহণের পূর্বেই সরকার চীফ ম্যানেজারের নিকট ঐসব অধিগ্রহণ বহির্ভূত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মালিকদের মতামত জানতে চান।[২২৭] সংশ্লিষ্ট মালিকগণ অধিক শরীকদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগাভাগির আশংকায় জমিদারী উচ্ছেদের পরও খাসজমি, প্রাসাদ ভবনাদি ও তাতে সংরক্ষিত যাবতীয় দ্রব্যাদি সরকার তথা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনায় রাখার প্রস্তাব করেন।[২২৮] মালিকদের অভিপ্রায় বিবেচনা করে বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিনের হস্তক্ষেপের দরুণ প্রজাসত্ব বিলোপের পরও সরকার ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস এক্টের সাথে নতুন একটি ধারা সংযোজন করেন এবং এভাবে অধিগ্রহণ বহির্ভূত উক্ত বাড়ীঘর ও খাসজমিজমা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নতুন ব্যবস্থাপনায় রাখার পদক্ষেপ নেন। এক্ষেত্রে একজন নামমাত্র চীফ ম্যানেজার ও একজন সহকারী ম্যানেজার, একজন একাউন্ট্যান্ট, একজন তহশীলদার এবং কয়েকজন অফিস এ্যাসিসট্যান্ট সহকারে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট' - এই নামে টিকে থাকে। সরকারের রেভিনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। কিন্তু উক্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পর্যাপ্ত লোকবল, অর্থবল, শক্তি সামর্থ না থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নওয়াব এস্টেটের অধিকাংশ জমি জমা অচিরেই বেদখল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এখনো 'ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট' নামে একটি সেল রয়েছে। তারা নামে মাত্র এখনো অবশিষ্ট খাস ও ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশুনা করে থাকেন। ঢাকা শহর ও প্বার্শবর্তী অঞ্চলে ৫/৬টি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া এখন উক্ত ওয়াকফ এস্টেটের তেমন কোন জনকল্যাণ কাজ নেই।

এই অধ্যায়ে ঢাকার নওয়াবদের সুদূর কাশ্মীর থেকে আগমন, ঢাকায় তাঁদের বসতি স্থাপন, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং ব্যবসায় অর্জিত অর্থে জমিদারী ক্রয় ও তা পরিচালনার বিষদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাঁরা কাশ্মীর থেকে এসে বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁদের আদি ভূমি কাশ্মীরের সংগে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করে এদেশকে আপন করে নেন। তাঁরা বাংলাদেশেরই লোক হয়ে যান এবং বাঙালীদের জন্য তাঁদের অর্জিত ধন সম্পদ জনকল্যাণমূলক কাজে নির্দ্বিধায় ব্যয় করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এবং জনকল্যাণমূলক কাজের ফলে বাঙালীদের বিশেষ করে ঢাকাবাসীর যথেষ্ট উপকার হয়। ব্যবসায় এবং জমিদারী পরিচালনায় এই পরিবারের অসাধারণ দক্ষতা তাঁদেরকে শৌর্য্যবীর্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। ব্যবসা এবং জমিদারী থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জিত না হলে জনকল্যাণমূলক কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের জনকল্যাণমূলক কাজের মূলই ছিল আর্থিক সংগতি, যা'তাঁরা কঠোর নিষ্ঠা ও মেধার বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন। এজন্য এখানে তাঁদের ব্যবসা, জমিদারী ক্রয় ও বিস্তার এবং তা পরিচালনার জটিল ইতিহাস কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিশাল জমিদারী পরিচালনার জন্য প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন নওয়াব নিজে। তাঁর দৈনন্দিন কাজের সাহায্যার্থে উচ্চহারে বেতন দিয়ে তিনি ইংরেজ ও দেশীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এই জমিদারী তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে করা দুঃসাধ্য হতো। কাজেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকাও কিছুটা আলোচিত হলো।

১(৫) ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক, প্রতিপত্তি লাভ ও নওয়াব উপাধি অর্জন ঃ

যে কোন প্রতিষ্ঠিত বংশের উত্থানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, দেশের স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের সাথে তাঁদের একটা সুসম্পর্ক ছিল। ঢাকার নওয়াব বংশটিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঢাকায় এঁদের প্রতিষ্ঠালাভের কাল ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে পুরো উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপৃত। ঐ সময় ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য ও প্রশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ব্রিটিশরা ছিল এদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী, চাকুরী সব ক্ষেত্রে ইংরেজরা ছিল সর্বোচ্চ স্থানে।

ভারতীয়দের সাথে ব্রিটিশদের সম্পর্ক ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং তা থেকে উদ্ভূত শত্রুতা। আরেকটি সম্পর্ক ছিল সহযোগিতা। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপন এবং একে স্থায়ীকরণের জন্য কিছু ভারতীয় ব্রিটিশের সহযোগিতা করে। তাঁরা ব্রিটিশ কর্তৃক পুরস্কৃত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রগামী ছিল। ঢাকার নওয়াব পরিবারের কর্মকান্ড শেষোক্ত দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

খাজা পরিবারে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রথম সফলতা অর্জনকারী খাজা আব্দুল ওহাব, কাশ্মীর, পাটনা ও তিব্বতের লাসা অঞ্চলের সাথে ব্যবসা করতেন। তিনি কোন ইউরোপীয় বণিকের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। খাজা পরিবারের দ্বিতীয় প্রধান এবং জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা খাজা হাফিজুল্লাহ আর্মেনীয়দের সাথে অংশীদারিত্বে ব্যবসা করতেন। তাঁর সাথে ইংরেজদের সম্পর্কের বিষয়েও তেমন কিছু জানা যায় না। তবে জমিদারী ক্রয় ও তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে খাজা হাফিজুল্লাহর পক্ষে ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই স্বাভাবিক ছিল।

ইংরেজ সাহেবদের সাথে খাজা পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে খাজা আলীমুল্লাহর সময়। তাঁর আমলে ভারতীয় মুসলমানগণ সাধারণভাবে ইংরেজ বিরোধী ছিলেন। খাজা আলীমুল্লাহ ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতা করার নীতিকে কল্যাণকর ভাবেননি। কারণ শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করে তখনকার পরিস্থিতিতে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব ছিলনা। ব্যবসা এবং জমিদারী উন্নয়নের জন্য ইংরেজদের সংগে সদ্ভাব রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। এই উপলব্ধি থেকে খাজা আলীমুল্লাহ নিজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যতটা সম্ভব ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার পথ বেছে নেন। অবাধে মেলামেশা করে তিনি ইংরেজ সরকারী ও বেসরকারী আমলাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।[২২৯] ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সহায়তায় খাজা আলীমুল্লাহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কাঁচা চামড়া ক্রয় করে সেগুলো কলকাতা বন্দর দিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠাতেন।[২৩০]

খাজা আলীমুল্লাহ ইউরোপীয়দের অনুকরণে খাদ্যাভাস ও আচরণবিধি পরিবর্তন করেন। তিনি ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করেন। নিজে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ব করেন এবং পরিবারের লোকদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২৩১] তিনি ব্রিটিশদের অনুকরণে ঢাকায় ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেন।[২৩২] ঘোড়দৌড়ের সময় খাজা আলীমুল্লাহ ইংরেজদেরকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করতেন। সেখানে বল নাচ এবং সুরার ব্যবস্থাও থাকতো। ঘোড়দৌড়ে প্রতিযোগিদের জন্য তিনি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করতেন।[২৩৩] ১৮৪৫ খ্রীঃ ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণকারী জকিও ইংরেজ সাহেবদের সাথে খাজা আলীমুল্লাহ ও তাঁর পুত্র আব্দুল গনির একটি দুস্প্রাপ্য চিত্র পাওয়া গেছে। জলরঙে আঁকা চিত্রটিতে শিল্পী ফিগার ও পরিপ্রেক্ষিত অংকনে

Dhaka University Institutional Repository

কুশলতার পরিচয় দিতে পারেননি। ঐ চিত্রে দেখা যায় খাজা আলীমুল্লাহ ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যে পোষাক পরেছেন। পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৮- তে উক্ত চিত্রটির একটি অনুকৃতি দেয়া হলো।[২৩৪] চিত্রটি ইংরেজদের সাথে খাজা আলীমুল্লাহর সৌহার্দ সম্প্রীতির স্বাক্ষর বহন করে।

ইংরেজ ও স্থানীয় জমিদারগণ মিলে ১৮৪৬ সালে ঢাকায় প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক স্থাপন করেন। খাজা আলীমুল্লাহ এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ঐ ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলীর একজন ছিলেন।[২৩৫] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৪০ খ্রীঃ গঠিত ঢাকার প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। উক্ত কমিটিতে ১৮ জন সদস্য ছিল। তাঁদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন ইংরেজ, ৫ জন হিন্দু, ৪ জন মুসলমান এবং ২ জন আর্মেনীয়।[২৩৬] খাজা পরিবারে আলীমুল্লাহই প্রথম বিভিন্ন পাশ্চাত্য খেলাধূলার প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে এই পরিবারে পাশ্চাত্য খেলাধুলা ব্যাপকভাবে চর্চা হতো। তিনি শিকারের জন্য উন্নত জাতের হাতী ঘোড়া সংগ্রহ করেন। তাঁর সাথে শিকারে যাওয়ার জন্য তিনি ইংরেজদেরকেও আমন্ত্রণ জানাতেন।[২৩৭] খাজা আলীমুল্লাহ ইউরোপীয়দের অনুকরণে বসবাসের জন্য ফরাসী বণিকদের কাছ থেকে কুমারটুলির কুঠিটি ক্রয় করে তা প্রাসাদে পরিণত করেন। এই প্রাসাদের অংগসজ্জা এবং আসবাবপত্র ইউরোপীয় রীতিতে করা হয়।

খাজা আলীমুল্লাহর পুত্র খাজা আব্দুল গণির সময় ইংরেজদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। ইংরেজ শাসনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান, ব্রিটিশ আমলা ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে সৌহার্দ স্থাপন, আধুনিক ও ইংরেজী শিক্ষার মর্মানুধাবন প্রভৃতি কারণে তিনি ইংরেজদের কাছে প্রশংসিত হন।[২৩৮] খাজা আব্দুল গণি শৈশবে স্বগৃহে আরবী-ফার্সী শিক্ষা করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ১৮৩৫ সালে তাঁকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়।[২৩৯] তিনি অবাধে ইংরেজী পড়তে, লিখতে এবং বলতে পারতেন।[২৪০] ১৮৫৪ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পর আব্দুল গণি জমিদারীর কার্যভার পুরোপুরি গ্রহণ করেন। এর মাত্র তিন বছর পর ভারতে যুগান্তকারী সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু খাজা আব্দুল গণির সহায়তায় ইংরেজরা ঢাকার পরিস্থিতি আয়ত্বে রাখতে সক্ষম হয়।

ঢাকায় দুটি কোম্পানীতে ১০৬০ জন দেশীয় সৈন্য ছিল।[২৪১] মে মাসে মীরাটের বিদ্রোহের সংবাদ ঢাকায় আসার পর ঢাকার সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। জুনমাসে একটি গুজব ওঠে যে, ব্যারাকপুর ও জলপাইগুড়ির বিদ্রোহী সিপাহীদের কিছু ঢাকায় এসে লালবাগের সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়েছে। এ গুজব পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। ঢাকার ইউরোপীয়গণ শংকিত হয়ে পড়েন। আতঙ্কিত ইউরোপীয়গণ জেলা প্রশাসক জেনিংসন-এর বাসভবনে সমবেত হন। তাঁদের কিছু মহিলা বুড়িগংগা নদীতে নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত ঢাকা নগরী আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।[২৪২] গুজবটি পরে নিছক রটনা বলে পরিগণিত হয়। তবে তৎকালীন ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানীর দেশীয় সৈন্যগণ যে ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিল এবং বিদ্রোহের মনোভাব পোষণ করতো, তা সমসাময়িক লেখকগণ উল্লেখ করেছেন।[২৪৩] ঐ সময় ঢাকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে আব্দুল গণি তাঁর পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন।[২৪৪]

বেংগল টাইমস ও ঢাকা প্রকাশে দেয়া তথ্যানুযায়ী জানা যায়, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকার সিপাহীগণ আব্দুল গণিকে বাংলার রাজত্ব প্রদানের প্রলোভন দিয়েছিল এবং তাঁকে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানিয়েছিল। আব্দুল গণি সিপাহীদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সিপাহীদের এই ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দেন।[২৪৫] যথাসময়ে ঢাকার এসব বিদ্রোহ ভাবাপন্ন সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে না পারলে এবং তাঁদের সংগে আব্দুল গণির সহযোগিতা সংযোজিত হলে, ঢাকায় নিশ্চিতভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতো। হয়তো স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ঢাকায় ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটতো। কিন্তু ঢাকাবাসী ও আব্দুল গণির জন্য এর ফল হতো মারাত্মক। কারণ, সিপাহী বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং বিদ্রোহের স্থান সমূহে রক্তগংগা বয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের সময় ঢাকার সিপাইরা

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল গণিকে প্রকাশ্যে নানারূপ হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু তিনি ভীত না হয়ে খোদার উপর ভরসা রেখে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন।[২৪৬]

১৮৫৭ সালের আগষ্ট মাসে দেড়শো ব্রিটিশ নৌসেনা ঢাকা পৌঁছলে সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। ওদিকে ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁদের ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার সংবাদ কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে। ইংরেজরা গোপনে সভা করে ঢাকার সব দেশীয় সিপাহীদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২২ নভেম্বর প্রত্যুষে প্রথমে ঢাকার কোষাগার রক্ষিদের নিরস্ত্র করা হয়। কিন্তু লালবাগের সিপাহীরা অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজী হয়নি। ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও সিপাহীদের মধ্যে আধঘন্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সিপাহীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে সিপাহীদের ৩১ জন নিহত হয় এবং ইরেজদের ৫ জন নিহত ও ১৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।[২৪৭]

সিপাহীদের পলায়নের পরপরই এক সংক্ষিপ্ত কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিচার সম্পন্ন করা হয়। মোট ১১ জন সিপাহীকে নির্মমভাবে ফাঁসী দেয়া হয় এবং অনেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ঢাকার তথাকথিত বিদ্রোহী সিপাহীদের লঘু পাপে গুরুদন্ড দেয়া হয়েছিল।[২৪৮] সিপাহীদের বিচারের সময় খাজা আব্দুল গণি তাঁদের দন্ড কমানোর চেষ্টা করেন।[২৪৯] এছাড়া জনগণের দুর্ভোগ কমানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার যে ঋণ তহবিল খুলেছিল তাতেও তিনি বিপুল অংকের চাঁদা দেন।[২৫০] সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর ঢাকায় ইংরেজ সমাজে আনন্দ উৎসব বেড়ে যায়। খাজা আব্দুল গণি এই আনন্দ উৎসবে ইংরেজদের সাথে শরীক হন। ব্রেনান্ডের ডাইরী থেকে জানা যায়, তখন বর্ষাকাল হওয়া সত্ত্বেও ঢাকায় একমাসে ছয়টি বল নাচ পার্টির আয়োজন হয়েছিল। এর মধ্যে একটি পার্টি হয়েছিল খাজা আব্দুল গণির গৃহে।[২৫১]

সিপাহী যুদ্ধে আব্দুল গণির দ্ব্যর্থহীনভাবে ইংরেজপক্ষ সমর্থনকে নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু তৎকালীন উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সিপাহীদের সেই বিদ্রোহ ছিল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অসংগঠিত বিপ্লব। দেশের নিরক্ষর জনগণ কোম্পানীর সরকার ও সিপাহীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে নিজেদেরকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল।[২৫২] অন্যদিকে বাংলার বণিক শ্রেণী তাঁদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থে ইংরেজদের সহায়তা করেছিল। কারণ দেশের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা না থাকলে তাঁদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতো। চট্টগ্রামের মাগনদাস রায়, সিলেটের রামকৃষ্ণ মজুমদার, কুমিল্লার আব্দুল্লাহ খান প্রমুখ উঠতি ব্যবসায়ী ইংরেজদের রসদ ও পরিবহণ সংগ্রহে সহায়তা করে।[২৫৩] জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী সিপাহীদের বিরোধিতা করেছিল। তাঁরা ছিল সরকারী কর্মচারী কিংবা ভূস্বামীদের অধীনে কর্মরত। তাঁদের মধ্যে ঢাকা কালেক্টরেটের নাজির জগবন্ধু সেন, আগা গোলাম হোসেন খান, মোঃ আব্দুল আলী এবং নোয়াখালীর যশোধা কুমারের নাম উল্লেখযোগ্য। সিপাহীদের গতিবিধির সংবাদ প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে এরা সরকারকে সহায়তা করেন।[২৫৪] হৃদয়নাথ লিখেছেন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যালয়ের অনেক হিন্দু কর্মচারী ইংরেজ সেনাদের সহযোগিতা করে। তাঁদের বেশ কয়েকজনকে সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রও দেয়া হয়।[২৫৫] ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে এদেশের ভূস্বামীগণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে কোম্পানী ও ভূস্বামীদের স্বার্থ ছিল একে অপরের পরিপূরক। ভূস্বামীগণ মনে করতেন যে, কোম্পানীর শাসনের অবসান হলে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।[২৫৬] খাজা আব্দুল গণি ছাড়াও এ অঞ্চলের যেসব ভূস্বামী ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন তাঁরা হলেন, ভাওয়ালের রাজা কালী নারায়ণ রায়, চট্টগ্রামের কালিন্দী রানী, যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায়, রংপুরের রানী স্বর্ণময়ী, পাবনার বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, সৈয়দ আমীর আলী, গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, খোদা বক্স শাহ ও ইয়াসিন শাহ ফকির প্রমুখ।[২৫৭]

আলোচ্য সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সিপাহী বিদ্রোহের যে পরিণতি হয়েছিল, তার আলোকে বিচার করলে আব্দুল গণির ভূমিকাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। সে বছর মার্চ মাসে ব্যারাকপুরে সিপাহী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মে মাসে

Dhaka University Institutional Repository

মীরাটের সিপাহীরা সেই বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে। তাঁরা অগ্রসর হয়ে দিল্লীর বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে মিলিত হন এবং মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সুসংগঠিত ইংরেজ সেনাদের পাল্টা আক্রমণে দিল্লীর পতন ঘটে। সম্রাট বাহাদুর শাহকে বন্দী ও তাঁর সহযোগিদের শায়েস্তা করা হয়। এর সাথে উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহগুলোও দ্রুতগতিতে দমন হতে থাকে। এদিকে ঢাকার লালবাগ কেল্লায় সিপাহীদের সাথে ইংরেজ সেনাদের যে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হয়, তা ছিল নভেম্বরের ২২ তারিখে। অর্থাৎ বিপ্লব সূত্রপাতের ৭/৮ মাস পরে। এমনকি দিল্লীর পতনেরও প্রায় ২ মাস পরে। এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, ঝাঁসী, পাটনা, রোহিলাখন্ড, অযোধ্যার মত স্থানে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী দেশীয় বাহিনীগুলো ব্রিটিশদের সামনে টিকতে পারেনি। তাই আব্দুল গণি হয়তো ভেবেছিলেন, বিদ্রোহের শেষ স্তরে ঢাকার অল্প সংখ্যক সিপাহীর প্রতিরোধ ব্রিটিশদের বিশাল শক্তির সামনে টিকতে পারবে না। তাই সিপাহীদের কথায় ভুলে ব্রিটিশদের বিরোধিতার কোন মানেই হয়না।[২৫৮]

ইংরেজ সরকার নওয়াব আব্দুল গণির এই উপকারের যথাযোগ্য প্রতিদান দিতে কুণ্ঠিত হননি। পরবর্তীকালে সরকারী কাজকর্মে খাজা আব্দুল গণির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৯ খ্রীঃ হোসেনী দালানের তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে খাজা আব্দুর রহিম ও মীর মুহাম্মদকে খাজা আব্দুল গণির সুপারিশেই নিযুক্ত করা হয়।[২৫৯] আব্দুল গণির রাজানুগত্য ও জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৬১ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন।[২৬০] তখন থেকে আব্দুল গণির দরবারের শালিশী রায়কে সরকারী আদালতের রায়ের সমান মর্যাদা দেয়া হতো। বৈষয়িক জ্ঞানে বুৎপন্নতার কারণে বিবাদ মীমাংসা ও শালিশীর কাজে আব্দুল গণি এতই দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, অনেক লোক সরকারী আদালতে যাওয়ার চেয়ে তাঁর শালিশীকেই বেশী গুরুত্ব দিত এবং বিচারের আশায় তাঁর দরবারে ভিড় জমাতো।[২৬১]

১৮৬৬ খ্রীঃ লেঃ গভর্ণর স্যার সেলিস বিডনের সময় খাজা আব্দুল গণি বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ বড়লাট আইন পরিষদে অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত হয়।[২৬২] ১৮৬৯ খ্রীঃ ঢাকা শহরে এক মারাত্মক শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিলে সরকার খাজা আব্দুল গণির হস্তক্ষেপ কামনা করে। তখন আব্দুল গণি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে শালিশীর মাধ্যমে সেটার মীমাংসা করেন। একাজে তাঁকে চারদিন ধরে বিশ হাজার লোককে নিজ খরচে ভোজ দিতে হয়েছিল।[২৬৩]

রাজানুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ খাজা আব্দুল গণিকে ১৮৭১ খ্রীঃ সি.এস.আই.*(কোম্পানিয়ন অব দি অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া)* খেতাবে ভূষিত করা হয়।[২৬৪] ১৮৭১ খ্রীঃ ১৫ ডিসেম্বর আহসান মঞ্জিলে এক অনুষ্ঠানে খাজা আব্দুল গণিকে উক্ত খেতাব প্রদানের দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ওয়েলসের যুবরাজের গুরুতর পীড়ার কারণে তা স্থগিত রাখা হয়। পরে এক তারবার্তায় জানা যায় যুবরাজ বিপদমুক্ত। তিনদিন পর ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ এফ.বি. সিম্পসন কর্তৃক খাজা আব্দুল গণিকে রাজকীয় পত্র প্রদান এবং ব্যাজ পরানোর কাজ সম্পাদিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সরকারের উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক অফিসার, ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ ছাড়াও ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[২৬৫] ওয়েলসের যুবরাজের উপরোক্ত রোগমুক্তির খবর শুনে খাজা আব্দুল গণি ঢাকার জনসাধারণের উপকারার্থে কোন স্থায়ী কাজ করতে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে উক্ত টাকা দিয়ে ঢাকা শহরে পানীয় জলের কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত জলের কল স্থাপনে বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনে তিনি তাঁর দান আড়াই লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছিলেন।[২৬৬] উক্ত জলের কল স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক, বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলকে নিয়ে ১৮৭৪ খ্রীঃ ৫ আগস্ট ঢাকায় আগমণ করেন। তিনি ৬ আগষ্ট বিকেলে উক্ত জলের কলের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সন্ধ্যায় আব্দুল গণির বাড়ী আহসান মঞ্জিলে এক সান্ধ্য সম্মেলনে যোগ দেন।[২৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ সরকার অবশেষে খাজা আব্দুল গণিকে ১৮৭৫ খ্রীঃ নওয়াব উপাধি দিয়ে এবং একইসাথে তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে খান বাহাদুর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁদের উভয়কে খেলাত প্রদান উপলক্ষে ১৮৭৫ খ্রীঃ ২১ জুলাই, রবিবার বংগের লেঃ গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল ঢাকায় আসেন। তদুপলক্ষে ঐ দিন বিকেল ৫ টায় লেঃ গভর্নরের রোটাস নামক জাহাজে স্থানীয় জমিদার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজ কর্মচারীদের এক আড়ম্বরপূর্ণ সভা হয়। উক্ত সভায় তাঁদের উভয়কে কারুকার্য খচিত চোগা, পায়জামা, কোমরবন্ধ, পাগড়ী ও মুক্তাহার খেলাত স্বরূপ দেয়া হয়। এছাড়া নওয়াব সাহেবকে ঢাল এবং তরবারিও দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে লেঃ গভর্নর তাঁদের গুণকীর্তন করে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। লেঃ গভর্নরকে নওয়াব আব্দুল গণি দু'হাজার টাকা এবং খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ সাড়ে আট'শ টাকা নজরানা দেন।[২৬৮] তখন থেকে 'গণি মিয়া' নামে পরিচিত লোকটি নওয়াব আব্দুল গণি নামে খ্যাতি লাভ করেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ ওয়েলসের যুবরাজ (পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) -এর কলকাতা আগমণ উপলক্ষে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক নওয়াব আব্দুল গণি ও তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ নিমন্ত্রিত হন। তাঁরা মূল্যবান দ্রব্য ও বস্ত্র উপহার নিয়ে বিশেষ রেলওয়ে ষ্টীমার ভাড়া করে কলকাতায় পৌছেন।[২৬৯] ২৩ ডিসেম্বর যুবরাজ যখন নৌযান থেকে অবতরণ করেন, তখন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে নওয়াব আব্দুল গণিও প্লাটফরমে উপস্থিত ছিলেন।[২৭০] এছাড়া ঐ সময় জাহাজঘাটে নওয়াব আব্দুল গণির বাদ্যকরেরাও বাদ্য বাজিয়ে ছিলেন।[২৭১] যুবরাজের দরবারে নওয়াব আব্দুল গণিকে দেশীয় শাসন কর্তাদের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছিল।[২৭২]

যুবরাজের দরবারে গিয়ে আব্দুল গণি তাঁর নামে নির্ধারিত চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। কিন্তু তাঁবুর ফাঁক দিয়ে সেখানে সূর্যরশ্মি পড়ায় তিনি গরমে অস্থির বোধ করেছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে প্রথম সারিতে বসালেন। ঐ প্রথম সারিতে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, দেশীয় রাজা-মহারাজা এবং নওয়াবগণ উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে তখন নয়জনের পরেই হলো তাঁর আসন।

যুবরাজ দরবারে পৌছলে লর্ড নর্থব্রুক একে একে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। নওয়াব আব্দুল গণির সাথে পরিচয় করে দেয়ার সময় বড়লাট সাহেব নওয়াব কর্তৃক ১৮৭১ খ্রীঃ যুবরাজের রোগমুক্তির জন্য মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় প্রার্থনা আয়োজনের কথাটি জ্ঞাত করেন। এছাড়া যুবরাজের আরোগ্যের সংবাদে খুশী হয়ে তিনি যে, নিজ ব্যয়ে ঢাকা শহরে পানীয় জলের কল স্থাপন করেছেন সেটাও উল্লেখ করেন। যুবরাজ নওয়াব আব্দুল গণির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তিনি কখনো ভুলবেন না বলে জানান। এছাড়াও তিনি আব্দুল গণির সামনে মাথা নত করে সম্মান দেখান।[২৭৩] ঐ সফরকালে নওয়াব আব্দুল গণি গভর্ণর হাউসে ওয়েলসের যুবরাজের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বহু মূল্যবান উপহারাদি প্রদান করেন।[২৭৪] এই উপলক্ষে নওয়াব আব্দুল গণি স্পেশাল অর্ডার দিয়ে ঢাকার ইতিহাসখ্যাত মসলিন বস্ত্র তৈরী করিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার কারুশিল্পীদের তৈরী স্বর্ণ রৌপ্যের ফিলিগ্রী সামগ্রী এবং অনুরূপ ধাতব নির্মিত দুটো হাতীর বাচ্চা উপহারস্বরূপ সংগে নিয়েছিলেন।[২৭৫] যুবরাজও আব্দুল গণিকে উপহারাদি দেন এবং ঐ রাজকীয় সফরের স্মৃতি স্বরূপ তাঁকে একটি মেডেল প্রদান করেন।[২৭৬] উক্ত ভ্রমণকালে খাজা আহসানুল্লাহর সাথে গভর্ণর জেনারেল এক স্বাক্ষাৎকার দেন। তাঁরা প্রায় আধঘন্টা ধরে পূর্ব বাংলার জমিদার ও রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ আলাপ করেন।[২৭৭] ঐ সফরকালে ওয়েলসের যুবরাজকে কলকাতায় যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখানো হয়, তাতে ঢাকার নওয়াবের অশ্বও অংশ নেয়। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৫ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড়ের প্রথম বাজীতে খাজা আহসানুল্লাহ এক হাজার টাকা প্রদান করেন। তৃতীয় বার গভর্ণর জেনারেলের প্রদত্ত এক হাজার টাকার বাজিটি খাজা আহসানুল্লাহর 'দরিয়াবাজ' নামক অশ্বটি জিতে নেয়।[২৭৮] যুবরাজের হাত থেকে নওয়াব আব্দুল গণি এই বাজী জেতার জন্য পুরস্কার ট্রফি গ্রহণ করেন।[২৭৯]

১৮৭৬ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নওয়াব আব্দুল গণিকে সাতজন তুরুক সওয়ার (সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈনিক) পাঠানো হয়।[২৮০] সুসজ্জিত অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করার এই সরকারী (রাজকীয়) সম্মান তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

আভিজাত্যের উচ্চ শিখরে উন্নীত করে। ১৮৭৭ খ্রীঃ ১ জানুয়ারী রানী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি বরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দিল্লীর দরবারে খাজা আব্দুল গণির 'নওয়াব' খেতাবটিকে বংশগত করা হয়। তখন থেকে খাজা পরিবারের প্রত্যেক প্রধানের অবর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে 'নওয়াব' খেতাব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[২৮১]

১৮৮৬ খ্রীঃ মহারানীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নওয়াব আব্দুল গণিকে কে.সি.এস.আই. (*নাইট কমান্ডার অব দি অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইন্ডিয়া*) অর্থাৎ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২৮২] ঐ বছর ডিসেম্বরে নওয়াব আব্দুল গণি কলকাতা সফরে গিয়ে জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত অবস্থান করেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন বংগের প্রাচীন রাজধানী ঢাকায় এসে তাঁকে উপাধির খেলাত প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নওয়াব আব্দুল গণি সেবার ঢাকায় ফিরে আসলে ঢাকার জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেয়।[২৮৩]

নওয়াব আব্দুল গণিকে নাইট উপাধির খেলাত পরানোর জন্য ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন ১৮৮৮ খ্রীঃ ২৬ নভেম্বর ঢাকায় আসেন। তাঁর আগমণ উপলক্ষ্যে ঢাকায় সাড়া পড়ে যায়। নওয়াব আব্দুল গণি তাঁকে সাড়ম্বরে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য যাবতীয় আয়োজন করেন। সুরমা উপত্যকা থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়সওয়ার এনে নওয়াব সাহেব তাদেরকে ভাইসরয়ের বিশেষ প্রহরী হিসেবে নিয়োগ করেন।[২৮৪] বড়লাট ঢাকা রেলষ্টেশনে পৌঁছলে ঢাকার কমিশনার ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ সাহেবদের সাথে নওয়াব আব্দুল গণি এবং আহসানুল্লাহ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। বড়লাট ষ্টেশনে নেমে নওয়াব আব্দুল গণিকে তাঁর নিজের পাশে গাড়ীতে বসিয়ে সদরঘাটের সভাস্থলে যান এবং সভামঞ্চে তাঁকে পাশে বসিয়ে সম্মানিত করেন।[২৮৫] ১৮৮৮ খ্রীঃ ২৭ নভেম্বর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নওয়াব আব্দুল গণিকে বড়লাট লর্ড ডাফরিন কে.সি.এস.আই. খেলাত পরিয়ে সম্মানিত করেন।[২৮৬] বড়লাটের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর শাহবাগ উদ্যানে ব্যাপক আয়োজন করেন।[২৮৭] তাঁর আপ্যায়নের জন্য নওয়াব সাহেব কলকাতার উইলসন হোটেল থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে ৭ হাজার টাকার খাবার আনেন।[২৮৮] পুরানো পল্টনের মাঠে বড়লাটকে মনিপুরী পোলো খেলা দেখানোর আয়োজন করা হয়।[২৮৯] নওয়াব ও ঢাকার ইংরেজ সাহেবরা বড়লাটের সম্মানে কয়েকটি বলনাচ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ১ জানুয়ারী নববর্ষ উপলক্ষ্যে নওয়াব আব্দুল গণি এবং আহসানুল্লাহকে ব্রিটিশ সরকার 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে খাজা আব্দুল গণি যদিও কেবলমাত্র নওয়াব উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে নওয়াব বাহাদুর বলেই সম্বোধন করতেন।[২৯০]

পিতা খাজা আলীমুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৪৮ খ্রীঃ থেকেই ইংরেজ সাহেবদের সাথে ঘোড়দৌড় বাজী খেলা শুরু করেন। তাঁর পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় পর্যন্ত ঘোড়দৌড় উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকায় আগত ইংরেজ সাহেব বিবিদের নিয়ে তাঁরা নানা আমোদ-প্রমোদ ও বল নাচের আয়োজন করতেন।[২৯১] ইংরেজ সাহেবদের সাথে অনেক সময় নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর হাতিঘোড়া নিয়ে শিকারে বের হতেন। বরাহ শিকারে তিনি সহগামী ইংরেজ সাহেবদের চেয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতেন।[২৯২] ঢাকার অদূরে বাইগুনবাড়ীতে শিকারের জন্য নওয়াবদের সংরক্ষিত বনভূমি ছিল। সেখানে শিকারের জন্য বিশেষ মাচান প্রভৃতি সবসময় প্রস্তুত করে রাখা হতো। উচ্চপদস্থ কোন ইংরেজ সাহেব ঢাকায় এলে নওয়াব সাহেব তাঁর জন্যে সেখানে শিকারের সুব্যবস্থা করতেন।[২৯৩] ঢাকার উচ্চ পদস্থ ইংরেজ অফিসারেরা অনেক সময় শিকার কালে নওয়াবের হাতিঘোড়ার সাহায্য নিতেন।[২৯৪]

নওয়াব আব্দুল গণি ইংরেজী শিক্ষা পছন্দ করলেও ইংরেজদের চালচলন ও বেশভূষা অবলম্বন করতেন না। তিনি পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার ও আনন্দ উৎসবে প্রাচ্য রীতিনীতি বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। ইংরেজদের সাথে আব্দুল গণির ঘনিষ্ঠতা থাকলেও তিনি তাঁদের তেমন পরোয়া করতেন না। একবার ইংরেজদের আমন্ত্রণে তিনি কোন এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে সেনাবাহিনীর জনৈক ইংরেজ ক্যাপটেন তাঁর সাথে অশোভন আচরণ করলে তিনি ঘুষি ও লাথি মেরে তাঁকে উচিত শিক্ষা দেন।[২৯৫] তায়েশ বলেন, ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে আরব, রোম, সিরিয়া ও ইউরোপ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত আব্দুল গণির বদান্যতা এবং বুদ্ধিমত্তার কথা ছড়িয়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে নওয়াব আব্দুল গণির মত এরূপ আর কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির জন্ম হয়নি, যাঁর দ্বারা সারা বাংলার মান মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৯৬]

নওয়াব আব্দুল গণির পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর সাথেও ইংরেজদের সুসম্পর্ক পূর্বানুরূপ বহাল ছিল। শৈশবে তাঁকে ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার জন্য লন্ডনের জনৈক শিক্ষককে মাসিক এক হাজার টাকা বেতন দিয়ে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল।[২৯৭] ইংরেজী ভাষায় তাঁর এতই অধিকার ছিল যে, অন্তরাল থেকে তাঁর কথা শুনে মনে হতো যে, কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ সাহেব কথা বলছেন।[২৯৮] ১৮৮৮ খ্রীঃ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সাথে ঢাকায় আগত লেডী ডাফরিন তাঁর লেখায় আহসানুল্লাহর চমৎকার ইংরেজী বচনের প্রশংসা করেছেন।[২৯৯] ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর মিঃ ক্লে তাঁর ডাইরীতে ১৮৬৬ খ্রীঃ লিখেছেন, খাজা আহসানুল্লাহ ছিলেন তাঁর পিতার মতো ব্রিটিশ অনুরাগী এক নেটিভ সাহেব।[৩০০] জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ আতিথেয়তা ও দানকার্যে তাঁর পিতার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখেন। তিনি সেযুগের ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক দান করেছেন। এসব দানের মধ্যে অনেকগুলোই ছিল তাঁর ইংরেজ প্রীতির বহিঃপ্রকাশ। যেমন- ঢাকার ইংরেজ ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া পার্কের উন্নয়নের জন্য তিনি ১২ হাজার টাকা[৩০১] এবং কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফান্ডে তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করেন।[৩০২] ১৮৮৯ খ্রীঃ আহসানুল্লাহ রাজপৌত্র এলবার্ট ভিক্টোরের কলকাতা আসার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। এ ব্যাপারে কলকাতার কোন রাজা মহারাজাও এত ব্যয় করেননি।[৩০৩]

নওয়াব আহসানুল্লাহ দীর্ঘকাল ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।[৩০৪] তিনি দুইবার বড়লাট আইন সভার সরকার মনোনীত সদস্য হয়েছিলেন। প্রথমবার মনোনীত হন ১৮৯০ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয়বার মনোনীত হন ১৮৯৯ খ্রীঃ। দ্বিতীয়বার মেয়াদপূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি অসুস্থতাবশতঃ পদত্যাগ করেন।[৩০৫] খাজা আহসানুল্লাহ ১৮৭৫ খ্রীঃ খান বাহাদুর[৩০৬] ১৮৭৭ খ্রীঃ নওয়াব ১৮৯১ খ্রীঃ সি.আই.ই. (*কমান্ডার অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার*) এবং ১৮৯২ খ্রীঃ নওয়াব বাহাদুর খেতাব পান।[৩০৭] ১৮৯৭ খ্রীঃ ২৪ মে রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উৎসবকালে নওয়াব আহসানুল্লাহকে কে.সি.আই.ই.(*নাইট কমান্ডার অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার*) উপাধি প্রদান করা হয়।[৩০৮]

নওয়াব আহসানুল্লাহকে খেলাত প্রদানের জন্য বংগের লেঃ গভর্নর স্যার উডবার্ণ ২৭ জুলাই ঢাকায় আগমন করেন। পরদিন ২৮ জুলাই সোমবার বিকেলে এতদুপোলক্ষ্যে নর্থব্রুক হলে এক আড়ম্বরপূর্ণ সভায় ছোট লাট নওয়াবের গলায় স্টার পরিয়ে দেন। তিনি তাঁর নানা গুণাবলী নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতাও করেন।[৩০৯] গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন বাহাদুর ব্রহ্মদেশে যাওয়ার কালে ১৮৯৮ সালের ১১ নভেম্বর চাঁদপুর এবং ১২ নভেম্বর চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি করেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ নিমন্ত্রিত হয়ে চাঁদপুরে বড় লাটের সাথে দেখা করেন। নওয়াব সাহেব চাঁদপুরে বড়লাটের অভ্যর্থনার জন্য ব্যাপক আয়োজন করেন। এতে তাঁর প্রায় লক্ষ টাকা লেগে যায়।[৩১০] বিভিন্নভাবে উপঢৌকনাদি দিয়ে রাজপুরুষদের সাথে সম্পর্ক রাখা তৎকালীন দেশীয় বড়লোকদের অভ্যাস ছিল। ঢাকার কমিশনার মিঃ সিরেজ সাহেবের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নানা উপঢৌকনাদি প্রদানে নওয়াব আহসানুল্লাহ দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন।[৩১১] ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের জমিদারী পরিচালনায় বিভিন্ন উচ্চপদগুলোতে ইংরেজ কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন সেকথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। ১৮৯৯ খ্রীঃ মার্চ মাসে বড়লাট ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ সপরিবারে জাহাজযোগে কলকাতায় যান। ঐ ভ্রমনকালে তাঁর ম্যানেজার মিঃ উইদ্রল ও সেক্রেটারী মিঃ এডওয়ার্ড তাঁদের সফর সংগী হয়েছিলেন।[৩১২] নওয়াব আহসানুল্লাহর দানে ১৯০১ সালে ঢাকায় বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা হয়। সেটা উদ্বোধন করার জন্য ছোটলাট বাহাদুরের ঢাকায় আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়ায় তাঁর পক্ষে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ বোল্টন সাহেব এসে তা উদ্বোধন করেন।[৩১৩]

Dhaka University Institutional Repository

মোট কথা ঢাকার নওয়াবগণ ইংরেজ শাসনকে এদেশবাসী ও নিজেদের জন্য মংগলজনক বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা এদেশে ইংরেজ শাসনের স্থায়ীত্বকে কামনা করতেন। সে কারণে শুধু সিপাহী বিদ্রোহের সময়ই নয় ইংরেজ সরকার কর্তৃক দেশীয় অন্যান্য বিদ্রোহ দমনকালে এবং ভিনদেশীয়দের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও ঢাকার নওয়াবগণ ব্রিটিশদের দ্ব্যর্থহীণভাবে সহায়তা করেছেন। এছাড়া দেশে বিদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি মোকাবেলায় এঁরা ইংরেজ সরকারকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন। নিম্নে এরূপ কিছু কাজের উদাহরণ দেয়া হলো।[৩১৪]

(১) সিপাহী যুদ্ধের সময় ব্যবহারের জন্য খাজা আব্দুল গণি ইংরেজ সরকারকে তিনটি হাতী উপহার দিয়েছিলেন। ঢাকার লালবাগে সিপাহী যুদ্ধ হওয়ার প্রাক্কালে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীদের একদল ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। তাদেরকে বাঁধা দেয়ার জন্য ইংরেজ নৌসেনাদের দাউদকান্দিতে জরুরীভাবে পরিবহণ করার নিমিত্তে খাজা আব্দুল গণি তাঁর 'ডলফিন' নামক চাকাদাড় চালিত বজরাটি দিয়ে সরকারকে সহায়তা করেন।

(২) আসামের লুসাইদের প্রথমবারের বিদ্রোহ দমনকালে নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর 'আদ্য' নামক স্টীমারটিকে সিলেটে সৈন্য বহন করার কাজে ইংরেজ সরকারকে ধার দেন।

(৩) পার্বত্য ত্রিপুরার কুকী বিদ্রোহ দমনকালে নওয়াব আহসানুল্লাহ ইংরেজ সরকারের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেনা ও রসদ সরবরাহের কাজে তাঁর 'স্টার অব ঢাকা' স্টীমারটিকে নিয়োজিত করেন।

(৪) দ্বিতীয়বার লুসাই অভিযানকালে নওয়াব আহসানুল্লাহ রসদাদি পরিবহন কাজে তাঁর ৬টি হাতী সরকারকে ধার হিসেবে দেন। এছাড়াও তিনি সরকারকে ৩০০টি দেশীয় নৌকা সরবরাহ করেন।

(৫) ১৮৭৪ খ্রীঃ বাংলায় ভীষণ দূর্ভিক্ষ শুরু হলে নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর 'স্টার অব ঢাকা' নামক স্টীমারটি রাজশাহীতে উপদ্রুত এলাকায় সরকারের সাহায্যার্থে মোতায়েন করেন। সেটা ৪ মাস ধরে সফলভাবে কাজ করছিল। এছাড়া তিনি দূর্ভিক্ষের সময় ঢাকায় স্বল্পমূল্যে পর্যাপ্ত চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

(৬) নাগা বিদ্রোহ দমন যুদ্ধের সময় নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর ১৫টি সর্বোৎকৃষ্ট শিকারী হাতী পুরোপুরি সুসজ্জিত করে ইংরেজ সরকারের পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে হাতিগুলো সেখানে মারা যায়।[৩১৬]

(৭) ১৮৭৫ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ওয়েলসের যুবরাজের কলকাতা ভ্রমনকালে গোয়ালন্দে তাঁর বরাহ শিকারের আয়োজন করা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ সেখানে ৩০টি হাতি এবং বহু সংখ্যক ঘোড়া ও নৌযান প্রস্তুত রাখেন।[৩১৭] নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ সময় তাঁর 'ট্রাক' নামক বজরাটি মিঃ প্রেসটেজ-এর ব্যবস্থাপনায় প্রিন্সের ব্যবহারের জন্য সুসজ্জিত করে প্রস্তুত রেখেছিলেন।

(৮) বরিশালের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর স্টীমার 'স্টার অব ঢাকা'কে মোতায়েন করেছিলেন।

(৯) ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পের পর বৈদ্যর বাজার এলাকায় টেলিগ্রাফের তার পুনসংযোগের কাজে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর 'ঢাকা' নামক স্টীমারটিকে সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহায্যার্থে নিয়োগ করেন।

(১০) চট্টগ্রামে সাইক্লোন প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে নওয়াব আহসানুল্লাহ বহু অর্থ দান করেন। এছাড়া তিনি তাঁর 'বড়নগর' নামক স্টীমারটি দুর্গতদের জন্য সরকারের খাদ্যশস্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত করেন।

(১১) মিঃ পালো ঢাকার কমিশনার থাকাকালে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের মধ্যে রিলিফ বিতরণের জন্য নওয়াব তাঁর 'স্টার অব ঢাকা' নামক স্টীমারটি দিয়ে সরকারকে সাহায্য করেন।

(১২) নওয়াব তাঁর 'জামুর্কী' নামক স্টীম লঞ্চটি মিঃ টি. এফ. ব্রোকশার্ট-কে সরকারী কাজে ব্যবহার করতে দেন। এছাড়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সরকারী মালামাল পরিবহনে তাঁর হাতীগুলো দিয়ে সাহায্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) ১৮৮৫ খ্রীঃ মধ্য এশিয়ায় ব্রিটিশদের সাথে রুশ বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধার আশংকা দেখা দেয়। ঐ যুদ্ধ যদি শুরু হয় তবে নওয়াব আহসানুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রয়োজনে সাত লক্ষ টাকা প্রদান করবেন বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও এই রাজভক্তির জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।[৩১৭(ক)]

উপরোক্ত বর্ণনা ছাড়াও ঢাকার নওয়াবগণ বিভিন্ন সময় ইংরেজ সরকারী আমলা ও বেসরকারী ইউরোপীয় নাগরিকদের অনুরোধে অথবা তাঁদের মাধ্যমে ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাহায্য সহযোগিতা প্রেরণ করেছেন। ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকার মধ্যে এরূপ অনেকগুলো দানের কথা জানা যায়।

১(৬) সামাজিক মর্যাদা ও ঢাকার কর্তৃত্ব লাভঃ

ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের অর্জিত বিপুল অর্থ সামর্থের সদ্ব্যবহার, প্রজাগণের হিতসাধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান, আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, সরকারী আমলাদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। খাজা আলীমুল্লাহর সময়েই আমরা জানি ঢাকা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন প্রভৃতি কাজে তাঁর অংশগ্রহণ এতদাঞ্চলের কর্তাব্যক্তিদের একান্ত কাম্যছিল। ঢাকার নায়েবে নাজিমদের উপর শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ইমামবাড়া হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লীর ভার ছিল। ১৮৪৩ খ্রীঃ ঢাকার শেষ নায়েবে নাজিম গাজিউদ্দিন হায়দার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে মোতাওয়াল্লীর পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সুন্নী সম্প্রদাভূক্ত হয়েও খাজা আলীমুল্লাহ উক্ত ইমামবাড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও মহররম উৎসবের ব্যয় বহনে এগিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁর উপরেই হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লীর ভারার্পন করেন।[৩১৮] এভাবে খাজা পরিবারটি ঢাকার শিয়া, সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়।

মোগল আমলের নওয়াবদের ন্যায় ঢাকার এই নওয়াবদের প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকলেও ইংরেজ সরকার ও জনসাধারণের উপর তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৮৮৬ খ্রীঃ ঢাকার নওয়াবের ব্যয়ে পরিচালিত মহররম মিছিলে ইংরেজ পুলিশের একটি শকট ঢুকে পড়া নিয়ে পুলিশ ও মিছিলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নওয়াবের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে এই অঘটনের অবসান হয়।[৩১৯] ১৯০৮ সালে মহররম মিছিলকারীদের সাথে অনুরূপভাবে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটলে নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের উচ্চ পদস্থ লোকদের দিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশদের সাসপেন্ড করার ব্যবস্থা করেন।[৩২০]

নওয়াব আব্দুল গণির সময় খাজা পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাঁদের অংশ গ্রহণ ছাড়া ঢাকা শহরের কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানই করা সম্ভব হতো না। ১৮৬৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনীর এক ব্যাপক আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খাজা আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহকে সম্মানিত অতিথির আসনে বসানো হয়েছিল।[৩২১]

ঢাকায় পঞ্চায়েত প্রথা পূর্ব থেকেই চালু থাকলেও নওয়াব আব্দুল গণির প্রচেষ্টায় তা পুর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হয়। তিনি ছিলেন ঢাকার পঞ্চায়েত প্রধান। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুষ্ঠুভাবে আচার অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ঢাকা শহরকে বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত মহল্লায় বিভক্ত করা হয়েছিল। ঢাকার নওয়াবদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে প্রত্যেক পঞ্চায়েত মহল্লায় একজন করে সর্দার এবং একজন করে নায়েবে সরদার নিযুক্ত হতেন। আহসান মঞ্জিলে কিংবা সংশ্লিষ্ট মহল্লায় আয়োজিত আড়ম্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে ঢাকার নওয়াব পঞ্চায়েত সর্দারদের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিতেন। এটা ছিল মহল্লাবাসীদের উপর সংশ্লিষ্ট সর্দারের সামাজিক কর্তৃত্বকে ঢাকার নওয়াব কর্তৃক স্বীকৃতিদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। সর্দার ছিলেন মহল্লায় সর্বেসর্বা। মহল্লা সমূহের কলহ বিবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচারালয় ছিল নওয়াববাড়ী বা আহসান মঞ্জিল। ইংরেজ শাসকদের অধীনে থাকলেও ঢাকা নগরীর স্থানীয় প্রশাসন বহুলাংশে ঢাকার নওয়াব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো।[৩২২] ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বে এদেশে বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার ভার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনে

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চায়েতের এই ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। নওয়াব আব্দুল গণির প্রচেষ্টায় ১৮৮৮ খ্রীঃ এই ক্ষমতা আবার পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে অনেকটা ফিরে আসে।[৩২৩]

নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় পর্যন্ত আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত নওয়াবদের দরবার বাহ্যিকভাবে অনেকটা শাহী দরবারের মতই ছিল। সেখানে কেবল ঢাকা শহরের লোকদের সমস্যাদি নিয়েই বিচার বসতো না বরং ঢাকার নওয়াবদের জমিদারী এলাকার যে কোন স্থান থেকেই বিচারপ্রার্থীগণ এখানে এসে ভিড় করতেন। নওয়াব আব্দুল গণির বিচারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কোনদিনই শোনা যায়নি। তাঁর জমিদারীতে এই মর্মে কড়া নির্দেশ দেয়া ছিল যে, তাঁর শালিশী শেষ না করে কেউ যেন সরকারী আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়।[৩২৪]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৬৯ খ্রীঃ ঢাকায় উদ্ভূত শিয়া-সুন্নী মারাত্মক দাংগা দমনে সরকার অপারগ হয়ে নওয়াব আব্দুল গণির স্মরণাপন্ন হন। তিনি শালিশীর মাধ্যমে এর সুষ্ঠু মীমাংসা করে দেন। ঢাকার নওয়াবগণ এ শহরবাসীর জন্য সরকারের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যথাসম্ভব আদায় করতেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ সরকার আয়কর কমানোর কথা ঘোষণা করে। ঐ অনুপাতে ঢাকাবাসীর ট্যাক্সও কমিয়ে ৫০ হাজার থেকে ৩৮,৫০০ করার জন্য ঢাকার পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে খাজা আব্দুল গণি কালেকটরের নিকট একটি আবেদন করেন।[৩২৫] ১৮৮৬ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি কর বাড়ালে ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরা নওয়াব আব্দুল গণির স্মরণাপন্ন হন। ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও যাতে বেশী গোলযোগ না হয়, সেজন্য পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নওয়াব সাহেবকে অনুরোধ করেন। এমতাবস্থায় নওয়াব সাহেব ৮ হাজার দরখাস্ত সংগ্রহ করে সুপারিশসহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করেন। তিনি লোকদের আশ্বাস দেন, যদি সরকার তাদের আবেদনটি বিবেচনা না করেন, তবে তিনি নিজেই একটি ফান্ড গঠন করে তাদের কর পরিশোধের বিকল্প ব্যবস্থা নেবেন।[৩২৬]

আব্দুল গণিকে ঢাকাবাসী কেমন সম্মান করতো তা তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা 'বেঙ্গল টাইমস্'-এ প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায়। পত্রিকাটি লিখেছিল,১৮৭৬ খ্রীঃ ওয়েলসের যুবরাজ-এর সাথে সাক্ষাৎ শেষে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরার সময় নওয়াব আব্দুল গণিকে ঢাকার লোকেরা বিপুলভাবে সম্বর্ধনা প্রদান করে। নওয়াববাড়ীর স্টীমার ঘাটে নিশান হাতে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। নদীতীরে বড় বড় কামানের প্রতিকৃতি এবং পুষ্পশোভিত দন্ড স্থাপন করা হয়। নওয়াবের স্টীমার দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই বন্দুকের আওয়াজ ও বেলুন উড়িয়ে তাঁর আগমন ঘোষনা করা হয়। ঘাটে স্টীমার ভিড়লে বন্দুকের আওয়াজ ও ব্যান্ড বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয়। নওয়াব ও তাঁর পুত্র ঘাটে নামলে সবাই মাথা নুইয়ে সালাম জানায়। একদল মেয়েরা নেচে গেয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে।[৩২৭] ১৮৮৭ ও ১৮৯২ খ্রীঃ ভাইসরয় কাউন্সিলে যোগদান শেষে ঢাকায় ফিরলে ঢাকার নওয়াবকে অনুরূপ সাড়ম্বরে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।[৩২৮] এছাড়া ১৯০২ সালে শিলং থেকে ফেরার পরে এবং ১৯০৩ সালে দিল্লীতে আয়োজিত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ১৯ জানুয়ারী নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলে অনুরূপ সম্বর্ধনা দেয়া হয়।[৩২৯]

পূর্ববংগের ভূম্যধিকারীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ববংগ জমিদার সভা। নওয়াব আব্দুল গণি প্রথম থেকেই এ সংগঠনের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। সংগঠনটি জমিদারদের নানা স্বার্থের পক্ষে একত্রিত হয়ে কাজ করতো। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকার নওয়াবগণ সারা পূর্ববংগের জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বও দান করতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ এবং সলিমুল্লাহর আমল পর্যন্ত তাঁদের এই নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। নওয়াবের আহবানে বহুবার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত উক্ত জমিদার সভার বৈঠকে তাঁদের স্বার্থে নানা রীতি-নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে সরকার জমিদারদের উপর নতুন করারোপের উদ্যোগ নেয়। এর প্রতিবাদে নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজের সভাপতিত্বে পূর্ববংগের সব জমিদার ও তালুকদারদের নিয়ে এক সভা করে সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।[৩৩০] ১৮৮৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত জমিদার সভায় এক অধিবেশনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রতিকী

Dhaka University Institutional Repository

উপঢৌকন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী জুবিলি উপলক্ষে মহারানীকে সোনার কৌটায় করে সোনার অক্ষরে লেখা অভিনন্দনপত্র পাঠানো হয়।[৩১] ১৮৯০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে এতদাঞ্চলের জমিদারদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ লেঃ গভর্নর স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলীর নিকট একটি আবেদনপত্র পেশ করেন।[৩২]

নওয়াব পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ঢাকার উন্নয়ন ও সামাজিক কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের অনেকে নিজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেশবাসী ও সরকারের নিকট সমাদৃত হয়েছিলেন। এদর মধ্যে নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজানের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন নওয়াব আব্দুল গণির জামাতা। তিনি একাধারে প্রায় ১৮ বছর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি বহুদিন জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান ছিলেন।[৩৩] তাঁর সমাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৮৮৮ খ্রীঃ ঢাকা সদর বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। এছাড়াও তাঁকে ১৯০৪ খ্রীঃ খান বাহাদুর, ১৯১০ খ্রীঃ নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৩৪] ঢাকা পৌরসভার স্বায়ত্ত শাসন আদায়, এ শহরের রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, শান্তি-শৃংখলা রক্ষণাবেক্ষণ প্রচেষ্টা প্রভৃতি কাজের জন্য তিনি সমকালীন জনগণের নিকট 'নগর পিতা' রূপে পরিচিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন।

নওয়াব আব্দুল গণির পিতৃব্যপুত্র খাজা আমীরুল্লাহ ১৮৮৪ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচিত ভাইসচেয়ারম্যান হন। নওয়াব আব্দুল গণির আরেক জামাতা খাজা মোঃ আজগর ১৮৯১ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসেবে প্রতিবারই খাজা পরিবার থেকে দু'চার জন নির্বাচিত হতেন। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও এ পরিবারের যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ- খাজা আব্দুল আলীম, সৈয়দ করিমুল্লাহ , খাজা আজিজুল্লাহ, খাজা আব্দুল আজিজ, খাজা নিজামুদ্দিন, খাজা মোঃ আফজাল খানবাহাদুর, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, খাজা নসরুল্লাহ, সৈয়দ সাহেবে আলম, নওয়াবজাদা খাজা আহসানুল্লাহ এবং সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দিন প্রমুখ।[৩৫] খাজা পরিবারের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় সরকারের ঐসব পদে নির্বাচিত সদস্যদের অনেকেই ছিলেন নওয়াবের মনোনীত কিংবা অনুসারী ও অনুগৃহীত ব্যক্তি। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নওয়াবের লোকদের আধিপত্য দেখে স্থানীয় পত্র-পত্রিকা অনেক সময় সরকার কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠানকে দেয়া স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়ে কটাক্ষ করে খবর ছাপাতো।[৩৬]

পঞ্চায়েত সর্দার থেকে শুরু করে পৌরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনার, জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য, প্রভৃতি পদে নওয়াবের লোক থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই ঢাকার সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপ নওয়াব পরিবারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। নওয়াবগণ ঢাকাবাসীর উপকারার্থে কলের জল ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা,স্কুল , মাদ্রাসা, হাসপাতাল, গোরস্তান স্থাপন ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ করে এ শহরবাসীর মনে একটি দরদীর স্থান পেয়েছিলেন। তদুপোরি তাঁরা নগরবাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সহায়তা করতে এমন কিছু কাজ করতেন, যার ফলে ঢাকাবাসীরা নওয়াবকে তাঁদের একজন স্বতফুর্ত অভিভাবক হিসেবে গণ্য করতো। যেমন- খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকে নওয়াব বাড়ীর আস্তাবলের উপর বড় একটি ঘড়ি সম্বলিত টাওয়ার ছিল।[৩৭] দূর থেকে লোকেরা পথ দিয়ে যাওয়ার কালে সময় জেনে নিত। প্রতিদিন বেলা ১ ঘটিকার সময় নওয়াব বাড়ী থেকে একটি তোপধ্বনি করে শহরবাসীকে সময় জানানো হতো।[৩৮] ঈদের চাঁদ দেখা গেলে এবং সারা রমজান মাসব্যাপী এফতারের সময় নওয়াব বাড়ী থেকে তোপধ্বনি করা হতো। নওয়াবের ব্যয়ে ঢাকার প্রায় সব মসজিদে তারাবী নামাজের জন্য ইমাম নিয়োগ ও এফতারের ব্যবস্থা করা হতো।[৩৯]

এছাড়া প্রতিবছর ১লা জানুয়ারীতে খ্রীস্টিয় নববর্ষ উপলক্ষে নওয়াব তাঁর শাহবাগ বাগানবাড়ীতে ঘটাকরে কৃষি ও শিল্প মেলার আয়োজন করতেন। উক্ত মেলায় ঢাকা ও আশেপাশের জেলাগুলো থেকে লোকেরা উৎকৃষ্ট জাতের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং গবাদি পশু-পাখি প্রদর্শন করতেন। শ্রেষ্ঠজাতের দ্রব্যাদি ও পশুপাখি প্রদর্শণকারীদেরকে নওয়াবের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষ থেকে পুরস্কার দেয়া হতো।[৩৪০] ঢাকায় কোন উচ্চ পদস্থ সরকারী আমলা অথবা খ্যাতনামা ব্যক্তি আসলে নওয়াব সাহেব তাঁর সম্মানার্থে অহসান মঞ্জিলে অথবা শাহবাগে সম্বর্ধনা সভা করতেন। ঢাকার নওয়াবের উপর এ নগরবাসীর ব্যাপক প্রত্যাশা ছিল। তাঁরা মনে করতো শহরে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ করা এবং অবক্ষয়ের হাত থেকে একে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি নওয়াবেরও রয়েছে। তাই ১৮৯৩ খ্রীঃ ঢাকা প্রকাশের এক নিবন্ধে নগরবাসীর পক্ষ থেকে এই বলে আবেদন করা হয় যে, সোনারগাঁও এবং রামপালের মত ঢাকা নগরীও যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় সেজন্য নওয়াব সাহেব যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন।[৩৪১]

আমাদের দেশে সাধারণতঃ মৃত্যুর পরই খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকশের জন্য তাঁদের জীবনী নিয়ে আলোচনা বা সভা সমিতি করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন জনহিতকর কাজের দ্বারা নওয়াব আব্দুল গণি সমসাময়িক দেশবাসীর হৃদয়ে এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায়ই এরূপ অনেক সভা-সমিতি হয়েছিল। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাঁর স্মৃতিতে স্থায়ী কিছু করার জন্যে ১৮৭৯ খ্রীঃ ২৬ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪ ঘটিকায় পূর্ববংগ রংগভূমিতে বাবু রাধিকা মোহন রায়ের সভাপতিত্বে ঢাকার 'জনসাধারণ সভা'র এক অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় পন্ডিত প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তী বাংলায় এবং মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী উর্দুতে নওয়াব আব্দুল গণির সৎকার্যাদি ও সৎস্বভাবাদির উল্লেখপূর্বক বক্তৃতা করেন। তাঁরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর স্মৃতিতে স্থায়ী কিছু করা অবশ্য কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়।[৩৪২] (১) নওয়াব আব্দুল গণির প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদশর্নের জন্য তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবছর ১৪ শ্রাবণ তারিখে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আনন্দ উৎসব করা হবে। (২) অর্থ সংগ্রহ সাপেক্ষে তাঁর স্মরণার্থে একটি স্থায়ী স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করা হবে। ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান থেকে এজন্য চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। (৩) নওয়াব আব্দুল গণির জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকার অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হবে।[৩৪৩] (৪) সভার কার্যবিবরণী ইংরেজী, বাংলা ও উর্দূ ভাষায় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হবে। (৫) চাঁদা সংগ্রহের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। বাবু অভয় চন্দ্র দাস কমিটির সভাপতি, বাবু শ্রীনাথ রায়, বাবু গোবিন্দ দাস, মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী ও সৈয়দ মোহাম্মদ-কে সম্পাদক এবং রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়।[৩৪৪]

নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকাবাসীর জন্য যেমন নিবেদিত প্রাণ মনীষী ছিলেন, ঢাকার বাসিন্দারাও তেমন তাঁকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া নওয়াব সাহেবকে প্রতিদান দেয়ার মত তাঁদের কিইবা ছিল। ঢাকা বাসিরা নওয়াব আব্দুল গণিকে একটি অভিনন্দন পত্র দেয়ার বাসনার কথা অনেকদিন ধরে বলাবলি করতো। অবশেষে তাঁরা ১৮ আগষ্ট ১৮৮৮ খ্রীঃ একটি বিরাট জনসভায় মিলিত হয়ে নওয়াব সাহেবের নানা গুনগান বর্ণনা করেন এবং সবার পক্ষ থেকে তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[৩৪৫]

দীর্ঘজীবি নওয়াব আব্দুল গণি খ্যাতি ও মর্যাদার চরম শীর্ষে থেকেই ১৮৯৬ খ্রীঃ ২৪ আগষ্ট সোমবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ৮৫ বছর ২৫ দিন বয়সে আহসান মঞ্জিলে ইন্তেকাল করেন।[৩৪৬] মৃত্যুর পরেও নওয়াব আব্দুল গণির প্রতি ঢাকাবাসীরা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ঢাকার কালেকটর ও কমিশনার সাহেব তাঁর শব মিছিলের সাথে সরকারী ফৌজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরিয়তের বিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলে তাঁর পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহ তা গ্রহণ করেননি।[৩৪৭] সেদিন এতদাঞ্চলে সব সরকারী অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব এবং অধিকাংশ দোকান পাট বন্ধ ছিল।[৩৪৮] ঢাকার অন্যসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একদিন বন্ধ রাখা হলেও নওয়াবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে জগন্নাথ স্কুল ও কলেজ দু'দিন বন্ধ দেয়া হয়েছিল।[৩৪৯] তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ লিখেছিলো, নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যু সংবাদে ঢাকার গণ্যমান্য ইংরেজ, দেশী বিদেশী সবাই অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছেন। সব প্রধান ব্যক্তি তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

শেষবারের মত দেখার জন্য তাঁর মরদেহের নিকট সমবেত হন। হাজার হাজার লোক সমাগমে নওয়াব বাড়ির সুবৃহৎ চত্বর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রচন্ড রোদে দগ্ধ হয়েও সকলে একাগ্রমনে তদগত হয়েছিলেন। যখন দাফনের উদ্দেশ্যে তাঁর লাশ স্থানান্তরের জন্য উত্তোলন করা হলো, অমনি সমবেত বিশাল জনতার প্রায় বিশ হাজার ছাতি একত্রে মুদ্রিত হলো। সম্মান প্রদর্শনের কি অদ্ভুত দৃশ্য। তাঁর শবের পিছনে পিছনে প্রায় ৫০ হাজার লোক যেন নদী প্রবাহের ন্যায় ছুটে চললো। অসহ্য পিতৃশোকে নওয়াব আহসানুল্লাহ বেশীদূর গমন করতে পারলেন না। অন্যান্য পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণ সেই বিশাল জনতার সাথে মৃতদেহ বহনপূর্বক প্রায় এক মাইল দূরে নওয়াব পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট গোরস্তানে তাঁকে সমাধিস্থ করলেন।[৩৫০]

নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যুতে ২৫ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ মংগলবার ঢাকার নর্থব্রুক হলে ঢাকার কমিশনার মিঃ লটমন জনসনের সভাপতিত্বে এক শোকসভা হয়। কমিশনার সাহেব পরলোকগত নওয়াবের গুনগান বর্ণনা করে বক্তৃতা করেন। সভায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এবং আরো অনেকে মরহুমের বিয়োগে শোক প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন।[৩৫১] সভায় মরহুম নওয়াবের স্মরণে একটি চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য একটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়। উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সাহেবগণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ সাব কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। মরহুমের মৃত্যুদিবস বিকাল থেকে নওয়াব আহসানুল্লাহ পিতার রুহের মাগফেরাতের জন্য গরীব দঃখীদেরকে হাজার হাজার টাকা দান করেন।[৩৫২] নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যু উপলক্ষে ১৮৯৬ খ্রীঃ ২৬ আগষ্ট ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রগণ এক শোকসভা করে তাঁর স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ কোন একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৫৩] নওয়াব আব্দুল গণির স্মরণে তাঁরা উক্ত মাদ্রাসার মূল ভবনের দেয়াল গাত্রে একটি উৎকীর্ণ মার্বেল ফলক স্থাপন করেন, যা এখনো বিদ্যমান। ১৮৯৬ খ্রীঃ ৩০ আগস্ট কলকাতার রয়েল স্ট্রীটে নওয়াব সৈয়দ আমীর হোসেন-এর বাসভবনে নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যু উপলক্ষে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের' একসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করা হয়।[৩৫৪]

নওয়াব আব্দুল গণির পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহকেও ঢাকাবাসী তাঁদের অভিভাবক ও আশ্রয়স্থল বলে মনে করতো। জনকল্যাণে তিনি অজস্র অর্থদান করেছেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ প্লেগরোগের আতঙ্কে ঢাকা শহরের লোকেরা যখন দিশেহারা হয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে গঞ্জে ছুটে পালাচ্ছিল । নওয়াব আহসানুল্লাহ তখন লক্ষ টাকা দান করে শহরবাসীকে ঐ মহামারী থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। নওয়াবের একক দানে সম্পাদিত বিজলী বাতির ব্যবস্থাটি তাঁকে ঢাকা শহরবাসীর শ্রদ্ধার শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু ১৯০১ খ্রীঃ ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় তিনি পরলোকগমন করলে ঢাকাবাসীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণ নওয়াব সাহেবের শেষ কৃত্যে অংশগ্রহণ করেন।[৩৫৫] স্থানীয় পত্রপত্রিকা নওয়াব সাহেবের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের উল্লেখ করে এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানা প্রশংসা বাক্যসহ শোকবানী প্রকাশ করে।[৩৫৬]

নওয়াব আহসানুল্লাহর তিরোধানে শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তৎকালীন বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার জন উডবার্ন নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের নিকট তার যোগে এক শোকবার্তা প্রেরণ করেন।[৩৫৭] নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পরদিন বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতা গেজেটে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা হয়। সেখানে নওয়াব আহসানুল্লাহর দীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তাও বলা হয়েছিল।[৩৫৮] নওয়াব সাহেবের মৃত্যুতে ২৩ ডিসেম্বর ১৯০১ খ্রীঃ সোমবার ঢাকার জনসাধারণ সভার উদ্যোগে নর্থব্রুক হলে বাবু রমাকান্ত নন্দীর সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নওয়াবের সম্পর্কে ঢাকার খ্যাতনামা উকিল বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং পন্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয়ের মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনে সমবেত জনতা কান্নায় ভেংগে পড়েন। সভায় নওয়াবের পুত্র খাজা সলিমুল্লাহর নিকট একটি সহানুভূতি জ্ঞাপকপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া পরলোকগত নওয়াবের স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি নেয়ারও

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেমন- ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, টাংগাইলে সাধারণ সভা, কুমিল্লায়-পৌরসভা, বিক্রমপুর ও ভাগ্যকুলে-স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির উদ্যোগেও অনুরূপ শোকসভা করা হয়েছিল।[৩৫৯] মরহুম নওয়াবের স্মরনার্থে একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকার কমিশনার মিঃ সেভেজ সাহেব তাঁর নিজ গৃহে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় পূর্ববংগের সব স্থান থেকে এজন্য চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৬০] ঢাকাবাসীর উপর খাজা পরিবারের অনুরূপ প্রভাব ও কর্তৃত্ব নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবনকাল পর্যন্ত পুরোপুরি অটুট ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকার পঞ্চায়েত প্রথার উন্নয়নকল্পে বারো এবং বাইশ পঞ্চায়েতকে একত্রিত করেন এবং ১৯০৭ খ্রীঃ খাজা মোঃ আজমকে এর সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। খাজা আজম এই প্রথার অনেক সংশোধন ও উন্নয়ন করেন। তাঁর সময় মুসলমানদের বেশীর ভাগ মামলা পঞ্চায়েত দরবারে মীমাংসা হতো।[৩৬১] উল্লেখ্য, আলোচ্য পঞ্চায়েত প্রথাটি মূলত ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো এবং এর সরদারগণও ছিলেন মুসলমান। এজন্য নওয়াবের পক্ষে সর্দারদের মাধ্যমে ঢাকার মুসলমানদের সমস্যাদি সামাধান করে কর্তৃত্ব করাও সহজ হতো। ঢাকা শহরে ঘটা করে ফাতেহা দোয়াজ দাহাম উদযাপন করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রতিটি মহল্লার সর্দারকে অর্থ দিতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের ন্যায় উদারভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ করে ঢাকার জনসাধারণের মনজয় করেছিলেন। তদপুরি তিনি সক্রিয় রাজনীতি করে সরকারী আমলা ও মুসলিম সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

যদিও কংগ্রেস প্রভাবিত তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রাজনীতি রুখতে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববাংলার মুসলমানদের নেতা নওয়াব সলিমুল্লাহকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছিলেন[৩৬১(ক)] কিন্তু ঢাকাসহ এতদাঞ্চলের মুসলমানদের উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবের গৃহীত পদক্ষেপ অযৌক্তিক ছিলনা। ১৯০৫ সালে সরকারে বঙ্গবিভাগ সমর্থন করায় ব্রিটিশ সরকারের নিকট ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর গুরুত্ব খুবই বেড়ে যায়। কালক্রমে তিনি কার্যত ব্রিটিশ সরকারের একজন বেসরকারী উপদেষ্টার মর্যাদা পেয়েছিলেন।[৩৬২] তাঁর পরামর্শ ব্যতিত পূর্ববাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য কাজই হতো না। এর ফলে দেশবাশীর অভাব অভিযোগ অতি সহজে তিনি সরকারের গোচরীভূত করে সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হতেন। বদর উদ্দিন আহমদ লিখেছেন, নওয়াব সলিমুল্লাহর অঙ্গুলি সংকেতে সমগ্র ঢাকা নিয়ন্ত্রিত হতো। তিনি নগরবাসীকে এক সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর ডাক পাওয়া মাত্রই মুহূর্ত ইতস্তত না করে লোকেরা তাঁর উদ্দেশ্য জানার জন্য আহসান মঞ্জিলে গিয়ে হাজির হতেন।[৩৬৩] নওয়াব আব্দুল গণির ন্যায় তিনিও আহসান মঞ্জিলে দরবার বসিয়ে সাধারণ নাগরিকদের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করে দিতেন। সরকারী আদালতের ন্যায় তাঁর দরবার থেকেও রায় প্রকাশ করা হতো। এতে বহুলোকের উকিল মোক্তার বাবদ খরচের টাকা বেচে যেত। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ব্যাপারেও ঢাকার নওয়াবগণ অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। বিশেষ করে মুসলমানেরা যাতে নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম পালন করতে পারে তাঁরা সে ব্যবস্থা করতেন। মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় যাতে হিন্দুরা বাদ্য বাজানো বন্ধ রাখেন সেজন্য ছোট লাটকে দিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সালে একটি আইন পাশ করেন।[৩৬৪] ১৯৩০ সালে ঢাকায় হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাংগা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। নওয়াব হাবিবুল্লাহ ঐ দাংগা প্রশমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ঢাকা শহরবাসীর কৃতজ্ঞভাজন হয়েছিলেন।

১৯১১ সালে বংগবিভাগ রদ হলেও নওয়াব সলিমুল্লাহ ও তাঁর সহযোগিদের প্রচেষ্টায় সরকার ঢাকাকে বংগের দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দিয়ে রাখে। ফলে এখানে সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর থেকে যায় এবং বছরে অন্তত দুই মাস বঙ্গের গভর্ণর সপরিষদ এখানে অবস্থান করতে থাকেন। লর্ড ক্রু গভর্নর লর্ড কারমাইকেলকে পূর্ববাংলার মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে পরামর্শ দেন।[৩৬৪(ক)] ঢাকার নওয়াব ও তাঁর সহযোগিদের সন্তুষ্ট করতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এভাবে ঢাকার গুরুত্ব টিকে থাকার পাশাপাশি ঢাকার নওয়াবের গুরুত্বও বেশ অটুট থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১(৭) ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে নওয়াব পরিবার ঃ

এতদাঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ঢাকার নওয়াবগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে তাঁরা এস্টেটের কর্মচারী নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের সবাইকে স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করার সুযোগ সুবিধা দিতেন। প্রজা কিংবা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করে তাঁরা খাজনা আদায় কিংবা ব্যবসায়িক উন্নতি করার পক্ষপাতি ছিলেন না। এজন্য সকল শ্রেণী ও ধর্মের লোকেরা তাঁদের ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। তাঁদের এই জনপ্রিয়তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে ঢাকায় উদ্ভূত দাংগা হাংগামা দমনে তাঁদের গৃহীত ব্যবস্থাদি সরকারের ব্যবস্থার চেয়েও বেশী কার্যকর হতো।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে ১৮৬৯ খ্রীঃ ঢাকায় শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে একবার ভীষণ দাংগা বাঁধার উপক্রম হয়। সেবার ওহাবী এবং ফারাজীরা শিয়াদেরকে নাজেহাল করার একটি পরিকল্পনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সুন্নীরাও শিয়াদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। একরাতে শিয়াদের কেউ ফার্সী ভাষায় কতকগুলো অশোভন মন্তব্যসহ খ্যাতনামা কয়েকজন সুন্নী ধর্মগুরুর ব্যাংগচিত্র চকবাজারের দেয়ালে এটে রাখে।[৩৬৫] এতে শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে খন্ড খন্ড দাংগা ঘটে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের আশংকা দেখা দেয়। শিয়াদের অভিযোগের পেক্ষিতে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কয়েকজন সুন্নীকে দন্ডিত করেন।[৩৬৬] কিন্তু তাতেও কোন ফল লাভ হয়নি বরং উত্তেজনা বেড়েই চলতে থাকে। সুন্নীদের প্ররোচনায় শিয়াদের চাকর-বাকর, বাবুর্চী, এমনকি মেথররাও তাদের কাজ-কাম করতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় সরকার উক্ত দাংগা দমনে নওয়াব আব্দুল গণির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। আব্দুল গণি তখন ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে উভয় পক্ষের লোকদের ডেকে শালিশীর মাধ্যমে বিষয়টির সুষ্ঠ মিমাংসা করে দেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে, উক্ত কাজে আব্দুল গণিকে প্রায় ২০ হাজার লোককে চারদিন ধরে নিজ খরচে ভোজ দিতে হয়েছিল।[৩৬৭] বিশ শতকের গোড়ার দিকে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুরা, নরসিংদী, রূপগঞ্জ, কালিগঞ্জ থানার এক ব্যাপক এলাকা জুড়ে এক ভন্ড ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। বারই আগলা গ্রামের জনৈক আম্বের আলী 'বাবা হক' (খাজা বাবা) সেজে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে 'জজবা পার্টি' নামে এক অদ্ভুত ধর্মাচরণ শুরু করে। তারা পশ্চিমের বদলে পূর্বমুখী হয়ে প্রার্থনা ও নামাজ রোজার বদলে বাদ্য যন্ত্র নিয়ে নাচ-গান (সামা) করে এবং মাদকাসক্ত হয়ে তাদের গুরু বাবা হক-কে সর্বশক্তিমান বলে প্রচার করে। তারা আইন শৃংখলা অমান্য করে এবং সরকারকে খাজনা না দিয়ে তাদের গুরু আম্বের আলীকে নজরানা দিতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত পুলিশী ব্যবস্থা সফল না হওয়ায় ঢাকার কমিশনার মিঃ বেটসন বেল ১৯১৩ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পত্র দ্বারা অনুরোধ করেন। নওয়াব বাহাদুর খ্যাতনামা ধর্মগুরু ও স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিদের সহায়তায় বিষয়টি সফলভাবে মোকাবেলা করেন।[৩৬৭(ক)]

১৯০৫ সালে বংগবিভাগের ফলে এতদাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া শুরু করে। নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ মুসলমান সরকারের বংগবিভাগকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন নেতাদের প্ররোচনায় এতদাঞ্চলের অধিকাংশ হিন্দুরা এর বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসী নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অনেক স্থানেই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় পর্যবসিত হয়।

এইরূপ উত্তেজনা চলাকালে ১৯০৪ সালের ১৩ নভেম্বর রাত ৯.০০ টায় নওয়াবপুর পুলের নিকট অবস্থিত মসজিদের সামনে ঢাকায় প্রথম একটি হিন্দু মুসলিম দাংগা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় শাঁখারী বাজারে রক্ষাকালীর ভাষাণ উপলক্ষে সংকীর্তনাদিসহ দেবীমূর্তি বের করা হয়েছিল। পুজারীরা উক্ত মসজিদের পাশ দিয়ে এশার নামাজ চলাকালে বাদ্যসহকারে যাবার সময় মুসল্লীরা লাঠিসোটা নিয়ে বাঁধা দেয়। সংঘর্ষে হিন্দু পক্ষের ৭/৮ জন আহত হয়। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাংকিন এবং নওয়াব সলিমুল্লাহ সাহেব ঐ ঘটনার মধ্যস্থতা করেন। মুসলমানদের পক্ষে নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ জান ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে পুনরায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬৮] এই ঘটনার পর ঢাকার কোন মসজিদের পাশ দিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় বাদ্য বাজানো বন্ধ করতে হবে বলে ১৯০৬ সালে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব-বাংলার লেঃ গভর্নর একটি আইন পাশ করেন। নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ এবং ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী আব্দুল সালাম এই আইন পাশ করাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৩৬৯]

এদিকে বংগবিভাগ বিরোধী আন্দোলনকারীদের নানা উস্কানী সত্ত্বেও নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে ধৈর্য্য সহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পরামর্শ দেন। ১৯০৭ সালের ৪ এবং ৫ মার্চ নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলমান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কুমিল্লায় সভা করতে যান।[৩৭০] সেখানে কংগ্রেস সমর্থক হিন্দুরা তাঁর সভা পন্ড করার জন্য ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি করে। এমনকি ৮ মার্চ তিনি সদলবলে ঢাকায় ফেরার পথে কতিপয় দুর্বৃত্ত তাঁকে বহনকৃত রেলগাড়িটি লাইনচ্যুত করার হীন চেষ্টাও করেছিল।[৩৭১] এঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা ১২ মার্চ নওয়াবের শাহবাগে একটি বিরাট প্রতিবাদ সভা করেন। সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ও খাজা মোহাম্মদ আজম মুসলমানদেরকে কোন প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থেকে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেন। তাঁরা মুসলমানদেরকে বিদ্যার্জন, ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য বৈষয়িক কাজ-কর্মে প্রতিযোগিতা করে হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্যের সমুচিত জওয়াব দিতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৩৭২]

বংগবিভাগের জন্য সৃষ্ট এতদাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ দূর করে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতেন। এজন্য স্থানীয় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে তিনি ১৯০৭ সালের মে মাসে আহসান মঞ্জিলে একটি সভা করেন। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী হাজী নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্থানীয় উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে এ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। সভায় এতদুপোলক্ষে উভয় সম্প্রদায় থেকে ৪০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে বড় ধরণের একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৩৭৩]

বংগবিভাগের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এক শ্রেণীর লোকেরা ভন্ড ফকির ও মোল্লা সেজে নওয়াব সলিমুল্লাহর নাম ভাংগিয়ে মুসলমানদের নানা অনুচিত ও অসৎ কাজে উত্তেজিত করা শুরু করেছিল। ১৯০৭ সালে বিষয়টি নওয়াব সাহেবের দৃষ্টিতে আসে। তিনি একটি ইশতেহার প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, এরূপ কাউকেও তিনি দুষ্ট নীতি প্রচারের ক্ষমতা দেননি। হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে তাঁর শত্রুরা এরূপ কাজ করতে পারে। তাই এরূপ কাউকে পাওয়া গেলে তাকে যেন আইনে সোপর্দ করা হয়।[৩৭৪] ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকার দু'জন কৃতিসন্তান মিঃ কে. জি. গুপ্ত এবং বিচারপতি লালমোহন দাসের সম্বর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। নর্থব্রুক হলে আয়োজিত উক্ত সামাজিক সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে নওয়াব সাহেব উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।[৩৭৫]

নওয়াব সলিমুল্লাহর গৃহীত উল্লিখিত ব্যবস্থাদির কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ (প্রায় ১৯২৬ সাল পর্যন্ত) ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগামুক্ত থাকে। কিন্তু হিন্দু মহাসভা মসজিদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বাদ্য বন্ধ রাখা আইনটির ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে একটি সর্ব ভারতীয় ইস্যু খাড়া করার চেষ্টা চালাতে থাকে। উল্লিখিত নিয়ম ভংগ করে ১৯২৬ সালের ২৯ এপ্রিল রাতে হিন্দুদের একটি বিবাহ মিছিল আমলীগোলা মসজিদের সামনে দিয়ে এশার নামাজের সময় বাদ্য বাজিয়ে যাওয়া শুরু করেন। এমতাবস্থায় মুসল্লীরা বাঁধা দিলে পুনরায় দাংগা বাঁধে। উল্লেখ্য, এ সময় কলকাতায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছিল। এই প্রেক্ষিতে ঢাকায় শান্তি ভংগের আশংকায় নওয়াব হাবিবুল্লাহর উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল শুক্রবার রাতে আহসান মঞ্জিলে মুসলমানদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েকজন হিন্দু নেতাও যোগ দেন। সভায় মুসলমান নেতারা স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ঐরূপ সাম্প্রদায়িক দাংগা থেকে দূরে থাকার জন্য সাবধান করে দেন।[৩৭৬] কলকাতার দাংগার কথা ভেবে ঢাকায় যাতে ঐরূপ কোন অশান্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের আহ্বানে আহসান মঞ্জিলে এতদাঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐ সভা হয়। সভায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৩৭৭] উক্ত ঘটনা উপলক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

শেষে ৩০ এপ্রিল শুক্রবার আহসান মঞ্জিলে প্রায় তিন হাজার মুসলমানের একটি সভা হয়। সভায় কয়েকজন হিন্দু নেতাসহ পুলিশ সুপার মিঃ বাটনও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা মোতাবেক প্রথমে সংশ্লিষ্ট হিন্দু নেতারা মুসলমানদের নিকট ক্ষমা চেয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানায় ২৫ টাকা জরিমানা দেয়। কিন্তু তাতেও মুসলমানরা সন্তুষ্ট না হলে উপস্থিত হিন্দু নেতারা মুসলমান সমাজের নিকট ক্ষমা চাইলে বিষয়টির মীমাংসা হয়।[৩৭৮] কিন্তু হিন্দু মহাসভার সদস্যরা উক্ত মীমাংসা পছন্দ করেনি এবং এর নিন্দা জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশ করে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যুগপৎ কর্মসূচী দেয়ার মাধ্যমে উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। এই প্রেক্ষিতে ঢাকার নওয়ার হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে খাজা পরিবারের লোকেরা ঢাকাবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করেন। এতদুপলক্ষে ৩ মার্চ ১৯২০ বুধবার বেলা ৩.০০ টায় আহসান মঞ্জিল প্রাংগনে এতদাঞ্চলের হিন্দু মুসলমানদের এক বিরাট সভা হয়। সভায় মওলানা শওকত আলী সহ খেলাফত আন্দোলনের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাও উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য সভায় 'আল্লাহু আকবর' এবং 'বন্দে মাতরম' উভয় ধ্বনিই প্রদান করা হয়। এছাড়া মঞ্চ সজ্জার দৃশ্যপটে অর্ধচন্দ্র ও মসজিদের সাথে ত্রিশূল ও মন্দিরের চিত্র আঁকা হয়। সভার শুরুতে মৌলভীকে দিয়ে কোরআন পাঠ এবং হিন্দু বালকদের দিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো হয়েছিল।[৩৭৯] এমনকি হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য মওলানা শওকত আলী ও খিলাফত আন্দোলনের নেতারা উক্ত সভায় মুসলমানদের গরুর বদলে অন্যান্য পশু দিয়ে কোরবানী করতেও উপদেশ দিয়েছিলেন।[৩৮০]

১৯২৬ সালের ১১ জুলাই আরমানীটোলার মাঠে যখন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা ফুটবল খেলছিল, তখন একটি মুসলমান বালকের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু ছাত্ররা তাকে প্রহার করে। ছেলেটির চীৎকারে তার আত্মীয়রা ছুটে এসে হিন্দু ছাত্রদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এনিয়ে এক পর্যায়ে স্থানীয় মহল্লার হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক মারামারি বাঁধার উপক্রম হয়। এই সময় ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ কিছু সংখ্যক পুলিশ এবং এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সাথে নিয়ে তথায় উপস্থিত হয়ে দাংগাটি থামিয়ে দেন।[৩৮১]

ঢাকার বিক্ষুব্ধ মুসলমানেরা ১৯২৬ সালে এক সময় মসজিদের পাশ দিয়ে চিরাচরিত জন্মাষ্টমীর মিছিলকেও বাদ্য বাজিয়ে যেতে দিতে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ফিলপট স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে একটি সভা করেন। সভায় উদারমনা নওয়াব হাবিবুল্লাহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু দিনের ঐতিহ্যমত জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাদ্য পরিবেশন করার পক্ষে মত দেন। ফলে মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রথাটি অব্যাহত রাখার আদেশ দেন। এতে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হয়।[৩৮২] বিক্ষুব্ধ মুসলমানেরা ঐ বছর হিন্দুদের জন্মাষ্টমীতে যোগ দেয়নি। অন্যদিকে জন্মাষ্টমী মিছিলের দিনেই কাকতালীয়ভাবে মুসলমানদের আখেরী চাহার সোম্বা পালনের দিবস ছিল। জন্মাষ্টমীর মিছিলকারীরা নওয়াব ইউসুফ মার্কেটের নিকট দাদন মিয়া মসজিদের সামনে সমবেত হয়ে উচ্চ শব্দে বাদ্য বাজায়। এছাড়া তাঁরা সেবারই প্রথম জন্মাষ্টমীর মিছিলে 'হিন্দু ধর্মের জয়' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি যোগ করে। এতে মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়। এমনকি মিছিল এলাকা থেকে অনেক দূরে নারিন্দা ও মালিটোলা মসজিদের সামনেও তাঁরা এসব ধ্বনি দেয় এবং সেখানে এর প্রতিবাদকারী মুসলমানদের তাঁরা অপমান করে। এমতাবস্থায় শহরে শান্তিভংগের উপক্রম হলে নওয়াব হাবিবুল্লাহ দ্রুতগতিতে ঐসব স্থানে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে বাদামতলীর একটি মসজিদে হিন্দুগণ কর্তৃক গুলি বর্ষণের একটি ঘটনা মুসলমানদের এতই উত্তেজিত করে যে তাঁরা নওয়াবের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দাংগায় লিপ্ত হয়। এতে বেশ কিছু জানমালের ক্ষতি হয়।[৩৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৬ সালের ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পরে প্রায় ৪ বছর ঢাকায় তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলছিল। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারী সরকারী আদেশ অমান্য করে ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় আজাদী দিবস পালনার্থে মিছিল বের করে। কিন্তু সেবারও তাঁরা নারিন্দা মসজিদের নিকট গিয়ে গোলমাল করে। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ মসজিদে ঢুকে গিয়ে একটি কোরআন শরীফ ছিন্ন ভিন্ন করে মুসলমানদের মনে চরম আঘাত দেয়। এ ঘটনার পরে ঢাকায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাংগা শুরু হয়ে যায়। আরমানিটোলায় পিকচার হাউসের নিকট ঢাকায় প্রথম বড় ধরনের একটি দাংগা হয়। এপ্রেক্ষিতে জনগণকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দাংগা নিরসন করার মানসে নওয়াব হাবিবুল্লাহ নিজের সভাপতিত্বে ঢাকার গণ্যমান্য হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের মে মাসে শাঁখারী বাজারে সংঘটিত একটি দুর্ঘটনা উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়। সেখানে একজন মুসলমান ঘোড়া গাড়ীওয়ালার গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে এক হিন্দু বালিকা আহত হয়। শাঁখারীরা গাড়ীওয়ালাকে ভীষণভাবে মারধোর করে। এমনকি তাদের একজন ঢাকা কোর্ট এলাকার বার লাইব্রেরীর নিকট অবস্থিত মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলে হিন্দুরা সেখানেও ইট পাটকেল ছোঁড়ে। মুসলমানেরা এতে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয় এবং শাঁখারী বাজারের রাস্তায় মোড়ে মোড়ে পিকেটারদের বসিয়ে তাঁদের বাইরে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়।[৩৮৪] ঢাকার নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ কলকাতা থেকে এই দাংগার খবর পেয়ে যথাশীঘ্র ঢাকায় ফিরে আসেন। তিনি উভয় পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেখানে ২৪ মে ১৯৩০ শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পান। ইতোমধ্যে ২২ মে বংশালে দুজন হিন্দু মুসলমান বালকের মধ্যে লাটিম খেলা নিয়ে বেঁধে যাওয়া সংঘর্ষে উভয়পক্ষের বড়রাও জড়িয়ে পড়ে। নওয়াব সাহেব নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে দ্রুত সেখানে যান। তিনি ৫ জন হিন্দু এবং ৫ জন মুসলমান নেতাকে নিয়ে গঠিত কমিটিকে উক্ত ঘটনার তদন্তে লাগান। এরমধ্যে একজন মুসলমান দুর্বৃত্ত এমপায়ার থিয়েটার এলাকায় জনৈক হিন্দুকে অপমান করে। এ সংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথেই নওয়াব সাহেব সেখানে গিয়ে দুর্বৃত্তটাকে আচ্ছামত শাস্তি দেন। এদিকে শহরের পরিস্থিতি গুরুতর হবার আভাস পেয়ে ২৪ মে তারিখেই নওয়াব হাবিবুল্লাহ ঢাকার কালেকটর সাহেবকে সেনাবাহিনী তলব করতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু ২৪ মে রাতে ফকিরাপুলে আওলাদ হোসেন নামে জনৈক মুসলমান যুবক হিন্দুগণ কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। উক্ত নিহত ব্যক্তির শবযাত্রায় হিন্দুরা আক্রমন করলে সারা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহরূপ ধারণ করে। অসংখ্য হিন্দু মুসলমানের ঘরবাড়ী দোকান-পাট লুট পাট করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দাংগায় অনেক লোক হতাহত হয়। সরকার বহুসংখ্যক পুলিশ ও সেনা সদস্য দাংগা দমনে নিয়োগ করেন। মাসখানেকের মধ্যে দাংগাকারী ১২৯ জন হিন্দু এবং ১৫৯ জন মুসলমান গ্রেফতার হয়।[৩৮৫] দাংগার সময় নিযুক্ত গুর্খা ও হিন্দু সেনারা স্বভাবতই হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই নওয়াব হাবিবুল্লাহ সরকারকে দিয়ে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে মোতায়েনের ব্যবস্থা করেন।[৩৮৬] এছাড়া নওয়াব সাহেব নিজেও ঐ সময় ভীষণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি নির্ভিকভাবে হিন্দু পল্লীতে ঘুরে ঘুরে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেন।[৩৮৭]

ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উল্লেখিত কার্যাবলী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁরা যথা সময়ে ঐ সব ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করলে ঢাকায় আরো আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক দাংগা ভয়াবহরূপ ধারণ করতো এবং তাতে বহু জান মালের ক্ষয়ক্ষতি হতো। দাংগা কালে ঢাকার নওয়াবদের সময়োচিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এতদাঞ্চলে অন্যসব দাঙ্গা প্রধান এলাকার তুলনায় ঢাকায় ক্ষয়ক্ষতি বেশ কম হয়েছিল একথা নিসংকোচে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। এমনকি একই লেখক তাঁর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পৃথক পৃথক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ ব্রেডলী বার্ট তাঁর '*রোমান্স অব এ্যান ইষ্টার্ণ ক্যাপিটাল*' (লন্ডন ১৯০৬ পৃঃ ২৮২) শীর্ষক গ্রন্থে খাজা আব্দুল হাকিমের নাম উল্লেখ করলেও তিনি তাঁর '*টুয়েলভ মেন অব বেংগল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী*' (কলকাতা ১৯২৫ পৃঃ ১৭৩-৭৪) শীর্ষক গ্রন্থে মৌলভী আব্দুল্লাহর নাম উল্লেখ করেছেন।

২। লোকনাথ ঘোষ, *মডার্ণ হিষ্টরী অব দি ইন্ডিয়ান চীফস, রাজাস, জমিনদারস এন্ড সি, ভল্যুম*- ২, কলকাতা ১৮৮১, পৃঃ ২৯১-৯২। (অতঃপর গ্রন্থটি সূত্রের ক্ষেত্রে-লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস*, বলে বিবেচ্য হবে।)

৩। এ, ক্লাউড ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস অব বেংগল*, ভল- ১, কলকাতা *১৯০৭ পৃঃ ১৯৫*, (অতঃপর-ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস*, প্রাগুক্ত বলে বিবেচ্য হবে।)

৪। ক্লাউড ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৫

৫-৬। রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, ডঃ আ.ম.ম. শরফুদ্দীনের বংগানুবাদ, ঢাকা- ১৯৮৫, পৃঃ ১৮১, (অতঃপর-তায়েশ, *তাওয়ারিখ, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ* বলে বিবেচ্য।)

৭। *ব্রেডলী বার্ট*, *টুয়েলভ মেন অব বেংগল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী*, কলকাতা *১৯২৫* পৃঃ ১৭৩-৭৪,(অতঃপর-বার্ট, *টুয়েলভ মেন*, বলে বিবেচ্য হবে।)

৮। *ব্রেডলী* বার্ট, *রোমান্স অব এ্যান ইষ্টার্ণ ক্যাপিটাল, লন্ডন ১৯০৬ পৃঃ* ২৮৩। (অতঃপর-বার্ট, *রোমান্স*, বলে বিবেচ্য হবে)

৯। সি.ই. বাকল্যান্ড, *বেংগল আন্ডার দি লিউটেন্যান্ট গভর্ণরস, ভল*-২, কলকাতা ১৯০১ পৃঃ ১০২৮।

১০। এস.এম. তৈফুর, *গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, ঢাকা- ১৯৫৬* (অতপর-তৈফুর, ঢাকা, বলে বিবেচ্য) পৃঃ ৩২২।

১১। এ.এইচ. দানী, *ঢাকা এ রেকর্ড অব ইটস চেঞ্জিং ফরচ্যুনস, ঢাকা- ১৯৬২* (অতপর- দানী, ঢাকা, বলে বিবেচ্য) পৃঃ ১১৮।

১২। একদিন খাজা আলীমুল্লাহ সাদুল্লাপুরে (বাইগুনবাড়ী) শিকার করতে গিয়ে তাঁর ভাইপো ও জামাতা সাবা-কে বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরব গাঁথা অনেকটাই ভুলে যাওয়া হয়েছে। এখনো যা মনে আছে তা তুমি লিখে রাখলে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। সাবা এই নির্দেশে গ্রন্থটি রচনা করেন। আব্দুর রহিম সাবা, তারিখ-এ কাশ্মীরীয়ান-এ ঢাকা, অপ্রকাশিত ফার্সী পান্ডুলিপি, পৃঃ ৪ (অতপর গ্রন্থটির সূত্রের ক্ষেত্রে- *সাবা, তারিখ*, বলে বিবেচ্য হবে)

১৩। আব্দুর রহিম সাবা, *তারিখ-এ কাশ্মীরীয়ান-এ ঢাকা* (অপ্রকাশিত, ফার্সী পান্ডুলিপি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ডাক সংখ্যা ডি.ইউ. ১১৪ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তাওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মীরীয়াহ* (উর্দু পান্ডুলিপি অপ্রকাশিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ডাকসংখ্যা এইচ.আর-৬। গ্রন্থ দুটোর ফটোকপি আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৪। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ, *ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব দি পার্সিয়ান, উর্দু এন্ড এরাবিক ম্যানাসক্রিপ্টস ইন দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী*, ভল-১ (১৯৬৬) পৃঃ ১৪ এবং ভল-২, (১৯৬৮) পৃঃ ৪০৭।

১৫। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য (উনবিংশ শতাব্দী) ঢাকা ই.ফা. অক্টোবর, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৭-৮৩ এবং মুহাঃ আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম, ডিসেম্বর ১৯৮৬ পৃঃ ২১।(অতঃপর-আবদুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য* এবং আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, বলে বিবেচ্য হবে।)

১৬। যেমনঃ উভয় গ্রন্থকারই খাজা পরিবারের আদি পুরুষ খাজা আব্দুল হাকিমকে কাশ্মীরের 'শাসনকর্তা' বলেছেন। কিন্তু কাশ্মীরের মুসলিম ইতিহাসে এই নামে কোন শাসকের নাম পাওয়া যায় না। *ডঃ আর. কে. পারমু, এ হিস্টরী অব মুসলিম রুল ইন কাশ্মীর* (১৩২০-১৮১৯) নিউ দিল্লী- ১৯৬৯ পৃঃ ৩৩৩-৩৩৮।

১৭। আব্দুর রহিম সাবা, তারিখ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫-৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২১। সাবা কিংবা নওয়াব আহসানুল্লাহ, খাজা আব্দুল হাকিমের কাশ্মীর শাসনকালের কোন তারিখ উল্লেখ করেনি। তায়েশ লিখেছেন, কাশ্মীরের শাসকদের নিকট তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। তাই হয়তো খাজা আব্দুল হাকিম শাসনকর্তার বদলে কাশ্মীরের কোন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। অবশ্য গ্রন্থকারদ্বয় তাঁর নাম বলতে যে 'হাকিম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেটা প্রদেশের গভর্ণর না হয়ে তাঁর অধীনস্থ কোন প্রশাসক পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

১৮-১৯। আঃ রহিম সাবা, তারিখ, প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি পৃঃ ৬-৭, থেকে উদ্ধৃত করেছেন, মুহাঃ আব্দুল্লাহ, নওয়াব আঃ গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ, অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশের জন্য গৃহীত) পৃঃ ১৩। (উল্লেখ্য,বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।)

২০। হাকিম হাবিবুর রহমান, আসুদগানে ঢাকা, মূল উর্দু থেকে মওলানা আকরাম ফারুক ও রুহুল আমীন চৌধুরী কর্তৃক বংগানুবাদ, ঢাকা- ১৯৯০ পৃঃ ৫৪ ও ৮১। পীর শাহ্ নূরী ঢাকার মোগল নায়েবে নাজিম নওয়াব জসরত খানের মুর্শিদ ছিলেন। তৈফুর, ঢাকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৬ ।

২১-২২। আব্দুর রহীম সাবা, তারিখ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫-৬ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ, তারিখে খান্দান, পৃঃ ৪৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, মুহাঃ আব্দুল্লাহ, নওঃ সলিমুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২-২৩ এবং মোঃ আলমগীর, নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬ষ্ঠ খন্ড, জুন ১৯৯১ খ্রীঃ পৃঃ ৩৩-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। সাবা, তারিখ, পৃঃ ১১-১২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪। সম্ভবতঃ এটা ছিল আঃ কাদেরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহ।

২৪-২৫। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তাওয়ারিখ-এ-খান্দান-এ-কাশ্মীরীয়াহ*, (অপ্রকাশিত উর্দু পান্ডুলিপি) (অতপর গ্রন্থটির সূত্রের ক্ষেত্রে- নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান* বলে বিবেচ্য হবে) প্রাগুক্ত পৃঃ ৪-৫। বেগম বাজারে উক্ত স্থানে এখন ঢাকার নওয়াবদের পারিবারিক গোরস্থান রয়েছে।

২৬। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯ এবং নওঃ আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪-৪৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ২৩।

২৭। ঢাকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আলোচ্য যুগে যদিও বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে চলে গিয়েছিল, তথাপি পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে মসলিন ইত্যাদি শিল্প ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিকে ভালভাবেই টিকিয়ে রেখেছিল। বণিকদের সুবিধার্থে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান (১৭৩৩-৩৪ খ্রীঃ) পুরানো বাদশাহী বাজারের (চকবাজার) পুনর্নির্মাণ করে আয়তন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেন। বাজারটি গ্রীক, কাশ্মীর, আর্মেনী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। (হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮ এবং কে.এম. মোহসীন, *ঢাকা পাষ্ট প্রেজেন্ট ফিউচার*, শরিফুদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত- ১৯৯১ পৃঃ ৬৬, এবং তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ২৪১) অতএব ঐ আমলে ঢাকার নওয়াবদের পূর্বপুরুষদের কাশ্মীর থেকে বাণিজ্যোপলক্ষে ঢাকায় আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া মৌঃ আব্দুল্লাহর ছেলে খাজা হাফিজুল্লাহ ১৭৩৫ খ্রীঃ সিলেটে তাঁর নানাবাড়ী জন্মে। হাফিজুল্লাহ ছিল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। তাই ১ম পুত্র আহসানুল্লাহ হয়ত আরো দুই বছর আগে জন্মেন এবং আব্দুল্লাহ হয়তো আরো দুই বছর আগে সিলেটে বিয়ে করেন। এভাবে হিসেব করলে তাঁর ঢাকায় আগমণের ১৭৩০ সালটি এসে যায়।

২৮। ১৮৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত আহসানুল কাসাস পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থের প্রথম থেকে কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত আহসানুল্লাহ তাঁর পিতা আঃ গণির জীবদ্দশায় পরিবারের উক্ত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা প্রায় শেষ করেন। কারণ পিতা পুত্রের মৃত্যু হয় মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে।

২৯। আব্দুল্লাহর বাকী চার সন্তান ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তাওয়ারিখে খান্দানে কাশ্মীরীয়াহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬-৪৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫। উল্লেখ্য যে, খাজা হাফিজুল্লাহ ৮০ বছর বয়সে ১৮১৫ খ্রীঃ মারা যান (সাবা, *তারিখ*, পৃঃ ৩৪-৩৫) তাই তিনি ১৭৩৫ খ্রীঃ জন্মেছিলেন বলে ধরা যায়।

৩০। মুহাঃ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫।

৩১। তৈফুর বলেন, এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা আঃ ওহাব ১৭৫৬ খ্রীঃ দিকে সিলেটে বসতি স্থাপন করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই বংশের দুইভাই খাজা আহসানুল্লাহ ও খাজা হাফিজুল্লাহ সিলেট থেকে ঢাকায় এসে পূর্বদরজায় বসতি স্থাপন করেন (তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২২) উল্লেখ্য, উক্ত দুই ভাইয়ের পিতা মৌঃ আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয় ১৭৯৬ খ্রীঃ। অতএব, তৈফুরের বর্ণনামতে তাঁরা অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ তাঁর পিতার জীবদ্দশায়ই হয়ত সিলেটস্থ নানার বাড়ী থেকে ঢাকায় চলে আসেন। কিন্তু তাঁদের পিতার নিবাস যে ঢাকাতেই ছিল, তা তৈফুরের হয়তো জানা ছিল না।

৩২। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুপ্ত পৃঃ-১০।

৩৩। জাদুঘর তৈরীকল্পে, আহসান মঞ্জিল অধিগ্রহণকালে সেখানে প্রাপ্ত নওয়াবদের ব্যবহৃত পুরানো কাগজপত্র, পুরানো দাখিলা, দলিল এবং জমিদারী সম্পর্কীয় দলিলপত্র, রশিদ, নোটিশ ইত্যাদি কাগজপত্র। অতপর সূত্রের ক্ষেত্রে এগুলো '*পুরানো দলিলপত্র*' নামে বিবেচ্য হবে। নথি পৃ ঃ এ-৮

৩৪-৩৫। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, নবাব পরিবারের উত্থান ও পতন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৮ আগস্ট ১৯৭৮

৩৬। সাবা এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ ছাড়াও প্রাচীন লেখকদের মধ্যে লোকনাথ ঘোষ, ক্যাম্পবেল, ব্রেডলী বার্ট, বাকল্যান্ড, তায়েশ, আওলাদ হাসান এঁরা সবাই নওয়াবদের উল্লেখিত পূর্বপুরুষদের নামের আগে খাজা উপাধি ব্যবহার করেছেন। আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত ১১০০ বংগাব্দে লেখা প্রাচীন দলিল পত্রেও খাজা উপাধি পাওয়া যায়। ভারতে সুলতানী শাসনামলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে নিয়োজিত রাজস্ব বিষয়ক কর্মকর্তাকে সাহেব-ই- দেওয়ান বলা হতো। তিনি খাজা নামেও পরিচিত ছিলেন। আই.এইচ. কোরেশী, *এডমিনেস্ট্রেশন অব সুলতানাত অব দিল্লী* পৃঃ ১৮৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-আঃ করিম, *ঢাকা দি মোগল ক্যাপিটাল*, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪ পৃঃ ৫২।

৩৭। মোঃ আলমগীর, ঢাকার নওয়াব ঃ ঐতিহাসিক রূপরেখা, নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশিত পত্রিকা, ৬ খন্ড, জুন-১৯৯১ এবং নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, ৩ সংস্করণ ১৯৯৫ খ্রীঃ পৃ ৩২৪। খাজা শব্দটি ফার্সী, 'খাওয়াজা' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসলামী দেশ সমুহে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত একটি উপাধি। গোড়ার দিকে এটা জ্ঞানী, শিক্ষক, বণিক, ইমাম প্রভৃতি ব্যক্তি বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগে মিশরে এটা ছিল- পারস্য অন্যান্য নামকরা বিদেশী বণিকদের উপাধি। সামানীদের আমলে বুজুর্গ উপশব্দ যুক্ত হয়ে এটা আমলাতন্ত্রের প্রধানকে নির্দেশ করতো। পরবর্তীকালে বহুলভাবে উজির, শিক্ষক, গ্রন্থকার, ধনীব্যক্তি এবং বণিককে এ উপাধি দেয়া হতো। উছমানী সাম্রাজ্যে এটা ব্যবহৃত হতো, 'উলামা' অর্থে এবং এর বহুবচন 'খাওয়াজেগান' দ্বারা বিশেষ শ্রেণীর বেসামরিক কর্মকর্তাদের বুঝাত। আধুনিক তুরস্কে এটা ধর্মীয় পেশাদার ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খন্ড, ইসালামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯০, পৃঃ ৪৪৭।) বর্তমান কথ্য আরবীতে যে কোন বিদেশীকে খাজা বলে অভিহিত করা হয়। তুর্কী ভাষায় শব্দটি হোজা আকারে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে- যাতে শিক্ষিত লোক বুঝায়, বাংলা বিশ্বকোষ ২য় খন্ড, ঢাকা মুক্তধারা-১৯৮৯ পৃঃ ২৭২।

৩৮। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ-৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। ফরাশগঞ্জে বিলাসবহুল প্রাসাদোপম বাড়ীতে (বর্তমান রূপলাল হাউজ) থেকে খাজা আরাটুন মোরগ-কবুতরের লড়াই দেখা ও ঘুড়ি উড়াতে ভালবাসতেন বলে লোকেরা তাঁকে সৌখিন আরাটুন বলে ডাকতো। ময়মনসিংহের হোসেনশাহী পরগনায় তাঁর জমিদারি ছিল। তাঁর বংশধরেরা তাঁর জমিদারি খাজা আলীমুল্লাহর নিকট বিক্রি করে কলকাতায় চলে যায়। (তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ৩৪১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, পৃঃ ১৫৮)।

৪০। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ১৫৯ এবং আজিমুশ্শান হায়দার, *ঢাকা হিস্টরী এন্ড রোমান্স ইন প্রেস নেমস*, ঢাকা ১৯৬৭ পৃঃ ৩২ (অতপর আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স* বলে বিবেচ্য) খাজা বাগদাসোর সম্ভবত গ্রীক ব্যবসায়ী ও জমিদার ছিলেন, তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।

৪১। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫১।

৪২। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৫৯।

৪৩। ডঃ এম. এ. রহিম, *সোশাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেংগল*, আসাদুজ্জামানের বংগানুবাদ, ২য় খন্ড ১ম পুর্নমুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃঃ ২৪। মোগল শাসকরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান নির্বিশেষে খাজা উপাধি প্রদান করতেন। ঢাকার খাজা দেওয়ান মহল্লাটির নামকরণ হয়েছিল দেওয়ান খাজা মুরলীধর বাহাদুরের নামানুসারে, যিনি নওয়াব শায়েস্তা খাঁর স্বরাষ্টমন্ত্রী ছিলেন। ঢাকার খাজা ডালসিংহ লেনটি জনৈক হিন্দু মোগল রাজকর্মচারীর নামে নামকরণকৃত। (তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ১৮৭ এবং আজিমুশ্শান হায়দার, *ঢাকা, রোমান্স*, পৃঃ ২৮) মীরজুমলা ঢাকা থেকে কুচবিহার অভিযানের সময় এবং এহতিশাম খানের অস্থায়ী সুবাদারের দায়িত্ব পালনকালে রাজকীয় জটিল বিষয় মীমাংসার ভার খাজা ভগবান দাস' 'সুজাইর' হাতে ন্যস্থ ছিল। যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস ১৩১৯ বঙ্গাব্দ ১ম খন্ড পৃঃ ভূমিকা ৬ দ্রঃ। মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁর আমীর ওমরাহদের মধ্যে খাজা উপাধিধারী ডজনখানেক লোকের নাম পাওয়া যায়, তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ১১৭-২০ দ্রঃ)।

৪৪। সিরাজুল ইসলাম, *বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৪৫। *প্রাকটিক্যাল ডিকশনারী*, ১১শ সংস্করণ, আলহাবাদ থেকে উদ্ধৃত- মোঃ আব্দুল্লাহ, *নওঃ আঃ গণি ও আহাসনুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ২।

৪৬। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৩৩।

৪৭। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, বংগানুবাদ প্রাগুক্ত পৃ ঃ ১৮১।

৪৮। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৪৪-৪৮ থেকে উদ্ধৃত-মোঃ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ২০-২২ এবং *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ১৪। শাহ্ নূরী নায়েবে নাজিম জসরত খাঁর আধ্যাত্মিক গাইড ছিলেন। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৬

৪৯। সি, ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ১৯৫-৯৬ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃ ঃ ১৮১ এবং আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৫৪-৫৫ এবং সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৩৪। তৈফুর সাহেব আহসানুল্লাহর হজ্জে গমনের সাল ১৮১৩ খ্রীঃ এবং নূর আহমদ ১৮১৫ খ্রীঃ বলেছেন (তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৩২৩ এবং আবুয যোহানুর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, ঢাকা-১৯৭৫ পৃঃ ১৩) যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আহসানুল্লাহ তাঁর পুত্র আলীমুল্লাহকে নাবালক রেখে যান বলা আছে। অথচ ১৮১৩ খ্রীঃ আলীমুল্লাহ সাবালক হয়েছিলেন। এমনকি তখন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল গণিও তখন জন্মেছেন।

৫০। তায়েশ, *তাওয়ারিখ* বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ১৮১।

৫১। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৪৬, উদ্ধৃত করেছেন -আবদুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ* পৃঃ ১৪।

৫২। কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে গিয়ে প্রথম দিকে ঢাকার খাজা পরিবারে কোন নাচ গানের ব্যবস্থা ছিল না। বৈষয়িক কাজকর্মে পারদর্শী খাজা হাফিজুল্লাহ কবিতা ও গজল চর্চা করলেও তাঁর সময় পর্যন্ত নাচ-গান হয়নি। তাঁর পুত্র আব্দুল গফুরের সময় অন্য পরিবার তথা আত্মীয় স্বজনদের উদ্যোগে এ পরিবারে নাচ-গানের প্রচলন শুরু হয়। খাজা আলীমুল্লাহই প্রথম খোলা খুলিভাবে নাচ-গান শুরু করেন। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৪৩, ১৪৪ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২-২৩।

৫৩। সূফীদের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক নেতা বা সাধকদের 'খাজেখান' বলা হয়ে থাকে। কঠিন বিপদাপদ ও সমস্যা সমাধানে আধ্যাত্মিক নেতা বা সাধকগণ যে বিশেষ দোয়া দরুদ পাঠান্তে মুনাজাত করে থাকেন তাকে 'খতুমে খাজেগান' বলা হয়। মৌঃ মোহাঃ শামছুল হুদা, নেয়ামুল কোরআন, ২২ সংস্করণ ১৯৮৪ পৃঃ ১৯৯।

৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ নভেম্বর ১৮৮৯ পৃ ৭।

৫৫। কাশ্মীরী ম্যাগাজিন, লাহোর, ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ পৃঃ ২৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, মুহাঃ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৮, ৩০৯।

৫৬। মুহাঃ আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০৯। কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত হওয়ায় ঢাকার নওয়াবগণ চিরদিনই কাশ্মীরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। কাশ্মীরী পরিচয় দিয়ে কেউ ঢাকায় এলে নওয়াবগণ তাঁদের যথাসম্ভব সহায়তা করতেন। অনেকে এই সুযোগ গ্রহণ করে ঠকবাজিও করতেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ উর্দুতে পারদর্শী জনৈক মোঃ জালালুদ্দিন ঢাকায় এসে কাশ্মীরি পরিচয় দিয়ে নবাবের সহানুভূতি পান এবং ভদ্রবেশে অনেকের কাছ থেকে ২৫০ টাকা ধার নিয়ে একদিন পালিয়ে যান (ঢাকা প্রকাশ, ১৫ মে, ১৮৮৭ খ্রীঃ পৃঃ ৭)।

৫৭। হোগরাথ মিলনে জে, *গ্রেট ব্রিটেন ইন দি করোনেশন ইয়ার, লন্ডন, জুন ১৯১৪ (লিডিংম্যান অব দি এম্পায়ার, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া)* পৃঃ ১৮২-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৮। হোগরাথ, *ঐ লিডিংম্যান,* পৃঃ ২৮৩ এবং আজিমুশ্শান হায়দার সম্পাদিত, *এ সিটি এন্ড ইটস সিভিক বডি* (অতপর-আজিমুশ্শান, *সিভিকবডি* বলে বিবেচ্য) ঢাকা-জুন ১৯৬৬ পৃঃ ৮০ এবং মুহাঃ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ই, ফা, জুন-১৯৯১ পৃঃ ৬৭, ৮৮-৮৯)

৫৯। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষনা কেন্দ্র পত্রিকা, ৬ খন্ড ১৯৯১ পৃঃ ৫৪।

৬০। খাজা পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক খাজা আঃ গণিকে মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব প্রদান উপলক্ষে ৮মে ১৮৪৬ খ্রীঃ সম্পাদিত ফার্সী ওয়াকফনামার ইংরেজী অনুবাদ দ্রঃ। *পুরানো দলিলপত্র* (১৯১৮ সালে নওয়াব হাবিবুল্লাহ ও খাজা আতিকুল্লাহর মধ্যে মোতাওয়াল্লী নির্ধারণ নিয়ে সংঘটিত মামলা সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সহায়ক পত্রাদি। যেমন-আরজি, স্বাক্ষীর জবানবন্দী, সওয়াল-জওয়াব, মামলার রায় ইত্যাদি নিয়ে বাঁধানো (নওয়াবদের নিজস্ব প্রেসে ছাপানো) কপির ব্যক্তিগত সংকলন, আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত, *(ইনডেক্স অব পেপার্স) এবং ক্রনোলজিক্যাল লিস্ট অব ডকুমেন্টস ইন আপীল ফ্রম অরজিনাল ডিক্রি নং-৭৪ অব ১৯১৮।* অতপর সূত্রের ক্ষেত্রে দলিলপত্রগুলো ইনডেক্স অব পেপার্স-বলে বিবেচ্য)। পুস্তিকার পৃঃ নং-৮৪-৮৫ ও ১৪৫ এবং ২ দ্রঃ এবং পুরানো দলিলপত্র, আহসান মঞ্জিল যাদুঘরে জীর্ণ কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত পৃঃ এ-৮।

৬১। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭।

৬২। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭

৬৩। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯-২১ আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭-১৯।

৬৪। খাজা হাফিজুল্লাহ, মৌলভী হাফিজুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৮১।

৬৫। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮-৩৯, এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৮১।

৬৬। মুহাম্মদ আঃ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯ পৃঃ ৪১। ১৭৪১-৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত আগাবাকের বরিশাল জেলার বুযুর্গ উমেদপুর ও সলিমাবাদ পরগণা দুটোর জমিদার ছিলেন এবং প্রথম পরগনায় নিজ নামানুসারে 'বাকরগঞ্জ' নামে একটি 'গঞ্জ' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বৃটিশ আমলে ওখানে একটি জেলা প্রতিষ্ঠা হলে এর নাম রাখা হয় 'বাকরগঞ্জ' জেলা। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের গোলযোগে আগাবাকের পরিবার দুর্দশায় পতিত হলে ঢাকার দিওয়ান রাজবল্লভ বুজুর্গ-উমেদপুরের জমিদারী হস্তগত করেন। নওয়াব মীর কাসিমের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হলে, কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের জমিদারী ভগ্নদশায় পতিত হয়। 'ভূকৈলাসের ঘোষালগণ রাজবল্লভ পরিবার থেকে সলিমাবাদ পরগণা ক্রয় করেন। বুজুর্গ উমেদপুর পরগনায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারী ও তালুকের সৃষ্টি হয়। (জে.এন. সরকার, *বেংগল নবাবস,* পৃঃ ৪৩ এবং এইচ, বেভারিজ, বাকরগঞ্জ পৃঃ ৪৩, ১১৮ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫-৩৬) খাজা হাফিজুল্লাহ বুজুর্গ উমেদপুর পরগনার ১৩ আনা জমিদারী কেনেন এবং বাকী ৩ আনা শায়েস্তাবাদের জমিদারদের অধিনে চলে যায় (*পুরতান দলিল, ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৭) সৈয়দ বলে দাবীকৃত বাকেরগঞ্জ জেলার শায়েস্তাবাদের জমিদারগণ প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পরিবার ছিলেন। শায়েস্তাবাদ পরগণা ছাড়াও সুলতানাবাদ পরগণার কিছু অংশ এবং সুন্দরবনের আয়লা ও ফুলঝুরির কতক অঞ্চল তাঁদের জমিদারীর অর্ন্তভুক্ত ছিল। চারামনের নিকট আইলাতে তাঁদের বাসভবন ছিল, আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৭। কাঁকড়া ধানগাছের ডগা কেটে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করায় ১৭৯৯ খ্রীঃ বাকেরগঞ্জের বুজুর্গ উমেদপুর পরগনা ও এর প্বার্শবর্তী আরো সাতটি জমিদারী এলাকায় সরকার ৪২,২৬৪ টাকার রাজস্ব আদায় সাময়িকবাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। উল্লেখিত কারণে ঐ সময় ঐ অঞ্চলে অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়ে যায়। জেমস টেইলর, *টপোগ্রাফী,* মোঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক বংগানুবাদ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৩, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭৭।

৬৭-৬৮। এইচ. বেভারিজ, বাকরগঞ্জ পৃঃ ১১০-১৫, ১২৩,১৫৬ থেকে উদ্ধৃত- আঃ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১, এবং সিঃ ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬।

৬৯। সিরাজুল ইসলাম, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ১৮ আগস্ট ১৯৭৮। খাজা আলীমুল্লাহকে প্রফেসর ইসলাম খাজা হাফিজুল্লাহ্র ভাই বলেছেন, যা সঠিক নয় প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ভাইপো ছিলেন।

৭০। বলদাখাল পরগানা ঃ বলদাখাল ও গংগামন্ডল পরগনাদ্বয় ঈশা খাঁর সোনারগাঁও জমিদারীর অর্ন্তভুক্ত ছিল। অস্টাদশ শতকের প্রারম্ভে এই পরগণা দুটি নিয়ে ঢাকার আগাসাদেকের বলদাখাল জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশা খাঁর পরিবারের সাথে আগাসাদেকের আত্মীয়তা ছিল। ১৭১৩ খ্রীঃ আগাসাদেক মোগল সম্রাটের নিকট থেকে পইটকরা পরগনাও লাভ করেন। ১৭২২ খ্রীঃ আগাসাদেকের পুত্র মীর্জা ভেলের, বলদাখাল ও গঙ্গামন্ডলের জমিদার ছিলেন বলে মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব তালিকা থেকে জানা যায়। এই সময় আবুল হোসেন নামক আগাসাদেকের এক আত্মীয় পইটকরা পরগনার জমিদারীর স্বত্বপ্রাপ্ত হন, যার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৯৪,৬৩৮ টাকা। ঢাকার মীর আশরাফ আলী আগাসাদেকের জ্যেষ্ঠপুত্র মীর্জা ইব্রাহিমের কন্যাকে বিয়ে করে বলদাখাল পরগনা ও কুড়িখাই মহলের একতৃতীয়াংশের মালিক হন। বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য বলদাখাল জমিদারীর রাজস্ব বাকী পড়ে এবং ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে জমিদারীর অধিকাংশই হাতছাড়া হয়ে যায়। বলদাখাল পরগণার কতক অংশ ঢাকার খাজা পরিবার ক্রয় করে এবং বাকী অংশ ৫২টি তালুকে বিভক্ত হয়ে যায়। বলদাখালের যে সামান্য অংশ আগাসাদেকের বংশধরদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাও ১৮৭০ খ্রীঃ হস্তচ্যুত হয়। আঃ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২-৩৩।

৭১। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬-৪৭। প্রফেসর আব্দুর রহিম তাঁর গ্রন্থে খাজা হাফিজুল্লাহ কর্তৃক বলদাখাল পরগনার জমিদারী ১৮৩৫ সালে ক্রয়ের তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু তা ঠিক নয় কারণ এর বহু আগেই তিনি মারা গেছেন (আঃ রহিম, *মুসলিম সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স ইন বেংগল, ঢাকা-নভেঃ ১৯৭৮,* পৃঃ ৩৫৩ এবং *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১।

৭২। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৯-১০ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৮১।

৭৪। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯-৪০।

৭৪(ক) *প্যানোরামা অব দি সিটি অব ঢাকা, প্রকাশক মেসার্স ডিকিনসন, ১১৪, নিউ বন্ড স্ট্রীট, লন্ডন,* সূচী ক্রমিক ৩৯ দ্রঃ: বাড়ীটির পশ্চিম দিকে মীর্জা আনু আলী ও মোঃ আলীর বাড়ী দেখা যায়। হাফিজুল্লাহর দ্বিতল কিন্তু জৌলসহীন বাড়ীটি নদীর একেবারে তীরে দন্ডায়মান। নদীভাংগন রোধকল্পে সেখানে আড়াআড়ি কয়েকটি পাকা ঠেসদেয়াল তৈরী হয়েছিল দেখা যায়। ঐ প্যানোরামা দ্রঃ।

৭৫। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯-৪০।

৭৬। এখনো গ্রামগঞ্জে কবির লড়াই বলে যে গান-বাজনা প্রচলিত আছে, তাতেও অনুরূপ স্বরচিত কবিতা ও ছন্দের প্রতিযোগিতা হতে দেখা যায়। তবে এই প্রথাটি সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিনোদনমূলক কবিতা প্রতিযোগিতার মত ঢাকার খাজা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে 'মুশায়ারা' নামে বিশেষভাবে চালু ছিল এবং তা বাংলাদেশ আমলের পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

৭৭। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০-৫৩ থেকে উদ্ধৃত-মোঃ আব্দুল্লাহ, *নও আঃ গণিও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১।

৭৮। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫।

৭৯। *পুরোনো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৯ এবং সি, ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬। আটিয়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ খান পন্নির পঞ্চম বংশধর মুনির খানের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারী ভাগ হয়ে যায়। বড় ভাই খোদা নেওয়াজ খাঁর অংশ বড় তরফ এবং ছোট ভাই মাদার খাঁর অংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ মাদার খাঁর পুত্র আলিয়ার খাঁর নামে ছোট তরফের বন্দোবস্ত হয়। উত্তরাধিকারী ভাগ বাটোয়ারা ও তত্ত্বাবধানের অব্যবস্থার দরুণ ছোট তরফের জমিদারী দ্রুত অবনতি হয়। ১৮০৬ খ্রীঃ ঢাকার খাজা পরিবার আলিয়ার খান পন্নির দুই কন্যার অংশ ক্রয় করেন (এফ. সসচি, ডিঃ গেজেটিয়ার, ময়মনসিংহ পৃঃ ১৮৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০-৩১)।

৮০। সাবা, *তারিখ* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৯, উদ্ধৃত- মোঃ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আব্দুল গণি ও আহাসানুল্লাহ* পৃঃ ২২।

৮১। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯-৪০।

৮২। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪-৪৭।

৮৩। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৯ এবং সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬ এবং ১৬৫।

৮৪। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯ থেকে উদ্বৃত আব্দুল্লাহ, *আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২

৮৫। *পরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৭ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ খ্রীঃ (খাজা হাফিজুল্লাহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁর জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন তাঁর ছোট ভাই খাজা আলীমুল্লাহ-এই বলে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম তাঁদের লেখায় যে তথ্য দিয়েছেন তা ঠিক নয়। (সিরাজুল ইসলাম, বিচিত্রা, প্রাগুক্ত এবং রফিকুল ইসলাম, ঢাকার কথা ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮২ পৃঃ ১৩৯)

৮৬। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫ এবং আহসানুল্লাহ, *তারিখে খন্দান,* পৃঃ ৪৭-৪৮।

৮৭। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৮ এবং আহসানুল্লাহ, *তারিখে খন্দান,* পৃঃ ৫৫ এবং সি ক্যাম্পবেল, পৃঃ ১৯৬।

৮৮+৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে, ১৮৯৪ খ্রীঃ পৃঃ ৪ এবং *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৬, ৭৯-৮০।

৯০। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ এবং *পুরানো দলিলপত্র* , প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৭।

৯১। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০, উদ্ধৃত- আবদুল্লাহ, *নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* পৃঃ ২৩ এবং বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫। অতএব রমনার বাগান তথা রেসকোর্স ময়দানসহ রমনা পার্ক ইত্যাদি এলাকা খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকেই খাজা পরিবারের মালিকানায় ছিল। আর এইজন্যই নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তৈরীকৃত ভূমির তালিকায় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ঐ এলাকাকে নওয়াব পরিবারের সম্পত্তির অর্ন্তভুক্ত দেখতে পেয়েছেন।

৯২। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ পৃঃ ৪ এবং *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৬,৭, ৮, ৯ ও ৭৯ -৮০ এবং ঐ *ইনডেক্স অব পেপার্স-১* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩

৯৩। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ৬-৭ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স -১,* পৃঃ ৩।

৯৪। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৬-৮, ১৯, ৪০ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* পৃঃ ৩, ৮৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ খ্রীঃ পৃঃ ৪, ৩০ আগস্ট, ১৮৯৬ পৃঃ ৬

৯৫। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-১

৯৬। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ ৮-১০,ঋণ গ্রহনের কারণে দায়িকের প্রাপ্ত এই ভাতা ক্রোক করা সম্ভব ছিল। নওয়াব পরিবারের জনৈক বৃত্তি ভোগী, উকিল রজনীকান্ত চৌধুরীর ঋণ পরিশোধ করতে না পারায়, রজনীকান্ত কোর্টে মামলা করে তাঁর ভাতা ক্রোকের পক্ষে রায় পান। ঢাকা প্রকাশ, ১২ জুলাই এবং ৩০ অক্টোবর ১৮৯১। এই ভাতার পরিমাণ তখন মাসে ৩০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেম্বর ১৮৬৪ পৃঃ৪২৬

৯৭। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৮ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ নং-৮৬।

৯৮। ধনবিবির পুত্রের নাম খাজা আব্দুল গাফফার, পুরানো দলিলপত্র, প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৯ এবং *পুরানো দলিলপত্র, ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৯-৪৪ ও ১৫৬,১৮৩ এবং ঢাকা প্রকাশ ৯মে ১৯১৫ পৃঃ৩।

৯৯। *ঐ ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* পৃঃ ২৩৯। উক্ত সম্পত্তি চতুষ্টয় ছাড়াও খাজা পরিবারের সব সহায়সম্পত্তির ঐক্যতা দৃঢ়কল্পে খাজা আলিমুল্লাহ ও আব্দুল গণি আরো কয়েকটি তৌলিয়তনামা সম্পাদন করেন। এজন্য সার্বিকভাবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তিগুলোর পৃথক

Dhaka University Institutional Repository

পৃথকভাবে পরিচিতি দেয়ার জন্য সেগুলোকে এ, বি,সি, ডি, প্রভৃতি প্রপার্টি (ফান্ড) নামে পরিচিত করা হতো এবং এই অর্থে উক্ত সম্পত্তি চতুস্টয় ছিল 'এ' ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১০০। *পুরানো দলিল*, পৃঃ এ, ৬-৭, ৯-১০ এবং সাবা, *তারিখ* , পৃঃ ১৩১

১০১। *পুরানো দলিল*, পৃঃ এ-৮০

১০২। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১-৩২১।

১০৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৩মে, ১৮৯৪ খ্রীঃ পৃঃ ৪ এবং ২৯ মে ১৮৯৮ খ্রীঃ পৃঃ ৭ এবং *পুরানো দলিল, ঐ* পৃঃ এ-৮০।

১০৪। ঢাকা প্রকাশ, *ঐ* এবং ২২শে ডিসেম্বর ১৯০১ এবং *পুরানো দলিল*, পৃঃ এ-৬, ১০,৪৪, ৮০ ও ৯৪-৯৫ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪

১০৫। হৃদয়নাথ মজুমদার, *দি রেমিনিসেন্স অব ঢাকা*, কলকাতা-১৯২৪ খ্রীঃ পৃঃ ৭৮-৭৯ (অতঃপর-হৃদয়নাথ, *রেমিনিসেন্স*, বলে বিবেচ্য হবে।) এবং শরীফুদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা এ স্টাডি ইন আরবান হিস্ট্রি এন্ড ডেভেলপমেন্ট*, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬ (অতপর- শরীফুদ্দিন, *ঢাকা* বলে বিবেচ্য।) পৃঃ ৯৫, ১০৪। আলোচ্য যুগে বাংলায় সাধারণত গরু, মহিষ ও ছাগল ভেড়ার চামড়ার ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গো-হত্যার প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যভেবে চামড়ার কারবারে আসতে চাইতো না। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু যথা- চামার, মুচি এই পেশায় নিয়োজিত ছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় হিন্দু একটি যৌথ ব্যবসায়ী কোম্পানী চালুকালেই ঘোষনা করেন যে, কোন অবস্থায়ই তাঁরা চামড়ার ব্যবসা করবেন না।(দেখুনঃ *প্রসপেকটাস অব দি ইস্ট বেংগল মার্কেন্টাইল কোঃ লিঃ*, ইন্ডিয়া অফিস ভারনাকুলার ট্রাষ্ট থেকে উদ্ধৃত- শরিফুদ্দিন,ঢাকা , প্রাগুক্ত পৃঃ ১২২ নোট নং-৬১) হিন্দুদের এই মনোবৃত্তি এদেশে আর্মানী, ইরানী ও কাশ্মীরীদের চামড়ার ব্যবসায়ে একচেটিয়া সুযোগ এনে দেয়। আরো উল্লেখ্য ১৮৫০ এর দশকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণে ইউরোপে বাংলাদেশের চামড়ার কদর অত্যধিক বেড়ে যায়। (শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭।)

১০৬। বার্ট, *ট্রেয়েলড মেন*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫ এবং *পুরানো দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৭ এবং শরিফুদ্দন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২-১৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩মে ১৮৯৪।

১০৭। সি. ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬ এবং বার্ট, *ট্রেয়েলড মেন*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬ এবং ঢাকা প্রকাশ-৭ জুন ১৮৮০, পৃঃ ১৪৭।

১০৮। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত-মোঃ আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ এবং *পুরানো দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ এ -৭

১০৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ এবং *পুরানো দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-১৯, ৩০ ও ৪২।

১১০। *পুরানো দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ এ -৭ এবং সি . ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।

১১১। *পুরানো দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৭৯ ও ৯৮ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৮৮০ পৃঃ ১৪৭। নির্মল কুমার গুপ্ত বলেন, খাজীরুন্নেসা কুমিল্লার এক বিখ্যাত জমিদারের কন্যা ছিলেন (নির্মল কুমার গুপ্ত, *ঢাকা'র কথা*, ১১৬৬ বাংলা পৃঃ ৬৪) কিন্তু যতদূর জানা যায়, তিনি বরিশাল এলাকার মহিলা ছিলেন। কারণ বরিশাল-পটুয়াখালীর পুরানো দলিলপত্রে তাঁর নাম পাওয়া যায় বলে নওয়াব পরিবারের প্রবীণ সদস্য খাজা হালিম জানিয়েছেন।

১১২। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা*, ষষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫ এবং মাশরিকী, পাকিস্তানকে উর্দু আদিব, সম্পাদনা- হাফিজ হুসিয়ারপুরী, রেডিও পাকিস্তান, করাচী প্রাগুক্ত পৃঃ উল্লেখ্য, খাজা আলীমুল্লাহ সর্বমোট ৯টি বিয়ে করেন।

১১৩। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৩। ঢাকার বহু মুসলমান বড়লোকের সৎকাজে দানের নিমিত্ত বহু টাকার সম্পত্তি খাজা পরিবারের জিম্মায় ছিল, ঢাকা প্রকাশ, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ খ্রীঃ পৃঃ ৭

১১৪। বার্ট, *ট্রেয়েলড মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫

১১৫। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ, পৃঃ১৮১

১১৬। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯

১১৭। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮-৪৯ এবং আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-২০ এবং মুনতাসীর মামুন, ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, ১ম পুনর্মুদ্রন ১৯৯৪ (অতপর-মামুন, *ঢাকা*, বলে বিবেচ্য।) পৃঃ ২৩০।

১১৮। রেজিল্যান্ড হেবার, *ন্যারেটিব অব এ জার্নি থ্রু দি আপার প্রভিন্সস অব ইন্ডিয়া ফ্রম ক্যালকাটা টু বম্বে* ১৮২৪-২৫, লন্ডন-১৮২৮, ভল-১ পৃঃ ১৫৪ এবং মোঃ আবদুল্লাহ, ঐ পৃঃ ২১

১১৯। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬-৩৭

১২০। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৪১।

১২১। সিরাজুল ইসলাম, *বিচিত্রা*, ১৯৭৮ প্রাগুক্ত,

১২২। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৪২-৪৫

১২৩। তৈফুর, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩।

১২৪। বার্ট, *ট্রেয়েলড মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৪-৭৫।

১২৫। বার্ট, *ট্রেয়েলড মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫-৭৬ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।

১২৬। বি.সি.এ্যালেন, *ইস্টার্ণ বেংগল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ঢাকা, এলাহাবাদ* ১৯১২, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৫ও ৪৫ এবং কেদারনাথ মজুমদার, ঢাকার বিবরণ, ময়মনসিংহ মার্চ-১৯১০, পৃঃ ৪২। আলীমুল্লাহ কর্তৃক ফরাসী কুঠিটি ক্রয়ের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২৭-২৮। সিরাজুল ইসলাম, *বিচিত্রা,* ১৯৭৮ প্রাগুক্ত।

১২৯। দরিয়া-ই-নূর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরবর্তী অধ্যায় নং -৮(৮) পৃঃ দ্রঃ

১৩০। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬। উক্ত মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ১৮ জন সদস্য ছিলেন। রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-৫১ এবং নির্মল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬

১৩১। শাহ্‌ফোরাকী রমনার একটি টিলার উপর বাস করতেন। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২-৮৩

১৩২। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২-৮৩, ৮৬

১৩৩। লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯-৯০

১৩৪। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৮১

১৩৫। ঢাকা প্রকাশ, জানুঃ ৯, ১৮৮১ খ্রীঃ, পৃঃ ৪৮৪-৮৫ এবং আঃ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১। এই রাগে পরবর্তীকালে নওয়াব আব্দুল গণির অংশীদারগণ যখন ১৮৮০ খ্রীঃ তাঁর বিরুদ্ধে অংশীদারিত্ব নিয়ে মামলা উপস্থিত করে, তখন সাদত আলী খাঁন আঃ গণির বিরুদ্ধ দলকে সাহায্য করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুঃ ১৮৮১ খ্রীঃ| উল্লেখ্য,আরো অনেক পরে ১৯০৩ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ করটিয়ার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর এক সৎবোন রওশন আরাকে বিয়ে করে আটিয়া জমিদারীর আরো কিছু অংশ পেয়েছিলেন। যার বার্ষিক নীট পাওনা ছিল ছয় হাজার টাকা মাত্র, (ঢাকা প্রকাশ, ১০ মে ১৯০৩ খ্রীঃ)

১৩৬। *পুরানো নথিপত্র,* রেকর্ড রুম, নওয়াব এস্টেট অফিস এডওয়ার্ড হাউসে প্রাপ্ত (অতপর-*পুরানো নথিপত্র,* বলে বিবেচ্য) পৃঃ এ-১৪, খাজা আলীমুল্লাহ মামলায় জয়লাভ করে আটিয়া জমিদারীর অংশ আইনত প্রাপ্ত হলেও ভাগবাটোয়ারা প্রভৃতি ঝামেলার করণে উক্ত সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আব্দুল গনির সময় ১৮৫৫-৫৬ সালে খাজা পরিবারের নিয়ন্ত্রনে আসে। মোকদ্দমার খরচকৃত পাওনা থেকে মহাত্মা আঃ গণি সাদত আলী খানকে প্রায় ২ লক্ষ টাকার দাবী মাফ করে দিয়ে মাত্র ৮০ হাজার টাকা কিস্তিবন্দী করে দেন। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুঃ ১৮৮১ খ্রীঃ পৃঃ ৪৮৫।

১৩৭। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৮১

১৩৮। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ সি -৬-৯

১৩৯। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ সি -৬। উক্ত ফার্সী অনুলিপিটি আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

১৪০। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ -৮০ এবং ৯৪ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৮২

১৪১। দুরবীণ ৯ জিলহজ্ব ১২৭২ হিঃ থেকে উদ্ধৃত-মোঃ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮। খাজা আলীমুল্লাহর মৃত্যুর পর মৌলভী মোহাম্মদ ফাজিল হরফের হিসেবে তাঁর এপিটাফ রচনা করেন এভাবে,"তারিখ সুনামখ্যাত, আমীর খাজা আলীমুল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর প্রভাব প্রতিপত্তি ও মান-মার্যাদা নিয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করেন।... হায় ঢাকার খাজাদের অন্তিমকালে অনেক ক্রন্দন ও বিলাপ হলো।" তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৮২ এবং মোঃ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃ ৩৬৫।

১৪২। ঢাকা প্রকাশ, আগস্ট ৩০, ১৮৯৬ খ্রীঃ পৃঃ ৫-৭।

১৪৩। হৃদয় নাথ, *রেমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত,পৃঃ ১০৪ এবং ৯৭।

১৪৪। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৮৩। সম্ভবতঃ তাঁর অবর্তমানে পুত্র আহসানুল্লাহর যাতে এ্যাজমালি সম্পত্তি পরিচালনায় কোন বেগ পেতে না হয় এবং মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করলে পুত্র আহসানুল্লাহর মেধাও শ্রমটাকেও সরাসরি কাজে লাগানো যাবে এবং নেপথ্যে আঃ গণি নিজেই সব পরিচালনাও করতে পারবেন। এই ভেবে সুস্থ্য থাকাকলেই আহসানুল্লাহর উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু পরিবারের অনেকেই এতে খুশী হতে পারেননি এবং পরবর্তীতে উক্ত ওয়াকফনামার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ,৭ জুন ১৮৮০ খ্রীঃ পৃঃ ১৪৭।

১৪৫। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৭

১৪৬। আয়নামহলটি ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূমিকম্পে ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং পরে টর্নেডোয় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আয়নামহলের উক্ত সভায় বহিরাগত কেউ ছিল না। আনুষ্ঠানিক নোটিশের বদলে আঃ গণি মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ করে পরিবারের সকলকে সভায় হাজির করেছিলেন। *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৩, ১২০, ১২৪ এবং *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ-এ ৭ এবং ১১-১২ এবং ১৪৬।

১৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ আগস্ট, ১৮৭৪ পৃঃ -২৭১ এবং ২৩ শে আগস্ট, ১৮৭৪। এছাড়াও ৬ নভেম্বর, ১৮৭০, পৃঃ-৩৬৭, ৩৭৩ এবং ৬, ১৩, ও ২০ নভেম্বর ১৮৭০ দ্রঃ

১৪৯। ব্রেডলী বার্ট, *ট্রুয়েলভমেন,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩, ১৮১।

১৫০। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ পৃঃ ৫-৭

১৫১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেঃ ১৮৭০ খ্রীঃ পৃঃ ৪৩৬

১৫২। ঢাকা প্রকাশ, এপ্রিল ১৭ ও ২৪, ১৮৭৫ খ্রীঃ পৃঃ ৬৬-৬৭

১৫৩। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত তাং ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪ দ্রঃ। সিংহাসনটি প্রকৃতপক্ষে অলংকৃত চেয়ার, এখন সেটা আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের নাচঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে, যার সংগ্রহ নং আ-৮৮.৭।

১৫৪। ঢাকা প্রকাশ, এপ্রিল ২৪, ১৮৭০ খ্রীঃ

১৫৪(ক)। তায়েশ বলেন, ঢাকা জেলার প্রায় সব এলাকা জুড়ে গোবিন্দপুর পরগনা বিস্তৃত। কিছু অংশ ভাওয়াল পরগনার অধীনে। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ৩৬ এবং ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ২ জুন ১৮৭৮ খ্রীঃ পৃঃ ১৩৫। মুসলিমুন্নেছা ও তাঁর স্বামী শেখ আজীমের মাজার তাঁতী বাজারে অবস্থিত, হাকিম হাঃ রহমান, প্রাগুক্ত আসুদগান, পৃ ২৪।

১৫৬। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৭

১৫৭। ঢাকা প্রকাশ, মে ৩০, ১৮৮০ খ্রীঃ, পৃঃ ১৩৫ এবং ঢাকা প্রকাশ ১৪জুন, ১৮৮০ খ্রীঃ পৃঃ১৬৩।

১৫৮। ঢাকা প্রকাশ, জুন ৭, ১৮৮০ খ্রীঃ পৃঃ ১৪৭-৪৮, ১৫২ এবং জুন ১৪, ১৮৮০ পৃঃ ১৬০-৬৩। খাজা মনসুর বিচারে সাজাপ্রাপ্ত হলে নওয়াব আব্দুল গণি দুঃখ প্রকাশ করে দন্ডিত অর্থ প্রদানের ইচ্ছা করেন। ঢাকা প্রকাশ, তাং ঐ পৃঃ ১৫২।

১৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ২০ জুন, ১৮৮০ খ্রীঃ পৃঃ ১৭৬। ঢাকা প্রকাশে বলা হয়েছে যে, আব্দুল গণি আশাতীত ভাবে পুর্বপুরুষের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করলেও তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ফলে পরিবারের অন্যান্যরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তদুপরি নতুন মোতাওয়াল্লী আহসানুল্লাহর কিছু অনুচিত কার্যে পরিবারের অনেকেই অসন্তুষ্ট। বিশেষকরে স্বল্পবৃত্তিতে তাঁদের ভরণপোষণ সুকঠিন। এছাড়া নওয়াবের বিনানুমতিতে তাঁরা কেউ একটা শকটেও চড়তে পারেন না। তদুপরি উভয় নওয়াবই মিলে নাকি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট থেকে সব সম্পত্তির একটি স্বত্বত্যাগ বা নাদাবি পত্র লিখে নেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে অনেকেই রাজী হননি। ফলে তাঁদের বৃত্তি বন্ধ করায় এই গোলযোগ শুরু হয়েছে বলে শুনা গেছে। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন, ১৮৮০ খ্রীঃ পৃঃ ১৪৭।

১৫৯। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-২, ২০,৪৬-৪৭, ৮০-৮১ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স -১,* প্রাগুক্ত পৃঃ-৫।

১৬০। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার গ্রেগরীকে এনে নওয়াব এই মামলা মুভ করেন। নওয়াবের একার পক্ষেই প্রায় ৬/৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন, ১৮৮০ পৃঃ ১৪৭।

১৬১। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ আগস্ট ১৮৮১ খ্রীঃ পৃঃ ২৯৩ এবং *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-২১, ৩১, ৪৭ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১* পৃঃ ৫, ৫৬, ৬০।

১৬১ (ক) শিরিন আখতার, *অন দি সিলেকশন অব ঢাকা এ্যাজ দি ক্যাপিটাল অব ইস্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম* (১৯০৫-১৯১১) ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার (শরিফুদ্দিন সম্পাঃ) ১৯৯১ পৃঃ ১৯০

১৬২। *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫ ও ৭৫-৮০। জনৈক বৃত্তিভোগীর ঋণের দায়ে এই ভাতা আদালত কর্তৃক ক্রোক করা সম্ভব হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১২ জুলাই ১৮৯১ এবং ৩০ আগস্ট, ১৮৯১ খ্রীঃ

১৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৯৪ খ্রীঃ পৃঃ ৪-৫ এবং *পুরাতন দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-২, ২১, ৩১-৩২ ও ৫৭।

১৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ও ১৭ ফেব্রুঃ ১৮৯৫ খ্রীঃ পৃঃ ৫ এবং *পুরাতন দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-২, ২৭, ২৮, ৫৯, ৬১। এভাবে পিতা আব্দুল গণির সম্পত্তির নিরংকুশ মালিক হয়ে আহসানুল্লাহ পরিবারিক কোন্দলের কারণে 'বি' ফান্ড প্রপ্রার্থির বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেন। *ঐ পুরনো দলিলপত্র* পৃঃ এ-৩।

১৬৫। ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসের রেকর্ডরুমে রক্ষিত *পুরাতন নথি,* চীফ ম্যানেজার নোট (১৯৫৯-৬০ খ্রীঃ) প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৩ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-২,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২-৬০।

১৬৬। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুলাই, ১৮৯৫ খ্রীঃ পৃঃ ৭ এবং ১৫ সেপ্টে. ১৮৯৫ পৃঃ ৫, ২৪ নভেম্বর ১৮৯৫ পৃঃ ৭। মামলা তিনটি ছিল, জোবেদা খানম গংকৃত সুট নং-১৫৬, ১৮৯৪ খ্রীঃ এবং শাহজাদী খানম, গংকৃত সুট নং-৯৬, ১৮৯৫ খ্রীঃ এবং সালেহা খানম গংকৃত সুট নং-৫৭, ১৮৯৯ খ্রীঃ (*পুরাতন দলিল,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৩৩) নওয়াব আহসানুল্লাহর জীবদ্দশায় দু'টি মামলা আপোষে তুলে নেয়া হয়। ঢাকা প্রকাশ ২৪ মার্চ ১৯০১ খ্রীঃ

১৬৭। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৪ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪, ১১৬, ১২১।

১৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুঃ ১৯০৩ পৃঃ৩ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২২ এবং *পুরানো দলিল পত্র* পৃঃ- এ ৩০-৩৭।

১৬৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ ৩, ২৮ জুলাই ১৯০৭ পৃঃ ৩, ২১ ফেব্রুঃ ১৯০৯ পৃঃ৩ এবং *পুরানো নথিপত্র,* ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিস রেকর্ড রুমে প্রাপ্ত, চীফ ম্যানেজারের নোট, প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৪। এস্টেটের আয় কমে যাওয়ায় এর পর থেকে নওয়াব শুধু তাঁর নিজস্ব শেয়ার ও দায়িত্ব ভাতাদির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন এবং তার পরিমাণ ছিল নিজ শেয়ার ১০৫০/- + মোতাওয়াল্লী ভাতা ২০০০/- + সন্তানদের শিক্ষাবাবদ ২০০০/-, সর্বমোট ৫০৫০/- টাকা মাত্র। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯০৭ খ্রীঃ পৃঃ ৪।

১৭০। *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩, ২০২, ২০৮।

১৭১। ঢাকার প্রথম সাবজজ কোর্ট সুট নং-৪৮ সন ১৯১৫ খ্রীঃ, *ইনডেক্স অব পেপার্স -১,* প্রাগুক্ত পৃঃ১।

১৭২। রেকর্ড রুম, নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত,চীফ ম্যানেজারের নোট (১৯৫৯-৬০ খ্রীঃ) প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৩ এবং *পুরানো দলিলপত্র,* পৃঃ ডি-২৭

১৭৩+৭৪। ঐ চীফ ম্যানেজারের নোট, পৃঃ এ-৪।

১৭৫। নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক পূর্ববংগের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার কারণে সরকারের বংগবিভাগকে সমর্থন করার বিষয়টি সমালোচনা করতে গিয়ে ১৯০৬ সালে ইসমাইল হোসেন সিরাজী একটি বাংলা পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে বলেন যে, যদি ঢাকার নওয়াবের মুসলমানদের প্রতি দরদই থাকতো, তবে তাঁর জমিদারীতে এত হিন্দু কর্মচারী কেন? পত্রিকার সংশ্লিষ্ট কাটিংটি আহসান মঞ্জিলের যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৭৬। আব্দুল করিম, নবাবি আমলে রাজনীতির ধারা, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭। ঢাকা প্রকাশে মন্তব্য করা হয়, যদি লোকের কার্যে মন্ত্রনার কোন গুন থাকে আব্দুল গণির বিপুল সম্পত্তি লাভের জন্যে হিন্দু মন্ত্রীরাই যে তাঁর বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন তাহা অস্বীকার্য নহে। সুতরাং আব্দুল গণির ন্যায় (বৈষয়িক) বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হিন্দুগণের প্রতি অনুগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। (ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭।) নওয়াব আব্দুল গণির এস্টেটে দক্ষ কর্মচারীর সমাবেশ ছিল এবং এটা ছিল তাঁর সাংগঠনিক শক্তিরই পরিচায়ক। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষের উর্ধে। তাঁর মৃত্যুর পর ঢাকা প্রকাশে তাঁর অসাম্প্রদায়িকাতার গুণ উল্লেখ করে বলা হয় ঃ- নওয়াব আব্দুল গণি বাহাদুর হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ জ্ঞান খুব কমই করতেন। হিন্দু কর্মচারীরাই ছিলেন তাঁর চিরন্তন প্রধানমন্ত্রী, সম্পত্তি লাভে হিন্দু মন্ত্রীরাই তাঁর বেশী সাহায্য করেন। তিনি শুধু হিন্দু মন্ত্রীদের প্রতি সদয় ছিলেন না, হিন্দু সাধারণের প্রতিও তাঁর অনুগ্রহ ছিল। এমনকি হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানেও তিনি সাহায্য করতেন। (ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ)।

তৎকালে মুসলিম জমিদারের অধীনে হিন্দু কর্মচারীদের কাজকর্মে নিয়োগের যে কি ব্যাপকতা ছিল, তা সমসাময়িককালের লেখক আবদোস সোবহানের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। ১৮৮৮ খ্রীঃ তিনি তাঁর হিন্দু মুসলমান গ্রন্থে লিখেছেন, "বংগদেশে যে কতকঘর মুসলমান জমিদার আছেন, সকল ঘরই হিন্দু আমলায় আবৃত। প্যাদা, খানসামা, হুঁকা বরদার, ছাতি বরদার, বাবুর্চী এসব পদের চাকুরীগুলি বরং মুসলমানরাই পাইয়া থাকে। কিন্তু মহরী, নায়েব, দেওয়ান, খাজাঞ্চী, সেরেস্তাদার, পেশকার, পরিদর্শক, ম্যানেজার এসবই হিন্দু। ইহারা জমিদারীতে এত আধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে যে, প্রকৃত কথা বলতে গেলে ইহারাই জমিদার। মুসলমান জমিদারগন পেনসন ভোগী স্বাক্ষী গোপাল মাত্র। (হিন্দু মুসলমান পৃঃ ৪৩-৪৪, থেকে উদ্ধৃত করেছেন ওয়াকিল আহমদ, উনিশশতকে বাংগালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, ২ খন্ড, ১ প্রকাশ ১৯৮৩ পৃঃ৩৯।)

ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন, বাংলার সুলতানী আমলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের একটি শক্তিশালী ভুমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। যাছিল স্বভাবতই তাঁদের প্রশাসনিক পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে।...রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কায়স্থ রাজকর্মচারীর নৈপুণ্য ছিল সুপরিচিত। এরা আঠার উনিশ শতকেও ব্যবসা- বাণিজ্য, জমিদারী পরিচালনা ও সংস্কৃতি চর্চায় এদেশে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। (মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার বর্ণ-ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অষ্টাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩ পৃঃ ২০৬-২০৭)

১৭৮। কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরনার্থে যে অর্থ সংগ্রহ কমিটি গঠন করা হয়, উক্ত কমিটিতে বাবু চন্দ্রকান্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মে, ১৮৭২ খ্রীঃ ৮৮।

১৭৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রীঃ।

১৮০। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ এপ্রিল, ১৯০২ খ্রীঃ, পৃঃ ৫।

১৮১। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ডিসেঃ, ১৯০২ খ্রীঃ, পৃঃ ৪। দেওয়ান বাবু প্রসন্ন কুমার মুখোঃ বিক্রমপুরের অন্তর্গত খিলপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীঃ ১ আষাঢ় স্বীয় গ্রামে ৮২ বঃ বয়সে মারা যান। ঢাকা প্রঃ ১৪ জুলাই ১৯১৮ পৃ-৩।

১৮২। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেঃ, ১৯০৭, খ্রীঃ পৃঃ ৩।

১৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৯আগস্ট, ১৮৯৪ খ্রীঃ, পৃঃ ৭ এবং ১৯ ডিসেঃ ১৯০৯ দ্রঃ।

১৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ১৯০১ খ্রীঃ পৃঃ ৫।

১৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ সেপ্টেঃ, ১৯০০ খ্রীঃ, পৃঃ ৬।

১৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ এপ্রিল, ১৯০১ খ্রীঃ, পৃঃ ৬-৭, ও ১৯ মে ১৯০১. পৃঃ ৮।

১৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেঃ, ১৯০৭, পৃঃ ৩।

১৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ এপ্রিল, ১৯০২ খ্রীঃ, পৃঃ ৫।

১৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মে, ১৯০২ খ্রীঃ, পৃঃ ৪।

১৯০। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৮১ খ্রীঃ, পৃঃ ৫১৬।

১৯০ (ক)-(খ) ঢাকা প্রকাশ, ১৯ সেপ্টেঃ, ১৮৮৬ খ্রীঃ পৃঃ ১০ এবং *পুরানো নথি*, নওয়াব এস্টেট অফিসে সংরক্ষিত, কাচারী সংক্রান্ত নথি দ্রঃ

১৯১। আদিনাথ সেন, দীন নাথ সেনের জীবনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন-মামুন, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫। টাংগাইলের ঘাটাইল ও মধুপুরের অদূরে রঘুনাথপুর ও কাদিম হাতিলে ১৩৩১ বাংলা সালে যে নওয়াব এস্টেটের কাচারী প্রতিষ্ঠা করা হয়, তারও নায়েব ছিলেন বাবু বনমালী দাস এবং তহশীলদার ছিলেন বাবু সুরেন্দ্র মহন চক্রবর্তী। পুরানো নথিপত্র, প্রাগুক্ত, কাচারী সংক্রান্ত নথি দ্রঃ।

১৯২। ঢাকা প্রকাশ, ১১ এপ্রিল ১৮৮০, পৃঃ ৫০, এছাড়া উক্ত পত্রিকার পৃঃ ৮৭, ১০৮, ১১১, ১২৩, ১৩৫, ১৪৬, ১৫৮ এবং ১লা এপ্রিল ১৮৮২ পৃঃ ২৫, এছাড়া পৃঃ ৪৮,৫০,৬২,৭৪,৮৬,৯৮ এবং ৮ অক্টোঃ, ১৮৮২ পৃঃ ৩৬০ এছাড়া পৃঃ ৩৭২,৩৮৪ ৩৯৬ ইত্যাদি দ্রঃ

১৯৩। *পুরাতন দলিলপত্র*, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত দ্রঃ

১৯৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুন, ১৯০৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩।

১৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেঃ ১৮৮৮ খ্রীঃ।

১৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জানু ১৮৮৭ খ্রীঃ পৃঃ ৭।

১৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ মে, ১৮৯০ খ্রীঃ, পৃঃ ৬-৭।

১৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রীঃ।

১৯৯। ঢাকা প্রকাশ, ৪জুলাই, ১৮৯৭ খ্রীঃ, পৃঃ ৭।

২০০। ব্যক্তিগত ডাইরী, নওয়াব আহসানুল্লাহর (উর্দূ ভাষা)বর্তমানে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, ১৮৯১ খ্রীঃ তাং পৃঃ ডিসেম্বর ৭-১৫ দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০ (ক) উল্লেখ্য, মিঃ থমাস ১৮৮৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মারা গেলে নওয়াব এস্টেটের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একটি সনদপত্র দেয়া হয়েছিল। উক্ত সনদপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করে মৃতের পৌত্র মিঃ পেট্রিক এ. সি. থমাস তাঁর উক্ত পিতামহের ঢাকায় অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে একটি পত্র দেন, যার কপি এখন আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত আছে।

২০১। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেঃ, ১৮৭৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩৩১।

২০২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন, ১৯০০ খ্রীঃ, পৃঃ ৬ এবং ১৭ মার্চ ১৯০১ পৃঃ ৫।

২০৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন, ১৯০০ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

২০৪। ঢাকা প্রকাশ, ১ জুলাই, ১৯০০ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

২০৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ১৯০১ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

২০৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মে ১৯০১ পৃঃ ৮।

২০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ এপ্রিল, ১৯০২ খ্রীঃ পৃঃ ৫।

২০৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুন, ১৯০৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩।

২০৯। ঢাকা প্রকাশ, ১০ জুলাই, ১৯০৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩।

২১০। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেঃ, ১৮৭৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩৩১।

২১১। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ আগষ্ট, ১৮৯৪ খ্রীঃ পৃঃ ৭।

২১২। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ১৯০১ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

২১৩। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মে, ১৯০২ খ্রীঃ পৃঃ ৫।

২১৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ জুন, ১৯০২ খ্রীঃ পৃঃ ৫।

২১৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ আগস্ট, ১৯০৪ খ্রীঃ পৃঃ ৪।

২১৬। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেঃ, ১৯০৩ খ্রীঃ পৃঃ ৩।

২১৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুঃ, ১৮৮৯ খ্রীঃ পৃঃ ৭ এবং ২৪ মার্চ ১৮৯৫ পৃঃ ৬।

২১৮। *ক্লে'র ডাইরী* (১৮৬৬-১৮৬৭) রূপান্তর (বঙ্গানুবাদ) ফওজুল করিম, সম্পাদনা-মুনতাসীর মামুন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯০ পৃঃ ৪৬।

২১৯। ঢাকা প্রকাশ, ১০জুলাই, ১৯০৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩।

২২০। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ মে, ১৯০৫ খ্রীঃ এবং ১৭ ফেব্রুঃ ১৯০৭ খ্রীঃ

২২১। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই, ১৯০৬ খ্রীঃ পৃঃ ৪ এবং *পুরাতন দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ সি-২০।

২২২। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জানুঃ, ১৯০৮ খ্রীঃ।

২২৩। ১৯৫৯ সালে তৈরী চীফ ম্যানেজারের রিপোর্ট, *পুরাতন দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এ-৪। ১৯১৮ খ্রীঃ ঢাকা প্রকাশের এক খবরে জানা যায় ঢাকা নওয়াব এস্টেটের কমন ম্যানেজারে মিঃ জে. হডিং ২৮ মার্চ ১৯১৮ খ্রীঃ পাকস্থলীতে দুষ্টব্রন শল্য চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারা যান। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মার্চ ১৯১৮ খ্রীঃ পৃঃ ৩।

২২৪। *ঐ চীফ ম্যানেজারের রিপোর্ট* দ্রঃ

২২৫। *পুরানো নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত।

২২৬। *পুরানো নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত।

২২৭। *পুরানো নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত এবং মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা,* ৬ খন্ড, ১৯৯১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

২২৮। *পুরানো নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত।

২২৯। বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৭-৭৮

২৩০। হৃদয়নাথ, *রেমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯

২৩১। বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৬ এবং সি, ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬।

২৩২। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৯। উল্লেখ্য রমনা রেসকোর্স এলাকা খাজা আলীমুল্লাহর মালিকানায় ছিল, সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০।

২৩৩। লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯ এবং সি, ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬।

২৩৪। চিত্রটি বর্তমানে খাজা পরিবারের প্রবীন সদস্য খাজা মোঃ হালিমের নিকট (ঢাকা) রয়েছে।

২৩৫। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৭ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫০-৫১ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১১-১২।

২৩৬। কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ এবং নির্মলকুমার গুপ্ত, *ঢাকা ওল্ড এন্ড নিউ* পৃঃ ৪৬ এবং রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৩ এবং শরীফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫০-৫১।

২৩৭। এ. সি . ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।

২৩৮। বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩, ১৮১-৮৩।

২৩৯। আঃ গণি কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। আজিমুশ্শান (সম্পাদিত) *ঢাকা-এ সিটি এন্ড ইটস সিভিক বডি, ঢাকা*-১৯৬৬ পৃঃ ১৫।

২৪০। সত্যেন সেন, মহাবিদ্রোহের কাহিনী, ৬ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯১ পৃঃ ১২৮।

২৪১। সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৮-২৯ এবং বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৪২। দি ঢাকা নিউজ, ১৩-৬-১৮৫৭ সংকলিত করেছেন, মুনতাসীর মামুন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ পৃঃ ১৭-১৮ এবং সমসাময়িককালে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্রেনান্ড -এর লেখা ডাইরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, রতনলাল চক্রবর্তী, সিপাহীযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ পৃঃ ৬৭ ও ১৯০ এবং তায়েশ, তাওয়ারিখ, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১০৫ দ্রঃ।
২৪৩। দি ঢাকা নিউজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ পৃঃ ৩৯০ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬ এবং হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স*, প্রাগুক্ত পৃঃ১৮
২৪৪। বার্ট, *ট্রয়েলভ মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮।
২৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭, এবং *বেঙ্গল টাইমস*, ২৬ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ।
২৪৬। সি, ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০ এবং সি. ই. বাকল্যান্ড ভল-২, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২৯ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩২।
২৪৭। রতনলাল, প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৭০-৭২, রতনলাল চক্রবর্তী, সিপাহী বিদ্রোহ, (বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪১-৪২) এবং দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৪।
২৪৮। রতনলাল, *সিপাহী বিদ্রোহ*, ঐ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, ২৪৩ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১১০।
২৪৯। প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ, ঢাকার, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ভূমিকা। নভেম্বর ১৯৮৯ খ্রীঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত)।
২৫০। সি. ই. বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২৯ এবং সি, ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০।
২৫১। ব্রেনান্ডের ডাইরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন-রতন লাল, *সিপাহীযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৮-৭৯ এবং ১৯৮।
২৫২। রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫২।
২৫৩। রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৪।
২৫৪। রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৫। নাজির জগবন্ধু সিপাহীদের গোপনতথ্য সরবরাহ করে ইংরেজদের বিজয়ের পথ সুগম করেন। ঢাকা প্রকাশ, ৮ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫ এবং হৃদয়নাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৩, নাজির হোসেন বলেন, একদল হিন্দু কর্মচারী উস্কানী উৎসাহ, গুজব ও অতিরঞ্জিত কাহিনী দ্বারা ঢাকার মানুষকে দ্বিধা বিভক্ত করে এবং সিপাহীদের বিরুদ্ধে লোকজন ও কর্তৃপক্ষকে বিষিয়ে তুলেছিল। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৫ পৃঃ ৩৬৮, ৪৩১ ও ৫২৬।
২৫৫। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২১ ও ৯৩।
২৫৬। রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৬।
২৫৭। রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৫।
২৫৮। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৭ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩৮।
২৫৯। রতন লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯।
২৬০। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৮৬১ খ্রীঃ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড বলে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রথা চালু হয়। সে অনুযায়ী ঢাকাতে সর্ব প্রথম খাজা আঃ গণি এবং জে.জি.এন. পোগজ- কে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯।
২৬১। বার্ট, *ট্রয়েলভ মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮০।
২৬২। বার্ট, *ট্রয়েলভ মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮২, এবং এ.সি. ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং সি.ই. বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০।
২৬৩। লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯-৯০ এবং এ.সি. ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৯ এবং বার্ট, *ট্রয়েলভ মেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুলাই ১৮৬৯ খ্রীঃ এবং বাকল্যান্ড, *ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি, লন্ডন* ১৯০৬ পৃঃ ২৩৫।
২৬৪-৬৫। ক্যাম্পবেল, এ.সি ; ভল- ১, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০।
২৬৬। ঢাকা প্রকাশ, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ পৃঃ ২৮৩ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২৯।
২৬৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩ আগস্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৪৭ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১।
২৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ জুলাই ১৮৭৫ পৃঃ ২৩৩।
২৬৯। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫ পৃঃ ৪১৬ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১।
২৭০। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১।
২৭১। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুয়ারী ১৮৭৬ পৃঃ ৪৬১-৬৩।
২৭২। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ১৮৩।
২৭৩। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৯ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৩২।
২৭৪। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ১১৩।
২৭৫। কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫ পৃঃ ১৪৬ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১১৩ ও ১৮৩।
২৭৬। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১১৩ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০।
২৭৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৫ পৃঃ ৪৩৯।
২৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুয়ারী ১৮৭৬ পৃ ৪৫৯, ৪৬১-৬৩, এবং তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫।
২৭৯। মোসলেম ক্রনিকেল, ২৮ জানুয়ারী ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫। যুবরাজের বরাহ শিকারের আয়োজনার্থে গোয়ালন্দে ৩০টি হাতি, বহুসংখ্যক ঘোড়া ও নৌযান প্রস্তুত রাখা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ সময় তাঁর 'ট্রাক' নামক বজরাটি যুবরাজের ব্যবহারের জন্য সুসজ্জিত করে রেখেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৫ পৃঃ ৪৩৯ এবং আব্দুল্লাহ, নওঃ সলিমুল্লাহ, দানের তালিকা পৃঃ ৩৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৮০। নওয়াবের পক্ষ থেকেই সওয়ারদের বেতন দেয়া হতো। ঢাকা প্রকাশ, ৫ মার্চ ১৮৭৬, এদের মধ্যে তিনজন ঢাকায় থাকাকালে কৃত্রিম মুদ্রা তৈরী করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুঃ ১৮৮১ পৃঃ ৪৮৭।

২৮১। বার্ট, *ট্রুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮২ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১-৯২।

২৮২। ঢাকা প্রকাশ, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ পৃঃ ৭ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০ এবং বার্ট, *ট্রুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮২।

২৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ নভেম্বর, ১২ ডিসেঃ ১৮৮৬ এবং ২, ৯ ও ৩০ জানুঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ।

২৮৪। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত ভল- ১, পৃঃ ২০১ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৫ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৪।

২৮৫। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১১৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেম্বর ১৮৮৮ পৃঃ ৩-৪।

২৮৬। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেঃ ১৮৮৮।

২৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ১১ ও ১৮ নভেঃ এবং ২৫ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৪।

২৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৭।

২৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ নভেঃ এবং ২ ডিসেম্বর ১৮৮৮ পৃঃ ৪ এবং মারছিওনেস অব ডাফেরিন এন্ড আভা, *আওয়ার ভাইসরিগ্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৮৯০ পৃঃ ৪০২।*

২৯০। ঢাকা প্রকাশ, ১০ জানুঃ ১৮৯২ পৃঃ ৬। উল্লেখ্য, অনেক লেখকও এরূপ ভুল করেছেন। যেমনঃ ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত গ্রন্থের পৃঃ ২০১ এবং প্রফেসর আব্দুল্লাহ তাঁর প্রাগুক্ত *মুসলিম সুধী* গ্রন্থের পৃঃ ৩২।

২৯১। মোসলেম ক্রনিকেল, ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১০ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ এবং ৯ ফেব্রুঃ ১৮৯০ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহর *ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু,* আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, তারিখ ১, ৯, ১১ ও ১৩ জানুঃ ১৮৮৩ খ্রীঃ এবং *ঐ* ইংরেজীতে লেখা ডাইরী, অপ্রকাশিত, ১৩ জানুঃ ১৮৭৪ খ্রীঃ।

২৯২। বার্ট, *ট্রুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭।

২৯৩। বাকল্যান্ড সি.টি. *স্কেচেস অব সোশাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন ১৮৮৪* থেকে উদ্ধৃত-মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৮ মে, ১৮৯০ পৃঃ ৬।

২৯৪। *ক্লে'র ডাইরী,* ফওজুল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯ ও ৩৭। ক্লে লিখেছেন, ঢাকার সব ইংরেজ সাহেবদের সাথে খাজা গণি মিয়ার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তিনি তাঁদের নিয়ে শিকারে যান। আনন্দ বল নাচের ব্যবস্থা করেন। তাঁর ষ্টীমার 'ষ্টার অব ঢাকা' নিয়ে সাহেবরা পিকনিকে যায়। *ক্লে'র ডাইরী, ঐ* পৃঃ ৩১, ৪৪, ৪৮

২৯৫। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৩২ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০।

২৯৬। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ১৮৩।

২৯৭। ওফারাশেদী থেকে উদ্ধৃত-মোঃ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭।

২৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ২২শে ডিসেঃ ১৯০১ এবং মোসলেম ক্রনিকেল, ২৫ ফেব্রুঃ ১৮৯৯।

২৯৯। মার্ছিওনেস অব ডাফেরিন এন্ড আভা, *আওয়ার ভাইসরিগ্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন ১৮৯০ পৃঃ ৪০১।*

৩০০। ঢাকা- *ক্লে'র ডাইরী,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ২০।

৩০১। ঢাকা প্রকাশ ২ ও ৯ মে ১৮৯৭ পৃঃ ৬। নওয়াবের দানকৃত টাকার বেশীর ভাগ ইংরেজদের ক্লাব উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন, ১৯০০ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

৩০২। ঢাকা প্রকাশ, ২ ও ৯ মে ১৮৯৭ পৃঃ ৬ এবং ১০ ফেব্রুঃ ১৯০১ খ্রীঃ পৃঃ ৭।

৩০৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৯, পৃঃ ৬,

৩০৪। বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০, ক্যাম্পবেল , প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৮।

৩০৫। ঢাকা প্রকাশ ১৯ ফেব্রুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৮ এবং ২৩ সেপ্টেঃ ১৯০০ পৃঃ ৬, বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০।

৩০৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ জুলাই, ১৮৭৫ পৃঃ ২৩৩ (বাকল্যান্ডকে অনুসরণ করে মোঃ আব্দুল্লাহ তাঁর খান বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির সাল ১৮৭১ বলেছেন যা ঠিক নহে (মোঃ আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭) বাকল্যান্ড, *ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফী লন্ডন ১৯০৬* পৃঃ ২৩৬ এবং *বেংগল আন্ডার ...* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০।

৩০৭। বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৭ই জুন ১৮৯১, পৃঃ ৭, ১০ই জুন, ১৮৯২ পৃঃ ৬।

৩০৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুন, ১৮৯৭ পৃঃ ৬৭ এবং মোসলেম ক্রনিকেল, ৩০ জুলাই, ১৮৯৮, পৃঃ ৮৫৫।

৩০৯। ঢাকা প্রকাশ ২৪ এবং ৩১ জুলাই ১৮৯৮ খ্রীঃ ৭ এবং ৪।

৩১০। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ও ২৭ নভেঃ ১৮৯৮ খ্রীঃ পৃঃ ৭, (চট্টগ্রামে রায় অভয়চরণ বাহাদুর বড়লাটের অভ্যর্থনার যাবতীয় আয়োজন করেন, ঢাকা প্রকাশ, ৪ ডিসেঃ ১৮৯৮ খ্রীঃ)

৩১১। ভাওয়াল রাজও এতে বহুমূল্যবান বস্ত্রালংকার দিয়েছিলেন। ঢাকা প্রকাশ ১১ ফেব্রুঃ ১৮৯৯ খ্রীঃ পৃঃ ৬, (সম্ভবতঃ উপহার প্রদান ব্যবস্থাটি গোপনে হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা প্রকাশে তা প্রকাশিত হলে এবং যেহেতু এরূপ রাজপুরুষদের জন্য শাসিতজনদের প্রদত্ত উপহারাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, তাই এজন্য নওয়াব ও ভাওয়াল রাজার পক্ষ থেকে খবরটি মিথ্যা বলে প্রতিবাদ লিপি দেয়া হয়। উক্ত পত্রিকাও হয়ত উপায় না দেখে খবরটি ভাল করে না জেনে প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ফেব্রুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৬-৭)।

৩১২। ঢাকা প্রকাশ, ৫ মার্চ, ১৮৯৯ খ্রীঃ পৃঃ ৭।

৩১৩। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেঃ ১৯০১ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১৪। নওয়াবদের অর্থ দানের তালিকাটি উদ্ধৃত করেছেন, আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৬।

৩১৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩ মে ১৮৭৪ পৃঃ ৯২, ১০৪, ১৩৬।

৩১৬। নওয়াবদের দানের তালিকা দ্রঃ, আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৬।

৩১৭। ঢাকা প্রকাশ ১৯ ডিসেঃ ১৮৭৫ পৃঃ ৪৩৯ এবং আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৬। ঢাকা প্রকাশে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়, 'ঢাকার এত নিকটে এসেও ঢাকায় তাঁর শুভাগমন হবেনা। জনশ্রুতি প্রিন্স ঢাকায় আসলে নওয়াব আব্দুল গণি লক্ষ টাকা খরচে প্রস্তুত। তবু কেন ঢাকা কৃতার্থ হবে না।'

৩১৭ (ক) ঢাকা প্রকাশ, ৩ মে ১৮৮৫ পৃঃ ৯১।

৩১৮। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮। ১৮৪৩ সালে হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লীর পদশূন্য হলে ঢাকার কালেকটর নতুন মোতাওয়াল্লী নিযুক্তির জন্য রিপোর্ট পাঠান। সরকারের প্রত্যুত্তর আসতে দেরী হওয়ায় সরকারী অনুদানও বন্ধ থাকে। এদিকে মহররম উৎসব সমাগত হলে খাজা আলীমুল্লাহ এই ঐতিহ্যবাহী প্রথাটি চালু রাখতে উৎসবের সমুদয় ব্যয় বহন করেন। পরে সরকার তাঁকেই মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। নওয়াব এস্টেট থেকে হোসেনী দালানের জন্য বার্ষিক ১২৮৩ টাকা ৮ আনা বৃত্তি ধার্য্য ছিল। (যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, ১৩১৯ বংগাব্দ, ১ম খন্ড পৃঃ ৪২১) এছাড়া ঢাকার নওয়াবরা হোসেনী দালানের জন্য প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা করে ছিলেন যা পরে আলোচিত হবে।

৩১৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ অক্টোবর ১৮৮৬ খ্রীঃ

৩২০। ঢাকা প্রকাশ, ৮ মার্চ ১৯০৮ পৃঃ ৩

৩২১। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেঃ ১৮৬৪ পৃঃ ৪৫৯

৩২২। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* ৩য় সংস্করণ ১৯৯৫ পৃঃ ৫৩৫,

৩২৩। ঢাকার ম্যাজিঃ এল. হেয়ার ছোট ছোট মামলার বিচার ক্ষমতা ১৮৮৮ খ্রীঃ পঞ্চায়েতের উপর ছেড়ে দেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জানুঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৩২৪। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫ পৃঃ ৫৩৪।

৩২৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুন ও ১৩ আগস্ট ১৮৬৩ খ্রীঃ।

৩২৬। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খ্রীঃ।

৩২৭। বেংগল টাইমস, ১৮৭৬ থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯।

৩২৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জানুঃ ১৮৮৭ পৃঃ ৭ এবং ১৪ ও ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯২ পৃঃ ৭ ও ৮।

৩২৯। দি বেংগল টাইমস, ৭ জুন ১৯০২ এবং ২১ জানুঃ ১৯০৩। এ উপলক্ষ্যে ঢাকার লোকেরা শহরের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নিজেদের দোকানপাট, বাড়ীঘর নানা রঙে সজ্জিত ও আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে। রেল ষ্টেশন থেকে শুরু করে হাজার হাজার লোক রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিয়ে নওয়াবকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ জানুঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩

৩৩০। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ও ১২ ডিসেঃ ১৮৮০ খ্রীঃ

৩৩১। এছাড়া একটি বস্ত্রখন্ডে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং ভারতের শাসন ভার নিজ হাতে নেয়ার সময় মহারাণীর দে―য়া আশ্বাস বাণী প্রভৃতি রিপু করে ঐ অভিনন্দন পত্রের সাথে পাঠানো হয়। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৭ পৃঃ ৭

৩৩২। ঢাকা প্রকাশ, ২১ সেপ্টেঃ ১৮৯০ পৃঃ ৫

৩৩৩। ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোবর ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৬ এবং ৯ ডিসেঃ ১৯২৩ খ্রীঃ এবং আজিমুশ্যান হায়দার, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০-৮১।

৩৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ১২ ফেব্রুঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৫-৬ এবং ২ এপ্রিল ১৯০৫ পৃঃ ৩ এবং ৫ চৈত্র ১৩১৭/১৯ মার্চ ১৯১২ খ্রীঃ

৩৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৩ এবং ১৩ এপ্রিল ১৮৯০ পৃঃ ৭ এবং আজিমুশ্যান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৯-৩২

৩৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৬।

৩৩৭। মোহতারাম, সাপ্তাহিক হোলিডে, জানুঃ ১৯৮২ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯।

৩৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫

৩৩৯। *পুরানো দলিল পত্র,* আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, প্রাগুক্ত

৩৪০। ঢাকা প্রকাশ, ১৭, ২২ নভেঃ ১৮৭৮ পৃঃ ৩৭৪ এবং ১৮ ডিসেঃ ১৮৮১ পৃঃ ৪৩৬ এবং ২০ ফেব্রুঃ ১৮৮৭ পৃঃ ৬ এবং ১১ জানুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৭

৩৪১। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ আগস্ট ১৮৯৩ পৃঃ ৩-৫

৩৪২। ঢাকা প্রকাশ, ২ মার্চ, ১৮৭৯ পৃঃ ৫৫৬

৩৪৩। উক্ত প্রস্তাবানুসারে আঃ গণির জন্মদিন উপলক্ষে সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ বন্ধের আবেদনটি ঢাকার কমিশনার উপেক্ষা করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জুন ১৮৮০ পৃঃ ১৬৪।

৩৪৪। ঢাকা জনসাধারণ সভার উক্ত উদ্যোগের প্রশংসা করে ঢাকা প্রকাশ, আঃ গণি স্মরণে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করার সুপারিশ করে খবর প্রকাশ করেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ২ মার্চ ১৮৭৯ পৃঃ ৫৫৬।

৩৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ আগস্ট ১৮৮৮ পৃঃ ৫

৩৪৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬।

৩৪৭। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৪ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩

৩৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ এবং *দি ইংলিশম্যান* ২৫ আগস্ট ১৮৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৯-৫০-৫১। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৮

৩৫২। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৭। পিতার স্মরণে দরিদ্রের সাহায্যর্থে আহসানুল্লাহ বার্ষিক ৫ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী একটি ট্রাষ্টের হাতে অর্পন করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেঃ ও ১১ অক্টোঃ ১৮৯৬। আব্দুল গণির স্মরণার্থে কাশিমপুরের জমিদার শ্যামাপ্রাসাদ রায় চৌধুরী ১৭০০ টাকা কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ে লাগান এবং এর লভ্যাংশ দিয়ে বি,এ, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে ৫০ টাকা করে পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া নওয়ার আহসানুল্লাহ কর্তৃক উক্ত ৫ হাজার টাকা আয়ের জমিদারি ক্রয়ে তিনি ৩০০ টাকা দেন। ঢাকা প্রকাশ, ১০ জানুঃ ১৮৯৭ পৃঃ ৬

৩৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ৬ সেপ্টেঃ ১৮৯৬ খ্রীঃ পৃঃ ৬

৩৫৪। মোসলেম ক্রনিকেল, ৫ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ

৩৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৪

৩৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৪

৩৫৭। জ্যোতিশচন্দ্র দাস গুপ্ত, পৃঃ ৩১ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৬০

৩৫৮। জ্যোতিশচন্দ্র দাস গুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২ এবং মোসলেম ক্রনিকেল ২১ ডিসেঃ ১৯০১ খ্রীঃ এবং আব্দুল্লাহ, ঐ পৃঃ ৬০

৩৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৭

৩৬০। ঢাকা প্রকাশ, ২ ফেব্রুঃ ১৯০২ পৃঃ ৭

৩৬১। খাজা মোঃ আজম, *দি পঞ্চায়েত সিষ্টেম অব ঢাকা,* (মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৯০) পৃঃ ৩৩-৩৪

৩৬২। সুফিয়া আহমেদ, *মুসলিম কমুনিটি ইন বেংগল, ঢাকা- ১৯৭৪* পৃঃ ২৫২

৩৬৩। জাগরণ, ১ম বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৫ বাংলা পৃঃ ১৬৯

৩৬৪। পুরাতন নথি, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, ঢাকার রায়ট সংক্রান্ত নথি দ্রঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২ ও ৯ মে ১৯২৬।

৩৬৪(ক) রতন লাল চক্রবর্তী, *রোল অব ঢাকা আফটার দি অ্যানালমেন্ট অব পার্টিশন, ঢাকা পাষ্ট প্রেজেন্ট ফিউচার* (শরিফুদ্দিন আহমেদ সম্পাঃ) ১৯৯১ পৃঃ ২২৬-২৮

৩৬৫। এ.সি. ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস অব বেংগল,* ভল- ১, কলকাতা ১৯০৭ পৃঃ ১৯৯

৩৬৬ । ক্যাম্পবেল ঐ, এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুলাই ১৮৬৯

৩৬৭। লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯ এবং বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* পৃঃ১৮১ এবং বাকল্যান্ড, *ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফী,লন্ডন ১৯০৬* পৃঃ ২৩৫

৩৬৭(ক) মিঃ বেটসন বেল কর্তৃক সলিমুল্লাহকে দেয়া গোপন পত্র,তাং ১৪-৮-১৯১৩ ও ৬-৯-১৯১৩, *পুরানো নথি,* নওঃ এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

৩৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ও ২৭ নভেঃ ১৯০৪ পৃঃ ৩

৩৬৯। *পুরাতন নথিপত্র,* ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, ঢাকার রায়ট সংশ্লিষ্ট নথি পৃঃ ৩১-৩২ দ্রঃ

৩৭০। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৮-২৯ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ ১৯০৭

৩৭১। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৯

৩৭২। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ ১৯০৭

৩৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মে, ১৯০৭

৩৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জুলাই ১৯০৭ পৃঃ ৩ এবং ইসলাম প্রচারক, ৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

৩৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জানুঃ ১৯০৮ পৃঃ ৩

৩৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ২ মে ১৯২৬ পৃঃ ৩

৩৭৭। উক্ত সভায় হিন্দু নেতাদের মধ্যে বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, রায়বাহাদুর প্যারীলাল দাস, ডাঃ মোহিনী মোহন দাস, বাবু ধীরেন্দ্র নাথ চট্টপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ২ মে ১৯২৬।

৩৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ৯ মে ১৯২৬। উল্লেখ্য, ১৯২৫ সালে ঢাকা শহরে একটি মসজিদের কাছে অবস্থিত জনৈক জি. ঘোষের বাড়িতে বিয়ের বাদ্য বাজানো নিয়ে গোলযোগ হয়। শেষ পর্যন্ত নওয়াব বাড়ীর নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নামাজের সময় ব্যতীত বাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা করে দেন। ঢাকা প্রকাশ, ৬ জুন, ১৯২৫ পৃঃ ৩

৩৭৯। ঢাকা প্রকাশ, ৭ মার্চ ১৯২০

৩৮০। ঢাকা প্রকাশ, ৭ মার্চ ১৯২০

৩৮১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুলাই ১৯২৬ পৃঃ ৩ এবং *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত

৩৮২। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ আগষ্ট, ১৯২৬

৩৮৩। *পুরানো নথি,* ঢাকা নওয়াব এস্টেট পুরানো অফিসে রক্ষিত এবং *দি মোসলেম ক্রনিকেল, ১ অক্টোঃ ১৯২৬ পৃঃ ২৬১-৬৩।*

৩৮৪। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত (ঢাকার রায়ট) পৃঃ ১২।

৩৮৫। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত (ঢাকার রায়ট) পৃঃ ২০।

৩৮৬। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪৯।

৩৮৭। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৭৩ পৃঃ ৬৬৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৯ এবং মাসিক মোহাম্মদী, ৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা পৃঃ ৭৯৭-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নওয়াবদের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী

২(১) ঢাকার উৎকর্ষ সাধনে পৌর উন্নয়ন কার্যাবলীঃ

মোগল সুবা বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে সমৃদ্ধশালী ঢাকা নগরী প্রাচ্যের গর্বের বিষয় ছিল। কিন্তু এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে ক্রমাবনতি হতে হতে উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে তার সে গর্ব প্রায় বিলীন হবার উপক্রম হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ঢাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। মোগল আমলে এ শহরের লোকসংখ্যা যেখানে প্রায় নয় লক্ষ ছিল, কমতে কমতে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তা মাত্র ৬৬ হাজারে এসে দাঁড়ায়।[১] লোকালয়ের অভাবে ঢাকা শহরের নানা অংশ জংগলাকীর্ণ হয় এবং সে সাথে পয়ঃপ্রণালী মজে দূষিত ও বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হতে থাকে। মোগল আমলে ঢাকায় নির্মিত ইমারতগুলো সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়তে থাকে ।[২] ১৮২৪ খ্রীঃ বিশপ হেবার ঢাকার তিন চতুর্থাংশ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইমারতের ধ্বংসস্তুপ গুলোতে জংগল ও বাদুড়ের বাসা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৩] ১৮৩৫-৪০ খ্রীস্টাব্দের দিকে টেইলর সাহেব ঢাকা শহরের সর্বত্র ডোবা-খন্দক ভর্তি ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানির কারণে একে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিস্থলরূপে দেখতে পেয়েছিলেন।[৪] তাই বলা হয়েছে, আজ থেকে দেড় দু'শ বছর আগে ঢাকা ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর, নোংরা এক শহর নিরানন্দ তো বটেই।[৫] ঢাকা একটি অপরিকল্পিত শহর রূপে গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়টিও শহরের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর করার জন্য অনেকটা দায়ি ছিল। এ শহরে সংকীর্ণ গলিপথের দু'পার্শ্বে স্বল্প পরিসরে অপরিকল্পিতভাবে কাঁচা পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। এখানে সদরঘাট থেকে নওয়াবপুর রোড এবং বাংলা বাজার থেকে লালবাগ রোড ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন রাস্তাই ছিল না। ব্যাপক লোক সংখ্যা হ্রাসের সাথে সাথে শহরতলি এলাকা থেকে লোকজন উঠে এসে শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রধান রাস্তার ধারে ভীড় জমায়।[৬] দেশী বিদেশী কিছু ধনী ব্যক্তিরা অবশ্য নদী তীর ধরে সুরম্য অট্রালিকা নির্মাণ করেছিল।

ঢাকা নগরীর এই চরম দুর্দিনে ঢাকার নওয়াব পরিবার যদি এ শহর উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য-সহযোগিতায় বিশেষভাবে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়তো সোনারগাঁও, রামপালের মত একদিন ঢাকা শহরের অস্তিত্বও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত।

ইংরেজ প্রশাসকদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকার কারণে স্থানীয় প্রশাসনের নানা কর্মকান্ডে খাজা পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করতেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে আর্থিক সামর্থ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণে খাজা আলীমুল্লাহ এবং খাজা আব্দুল গণি ঢাকার যাবতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিতেন। তাঁরা স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও শহর উন্নয়ন কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢাকায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য কল্যাণমূলক কাজ করেন, যা ঢাকা শহরকে আধুনিকরূপ দিতে সহায়তা করে। নওয়াবগণ ছাড়াও খাজা পরিবারের আরো বেশ কিছু নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা ঢাকা শহর উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে এর উন্নতি বিধান করে গেছেন।

মোগল আমলে শহরের অধিকাংশ প্রশাসনিক ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম, যেমন ঃ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি ও নৈতিক মানরক্ষা প্রভৃতি দায়-দায়িত্ব ছিল নগর কোতয়ালের উপর। ১৭৭২ খ্রীঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক পূণর্বিন্যাসের ফলে ঢাকা শহর প্রশাসনের কর্মকর্তা মনোনীত হয়েছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। কোতয়াল পদটি তখন বিলুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

করা না হলেও তার দায়িত্ব থাকে সামান্যই।[৭] ফলে শহর প্রশাসনের সহায়ক হিসেবে স্থানীয় জনগণের যে ঐতিহ্যবাহী প্রথা-পদ্ধতি ছিল, তা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে এমন কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না, যা ঢাকা-শহর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে পারতো। বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু-মুসলিমদের যে পঞ্চায়েত প্রথা ছিল, আধুনিক শহর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদের তেমন কোন ধারণা ছিল না। এমতাবস্থায় মোগল আমলের কোতয়াল-দারোগা প্রথা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বিলুপ্ত করা হলে ঢাকা শহরের গতানুগতিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।[৮]

ইউরোপীয় দেশগুলোতে নগর উন্নয়নের জন্য শহরবাসীর উপর বিশেষ কর ধার্য করা হতো। কিন্তু প্রাচ্যের দেশগুলোতে এ ব্যবস্থা ছিল না। এখানে যে কোন ধরনের কর আরোপিত হলে তাকে নির্যাতনমূলক মনে করা হতো।[৯] টেইলর সাহেব লিখেছেন ১৮১০ খ্রীঃ ঢাকা শহর উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহকর আরোপিত হলে, ঢাকায় প্রকাশ্যে গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। এ উপলক্ষে শহরের নাগরিকগণ একত্রিত হয়ে কালেকটরের নিকট তাদের দাবী দাওয়া পেশ করে। স্থানীয় প্রায় নয় হাজার গণ্যমান্য গৃহকর্তা স্বাক্ষর করে একটি আবেদন পত্র কালেকটরের নিকট পেশ করে।[১০]

কোম্পানীর সরকার ১৮১৪ খ্রীঃ মোগলযুগীয় কোতয়াল প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ঢাকা শহরে পুলিশী প্রশাসন চালু করে। ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে প্রয়োজনীয় স্টাফসহ প্রতিটি থানার দায়িত্বে একজন করে দারোগা নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ থানার সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র তিনটিতে এসে দাঁড়ায়।[১১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকজন পদস্থ কর্মচারি মিলে ১৮১৩ খ্রীঃ ঢাকা নগর উন্নয়নের জন্য প্রথম একটি কমিটি গঠন করে, যা ছিল ঢাকা পৌরসভার সূত্রপাত।[১২] ১৮২৩ খ্রীঃ গঠিত হয়েছিল, 'কমিটি অব ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট'। এ কমিটির প্রাণ-পুরুষ ছিলেন ঢাকার দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ড'স এবং মিঃ ওয়াল্টার্স। উক্ত কমিটি নওয়াবপুরের রাস্তায় ইট বিছিয়েছিল। তারা রমনার জংগল পরিস্কার করে সেখানে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। আগেই বলা হয়েছে রমনা এলাকার মালিকানা স্বত্ব ছিল খাজা আলীমুল্লাহ্‌র। তিনি ঐ স্থান এবং প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে ঢাকায় ঘোড়দৌড় প্রচলনে ইংরেজদের সহায়তা করেন।[১৪] পরবর্তীকালে স্থানটি রেসকোর্স ময়দান বলে পরিচিত হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ ধোলাই খালের উপর লোহারপুল নির্মাণার্থে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্টার্স সাহেব ঢাকাবাসীর কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। খাজা আলীমুল্লাহ এ আবেদনেও সাড়া দিয়েছিলেন। ব্যয় সংকোচনের জন্য কোম্পানীর সরকার ১৮২৯ খ্রীঃ ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি বিলুপ্ত করে।

উক্ত কমিটি বিলুপ্তির পর ঢাকা শহরের অবস্থা পূর্বানুরূপ খারাপ হতে থাকে। কোতয়াল প্রথা উচ্ছেদের পর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য বার্ষিক মাত্র ১৮৮০ টাকা ব্যয় করতে পারতেন। ১৮৪০ খ্রীঃ দিকে ৫ বর্গমাইল বিস্তৃত ৬৮ হাজারেরও বেশি লোক অধ্যুষিত ঢাকা শহরের জন্য উক্ত অর্থ নিতান্তই অপ্রতুল ছিল।[১৫]

১৮৪০ খ্রীঃ ম্যাজিস্ট্রেট রাসেল মোরল্যান্ড স্কীনার ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটির ন্যায় একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি খাজা আলীমুল্লাহ, নন্দলাল দত্ত, জে.পি.ওয়াইজ প্রমুখ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে প্রথমে সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এরপর ১৭ জুলাই ১৮৪০ খ্রীঃ পদস্থ সরকারি আমলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তিনি সভা করে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।[১৬]

১৮৪০ খ্রীঃ আগস্ট মাসে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। এই কমিটিতে ১৮ জন সদস্যের মধ্যে খাজা আলীমুল্লাহ একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।[১৭] শহর উন্নয়নের জন্য কমিটি প্রথমে সরকারের নিকট থেকে চৌকিদারী ট্যাক্স বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং কমিটিগঞ্জ[১৮] থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করে। শহরের ময়লা পরিস্কারের জন্য কমিটি ১২ জন সুইপার ৬ জোড়া বলদসহ ৬টি গাড়ী ও গাড়োয়ান নিয়োগ করেন।[১৯] এর ফলে ঢাকা শহরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নতি হয়। ঢাকা শহরকে ৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতি ওয়ার্ডে ৩/৪ জন করে মেম্বার নিযুক্ত করা হয়। ঢাকার পূর্ব দরজা, তাঁতী বাজার, সুলতানগঞ্জ বাজার সংলগ্ন রাস্তাগুলো নির্মাণ ও প্রশস্ত করা হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং দুটো গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পাকা করা হয়।[২০] কমিটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজছিল আরমানিটোলার ঝিলে বাঁধ নির্মাণ। এই বাঁধের উপর দিয়ে নির্মিত রাস্তা আরমানিটোলাকে চকবাজার ও নওয়াবপুরের সাথে সংযুক্ত করে। উল্লিখিত কাজে কমিটির সদস্য হিসেবে খাজা আলীমুল্লাহ্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কমিটি ১৮৪২ খ্রীঃ বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে লালবাগ কেল্লা সংস্কারের এক ব্যাপক উদ্যোগ নেয়। ১৮৪৭ সালে কাজটি শেষ হয়। ১৮৪৪ খ্রীঃ ২৬ নভেম্বর দুর্গমালিক ও কমিটির মধ্যে দুর্গটি লীজ নেয়ার ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তি দলিলে কমিটির পক্ষে মিঃ ওয়াইজ, আরাটুন, টেইলর, মীর্জা গোলামপীর, ব্রজমোহন প্রমুখের সাথে খাজা আলীমুল্লাহও একজন স্বাক্ষরদাতা সদস্য ছিলেন।[২১] দুর্গের প্রাচীর ও ইমারত সংস্কার কাজে জেলখানার কয়েদীদের ব্যবহার করা হয়েছিল। কেল্লার অভ্যন্তরে অবস্থিত দরিদ্র বাসিন্দাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে চিত্তবিনোদনের জন্য বাগান ইত্যাদি পুনঃনির্মাণ করা হয়। এভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।[২২]

ঐ যুগে ঢাকা শহরে আর্মেনীয়, খৃষ্টান এমনকি গ্রীকদের জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানের ব্যবস্থা থাকলেও মুসলমানদের জন্য কোন নির্ধারিত গোরস্তান ছিলনা। লোকেরা যেখানে খুশী এমনকি বাড়ির আঙ্গিনায় মৃতদেহ দাফন করতো। এ ব্যবস্থাটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। মুসলমানদের গোরস্তানের জন্য উক্ত কমিটি নারিন্দা, আগাসাদেক ময়দান, ফিনিক্সপার্ক, লালবাগ ও নওয়াবগঞ্জ এই পাঁচটি এলাকায় স্থান নির্বাচন করে। ঐস্থানগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ মার্চ মাসে আগাসাদেক ময়দানের গোরস্তানটির প্রস্তুত কাজ প্রথম শেষ হয়। কিন্তু অশিক্ষা ও পুর্বসংস্কারের কারণে ঐ সময় সরকারী গোরস্তানে শব দাফনের জন্য আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।[২৩] ঢাকার মুসলমানদের এরূপ যত্রতত্র শবদাফনের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করে ১৮৬৪ খ্রীঃ ঢাকা প্রকাশ এক নিবন্ধ প্রকাশ করে।[২৪]

১৮৬৭ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যাল কমিটির পক্ষ থেকে আগাসাদেক ময়দানের গোরস্তানটি নতুন করে সংস্কার করা হয়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুরানো ও ব্যক্তিগত কবরস্থানগুলো বন্ধ না করায় অতি সামান্য লোকেই সেটা ব্যবহার করতো। এজন্য ১৮৬৮ খ্রীঃ চম্পাতলী, বেগম বাজার, পূর্ব দরজা, বেচারাম দেউরী প্রভৃতি মহল্লার ১২টি পুরানো কবরস্থান বন্ধের প্রস্তাব করা হয়।[২৫] ১৮৬৯ খ্রীঃ সরকার ঐ কবরস্থানগুলো বন্ধ করার অনুমতি প্রদান করে। এ নিয়মটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২৬]

উক্ত সাব-কমিটি শহরের লোকদের মৃতদেহ যত্রতত্র কবর দেয়া কঠোর ভাবে বন্ধ করে এবং সরকারী গোরস্তানে সমাধিস্থ করতে বাধ্য করে। একই সাথে শহরের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের জন্য পুরানো পল্টনে আরেকটি গোরস্তান তৈরী করা হয়। এভাবে সরকার ও নওয়াবের যৌথ প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরের মুসলমানদের জন্য গোরস্তান তৈরী ও সেখানে নিয়মিত শব দাফনের ব্যবস্থা হয়।[২৭] গোরস্তানগুলোতে মৃতদেহ গোসল, জানাজা দেয়া প্রভৃতি ধর্মীয় আচরণসহ যথাযথভাবে শবদাফনের জন্য লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের শাস্ত্রানুযায়ী শেষকৃত্য সম্পন্ন করার একটি বিরাট সামাজিক দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের পথ প্রশস্ত হয়।

বেগম বাজার এলাকায় ঢাকার নওয়াবদের দুটি পারিবারিক গোরস্তান আজো বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক শহরের মুসলমানদের সুবিধার্থে গোরস্তান নির্মাণ ও সংস্কারে তাঁরা প্রচুর অর্থ সাহায্য দেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ঢাকা শহরে গোরস্তান নির্মাণে নওয়াব আহসানুল্লাহ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন।[২৮] ঢাকা শহরের দরিদ্র ও অসমর্থ ব্যক্তিদের মৃতদেহ সৎকারে ঢাকার নওয়াবগণ আর্থিক সহায়তা করতেন। বিশেষ করে মিটফোর্ড হাসপাতালের গরীব ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন কাফনের জন্য খাজা পরিবারে একটি বিশেষ তহবিল বরাদ্দ ছিল।[২৯] ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা মহামারীতে লোকজন মারা গেলে ঢাকার নওয়াবগণ ঐসব মৃতদেহ সৎকারে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সহায়তা দিতেন। নওয়াবদের দানের তালিকা থেকে জানা যায় ১৮৭১ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৭ খ্রীঃ মধ্যেই সাইক্লোন, দূর্ভিক্ষ ও হাসপাতাল সুত্রে মৃত মুসলমানদের সৎকার কাজে তাঁরা ২১ হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৩০]

ঢাকার উন্নয়নে সর্বদা চিন্তা করলেও আব্দুল গণি ঢাকাবাসীর উপর কোনরূপ কর ধার্যের পক্ষপাতি ছিলেননা। তিনি কিভাবে দরিদ্র জনতার করভার লাঘব করা যায় সেই চিন্তা করতেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ সরকার জনসাধারণের ইনকাম ট্যাক্স শতকরা একটাকা করে কমিয়ে দেয়। ঢাকার পঞ্চায়েতের সভাপতি হিসেবে খাজা আব্দুল গণি তখন পঞ্চায়েতের উপর ধার্যকৃত করও কিছুটা কমানোর জন্য ঢাকার কালেকটরের নিকট আবেদন করেন। পঞ্চায়েতের উপর ১৮৬২-৬৩ সনে ধার্যকৃত ৫০ হাজার টাকার স্থলে ১৮৬৩-৬৪ সনে ৩৮,৫০০ টাকা করা হলে, তারা ৪ কিস্তিতে সেটা পরিশোধ করতে পারবেন বলে তিনি সুপারিশ করেন।.আব্দুল গণির ন্যায্য ও যুক্তিপুর্ণ আবেদনটি সমর্থন করে ঢাকা প্রকাশ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। অবশেষে সরকার আব্দুল গণির আবেদন মঞ্জুর করেন।[৩১] ১৮৪০ সালে গঠিত মিউনিসিপ্যাল কমিটি ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ১৮৫৪ খ্রীঃ খাজা আলীমুল্লাহর মৃত্যুর পর খাজা আব্দুল গণি উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। কিন্তু সরকারের সুষ্ঠ নীতিমালা না থাকায় ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি ক্রমান্বয়ে কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে। ১৮৫৯ খ্রীঃ লেঃ গভর্নর স্যার জেমস গ্রান্ড ঢাকা ভ্রমনে এসে এখানকার জলাবদ্ধ ড্রেন ও নোংরা পরিবেশ দেখে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩২] এমতাবস্থায় কমিটির সদস্যগণ যেমনঃ মিঃ পোগোজ, খাজা আব্দুল গণি, গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ এর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ৬ ফেব্রুয়ারী একটি সভা করে তাঁরা এক যোগে পদত্যাগ করেন।[৩৩]

ঢাকার কমিশনার ফ্রান্সিস ক্রস সিম্পসন বাংলা সরকারকে কমিটির সদস্যদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এছাড়া তিনি সুপারিশ করেন যে, ১৮৫০ সালের ২৬ আইন মোতাবেক ঢাকায় প্রয়োজনীয় গঠনতন্ত্র দিয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটি নিযুক্ত করা অত্যাবশ্যক। জবাবে সরকার বলেন, ঐ পদ্ধতি তারা চাপিয়ে দিতে পারেননা বরং ঢাকাবাসীরা যদি আবেদন করেন তবে সরকার তা বিবেচনা করতে পারে। কারণ এজন্য যেসব কর ধার্য করা হবে তা আদায়ের দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের নিতে হবে।[৩৪] উপরোক্ত বিষয়ে স্থানীয়দের অভিপ্রায় জানার জন্য ঢাকার কমিশনার সাহেব ১৮৬৩ খ্রীঃ জুন মাসে দুটি সভা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত জনগণকে তিনি সরকারের নিকট আবেদন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এই আবেদন করার ব্যাপারে ঢাকাবাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের মতে ৪৫০ জন সরকারের নিকট আবেদনের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করেন।[৩৫] কিন্তু শহরবাসীরা অনেক আগে থেকেই এরূপ কমিটিকে ভয়ের চোখে দেখতেন। তারা মনে করতেন এধরনের কমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকজন থেকে নানা অজুহাতে কর আদায় করা। তাই হাজার হাজার নগরবাসী বিশেষ করে সব গরীব মানুষেরা প্রস্তাবিত উক্ত আইনের বিরোধিতা করেন। যে তিন জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব দেন, তাঁরা হলেন- খাজা আবদুল গণি, জে. ষ্টীফেন এবং মিত্রজিৎ সিং।[৩৬] সার্বিক বিচারে কর ধার্যের মাধ্যমে ঢাকা নগর উন্নয়নের প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত ছিল বলে মনে হয়। তবু নেতৃস্থানীয় উক্ত ব্যক্তিরা কেন তা প্রণয়নে বিরোধিতা করেছিলেন সে কথা স্পষ্ট নয়। তবে প্রজা দরদী খাজা আব্দুল গণির ক্ষেত্রে একথা বলা যায়, গরীব নিরীহ ব্যক্তিদের উপর কর বসিয়ে নগর উন্নয়ন করতে হবে, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কথা ছিল নগর বা দেশের উন্নয়ণ করতে হলে এদেশের সরকার ও ধনী ব্যক্তিদের সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ। যার প্রমান পরবর্তীতে তাঁর প্রতিটি জনকল্যাণমূলক কাজেই আমরা পেয়ে থাকি।

১৮৬৪ খ্রীঃ সরকার মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী সরকার প্রয়োজন মনে করলে নগরবাসীদের আবেদন ছাড়াই যে কোন শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করতে পারতো এবং প্রয়োজন বোধে বাড়ী-ঘর, জমি, পশু, ব্যবসা ইত্যাদির উপর কর আরোপ করতে পারতো।[৩৭] এই আইনে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং কমিশনারদের নিযুক্তি, পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষমতা লেঃ গভর্নরের হাতে ন্যস্ত ছিল।[৩৮] ১ আগস্ট ১৮৬৪ খ্রীঃ ঢাকায় নতুন পৌর আইনটি চালু করা হয়। এ সময় একটি নোটিশের মাধ্যমে ইতোপূর্বে পৌর এলাকার বাইরে থাকা জাফরাবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানগঞ্জ ও দয়াগঞ্জ এলাকা সমূহকে পৌর সভার অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন লেঃ গভর্নর। ডিভিশনাল কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন পদাধিকার বলে সদস্য।[৩৯] যদিও সিভিল সার্জনের পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার নিয়ম ছিল না, তথাপি তিনি সব সময়ই কমিশনার নিযুক্ত হতেন।[৪০] কমিশনারের সংখ্যা ছিল ১৪ থেকে ২৩ জন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম কমিটিতে ২১ জন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্কিনার এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষক, জর্জ বিলার্ট ছিলেন ঢাকা পৌর সভার যথাক্রমে প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান।[৪১] সদস্যরা ছিলেন ৮ জন সরকারী কর্মকর্তা এবং ১৩ জন স্থানীয় নেতা। খাজা আহসানুল্লাহ ঐ প্রথম কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।[৪২] ডিভিশনাল কমিশনার এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যৌথভাবে সরকারের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কমিশনার মনোনয়ন করতেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি বেভারিজের অভিপ্রায়ে খাজা আব্দুল গণিকেও মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হয়।[৪৩]

মিউনিসিপ্যালিটির উপরোক্ত কমিটির প্রথম সভা ১১ আগস্ট ১৮৬৪ খ্রীঃ ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে ৬ জন ইউরোপীয় ৩ জন আর্মেনীয় এবং খাজা আব্দুল গণি ও খাজা আহসানুল্লাহ সহ ৭ জন দেশীয় সদস্য যোগদান করেছিলেন। ঐ সভায় ঢাকার বসতবাড়ির উপর শতকরা সাড়ে সাত টাকা করে কর ধার্য করা হয়। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একটি অফিস ভাড়া নেয়া ও একজন সেক্রেটারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪৪] উক্ত সভায় সিভিল সার্জন ডাঃ আলেকজান্ডার সিম্পসন কর্তৃক ঢাকায় ধনী ব্যক্তিদের গাড়ীঘোড়া ও হাতির উপর ট্যাক্স ধার্যের একটি প্রস্তাবকে খাজা আব্দুল গণি সমর্থন করেন। কিন্তু অন্যান্যরা সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত কর আদায়ের ফলাফল কি হয় তা আগে দেখার দাবী জানান। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়।[৪৫]

ঢাকার নতুন সিভিল সার্জন ডাঃ হেনরি চার্লস কাটক্লিফ স্বাস্থ্য ও নগর উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা দেন। পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপঃ নদীর সমান্তরালে দুটি এবং আড়াআড়ি ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাস্তা নির্মাণ করে শহরকে আয়তাকার ব্লকে ভাগ করে আধুনিক ও খোলামেলা রূপ দিতে হবে। শহরের উত্তর ও পশ্চিমে জংগল পরিস্কার করে উন্মুক্ত উদ্যান স্থাপন করতে হবে। শহরের খালি পড়ে থাকা স্থানগুলোতে ভূমি উন্নয়ন ও ঋণ দানের মাধ্যমে বাড়ী তৈরী করে ঘন বসতি স্থান থেকে লোকদের তথায় স্থানান্তর করতে হবে। রাস্তার কেরোসিনের বাতিগুলো আরো উন্নত ও পর্যাপ্ত করতে হবে। তাঁর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল, ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ২০ মাইল দুরবর্তী শীতলক্ষা নদী থেকে লোহার পাইপের মাধ্যমে ঢাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এছাড়া পুরানো ও অকেজো ড্রেনগুলো বন্ধ করে দিয়ে নতুন পাকা ও অগভীর ড্রেন তৈরী করা।[৪৬]

সিভিল সার্জনের উক্ত পরিকল্পনা কমিশনার ও অফিসারগণ বিশেষভাবে সমর্থন করেন। এ পরিকল্পনার প্রসংগে খাজা আব্দুল গণির উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেন, "যদি ডাক্তারের পরিকল্পনা সত্য সত্যই বাস্তবায়ন করা যায়, তবে ঢাকা শহর বসবাসের জন্য একটি লোভনীয় স্থানে পরিনত হবে এবং তা নরকের অবস্থা থেকে স্বর্গে পরিণত হবে।"[৪৭] যদিও তখন ঐ পরিকল্পনা পুরো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, তথাপি ঢাকা শহরের পরবর্তী উন্নয়ন এর সূত্র ধরেই এগিয়েছিল। বিশেষ করে ঢাকার নওয়াবের নিজস্ব প্রচেষ্টায় শহরের উত্তরাংশে শাহবাগ বাগানবাড়ি এবং উত্তর-পূর্বাংশে কোম্পানী বাগান ও দিলখুশা বাগান বাড়ি নির্মিত হয়। এ উদ্যানগুলো শহরের নিরানন্দ পরিবেশকে কিছুটা আনন্দময় করতে সক্ষম হয়।

সিভিল সার্জন কাট ক্লিফের উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ সংগ্রহ ও জনমত সৃষ্টির জন্য ১৮৬৯ সালের ২৮ এপ্রিল ঢাকায় ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট জর্জ গ্রাহামের সাথে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ একসভা করেন।[৪৮] ঐ পরিকল্পনার উপর অনেকেই লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, খাজা আব্দুল গণি কখনই ঢাকার জনসাধারণের উপর করের বোঝা চাপানোর পক্ষপাতি ছিলেননা। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ঢাকার দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়

Dhaka University Institutional Repository

করে এ ধরনের ব্যয়বহুল কাজ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি করারোপ করে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের বিরোধিতা করেন।[৪৯]

যাহোক চেয়ারম্যান জর্জ গ্রাহাম্ শহরের ঘরবাড়ি ও বুড়ীগংগার ফেরীর উপর ট্যাক্স দ্বিগুন করার প্রস্তাব দেন। তিনি সরকারকে ধোলাইখাল থেকে আদায়কৃত টোলকর মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া পোষা কুকুরের উপর করারোপ করে তিনি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেন। ১০মে ১৮৬৯ খ্রীঃ এক সভায় তিনি কমিশনারদের নিকট তার প্রস্তাব পেশ করেন। খাজা আহসানুল্লাহ প্রস্তাবটির বেশ কিছু সংশোধনী আনলেও শেষ পর্যন্ত তিনি এর পক্ষে ভোট দেন। অনেক বাদানুবাদ শেষে সংখ্যাধিক্যের ভোটে গ্রাহামের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[৫০]

১৮৭১ খ্রীঃ শৌচাগারের উপর প্রস্তাবিত কর দিতে ঢাকাবাসীরা দুটি কারণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ তা ছিল অতিরিক্ত করের একটি নতুন বোঝা। দ্বিতীয়তঃ ঢাকার শৌচাগার ছিল অন্দর মহলে অবস্থিত যেখানে পুরুষ মেথর প্রবেশ করলে মেয়েদের পর্দা নষ্ট হবে বলে বর্ণ হিন্দু ও মুসলিমরা এর প্রতিবাদ করে। এমতাবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লায়াল গৃহ কর বর্ধিত করার প্রস্তাব দিলে খাজা আব্দুল গণি ও তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ ব্যতীত অন্যরা এর প্রতিবাদ করে। শেষ পর্যন্ত অল্প পরিমাণে পায়খানা কর ধার্যের বিষয়ে তারা সবাই একমত হন।[৫১] তৎকালে পাকা ড্রেনের সাহায্যে পায়খানার ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই পায়খানা মালিকের অবহেলায় যাতে ময়লা জমে পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য মিউনিসিপ্যালিটি কয়েকজন অভারসিয়র নিযুক্ত করেন। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে নোটিশ এবং জরিমানা করা হতো।[৫২] ১৮৭২ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে শহরের কিছু জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে সরকারের নিকট থেকে ২৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনপত্রে কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্যদের সাথে খাজা আব্দুল গণি এবং খাজা আহসানুল্লাহও স্বাক্ষর করেন। শেষ পর্যন্ত ২৫ অক্টোবর ১৮৭২ খ্রীঃ সরকার এই ঋণ মঞ্জুর করেন।[৫৩]

নওয়াব আব্দুল গণির জামাতা খাজা মোঃ আজগর ১৮৭৪-৭৫ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসেবে কাজ করেন। তাঁকে ১৮৭৯ খ্রীঃ লেঃ গভর্নর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। দেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ পদ অলংকৃত করেছিলেন।[৫৪] ১৮৯১ খ্রীঃ খাজা মোঃ আজগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন।[৫৫] ১৮৮২ খ্রীঃ আগস্ট মাসে লেঃ গভর্নর স্যার রিভার্স থমসন ঢাকা পরিদর্শনে আসেন। ঢাকায় নির্বাচনের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠনের জন্য তাঁর নিকট ঢাকার জনসাধারণের পক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহর পিতৃব্য খাজা আব্দুল আলিম এবং নওয়াবের ভগ্নিপতি পূর্বোক্ত খাজা মোহাম্মদ আজগর এক আবেদন পত্র পেশ করেন।[৫৬] এর দুই বছর পর ১৮৮৪ খ্রীঃ সরকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের অধিকার দেয়।[৫৭] ঢাকায় ২১ জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের মধ্যে ১৪ জন নির্বাচিত হবেন এবং বাকী ৭ জনকে সরকার মনোনয়ন করবেন বলে ঘোষনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা শহরকে ৭টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়।[৫৮]

১৮৮৪ খ্রীঃ ২৫ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচনে ঢাকা শহরের মাত্র ৭২০২ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯ জন ভোটাধিকার পায়।[৫৯] সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ১১৩ জন দেশীয় প্রার্থী ১৪ টি আসনে প্রতিযোগিতা করতে নামেন। কিন্তু কোন ইউরোপীয় কিংবা আর্মেনীয় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে যাননি।[৬০] এই নির্বাচনে ঢাকার অভিজাত হিন্দুরা পৌর সভার সমস্ত আসনগুলো দখলকরার পরিকল্পনা করেন। তখন ঢাকার জন সংখ্যার অর্ধেকই ছিল মুসলমান। তাঁরা নওয়াব আব্দুল গণির নেতৃত্বে হিন্দুদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাঁধা দেন।[৬১]

নওয়াব আব্দুল গণির প্রচেষ্টায় ঢাকার মুসলমানেরা একতাবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা করে কমিশনার পদে প্রার্থী দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৬২] এমতাবস্থায় ১৪টি কমিশনার পদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

২১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন মুসলিম এবং বাকীরা সব হিন্দু।[৬৩] উক্ত নির্বাচনে নওয়াব পরিবার থেকে খাজা আমীরুল্লাহ এবং খাজা মোঃ ইউসুফজান নির্বাচিত হন।[৬৪] ২৭ মার্চ ১৮৮৫ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত নব-নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের এক সভায় বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়কে চেয়ারম্যান এবং খাজা আমীরুল্লাহ-কে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।[৬৫] হিন্দু মুসলিম কমিশনারদের মধ্যে সমঝোতার ফলস্বরূপ আনন্দ চন্দ্র রায়কে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।[৬৬] কিন্তু আনন্দ চন্দ্রের ধীরে চলো নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ চেয়ারম্যানের সাথে মতানৈক্যের দরুণ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে খাজা আমীরুল্লাহ সাময়িকভাবে ভাইস চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করেন। উকিল রমাকান্ত নন্দীকে ঐপদে নিযুক্ত করা হয়।[৬৭]

ঐ আমলে গৃহ করই মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান আয় ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ গৃহ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠলে সৈয়দ গোলাম মোস্তফাসহ কতিপয় মুসলিম কমিশনার এর বিরোধিতা করেন। এদিকে ১৮৭৭ খ্রীঃ থেকে ঢাকায় গৃহকর বৃদ্ধি করা হয়নি বিধায় ১৮৮৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটিকে গৃহকর পুনঃধার্য করতে বলেন।[৬৮] এই কর ধার্যের কাজে মিউনিসিপ্যালিটির কামিশনারগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। চেয়ারম্যান আনন্দ রায় ও তাঁর সমর্থকেরা গৃহকর বৃদ্ধি করে সরকারী প্রস্তাব বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলিম নেতারা মহল্লাবাসীদের সংগঠিত করে এর প্রবল বিরোধিতা করেন। তাঁরা নওয়াব আব্দুল গণির নিকট গিয়ে তাঁকে তাদের এই কর জুলুম থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। হিন্দুদের নিকট থেকে তেমন কোন প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নওয়াব আব্দুল গণিকে এ ব্যাপারে যাতে বেশী গোলযোগ না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নিতে বলেন।[৬৯] নওয়াব সাহেব শহরবাসীর অসন্তোষের উপযুক্ত কারণ উপলব্ধি করেন এবং কর হ্রাসের জন্য তাঁদেরকে সরকারে নিকট দরখাস্ত করতে উপদেশ দেন। তিনি এভাবে তাদের নিকট থেকে ৮ হাজার দরখাস্ত সংগ্রহ করেন এবং নিজের মন্তব্যসহ সেগুলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাখিল করেন।[৭০]

এ সময় নওয়াব আব্দুল গণি প্রস্তাব করেন যে, যদি সরকার সমস্ত আবেদন নাকচ করে দেয়, তথাপি ঢাকার দরিদ্র জনগণের যাতে কর দিতে না হয়, তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন। নওয়াব নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজন বোধে অর্থ বিনিয়োগ করবেন। এ অর্থের সুদ দ্বারা দরিদ্র জনগনের কাছ থেকে প্রাপ্ত করের সমপরিমান অর্থ তিনি পরিশোধ করবেন।[৭১] কিন্তু নওয়াবের এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি। কারণ সরকার তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন।[৭২]

শহরবাসীর উপর গৃহকর বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কি কি উপায়ে মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাড়ানো যায়, তা স্থির করার জন্য ১৪ মার্চ ১৮৮৮ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির এক সভায় খাজা আমীরুল্লাহসহ চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৭৩] তেজস্বী খাজা আমীরুল্লাহ নানাবিধ কাজে সহকর্মীদের সাথে মতোবিরোধ প্রকাশ করতেন এবং তাঁর মতামত গৃহীত না হলে মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভায় হাজির হতেন না। এরূপ তিনি ছয়টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন। ফলে ১৮৮৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে নিয়মানুযায়ী তাঁর সদস্য পদটি হারান।[৭৪]

পুরানো পল্টন থেকে ব্রিটিশ সেনানিবাস সরিয়ে নেয়ার পর ঐ স্থান জংগলাকীর্ণ হয়ে যায়। নওয়াব আহসানুল্লাহ পুরানো পল্টনের সার্বিক উন্নয়নকল্পে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি প্রস্তাব দেন। মিউনিসিপ্যালিটির ১৮৮৮ খ্রীঃ ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত সভায় নওয়াবের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। এরে ফলে পুরনো পল্টনে সমস্ত জংগল পরিস্কার ও খানা-খন্দক ভরাট করে একটি বিস্তীর্ণ ময়দান স্থাপিত হয়। এই ময়দানের একাংশ সাহেব-সুবাদের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অপরাংশে নওয়াবের উদ্যোগে ও ব্যয়ে কোম্পানীর বাগিচা নামে নন্দন কানন নির্মাণ করা হয়।[৭৫]

১০ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান আনন্দ চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধবাদীদের নেতা বাবু ইশ্বর চন্দ্র দাস সেবার নোংরাভাবে প্রচারণা শুরু করেন। ফলে বাবু রূপলাল দাস ও খাজা আমীরুল্লাহর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রার্থী পদের আবেদনপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ঐ বছর ভোটে নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনার বাবু ইশ্বর চন্দ্র দাস চেয়ারম্যান এবং সরকার মনোনীত কমিশনার বাবু গোপীমোহন বসাক ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৭৬]

সরকার নওয়াব বাড়ির খাজা মোঃ আজগর এবং খাজা মোঃ ইউসুফজান-কে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে সদস্য হিসেবে নিযুক্তি দেন।[৭৭] কিন্তু ঐ বছর ডিসেম্বরে খাজা মোঃ আজগর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে দাড়িয়ে পরাজিত হন।[৭৮] পর বছর ১৮৯১ খ্রীঃ খাজা মোঃ আজগরকে সরকার কর্তৃক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত করা হয়।[৭৯] তারপর ২৭ এপ্রিল ১৮৯১ খ্রীঃ সোমবার অনুষ্ঠিত কমিশনারদের এক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে খাজা মোঃ আজগর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং বাবু ইশ্বরচন্দ্র শীল ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৮০] মুসলমানদের মধ্যে খাজা মোঃ আজগরই প্রথম ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিতীয় মুসলমান চেয়ারম্যান ছিলেন খাজা মোঃ ইউসুফজান।[৮১]

খাজা মোঃ আজগর চেয়ারম্যান হয়েই ইতোপূর্বে নিয়ম বর্হিভূত ভাবে বনগ্রামের রাস্তায় স্থাপনকৃত জলের কলের চুংগিগুলো জনস্বার্থে তুলে এনে অন্যত্র পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও চাকুরী স্থায়ীকরণের জন্য তাঁদের নিকট থেকে জামানত আদায় ও কাজের হিসেব রাখার ব্যবস্থা করেন।[৮২] এছাড়া পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানের অনিয়ম কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কমিশনারদের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।[৮৩]

মিউনিসিপ্যালিটির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০ জুন ১৮৯১ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত এক সভায় চেয়ারম্যান খাজা মোঃ আজগর কয়েকটি গঠনমুলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর মধ্যে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ, টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ করানো এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে চক্ষু ওয়ার্ড স্থাপন সংক্রান্ত কাজগুলো ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮৪]

তৎকালে ঢাকার রাস্তাঘাট কাঁচা ছিল এবং প্রচুর ধুলো উড়তো। খাজা আজগর কলের পানি ছিটিয়ে ধুলো প্রশমনের ব্যবস্থা করেন।[৮৫] এছাড়া তিনি প্রতি রবিবার ফিল্টার জল প্রদানের সময় ১১ টা থেকে আধঘন্টা বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন।[৮৬] তিনি শহরের রাস্তা-ঘাট আলোকায়নের জন্য ১৮৯৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে মিঃ মেথুরায় কোম্পানীকে টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার নিযুক্ত করেন।[৮৭] ১৮৯৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে ঢাকা সফরে এসে ছোট লাট স্যার চার্লস এলিয়ট ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৮৮] খাজা মোঃ আজগর স্বাস্থ্যগত কারণে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ভাইস চেয়ারম্যান বাবু ইশ্বর চন্দ্র শীলের হাতে ন্যাস্ত করেন।[৮৯]

১৮৯৪ সালের নির্বাচনে ইশ্বর চন্দ্র শীল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের তিনজন কমিশনার যথা-খাজা মোঃ আজগর, খাজা আব্দুল আলীম, সৈয়দ করিমুল্লাহ (নওয়াবের আত্মীয়) এবং নওয়াব এস্টেটের স্থানীয় এজেন্ট মিঃ উইদ্রল পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে তাঁরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন।[৯০] ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে প্রথম ৫০/৬০ বছর এতে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকদের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। প্রতিবারের কমিটিতেই এই পরিবারের দু'একজন হয় ভোটে নির্বাচিত, নয়তো সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য হতেন।[৯১] এজন্য অনেক সময় স্থানীয় পত্র পত্রিকা উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টোর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে খবর প্রকাশ করতো। শীতকালে বুড়ীগঙ্গা নদীর নাব্যতা সচল রাখার জন্য ১৮৯৫ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ মিউনিসিপ্যালিটিকে ১৫ হাজার টাকা দেন। ঐ টাকা দিয়ে তারা নদীর কয়েকস্থানে স্পার নির্মাণ করে এর গভীরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।[৯২] ঢাকার নওয়াবদের অনুরূপ নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা ক্রমান্বয়ে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ও শহরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২(২) ঢাকার পৌর উন্নয়নে নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফজান ঃ

খাজা মোঃ ইউসুফজান ১৮৫০ খ্রীঃ ঢাকায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা খাজা মাহদী ১৮৪৯ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণির এক সৎবোনকে বিয়ে করে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন।[৯৩] খাজা মোঃ ইউসফজানও নওয়াব আব্দুল গণির কন্যা নুরজাহান বেগমকে বিয়ে করেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তিত হবার আগেও খাজা মোঃ ইউসুফজান (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৯ দ্রঃ) ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত কমিশনার ছিলেন।[৯৪] ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৫ নভেম্বর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে তিনি কমিশনার নির্বাচিত হন।[৯৫] ১৮৯৭ খ্রীঃ তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সরকার মনোনীত সদস্য হন।[৯৬] ঐ বছরই খাজা মোঃ ইউসুফজান সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের ভোটে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।[৯৭]

১৮৯৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজান এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তিনি বলেন, এবার প্লেগের কারণে হজ্বযাত্রীদের জাহাজ পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই তাঁরা যেন এবার মক্কায় গমন থেকে বিরত থাকেন। হজ্বযাত্রীদের সাহায্যার্থে এবার নওয়াব আহসানুল্লাহর দেয়া দশ হাজার টাকাও ব্যয় করা হবে না।[৯৮] খাজা মোঃ ইউসুফজান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় ঢাকা প্রকাশ তাঁর সম্পর্কে খুবই উচ্চাশা ব্যক্ত করেন।[৯৯] 'চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজান ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লা সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঝাড়ুদার এবং রাস্তাকর্মীদেরকে সরাসরি কাজের তাগাদা দিতেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত কর সংগ্রহ করতেন ও তার যথাযথ হিসেব রাখতেন। বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যাবলীর উন্নয়ন সাধন করে এক বছরের মধ্যেই তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসনকে গতিশীল করেন।[১০০] 'চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজান ঢাকা শহরের উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শহরের পরিবেশ এবং এর বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য তিনি পয়নিস্কাশনের ব্যবস্থা নেন। তিনি একদিন পর একদিনের বদলে প্রতিদিন শহরবাসীদের মল অপসারনের ব্যবস্থা করেন এবং উত্তর-পশ্চিমে শহর থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে রেল যোগে পূরিষাদি বহন করে নিয়ে গর্তে পুতে ফেলার ব্যবস্থা করেন।[১০১] 'এছাড়া তিনি শহরবাসীর অপরিকল্পিত ও অনুপযুক্ত পায়খানা বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। জোড়াতালি দিয়ে সংস্কারের বদলে তিনি শহরের রাস্তাঘাট পুরোপুরিভাবে পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ঐ সকল কাজের জন্য চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজান স্থানীয় সংস্থাদের নিকট ঋণ গ্রহণের আবেদন করেন'। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ ও মনোনিবেশ দেখে ঋণের বিষয়টি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। কিন্তু ঐ সময় ভূমিকম্প, দূর্ভিক্ষ, মহামারী (প্লেগ) প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাজা মোঃ ইউসুফের কাজের তেমন অগ্রগতি হয়নি।[১০২] চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ প্লেগ নিবারণে নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রদানকৃত একলক্ষ টাকার ফান্ড থেকে শহরের লোকদের চিকিৎসার্থে একজন স্বাস্থ্যকর্মকর্তা ও একজন সহকারী স্বাস্থ্যকর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।[১০৩] ১৮৯৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে ঢাকা সফরে আগত ছোট লাট লর্ড উডবার্ন চেয়ারম্যান খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের শহর উন্নয়নের প্রচেষ্টা দেখে পরিতুষ্ট হন। ঐ সফরকালে ছোট লাট এতদাঞ্চলের সেরা যে ৫ জন লোকের সাথে নিভৃতে আলাপ করেছিলেন, খাজা মোঃ ইউসুফ জান ছিলেন তাঁদের একজন।[১০৪] অর্থাভাবে চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ ১৮৯৮ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির বাজেটে শিক্ষাখাতে মাত্র ২৬২ টাকা বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ বছরই প্লেগ নিবারণের জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে খাজা মোঃ ইউসুফ ঐ প্লেগ ফান্ড থেকে ১৯৫৭ টাকা নিয়ে শিক্ষাখাতে টাকার অঙ্ক ২১১৯ করতে সক্ষম হন। এছাড়াও তিনি চাঁদনি ঘাটের বুড়িগঙ্গার চর ৫ বছর মেয়াদী ইজারা দিয়ে আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন।[১০৫] ঐ বছর নওয়াব আহসানুল্লাহর নিজস্ব অর্থে পুরানো পল্টনে নওয়াবের বাগানবাড়ীর নিকট একটি পুলিশ স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।[১০৬] ১৮৯৯ খ্রীঃ খাজা মোঃ ইউসুফ এবং খাজা আব্দুল আলীম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নামে মাত্র স্বায়ত্ত শাসন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তা নিয়ন্ত্রিত হতো। এজন্য মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্মে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরা সরকারের সাথে আপোষ করে চলতেন।

১৮৯৮-৯৯ খ্রীঃ একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় শহরবাসীদের রিলিফ প্রদান ও পূনর্বাসন করতে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি সরকারী আমলাদের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে ১৮৯৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিন নামে এক করিৎকর্মা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকায় আসেন। নওয়াব পরিবারের লোকেরা তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটির পরবর্তী চেয়ারম্যান নিযুক্তিতে সহায়তা করেন। ১৯০০ খ্রীঃ সরকার প্রথমে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিন-কে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদে নিযুক্তি দেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেবার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ায় খাজা মোঃ ইউসুফ ঐ পদে দাঁড়ান নাই। কিন্তু বেসরকারী ভাবে নির্বাচিত কমিশনার বাবু প্যারিলাল দাস চেয়ারম্যান পদে জোর প্রতিদ্বন্দিতা করেন। অধিকাংশ নির্বাচিত তথা বেসরকারী কমিশনার বাবু প্যারীলাল দাসের পক্ষাবলম্বন করতে মনস্থ করেন। এমতাবস্থায় ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করে বেশ কয়েকজন বেসরকারী কমিশনারকে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে আনতে সক্ষম হন। ফলে তিনি ১৪ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং বাবু দেবেন্দ্র দাস বি. এ. ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[১০৮]

বাবু দেবেন্দ্র পরে ১৯০১ খ্রীঃ খাজা মোঃ ইউসুফ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাথে একাত্ব হয়ে ঢাকার উন্নয়নে সচেষ্ট হন। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে বিজলী বাতি দেয়ার ব্যবস্থা করলে, ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিউনিসিপ্যালিটির এক সভা হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট সড়কগুলোতে থাকা পুরাতন কেরোসিন ল্যাম্প পোস্টগুলো যেসব রাস্তায় আলো নেই সেখানে নিয়ে স্থাপন করা হবে। উক্ত ল্যাম্প পোস্টগুলো সব কমিশনারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় যেখানে আলোর বিশেষ প্রয়োজন সেখানে সেগুলো স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।[১০৯] ৪ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ঢাকা শহর পরিমাপের জন্য ৩০০০/- টাকা এবং শহরের বেওয়ারিশ কুকুর বধের জন্য ৭৫/- টাকা ধার্য করা হয়।[১১০] ১৯০৩ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে ৪ নম্বর ওয়ার্ড তথা ইসলামপুর এলাকা থেকে নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা মোঃ মুসা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর সাথে এই ওয়ার্ডের নির্বাচিত কমিশনার অপরজন ছিলেন মৌলভী আলা বখশ।[১১১] এছাড়া খাজা মোঃ ইউসুফকে ঐ বছর সরকার কমিশনার মনোনিত করেন।[১১২] ১৯০৩ খ্রীঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে নওয়াব সলিমুল্লাহ পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেন। এজন্য ঢাকার পত্র-পত্রিকা উচ্চাশা পোষণ করে খবর প্রকাশ করেন।[১১৩]

১৯০৩ খ্রীঃ ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান র‍্যাঙ্কিন সাহেব শহরের জলের কলে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের জন্য বুড়িগংগায় চর খননের উদ্যোগ নেন। তিনি এ কাজের ব্যয় নির্বাহার্থে কলের পানির উপর ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কমিশনারগণ এবং ঢাকার জনসাধারণ তাঁর বিরোধিতা করেন। ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয় এবং দাতা নওয়াব আব্দুলগণির বিনা পয়সায় জল দেয়ার শর্তটি বহাল থাকে।[১১৪] মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাঙ্কিন রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর পদে পদোন্নতি পেয়ে ৩০ জুলাই ১৯০৫ খ্রীঃ ঢাকা ত্যাগ করে চলে যান। ১১ আগস্ট খাজা মোঃ ইউসুফজানকে মিউনিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের শূন্য পদে নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় বারের উকিল বাবু দেবেন্দ্র দাস ভাইস চেয়ারম্যান হন।[১১৫]

এই সময় বংগ বিভাগের কারণে মিউনিসিপ্যালিটির হিন্দু কমিশনারেরা চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু তিনি মুসলিম কমিশনার এবং সরকারী আমলাদের নিকট থেকে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন। বংগ বিভাগের ফলে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় এখানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা গড়ে উঠতে থাকে। শহরের উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

দিকে বিস্তৃত এলাকা অধিগ্রহণ করে সরকারী অফিস-আদালত ও আবাসিক ভবনাদি তৈরি হতে থাকে। রাজধানীর উপযুক্ততা দিতে গিয়ে ঐ সময় প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ঢাকার সার্বিক উন্নয়ন পরিচালিত হতে থাকে। 'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে খাজা মোঃ ইউসুফ সব উন্নয়ন কাজে পরামর্শ দাতারূপে কাজ করতেন। তৈফুর সাহেব একবার তাঁকে একটি মজা পুকুর সাফ করার নেতৃত্ব দিতে দেখেছিলেন। তিনি একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সারা শহর ঘুরে লোকের দূর্দশার খবর নিতেন।'

শহর থেকে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পুরিষাদি ট্রামে বহন করে নিয়ে গর্তে ফেলার এক পরিকল্পনা নিয়ে ১৯০৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পূর্ব বাংলা সরকারের সেনিটারী ইঞ্জিনিয়ার এজন্য ১,৭১,০০০ টাকার একটি ব্যয়ানুমান পেশ করেন।[১১৬] ১৯০৬ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারেরা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। কিন্তু স্কীমটি বাস্তবায়নে সরকারে নিকট থেকে অর্থ ঋণ গ্রহণ কালে মিউনিসিপ্যালিটির হিন্দু সদস্যেরা এর বিরোধিতা শুরু করেন। বংগ বিভাগের বিরোধিতাই তাঁদের উল্লিখিত বিরোধিতার কারণ। এমতাবস্থায় চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ কাস্টিং ভোট দিয়ে উক্ত প্রস্তাব পাশ করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বাতিল হয়।[১১৭]

নওয়াব সলিমুল্লাহর সমর্থনে ১৯০৫ সালে পূর্ব বংগ ও আসাম প্রদেশ বাস্তবায়িত হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ জুন মাসে পূর্ব বংগ ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে ঢাকা বিভাগের অধীনস্থ মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি দেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়।[১১৮] খাজা মোঃ ইউসুফ এই নিয়মে বহুদিন ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন। এ অধিকারটি বঙ্গবিভাগ রহিত হওয়ার পরে যুক্ত বংগীয় ব্যবস্থাপক পরিষদেরও চালু থাকে।[১১৯]

বংগ বিভাগের পর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ১৯০৬ খ্রীঃ বুড়ীগংগা নদীর তীরে একটি প্রমোদ উদ্যান তৈরীর ব্যবস্থা করেন।[১২০] উদ্যানটি ১৯১১ খ্রীঃ দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে অভিষেক (করোনেশন) পার্কে রূপান্তরিত করা হয়।[১২১] বংগ বিভাগ বাস্তাবায়নের পর এতদাঞ্চলের হিন্দু সমাজ যেমন এর ঘোর বিরোধিতা করেছিল, নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববংগের মুসলিমরা তেমনি এর পক্ষে যথাসাধ্য কাজ করেছিল। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে ঐ সময় অধিকাংশ সদস্য ছিলেন হিন্দু। তাঁদের প্রভাবে নবগঠিত পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট মিঃ ফুলার ৫ নভেম্বর ১৯০৫ খ্রীঃ ঢাকায় এলে, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিঃ বোর্ড তাঁকে কোনরূপ অভিনন্দন পত্র দেয়া থেকে বিরত থাকে। কেবলমাত্র মুসলিম সমিতির পক্ষ থেকেই ছোট লাটকে অভিনন্দন পত্র দেয়া হয়।[১২২] কিন্তু মিঃ ফুলারের পদত্যাগের পর ছোট লাট মিঃ হেয়ার ঢাকায় এলে (১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬ খ্রীঃ) ডিঃ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজানের প্রচেষ্টায় ও সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন পত্র দেয়ার প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়। এছাড়া খাজা মোঃ ইউসুফ ও নওয়াব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিও সর্বসম্মতিক্রমে ছোট লাটকে অভিনন্দন পত্র দিতে সম্মত হয়।[১২৩] ১৯০৯ খ্রীঃ মে মাসে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে নওয়াব পরিবারের খাজা মোঃ আজম এবং খাজা আজিজুল্লাহ নির্বাচিত হন। এছাড়া ঐ বছর সরকার কর্তৃক খান বাহাদুর খাজা মোঃ ইউসুফ জান কমিশনার মনোনীত হন।[১২৪] এঁদের মধ্যে খাজা মোঃ ইউসুফ চেয়ারম্যান এবং দেবেন্দ্রনাথ দাস ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। খাজা ইউসুফ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এবারো ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা আনন্দ সহকারে খবর প্রকাশ করে।[১২৫]

১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী ভারত সফরে আসেন। পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের জেলাবোর্ড ও পৌরসভা সমূহের পক্ষ থেকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত অভিনন্দন পত্রটি নওয়াব ইউসুফ জানের স্বাক্ষরে প্রেরিত হয়েছিল। আদিনাথ সেন বলেন, স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত বিধি বিধানে বঙ্গদেশে নওয়াব ইউসুফ জান ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। ঢাকার উন্নয়নে তাঁর ন্যায় অসাম্প্রদায়িক লোক দেখা যায় না।[১২৫(ক)]

স্থানীয় সরকার সমূহের কার্যব্যবস্থায় বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার নিমিত্তে নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রচেষ্টা চালান। তিনি জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সদস্য পদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট করে দেয়ার দাবী জানান। এ বিষয়ে তিনি ৫ এপ্রিল ১৯১১ খ্রীঃ পূর্ববংগ ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বিষয়টি পর্যালোচনা করে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[১২৬] তৎকালে ঢাকা শহরে কোন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের পর এরূপ মার্কেটের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ ১৯১১ সালের ২২ ডিসেম্বর এক পত্রে বিষয়টি ঢাকার কমিশনারের নিকট পেশ করেন[১২৬(ক)]

'১৯১২ খ্রীঃ ১১ জুনে কার্যকালের মেয়াদ শেষে কমিশনারদের এক সভায় খাজা মোঃ ইউসুফজান পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কাজী আলাউদ্দিন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[১২৭] ১৬ আগস্ট ১৯১২ খ্রীঃ নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফ জানের নেতৃত্বে নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ (চিত্র নং ৭ দ্রঃ) (নওয়াব সলিমুল্লাহর ছোট ভাই), মৌলভী আমিরুদ্দিন, বাবু দেবেন্দ্র দাস প্রমুখ ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বংগের গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সাথে দেখা করেন। তাঁরা ঢাকা শহরে কলকাতার ন্যায় ময়লা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাসনের জন্য ড্রেন তৈরীর প্রস্তাব দেন। পুরাতন ঢাকায় একটি মিউনিসিপ্যাল মার্কেট স্থাপন করা ও লোহারপুলের পুনর্নির্মাণের দাবী করেন। এছাড়াও ঐ সময় ডিঃ বোর্ডের পক্ষ থেকে ঢাকা-আরিচা রেল লাইন স্থাপন এবং পল্লী গ্রামসমূহে বিশুদ্ধ পানির কূপ স্থাপনের দাবী জানানো হয়।[১২৮] উল্লেখিত প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৩ খ্রীঃ পুরান ঢাকায় নির্মিত নতুন সড়কের পাশে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নওয়াব ইউসুফের নামে একটি মার্কেট নির্মাণ করেন।[১২৯] মার্কেটটি নির্মাণে ১,২০,০০০ টাকা ব্যয়ানুমান ধরে ইংরেজ স্থপতি মিঃ মুনিংস নক্শা করেছিলেন। ১৯১৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর সেটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।[১২৯(ক)]

বংগবিভাগ রদের পরেও নওয়াব পরিবারের খাজা মোঃ ইউসুফ প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে হিন্দু সদস্যরা ব্যাপক পরাজয়ের সম্মুখীন হন। এ কারণে তাঁরা দরিদ্রদের বিশেষ করে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা হ্রাসের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯ আগষ্ট ১৯১২ খ্রীঃ 'ঢাকা জনসাধারণ সভা'র পক্ষ থেকে সভাপতি আনন্দচন্দ্র রায় এবং সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এজন্যে বংগের গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সাথে দেখা করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে বার্ষিক মাত্র দেড় টাকা কর দাতাদেরকে ভোটাধিকার দেয়ায় অনেক গরীবলোক ভোটাধিকার পেয়েছে। যাদের অনেককে ধনী ও চালাক লোকেরা কৌশলে তাঁদের পক্ষে ভোটদানে প্রভাবিত ও বাধ্য করে থাকে। এমতাবস্থায় আইন সংশোধন করে যাঁরা বেশী কর দেন, কেবল তাঁদেরকেই ভোটাধিকার দেয়া হোক বলে তাঁরা অনুরোধ জানান।[১৩০] কিন্তু নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফ প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সরকার ঐ নিয়ম প্রচলনে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে থাকার পাশাপাশি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদেও দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। কিছুদিন তিনি ডিঃ বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সুনামের সাথে পালন করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে এতই ভালোবাসতেন যে তাঁরা নওয়াবের একটি সুন্দর তৈলচিত্র ডিঃ বোর্ডের সভাকক্ষে টাংগিয়ে রেখেছিলেন।[১৩১] নওয়াব ইউসুফজান লম্বা নলের গড়গড়া টানতে টানতে মিউনিসিপ্যাল অফিসে কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রভাব খাটিয়ে জনগণের সমস্যার সমাধান করতেন।

১৯১৪ খ্রীঃ ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটিকে শৌচাগার কর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এতে জনগনের দুর্দশা বাড়বে বিধায় চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ তা নাকচ করে দেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ঢাকা থেকে পূর্ববংগের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় এখানে বাড়ীর মূল্য অনেক কমে গেছে। এ জন্য আগে ধার্যকৃত ট্যাক্সই এখন বেশী বলে কর দাতারা অনুভব করছে। তাই কর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।[১৩২] ঢাকার রাস্তায় চলাচলকৃত ঘোড়ার গাড়ী পরীক্ষা করে ১৯১৪-১৫ অর্থ বছরে পাশ বা লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্য মিউনিসিপ্যালিটির এক সভায় নওয়াব পরিবার থেকে নির্বাচিত কমিশনার খাজা আজিজুল্লাহসহ তিন সদ্যসের এক কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা ঐ কাজটি সুষ্ঠুভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদন করেন।[১৩৩] চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে শহরের বৈদ্যুতিক তার বিস্তারের জন্য ১৯১৪ খ্রীঃ ২৯৩১ টাকা ব্যয় এবং উয়ারী অঞ্চলে তিনটি পয়নিষ্কাশন প্রণালী নির্মানের জন্য ২৫৬৭ টাকা ব্যয় করেন।[১৩৪]

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ঢাকার পয়নিষ্কাশন প্রণালীর আধুনিকীকরণ। বলতে গেলে এ কাজে তিনি একক কৃতিত্বের দাবীদার।[১৩৫] ঢাকার সদর রাস্তার নীচ দিয়ে ড্রেনেজ লাইন তৈরী করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে ১৯১২-১৩ অর্থ বছরে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়।[১৩৬] ঢাকার পয়নিষ্কাশন প্রণালীর উন্নয়নের জন্য খাজা মোঃ ইউসুফ ১৯১৫ খ্রীঃ ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ানুমান করে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সরকারের নিকট থেকে ঐ টাকা মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য তিনি সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালান। তিনি অবশেষে ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার চুক্তি করতে সক্ষম হন। খাজা ইউসুফের নিরলস চেষ্টা সত্ত্বেও কাজটি সম্পাদন করতে ১৯২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সময় লেগে যায় এবং বর্ধিত ব্যয়ানুমান ৪০ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাড়ায়। ১৫ আগষ্ট ১৯২৩ খ্রীঃ বুধবার সকাল ৮.১৫ মিঃ বংগের গভর্নর লর্ড লিটন একটি সোনার চাবি দ্বারা মেশিন চালিয়ে সুয়ারেজ পাম্প স্টেশনের উদ্বোধন করেন। ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লর্ড লিটন ঢাকার সুয়ারেজ কাজের জন্য নওয়াব ইউসুফের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন।[১৩৭] ১ নভেম্বর ১৯১৫ খ্রীঃ সোমবার মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কমিশনারদের ভোটে নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফের স্থলে প্রবীন কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল দাস বি. এল. চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ ছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান পদে খান বাহাদুর কাজী রাজীউদ্দিন আহমদের স্থলে শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র রায় নির্বাচিত হন।[১৩৮]

খাজা মোঃ ইউসুফ প্রায় ১৮ বছর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ দিকে চেয়ারম্যান পদে না থাকলেও একজন কমিশনার হিসেবে খাজা মোঃ ইউসুফের সেবা অব্যাহত থাকে।[১৩৯] ১৯২৩ খ্রীঃ ৮ নভেম্বর খাজা মোঃ ইউসুফ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব থেকে তিনি ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যনের পদে কাজ করছিলেন।[১৪০] এই সময়ে ডিঃ বোর্ডের পক্ষ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিখ্যাত তীর্থস্থান লাংগলবন্দে জলের কল স্থাপনের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৩১ মার্চ ১৯২৫ খ্রীঃ মংগলবার সকালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এ. এইচ. ক্লেটন এই জলের কল উদ্বোধন করেন। নওয়াব ইউসুফের স্মরণে এই কলের জল ব্যবস্থার নামকরণ করা হয় "নওয়াব ইউসুফ ওয়াটার ওয়ার্কস"[১৪১]

নওয়াব খাজা মোঃ ইউসফের মৃত্যুর পর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকান্ডে ঢাকার নওয়াব পরিবারের নিরবিচ্ছিন্ন সংযুক্তি ছিন্ন হয়। এরপর মাঝে মধ্যে এই পরিবারের দু'একজন মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনার কিংবা চেয়ারম্যান মনোনীত হলেও আগের মত তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোন কার্যাবলী নজরে আসে না। পরবর্তীকালে নওয়াব পরিবারে যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিন[১৪২] ও খাজা খায়রুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯২২ থেকে ১৯২৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।[১৪৩] ১৯২৫ খ্রীঃ সরকার খাজা নাজিমুদ্দিন ও নওয়াবজাদা খাজা আফজালকে কমিশনার মনোনীত করেন। ঐ বছরও কমিশনারদের ভোটে খাজা নাজিমুদ্দিন চেয়ারম্যান এবং রায় কেশব চন্দ্র ব্যানার্জী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[১৪৪] খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রচেষ্টায় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তদানীন্তন বাংলায় দ্বিতীয় বৃহত্তম পৌর সভার মর্যাদা লাভ করে। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।[১৪৫] খাজা নাজিমুদ্দিনের পর নওয়াব পরিবারের আর কাউকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হতে দেখা যায়নি। অতপর পাকিস্তান আমলের আগ পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে সাধারণতঃ হিন্দুরাই চেয়ারম্যান হতেন। পরবর্তীকালে নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ, সৈয়দ সাহেবে-আলম, নওয়াবজাদা খাজা আহসানুল্লাহ, সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দিন প্রমুখ নওয়াব পরিবারের সদস্যগণ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে খাজা খায়রুদ্দিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন

Dhaka University Institutional Repository

নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৯৫৭ সালে কমিশনার হন এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর আমলে ঢাকা পৌরসভার আয় ৩১ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় পৌঁছে। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের বেতনাদি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন।[১৪৬]

২(৩) ঢাকায় পানীয় জলের কল স্থাপন ঃ

ঢাকা শহরের বাসিন্দারা সাধারণত নদী পুকুর কিংবা কুয়ার পানি ব্যবহার করতো। ময়লা আবর্জনার পুঁতিগন্ধে ভরা নোংরা শহর হিসেবে পরিচিত ঢাকা নগরীর পানির উৎসগুলো স্বভাবতই কম-বেশি দূষিত ছিল। শহরের লোকেরা এসব পানি দিয়েই তৃষ্ণা মেটাতে বাধ্য হতো। ফলে সারা বছর ধরে তাদের মধ্যে পানি বাহিত রোগ লেগেই থাকতো। কখনো কখনো তা আবার মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে বিপুলসংখ্যক লোকের প্রাণ সংহার করতো। দরিদ্র লোকেরা যে যার মত পানি সংগ্রহ করলেও শহরের মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর পানি সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য ভিস্তিওয়ালা নামে এক শ্রেণীর শ্রমজীবীরা কাজ করতো। নিকটস্থ নদী, নালা, পুকুর কিংবা কূয়া থেকে পয়সার বিনিময়ে মশকের সাহায্যে পানি বয়ে এনে তারা শহরবাসীর পানির চাহিদা মেটাতো। বদান্যবর নওয়াব আব্দুল গণির দানে সর্বপ্রথম ঢাকা শহরে কলের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কলের জল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও ভিস্তিওয়ালারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপিত জলের চুংগি থেকে কোন কোন বাড়িতে পানি বিতরনের কাজ করতো। ব্যাপকভাবে শহরের বাড়িতে বাড়িতে জলের কলের পাইপ স্থাপনের ফলে ভিস্তিওয়ালাদের ঐ পেশা নিঃশেষ হয়ে যায়।[১৪৭]

পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, ঢাকার ইংরেজ সিভিল সার্জন ডাঃ হেনরি চার্লস কাটক্লিফ-ই প্রথম শহরবাসীর স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য বিশুদ্ধ কলের জল সরবরাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করেছিলেন। বুড়িগংগার তুলনায় শীতলক্ষার পানি অধিকতর পরিষ্কার ছিল। এজন্য তিনি ঢাকা থেকে ২০ মাইল দূরবর্তী শীতলক্ষা নদী থেকে লোহার পাইপের সাহায্যে পরিস্কার পানি শহরে এনে সরবরাহের জন্য ১৮৬৯ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির সভায় প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাব প্রভৃতি কারণে সিভিল সার্জনের উক্ত প্রস্তাব তখন বাস্তবায়িত হয়নি।[১৪৮]

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও রাজানুগত্যের দরুন ব্রিটিশ সরকার ঢাকার খাজা আব্দুল গণিকে ১৮৭১ খ্রীঃ উচ্চ সম্মানবাহী সি.এস.আই. খেতাব প্রদান করেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭১ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁকে উক্ত খেতাব আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওয়েলসের যুবরাজের অসুস্থ্যতার কারণে সেটা স্থগিত থাকে। পরে ১৮ ডিসেম্বর ঢাকার কমিশনার কর্তৃক কাজটি সম্পাদিত হয়।[১৪৯] এর পূর্বে তাঁকে ১৮৬১ খ্রীঃ অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮৬৬ খ্রীঃ বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ বড়লাট আইন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করা হয়। সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ব্রিটিশ রাজপুরুষের স্মরণে ঢাকা শহরে জনকল্যাণমূলক একটি স্থায়ী কাজ করার জন্য আব্দুল গণি ভাবতে শুরু করেন।[১৫০] ১৮৭১ খ্রীঃ ডিসেম্বর ওয়েলসের যুবরাজ (পরবর্তীকালে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড) -এর গুরুতর অসুস্থতা (টাইফয়েড) নওয়াবের সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ এনে দিল।[১৫১] যুবরাজের রোগমুক্তির জন্য আব্দুল গণি ঢাকা শহরের মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় প্রার্থনা আয়োজনের ব্যবস্থা করেন এবং জনগণের সাথে নিজেও সেই প্রার্থনায় যোগ দেন।[১৫২]

ওয়েলসের যুবরাজের ঐ রোগমুক্তির খবর শুনে আনন্দে রাজভক্ত খাজা আব্দুল গণি তাঁর স্মরণে ঢাকার জনগণের উপকারার্থে কোন একটি স্থায়ী কাজ করার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।[১৫৩] দানকৃত এ অর্থদ্বারা কি করা হবে গণি মিয়া তা উল্লেখ করেননি। এজন্য সরকারী আদেশে অচিরেই একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি স্থির করেন যে, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে উক্ত অর্থদ্বারা শহরে পানীয় জলের কল স্থাপন করা হবে।[১৫৪] কিন্তু হিসেব নিকেস করে দেখা গেল, এত কম টাকায় জলের কল স্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়াও সেটা রক্ষণাবেক্ষণে আরো প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

টাকার দরকার। এমতাবস্থায় খাজা আব্দুল গণি ও তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নিকট পুনরায় অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। খাজা আব্দুল গণি তখন তাঁর দানের অর্থ দিগুণ করলেন এবং সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য খাজা আহসানুল্লাহ আরো ৫০ হাজার টাকা দিলেন। অর্থাৎ পিতা-পুত্র মিলে দেড় লক্ষ টাকা একাজে দান করেন। তবে দ্বিতীয়বার অর্থদানের সময় তাঁরা শর্ত দিলেন যে, খাজা আহসানুল্লাহর প্রদানকৃত ৫০ হাজার টাকা স্থায়ী বিনিয়োগ করতে হবে এবং তা থেকে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে জলের কল রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে। এছাড়া ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি এই পানীয় জলের জন্য জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনরূপ করারোপ করতে পারবেনা। নওয়াবের অর্থে স্থাপিত কলের পানি সবাইকে আজীবন বিনামূল্যে ভোগ করতে দিতে হবে।[১৫৫] ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার তাঁর পত্র নং-১০৭ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ খ্রীঃ এবং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ খ্রীঃ তারিখের সভায় নওয়াব আব্দুল গণির উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর সরকারও তা অনুমোদন করেন।[১৫৬] ১৮৭২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসেই জলের কলের জন্য প্রয়োজনীয় নক্সা প্রণয়ন ও ব্যয়ানুমান তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়। এজন্য সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পেয়ারা এবং মিঃ এন. ডব্লিউ. মেকেঞ্জিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[১৫৭] জলের কল স্থাপনের জন্য প্রথমে লালবাগের চাঁদনীঘাটে, লালবাগ রাস্তার দক্ষিণ ও উত্তরে প্রায় আড়াই একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।[১৫৮]

জলের কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য ১৮৭৪ খ্রীঃ ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় আসেন। তিনি কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ ঘাট এবং সেখান থেকে 'সোনামুখী' নামক জাহাজে করে ৫ আগস্ট বুধবার বিকেল ৪ ঘটিকায় ঢাকার সদর ঘাটে এসে অবতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে একই দিনে বংগের লেঃ গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল সাহেব 'রোটাস' নামক অপর একটি জাহাজে করে ঢাকায় আসেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ঐদিনই সন্ধ্যায় নওয়াবের আমন্ত্রণে আহসান মঞ্জিলে এক প্রমোদ সমাবেশে যোগ দেন।[১৫৯] পরদিন ৬ আগস্ট বিকেল ৬ ঘটিকায় জলের কলের ভিত্তি স্থাপনের জন্য লালবাগের চাঁদনীঘাটে এক সভার ব্যাপক আয়োজন করা হয়। পূর্ব থেকেই আমন্ত্রন কার্ড বিলি করে শহরের সব গন্যমান্যদের উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির করা হয়।[১৬০] অনুষ্ঠানের সুদৃশ্য মঞ্চের উপর ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল, বড় লাটকে উদ্দেশ্য করে তাঁর ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি নওয়াব আব্দুল গণির অর্থদানের পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বড়লাটকে এ মহৎ কাজের ভিত্তি স্থাপন করতে আহবান করেন।[১৬১] বড়লাট তাঁর বক্তৃতায় নওয়াব আব্দুল গণির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এ অনুষ্ঠানের কথা ওয়েলসের যুবরাজকে অবহিত করবেন বলেও উল্লেখ করেন।[১৬২]

ঢাকা বাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে মিউনিসিপ্যালিটি সিভিল সার্জন ডাঃ ওয়াইজের পরামর্শমত জলের পাইপ বসানোর ব্যবস্থা করে। প্রথমত পানির পাইপ লালবাগ থেকে সদরঘাট পর্যন্ত গিয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এরপর এক শাখা শাঁখারী বাজার হয়ে একরামপুর ও লোহারপুল পর্যন্ত এবং আরেকটি শাখা তাঁতীবাজার দিয়ে বংশাল ও জেলখানা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।[১৬৩]

১৮৭৭ খ্রীঃ রানী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণের স্মৃতি রক্ষার্থে নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকা বাসীর হিতার্থে কল্যাণমূলক কোন কাজ করার জন্য পুনরায় ২০,০০০ টাকা দান করেন। নানাদিক বিবেচনা করে সরকার উক্ত টাকাও জলের কল নির্মাণে ব্যয় করেন। এর ফলে আগের পরিকল্পনার সাথে আরো আড়াই মাইল বিস্তৃত এলাকায় কলের জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।[১৬৪] ঢাকার মত অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শহরে প্রাচীনকাল থেকে তৈরী রাস্তাঘাট খুঁড়াখুড়ি করে পানির লাইন বসিয়ে জলের কল চালু করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। নওয়াবের দানকৃত উক্ত টাকা ছাড়াও মিউনিসিপ্যালিটির অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়। এ সত্ত্বেও জলের কল নির্মাণ শেষ হতে বিলম্ব হওয়ায় ঢাকা প্রকাশ একাজে আরো টাকা গ্রাসের আশংকা করে ১৮৭৭ খ্রীঃ খবর প্রকাশ করে।[১৬৫] ১৮৭৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মোট ১,৯৫,৩৫০/- টাকা ব্যয়ে ঢাকায় জলের কল স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়। নওয়াবদ্বয়ের দানকৃত ১,৭০,০০০/- টাকার অতিরিক্ত খরচ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

বহন করে।[১৬৬] ঐ সময় ২ টি নিমজ্জমান বয়লার, ২টি ইঞ্জিন, ৪টি পানি থিতানোর ট্যাংক, ২টি ফিল্টার বেড এবং একটি থিতানো পানির রিজার্ভার নিয়ে জলের কল কমপ্লেক্সটি গঠিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে সোয়া চার মাইল ব্যাপী পাইপ দিয়ে শহরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৬৭] বুড়ীগংগা নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে পানি উঠিয়ে তা ফিল্টার করা হতো। এরপর শহরের রাস্তার বিভিন্ন স্থানে সুবিধামত জায়গায় নির্মিত ২৫টি জলের চুংগীর সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হতো। এছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত বাড়িতেও জলের চুংগি দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় প্রতিদিন সরবরাহকৃত ফিল্টার পানির পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ গ্যালন।[১৬৮]

১৮৭৮ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্ম তারিখ ২৪ মে, শুক্রবার ঢাকার পানীয় জলের কল উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঐ দিন চাঁদনীঘাটে জলের কল এলাকাটি সুসজ্জিত করা হয়। সকাল ৮ টায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাঁদনী ঘাটে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। প্যান্ডেল এলাকায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অনেকে পার্শ্ববর্তী দালান কোঠার উপর থেকেও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।[১৬৯] অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এফ. বি. পিকক সাহেব জলের কলের উদ্বোধন ঘোষনা করেন। কমিশনার সাহেব তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রিন্স অব ওয়েলস-এর রোগমুক্তি উপলক্ষে নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক প্রথমে ৫০ হাজার টাকা দানের কথা উল্লেখ করেন এবং উক্ত অর্থ কিভাবে দেড়-দুই লক্ষ টাকায় বর্ধিত হয়ে জলের কল স্থাপন সম্ভব হয় সেসব পূর্বাপর বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,পৃথিবীতে সব মানুষ নশ্বর, কিন্তু নওয়াব আব্দুল গণি সাহেব যে কাজ করে গেলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নওয়াব আব্দুল গণিকে সম্বোধন করে তিনি আরো বলেন, "লেঃ গভর্নর বাহাদুর এই কার্যের জন্য আপনাকে অভিবাদনার্থ আমাকে অনুজ্ঞা করেছেন। তদানুসারে আমি আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি।"[১৭০] অনুষ্ঠানে সরকারের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ স্মাইথ এবং মিঃ বিভিয়ান সাহেবও বক্তৃতা করেন।[১৭১] নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর বক্তৃতায় জলের কল সংস্থাপন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় খোদার শোকর গোজার করেন। তিনি বলেন, ঢাকায় কলের জলের ব্যবস্থা করা তাঁর একটি স্বপ্ন ছিল। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্যকারী ব্রিটিশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[১৭২] সবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট-কালেকটর মিঃ ডি. আর. লায়াল সাহেব দন্ডায়মান হয়ে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ঢাকা বাসীর পক্ষ থেকে নওয়াব আব্দুল গণিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নওয়াবদের প্রাচীন এ্যালবামে উক্ত ওয়াটার ওয়ার্ক্সের ফিল্টার বেড, কলঘর, প্রভৃতির দৃশ্য সম্বলিত একটি দুস্প্রাপ্য আলোক চিত্র পাওয়া গেছে। চিত্রটি পরিশিষ্টে চিত্র নং-১০ তে দেয়া হলো। উক্ত আলোকচিত্রকে অবলম্বন করে জলের কলের **উক্ত** উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি কাল্পনিক দৃশ্য অঙ্কন করে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

নতুন সংস্থাপনের কারণে প্রথম ৫/৭ দিন পাইপে স্বভাবতই ময়লা পানি আসতো। তাই ঢাকার পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শহরবাসীদের প্রথম কয়েক দিন কলের পানি খাওয়া দাওয়ার কাজে ব্যবহার না করতে পরামর্শ দেয়া হয়।[১৭৩] জলের কল প্রতিষ্ঠার ফলে ঢাকা শহরবাসীর স্বাস্থ্যোন্নয়নে সহায়ক হয় এবং কলেরার প্রকোপ কমে যায়। এমনকি সাধারণ রোগব্যাধি যেমন সর্দ্দিজ্বর, আমাশয় ইত্যাদির প্রকোপও ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।[১৭৪] কল প্রতিষ্ঠার আগে এবং পরে ঢাকা শহরে কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্টটি পর্যালোচনা করলে ঢাকা শহরের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায়, ১৮৭৭ খ্রীঃ কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৭ জন। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীঃ সেটা কমে হয় ৩২ জন এবং ১৮৮১ খ্রীঃ মাত্র ১৪ জন।[১৭৫]

ঢাকায় জলের কল প্রতিষ্ঠার কারণে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের নিকট নওয়াব খাজা আব্দুল গণির সম্মান ও সমাদর ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ১৮৭৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ওয়েলসের যুবরাজ ভারত ভ্রমনে আসেন। ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে যুবরাজের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য আব্দুল গণি বিশেষ রেলওয়ে স্টীমারযোগে কলকাতা গমন করেন।[১৭৬] প্রিন্স যখন স্টীমার থেকে অবতরণ করেন তখন বড়লাটের আমন্ত্রণক্রমে নওয়াব আব্দুল গণিও প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন।[১৭৭] অনেকের সাথে নওয়াবের বাদ্যকরেরাও তথায় বাদ্য বাজিয়ে যুবরাজকে স্বাগত জানান।[১৭৮] যুবরাজের দরবারে নওয়াব আব্দুল

Dhaka University Institutional Repository

গণিকে দেশীয় শাসন কর্তাদের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়।[১৭৯] আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, উক্ত দরবারে লর্ড নর্থব্রুক নওয়াব আব্দুল গণিকে পিছনের সারি থেকে উঠিয়ে এনে সামনের সারিতে বসান। তিনি যুবরাজের সাথে তাঁর স্মরণে ঢাকায় পানীয় জলের কল স্থাপনের কথা বলে আব্দুল গণিকে পরিচয় করিয়ে দেন। যুবরাজ আব্দুল গণির প্রতি মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১৮০] এরপর আব্দুল গণি গভঃ হাউসে প্রিন্সের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে ঢাকায় তৈরী মসলিন ও ফিলিগ্রী কাজের সামগ্রী উপহার দেন।[১৮১] যুবরাজও নানা উপহারাদিসহ ঐ রাজকীয় সফরের স্মৃতিস্বরূপ নওয়াব আব্দুল গণিকে মেডেল প্রদান করেন।[১৮২]

উদ্বোধনের ২/৩ দিন পরেই জলের কল চালানো বন্ধ রাখতে হয়। কারণ নির্মাণ কাজে ত্রুটির কারণে সঞ্চিত জলাধারে পানি চুয়ানোয় সেটি সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন পড়ে। উক্ত সংস্কার কাজ প্রায় মাস খানেক ধরে চলে।[১৮৩] ১৮৮২খ্রীঃ পর্যন্ত সকাল ৮.০০ টা থেকে ১০.০০ টা এবং বিকেল ৪.০০ টা থেকে ৬.০০ টা , মোট ৪ ঘন্টা মাত্র কলের পানি সরবরাহ করা হতো। ছুটির দিন রবিবারে আবার সর্বত্র পানি সরবরাহ করা হতো না। এত অল্প পরিমান পানি শহরের ব্যাপক চাহিদা পুরণ করতে পারতো না বিধায় কলের বিস্তার কাজ জরুরী হয়ে পড়ে।[১৮৪] এছাড়া যথাযথ সংস্কারের অভাবে কলের পাইপে মাঝে মাঝে অপরিস্কার পানি আসতে থাকে। কোন কোন স্থানে পাইপ ফুটো হয়ে পানি পড়তে থাকে। আবার কোথাও একেবারে পানি শূন্য অবস্থা চলতে থাকে।[১৮৫]

১৮৮১ খ্রীঃ ১৯ ডিসেম্বর মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ জলের কলের রক্ষণাবেক্ষণ ফান্ড থেকে ২৫ হাজার টাকা তুলে চৌধুরী বাজার, নওয়াবগঞ্জ, আমলিগোলা, বংশাল প্রভৃতি এলাকায় কল বিস্তারের পরিকল্পনা করে। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনার এফ. এইচ. পিলো সাহেব এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেন।[১৮৬] ১৮৮২ সালে অতিরিক্ত রিজার্ভার নির্মাণসহ জলের কলের আধুনিকীকরণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি এজন্য সরকারের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নেয়ার প্রস্তাব পেশ করে। ঢাকার জেলা প্রশাসক প্রস্তাবটির পক্ষে সুপারিশও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়নি।[১৮৭]

এমতাবস্থায় ১৮৮৩ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিয়ে খোলা বাজার থেকে এক লক্ষ টাকা ধার করে কলের জল বিস্তারের পরিকল্পনা করে। সরকার এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। কিন্তু এত অল্প সুদের কারণে ঋণদাতাদের নিকট থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।[১৮৮] ১৮৮৪ খ্রীঃ ডিউক অব কনটের কলকাতায় আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকাবাসীর হিতার্থে ১১ হাজার টাকা দান করেন।[১৮৯] নওয়াবের দেয়া ঐ অর্থে শহরের উত্তর অংশে নওয়াবপুর, ঠাঁঠারী বাজার হয়ে নওয়াবের দিলখুশা বাগান পর্যন্ত ৩৯৬০ ফুট পানির পাইপ বিস্তার করা হয়। পানীয় জলের কলের ঐ বিস্তারকে 'কনট এক্সটেনশন' নামে অভিহিত করা হয়।[১৯০] কনট এক্সটেনশনসহ উক্ত জলের কলের জন্য বিভিন্ন সময়ে নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহর দানকৃত অর্থের মোট পরিমাণ দাড়ায় আড়াই লক্ষ টাকা।[১৯১]

লালবাগের চাঁদনী ঘাটে জলের কল ও পানি ফিল্টারের রিজার্ভার এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রথমদিকে তেমন কোন বেড়া কিংবা দেয়ালের ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮০ খ্রীঃ একদিন উক্ত কলের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ঘোড়াসহিস অর্ধমাতাল অবস্থায় সেখানে বেড়াতে গিয়ে জলের পুকুরে পড়ে মারা যান। ফলে ১৮৮৪ খ্রীঃ দরপত্র আহবান করে উক্ত এলাকার চারদিক দিয়ে পাকা দেয়াল নির্মাণ করা হয়।[১৯২] ১৮৮৯ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটি ব্যাপকভাবে জলের কল বিস্তারের পরিকল্পনা করে সরকারের কাছে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। সরকার শতকরা সাড়ে চার টাকা হার সুদে ত্রিশ বছর মেয়াদে ১,২৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করেন।[১৯৩] এই পরিকল্পনায় পূর্বে যেসব মহল্লায় জলের চুংগি ছিল না সেসব স্থানে পাইপ বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, যারা নিজ নিজ বাড়ীতে কলের জল নিতে চান, তাঁদেরকে প্রতি ঝরণা কলের জন্য মাসিক চার টাকা এবং সংযোগ পাইপের খরচে দিতে চেয়ে দরখাস্ত করতে হবে।[১৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সময় জলের কলের ইঞ্জিন ও বয়লার দ্বিগুন করা হয়। এছাড়া একটি গোলাকার থিতানো ট্যাঙ্ক, একটি ফিল্টার বেড, একটি রিজার্ভার ও একটি বয়লার রুম নির্মাণ করা হয়।[১৯৫] ১৮৯১ খ্রীঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বংগের ছোট লাট স্যার চালর্স আলফ্রেড ইলিয়ট উক্ত সম্প্রসারিত জলের কল উদ্বোধন করেন।[১৯৬] ১৮৯৩ খ্রীঃ মোট ১৬ মাইল ব্যাপী পাইপ লাইন দ্বারা প্রতিদিন ৩,৬০,০০০ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হতো।[১৯৭] পানি বিতরণের জন্য ঐ সময় ১২৯টি হাইড্রান্ড ছিল। এ ছাড়া ২৪ ঘন্টা পানি সরবরাহের জন্য জেলখানা, হাসপাতাল, পাগলাগারদ ও রেলওয়ের কোয়ার্টারে বিশেষ সংযোগ দেয়া ছিল। ঐ সময় রাস্তায় পানি দেয়ার গাড়ীতে পানি ভর্তি করার জন্য ১৫টি স্থানে স্ট্যান্ড পাইপের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৯০ এর দশকে জলের কল ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গড়ে বার্ষিক ব্যয় হতো ১৮,০০০ টাকা।[১৯৮] ১৮৯৩ খ্রীঃ জলের কলের পানি চোষণ পাইপের সামনে বুড়ীগংগা নদীতে এক চর পড়ে কলে পানি সরবরাহে অসুবিধা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় চরে সরু খাল কেটে নদীর মূল ধারার সাথে সংযোগ করে পাম্প মেশিনে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির চিন্তা ভাবন করা হলেও তা কার্যে পরিণত করা হয়নি।[১৯৯]

১৯৯০ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাঙ্কিন সাহেবের অনুরোধে মিউনিসিপ্যালিটি পুনরায় গ্রাহকদের নিজস্ব খরচের বিনিময়ে শহরের ঘরে ঘরে পানীয় জলের কলের সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সময় একত্রে অনেকে কলের সংযোগ নেয়ার জন্য আবেদন জানালে মাসিক মাত্র ১/২ টাকা খরচ পড়তো।[২০০] মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ র‍্যাঙ্কিনের আমলে ১৯০৩ খ্রীঃ সেনেটারী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সিল্ক-এর পরামর্শমত নদীর চরের মধ্যে ২৬ ফুট ব্যাসের বড় বড় ৪টি কূপ খনণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ঐ কুপের পানি ফিল্টার না করেই চোষণ পাইপ দ্বারা শহরে সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়। এ কূপ খননের জন্য ৮০, ৬৭৫/- টাকা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৬,০০০/- টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। ঋণ করে এই কাজ করার পর ঐ টাকা শোধ দেয়ার জন্য কলের জলের উপর প্রয়োজনীয় কর ধার্য করতে চেয়ারম্যান র‍্যাঙ্কিন সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে দাতা নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক বিনা পয়সায় পানি সরবরাহের যে অবধারিত শর্ত দেয়া ছিল, তা লজ্ঘন হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ চেয়ারম্যানের প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। এমতাবস্থায় নগরবাসী বিনা ট্যাক্সে যে পরিমাণ পানি পাচ্ছিল, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়।[২০১] তাছাড়া চরে খননকৃত কূপের পানি শুষ্ক মৌসুমে শহরের পানির চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হতে পারে ভেবে পরিকল্পনাটি বাদ দেয়া হয়।[২০২]

নদী থেকে সংগৃহীত কলের পানি দুষণমুক্ত করার জন্য প্রথম থেকেই তাতে জীবানু নাশক তরল ক্লোরাইন ও সালফেট মিশানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিমাসে কলের পানির নমুনা সংগ্রহ করে মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাবরেটরীতে এনে তাতে ক্লোরাইন মিশানো হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা হতো। এছাড়া মাঝে মধ্যে জনস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরীতে নিয়ে তাতে জীবানু আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হতো।[২০৩]

১৯০৫ খ্রীঃ বংগ বিভাগের কারণে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়াতে শহরের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ফলে তৎকালে দৈনিক সরবরাহকৃত মাত্র ৩,৪০,০০০ গ্যালন পানি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল হয়ে পড়ে।[২০৪] অন্যদিকে বুড়ীগঙ্গা নদীর দুর্দশা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জলের কলের যন্ত্রপাতির ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থ সংস্থান করার বিষয়ে করারোপের যৌক্তিকতা দেখিয়ে ১৯০৮ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজান এক রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে তিনি বলেন যে, যদিও দাতা নওয়াব আব্দুল গণির শর্ত ছিল যেন কোনরূপ করারোপ করা না হয়। কিন্তু শহরের সম্প্রসারণের ফলে কলের জলের বিস্তৃতির যে ব্যবস্থা এখন নেয়া প্রয়োজন, তাতে অর্থ দান করার মত বর্তমানে আর কেউ বেঁচে নেই। বহুদিন থেকেই সরকার কর ধার্যের প্রস্তাব করলেও কমিশনারদের আপত্তির কারণে তা করা হয়নি। কিন্তু এখন কলের জলের উপর করারোপ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি যে সব বাড়ীতে জলের কল নেয়া আছে বা নেয়া হবে, তাদেরকে ৪ টাকার স্থলে ৫ টাকা এবং সাধারণ লোক যারা ২ টাকার উপরে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য ২ টাকা কর ধার্য্যের প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[২০৫] তবে শহরে দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তি যাদের বাড়ীর বার্ষিক জমার পরিমাণ ৩০ টাকারও কম তারা এই ট্যাক্স থেকে মুক্ত থাকবে।[২০৬] চেয়ারম্যান তাঁর রিপোর্টে আরো বলেন, এরূপ কর ধার্য্য করলে মিউনিসিপ্যালিটির এ বাবদ ৩২ হাজার টাকা আয় হবে। এর ফলে সরকারের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে কাজ শেষে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ছাড়াও ধীরে ধীরে ঋণ শোধ করা যাবে।[২০৭] বলা বাহুল্য চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফের উক্ত প্রস্তাবমত ঢাকায় প্রথম কলের জলের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। এই সময় শহরের লোকদের চাহিদা অনুযায়ী কলের জল ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার এক আদেশ দেন। এ প্রেক্ষিতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকডোনাল্ড সাহেব, জেমস সিম্পসন এন্ড কোম্পানীর সাথে পরামর্শ করে ৩,৭৫,০০০ টাকার একটি ব্যয়ানুমান তৈরী করেন। বুড়ীগংগার চরে কূপ খননের বদলে তিনি চরের অপর পার্শ্বে কল বসিয়ে পানি চোষনের প্রস্তাব দেন। মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাবটি অনুমোদন করে সেনেটারী ইনসপেকটর মিঃ হাউসডেনকে তা পর্যালোচনা করতে দেন। সংশ্লিষ্ট সংস্কারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা লাগবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।[২০৮] মিউনিসিপ্যালিটি এই কাজে সরকারের নিকট থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ এবং আরো কিছু অর্থ অনুদান হিসেবে চান। এ সময় নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলমান নেতাগণ এদেশের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যাহোক পূর্ব বংগের ছোট লাট হেয়ার সাহেব ৩ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করেন।[২০৯] বাকী দুই লক্ষ টাকা ২০ বছরে পরিশোধের শর্তে সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে ধার দেয়।[২১০] উক্ত সংস্কার ও সম্প্রসারণকালে জলের কলের জন্য যে ইঞ্জিন আনা হয়, তাতে প্রতি ঘন্টায় এক লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা যেত। পূর্বের ফিল্টারের পরিবর্তে ৫টি নতুন জুয়েল ফিল্টার নির্মিত হয়, যার প্রতিটিতে মিনিটে ১৮ হাজার গ্যালন জল পরিস্কার করা যেত। এছাড়া ৫ শত ফুট লম্বা একটি জেটি স্থাপন করে চরের অপর পার্শ্ব থেকে পানি আনার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বের ১৬ মাইলের সাথে আরো ১৮ মাইল ব্যাপী জলের কলের পাইপ বিস্তৃত করা হয় এবং ১০৪ টি কলের চুংগী (স্ট্রীট হাইড্রান্ট)-এর স্থলে ১৪৬টি কল বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বের সরবরাহকৃত ৩,৪০,০০০ গ্যালনের স্থলে এখন আট ঘন্টা সময়ে ৮ লক্ষ গ্যালন পানি সরবাহের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন ইঞ্জিন ও নতুন ফিল্টার প্রভৃতির জন্য নতুন ঘর তৈরী করা হয়।[২১১] এই বর্ধনকাজের সময় পিলখানা পর্যন্ত জলের কলের সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছিল।[২১২]

জলের কলের উপরোক্ত উন্নয়ন কাজটি দীর্ঘ ২ বছর চলার পর ১৯১০ খ্রীঃ সমাপ্ত হয়।মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজান এই কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[২১৩] পরিবর্ধিত জলের কল উদ্বোধন উপলক্ষে ৫ এপ্রিল ১৯১০ খ্রীঃ মংগলবার বিকেলে চাঁদনীঘাটে জলের কল প্রাংগনে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। ছোট লাট হেয়ার সাহেব উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কাজের জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এবং এর চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফজানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতা শেষে তিনি বিকেল সোয়া ৪টায় ফিল্টার কক্ষে গিয়ে উক্ত চেয়ারম্যানের দেয়া চাবি দ্বারা জলের কল চালিয়ে দেন।[২১৪]

ঢাকায় স্থাপিত উক্ত জলের কলের কমপ্লেক্সটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ঢাকা সফরে আগত উচ্চস্তরের সব ব্রিটিশ রাজপুরুষদের পরিদর্শন সূচীতে অবশ্যই এটা অন্তর্ভূক্ত থাকতো। বংগের ছোট লাটগণ ঢাকা এসে প্রায় প্রতিবারই জলের কল পরিদর্শন করতেন। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফর কালে ৩১ জানুয়ারী বুধবার সকালে জলের কল পরিদর্শন করেন।[২১৫] নওয়াব আব্দুল গণির দানে পানীয় জলের কল সংস্থাপন কাজটি ঢাকা শহরের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত। এ ব্যবস্থাটি তৎকালীন ঢাকা শহরের অবনতির দিকে ধাবমান গতিধারাকে উন্নয়নের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করে। এতদাঞ্চলের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তাই এ ব্যবস্থাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

 Dhaka University Institutional Repository

২(৪) ঢাকায় বিজলী বাতির ব্যবস্থাকরণ ঃ

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের আগে ঢাকা শহরের রাস্তায় আলোকায়নের কোন ব্যবস্থা ছিলনা।[২১৬] মোগল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলের ঢাকার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, 'বুড়িগংগার তীর থেকে টংগীর পুল পর্যন্ত লোকেরা তখন রাত্রিবেলা বাড়ীঘর ও দোকানের আলোতে রাস্তায় নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারতো।'[২১৭] কিন্তু সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপক ভিত্তিতে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট আলোকায়নের তেমন কোন নজীর তখন দেখা যায়নি।

১৮৭৭ খ্রীঃ রানী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধিবরণ ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য বেসরকারী উদ্যোগে ঢাকায় একটি পার্ক তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে একটি কমিটিও গঠন করা হয়।[২১৮] কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্ক তৈরীর পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে যায়। এজন্য সংগৃহীত টাকার কিছু অংশ মিটফোর্ড হাসপাতালকে দেয়া হয়। বাঁকী ৬,৫০০/- টাকা শহরের রাস্তায় আলোকায়নের জন্য কেরোসিন ল্যাম্প পোস্টের ব্যবস্থা করতে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করা হয়। ঐ টাকায় মিউনিসিপ্যালিটি ঢাকা শহরের রাস্তায় ১০০টি ল্যাম্পপোস্ট তৈরী করে। পরবর্তীকালে ল্যাম্প পোস্টের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৮৯৩ খ্রীঃ এর সংখ্যা ৩০০টিতে পৌঁছে। ল্যাম্প পোস্টগুলোর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ছিল প্রায় ৬০০০ টাকা।[২১৯]

১৮৭৭ খ্রীঃ উক্ত কেরোসিন বাতি স্থাপনের আগে সারা ঢাকা নগরী রাত্রে ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলেও নওয়াব বাড়িতে আলোর কোন অভাব ছিলনা। ঢাকা শহরের রাস্তায় কেরোসিন বাতি স্থাপনের এক যুগেরও বেশি আগে নওয়াব আব্দুল গণি নিজোদ্যোগে একটি কোলগ্যাসের কারখানা স্থাপন করেন। উক্ত কারখানা দ্বারা তিনি তাঁর নিজ বাড়ি আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে গ্যাসের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[২২০] এছাড়া ঈদ-মহররম, মিলাদুন্নবী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহাম প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব কিংবা উচ্চ পদস্থ সরকারী আমলা বা রাজপুরুষদের পরিদর্শন উপলক্ষে, আহসান মঞ্জিল গ্যাসালোকের সাথে অজস্র মোমবাতির আলোক মালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।[২২১] ১৮৮৮ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড ডাফরিনের আগমন উপলক্ষ্যে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবন ও এর প্রাংগনস্থ বাগান অগনিত মোমবাতির আলোতে উদ্ভাসিত করা হয়। সেদিন লেডী ডাফরিন একে ধরাপৃষ্টে গার্ডেন-অব-লাইট বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২২২]

১৮৮৬ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণিকে কে.সি.এস.আই. উপাধি প্রদান করা হলে, খুশীতে তাঁর পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা শহরের রাস্তায় গ্যাসের বাতি দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[২২৩] কলকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমার পিতার কে.সি.এস.আই. উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে ঢাকা শহরের লোকেরা যেভাবে উৎসব ও সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন, তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছে। এই খুশীর দিনে আমি ঢাকার প্রধান রাস্তাগুলোতে থাকা কেরোসিন বাতির স্থলে নিজ খরচে গ্যাসালোক দেয়ার প্রস্তাব করছি। তবে বর্তমানে রাস্তা আলোকায়নের জন্য যে খরচ হচ্ছে, তা দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটিকে পয়ঃ প্রণালীর উন্নয়ন এবং গ্যাসালোকের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে হবে।"[২২৪]

এতদুপোলক্ষে ঢাকাবাসীর খুশী করার ব্যাপারে নওয়াব আহসানুল্লাহর অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দানের আরেকটি খবর ১৮৮৯ সালে বেংগল টাইমস পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল।[২২৫]

১৮৮৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের ঢাকায় আগমণের সম্ভাব্য কারণগুলোর কথা বলতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল যে, বড়লাট হয়তো লর্ড নর্থব্রুকের মত এবার ঢাকার রাস্তার জন্য নওয়াবের অংগীকারকৃত গ্যাসালোকের ভিত্তি স্থাপন করবেন। কিন্তু বড়লাটের ভ্রমণ শেষে এরূপ কোন কাজ না হওয়ায় ঐ পত্রিকা হতাশা প্রকাশ করেছিল।[২২৬]

১৮৯১ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর আইন বিষয়ক সেক্রেটারী মিঃ জি.এল.গার্থ সাহেব-কে দিয়ে ঢাকার রাস্তায় গ্যাসবাতি দেয়ার জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি শহরের যেসব রাস্তায়

Dhaka University Institutional Repository

কেরোসিন বাতি আছে, ঐ সব রাস্তায় গ্যাসালোক দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করেন।[২২৭] সহায় সম্পত্তি নিয়ে নওয়াব পরিবারের নিজেদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা ও আত্মকলহের কারণে নওয়াব আহসানুল্লাহর পক্ষে ঢাকায় গ্যাসালোকের ব্যবস্থা করতে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে কেরোসিন বাতির বদলে রাস্তায় গ্যাসালোক দেয়া নিয়ে ঐ সময় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের মধ্যেও বেশ মতানৈক্য দেখা দেয়। মিউনিসিপ্যালিটির কোন কোন কমিশনার এ বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করেন। ফলে এক সময় নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রস্তাবিত দানের টাকায় বুড়ীগংগার তীরস্থ বাকল্যান্ড বাঁধকে মিটফোর্ড হাসপাতাল পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়। উক্ত বর্ধিত অংশকে 'নওয়াব বাঁধ' বলে পরিচিত করার চিন্তাও করা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ প্রস্তাবে অনুকূল সাড়া দিতেও চেয়েছিলেন। ইতোমধ্যে গ্যাসালোক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে শিয়ালদাহের এক গ্যাস কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু এতে কোন ফলপ্রসূ কাজ হয়নি।[২২৮] এদিকে রাস্তায় কেরোসিন বাতির বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে গিয়ে ১৮৮৯-৯০ সালে ৩৫টি ল্যাম্পপোষ্ট বৃদ্ধি করা হয় এবং আরো ১০০টি বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সময় কানপুর থেকে অত্যন্ত বেশী উজ্জ্বল জ্যোতি বিশিষ্ট ৬টি ল্যাম্প আনা হয়। এগুলোতে তেলও কম ব্যয় হতো।[২২৯]

১৮৯৬ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যুর পর নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পিতার স্মরণে জনগণের উপকারার্থে বার্ষিক ৫ হাজার টাকা আয়ের উপযুক্ত জমিদারি কিনে দেয়ার ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুত গ্যাসালোক দেয়ার ওয়াদাও অচিরেই পূরণ করবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তবে ঐ সময় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানসহ অধিকাংশ কমিশনারদের প্রতি নওয়াবের আস্থা ছিল না। এজন্য তাঁদের উপর তিনি গ্যাসালোকের কার্যভার দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[২৩০] অন্যদিকে নওয়াব আব্দুল গণির কে.সি.এস.আই. উপাধি পাওয়া উপলক্ষে ঢাকায় গ্যাসালোক দিতে চাওয়ার পর এক যুগ পেরিয়ে গেলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই ১৮৯৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ-কে যখন কে.সি.আই.ই. খেতাব প্রদান করা হয়, তখন ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করে যে, "এবার নিশ্চয়ই নওয়াব সাহেব তাঁর উক্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন।" এছাড়াও ঐ সময় নওয়াবের ভগ্নিপতি খাজা মোঃ ইউসুফজান চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকায় মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি নওয়াবের সন্দেহ দূর হয়েছে বলেও উক্ত পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়।[২৩১] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্যাসালোকের মাধ্যমে ঢাকার রাস্তাঘাট আলোকায়নের কাজটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। ১৯০০ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ কোলগ্যাসের বদলে ঢাকায় তড়িতালোক প্রদানের কথা ঘোষণা করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটিকে যথাশীঘ্র এই কাজটি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান।[২৩২]

নওয়াবের এই বিদ্যুতালোক প্রদানের পিছনে তাঁর পারিবারিক কয়েকটি ঘটনার যোগসূত্র ছিল। তাহলো- নওয়াব আহসানুল্লাহর একের পর এক তিনটি স্ত্রী মারা যান। তিনি চতুর্থপক্ষে তাঁর এক জ্ঞাতি বিধবা খোদেজা বেগম-কে বিবাহ করেন।[২৩৩] এর ক'দিন পর নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহর সাথে উক্ত খোদেজা বেগমের পূর্ব-স্বামীর (খাজা ভোলা মিয়া) ঔরসজাত কন্যা আজগরী খানমকে বিবাহ দেন। এছাড়া খোদেজা বেগমের ২০/২১ বছর বয়স্ক এক পুত্র কে.এম.বদরুদ্দিনের সাথে নওয়াব সাহেব নিজের এক কন্যা নওয়াবজাদী পরীবানুর বিয়ে দেন।[২৩৪] নওয়াব আহসানুল্লাহর ন্যায় ধনবান ব্যক্তির পুত্র-কন্যার বিবাহে যেরূপ ধূমধাম হওয়ার কথা ঐসব বিবাহে তার কিছুই হয়নি। কারণ পিতার সাথে মনোমালিন্যের কারণে নওয়াবের জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা সলিমুল্লাহ গৃহত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করায় নওয়াবের মনে সুখ ছিল না। তাই তিনি তাঁর উক্ত চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণকালে লৌকিক আমোদ প্রমোদ না করে তাঁর নিজ এস্টেটের অফিসার-কর্মচারীদের একমাসের বেতন বখশিস দিয়েছিলেন। এই বখশিসের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১ হাজার টাকা।[২৩৫] অনুরূপভাবে নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর বিয়ের আমোদ প্রমোদ উপলক্ষ্যে কোন খরচাদি না করে নওয়াব আহসানুল্লাহ এই বিয়ের স্মরণে ঢাকা শহরে বিদ্যুতালোক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এজন্য প্রথমে চারলক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।[২৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৯০১ খ্রীঃ কুমারটুলীস্থ তাঁর পুরানো গ্যাস কারখানা ও তৎসংযুক্ত ভবনাদির জন্য ৪,০০০/- টাকা মূল্যধার্য করেন। ঐ গ্যাস কারখানাসহ মোট ৪,৪৬,০০০/- টাকার একটি ট্রাস্ট তৈরী করে তিনি ঢাকা শহরে বিদ্যুতালোক প্রদানের ব্যবস্থা করেন। পরে ঐ গ্যাস কারখানার স্থানেই বিদ্যুতালোকের মেশিন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।[২৩৭] আদিতে উক্ত 'ঢাকা ইলেকট্রিক লাইট ট্রাস্টিস' পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সদস্যরা ছিলেন- ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, কালেকটর, নওয়াবের মনোনীত তাঁর এস্টেটের একজন স্থানীয় কর্মকর্তা এবং দুইজন বেসরকারী ব্যক্তি। নওয়াব সাহেব ট্রাস্টের সদস্য না হলেও তিনি সভায় যোগদান এবং হিসাবাদি দেখতে পারতেন।[২৩৮] তবে ট্রাস্টিস-এর কাজ মূলত মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ন্ত্রণেই হতো। উক্ত ট্রাস্টের শর্তানুযায়ী কেরোসিন বাতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটির বছরে যা খরচ হতো তাও এই তড়িতালোক সংস্থাপন ফান্ডের সাথে যোগ করা হয়।[২৩৯] এরপর থেকে ঢাকায় তড়িতালোক সংস্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতির ক্রয় এবং অন্যান্য আনুসাংগিক কাজ খুব দ্রুতগতিতে করা হয়েছিল। এই কাজে নওয়াবের সর্বমোট সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।[২৪০] উক্ত টাকা দানের সময় নওয়াব সাহেব জলের কলের ন্যায় বিদ্যুতালোকও ঢাকার জনগণ বিনামূল্যে ভোগ করবেন এমন কোন শর্তারোপ করেননি। তথাপি নওয়াবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিদ্যুতায়নের জন্য নগরবাসীদের নিকট থেকে কোন প্রকার ট্যাক্স নেয়া হতো না।[২৪১] এ উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারী ১৯০০ খ্রীঃ বৃহস্পতিবার ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চেয়ারম্যান মিঃ র‍্যাঙ্কিন সংস্থাপন কাজের পরবর্তী কালে বিদ্যুতালোকের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটির ফান্ড থেকে মেটানোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[২৪২] অনেক বাদানুবাদের পর তাঁর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এছাড়া নওয়াবের দানে যে দুটি প্রধান রাস্তায় বিজলী বাতি দেয়া হয়, সেখানে পূর্বে থাকা কেরোসিন বাতিগুলো আলোকবিহীন রাস্তায় নিয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ঐসব স্থানের লোকেরাও নওয়াবের দানের উপকারিতা বুঝতে পারেন।[২৪৩]

প্রথম পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত রাস্তা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়। যথা- রহমতগঞ্জ রোড, চক বাজার রোড, মোগলটুলী রোড, নলগোলা রোড, বাবু বাজার রোড, কমিটিগঞ্জ রোড, আর্মেনীয় স্ট্রীট, ইসলামপুর রোড, আহসান মঞ্জিল রোড, পটুয়াটুলী রোড, ওয়াইজঘাট রোড, পটুয়াটুলী লোয়ার রোড, পটুয়াটুলী ঘাট রোড, বাংলা বাজার রোড, ডাল বাজার রোড, ফরাশগঞ্জ রোড লোহারপুল পর্যন্ত, ডিগবাজার রোড, ভিক্টোরিয়া পার্ক, লক্ষ্মীবাজার রোড, সদরঘাট রোড, শাঁখারী বাজার রোড, জনসন রোড, নওয়াবপুর রোড, রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টার রোড, জামদানী নগর রোড এবং রাজার দেউরী লেন থেকে সাহেব বাজার পর্যন্ত সংলগ্ন গলিসমূহ।[২৪৪]

ঢাকায় বিদ্যুতালোক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অকটাভিয়াস স্টীল কোম্পানী নামক এক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে কাজের দায়িত্ব দেয়।[২৪৫] এই কাজে নিয়োজিত জনৈক পশ্চিম দেশীয় কর্মচারী ১৯০১ সালে নভেম্বর মাসে হঠাৎ উচ্চ থাম থেকে পড়ে মারা যান।[২৪৬] অবশেষে ১৯০১ খ্রীঃ শেষ নাগাদ ঢাকায় বিজলী বাতি সংস্থাপনের কাজ শেষ হয়।

অসুস্থতার কারণে কলকাতা থেকে বংগের ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ঢাকায় বিদ্যুতালোক ব্যবস্থা উদ্বোধন করার জন্য আসতে পারেননি। তাঁর প্রতিনিধিরূপে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী এইচ.সি. বোল্টন সাহেব এসে ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ সালে আহসান মঞ্জিলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজলী বাতির উদ্বোধন করেন।[২৪৭] পরদিন ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি চমৎকার বর্ণনা ছেপেছিল। তা থেকে জানা যায়, ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর শনিবার বিকেল পাঁচটায় নওয়াবের আমন্ত্রণে শহরের গণ্যমান্য সবাই আহসান মঞ্জিলে সমবেত হয়েছিল। প্রাসাদের দোতালার দক্ষিণ বারান্দায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বোল্টন সাহেব মাঝখানে, নওয়াব বাহাদুর তাঁর ডানদিকে এবং কমিশনার সাহেব বামদিকে বসেছিলেন। প্রথমে কমিশনার সাহেব বিদ্যুতালোকের সংস্থাপন বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠ করেন। বোল্টন সাহেব তাঁর ভাষণে নওয়াব বাহাদুরের দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতা শেষে সন্ধ্যালগ্নে তিনি একটি সুইচ টিপে বিজলী বাতির উদ্বোধন করেন।[২৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি কাল্পনিক চিত্র তৈরী করে তা এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে। পরিশিষ্টে চিত্র নং ১১ তে চিত্রটি দেয়া হলো। এভাবে কলকাতার বাইরে কেবলমাত্র শৈলশহর দার্জিলিং এর পরে ঢাকাই ছিল বঙ্গের দ্বিতীয় নগরী যে আধুনিক সভ্যতার আকর এই বিদ্যুতালোক পেয়ে ধন্য হয়েছিল।[২৪৯]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে ঢাকা শহরের রাস্তায় স্থাপনকৃত বিজলী বাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ফান্ড থেকে খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়। তাই শহরবাসীকে এজন্য কোন প্রত্যক্ষ কর দিতে হতো না। নওয়াবের দানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আহসান মঞ্জিলেও বিনামূল্যে বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হয়।[২৫০] বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের ঐতিহাসিক কেদারনাথ ও যতীন্দ্রমোহন তাঁদের গ্রন্থে লিখেছেন, ঢাকা শহরে বিদ্যুতালোক প্রদানের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রথমে দুই লক্ষ টাকা দান করেন এবং পরে এর ব্যয় নির্বাহে আরো দুই লক্ষ টাকা দেন। পূর্ব বংগের আর কোন স্থানে বিদ্যুতালোক নেই। অনেক ধনীগৃহে এই বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে এবং সেই সাথে বৈদ্যুতিক পাখারও সংযোগ হয়েছে। এই বিদ্যুতালোক উপভোগের জন্য শহরবাসীকে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না।[২৫১]

আধুনিক সভ্যতার আকর-উৎস হিসেবে পরিচিত বিদ্যুৎ না হলে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা শহরে ঐ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে এক যুগান্তকারী কাজ সম্পন্ন করেন। এটা ছিল ঢাকার উন্নতির সোপান স্বরূপ। এর ফলে ঢাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কলকারখানার উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক ঢাকার সৃষ্টিতে নওয়াব আব্দুল গণির জলের কল স্থাপনের পর নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক বিদ্যুতালোক প্রবর্তন ছিল ঢাকাকে আধুনিকরূপ দানের দ্বিতীয় কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিঃ বোর্ডের তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান খাজা মোহাঃ ইউসুফজান, মিটফোর্ড হাসপাতালে তড়িতালোকের সংযোগ দেয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ১৯০২ সালের শেষ দিকে উক্ত সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়।[২৫২] তড়িতালোকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা যদিও মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বে ছিল, তথাপি এর সুবিধা ও অসুবিধার জন্য স্থানীয় লোকেরা নওয়াব বাহাদুরেরই নাম করতো। ১৯০২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সারা রাতের বদলে মাঝে মধ্যে রাত ১টা কিংবা ২টার পর বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়া হতো। এমতাবস্থায় জনগণের পক্ষ থেকে ঢাকা প্রকাশে মন্তব্য করা হয়,"যাতে সারা রাত শহর দীপ্ত থাকে আশা রাখি মাননায় নওয়াব বাহাদুর তার ব্যবস্থা করে সর্ব সাধারণের কৃতজ্ঞভাজন হবেন।"[২৫৩]

১৯০২ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ঢাকার নববিধান সম্প্রদায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ নিজ ব্যয়ে নববিধান সমাজগৃহে তড়িতালোক প্রদানের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন।[২৫৪] বদান্যবর নওয়াব সলিমুল্লাহ আহসান মঞ্জিল সংলগ্ন কুমারটুলীতে স্থাপিত তাঁর পুরানো গ্যাসপ্লান্টটি হোসেনী দালানের জন্য প্রদান করেন। ২ মার্চ ১৯০২ খ্রীঃ রবিবার সন্ধ্যায় হোসেনী দালানে উক্ত গ্যাসালোক চালু করা হয়। ঐ সময় চার'শ মোমবাতি পাওয়ারের ৪টি এবং দুই'শ মোমবাতি পাওয়ারের ১১টি গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে হোসেনী দালান ও সংলগ্ন পুরো এলাকা আলোকিত করা হয়। এ উপলক্ষে হোসেনী দালানে সেদিন এক মেলা বসেছিল, যেখানে দেশীয় লোকজন ছাড়াও বহু ইউরোপীয় নর-নারীর সমাগম ঘটেছিল।[২৫৫]

১ সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রীঃ নওয়াবপুর এলাকায় বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে ঢাকায় প্রথম বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দশ বছরের এক বালকসহ তিনজন আহত হয়।[২৫৬] ১৯০৭ খ্রীঃ জুন মাসে আরমানিটোলায়ও অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।[২৫৭] ঘুড়ি উড়াতে ব্যবহৃত কাঁচের মাঞ্জা সূতা দ্বারা অনেক সময় বৈদ্যুতিক তারের ক্ষতি হতো। এজন্য ১৯০৪ খ্রীঃ ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাঙ্কিন সাহেব তারের ১০০ গজের মধ্যে কেউ ঘুড়ি উড়াতে পারবেনা বলে এক নির্দেশ জারী করেন।[২৫৮] ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিজলী বাতির তত্ত্বাবধানের কাজ দেশীয় একটি কোম্পানীর হাতে ছিল। শহর বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ আলো বিস্তারের কাজ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যে কোম্পানী ঢাকায় ঐ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাদি সংস্থাপনের কাজ করেছিল কলকাতার সেই অকটেভিয়াস স্টীল কোম্পানীর হাতে- এর দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৫৯] উল্লেখ্য, নওয়াবের শাহবাগ বাগান বাড়ীতে

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোন সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে সেখানে আগে থেকেই পৃথক জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল।[২৬০] ১৯৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ আলোকের জন্য কোন ট্যাক্স নেয়া হতো না, যদিও এই খাতে বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয় হতো।[২৬১] ১৯৪৮-৪৯ অর্থ সনেই প্রথম বিদ্যুতালোকের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে নাগরিকদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। তখন বিজলী বাতির জন্য হোল্ডিং প্রতি বার্ষিক শতকরা তিন টাকা এবং কেরোসিন বাতির জন্য শতকরা এক টাকা কর ধার্য করা হয়।[২৬২] ১৯১৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা শহরের রমনা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।[২৬৩] কিন্তু তখনও শহরের এক ব্যাপক এলাকা বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বিশের দশকের শেষ অবধিও পুরানো পল্টন এলাকার রাস্তায় কোন তড়িতালোক ছিল না এবং লোকদের অন্ধকার ঘরে টিম টিম করে হারিকেন জ্বলতো।[২৬৪]

১৯০১ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর অর্থ সাহায্যে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু এরপর বহুদিন চলে গেলেও ঢাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি ও বিস্তৃতিকল্পে আশানুরূপ ভাবে কেউ এগিয়ে আসেনি। তাই সারা বৃটিশ আমল এমনকি পাকিস্তান আমলেও শহরের এক ব্যাপক এলাকায় কেরোসিন ল্যাম্পের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। ১৯৪৬-৪৭ সনে ঢাকা শহরে ১৩৭০টি বিজলী বাতি এবং ১০৭০টি কেরোসিন ল্যাম্প ছিল। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান 'ওয়াপদা' ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেও মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বে ৭৪১টি কেরোসিন বাতি চালু ছিল।[২৬৫]

২(৫) স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ঃ

নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ ছিলেন একজন প্রকৃত জনদরদী ও সমাজসেবক। দুর্দান্ত প্রতাপশালী নওয়াব সলিমুল্লাহকে বাহিরের দিক থেকে কঠোর মনোবৃত্তি সম্পন্ন মনে হলেও তাঁর অন্তর ছিল কুসুমের মতো কোমল। দুঃখীর দুঃখে, আর্তের হাহাকারে, অনাথের করুণ ক্রন্দনে তাঁর চিত্ত বিগলিত হয়ে যেত। তাইতো তিনি পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয় এতিম ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দান করে উৎপাদনশীল কর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে তৈরী করেছিলেন একটি এতিমখানা।[২৬৬]

একটি করুণ পারিবারিক দুর্ঘটনা ঢাকার নওয়াবকে এই এতিমখানা নির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাহলো-১৯০৯ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর এক শিশু কন্যা অকালে মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনায় নওয়াব ও তাঁর সহধর্মীনী বেগম আসমাতুন্নেছা খুবই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। সন্তান হারা জনক-জননীর স্নেহ বভুক্ষু অন্তর সেদিন পিতৃমাতৃহীণ এতিম শিশুদের আশ্রয়দানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন।[২৬৭]

আহসান মঞ্জিলের নিকট কুমারটুলীতে একটি ভাড়া করা বাড়িতে প্রথমে এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠা করে এর নাম দেয়া হয় 'ইসলামিয়া এতিমখানা'। প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সর্ব সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য ১৯১২ সালে একে একটি কমিটির পরিচালনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। নওয়াব সাহেব তখন এতে মাসিক ২ শত টাকা আর্থিক সাহায্য দিতেন।[২৬৮] এছাড়াও নওয়াব সলিমুল্লাহর দেয়া খরচে উক্ত এতিমখানার ছেলেমেয়েদের তখন লেখাপড়াও করানো হতো। ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষারত এরূপ ১০/১২ জন ছাত্রের বেতনাদি পরিশোধের জন্য উক্ত মাদ্রাসার সুপারের দেয়া কয়েকটি বিলের কপি আজো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[২৬৯] ক্রমে এতিম বালকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কুমারটুলীর বাড়িতে স্থান সংকুলানের অসুবিধা দেখা দেয়। এ কারণে ১৯১২ সালে এতিমখানাটি লালবাগ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। লালবাগ চৌরাস্তার সামান্য পূর্বে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে এতিমখানাটি তথায় নিয়ে যাওয়া হয়।[২৭০] ১৯১৩ খ্রীঃ লর্ড কারমাইকেল এতিমখানাটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে এক হাজার টাকা দান করেন।[২৭১] এরপর স্থায়ীভাবে এতিমখানাগৃহ নির্মাণের জন্য আজিমপুরে (আমলাপাড়া) গোরেশহীদ মসজিদ সংলগ্ন একখন্ড খাসমহল জমি পত্তন নেয়া হয়। সেখানে দুই

Dhaka University Institutional Repository

বছরে এতিমখানা নির্মাণের আনুসাংগিক কাজ শেষ হয়। নওয়াব বাহাদুর এই নির্মাণ কাজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন।[২৭২]

নওয়াব এস্টেটের ওয়াকফ সম্পত্তি ও নওয়াবের নিজস্ব দানে এই এতিমখানাটির ব্যয় নির্বাহ হতো। একটি কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো। ১৯১৪ খ্রীঃ ১৯ এপ্রিল নওয়াব খাজা মোহাঃ ইউসুফজানের সভাপতিত্বে উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আগের বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ পেশ করা হয় এবং পরবর্তী বছরের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠণ করা হয়। উক্ত কমিটিতে মাননীয় মিঃ বেটসন বেল-সভাপতি, নওয়াব খাজা মোহাঃ ইউসুফজান সহ-সভাপতি, রায় সুরেশচন্দ্র সম্পাদক এবং বাবু ভবানী প্রসাদ নিয়োগী হিসেব পরীক্ষক ছিলেন।[২৭৩]

নওয়াব সলিমুল্লাহর দানে পরিচালিত মুসলিম এতিমখানাটি তাঁর মৃত্যুর পর আর্থিক সমস্যায় পতিত হয়। এমতাবস্থায় জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করা হয়। জনগনও সাড়া দেয়। বিশেষ করে নওয়াব পরিবারের কতিপয় সদস্যের উদার হস্তক্ষেপের দরুণ প্রতিষ্ঠানটি অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেনের সভাপতিত্বে ১৯১৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে এর উন্নতির উপায় নির্ধারনের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহর ভগ্নী নওয়াবজাদী আমিনাবানু এবং নওয়াবজাদী আখতারবানু উভয়েই এককালীন ২৫০ টাকা করে দান করেন। এছাড়া আরেকজন মুসলিম ভদ্রলোক মাসিক ৪২ টাকা করে দান করতে প্রতিশ্রুতি দিলে এতিমখানাটি তখনকার মত আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠে।[২৭৪] ১৯১৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে নওয়াবজাদী মেহেরবানুর স্বামী, খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম উক্ত এতিমখানার জন্য এক হাজার টাকা দান করেন।[২৭৫] এছাড়া তিনি ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তাঁর এক শিশু পুত্রের মুসলমানী উপলক্ষে উক্ত এতিমখানার ছেলেমেয়ে ও পাচক, মেট্রন প্রভৃতি ৩১ জনের জন্য এক মাসের খাবার খরচ বাবদ ১৭০/- টাকা দান করেন।[২৭৬] এতিমখানায় অর্থদান ছাড়াও খাজা পরিবারের অনেকে এতিমখানা থেকে অসহায় শিশুদের এনে নিজ বাড়িতে রেখে লালন পালন করে বড় করে তুলতেন। নওয়াবজাদী মেহেরবানুর দায়িত্বে প্রতিপালনরত এরূপ কয়েকটি এতিম শিশুর সাথে নওয়াবজাদীর একটি দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ১২তে দেয়া হলো।[২৭৭]

নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খাজা হাবিবুল্লাহ নওয়াবী পদে আসীন হয়ে পিতার স্মৃতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এতিমখানাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৬ খ্রীঃ লালবাগের ভাড়া বাড়ী থেকে এতিমখানাটি আজিমপুরের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরের কাজ পুরোপুরি শেষ করেন।[২৭৮] ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠানটির পুর্বনাম বদলিয়ে প্রতিষ্ঠাতার নামে এর নামকরণ করা হয় 'স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা।'[২৭৯]

১৯১৬ খ্রীঃ ২২ আগস্ট মংগলবার সকাল ৮.০০ ঘটিকায় ঢাকা শহরের আজিমপুরে বংগের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এই এতিমখানায় 'নওয়াব হাবিবুল্লাহ ওয়ার্ড' নামে একটি নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[২৮০] এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিগণ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। লাট সাহেবের আসনে গ্রহণ করার পর মুসলিম সমাজের পক্ষে কাজী জহিরুল একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। উক্ত পত্রে এতিমখানার আনুপার্বিক সব বিবরণ বর্নিত হয়েছিল।[২৮১]

লর্ড কারমাইকেল তাঁর বক্তৃতায় ইতোপূর্বে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে ১৯১৩ সালে এই এতিমখানা পরিদর্শনের কথা স্মরণ করেন। সে সময় নওয়াব বাহাদুর তাঁকে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য অনুরূপ একটি পাকা ভবন নির্মাণের কথা বলেছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত ভবনটির ভিত্তি স্থাপন করতেও তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন বলে লাট সাহেব উল্লেখ করেন।[২৮২] উল্লেখ্য, দুই বছরে উক্ত ওয়ার্ড ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়।[২৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৬ খ্রীঃ থেকে ১৯২২ খ্রীঃ পর্যন্ত এতিমখানাটি প্রকট আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিল এবং এ কারণে ১৯২৩ খ্রীঃ তা পুনরায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ঐ নাজুক সময়ে নওয়াব সলিমুল্লাহর বন্ধু ও সমাজ হিতৈষী বালিয়াটির জমিদার কাজেমুদ্দিন সিদ্দিকির ভাই, খান বাহাদুর ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় এগিয়ে আসেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় নওয়াব হাবিবুল্লাহকে সভাপতি করে ১৯২৩ খ্রীঃ এতিমখানাটি পরিচালনার জন্য কতিপয় বিশিষ্ট ও দানশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জনাব সিদ্দিকী নিজে ঐ কমিটিতে অবৈতনিক সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব নেন।[২৮৪] ফলে প্রতিষ্ঠানটি আবার প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে পায়।[২৮৫] ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী ঢাকা কমিশনার অফিসে প্রধান সহকারীর চাকুরী করতেন। অফিস সময়ের আগে পরে তিনি এতিমখানার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তাঁর কাজে বিশেষ সহায়তা করতেন খান বাহাদুর খাজা মোহম্মদ আজম, হাকিম হাবিবুর রহমান, চৌধুরী গোলাম ছাত্তার, হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।[২৮৬]

এতিমখানাটির জন্য অর্থাদি সংগ্রহের নিমিত্তে ১৯২৪ সালের মে মাসে ঢাকার জিঞ্জিরা ও ধলেশ্বর নামক স্থানে দুটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা দুটোতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।তাঁদের কেউ কেউ এতিমখানার জন্য এককালীন অর্থ সাহায্য কিংবা ছাত্রদের মাসিক বৃত্তি দান করেন।[২৮৭]

১৯২৫ খ্রীঃ নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ এই এতিমখানা পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং চৌধুরী ফরিদ উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী সম্পাদক ছিলেন। এসময় ১মে ১৯২৩ খ্রীঃ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কার্যনিবাহী কমিটির কার্যবিবরণীসহ আয়-ব্যয়ের একটি হিসেব ঢাকা প্রকাশে ছাপানো হয়েছিল। উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে এতিমখানার আয় হয়েছিল ৬৬৮১ টাকা ১১ আনা এবং ব্যয় হয়েছিল ২৯৪১ টাকা ২আনা। এছাড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিব ব্যাংকে এতিমখানার ফান্ডে ৩৫৬৭ টাকা জমা ছিল। এতিমখানায় ঐ সময় তিনটি বালিকা এবং ১৯ টি বালক পালিত হচ্ছিল। অর্থাভাবে এতিমখানাটির কার্যাবলী ভালভাবে চালানো যাচ্ছেনা বলে উক্ত রিপোর্টের শেষে কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সহৃদয় মুসলমানদের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।[২৮৮]

নওয়াব হাবিবুল্লাহর আমলে আজিমপুরে এতিমখানার প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহ সরকারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অধিগ্রহণ করা হয়।[২৮৯] চৌধুরী ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকীর অবিরাম পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে এতিমখানাটি পূর্ববাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান এতিমখানায় পরিণত হয়। ২৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই এতিমখানাটিতে বর্তমানে যেসব দালান কোঠা দেখা যায়, সেগুলোর অধিকাংশই তাঁর আমলে তৈরী।[২৯০] ১৯২৬ খ্রীঃ বংগের ছোট লাট লর্ড লিটন পরিদর্শনে এসে সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কারখানা বিভাগের উদ্বোধন করেন এবং এতে তিনি আড়াই হাজার টাকা অনুদান দেন।[২৯১] ক্রমে এতিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সংকুলানের প্রয়োজনে নওয়াব হাবিবুল্লাহ ওয়ার্ড সম্প্রসারনের জন্য একটি নতুন ভবন তৈরী করা হয়। ১৯২৬ খ্রীঃ আগস্ট মাসে নব নির্মিত এই ভবনটি তৎকালীন বংগীয় গভর্নমেন্টের কার্যকরী সমিতির সদস্য নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী উদ্বোধন করেছিলেন।[২৯২] এই এতিমখানার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভবনের দ্বারা ঢাকার নওয়াব পরিবারের পূর্ব পুরুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা মোহাঃ আজম এবং নওয়াব পরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ভবনগুলো ঐসব নামে নির্মিত হয়েছিল।[২৯৩]

এতিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ১৯৩১ খ্রীঃ ২২,৮৫৩/- টাকা ব্যয়ে স্যার আহসানুল্লাহ ওয়ার্ড নামে একটি স্বতন্ত্র ভবন তৈরী করা হয়। ঐ ভবন নির্মাণে নওয়াব হাবিবুল্লাহ ১০ হাজার টাকা দান করেন। বাকী অর্থ তৎকালীন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রচেষ্টায় সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয়। লেডী জ্যাকসন ভবনটির উদ্বোধন করেন।[২৯৪] এরপর খাজা সালাহউদ্দিনের দানকৃত ১০ হাজার টাকা এবং সরকারের অর্থ সাহায্যে মোট ২৩,১৭৫/- টাকায় এতিমখানার "মহিলা ওয়ার্ড" প্রতিষ্ঠা করা হয়। নওয়াব হাবিবুল্লাহর মায়ের নামে এ ওয়ার্ডটির নামকরণ করা হয় "আসমাতুন্নেছা

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ড" । এ ওয়ার্ডটিও উদ্বোধন করেন লেডী জ্যাকসন। এ সময়েই এতিমখানার কারখানাটি সম্প্রসারিত করে এখানে বয়ন বিভাগ নির্মাণ করা হয়।[২৯৫] ঢাকার নওয়াব ছাড়াও অনেক বিত্তশালী মুসলমানদের দানে এখানে বেশ কয়েকটি ভবন নির্মিত হয়েছিল। সেগুলো স্ব-স্ব দাতার নামে পরিচিত। ১৩৩৫ বাংলা সালে জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটিতে ৫০ জন এতিম ছিল এবং স্থানাভাবে বহু এতিম ফিরে যাচ্ছিল। এতিমদের যথাযথভাবে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হতো। ঐ সময় দুইবেলা স্কুল হতো এবং চারজন শিক্ষক ছিলেন। লেখাপড়া ছাড়াও টিনের দ্রব্যাদি তৈরী এবং দর্জির কাজও শিখানো হতো। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া ছাড়াও এতিমদের অন্তত একটি কারীগরি শিক্ষা দেয়া। কম্পাউন্ডের ভিতর কৃষিকাজও কিছু করা হতো। তাতে ছাত্ররা সাহায্য করতো। তারা এর ভিতরেই খেলাধূলা করতো।[২৯৬] ১৯৩৪ সালে মাসিক মোহাম্মদী প্রত্রিকায় প্রকাশিত অনুরূপ আরেকটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সে সময় এ এতিমখানাটিতে ছেলেমেয়েদের খাওয়া পরা এবং শিক্ষা বাবদ মাসে ১৪ শত টাকা ব্যয় হতো। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এতিমদের জন্য প্রায় সোয়া দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির রিজার্ভ ফান্ডে তখন ১৪ হাজার এবং সাধারণ ফান্ডে ৩২ হাজার টাকা জমা ছিল। সাধারণ ফান্ডের টাকায় আরেকটি ওয়ার্ড তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এতিমদের সংখ্যা ছিল তখন ১৪০ জন, যার মধ্যে ৭ জন বালিকা। বালিকাদের একজন লেডী সুপারের পরিচালনায় স্বতন্ত্র ওয়ার্ডে রাখা হতো।

উক্ত পত্রিকা থেকে আরো জানা যায় যে, খাওয়া পরার সুবিধা ছাড়াও এতিমদের শিক্ষার দিকেও যথেষ্ঠ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। সেখানে দর্জি, কামার, বয়ন, মিস্ত্রী, দপ্তরী ও বাগানের কাজ শিক্ষা দেয়া হতো। মেধাবী ছাত্রদের সাধারণ ও কারিগরী বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো। একটি ছেলে এম. এ. বি. এল. পাশ করেছিল। আরেকজন আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে কার্পেন্ট্রি পাশ করেছিল। দু'জন শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয় থেকে নিম্ন পরীক্ষায় পাশ করেছিল। এরা সবাই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করতো। তখন ৩২ জন ছেলে বাইরের বিদ্যালয়ে এবং ১০১ জন ছেলে এতিমখানার সাধারণ ও কারীগরি বিভাগে শিক্ষা করছিল। ব্যয়াম ও স্কাউট শিক্ষক ছেলেদের স্বাস্থ্য চর্চার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। এতিমদের ধর্মশিক্ষাও দেয়া হতো। গোরে শহিদ মসজিদে সবাইকে জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হতো।[২৯৭] প্রতিষ্ঠানটি এখনো স্বগৌরবে বিদ্যমান। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে গঠিত একটি গভর্নিং বডি দ্বারা সেটা পরিচালিত হয়ে থাকে।

২(৬) বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণে অবদান ঃ

ঢাকা নগরীর দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবাহিত বুড়ীগংগা নদীটি এ শহরকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য্যশালী করেছে। ঢাকা বাসীরা যুগে যুগে নানাভাবে এ নদীটিকে ব্যবহার করেছেন। পানির নিত্য ব্যবহার ও নৌযান চালানো ছাড়াও নদীটিকে তাঁরা আরো যেসব উল্লেখযোগ্য কাজে লাগিয়েছেন, তম্মধ্যে এর তীরে বাকল্যান্ড বাঁধ তৈরী ও এর ব্যবহার অন্যতম। বিভিন্ন স্থানের ডোবা, খানা-খন্দকের পঁচা পানির দুর্গন্ধ এবং ঝোঁপ জংগলের আবর্জনা ও মশা-মাছি একদিকে নগরবাসীদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলতো। অপরদিকে শুভ্রবসনা বুড়িগংগা নদীর নির্মল হাওয়া উপভোগের জন্য নদী তীরের এই বাকল্যান্ড বাঁধ তাঁদেরকে পরিমল আনন্দ দান করতো। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত বাকল্যান্ড বাঁধ ছিল ঢাকাবাসীদের অবসর বিনোদনের একটি প্রধান কেন্দ্র। শহরের উচ্চবিত্ত ও প্রভাশালী আমলা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের প্রতিদিন বাকল্যান্ড বাঁধে ভ্রমণ ছিল একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য।

মোগল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে বড়ীগংগা নদীর তীর দিয়ে দীর্ঘ একটি পাকা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। বাঁধটি তৎকালে পোস্তা (বাঁধ) নামে পরিচিত ছিল। ঐ বাধঁটি এখন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেলেও লালবাগের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পোস্তা নামে একটি মহল্লা আজো সেটার স্মৃতি বহন করছে।[২৯৮] নদীর কুলে নৌকা ভিড়ানো, মালপত্র

Dhaka University Institutional Repository

সহজে উঠানো নামানো এবং যাত্রী সাধারনের যাতায়াতের সুবিধার্থে উক্ত বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছিল। রেনেলের বর্ণনানুসারে ১৭৬৫ খ্রীঃ বাঁধটি প্রায় ৪ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।[২৯৯] সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মোগল আমলের ঐ বাঁধটি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের বাঁধটি নির্মাণের উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকার কমিশনার সি.টি. বাকল্যান্ড। ১৮৬৪ খ্রীঃ তিনি ঢাকায় কমিশনার নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাঁধটি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেন।[৩০০] এ উপলক্ষে তিনি চাঁদা তোলার জন্য সদরঘাটে একটি সুসজ্জিত বজরায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। তাঁরা কমিশনার সাহেবের অনুরোধে বাঁধ নির্মানের জন্য ৬৫ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করেন।[৩০১] চাঁদাদাতাদের মধ্যে নওয়াব খাজা আবদুল গণি, রাজা কালী নারায়ন রায়, জগন্নাথ রায় চৌধুরী, মোহিনীমোহন দাস এবং হাজী বদরউদ্দিন ওরফে ভুট্টো হাজীর (নওয়াব আবদুল গণির চামড়া ব্যবসায়ের অংশীদার) নাম উল্লেখযোগ্য।[৩০২] নওয়াব আবদুল গণি বজরায় উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে উপস্থিতগণের নিকট থেকে চাঁদা প্রদানের সম্মতি আদায়ে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৩০৩] তৎকালীন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেকটর মিঃ ক্লে, তাঁর ডাইরীতে লিখেছিলেন, 'জনহিতকর কাজে নেটিভদের হাতটান। মুক্ত হস্ত দান খয়রাত কম। কিন্তু খাজা গণি মিয়া এর ব্যতিক্রম বরং বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণে দানের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।'[৩০৪] ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, বাকল্যান্ড বাঁধ ও সংলগ্ন ঘাট নির্মাণে ঢাকার নওয়াব মোট ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন।[৩০৫] নদীর তীরবর্তী বাড়ীগুলোর সামনে থেকে বাঁধের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সংশ্লিষ্ট মালিকদের নিকট থেকে অধিগ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া নদীর তলদেশ থেকে মাটি উঠিয়ে তীরবর্তী নীচু ও ঢালু জায়গা ভরাট করে শহরের সমতলে সমান করা হয়।[৩০৬]

382374

কিন্তু বাঁধের নির্মাণ কাজটি শেষ হবার আগেই কমিশনার বাকল্যান্ড সাহেব বিলেতে চলে যান। পরবর্তী কমিশনার মিঃ সিম্পসনের প্রচেষ্টায় ১৮৬৯ খ্রীঃ কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল।[৩০৭] উক্ত বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও বাকল্যান্ড সাহেব সরকারী উদ্যোগে ঢাকা শহরে বাড়ীঘর নির্মাণ ও পূর্তকাজে বেশ জোর দিয়েছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ঢাকায় একটি কৃষি ও শিল্পমেলার আয়োজনকারীদের বাঁকল্যান্ড সাহেব ২০০/- টাকা প্রদান করেন।[৩০৮] কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাকল্যান্ড সাহেবের বিদায়কালে একটি অভিনন্দন পত্র দেয়া হয়েছিল। ঢাকাবাসীর পক্ষে উক্ত অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন নওয়াব আবদুল গণি, খাজা আহসানুল্লাহ, জি. এম. রেলি, সি.এন. পোগজ ও গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ।[৩০৯] নদীতীরে নির্মিত উক্ত রাস্তাটি ক্রমে বাকল্যান্ড বাঁধ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।[৩১০]

মিঃ বাকল্যান্ডের সংগৃহীত পূর্বোক্ত ৬৫ হাজার টাকায় বাঁধ নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য কমিশনার সিম্পসনের সময় লোকাল ফান্ড থেকে ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। তাতেও সংকুলান না হওয়ায় মিঃ সিম্পসন নওয়াব আবদুল গণির নিকট থেকে ৮ হাজার টাকা ধার নিয়ে বাঁধ নির্মাণের কাজটি শেষ করেন।[৩১১] ফান্ডে টাকার অনটনের কথা জানতে পেরে নওয়াব আবদুল গণি নিজ তহবিল থেকে ঐ সময় একাজে দু'হাজার টাকা দান করেন। এছাড়া মোহিনী মোহন দাস এবং আরো কয়েকজনের নিকট থেকে ২ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়।[৩১২] উল্লেখ্য যে, ঐ সময় টাকার অভাবে কাজ শেষ করতে না পেরে কমিশনার সিম্পসন সাহেব নদীতীরবর্তী বসবাসকারী বিত্তশালীদের নিকট চাঁদা দানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে নওয়াব আবদুল গণি ছাড়া কেউ স্বত-স্ফূর্তভাবে আশানুরূপ সাড়া দেননি।[৩১৩]

হৃদয়নাথ মজুমদার লিখেছেন, প্রথম বছর নর্থব্রুক হল থেকে ওয়াইজঘাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মিত হয়। পরের বছর পূর্বদিকে রূপলাল হাউস ও পশ্চিমদিকে বাদামতলী ঘাট পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। বাঁধের মাঝেরটুকু সরকারী উদ্যোগে নির্মিত হয়। এছাড়া পূর্বের অংশটুকু নির্মিত হয়েছিল রূপলাল দাস ও রঘুলাল দাসের দানে এবং পশ্চিমের অংশটুকু নির্মিত হয়েছিল নওয়াব খাজা আবদুল গণির দানে।[৩১৪] তিনি আরো বলেন, নওয়াব আবদুল গণি এবং রূপলাল দাস কেউই

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের বাড়ির সামনের অংশটুকু মিউনিসিপ্যালিটিকে ব্যবহার করতে দিতেন না। যদিও মিউনিসিপ্যালিটিই সমগ্র বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতো।[৩১৫] ১৮৮৯ খ্রীঃ ম্যাজিস্ট্রেট জি. এল. হেয়ার সাহেব লালকুঠি থেকে নওয়াব বাড়ি পর্যন্ত বাকল্যান্ড বাঁধের সাথে বুড়ীগংগায় কোন নৌকা রাখতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কেউ এরূপ করলে তাকে জরিমানা করা হতো।[৩১৬] ২৯ জানুঃ ১৮৮৯ খ্রীঃ মংগলবার রাত ৮টায় একজন এ নিষেধাজ্ঞার কথা না জেনে নওয়াব বাড়ীর সামনে নৌকা বাঁধলে তাকে ৪ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।[৩১৭] পূর্ব পশ্চিমে শহরের পুরো এলাকায় নদীতীর জুড়ে বাঁধটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলেও মিউনিসিপ্যালিটির পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি।[৩১৮] বাকল্যান্ড বাঁধের সাথে ঐ সময় সদরঘাট এলাকায় একটি সবুজ চত্বর নির্মিত হয়। চত্বরটি ক্রমে একটি ছোট পার্কে পরিণত হয়েছিল। ঐ পার্কে একটি উত্তোলিত মঞ্চের উপর প্রতি শনিরার সেপাইরা ব্যান্ড পরিবেশন করতো। ঢাকা পরিদর্শনে আগত গভর্নরদের সেখানে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করা হতো। পরর্বতীকালে ঢাকায় সরকারী ব্যান্ড সেপাইরা না থাকায় এক পর্যায়ে উক্ত ব্যান্ড বাজানো বন্ধ হয়ে যায়।[৩১৯] নদী তীরে বৈকালিক ভ্রমণে আগত ঢাকাবাসীরা সপ্তাহান্তে ঐ বাদ্য উপভোগ করে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতো। তাই নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজ ব্যয়ে ঢাকার এই প্রচলিত ঐতিহ্যটি টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ ইংরেজ বাদকদলকে তথায় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে বাদ্য পরিবেশন করার নির্দেশ দেন।[৩২০] নদীতীরে বাঁধ-তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণে নওয়াব আহসানুল্লাহ খুবই গুরুত্ব দিতেন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ঢাকা শহরে গ্যাসালোক (পরবর্তীতে তড়িতালোক) দেয়ার জন্য তিনি যে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা খরচ করা নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির অভ্যন্তরে মতানৈক্য দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, ১৮৯৬ খ্রীঃ এক পর্যায়ে নওয়াব সাহেব ঐ প্রতিশ্রুত টাকায় নদী তীরের বাঁধটি মিটফোর্ড পর্যন্ত বর্ধিত করে দিতে চেয়েছিলেন। ঐ বর্ধিতাংশটি নওয়াব বাঁধ নামে পরিচিত হবার কথা হয়েছিল।[৩২১] কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর তীরে নৌকা ভিড়িয়ে মালপত্র উঠানো-নামানোর বিশেষ সুবিধা হয়। এ ছাড়া এ বাঁধের ফলে ঢাকাবাসী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য এক নতুন ধরণের অবসর বিনোদনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সকাল বিকাল ভ্রমণ ও গল্পগুজব করার জন্য কিংবা নদীর দৃশ্য উপভোগ করার জন্য এটা ছিল একটি মনোরম স্থান। বাঁধটি দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল মিউনিসিপ্যালিটির উপর। ১৮৯০ খ্রীঃ ঢাকা প্রকাশের এক খবরে জানা যায়, তখন বুড়ীগংগার তীরে সকাল বিকালে বিস্তর লোক হাওয়া খেতে যেত। তাঁদের বিশ্রামের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে প্রায় ২০টি লৌহ বেঞ্চ বাঁধের বিভিন্ন স্থানে রাখা ছিল।[৩২২]

১৮৮২ খ্রীঃ বাকল্যান্ড বাঁধের উত্তর পাশ দিয়ে ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩০ ফুট চওড়া একটি গাড়ী ঘোড়া চলার মত রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ঢাকার সিভিল সার্জন ডাঃ এবার ক্রমবি যুক্তি দেন যে, এতে বাঁধের আয়তন সঙ্কুচিত হবে এবং সাহেব মেমদের বিলাস ভ্রমণ ছাড়া ঢাকা বাসীদের তা কোন উপকারে আসবে না। শেষ পর্যন্ত লেঃ গভর্নরের হস্তক্ষেপে পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে যায়।[৩২৩] ১৯২২ খ্রীঃ বংগের গভর্নর লর্ড লিটন ঢাকা সফরে এলে খান বাহাদুর খাজা মোঃ আজমের নেতৃতে ঢাকার মুসলমান এসোসিয়েশনের লোকেরা ১২ আগস্ট তাঁর সাথে দেখা করেন। তাঁরা গভর্নরের নিকট ঢাকার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ধোলাইখাল সংস্কার ও বাকল্যান্ড বাঁধ সম্প্রসারণের প্রস্তাব পেশ করেন।[৩২৪]

১৯২৭ খ্রীঃ ঢাকার কালেকটর, বাকল্যান্ড বাঁধটি মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ন্ত্রণ থেকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঢাকাবাসীর প্রতিবাদের মুখে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ পাকিস্তান সরকার এক নির্দেশে বাকল্যান্ড বাঁধের স্বত্ব পৌরসভার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আই. ডব্লিউ. টি. এ. -এর কর্তৃত্বে দিয়ে দেয়।[৩২৫] এরপর থেকে ঢাকাবাসীর গর্বের এই মনোরম বাঁধটি ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। বর্তমানে সেটা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্তির পর্যায়ে চলে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২(৭) নর্থব্রুক হল নির্মাণে অবদান ঃ

প্রাচীন ঢাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নর্থব্রুক হলটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টাউন হল হিসেবে তৈরী এ ভবনটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ঢাকার আধুনিক শিক্ষিত ও অভিজাতদের মিলনায়তন হিসেবে গন্য হতো। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ১৮৭৪ সালের ঢাকা সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর নামে এই হলটি নির্মাণ করা হয়। হলটি নির্মাণে ঢাকার নওয়াব আবদুল গণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত সফরকালেই লর্ড নর্থব্রুক ৬ আগস্ট নওয়াবের দানে ঢাকায় স্থাপিত পানির কলের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নওয়াবের অতিথিরূপে আহসান মঞ্জিলে সান্ধ্য সম্মেলনে যোগ দেন।[৩২৫(ক)]

বড়লাটের আগমনে ঢাকা শহর বাসীর আনন্দ-উৎসব এবং আয়োজনের কোন সীমা ছিল না। এই শুভাগমনের স্মরণে ঢাকায় একটি স্মৃতি চিহ্ন নির্মাণের মানসে ঢাকা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে নওয়াব খাজা আব্দুল গণি ১৬ জুলাই ১৮৭৪ খ্রীঃ বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবন আহসান মঞ্জিলে এক সভা করেন। উক্ত সভায় 'নর্থব্রুক হল ও লাইব্রেরী' নামে একটি টাউন হলের সাথে সাধারণ পাঠাগার নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত গণ্যমান্যদের মধ্য থেকে এজন্য অর্থদানের একটি তালিকাও তৈরী করা হয়।[৩২৬] উক্ত সভায় মোট আট হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তম্মধ্যে নওয়াব খাজা আবদুল গণি ১ হাজার ও তাঁরপুত্র খাজা আহসানুল্লাহ ১ হাজার টাকা প্রদান করেন।[৩২৭]

বড়লাটের আগমন উপলক্ষে ঢাকায় ব্যাপক আয়োজন ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। এ কাজে খাজা আবদুল গণির বাড়ীতে আয়োজিত সভায় সংগৃহীত পূর্বোক্ত ৮ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়। ফলে টাউন হল নির্মাণে টাকার স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় স্থানীয় একটি পত্রিকা আব্দুল গণির বিরূপ সমালোচনা করে লিখেছিল, খাজা সাহেব এ কাজে সামর্থানুরূপ দান না করায় অন্যরাও আশানুরূপ দান করেননি। তাই তাঁকে পুনরায় এতদাঞ্চলের ধনীব্যক্তিদের একত্রিত করে ও দানাঙ্ক বর্ধিত পূর্বক হল নির্মাণের কাজটি করা উচিত।[৩২৮] এ প্রেক্ষিতে ৫ আগস্ট ১৮৭৪ খ্রীঃ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে পূর্ববঙ্গ রংগভূমিতে পুনরায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত নর্থব্রুক হল নির্মাণের জন্য এতদাঞ্চলের ধনীব্যক্তিরা বেশ বড় অংকের অর্থদানের অংগীকার করেন। খাজা আবদুল গণির বাড়ীতে অনুষ্ঠিত ইতোপূর্বের সভায় সংগৃহীত টাকা থেকে অব্যয়িত অর্থ এই সাথে যোগ করে কাজটি শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া উক্ত হল ও লাইব্রেরী নির্মাণের ব্যবস্থাদি করার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটিও গঠন করা হয়।[৩২৯] ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রীঃ ঢাকার কমিশনার ককরেল সাহেবের সভাপতিত্বে নর্থব্রুক হল নির্মাণ কমিটির এক সভা হয়। এতে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লায়েল, জয়েন্ট ম্যাজিঃ মিঃ রামপেনি, ডিঃ সুপার মিঃ উইদ্রল প্রমুখ ইংরেজ সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে নওয়াব খাজা আবদুল গণি ও খাজা আহসানুল্লাহ, বাবু মোহিনীমোহান দাস, রেবতী মোহন বসাক, রূপলাল দাস, ব্রজসুন্দর মিত্র, বাবু অভয় চন্দ্র দাস, লালা মৃত্যুজিৎ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় কমিটির সেক্রেটারী বাবু অভয় চন্দ্র দাস হিসাব দেন যে, বড়লাটের অভ্যর্থনার জন্য সংগৃহীত ১০,১৭৩ টাকা এবং নর্থ ব্রুক হলের জন্য সংগৃহীত ৪,১৫০ টাকার মধ্যে ১০,৭৫০ টাকা খরচ হয়েছে এবং ৩,৫৬৯ টাকা ব্যাংকে জমা আছে। উল্লেখ্য, বড়লাটকে অভ্যর্থনার জন্য আদায়কৃত তহবিল থেকে খাজা আহসানুল্লাহ-কে প্রয়োজনীয় খরচের জন্য কিছু অর্থ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি নির্ধারিত অর্থের চেয়ে ২৮৮ টাকা বেশী খরচ করতে বাধ্যহন। নর্থব্রুক হল নির্মাণের স্বার্থে নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় ২৮৮ টাকার দাবী পরিত্যাগ করেন। উক্ত সভায় এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া হয়।[৩৩০] এ ছাড়া ঐ সভায় নর্থব্রুক হল নির্মাণে ৪৫,৭৫০ টাকার ব্যয়ানুমান পেশ করা হয়। উক্ত সভায় হলটি নির্মাণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে ৯ সদস্যের একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। সভায় আরো নির্ধারিত হয় যে, হল নির্মাণার্থে আদায়কৃত ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের নামে ব্যাংকে জমা থাকবে।[৩৩১] উল্লেখ্য, হলটি নির্মাণে সর্বমোট ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।[৩৩২]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৯ সালেই হলটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল, কিন্তু মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৮৮০ সালের ২৪মে ঢাকার কমিশনার কর্তৃক নর্থব্রুক হলের দ্বারোদঘাটন করা হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে ঐদিন বিকেল সাড়ে চারটায় হল কক্ষে এক আড়ম্বপূর্ণ সভা হয়। একজন পুলিশ ইনসপেক্টর একশত কনস্টবলসহ হলের সিংহদ্বারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানে আগত কমিশনার সাহেবকে ফৌজি কায়দায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কমিশনার বাহাদুরের গমণাগমনকালে নওয়াব খাজা আবদুল গণির ইউরোপীয় ব্যান্ডপার্টি বাদ্য পরিবেশন করে।[৩৩৩] ঢাকার নওয়াবদের পুরানো এ্যালবাম থেকে নদীতীরে বাকল্যান্ড বাঁধের পাশে নর্থব্রুক হলের তৎকালীন দৃশ্য সম্বলিত যে দুস্প্রাপ্য চিত্র পাওয়া গেছে তা পরিশিষ্টে চিত্র নং-১৩ তে দেয়া হলো।

আগেই বর্ণিত হয়েছে, একটি টাউন হলের কার্যব্যবস্থার পাশাপাশি ভবনটিতে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করাও উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ ৮ ফেব্রুয়ারী জনগণের টাকায় নর্থব্রুক হলে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অর্থ ও বই পুস্তক দান করেছিলেন, তম্মধ্যে খাজা আবদুল গণি ও ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র-এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।[৩৩৪] ১৮৮২ খ্রীঃ খাজা আবদুল গণি প্রায় ৭ শতটি মূল্যবান গ্রন্থ এই লাইব্রেরীতে দান করেন।[৩৩৫] নওয়াব আহসানুল্লাহও উক্ত গ্রন্থাগারে অনেকগুলো বই দান করেন। নওয়াবদের দানকৃত বইগুলো পৃথক পৃথক আলমারীতে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। ঐসব বইসহ নওয়াব আবদুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহর নামাঙ্কৃত কয়েকটি আলমারী আজো সেখানে বিদ্যমান।[৩৩৬] নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, নর্থব্রুক হল উন্নয়নের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে একবার ২ হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল।[৩৩৭]

নর্থব্রুক হল লাইব্রেরীর সাথে একটি রিডিংরুম সংযোজিত করা হয়েছিল। সেখানে এতদাঞ্চলে প্রকাশিত সব ধরনের ইংরেজী সংবাদ পত্র এবং উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্রিকা পাঠকদের জন্য গ্রহণ করা হতো। পত্রিকা ও বই পুস্তক পড়ার জন্য পাঠক/সদস্যকে যে চাঁদা দিতে হতো তা ছিল খুবই সামান্য।[৩৩৮] বিলেতে যখন যে ভাল বই প্রকাশিত হতো, তখন তা আনিয়ে প্রচার করাও ছিল নর্থব্রুক হলের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৩৩৯] ১৮৮৮ খ্রীঃ এ লাইব্রেরীর জন্য বিলেত থেকে ছয়শত টাকার বই আনানো হয়।[৩৪০]

প্রথমদিকে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে একটি কমিটির দ্বারা নর্থব্রুক হল ও লাইব্রেরী পরিচালিত হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে কমিশনারগণ এর প্রতি তেমন নজর দিতেন না বলে চাঁদাদাতা সদস্যগণ এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির উপর অর্পনের প্রস্তাব করেন। এ উপলক্ষে ১৯ জানুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ এক সভায় এর রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়-ব্যয়ের বিষয়ে নীতিমালা নির্ধারণ করে এবং হলটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন।[৩৪১] ১৮৮৬ খ্রীঃ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নর্থব্রুক হল শ্রীহীন হয়ে পড়ে। চারিদিকে সীমানা দেয়াল না থাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এমনকি এর ছাদ দিয়ে পানি পড়া শুরু করে বলেও জানা যায়।[৩৪২] এমতাবস্থায় হলের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নওয়াব আহসানুল্লাহ এগিয়ে আসেন। তিনি ১৩৫০ টাকা ব্যয় করে নর্থব্রুক হলের চর্তুদিকে সীমানা দেয়াল নির্মাণ করে দেন।[৩৪৩] সে সময় ভবনের মেরামত কাজও করা হয়।

নর্থব্রুক হলের দক্ষিণ-পূর্বকোণে পরবর্তীকালে জনসন হল নামে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ক্লাবঘর তৈরী করা হয়।[৩৪৪] পরবর্তীকালের কর্তৃপক্ষ এই ঐতিহ্যবাহী হল ও পাঠাগারের ঐতিহ্যকে সমুন্নত না রেখে সেখানে নানা সময় টেলিগ্রাফ অফিস, মহিলা কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করে এর অপব্যবহার করেছেন। এর আশে পাশে অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন দালান ও ব্যব সায়ীদের আড়ত তৈরী করে এর পরিবেশকে বিনষ্ট করেছে। এতদসত্বেও এটি আজো পুরানো ঢাকার একটি ঐতিহাসিক ও অনুপম স্থাপত্য নিদর্শন এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৪ এবং জেমস্ টেইলর, *টপোগ্রাফী এন্ড স্টাটিসটিক্স অব ঢাকা,* মোঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক অনুদিত, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পূর্নমুদ্রণ ঢাকা-১৯৯৩। (অতঃপর-*টেইলর, টপোগ্রাফী,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, বলে বিবেচ্য,) পৃঃ ১৫৯ ও ২৭৯।

২। বার্ট, *রোমান্স,* বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৪, এবং শরীফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৭।

৩। বিশপ হেবার, *ন্যারেটিভ অব এ জার্নি,* ভল-১, উদ্ধৃত করেছেন- আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ- ৯২।

৪। *টেইলর, টপোগ্রাফী,* বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৭, ২৫০-৫১, ২৮০, কর্ণেল ডেভিডসনের লেখায়ও অনুরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়, দেখুন-মুনতাসীর মামুন, কর্ণেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়, ১ম প্রকাশ ১৯৯০ পৃঃ ২৯।

৫। মামুন, পুরানো ঢাকা উৎসব ও ঘরবাড়ী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১।

৬। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৭।

৭। মামুন, ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, ১ম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪ (অতপর-মামুন, *ঢাকা,* বলে বিবেচ্য) প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭।

৮। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৯।

৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ আগস্ট ১৮৬৪ পৃঃ ২৮১।

১০। টেইলব, *টপোগ্রাফী,* বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৮।

১১। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১।

১২। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯২-৯৩ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮।

১৩। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০, উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩।

১৪। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯ এবং সি. ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮, (হাকিম হাঃ রহমান বলেন, ওয়াল্টার্স সাহেব চক বাজারকে পুনর্নির্মাণ করেন। আসুদগানে ঢাকা, প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ, পৃঃ ৪৮ এবং ৫২) ওয়াল্টার্স সাহেব সোয়ারীঘাট থেকে বৃহৎ কামান নিয়ে চকবাজারের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে ছিলেন, নির্মল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩।

১৫। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৯-৫০

১৬। ঐ, পৃঃ - ১৫০।

১৭। কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ,* ১ম সংস্করণ, ময়মনসিংহ, মার্চ ১৯১০। এবং প্রফেসর নির্মল কুমার গুপ্ত, *ঢাকা (ওল্ড এন্ড নিউ)* ঢাকা ১৯৪০ পৃঃ ৪৬ এবং নির্মল কুমার গুপ্ত, *ঢাকার কথা,* কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৬ পৃঃ ৬৩

১৮। ১৮২৩ সালে গঠিত ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি কর্তৃক ইমামগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বাজার 'কমিটি গঞ্জ' নামে পরিচিত ছিল। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫০ ও ১৬৭, নোট ক্রমিক নং- ২১। ১৯২১ খ্রীঃ এখানকার রাস্তায় বিদ্যুতায়নের জন্য মাত্র পাঁচশ টাকা দিয়ে গোপীনাথ কবিরাজ নিজের নামে এর পুণঃনামকরণ করেন; আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮ এবং ৫৪।

১৯। শরফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১

২০। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৫১

২১। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৭-৬৮ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তীর ঢাকা,* তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৫, পৃঃ ৫২৪।

২২। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৩ এবং যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ৩৩৩

২৩। ঐ পৃঃ ১৫৪

২৪। ঢাকা প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৮৬৪ পৃঃ ৬১-৬২

২৫। আজিমুশ্শান হায়দার, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৪

২৬। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৯ এবং আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১২৪ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* ৩য় সংস্করণ-১৯৯৫ পৃঃ ৫০০

২৭। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৯ এবং আজিমুশ্শান ঐ ১২৪ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০১।

২৮। আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত, দানের তালিকা পৃঃ ৩৯৮।

২৯। আব্দুল গণি প্লেগ ফান্ড থেকেও একাজে স্থায়ী বরাদ্দ ছিল। পুরানো নথি, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২২ এবং *পুরানো দলিল,* আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত।

৩০। আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৮ এবং *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১।

৩১। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ আগস্ট ১৮৬৩ পৃঃ ২৫৪

৩২-৩৩। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৪ এবং আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪-৯৫।

৩৪। ঐ, পৃঃ ১৬৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৮মে ১৮৬৩ পৃঃ ১২২-২৩

৩৫। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১১ জুন ১৮৬৩ পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৩ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৫।

৩৭-৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জানুয়ারী ১৮৬৪ পৃঃ ৪৭৮ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭১ এবং যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৪ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জানুয়ারী ১৮৬৪ পৃঃ ৪৯৩-৯৪ এবং আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ৯৪ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১১ ফেব্রুঃ ১৮৬৪ পৃঃ ৫১৫-১৭।

৩৯। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২০।

৪০। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৪১। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ৯৮

৪২। *ক্যালকাটা গেজেট,* ২৭ জুলাই ১৮৬৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭১

৪৩। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭২ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১

৪৪। তখন কর দাতার সংখ্যা ছিল ১০৬০ জন, কর আদায়ে ঢাকা শহরকে ১৬৬ মহল্লায় ভাগ করে প্রথমে ১৪ জন এবং শেষে ১০ জন তহশীলদার নিয়োগ করা হয়। শুরুতে ওয়াইজ হাউসের একটি অংশ মিউনিঃ অফিসের জন্য ভাড়া নেয়া হয়েছিল। (নাজির হোসেন, কিংবদন্তী ৩য় সংস্করণ পৃঃ ২২)

৪৫। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭২। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় আঃ গণি গরিবের উপর কর ধার্য্যের বিরোধী থাকলেও ধনীদের উপর কর ধার্য্যের বিরোধী ছিলেন না।

৪৬। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২মে ১৮৬৯ পৃঃ ৮৮-৯১

৪৭। শরিফুদ্দিন, ঐ পৃঃ ১৮৪

৪৮-৪৯। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৫

৫০। ঐ পৃঃ ১৮৭ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২মে ১৮৬৯ খ্রীঃ পৃঃ ৮৮-৯১

৫১। শরিফুদ্দিন, ঐ পৃঃ ১৯৪।

৫২। ১৮৭২ খ্রীঃ এরূপ অবহেলার দরুণ ঢাকা প্রকাশকে ২০ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ডিসেঃ ১৮৭২ পৃঃ ৪৩৫ এবং ১২ ডিসেঃ ১৮৭৫ পৃঃ ৪২৩।

৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ২২ সেপ্টেঃ ১৮৭২ পৃঃ ৩১৪-১৫ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৯

৫৪। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৭ নোট ক্রমিক নং- ৭ দ্রঃ; আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ৭৯ ও ১২৯। খাজা আজগর ন্যাশনাল কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন বলে ১৮৮৭ খ্রীঃ জানুঃ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব করেন, স্টেটসম্যান তাঁকে প্রশংসা করে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ পৃঃ ৬

৫৫। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৩১।

৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ২০ আগস্ট ১৮৮২ পৃঃ ২৬৭-৭০

৫৭। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, মিউনিঃ পলিটিক্স....* পৃঃ ১৫৪। উল্লেখ্য, ১৮৭৬ খ্রীঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন প্রথা চালু হয়। সেখানে সরকার চেয়ারম্যানসহ মাত্র ২৪/২৫ জন কমিশনার নিযুক্তি দিতেন এবং বাকী কমিশনারেরা নির্বাচিত হতেন (ঢাকা প্রকাশ, ১০ আগস্ট ১৮৮৪ পৃঃ ২৫৬)

৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ অক্টোঃ ১৮৮৪, পৃঃ ৩৪২-৪৩

৫৯। শতকরা প্রায় ৪০ জন বয়স্ক পুরুষই শিক্ষা কিংবা সম্পত্তি না থাকায় ঐ সময় ভোটাধিকার পায়নি, শরিফুদ্দিন- *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৪।

৬০। ঢাকা প্রকাশ ৯ নভেঃ ১৮৮৪ খ্রীঃ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩০।

৬১। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার,* পৃঃ ১৫৫-৫৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩০

৬২। ঢাকা প্রকাশে খবর বের হয় যে, নির্বাচন নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র জন্মেছে, কিন্তু মুসলমানেরা নাকি হিন্দুদের কাউকে ভোট দেবে না সংকল্প করেছে শুনে দুঃখ পেলাম। ঢাকা প্রকাশ, ৯ নভেঃ ১৮৮৪ পৃঃ ৩৬৩।

৬৩। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার,* পৃঃ ১৫৫-৫৬ এবং ঐ, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩২।

৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ৯ নভেঃ ১৮৮৪ পৃঃ ৩৭০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩০ নভেঃ ১৮৮৪, পৃঃ ৩৯৯ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ...* পৃঃ ১৫৬।

৬৫-৬৬। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১, শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ...* পৃঃ ১৫৬-৫৭ এবং আজিমুশ্শান *সিভিক বডি,* পৃঃ ১২৯ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তীর ঢাকা,* ৩য় সংস্করণ, ঢাকা এপ্রিল ১৯৯৫ পৃঃ ৫৭২।

৬৭। ঢাকা প্রকাশ, ২২ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ পৃঃ ৭।

৬৮। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট..* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯।

৬৯-৭০। ঢাকা প্রকাশ, ১২ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ পৃঃ ৭

৭১। ঢাকা প্রকাশ এ প্রসংগে মন্তব্য করেছিল, যদি নওয়াব সাহেব এরূপ কিছু করতে পারেন, তবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি যতদিন থাকবে ততদিন তাঁর বয়স বর্দ্ধিত হবে (ঢাকা প্রকাশ, ১৯ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ পৃঃ ৬)

৭২। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউঃ*প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯।

৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ মার্চ ১৮৮৮ পৃঃ ৪।

৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৪।

৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৬; ২৪ এপ্রিল ১৮৯৮ পৃঃ ৬ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯; এর আগে ১৮৭৪ খ্রীঃ সরকারের নিকট থেকে পুরানো পল্টনের ৮০ বিঘা জমি লীজ নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর দিলখুশা বাগানের বিস্তার করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৪০৩ এবং *পুরানো নথি,* পৃঃ ডি-৪৪।

৭৬। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট..* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬১-৬৩, এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৩ নভেঃ ১৮৯০, পৃঃ ৫-৬।

৭৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ এপ্রিল ১৮৯০ পৃঃ ৭

৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ ডিসেঃ ১৮৯০ পৃঃ ৫-৬।

৭৯। ঢাকা প্রকাশ, ৫ এপ্রিল ১৮৯১ পৃঃ ৫ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট..* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৪-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৮০। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৮৯১ পৃঃ ৭
৮১। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ৭৯
৮২। ঢাকা প্রকাশ, ৩১মে ১৮৯১ পৃঃ ৬
৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৮৯১ পৃঃ ৭
৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জুন ১৮৯১ পৃঃ ৬। এছাড়া মিঃ ওয়াইজের বাড়ির সামনে পানির কল ও গ্রাহকের ব্যয়ে বনগ্রামের রাস্তায় পানির কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী আগষ্ট মাসেই বর্ধমানের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার উমাকান্তকে নিয়োগ দেয়া হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ আগষ্ট ১৮৯১ পৃঃ ৮।
৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ডিসেঃ ১৮৯১ পৃঃ ৬
৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ সেপ্টেঃ ১৮৯৩ পৃঃ ৭
৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ডিসেঃ ১৮৯৩ পৃঃ ৬
৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৮৯৪ পৃঃ ৪-৬
৮৯। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার*, পৃঃ ১৬৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১১ মার্চ ১৮৯৪ পৃঃ৬-৭
৯০। ঢাকা প্রকাশ, ১২ ও ২০ জুলাই ১৮৯৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট*, ফিউচার, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৬
৯১। ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোঃ ১৮৯৬ খ্রীঃ
৯২। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৭
৯৩-৯৪। এস.এম.তৈফুর, *নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফজান*, আজিমুশ্শান হায়দার (সম্পাদিত) *সিভিক বডি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।
৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ নভেঃ ১৮৮৪ পৃঃ ৩৯৯
৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ৪ এপ্রিল ১৮৯৭ পৃঃ ৭
৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ৫ সেপ্টেঃ ১৮৯৭ পৃঃ ৬ এবং ২০ ফেব্রুঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৭ এবং আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ৮০ এবং শরিফুদ্দিন, ঢাকা *পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার* পৃঃ ১৬৮।
৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ফেব্রুঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৭
৯৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুন ১৮৯৮ খ্রীঃ
১০০। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার*, পৃঃ ১৬৮।
১০১। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ফেব্রুঃ ১৮৯৭ পৃঃ ৬
১০২। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউঃ* পৃঃ ১৬৯।
১০৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুলাই ১৮৯৮ পৃঃ ৩
১০৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জুলাই ১৮৯৮ এবং ৭ আগস্ট পৃঃ ৬
১০৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ সেপ্টেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৬
১০৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ নভেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৬
১০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ এপ্রিল ১৮৯৯ খ্রীঃ পৃঃ ৭
১০৮। ঢাকা প্রকাশ, ৮ এপ্রিল ১৯০০ পৃঃ ৭
১০৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুঃ ১৯০১ পৃঃ ৭ এবং ৬ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৬
১১০। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩
১১১। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ মার্চ ১৯০৩ পৃঃ ৪
১১২। ঢাকা প্রকাশ, ১৭মে ১৯০৩ পৃঃ ৩
১১৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ এপ্রিল ১৯০৩ পৃঃ ৩, ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল যে, নওয়াবদের কৃপা না হলে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নামে অভিহিত হবার যোগ্যতাই অর্জন করতো না এবং তাঁদের দয়া না হলে এ নগরী সম্রান্তদের বসোপযোগী হতো কিনা সন্দেহ। সেই বংশের বর্তমান নেতার হস্তক্ষেপ ঢাকার সৌভাগ্যই হবে। ঢাকা প্রকাশ, ৩মে ১৯০৩।
১১৪। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট..* পৃঃ ১৭৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪
১১৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জুলাই, ৬ ও ২০ আগস্ট ১৯০৫ পৃঃ ৩
১১৬। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৯০৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট...* পৃঃ ১৭৫
১১৭। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা-পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫। কিন্তু পরবর্তীতে কাজটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। মীরনজল্লা (বর্তমান বাংলাদেশ মাঠ) থেকে এক ন্যারোগেজ রেল লাইন শাহবাগ, মনিপুরীপাড়া হয়ে মীরপুর পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে তৈরী বড় বড় গর্তে মল ঢেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো। একাজের জন্য একটি মেথর পল্লীও বসানো হয়েছিল। সত্যেন সেন,শহরের ইতি কথা, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪ পৃঃ ১২১।
১১৮। কিন্তু হিন্দুদের কেউ তখন মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হতে রাজী হননি। মুসলমানদের পক্ষ থেকে খাজা মোঃ ইউসুফজান, খাজা মোঃ আজগর ও খাজা মোঃ আলিমের নাম প্রস্তাব করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জুন ১৯০৬ পৃঃ ৩
১১৯। ১৯১৪ সালে ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে চৌধুরী মোঃ ইসমাইল খাঁ, বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩।
১২০। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ নভেঃ ১৯০৬ পৃঃ ৩।
১২১। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ডিসেঃ ১৯১১

Dhaka University Institutional Repository

১২২। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ও ১২ নভেম্বর ১৯০৫ পৃঃ ৩

১২৩। ঢাকা প্রকাশ, ৯ ও ১৬ ডিসেঃ ১৯০৬ পৃঃ ৩। অবশ্য এক শ্রেণীর হিন্দুরা- এভাবে প্রভাবিত হয়ে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিঃ বোর্ড সর্বসম্মতক্রমে অভিনন্দনপত্র দেয়ার বিরূপ সমালোচনা করে প্রতিবাদ সভা করে। (ঢাকা প্রকাশ, তাং ঐ)

১২৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৬মে ১৯০৯ পৃঃ ৩

১২৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৩মে ১৯০৯ পৃঃ ৪

১২৫(ক)। আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত ২ খন্ড পৃঃ ৭৬

১২৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ এপ্রিল ১৯১১ পৃঃ ৩

১২৬(ক)। আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৩৩

১২৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ জুন ১৯১২ পৃঃ ৩

১২৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৩

১২৯। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ডিসেঃ ১৯১৩ পৃঃ ৩

১২৯(ক)। আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৩৩

১৩০। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৩ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট..* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮

১৩১। ১৯১২ খ্রীঃ যুক্তবংগের গভঃ লর্ড কারমাইকেল উক্ত সভাকক্ষ পরিদর্শনকালে আগ্রহভরে নওয়াবের তৈলচিত্রটি দেখেন। তিনি তাঁর সহকারী মিঃ মার্ককে নওয়াব সাহেবের সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং নওয়াবের ভুয়সী প্রশংসা করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জুলাই ১৯১২ পৃঃ ৪।

১৩২। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুলাই ১৯১৪ পৃঃ ৩

১৩৩। ঢাকা প্রকাশ, ১লা নভেঃ ১৯১৪ পৃঃ ৩

১৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ডিসেঃ ১৯১৪ পৃঃ ৩

১৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেঃ ১৯২৩ পৃঃ ৩

১৩৬। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট...*পৃঃ ১৭৭

১৩৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ আগস্ট ১৯২৩ পৃঃ ৩-৪

১৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ৮ আগস্ট ১৯১৫ পৃঃ ৪। নাজির হোসেন বলেছেন, তিনি ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* পৃঃ ৫৭৩।

১৩৯। ১৯১৮ খ্রীঃ নভেঃ মাসে খাজা মোঃ ইউসুফ এবং খাজা মোঃ শাহাবুদ্দিনকে সরকার ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত করেন (ঢাকা প্রকাশ, ১০ নভেঃ ১৯১৮ পৃঃ ৩ এবং আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৩০) খাজা শাহাবুদ্দিন পরবর্তীকালে ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কটি নির্মিত হয়। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ১৮৮।

১৪০। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেঃ ১৯২৩ পৃঃ ৩

১৪১। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ মার্চ, ১৯২৫ পৃঃ ৩

১৪২। নাজিমুদ্দীনের পিতা খাজা নিজামুদ্দিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রারম্ভযুগে একজন কমিশনার ছিলেন। আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ৮০

১৪৩। মাহেনও, ডিসেঃ ১৯৬৪ পৃঃ ৫১ এবং এস.এম.ইকরাম, *মডার্ণ মুসলিম ইন্ডিয়া এন্ড দি বার্থ অব পাকিস্তান,* ২য় সংস্করণ ১৯৬৫ পৃঃ ২২৪

১৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩মে এবং ২৬ জুলাই ১৯২৫ পৃঃ ৩

১৪৫। স্টেটসম্যান থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ১৭৩।

১৪৬। আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ৮৬, ১৩২ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৭৫ এবং ৫৮৫ এবং *বায়োগ্রাফিক্যাল এনসাইক্লোপেডিয়া অব পাকিস্তান, লাহোর* ১৯৬৯-৭০, পৃঃ ১৪-১৫।

১৪৭। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০ এবং শরিফুদ্দিন, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪৮, শামসুর রাহমান, *স্মৃতির শহর,* প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৭৯ পৃঃ ৫৯-৬১। বিশ শতকের ষাটের দশকেও পুরানো ঢাকার কোন কোন স্থানে ভিস্তিওয়ালারদের দেখা যেতো। ঢাকার ভিস্তিদের সুককা বলা হতো এবং তাদের বসবাসকৃত মহল্লাকে বলা হতো 'সিক্কাটুলী' যে নামটি এখনো বর্তমান। মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ২৯৮ এবং আজিমুশ্মান, *ঢাকা, রোমান্স,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

১৪৮। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২মে ১৮৬৯ পৃঃ ৮৮-৮৯।

১৪৯। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

১৫০। আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১০৯ এবং সি. ই. বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২৯-৩০।

১৫১। বার্ট, *টুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২, ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস অব বেংগল,* পৃঃ ২০০ এবং শরিফুদ্দন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২ এবং বাকল্যান্ড সি. ই. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২৯।

১৫২। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দানে কাশ্মীরীয়াহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৯-৪৩ থেকে উদ্ধৃত- আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৩২

১৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল, ১৮৭২ পৃঃ ৪২

১৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল, ১৮৭২ পৃঃ ৪২ এবং ১০ এপ্রিল, ১৯১০ পৃঃ ৪; খাজা আহসানুল্লাহ উক্ত কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০২। জলের কলের পরিকল্পনাটা মূলত আব্দুল গণিরই মনোৎসারিত বিষয় ছিল, কারণ-১৮৭৮ খ্রীঃ জলের কল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলে ছিলেন, " ... তৎস্মরানার্থ লোক সমূদয়ের উপকারার্থে প্রথমত-দাতব্য চিকিৎসালয়, কলেজ, সাধারণের নিমিত্ত সরাই, অনাথ নিবাস, সাধারণ পুস্তকালয় প্রভৃতির কোন একটি স্থাপনের অভিলাষ হয়। কিন্তু তাতে নগরের সর্ব সাধারণের উপকার হবে না এবং তাতে ঐ প্রকার অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান এখানে আছে, তার ক্ষতি হবে মনে করে

Dhaka University Institutional Repository

যাতে সকলের জীবনের প্রধান একটি আবশ্যকীয় দ্রব্য (জল) পরিষ্কাররূপে বিনাব্যয়ে পেতে পারে, তার প্রতি আমার অন্তকরণ আকৃষ্ট হয়। (ঢাকা প্রকাশ, ২৬মে, ১৮৭৮ পৃঃ ১২৫)

১৫৫। ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস অব বেংগল,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ পৃঃ ২৮৩ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ১৮২। উক্ত ৫০ হাজার টাকায় প্রমেসরি নোট কেনা হয়। যা থেকে পৌরসভা বছরে দুই হাজার টাকা পেত। মামুন, *ইতিহাসের খেরো খাতা,* দৈনিক জনকন্ঠ ১৯ জানুঃ ১৯৯৬। এরূপ বিনামূল্যে পানি সরবরাহের ঘটনা এদেশে দ্বিতীয়টি আর নেই। এর অনেক পরে ১৮৯১ খ্রীঃ ময়মনসিংহে রাজা সূর্যকান্ত আচার্য জলের কল স্থাপন করলে- সেখানে বাড়ী প্রতি ১০ টাকা করে কর ধার্য্য করা হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ উক্ত কর আরো বাড়ানো হয়। (ঢাকা প্রকাশ, ৬ আগস্ট, ১৮৯১ পৃঃ ৬ এবং ৭ মে ১৮৯৩ পৃঃ ৫-৬ এবং ২২ জুলাই ১৮৯৪ পৃঃ ৪-৬।

১৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪। এর আগেই সরকার জলের কলের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হচ্ছে, সে বিষয়ে কমিশনারের নিকট এক রিপোর্ট চান (ঢাকা প্রকাশ, ২ জুন ১৮৭২ পৃঃ ১২৭) উল্লেখ্য, কমিশনার সিম্পসন সাহেব ১৮৭১ সালেই নওয়াবের অর্থদানের কথা সরকারকে অবহিত করেছিলেন। মামুন, *ইতিহাসের খেরোখাতা,* দৈনিক জনকন্ঠ ১৯ জানুঃ ১৯৯৬ পৃঃ ১১।

১৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ২২ সেপ্টেঃ ১৮৭২ পৃঃ ৩১৯

১৫৮। প্রথম খন্ড জমিঃ ১ একর ৪ রুড ৫ পৌণ পরিমাণ। অবস্থানঃ লালবাগগামী রোডের লাগ থেকে দক্ষিণে বুড়ীগংগার তীর পর্যন্ত। দ্বিতীয় খন্ড জমিঃ ১ একর ৩ রুড ৩৫ পৌণ পরিমাণ। লালবাগগামী রোডের লাগ থেকে উত্তরে উমাকান্ত কবিরাজ ও রাজকৃষ্ণ বাবুর ভূমি পর্যন্ত। ঢাকা প্রকাশ, ১১ মে ১৮৭৩ পৃঃ ১০৩।

১৫৯। এবারই সর্বপ্রথম একজন ব্রিটিশ ভাইসরয় ঢাকা শহর ভ্রমণে আসেন, শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* পৃঃ ২০২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩ আগস্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৪৭ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১।

১৬০। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই এবং ৩ আগস্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৩৩-৩৪ এবং ২৪৬

১৬১-১৬২। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ আগস্ট ১৮৭৪, পৃঃ ২৭০-৭১।

১৬৩। এ প্রেক্ষিতে বুড়ীগংগা নদী থেকে শহরের দূরবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে নওয়াবপুর এলাকার কথা বিবেচনা করার জন্য নওয়াবের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা করে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা একটি খবর প্রকাশ করে। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৩৯৯। প্রথমবার পাইপ বসানোর কালেই চকবাজার ও মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং কোতয়ালী থানা এলাকা, নারিন্দা রোড হয়ে লোহারপুল পর্যন্ত এবং অপরশাখা জেলখানা ও পাগলাগারদে সংযোগ দিয়েছিল। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৩।

১৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ফেব্রুঃ ১৮৭৭ পৃঃ ৫৯১ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪

১৬৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ফেব্রুঃ ১৮৭৭ পৃঃ ৫৯১, কাজের মন্থরগতির কারণে বেংগল টাইমস পত্রিকাও এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে অলস, অযোগ্য ইত্যাদি বলে তীব্র সমালোচনা করেছিল। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৩।

১৬৬। আজিমুশ্শান লিখেছেন, সরকার ৯০ হাজারের কিছু বেশি টাকা একাজে ব্যয় করেন (আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০) বি.সি.এলেন ১,৯৫,০০০/- টাকার মধ্যে নওয়াবের দানকৃত এক লক্ষ টাকার অতিরিক্ত খরচ সরকার বহন করে বলে যে তথ্য দিয়েছেন, তাও সঠিক নয় (বি.সি.এলেন, *ডিঃ গেজেটিয়ার, ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯) মিঃ এলেনকে অনুসরণ করে যতীন্দ্র মোহন ও কেদার নাথ তাঁদের গ্রন্থে অনুরূপ তথ্য লিখেছেন (যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৪-৮৫ এবং কেদার নাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৫) ক্যাম্পবেল বলেন, মূল দানকৃত অর্থ ৫০ হাজার অপ্রতুল হলে আঃ গণি কয়েক কিস্তিতে বাড়িয়ে দানের টাকা ২ লক্ষ পর্যন্ত উন্নীত করেন, (ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০) প্রফেসর শরিফুদ্দিন লিখেছেন, মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১,৯৫,৩৫০/- টাকা এবং নওয়াবের দানকৃত ১ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ৯৫,৩৫০/- টাকা বাংলা সরকার বহন করেন। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৩। অবশ্য পরিশেষে জলের কল বাবদ নওয়াবের মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিলেন- আড়াই লক্ষ টাকা। *পুরাতন নথি,* অর্থদানের তালিকা দ্রঃ এবং বাকল্যান্ড প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২৯।

২৬৭। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০ এবং বি.সি. এলেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯ এবং হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬১

১৬৮। বি.সি.এলেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪। প্রথমদিকে দিনে মাত্র ৩৫ হাজার গ্যালন ফিল্টার পানি সরবরাহ করা হতো, যা ১৮৮৩ খ্রীঃ ৯৫ হাজার গ্যালনে উন্নীত করা হয় বলে প্রফেসর শরিফুদ্দিন আহমেদ যে তথ্য দিয়েছেন, তা সঠিক নয়, শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৩-৬।

১৬৯-৭০-৭১। ঢাকা প্রকাশ, ২৬মে ১৮৭৮ পৃঃ ১২৫-২৭।

১৭২। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নওয়াব আব্দুল গণির ইংরেজীতে দেয়া বক্তৃতার ভাবানুবাদ ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ করা হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ২৬মে ১৮৭৮ পৃঃ ১২৫। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "ঢাকা শহরবাসীকে রোগব্যাধি মহামারী থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে নওয়াব আব্দুল গণি, পানির কল ব্যবস্থা প্রবর্তনে মনস্থ করেন। এতদুদ্দেশ্যে অর্থ- সংগ্রহের জন্য তিনি ১৮৭৪ খ্রীঃ জানুঃ মাসে ঢাকার সব গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তিদেরকে ডেকে তাঁর বাসভবনে এক বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে ভাওয়ালের রাজা কালী নারায়ণ, জমিদার রাজাবাবু কাশিমপুর, পালিয়া ও পূবাইলের জমিদার, রামকুমার বসাক, রূপলাল দাস প্রমুখ ধনী ব্যক্তিরা যোগ দেন। এছাড়া রাজলক্ষী ও আমীরজান নাম্নী দু'জন বাইজীও ঐ সভায় যোগ দেন। নওয়াব আব্দুল গণি প্রস্তাব করেন যে, ঢাকা শহরে কলের জল সরবরাহের জন্য দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহে একটি কল্যাণ তহবিল খুলে অর্থ সংগ্রহ করা দরকার। আপনারা কে কত চাঁদা দেবেন বলুন। সবার নীরবতা ভেংগে প্রথমে রাজলক্ষী বাইজী ৫ শত টাকা দানের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত গণ্যমান্যদের কেউই বাইজীর দেয়া প্রস্তাবের চেয়ে বেশী পরিমাণে অর্থদানে রাজী না হওয়ায় আশাহত ও ক্ষুব্ধ নওয়াব আব্দুল গণি তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আপনাদের অর্থদানের কোন প্রয়োজন নেই। পানির কলের জন্য টাকা যা লাগে আমি একাই দেব। একাজে আব্দুল গণির খরচ হয় দেড়লক্ষ টাকা এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ গভঃ জেনারেল নর্থব্রুক এসে জলের কল উদ্বোধন করেন।" (সিরাজুল ইসলাম, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ১৮ আগস্ট ১৯৭৮ পৃঃ ১৯-২৬) মুনতাসীর মামুনও তাঁর লেখায় এই কাহিনীটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন (মুনতাসীর মামুন, ঢাকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ পৃঃ ৪৬ এবং হৃদয়নাথের ঢাকা শহর, ১ম প্রকাশ ঢাকা ১৯৮৫ পৃঃ ৩৭ দ্রঃ) অথচ আমাদের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৭৪ খ্রীঃ নয় বরং ১৮৭১ খ্রীঃ প্রিন্স-অব-ওয়েলস এর রোগমুক্তি উপলক্ষে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা ঢাকার কোন স্থায়ী কল্যাণ কাজে দান করেন। পরে তা দ্বারা জলের কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং তাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে তিনি ও তাঁর পুত্র দানের টাকা তিনগুণ বৃদ্ধি করেন। প্রথমবার ৫০ হাজার টাকা দানের পর তা দ্বারা জলের কল তৈরীর সিদ্ধান্তে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রফেসর ইসলামের বর্ণনানুযায়ী কোন বৈঠক করেছিলেন বলেও জানা যায় না। এছাড়া ১৮৭৮ খ্রীঃ গভঃ জেনারেল নর্থব্রুক জলের কল উদ্বোধন করেননি বরং তিনি কেবল ১৮৭৪ খ্রীঃ এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ জলের কলের উদ্বোধন করেন, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার এফ.বি.পিকক সাহেব।

১৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মে ১৮৭৮ পৃঃ ১২৫। ঐতিহাসিক যতীন্দ্র মোহন ও কেদারনাথ বলেন, ১৮৭৮ খ্রীঃ জলের কল খোলার পর প্রথম দিকে ফিল্টার না করেই শহরবাসীদের কলের জল প্রদান করা হয়। পর বছর শহরের কেবল মধ্যভাগে ফিল্টার জল প্রদান করা হয়। তারও পরের বছর থেকে লোহার পুল পর্যন্ত বড় বড় রাস্তাগুলোতে ফিল্টার বা পরিস্কার জল প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তখনো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকা ইতিহাস,* ১ম খন্ড পৃঃ ২৮৪ এবং কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৫

১৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেঃ ১৮৮০।

১৭৫। কেদার নাথ, *ঢাকা বিবরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৫। উল্লেখ্য, ১৯০২ খ্রীঃ আগস্ট মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর বরিশাল জমিদারি অঞ্চল পরিদর্শন কালে বরিশাল শহরে জলের কল স্থাপনের মোট খরচের শতকরা ৩০ ভাগ বহনের প্রতিশ্রুতি দেন (ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগষ্ট ১৯০২ খ্রীঃ) নওয়াবের অনুরোধে ঢাকার কমিশনার মিঃ রিড বরিশালে জলের কল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হন (ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুলাই ১৯১০ পৃঃ ৩) ৯মার্চ ১৯১২ খ্রীঃ পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট বরিশালের জলের কল উদ্বোধন করেন, ঢাকা প্রকাশ, ২৬মে ১৯১২ পৃঃ ৪২

১৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেঃ ১৮৭৫ পৃঃ ৪১৬

২৭৭। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১।

১৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুঃ ১৮৭৬ পৃঃ ৪৬১-৬৩

১৭৯। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ১৮৩

১৮০। অত্র গ্রন্থের পৃঃ৮৮দ্রঃ। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ২৩৯

১৮১। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৩, ১৮৩।

১৮২। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০ এবং বাকল্যান্ড, *ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফী, লন্ডন*-১৯০৬ পৃঃ ২৩৫

১৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ২ জুন ১৮৭৮ পৃঃ ১৪০ এবং ২৬মে ১৮৭৮ পৃঃ ১২৫।

১৮৪। ঐ আমলে দৈনিক ২ লক্ষ গ্যালন পানি অর্থাৎ শহরের জনপ্রতি গড়ে মাত্র আড়াই গ্যালন পানি সরবরাহ করা হতো। অথচ একই সময় কলকাতায় জনপ্রতি সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ ছিল ৪০ গ্যালন, শরিফুদ্দিন, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট.. পৃঃ ১৬৩।

১৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ নভেঃ ১৮৮২ এবং শরিফুদ্দিন, ঢাকা পৃঃ ১০৪। জলের কলের এমন দুদর্শার সময়ে সেটার উন্নতি না করে নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৮৮২ খ্রীঃ ওয়েলসের যুবরাজের কলকাতা আগমণের স্মরণে সেথায় স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তিনি ঢাকার উন্নয়নের বদলে কলকাতার ধর্মতলা ও প্রেস স্কয়ারে দুটি জলের ফোয়ারা নির্মাণ করায় ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা তাঁর সমালোচনা করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৮মে ১৮৮২ পৃঃ ১২৮।

১৮৬-১৮৭। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* পৃঃ ২০৪-২০৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৩ নভেঃ ১৮৯০ পৃঃ ৫

১৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ফেব্রুঃ ১৮৮৩ পৃঃ ৫৩৫। এমতাবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটি জলের কল রক্ষণাবেক্ষণ ফান্ড থেকেই অর্থ তুলে কলের প্রয়োজনীয় কাজ করতে মনস্থ করেন। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৫।

১৮৯। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৪ ও কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৫। ঢাকা প্রকাশে মাত্র ৬ হাজার টাকা দানের কথালেখা হয়েছে, ঐ ১০ এপ্রিল ১৯১০ দ্রঃ

১৯০। আজিমুশ্যান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪

১৯১। *পুরাতন নথি,* অর্থ দানের তালিকা দ্রঃ এবং আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৮ এবং সি.ই.বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২৯। অতপর নওয়াবের শাহবাগ গার্ডেনেও জলের কলের বিস্তার হয়।

১৯২। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেঃ ১৮৮০ পৃঃ ৪২৮ এবং ১ জুন ১৮৮৪ পৃঃ ১৩৫। ১৮৮৬ খ্রীঃ বাবু মদন মোহন বসাকের অর্থানুকূলে নওয়াবপুর ক্রসিং থেকে জোড়পুল পর্যন্ত পানির পাইপ বর্ধিত করা হয়। আজিমুশ্যান,*সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৬

১৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৬ ও ২৩ নভেঃ ১৮৯০ পৃঃ ৫-৬ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ এবং যতীন্দ্রমোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৪ (শরিফুদ্দিন ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ১,৫০,০০০ লিখেছেন যা সত্য নয়, শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৩)।

১৯৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৬

১৯৫। আজিমুশ্যান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০। ১৮৯০ খ্রীঃ নিরীক্ষায় দেখা যায় জেলখানা ও পাগলা গারদে দৈনিক ৬ হাজার গ্যালন পানি খরচ হয়, যা নির্ধারিত ব্যয় থেকে অত্যধিক বিধায় তাদের ট্যাক্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩২ টাকা থেকে ১৯৮ টাকায় এবং ১৮ টাকা থেকে ১০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া রেলওয়ে থেকে বার্ষিক ৩০০ টাকা ট্যাক্স পাওয়া যেত। উল্লিখিত কারণে ১৮৯০ খ্রীঃ জলের ট্যাক্স মোট ২২০০ টাকা বৃদ্ধি পায় (ঢাকা প্রকাশ, ২৩ নভেঃ ১৮৯০ পৃঃ ৬)

১৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৭ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউঃ* পৃঃ ১৬৩)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১২। এর পরেও পানি বিতরণের পরিমাণে তারতম্য দেখা যায়। ১৮৯৯-১৯০০ সালে মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের এক রিপোর্টে জানা যায়, ঐ সময় দৈনিক গড়ে ৩,৩৪,৭৭০ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হতো। (*সিভিক বডি, ঐ* পৃঃ ১১১) ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯০৫ খ্রীঃ পানি সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩,৪০,০০০ গ্যালন (ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪)

১৯৮। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০। কিন্তু কেদারনাথ লিখেছেন, ১৮৯২ থেকে ১৯০১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রতিবছরে গড়ে ১,৬০,০০০/-টাকা করে জলের কলে ব্যয় হচ্ছে। কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৬।

১৯৯। বি.সি.এলেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯ এবং আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১০-১১ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪। ১৮৯৫ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লার দানকৃত ১৫ হাজার টাকায় বুড়ীগংগায় কয়েকটি স্পার নির্মাণ করে নাব্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৭

২০০। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেঃ ১৯০০ পৃঃ ৬-৭।

২০১। ঢাকা প্রকাশ, ৩মে ১৯০৮ পৃঃ ৪ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪ এবং শরিফুদ্দিন, ঢাকা *পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৩ এবং এলেন.বি.সি পৃঃ ১৭৯।

২০২। বি.সি.এলেন, *ডিঃ গেজেটিয়ার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯।

২০৩। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১১।

২০৪। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল, ১৯১০ পৃঃ ৪।

২০৫। প্রস্তাবিত ট্যাক্স ১৯১০ খ্রীঃ কার্যকরী হয় এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আমল শুরু হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। নাজীয়া খানম, *প্রভিশন অব সিভিক এমেনিটিস ইন ঢাকা, ঢাকা-পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪২ এবং হৃদয়নাথ,*রিমিনিসেন্স,*প্রাগুক্ত পৃঃ ৬১

২০৬। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জুন ১৯০৮ চেয়ারম্যানের রিপোর্ট দ্রঃ

২০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জুন ১৯০৮ পৃঃ ৩ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪

২০৮। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪

২০৯। ঢাকা প্রকাশ, - *ঐ* -

২১০। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জানুঃ ১৯০৯ পৃঃ ৩, মিউনিসিপ্যালিটি ঋণের টাকা ২৬ বছরে শোধ করতে চেয়ে আবেদন করেছিল। বি.সি.এলেন, *ডিঃ গেজেটিয়ার,* ঢাকা পৃঃ ১৭৯।

২১১। নাজিয়া খানম বলেছেন, ঐ সময়ে ১৯ মাইল পানির পাইপ বসানো হয়েছিল, ঢাকা- *পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৪। এ ছাড়াও ঐ সময় নতুন শহর ও কোতোয়ালীর নিকট ২টি ব্যালসিং রিজার্ভার তৈরীর জন্য সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য চাওয়া হয় (ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪)

২১২। নাজিয়া খানম, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৪।

২১৩। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪

২১৪। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪

২১৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জানুয়ারী এবং ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ পৃঃ ৩।

২১৬। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৩

২১৭। তায়েশ, *তওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ৬৩ এবং বার্ট, *রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮-৯ ও ১৩৫।

২১৮-১৯। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১৩ এবং হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬১-৬২।

২২০। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৭০ পৃঃ ৪৩৬ এবং মোথরাম, সাপ্তাহিক হোলিডে, ২৪ জানুঃ ১৯৮২ খ্রীঃ

২২১। তৈফুর, ঢাকা প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৭ এবং মোঃ আলমগীর, ঢাকায় বিজলী বাতিদানে ঢাকার নওয়াব, ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অফিসার সমিতির পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৯৯৬ পৃঃ ৪৮-৫৫

২২২। *মারছিওনেস অব-ডাফেরিন-এন্ড আভা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৫ ও ৪০০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ পৃঃ ৩।

২২৩। কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৬ এবং যতীন্দ্র মোহন রায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৬।

২২৪। দি ইংশিলম্যান, মার্চ ৪, ১৮৮৭ থেকে উধৃত-আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১৩।

২২৫। বেংগল টাইমস, *ঢাকা,* ১৮৮৯ থেকে উধৃত-মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮, তবে এখানে প্রফেসর মামুনের বর্ণিত খুশীর অর্থ বৈদ্যুতিক বাতি না হয়ে গ্যাসালোক প্রদান হবে।

২২৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর ১৮৮৮ পৃঃ ৩ ও ৪।

২২৭। ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করে যে এজন্য মিউনিসিপ্যালিটির যে অর্থ সাশ্রয় হবে, তা তারা স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করতে পারবে। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ মার্চ ১৮৯১ পৃঃ ৩।

২২৮। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৪।

২২৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ নভেম্বর ১৮৯০ পৃঃ ৬।

২৩০। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ পৃঃ ৫। ১৮৯৬ সালে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ইশ্বরচন্দ্র শীলের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে নওয়াব পরিবারের তিনজন কমিশনার পদত্যাগ করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১২ ও ২০ জুলাই ১৮৯৬। এজন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর প্রস্তাবিত গ্যাসালোক দানের টাকা প্রদানে অস্বীকৃত থাকেন। শরিফুদ্দিন, *মিউনিঃ পলিটিক্স, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৬।

১৩১। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ জুলাই ১৮৯৮ পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৩২। এ ঘোষনা শুনে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল যে, ১৫ বছর আগে নওয়াব আব্দুল গণির কে. সি. এস. আই. খেতাব প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে গ্যাসালোক দেয়ার যে কথা হয়েছিল, তা আজো বাস্তবায়িত না হওয়ায় তড়িতালোক দেয়ার জন্য নওয়াবের ঘোষনায় লোকের কোন আস্থা নাই (ঢাকা প্রকাশ, ২৮ অক্টোবর ১৯০০ পৃঃ ৬) উল্লেখ্য ঐ একই সময় ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য নাসিরাবাদ শহরে তড়িতালোক দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ অক্টোবর ১৯০০।

২৩৩। ঢাকা প্রকাশ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯০০ পৃঃ ৬ (খোদেজা বেগমের পূর্ব স্বামীর নাম ছিল ভোলা মিয়া) *পুরানো নথি*, প্রাগুক্ত বংশ লতিকা দ্রঃ।

২৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ৯ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০ পৃঃ ৬ এবং *পুরানো নথি*, বংশ লতিকা দ্রঃ।

২৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০ পৃঃ ৬। উল্লেখ্য, নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রথম বিবাহের সময় সারা ঢাকা শহরের বাড়িতে বাড়িতে গান বাজনার ব্যবস্থা করা হয়। নওয়াব বাড়িতে ৭ দিন ধরে ভোজনাদি চলে। ১৮৭৬ খ্রীঃ নওয়াব তাঁর পুত্রের সুন্নতে খাৎনা উপলক্ষেই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১ মে ১৮৭৬ পৃঃ ৮৬-৮৭।

২৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃঃ৬-৭ এবং ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ পৃঃ ৩-৪, নাজির হোসেন তাঁর *কিংবদন্তীর* ঢাকা গ্রন্থে দানের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে একাজে নওয়াবের মোট সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

২৩৭। *দি বেংগল টাইমস*, ৫ মার্চ, ১৯০২ খ্রীঃ এবং *পুরানো নথি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২৬, ৩১।

২২৮-২২৯। *পুরানো নথি*, (নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত) প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২৬, ৩১। এবং মোঃ আলমগীর, ঢাকায় বিজলী বাতি দানে ঢাকার নওয়াব, ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১।

২৪০। *পুরানো নথি* (হিস্ট্রি অব দি ইলেক্ট্রিক ট্রাস্ট ফান্ড দ্রঃ) পৃঃ ডি-২৬-২৭, ৩১।

২৪১। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১১৪ এবং নাজিয়া খানম, *সিভিক এমেনিটিস, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৩

২৪২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ পৃঃ ৭ এবং মোঃ আলমগীর, ঢাকায় বিজলী বাতি দানে ঢাকার নওয়াব , প্রাগুক্ত ।

২৪৩। কেরোসিনের লাইট পোস্টগুলো যেসব রাস্তায় আলো নেই ঐসব স্থানে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক কমিশনারকে দেয়া হয়েছিল, ঢাকা প্রকাশ, ৬ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৬ এবং ঐ, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ পৃঃ ৭।

২৪৪। ঢাকা ইলেকট্রিক লাইট ট্রাস্টিজ-এর পক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিন কর্তৃক ৫ জুলাই ১৯০১ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মুনতাসির মামুন, ঢাকায় প্রথম (বিদ্যুৎ বাতি) প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭-৪৮।

২৪৫। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১১৪।

২৪৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ নভেম্বর ১৯০১ পৃঃ ৭।

২৪৭। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১১৪, ঢাকা প্রকাশ, ১ ও ৮ ডিসেম্বর ১৯০১ পৃঃ ৪ ও ৫। *দি বেংগল টাইমস*, ১১ ডিসেম্বর ১৯০১ এবং ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস অব বেংগল*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৮।

২৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেম্বর ১৯০১ পৃঃ ৫।

২৪৯। নাজিয়া খানম, *সিভিক এমেনিটিস*, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৩।

২৫০। কিন্তু এক সময় অর্থের প্রয়োজন হলে নওয়াব আহসানুল্লাহ ইলেকট্রিক ট্রাস্ট ফান্ড থেকে মাসে ৭৯২/-টাকা সুদের বিনিময়ে ১,৯০,০০০/- ঢাকা ঋণ গ্রহণ করলে, আহসান মঞ্জিল থেকে বিদ্যুৎ খরচ অনুযায়ী বিল প্রদানের নিয়ম চালু হয়। *পুরানো নথি*, ইলেকঃ ট্রাস্ট ফান্ড দ্রঃ পৃঃ ডিঃ ৩২।

২৫১। কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৬ এবং যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৬।

২৫২। মিডফোর্ড হাসপাতালে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য-বাবু রঘুনাথ দাস ১০০ টকা, নেহাপিট সাহেব ৫০০/-বাবু রূপলাল দাস ২৫০/-টাকা, কেসাটুর সাহেব ২০০/-টাকা, লালমোহন সাহা ১২৫/-টাকা, লেজারাস সাহেব ১০০/-টাকা, ডেয়ারউ-এন্ড কোং ১০০/-টাকা, ফিলম্যান সাহেব ১০০/-,কাজী জিয়াউদ্দিন ১০০/-,আলেকজান্ডার সাহেব ২৫/-এবং মাইকেল সাহেব ২৫/-টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন। (ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুন ১৯০২ পৃঃ ৫)।

২৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৩ এবং মোঃ আলমগীর, *ঢাকায় বিজলীবাতিদানে ঢাকার নওয়াব*, প্রাগুক্ত

২৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ নভেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৪।

২৫৫। দি বেঙ্গল টাইমস্, ৫ মার্চ ১৯০২ খ্রীঃ।

২৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৪।

২৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জুন ১৯০৭ পৃঃ ৩।

২৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩ এপ্রিল ১৯০৪ পৃঃ ৩। মিঃ মেকেঞ্জী নামক এক ইংরেজ ১৯০৫ খ্রীঃ ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর কর্তাব্যক্তি ছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জানুয়ারী ১৯০৫ পৃঃ ৩।

২৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুলাই ১৯১০ পৃঃ ৩।

২৬০। *পুরানো দলিল*, প্রাগুক্ত, উক্ত জেনারেটরটি কয়লা দ্বারা পরিচালিত হতো।

২৬১। ১৯৪৭-৪৮ সনে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১১৪।

২৬২। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১১৪।

২৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ পৃঃ ৩।

২৬৪। বিডি. বসু, আমার ছেলেবেলা, কলকাতা-১৯৭৩ পৃঃ ১১০ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-নাজিয়া খানম, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৪

২৬৫। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৬৬। মাসিক মোহাম্মদী, ৮ বর্ষ ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩৪১ বাংলা পৃঃ ১২৩-২৪ এবং জাগরণ, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫ বাংলা পৃঃ ১২৭-২৮। এতিমখানাটি ১৯০১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে নাজির হোসেন যে তথ্য দিয়েছেন তা সত্য নয়। কিংবদন্তী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬০। উল্লেখ্য, উক্ত এতিমখানায় স্থাপনকৃত একটি শিলালিপিতেও এর স্থাপনের তাং ১৯০৯ সাল দেখা যায়।

২৬৭। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৩-২৪ এবং জাগরণ, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫ পৃঃ ১২৭-২৮। উল্লেখ্য, ঢাকায় ঐ আমলে আরেকটি এতিমখানা ছিল, 'হিন্দু অনাথ আশ্রম' যা কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দুর প্রচেষ্টায় ১৯০৭ খ্রীঃ প্রতিষ্টিত হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ৪ আষাঢ়, ১৩৩৪ বাংলা।

২৬৮। মোহাম্মদী, ঐ ৮ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩৪১ বাংলা।

২৬৯। *পুরানো দলিল*, প্রাগুক্ত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।

২৭০। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬১ । লালবাগের একটি ভাড়া বাড়ীতেই প্রথমে এতিমখানাটির অগ্রযাত্রা হয় বলে প্রফেসর আবদুল্লাহ যে তথ্য দিয়েছেন, তাও সঠিক নয়। আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৮।

২৭১। মোহাম্মদী, ৮ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩৪১ বাংলা পৃঃ ১২৪। নাজির হোসেন লিখেছেন, নওয়াব সলিমুল্লাহ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ায় এতিমখানার ব্যয় নির্বাহে অসুবিধা দেখা দিলে; আজিমপুর গোরেশহীদ মসজিদের নীচতলায় একসময় এতিমদের রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে সেখানেই স্থায়ীভাবে এতিমখানাটি পুনস্থাপন করা হয়। মসজিদের নীচের অংশ সরাইখানার মত ব্যবহারের জন্য আগেই নির্মিত ছিল এবং সেখানে এতিমদের রাখতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। তিনি আরো বলেন, এ সময়েই আবুল খায়রাত রোডের ঐতিহাসিক তারা মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিমের বাড়ীতে এতিম বালিকাদের রাখা হয়েছিল। ঐ বাড়ীটা আজো এতিমখানার সম্পত্তি হিসেবেই রয়েছে। (নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬১)

২৭২। মোহাম্মদী, ঐ ১৩৪১ বাংলা।

২৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ১০ মে ১৯১৪ পৃঃ ৩।

২৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, ১৯১৯ খ্রীঃ ঢাকার সাবেক কমিশনারের স্ত্রীর উদ্যোগে কার্জন হলে ধ্রুব নাটকের অভিনয় থেকে উঠা অর্থ থেকে ৫০০ টাকা উক্ত এতিমখানায় দেয়া হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ চৈত্র ১৩২৫ বাংলা (১৯১৯) পৃঃ ৩।

২৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ এপ্রিল ১৯১৬ পৃঃ ৩।

২৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ২১ মার্চ ১৯২০ পৃঃ ৪।

২৭৭। চিত্রটি নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর ছেলে মরহুম খাজা লতিফুল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত।

২৭৮। মোঃ আঃ রউফ স্মরণিকা, স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা; ঢাকা ১৯৮৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৩৮।

২৭৯। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৮ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ৪৬২।

২৮০। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত ১৩৪১ বাং পৃঃ ১২৮। আবুয যোহা নূর আহমদ, ঐ তারিখে লর্ড কর্তৃক এতিমখানার উদ্বোধন করা হয় বলে যে তথ্য দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। নূর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯।

২৮১। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ আগস্ট ১৯২৬ পৃঃ ৪।

২৮২। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ আগস্ট ১৯২৬ পৃঃ ৪।

২৮৩। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৮।

২৮৪। আবুয যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬ ও৫৪ এবং আঃ রউফ, প্রাগুক্ত স্মরণিকা, উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৩৯ এবং মোহাম্মদী, ঐ পৃঃ ১২৮।

২৮৫। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৮ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ৪৬২।

২৮৬। আবুয যোহা নূর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৩৯।

২৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মে ১৯২৪ পৃঃ ৩।

২৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ১লা মার্চ ১৯২৫ পৃঃ ৩। ঢাকার মৌলবী বাজারস্থ বালিয়াদি লজে চৌধুরী ফরিদুদ্দিন আহম্দ সিদ্দিকী সপরিবারে থাকতেন। নূর আহম্মদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪। ১৯৬২ সালেও ঢাকা প্রকাশ অনুরূপ আরেকটি রিপোর্ট পেয়েছিল এবং সে অনুযায়ী সেটার সেক্রেটারীর ভূয়সী প্রশংসা করে খবর প্রকাশ করেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ৪ এপ্রিল ১৯২৬ পৃঃ ৩, অন্যদিকে ঢাকায় হিন্দুদের পরিচালিত অনাথ আশ্রমটির দুরাবস্থার কথা বলতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ জানায় যে, সেখানে বালক বালিকাদের থাকার অসুবিধা, এমনকি তাদের খেলার জন্য একটা পুতুলও নেই, ঢাকা প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৪ বাং, পৃঃ ৩।

২৮৯। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬২।

২৯০। আঃ রউফ, প্রাগুক্ত স্মরনিকা, উদ্বৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৩৯।

২৯১। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত ১৩৪১ বাং পৃঃ ১২৮।

২৯২। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ১৯২৬ পৃঃ ৩, এবং মোহাম্মদী ঐ পৃঃ ১২৮।

২৯৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬২। ওয়ার্ডগুলোর নাম হলোঃ-খাজা আলিমুল্লাহ ভবন, নওয়াব আবদুল গণি ভবন, স্যার আহসানুল্লাহ ওয়ার্ড, নওয়াব সলিমুল্লাহ ভবন, নওয়াব হাবিবুল্লাহ ওয়ার্ড, নওয়াব বেগম আসমাতুন্নেছা ওয়ার্ড প্রভৃতি।

২৯৪। মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত ১৩৪১ বাংলা, পৃঃ ১২৮।

২৯৫। মোহাম্মদী, ঐ ১৩৪১ বাংলা, পৃঃ ১২৮।

২৯৬। জাগরণ, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৫ বাং পৃঃ ১২৭-২৮।

২৯৭। মোহাম্মদী, ঐ ১৩৪১ বাংলা, পৃঃ ১২৮-২৯।

২৯৮। দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

২৯৯। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৬ এবং আজিমুশ্শান, ঢাকা-*রোমান্স,* পৃঃ ৩৮। তৈফুর সাহেব বিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, বুড়ীগংগা নদী দিয়ে নৌকায় চলার সময় লালবাগ থেকে বাবুবাজার খাল পর্যন্ত ঐ বাঁধের কিছু কিছু অংশ তখনও পরিস্কার দেখা যেত। (তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ২২৬ ফুট, নোট দ্রঃ) হাকিম হাবিবুর রহমানও বাল্যকালে বাঁধটি দেখেছিলেন, আসুদগান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮ দ্রঃ।

৩০০। ঢাকা- *ক্লে'র ডাইরী,* প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ২১ এবং ভূমিকা পৃঃ ১৫। প্রফেসর মামুন বলেন, মোগল আমলে নদীতীর বরাবর বাঁধ থাকলেও তার উপর দিয়ে ভ্রমণের জন্য পাকা রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা বোধ হয় বাকল্যান্ডের নিজস্ব ধারণা (মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮) তবে সত্যেন সেনের লেখা থেকে জানা যায় ১৮৬০ সালে শহরের গণ্যমান্য কিছুলোক উদ্যোগী হয়ে নদীতীরের বাড়ীর মালিকদের রাস্তা নির্মাণের জন্য তীর বরাবর কিছু জমি ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাদের দেয়া জমির উপরই বাঁধটি নির্মিত হয়। সত্যেন সেন, সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধ, *শহরের ইতিকথা,*ঢাকা,১৯৭৪ পৃঃ ১৩৩-৩৬। ক্লে লিখেছেন, বাঁধের জন্য বেসরকারীভাবে চাঁদা উঠানো হলে পরে সরকারও একাজে এগিয়ে আসেন। অতএব অনুমান করা যায় মিঃ বাকল্যান্ড হয়তো স্থানীয় উদ্যোগীদের কাছ থেকেই বাঁধ নির্মাণের ধারণাটি পেয়েছিলেন এবং পরিকল্পনাটি তিনি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে কাজটি ত্বরান্বিত করেছিলেন।

৩০১-৩০২। ঢাকা প্রকাশ, ৮ আগস্ট ১৮৬৯ পৃঃ ২৫৬ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৩৭ এবং লোকনাথ ঘোষ পৃঃ ২৯০। অতএব উক্ত বাঁধ নির্মাণকাল ১৮৭৫-৭৬ খ্রীঃ বলে হৃদয়নাথ যে তথ্য দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয় (হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬২)

৩০৩। নওয়াব আব্দুল গণির অনুরোধ ভুট্টো হাজী বাঁধ নির্মাণে ৪ হাজার টাকা দান করেন, নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯০ ও ১৯৬

৩০৪। *ক্লে'র ডাইরী,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২১

৩০৫। অর্থ দানের তালিকা, প্রাগুক্ত ক্রমিক নং- ১১ দ্রঃ

৩০৬। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬২

৩০৭। ঢাকা প্রকাশ, ৮ আগস্ট ১৮৬৯ পৃঃ ২৫৬, ঢাকায় বাকল্যান্ডের স্বাস্থ্য টিকতে ছিলো না। এপ্রিল ১৮৬৭ খ্রীঃ চিরকুমার বাকল্যান্ড তিন মাসের ছুটি নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় স্বাস্থ্যোদ্ধারে গিয়েও তেমন উন্নতি হয়নি। শেষে ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ খ্রীঃ তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। নীলকর ওয়াইজ সাহেব তাঁর সাথে দেশে যান। ৯ সেপ্টেম্বর মিঃ সিম্পসন ময়মনসিংহ থেকে এসে ঢাকায় কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহন করেন। ক্লে'র ডাইরী, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৩২, ৪৩, ৪৫।

৩০৮। নওয়াব আব্দুল গণি উক্ত মেলা আয়োজনে ২ হাজার টাকা দান করেন। প্রদর্শনীর তৃতীয় দিবসে যে জাঁকালো অনুষ্ঠান হয়, তাতে মঞ্চোপরি নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ কমিশনারের পাশে বসেছিলেন। (ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেঃ ও ৮ ডিসেঃ ১৮৬৪ পৃঃ ৪২৭ ও ৪৫৯)

৩০৯। এরূপ অভিনন্দনপত্র নিতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাঁকল্যান্ড তা অফিসিয়ালী নিতে পারেননি। মামুন, ঢাকা পৃঃ ১৭৮।

৩১০। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৩।

৩১১-১২-১৩। ঢাকা প্রকাশ, ৮ আগষ্ট ১৮৬৯ খ্রীঃ ২৫৬

৩১৪-৩১৫ ও ৩১৮। সত্যেন সেন লিখেছেন, বাকল্যান্ড বাঁধ যখন তৈরী হয় তখন পূর্বদিকে করোনেশন পার্কের প্রান্তে এসে শেষ হয়েছিল। সত্যেন সেন, সদর ঘাটের বাঁকল্যান্ড বাঁধ, শহরের ইতিকথা, ঢাকা ১৯৭৪, পৃঃ ৮৬ এবং হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* পৃঃ ৬২। বর্তমান শতকের ষাটের দশকের শুরুতে প্রফেসর দানীও লিখেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাঁধটি উন্নয়ন করে নদী তীরের সমান্তরালে রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু তাও বাস্তবায়িত হয়নি। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬।

৩১৬। ঢাকা **প্রকাশ**, ২৫ আগস্ট ১৮৮৯

৩১৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৬

৩১৯। হৃদয়নাথ, *ঐ* পৃঃ ৬৩ এবং *ক্লে'র ডাইরী,* ফওজুল করিম কর্তৃক বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২১-২২। ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে ঢাকার মিউনিঃ চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ সদরঘাটে উক্ত পার্কের সাথে অভিষেক উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ডিসেঃ ১৯১১ এবং ২৫ নভেঃ ১৯০৬ পৃঃ ৩। ২৬ জুন ১৯২৬ কবি নজরুল উক্ত পার্কে কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। ঢাকা **প্রকাশ**, ২৭ জুন ১৯২৬ পৃঃ ৩| সেবার নজরুল বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে ঢাকা বিভাগে দুটো মুসলিম সীটের একটিতে স্বরাজ দলের একজন প্রার্থী হয়ে দাড়িয়ে হেরে যান। তাঁর দলের অন্য একজন প্রার্থী ছিলেন নওয়াব পরিবারের খাজা আঃ করিম (আঃ কাদির নজরুল প্রতিভার স্বরূপ ঢাকা-১৯৮৯ পৃঃ ৪৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- অনুপম হায়াত, দোলন চাঁপার হিন্দোল, বেচারাম দেউড়ীতে নজরুল) ১ম প্রকাশ ১৯৯৮ পৃঃ ৮।

৩২০। ঢাকা প্রকাশ, ১৯মে ১৮৯৫ এবং ২১ ডিসেঃ ১৯১৩ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, ঢাকার নওয়াবরা একদল ইউরোপীয় (পর্তুগীজ) ব্যান্ড পার্টি রাখতেন, যাঁরা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আহসান মঞ্জিলের নহবত খানায় বাদ্য বাজাতো। এছাড়াও নওয়াবের নির্দেশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এবং উচ্চ পদস্থ রাজ প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনার জন্য তাঁরা বাদ্য পরিবেশন করতো। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃ-৩২৬। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় অর্থাভাবে ব্যান্ড পার্টি বিদায় দেয়া হলে করোনেশন পার্কের বাদ্যও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সরকার ১৯১৩ সালে প্রতি সোমবার বিকেলে গুর্খাদেরকে উক্ত স্থানে ব্যান্ড বাজাতে বলেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ডিসেঃ ১৯১৩ পৃঃ ৩।

৩২১। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১১৪। কিন্তু নওয়াব শেষ পর্যন্ত ঢাকা শহরে তড়িতালোক দেয়ায় কাজটি হয়নি।

৩২২। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৯০ খ্রীঃ উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৮০।

৩২৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জুলাই ও ২০ আগস্ট ১৮৮২ পৃঃ ২৩৮ ও ২৬৮।

৩২৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ আগস্ট ১৯২২ পৃঃ ৩, ঐ সময় ঢাকা পিপলস্ এ্যাসোঃ এবং পূর্ববংগ জমিদার সভার সদস্যরাও তাঁর সাথে ছিলেন।

৩২৫। সত্যেন সেন, সদর ঘাটের বাঁকল্যান্ড বাঁধ, শহরের ইতিকথা, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৪ পৃঃ ১৩৩-৩৬ এবং ৮৬ মামুন, ঢাকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮০- ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৩২৫(ক) এবারই প্রথম কোন বড়লাট ঢাকা সফরে আসেন। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩ আগস্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৪৭ সি.ই.বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০১ এবং তৈফুর, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫ ফুট নোট দ্রঃ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ১১৩।

৩২৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ও ২৬ জুলাই ১৮৭৪ পৃঃ ২২১ ও ২৩৪। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুরু থেকেই নর্থব্রুক হলের সাথে সাধারণ পাঠাগার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। তাই কোন কোন লেখক পাঠাগারটি এতে অনেক পরে যুক্ত হয় বলে যে তথ্য দিয়েছেন-তা সঠিক নয়, দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ২৩৩ এবং মামুন, *ঢাকা,* ১৪২।

৩২৭। এছাড়া একাজে আরো যাঁরা উল্লেখযোগ্য দান করেন তাঁরা হলেন-রূপলাল ও রঘুলাল দাস ৫০০ টাকা, মোহনী মোহন দাস ১০০ টাকা, ভগবান চন্দ্র রায় চৌধুরী ২০০ টাকা, শ্রীনাথ রায় ৫০০ টাকা, প্রভাস চন্দ্র দাস ৪০০ টাকা, সি.এ. টমাস ১০০ টাকা, সুধেন্দ্র মোহন ৩০০ টাকা, মোহাম্মদ মীর্জা ২০০ টাকা, হাজী বদর উদ্দিন ৫০ টাকা। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুলাই ও ৩০ আগষ্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৮৭

৩২৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই ১৮৭৪ পৃঃ ২৩৪

৩২৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ আগস্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৬৭

৩৩০। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৩৩১

৩৩১। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৩৩১। উক্ত সভায় রায় কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের দেয়া ২০ হাজার টাকায় ২টি শবদাহ ঘাট তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া নর্থব্রুক হল ঘাট নির্মাণে রাজা রাজেন্দ্র যে টাকা দিতে চেয়েছিলেন, তা উক্ত কমিটির নিকট অর্পণের জন্য তাঁকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

৩৩২। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জানুঃ ১৮৯৭।

৩৩৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ও ৩০মে ১৮৮০ পৃঃ ১২৭ ও ১৩৬। উদ্বোধনের পর থেকে উক্ত হলে ঢাকার নওয়াবগণ বহুবার এতদাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ সভা করেন। এরূপ ১২ ডিসেঃ ১৮৮০ খ্রীঃ বেলা ২টায় নওয়াব আহসানুল্লাহর সভাপতিত্বে পূর্ববংগ ভূম্যধিকারীদের এক সভায় সরকারের প্রস্তাবিত রেন্ট বিলের প্রতিবাদ করা হয়, ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ডিসেঃ ১৮৮০ পৃঃ ৪৪৭। ছোট লাটের ঢাকা পরিদর্শনকালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অধিকতর স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে ১৮৮২ খ্রীঃ ১৪ আগষ্ট সোমবার খাজা আঃ আলিম এবং খাজা মোঃ আজগর ও বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার নর্থব্রুক হলে ছোট লাট সমীপে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২০ আগস্ট ১৮৮২ পৃঃ ২৬৮-৬৯। ১৮৮২ খ্রীঃ নওয়াব আঃ লতিফ ঢাকা সফরে এলে ঢাকার নওয়াব ও ঢাকাবাসী মুসলমানদের পক্ষ থেকে ২৭ আগস্ট সোমবার তাঁর সম্মানে নর্থব্রুক হলে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়। (ঢাকা প্রকাশ, ২ সেপ্টেঃ ১৮৮২ পৃঃ ২৯৪) ১৯ ফেব্রু ১৮৯৭ খ্রীঃ শুক্রবার বিকেলে দেশ জুড়ে বিরাজমান দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় নর্থব্রুক হলে আয়োজিত এক সভায় ডিঃ ম্যাজিঃ এবং কালী প্রসন্ন ঘোষের পর নওয়াব আহসানুল্লাহ উর্দুতে ভাষণ শেষে ১০ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ফেব্রুঃ ১৮৯৭ পৃঃ ৫। নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুতে ঢাকা জনসাধারণ সভার উদ্যোগে এখানে ২১ ডিসেঃ ১৯০১ এক শোক সভায় মরহুমের পুত্র নওয়াব সলিমুল্লাহর নিকট শোকবার্তা প্রদান এবং মরহুমের স্মৃতি রক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহ কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৭।

৩৩৪। পাঠাগারটি নির্মাণে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ৫ হাজার টাকা, ত্রিপুরার মহারাজা ১ হাজার টাকা, বালিয়াটির জমিদার ব্রজেন্দ্র কুমার রায় ১ হাজার, রাণী স্বর্ণময়ী ৭ শত, কালীকৃষ্ণ ৫ শত, বিশ্বেশ্বরী দেবী ৫ শত টাকা দান করেছিলেন। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪২ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫০। বালিয়াটির ব্রজেন্দ্র কুমার রায় উক্ত ১ হাজার টাকা ছাড়াও মাসিক ৫ টাকা করে চাঁদা দিতেন। ঢাকা প্রকাশ, ২১ মে ১৮৮২ পৃঃ ১১৬।

৩৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৮৮২, পৃঃ ৩১

৩৩৬। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৩৫, উল্লেখ্য, নর্থব্রুক হলের উক্ত লাইব্রেরীটি ১৯৭১ খ্রীঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্তমানে (১৯৯৯) সেটার অবশিষ্টাংশ পার্শ্ববর্তী জনসন হলের একটি কক্ষে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৩৩৭। অর্থ দানের তালিকার ক্রমিক নং-২২১ এবং ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত আঃ গণির অর্থ দান তালিকা দ্রঃ

৩৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৮৮২ পৃঃ ৩১ এবং ২৩ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৭।

৩৩৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ পৃঃ ১১

৩৪০। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৭

৩৪১। ঢাকা প্রকাশ, ৫ জুলাই ও ৩১ জানুঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৫১১-১২ ও ১৯৫।

৩৪২। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ পৃঃ ১১

৩৪৩। অর্থ দানের তালিকা, প্রাগুক্ত, ক্রমিক নং- ১৭৪

৩৪৪। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৩। ঢাকার কমিশনার মিঃ লটমন জনসন-এর স্মরণে উক্ত বিলিয়ার্ড হলটি নির্মিত হয়। (তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জনকল্যাণমূলক কাজে আর্থিক সাহায্য প্রদান

দানশীলতার জন্য ঢাকার নওয়াবদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। আবহমানকাল থেকে এদেশে ঐশ্বর্য্যশালী লোকজনের অভাব ছিল না। কিন্তু এমন পরিবার খুব কমই ছিল, যাঁরা ঢাকার খাজাদের ন্যায় দানশীলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বিধাতা তাঁদের যেমন বিপুল ধন-সম্পদ প্রদান করেছিল, তেমনি তা দান করার মত বিশাল অন্তকরণও দিয়েছিল। দান কার্যে তাঁদের নিকট দেশ-বিদেশ , ধর্মীয় জাতিভেদ কিংবা বর্ণ-বৈষম্যের কোন বাছ-বিচার ছিলনা।[১] যেখানেই হোক না কেন বন্যা-খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প প্রপীড়িত জনগণ এবং দূর্ভিক্ষ-মহামারী, যুদ্ধাহতদের জন্য তাঁরা উদার হস্তে সহায়তা করেছেন। তেমনি রাস্তা ঘাট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, চিকিৎসালয়, মসজিদ নির্মাণ, পুকুর খনন প্রভৃতি জনকল্যানমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা দানে তাঁদের কোন জুড়ি এদেশে নেই।[২] এই পরিবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নওয়াবদের পূর্বপুরুষগণের সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে দান কার্যে উদার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর আটিয়া পরগনার জমিদারি দরিদ্রের জন্য ওয়াকফ করে দিয়ে যান।[৩] নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় তাঁদের দান কার্যের সুনাম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দানকার্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। শুধুমাত্র নওয়াবগণই নয় খাজা পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণও দানকার্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নওয়াবদের পাশাপাশি তাঁরাও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অজস্র দান- খয়রাত করতেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও লেখকগন ঢাকার নওয়াবদের বিভিন্ন দানের কথা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের অনেক দানকার্যের কথা আজ কিংবদন্তীর মত মনে হয়। নিম্নে তাঁদের বিভিন্ন দানকাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

৩(১) নওয়াব আব্দুল গণির দানশীলতা ঃ

আমরা দেখতে পাই সাধারণত যাঁরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেন তারা কিছুটা কৃপণ না হয়ে পারেন না। কিন্তু নওয়াব আব্দুল গণি এই অপযশের উর্ধ্বে ছিলেন। একদিকে তাঁর যেমন বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, অন্যদিকে দান-দক্ষিণায়ও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর যশোখ্যাতির প্রধান কারণটাই ছিল তাঁর অতুলনীয় দানশীলতা। নওয়াব আব্দুল গণি ছিলেন একজন প্রকৃত দানবীর। তিনি প্রকৃতির দূর্যোগ, দূর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা-খরা, ঘুর্ণিঝড় প্রভৃতির সময় জনগণ ও দুঃস্থ মানবতার দুর্দশা লাঘবে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতেন। তিনি কোন কোন সময় নগদ অর্থাদি দিয়ে , আবার কখনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ী ঘোড়া কিংবা নৌযান দিয়ে জনসেবায় অংশ গ্রহণ করতেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণি কলকাতার দূর্ভিক্ষ তহবিলে ২০০০/- টাকা এবং ঢাকার দূর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য ২০০০/- টাকা দান করেন।[৪] প্রথমদিকে খাজা আব্দুল গণির দানশীলতার বিষয়ে ঢাকা প্রকাশে পরস্পর বিরোধী খবর দিতে দেখা যায়। ১৮৬৪ খ্রীঃ ৩ বৈশাখ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ঢাকার তিনজন ধণী ব্যক্তি তথা মীর্জা গোলামপীর, মৌলভী আব্দুল আলী এবং খাজা আব্দুল গণির জনকল্যাণমূলক কর্মবিমুখতার কথা উল্লেখ করা হয়।[৫] অন্যদিকে ১৯৬৪ সালেই উক্ত পত্রিকা আরেকটি প্রবন্ধে নওয়াব আব্দুল গণি রাশি রাশি দান করেন বলে মন্তব্য করে এবং তাঁকে বোম্বের খ্যাতনামা পার্সী মহাদাতাদের সাথে তুলনা করে।[৬] আবার ১৮৭০ সালে উক্ত পত্রিকা তাঁর ঐশ্বর্যের তুলায় জনকল্যাণ কাজকর্মের পরিমাণ কম বলেও মন্তব্য করেছিল।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আব্দুল গণি দানকার্যে তাঁর উল্লেখিত দুর্নাম যে সফলভাবে ঘুচাতে পেরেছিলেন, সেটা তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকেই বুঝা যায়। ১৮৬৬ খ্রীঃ ঢাকার পূর্ব দরজায় তিনি একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ উক্ত লংগরখানায় ২০ জন পুরষ ১৬ জন মহিলা এবং ৬ জন শিশু ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল অন্ধ অথবা খোঁড়া। তাদের থাকার জন্য কক্ষাদিসহ বিনামূল্যে খাবার ও পোষাক দেয়া হতো এবং একজন দেশীয় ডাক্তার এদের স্বাস্থ্য সেবা দিতেন। এখানে ভর্তির শর্ত ছিল এই যে, সে আর ভিক্ষা করতে পারবে না। উক্ত লংগরখানাটি নওয়াব আহসানুল্লাহর সময়েও ছিল।[৮] ১৮৭৪ খ্রীঃ ঢাকা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়ে নওয়াব আব্দুল গণি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন।[৯] তিনি শিক্ষার উন্নতি কল্পে আলীগড় কলেজে দুই হাজার টাকা এবং ঐ কলেজের সেন্ট্রাল হল প্রতিষ্ঠায় পাঁচশত টাকা দান করেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজেও বার হাজার টাকা দান করেন।[১০] ঢাকা নর্থব্রুক হল লাইব্রেরীর জন্য তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ ৭০০টি বই কিনে দিয়েছিলেন-এ কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে।

১৮৭৩ খ্রীঃ ঢাকায় 'অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা'র জন্য আব্দুল গণি ৩০ টাকা দান করেন।[১১] ১৮৭৪ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সময় নওয়াব আব্দুল গণি দুস্থদের জন্য স্বল্পমূল্যে চাউল প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[১২] ১৮৭৪ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৭৬ খ্রীঃ ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি দুর্গতের সাহায্যার্থে তাঁর স্টীমার 'স্টার অব ঢাকা' সরকারের হাতে সমর্পণ করেন।[১৩] ঢাকা শহরে নওয়াব আবদুল গণির সবচেয়ে বড় অবদান হলো আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে পানীয় জলের কল স্থাপন করা। আগেই উল্লিখিত হয়েছে দরিদ্র জনগণের কথা ভেবে ঐ টাকা প্রদানের সময় তিনি সরকারের উপর বিনামূল্যে কলের পানি সরবরাহের শর্তারোপ করেছিলেন। ঢাকায় নর্থব্রুক হল ও বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণে তিনি বিপুল অংকের অর্থ সাহায্য করেন।[১৪] ১৮৮৫ খ্রীঃ তিনি দেশের মধ্যে বন্যা দুর্গতদের জন্য দশ হাজার টাকা সাহায্য দান করেন।[১৫] ১৮৮৭ খ্রীঃ ভাইসরয় কাউন্সিলে যোগদান শেষে নওয়াব আব্দুল গণি কলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন কালে তাঁর পুত্র আহসানুল্লাহসহ বরিশালের জমিদারীতে উপস্থিত হন। বরিশালের প্রজাগণ তাঁকে সেসময় সাড়ে ত্রিশ হাজার টাকা নজরানা দেয়। টাকাগুলো তিনি ঐ এলাকায় কয়েক স্থানে পুকুর খনন ও মসজিদ নির্মাণে দান করেন। এ ছাড়া ঐ সময় তিনি বরিশাল শহরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরীর জন্য আরো পাঁচ হাজার টাকা দান করেন।[১৬]

১৮৮৮ খ্রীঃ ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ভয়াবহ টর্নেডোর ছোবলে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। টর্নেডোয় নওয়াব সাহেব নিজে সমধিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুর্যোগে দরিদ্রের দুর্দশা দেখে তিনি তাঁদের সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ দশ হাজার টাকা দান করেন।[১৭] নওয়াব আবদুল গণি কেবল স্বদেশেই নয় বিদেশেও প্রচুর অর্থদান করেছেন। তিনি ইরান, ল্যাঙ্কাশায়ার, আয়ারল্যান্ড, ইটালি, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ঝড়, ভূমিকম্প প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থদান করেন। রুশ তুরস্ক যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বিধবাদের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য পাঠান। খলিফা হারুনার রশিদের বেগম জোবায়দা কর্তৃক মক্কায় নির্মিত খাল 'নহরে জোবায়দা' সংস্কারে তিনি ৪০ হাজার টাকা দেন।[১৮] তিনি মক্কায় হারাম শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর এস্টেট থেকে বার্ষিক বড় অংকের চাঁদা পাঠানো চালু করেন,যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১৮(ক)] ঢাকার হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী হিসেবে তিনি প্রতি বছর শিয়াদের মহররম উৎসব আয়োজনের সিংহভাগ অর্থ দান করতেন। এ ছাড়া হোসেনী দালানের সংস্কার কাজেও তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ দিতেন। এদেশের বড় বড় দরগা, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল কলেজে তিনি অর্থদান করতেন।[১৯] প্রতি বছর বহুলোক তাঁর অর্থে হজ্জ্ব করতে যেতেন।[২০]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ঢাকার নওয়াবদের কোন কোন দান কার্য আজ কিংবদন্তীর মত মনে হয়। যেমন : পাঞ্জাব থেকে ঢাকায় আগত এক বৃদ্ধ ফকির ভিক্ষা চাওয়ার সময় বলতো 'আমার ভান্ড ভরে দাও'। লোকেরা ২/৪ পয়সা দিয়ে তার এই অদ্ভুত আবেদনের কারণ জানতে চাইলে সে বলতো, 'আমার আবেদন নওয়াব আবদুল গণির কাছে, তাঁর কাছে কারো প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না।' একদিন হঠাৎ ঐ ফকিরের সাথে নওয়াব সাহেবের দেখা হয়ে যায়। সে যথারীতি নওয়াবের কাছে গিয়ে ভান্ডটি ভরে দেয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। নওয়াব তাঁর খাজাঞ্চী মীর হাবিব মিয়াকে ফকিরের ভান্ডটি টাকা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে ভরে দিতে বললেন। তাঁর নির্দেশে ফকিরের ভান্ডটি ভরে দিতে দুই হাজারেরও বেশী রূপার টাকা লেগেছিল। কিন্তু টাকা ভর্তি ভান্ডটি এতই ভারী ছিল যে, ঐ ফকির তা বহন করতে অক্ষম হলো। তখন নওয়াব সাহেব তাঁর এক পেয়াদাকে টাকা ভর্তি ভান্ডটি ফকিরের বাড়ীতে পৌছে দিতে আদেশ দিলেন।[২১]

আরেকবার মুলতান থেকে এক মুসাফির এসে জানালেন যে, তাঁর এলাকায় ৬০ মাইলের মধ্যে কোন কূপ বা সরাইখানা নেই। তিনি সেটা তৈরী করার জন্য নওয়াব আবদুল গণির নিকট অর্থ সাহায্য চাইলেন। নওয়াব সাহেব শুধু ঐ মুসাফিরের কথায় বিশ্বাস করেই তাঁকে সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। কয়েক বছর পর অন্যান্য মুসাফিরের নিকট থেকে জানা গেল, পূর্বোক্ত মুসাফিরের বর্ণিত এলকায় নওয়াব আবদুল গণির নামে একটি কূপ ও সরাইখানা ঠিকই তৈরী করা হয়েছে।[২২]

ঢাকার বহু বনেদী পরিবার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। নওয়াব আব্দুল গণি তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মীর আশরাফ আলীর পরিবারের লোকেরা একদিন চামড়ার ব্যবসায়ী ইত্যাদি কথা বলে ঘৃণা ভরে খাজা পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে চায়নি।[২৩] কিন্তু পরবর্তী কালে সেই মীর আশরাফ আলীর পৌত্র আসাদুদ্দীন হায়দার দুর্বিপাকে পড়লে, নওয়াব আবদুল গণি অর্থ সাহায্য দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন।[২৪] মীর্জা গোলাম পীর ঢাকার একজন খ্যাতনামা ধনীও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পুত্র বিলাসপ্রিয় মোহাম্মদ মীর্জাকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখে নওয়াব আবদুল গণি দুঃখবোধ করেন এবং হাজার হাজার টাকা সাহায্য দিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন।[২৬] ১৮৭৪ খ্রীঃ নওয়াব সাহেব তাঁকে বিনা সুদে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা কর্জ প্রদান করেন।[২৭] এছাড়া রাজাবাবু নামে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের বিপদেও তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য দেন।[২৮] পারিবারিক সহায় সম্পত্তি নিয়ে খাজা আব্দুর রহিম ওরফে লেংড়া মিয়ার সাথে নওয়াব আব্দুল গণির বিবাদ ছিল। কিন্তু মহাজনের কর্জ অনাদায়ে লেংড়া মিয়ার নামে পরোয়ানা জারি হলে, নওয়াব সাহেব তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি পুলিশ ও পেয়াদাদের লেংড়া মিয়ার খোঁজে নওয়াব বাড়ী এলাকায় ঢুকতে না দিয়ে তাড়িয়ে দেন। নিজ তহবিল থেকে মহাজনের টাকা পরিশোধ করে তিনি লেংড়া মিয়ার সম্মান রক্ষা করেন। এ ছাড়া নওয়াবের অনুমতি না নিয়ে নওয়াববাড়ী এলাকায় ঢুকার সাহস দেখানোর জন্য ঢাকার জজ সাহবেকে দিয়ে তিনি উক্ত পেয়াদাকে সাসপেন্ড করেন।[২৯] তিনি হাজার হাজার টাকা খরচ করে লালবাগের জনৈক গণি মিয়াকে এক বালিকা হত্যা মামলায় ফাঁসীর সাজা থেকে রক্ষা করেন।[৩০] নওয়াব আবদুল গণি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহুলোককে প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ পুত্র আসানুল্লাহকে জমিদারী পরিচালনার ভার দেয়ার পর নওয়াব আবদুল গণি এই ভেবে শঙ্কিত হন যে, আহসানুল্লাহ হয়তো ঐ সব ঋণ গ্রহীতাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন না। এই ধারণা ও করুণার বশবর্তী হয়ে তিনি খাতকদের নেয়া ঋণগুলো মাফ করে দেন এবং ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সব ছিঁড়ে ফেলেন।[৩১]

নওয়াব আবদুল গণি প্রতিদিন ভোরবেলা ঘোড়াগাড়ী চড়ে বেড়াতে যেতেন। নওয়াবপুরে জনৈক স্বর্ণকারের নয় বছরের এক মেয়ে রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ নওয়াবকে সালাম দিত। একদা পর পর তিনদিন ধরে মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে নওয়াব সাহেব তাঁর গাড়ী থেকে নেমে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটার পিতা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে জানালো- তিনদিন যাবৎ সে জ্বরে ভুগছে। নওয়াব মেয়েটাকে চিকিৎসার জন্য ২৫টি টাকা দিয়ে তার পিতাকে পরে দেখা করতে বলে গেলেন। স্বর্ণকারটি আনন্দে নওয়াবের পায়ে পড়ে বললো, আজ দু'দিন ধরে তার ঘরে সবাই উপোস রয়েছে। নওয়াব সাহেব পরে আট'শ টাকায় একটি দোকান কিনে ঐ স্বর্ণকারকে দান করেছিলেন।[৩২]

দানের জন্য খাজা পরিবারে পূর্ব থেকেই একটি পৃথক তহবিল ছিল। নওয়াব আবদুল গণির সময় ঐ তহবিল থেকে ১০ গুনেরও বেশী দান খয়রাত করা হতো। উক্ত তহবিল থেকে নওয়াবরা দুস্থ ও দরিদ্রদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতেন।[৩৩] তহবিলটি নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় পর্যন্তও কমবেশী অটুট ছিল। ঐ তহবিল থেকে নওয়াব বাড়ীতে আগত

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া হতো। কাউকেও ফিরিয়ে দেয়া হতো না। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা প্রয়োজনে নওয়াব আবদুল গণি অন্য তহবিল থেকেও অর্থ দান করতেন। নওয়াব সাহেব লোক ও সমাজের অজান্তে কতজনকে যে দান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাই প্রফেসর মুনতাসীর মামুন তাঁর গ্রন্থে নওয়াব আবদুল গণি দেশের প্রজা সাধারণের উপকারের কথা ভেবে নয় বরং বৃটিশ শাসকবর্গের অনুরোধে কিংবা তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্যই দান করতেন বলে যে অপবাদ দিয়েছেন, তা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।[৩৪]

নওয়াব আবদুল গণির দানশীলতার কথা বলতে গিয়ে সি. ই. বাকল্যান্ড সাহেব লিখেছেন, জনকল্যাণমূলক কাজে আবদুল গণির দানের সংখ্যা অগনিত। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, ক্লাব, সমিতি, মসজিদ-মাজার, দুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতির জন্য তিনি বিপুল অর্থ খরচ করেছেন। শুধু দেশেই নয় বরং ইউরোপ প্রভৃতি বিদেশেও দুস্থ ও যুদ্ধাহতদের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়েছেন। তাঁর দানের তালিকা অনেক বড় এবং অংকের হিসেবে তা বহু লক্ষ টাকা হবে।[৩৫]

নওয়াব আবদুল গণির মৃত্যুর পর তাঁর দানশীলতা, শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং চারিত্রিক গুনাবলীর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মোসলেম ক্রনিকল পত্রিকা প্রকাশ করেছিল, 'নওয়াব আবদুল গণি ঢাকা শহরে গ্যাসের আলো, কলের জল এবং অসংখ্য জনকল্যাণমূলক ভবনাদি দিয়ে গেছেন। তিনিই প্রথম ঢাকাকে বাসোপযোগী করে সজ্জিত করেছেন। ঢাকায় অবৈতনিক বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, মাদ্রাসা তাঁর বদান্যতা ও মহানুভবতার কথা প্রকাশ করছে। আধুনিক ঢাকা বলতে গেলে আবদুল গণিরই সৃষ্টি। এ শহরের প্রতিটি প্রান্তে তাঁর অবদানের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ঢাকায় নবাগত প্রতিটি লোক এ শহরে পাড়া দিয়েই প্রথমে নওয়াবের অবদান প্রত্যক্ষ করে থাকেন। নিস্কলুষ চরিত্রের অধিকারী আবদুল গণি উদারভাবে অর্থ ব্যয় করতেন। কিন্তু সাদাসিধে ধার্মিক মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতেন'।[৩৬] লোকনাথ ঘোষ নওয়াব আব্দুল গণির জীবদ্দশায়ই তাঁর উল্লেখযোগ্য দান কাজের একটি ছোট-খাট তালিকা তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন।[৩৭] বিভিন্ন সময়ে নওয়াব আব্দুল গণি যেসব অর্থ দান করেছিলেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল ৫০০/- টাকার বেশী অংকের দানগুলোর একটি তালিকা ঢাকা প্রকাশ তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধীয় খবরের সাথে প্রকাশ করেছিল। (পরিশিষ্ট নং ৯, পৃষ্ঠা নং৪০৮তে উক্ত দানের তালিকাটি দেয়া হলো) উক্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে নওয়াবের নিকট থেকে যেসব দান গ্রহণ করেছিলেন, সেটাও উক্ত তালিকায় প্রকাশ করা হয়নি। নওয়াব সাহেব তাঁর এস্টেটের কর্মচারীদের জন্য বহু সংখ্যক ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা ক্রয় করতেন । এজন্য উক্ত খবরের শেষে নওয়াবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছিল।[৩৮]

৩(২) নওয়াব আহসানুল্লাহর দানশীলতা ঃ

১৮৬৮ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে জমিদারীর সব কাজ কর্মের মত খাজা পরিবারের আনুষ্ঠানিক দান কাজও প্রধানত তাঁর নামেই চলতে থাকে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে খাজা আহসানুল্লাহকে জমিদারীর দায়িত্ব প্রদানের সময় তিনি ঋণ গ্রহীতাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন না বলে নওয়াব আব্দুল গণি আশংকা করেছিলেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ সে আশংকা দূর করে দানশীলতা ও আতিথেয়তায় তাঁর পিতার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হন।[৩৯] তিনি সেযুগে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশী অর্থ অকাতরে দান করেছিলেন।[৪০]

বিভিন্ন সময় জনকল্যাণমূলক কাজে নওয়াব আহসানুল্লাহর যেসব উল্লেখযোগ্য দানের কথা জানা যায় তা নিম্নরূপঃ ১৮৬৬ খ্রীঃ কলকাতার দুর্ভিক্ষ তহবিলে পিতা আব্দুল গণির সাথে তিনিও ১ হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৪১] ১৮৭২ খ্রীঃ তিনি ঢাকা নৌ-সমাজের সাহায্যে ৫০ টাকা দান করেন।[৪২] ১৮৭৩ খ্রীঃ তিনি তাঁর পিতার সাথে একত্রে ঢাকা অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষার জন্য ৩০ টাকা দান করেন।[৪৩] ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি ঢাকার স্কুলগুলোর জন্য ২০০ টাকা দান করেন।[৪৪] ঐ বছরেই লেঃ গভর্নরের কুমিল্লায় আগমনের ব্যয় নির্বাহে তিনি ১০০ টাকা দান করেন।[৪৫] ১৮৭৫ খ্রীঃ মিটফোর্ড হাসপাতালে

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের চিকিৎসার্থে ফিমেল ওয়ার্ড নির্মাণে নওয়াব আহসানুল্লাহর ২৫ হাজার টাকা দেন এবং এর সাথে সরকার ১০ হাজার টাকা দিয়ে কাজটি সম্পাদন করেন।[৪৬] দেশের জাতীয় উন্নয়নসহ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের মানসে ঢাকায় ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৩ ডিসেম্বর 'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী সভা' নামে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৮০ খ্রীঃ মার্চ মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাতে ৩০০ টাকা দান করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হবার প্রতিশ্রুতি দেন।[৪৭] ১৮৮০ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ ঘোষনা করেন যে, আব্দুল গণি স্কুল থেকে যে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করবে তাকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। তিনি ঐ স্কুল থেকে পাশকৃত ছাত্র জনৈক আফসার উদ্দিনকে ১৮৮০ সালে ৫০ টাকা পুরস্কার দেন।[৪৮] নওয়াব আব্দুল গণির দানে ঢাকা শহরে যে জলের কল চালু করা হয়েছিল তাতে নওয়াব আহসানুল্লাহও যে প্রচুর টাকা দান করেছিলেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি নওয়াবপুর, ঠাঁঠারী বাজার, দিলখুশা প্রভৃতি এলাকায় জলের পাইপ বর্ধিত করে ঢাকায় কলের জলের পূর্ণতা দিতে সহায়তা করেন।

১৮৮২ খ্রীঃ তিনি কলকাতায় ওয়েলসের যুবরাজ-এর আগমন উপলক্ষে প্রেস ভবন এলাকায় একটি এবং ধর্মতলায় একটি পানির ফোয়ারা নির্মাণে ১০০০ টাকা দান করেন।[৪৯] ঐ একই বছর তিনি কলকতায় হিন্দু হোস্টেল নির্মাণের জন্য ৪ হাজার টাকা চাঁদা দেন[৫০] এবং ঢাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলদের লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে ৩০০ টাকা দান করেন।[৫১] পরের বছর ১৮৮৩ খ্রীঃ নওয়াব অহাসানুল্লাহ ত্রিপুরার রূপসা লাইব্রেরীতে ২০ টাকা দান করেন।[৫২] ১৮৮৪ খ্রীঃ তিনি মাদারীপুরে তাঁর মৃত পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর নামে একটি মসজিদ নির্মাণে ২ হাজার টাকা দান করেন।[৫৩] ১৮৮৫ খ্রীঃ তিনি বন্যা প্রপীড়িতদের জন্য ২ হাজার টাকা দান করেন।[৫৪] ঐ একই বছর নওয়াব আহসানুল্লাহ লেডি ডাফরিনের স্ত্রী-চিকিৎসা তহবিলে ১০ হাজার টাকা দান করেন।[৫৫] ১৮৮৮ খ্রীঃ বড় লাট লর্ড ডাফরিনের ঢাকা আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ঢাকার গণ্যমান্যদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সভায় নওয়াব আহসানুল্লাহ ঘোষনা করেন যে, সবাই মিলে যে চাঁদা দেবেন, তিনি একাই তত অংকের টাকা একাজে দেবেন।[৫৬] ১৮৮৮ খ্রীঃ তিনি ৩৪ জন হাজীর মক্কায় যাতায়াতের খরচ বহন করেন। এছাড়া প্রতি বছর একদল হাজীকে হজ্বে পাঠানোর জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে খরচ প্রদানের একটি নিয়ম চালু ছিল।[৫৭] ১৮৮৯ খ্রীঃ তিনি বোম্বাই নগরে কালা ও বোবাদের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ৫০০ টাকা দেন।[৫৮] ১৮৮৯ খ্রীঃ রাজপুত্র এলবার্ট ভিক্টরের কলকাতা আগমন উপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ কলকাতায় কুষ্ঠরোগীদের আশ্রমে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[৫৯] ১৮৯৬ খ্রীঃ শীতকালে ফুলবাড়ীয়ার নিকট বুড়ীগংগার মোহনা, গজঘাটে ধলেশ্বরীর মোহনা এবং পদ্মার সাথে ইলসামারীর মোহনা খনন করে বারো মাস নৌচলাচলের জন্য বংগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ১৫ হাজার টাকা ব্যয়ানুমান নির্ধারণ করেন । ঐ টাকার সম্পূর্ণটাই নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রদান করেন।[৬০] ১৮৯৬ খ্রীঃ দূর্ভিক্ষে ঢাকায় চালের দাম বেড়ে যায়। নওয়াব আহসানুল্লাহ এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর গুদামে ও হাটে সুলভে চাল বিক্রির ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় বাজারে মোটা চাল টাকায় ৮ সের করে বিক্রি হচ্ছিল। তিনি টাকায় ১১ সের করে চাল দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এভাবে সুলভে চাল দেয়ায় সেখানে এতই লোকের ভিড় হয়েছিল যে, বিক্রেতাদের পক্ষে সবাইকে যথাসময়ে চাল দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।[৬১] এছাড়াও ১৮৯৬ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালে প্রজাদের দূর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারনে ৪০ হাজার টাকা দান করেন।[৬২] পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে নওয়াব আহসানুল্লাহ বার্ষিক ৫ হাজার টাকা আয়ের উপযুক্ত জমিদারী ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এজন্য তিনি জমিক্রয়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার দানের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতি বছর উক্ত ৫ হাজার টাকা দূর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়, প্লাবন প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হতো। সুষ্ঠুভাবে এই অর্থ ব্যয়ের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ একটি ট্রাষ্টিবোর্ড গঠন করে দিয়েছিলেন।[৬৩] নওয়াব সাহেব প্রতি বছর ৫ হাজার টাকা উক্ত ট্রাস্টিবোর্ডের হাতে তুলে দিতেন। প্রথম বছর (১৮৯৬ খ্রীঃ) ঐ ফান্ডে নওয়াবের দানকৃত ৫ হাজার টাকায় দূর্ভিক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

প্রপীড়িতদের জন্য চাল ক্রয় করা হয়।[৬৪] এছাড়া ১৯০১ খ্রীঃ আবার চালের মূল্য বৃদ্ধি পেলে ঐ ফান্ডের টাকা দিয়ে সুলভ মূল্যে চাল বিতরনের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৫] উক্ত রিলিফ ফান্ড সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৯৮ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্কের উন্নয়নের জন্য ১২ হাজার টাকা দান করেন।[৬৬] ১৮৯৮ খ্রীঃ বোম্বে ও কলকাতায় প্লেগ রোগ দেখা দিলে, ঐ রোগের ভয়ে ঢাকায় সর্বস্তরের লোকেরা ভীত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্লেগ প্রতিরোধ ও নিবারণে নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ১ লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়া প্রয়োজনে আরো এক লক্ষ টাকা দান করবেন বলে ঘোষণা করেন।[৬৭] বড়লাট এলগিন বাহাদুর ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পথে ১১ নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রীঃ চাঁদপুর পরিদর্শন করেন। চাঁদপুরে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর অভ্যর্থনার ব্যাপক আয়োজন করেন। ঐ সময় বড় লাটের স্মরণে কুমিল্লায় জনকল্যাণমুলক কাজের জন্য নওয়াব সাহেব ৮০ হাজার টাকা দান করেন। ঐ টাকা দ্বারা পরবর্তীকালে কুমিল্লাতে টাউন হল, পুকুর, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।[৬৮] উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ১৮৮৫ খ্রীঃ কুমিল্লা শহরের রাস্তায় আলোকায়নের (ল্যাম্প) জন্য তিনি ৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৬৮(ক)]

১৮৯৯ খ্রীঃ তিনি সুদানে গর্ডন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার তহবিলে ৩ হাজার টাকা দান করেন।[৬৯] ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জন্মাষ্টমী মিছিলে ব্যবহারের জন্য ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে গভর্নমেন্ট হাতী দিতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় নওয়াব আহসানুল্লাহ ও ভাওয়ালের রাজা তাঁদের ১৪টি হাতী এ কাজে ব্যবহার করতে দেন।[৭০] ১৯০০ খ্রীঃ ঢাকায় ব্যায়াম শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ ২৫ টাকা দান করেন।[৭১] ঐ সালেই তিনি কলকাতায় বড় লাটের দুর্ভিক্ষ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা দান করেন।[৭২] ১৯০০ সালে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পরলোকগত স্ত্রীর স্মরণে বরিশালের পটুয়াখালীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। এজন্য তিনি বরিশালের মহকুমা প্রশাসকের হাতে ৮ হাজার টাকা দেন।[৭৩] ঐ সালেই তিনি ঢাকার ধামরাই গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণে এক হাজার টাকা দান করেন।[৭৪] কলকাতার গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণের জন্য বড় লাটের ফান্ডে নওয়াব আহসানুল্লাহ ৫০ হাজার টাকা দান করেন।[৭৫] ১৯০১ খ্রীঃ সুনামগঞ্জের প্রসাদিনী সভা সংশ্লিষ্ট দুর্ভিক্ষ ভান্ডারে তিনি ৫ শত টাকা দান করেন।[৭৬]

১৯০১ খ্রীঃ ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম বিদ্যুতালোক প্রদানের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ যে সাড়ে চার লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন, সে কথা আগেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ১৮৯৭ খ্রীঃ ১২ জুনে সংঘটিত ভূমিকম্পে ঢাকার হুসেনী দালান বিধ্বস্ত হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে তা পুনঃনির্মাণ করেন। এজন্য কলকাতার শিয়াগণ পর্যন্ত তাঁকে সম্ভাসিত করেছিলেন।[৭৭] ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এক লক্ষ বারো হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত অর্থ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৭৮]

মক্কার নহরে জোবায়দা পুনর্খননে তিনিও ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৭৯] তিনি অনেক দরগায় আর্থিক সাহায্য দেন এবং বহু মাজার ও মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। ঢাকার শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকিন ও হাইকোর্টের চিশতি বেহেশতীর মাজার তিনি পুনর্নির্মাণ করেন। এ ছাড়া তিনি ঢাকার সাতগম্বুজ মসিজদ পুনঃসংস্কার করেন এবং সাভারে বাইগুনবাড়ী মসজিদ নির্মাণ করেন। মীরপুরে শাহআলীর মাজারের পার্শ্বে মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন এবং সেখানকার রাস্তাঘাট মেরামত করে দেন।[৮০] ঢাকার জ্যোতিশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন, নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানের কথা বলে শেষ করা যাবে না।[৮১]

নওয়াব আহসানুল্লাহর জমিদারী দায়িত্ব পালনকালে প্রকাশ্যে অর্থাৎ হিসাব রেখে যেসব দান করা হয়েছিল, তার একটি তালিকা উদ্ধার করা গেছে। উক্ত তালিকা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন সময় জনকল্যাণকাজে তিনি মোট ৪৮,৫৬,০৫০ টাকা দান করেছিলেন।[৮২] ১৯০৭ খ্রীঃ নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার সাহেব তালিকাটি তৈরী করতে গিয়ে মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন যে, তালিকাটি পুর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়নি। কারণ 'বিই' প্রপার্টি নওয়াব আহসানুল্লাহর একক দায়িত্বে থাকাকালে তিনি তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ব্যাপক দান করতেন-সেটা জানা সম্ভব নয়।[৮৩]

তৈফুর সাহেব লিখেছেন, ঢাকায় এমন কোন মসজিদ দরগাহ কিংবা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নেই যাতে নওয়াব আহসানুল্লাহর দানের ছোঁয়া লাগেনি।[৮৪] নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল, "নওয়াবের দানশীলতার বিষয়ে আলোচনা করলে এ কলিকালে সত্য সত্যই তাঁকে দাতাকর্ণ আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয়। জানিনা ভারতে এরূপ ক'জন মহাত্মন জন্ম গ্রহণ করেছেন। পরোপকারে যিনি পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রারও বেশী অকাতরে দান করেছেন। এতদ্ব্যতিত তাঁর ব্যবস্থানুসারে দরিদ্রদের সাহায্যে এস্টেট থেকে প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা বিতরণ করা হয়ে থাকে'।[৮৫] পরিশিষ্টে দেয়া ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকায় বর্ণিত অধিকাংশ দান কাজই নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলে করা হয়েছিল।

৩(৩) নওয়াব সলিমুল্লাহর দানশীলতা ঃ

দানশীলতার বিষয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতা এবং পিতামহের উদার মানসিকতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। অধিকন্তু ছোট বেলা থেকেই তিনি আভিজাত্য অতিক্রম করে জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাদের দুঃখ দূর্দশা জানতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর দান কাজটি প্রধানত জনসেবামূলক হতো। প্রথম জীবনে পিতার সাথে মনোমালিন্যের জন্য তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী নিয়ে পিতার নিকট থেকে দূরে অবস্থান করতে থাকেন।[৮৬] এই চাকুরী জীবনে খাজা সলিমুল্লাহ সাধারণ মানুষকে আরো বেশী করে জানা ও তাদের বিভিন্ন সমস্যাদি বুঝার সুযোগ পান।[৮৭] ময়মনসিংহে উক্ত চাকুরীকালে খাজা সলিমুল্লাহ অর্থকষ্টের দরুণ কিছুদিন রাজা সূর্যকান্তের একটি কুঠিতে অবস্থান করতে বাধ্য হন। কিন্তু সেখানেও তাঁর অতিথিপরায়নতা ও দানকাজ যথারীতি অটুট ছিল।[৮৮] ঐ সময়েও তিনি গরীব দুঃখী ও ছাত্রদেরকে নানাভাবে অর্থাদি সাহায্য করতেন।[৮৯] জনদরদী হবার কারণে পিতার সাথে মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও খাজা সলিমুল্লাহ পরিবারের মিত্রগ্রুপ ও বিরোধী গ্রুপ উভয়ের কাছেই সমাদৃত ছিলেন এবং এজন্যই তিনি ১৯০১ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পর নওয়াব এস্টেটের মোতাওয়াল্লী পদে সর্ব সম্মতিক্রমে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। নওয়াবী পদে আসীন হয়ে তিনি সর্বস্তরের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছা লাভ করেন। তখন থেকেই নওয়াব পরিবারের প্রধান রূপে তাঁর উপর ঢাকার নাগরিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব এসে বর্তায়। নওয়াব সলিমুল্লাহ এসব দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করেন। তাঁর নওয়াবী গ্রহণের সময় খাজা পরিবারের বিত্ত ও বৈভবে ভাটা পড়েছিল একথা সত্য। কিন্তু উত্তরাধিকারীরূপে তিনি যা পেয়েছিলেন তা যথেষ্টই বলা যায়। নওয়াব এস্টেট অফিস থেকে উদ্ধারকৃত এক দুষ্প্রাপ্য দলিলে বর্ণিত হিসাব থেকে জানা যায়, নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ব্যাংকের হিসাবে ও তোষাখানাতে জমা অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষাধিক টাকা।[৯০] পরিশিষ্ট নং ১০, পৃঃ নং৪১০তে হিসাবটি উদ্ধৃত করা হলো। এছাড়া সোনা-দানা, মণি-মুক্তাগুলোতো ছিলই। কিন্তু অকাতরে দান কাজ ও রাজনীতি করতে গিয়ে ৪/৫ বছরের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ গচ্ছিত ধন সম্পদ শেষ করে ঋণ করতে শুরু করেন। ১৯০৭ সালে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাড়ায় ১৪ লক্ষ টাকা। ধর্মভীরু সলিমুল্লাহর মদ-নারীর পিছনে কোন অর্থ অপব্যয় করেননি। জনকল্যাণমূলক কাজে দান-ধ্যান ও রাজনীতিতে অর্থব্যয়ের কারণেই তিনি ঋনগ্রস্থ হয়েছিলেন। বিভিন্ন কাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য যে সব দানের কথা জানা যায় তা নিম্নরূপঃ

পিতা নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুতে তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ অবিলম্বে কয়েক হাজার টাকা দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি সারা বছর তাঁর পিতার মাজারে কুরআন শরিফ তেলাওয়াতের জন্য ৪ জন হাফেজ নিযুক্ত করেন।[৯১] ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে টাংগাইলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী আয়োজনে নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

সলিমুল্লাহ ৫০০ টাকা দান করেন।[৯২] ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে পিতা নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রতিশ্রুত ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা তিনি সরকারের হাতে ১৯০২ খ্রীঃ প্রদান করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ এই সাথে ৪ টি বৃত্তি প্রদানের কথাও ঘোষনা করেন। তিনি বলেন, যারা আব্দুল গণি ফ্রী-স্কুল ও ঢাকা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হতে পারবে, তাদেরকে উক্ত বৃত্তি দেয়া হবে।[৯৩] ১৯০২ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ জাজিরার আনন্দময়ী দাসী নাম্নী জনৈকা অসহায় বিধবাকে ২৫ টাকা দান করেন। এছাড়া মাসিক ৬ টাকা ভাতা ধার্য করে ৪ সন্তানসহ তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন।[৯৪] ঐ একই সনে তিনি লাংগলবন্দের ঝড়ে বিপন্নদের জন্য ৫০০ টাকা দান করেন।[৯৫] ১৯০২ সালের জুন মাসে কলকাতার আলীপুর চিড়িয়াখানার ভল্লুক নিবাস তৈরীর জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করেন।[৯৬] নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর বরিশাল এলাকার জমিদারী পরিদর্শনকালে ১৯০২ খ্রীঃ ৭ আগস্ট সেখানকার মুসলমান ছাত্রাবাসের উন্নতিকল্পে ২ হাজার টাকা দান করেন। সেখানকার স্টীমার ঘাটে ইংরেজ সাহেবদের জেটি মেরামত করতে ২ হাজার টাকা দান করেন। এছাড়া ঐসময় বরিশাল শহরে জলের কল সংস্থাপনের জন্য তিনি ৩০% ব্যয় বহনের প্রতিশ্রুতি দেন।[৯৭] ১৯০২ খ্রীঃ ১০ সেপ্টেম্বর নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর আটিয়া জমিদারী পরিদর্শন করেন। ঐ সময় তিনি সেখানকার জামুর্কি কাচারীস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগী বেডে রেখে চিকিৎসা করার জন্য এবং উক্ত স্থানে একটি পাকা মসজিদ নিমার্ণে প্রচুর অর্থদান করেন। এছাড়া নাব্যতা সচল রাখার জন্য সেখানকার গাজখানা নদীগর্ভ- খননের প্রতিশ্রুতি দেন।[৯৮] ১ জানুয়ারী ১৯০৩ খ্রীঃ সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে ঢাকা শহরের স্কুল সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের এবং কাংগালী ভোজনের আয়োজন করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ ৫ হাজার টাকা দান করে ঢাকার সব কাংগালীদের ভোজনের সুব্যবস্থা করেন।[৯৯] ১৯০২ নভেম্বর মাসে ঢাকার নববিধান সম্প্রদায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁদের সমাজগৃহে বিদ্যুতালোক প্রদানে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।[১০০] ১৯০২ সালে তিনি ছোট লাট উডবার্নের স্মৃতি ভান্ডারে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[১০১] ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতামহীর নামে মিটফোর্ড হাসপাতালে আসমাতুন্নেছা মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[১০২] ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি কুমিল্লার নবীনগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাকাঘর নির্মাণের জন্য ১ হাজার টাকা দান করেন।[১০৩] ১৯০৩ সালে সম্রাটের অভিষেক উৎসবের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ৫ হাজার টাকা দান করেন।[১০৪] নওয়াব আব্দুল গণির স্মরণে ১৯০৩ খ্রীঃ আলীপুর চিড়িয়াখানায় একটি পশুশালা নির্মাণে নওয়াব সলিমুল্লাহ ২০ হাজার টাকা দান করেন।[১০৫] ১৯০৩ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ ত্রিপুরার মুরাদনগর স্কুলে পাঠাগারের উন্নতিকল্পে ১,০৭৫/- টাকা দান করেন।[১০৬] যুদ্ধে নিহত জাপানীদের সাহায্য ভান্ডারে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৪ খ্রীঃ ২ শত টাকা দান করেন।[১০৭] টাঙ্গাইল শহরে জলাভাব দূরীকরনার্থে জলাশয় খননে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিকে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৪ খ্রীঃ ২ হাজার টাকা দান করেন।[১০৮] ১৯০৪ সনে তিনি ময়মনসিংহে মুসলমান বোর্ডিং ও পাঠাগারের সাহায্যে ১ হাজার টাকা প্রদান করেন।[১০৯] ১৯০৪ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ মাদারীপুরের কৃষ্ণনগর কাচারী পরিদর্শনকালে মাদারীপুর স্কুল ও মাদ্রাসার আর্থিক দূর্দশা দেখতে পান। তিনি স্কুলের জন্য পূর্বনির্ধারিত সাহায্য মাসে ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করে দেন এবং স্কুল গৃহ নির্মাণে এককালীন ১ হাজার টাকা দান করেন। উক্ত মাদ্রাসার দ্বিতীয় মৌলভী তাঁর সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা জানালে নওয়াব সাহেব তাঁকে ১ শত টাকা দান করেন। ঐস্থানে জনৈক কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে তিন বিঘা নিস্কর জমি ও আজীবন ১ শত টাকা করে অর্থ সাহায্য নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া স্থানীয় জনতার অভাব মোচনের জন্য আজগর খলিফা নামক জনৈক ব্যক্তি কৃষ্ণনগরে একটি হাট বসানোর উদ্যোগ নেন। এজন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁকে ৩ শত টাকা দান করেন।[১১০] ১৯০৫ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ ছোট লাট বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত রাঁচি কলেজের ভান্ডারে ৪০ হাজার টাকা দান করেন।[১১১] ১৯০৫ সালের চৈত্র মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহর এক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে ঢোল পিটিয়ে সব কাংগালীদের নওয়াব বাড়িতে ডেকে এনে ৮০ মন চাউলের পোলাও-কালিয়া ভোজন করানো হয়।[১১২] ১৯০৫ সালে তিনি কাংড়া উপত্যকায় ভূমিকম্প প্রপীড়িতদের সাহায্যে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[১১৩] ১৯০৫ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার জন্য ডাফরিন বোর্ডিং নির্মাণে ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ানুমান নির্ধারিত হয়। মোহসীন ফান্ড ও সরকারের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত বোর্ডিং নির্মাণের ব্যয়ভার (১০ হাজার টাকা) বহন করেন।[১১৪] ১৯০৬ খ্রীঃ ময়মনসিংহে ছোট লাটের অভ্যর্থনার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর মোটর গাড়ী এবং ১ হাজার টাকা প্রদান করেন। তন্মধ্যে ২ শত টাকা ছোট লাটের অভ্যর্থনায় খরচ হয় এবং বাকী টাকা থেকে ৫০০ টাকা ময়মনসিংহের মুসলমান বোর্ডিং-এর উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়।[১১৫] ১৯০৬ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর পরামর্শে ঢাকা মাদ্রাসার-শিক্ষকদের নিয়ে 'মুসলমান ইনস্টিটিউট' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতির সাহায্যকল্পে নওয়াব সলিমুল্লাহ বার্ষিক ৪০০ টাকা দান করার কথা ঘোষনা করেন।[১১৬] ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ঢাকার শাহবাগে নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে 'প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির' প্রথম অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে আলীগড় কলেজ বোর্ডিং হাউসের ন্যায় ঢাকা কলেজের মুসলিম ছাত্রদের জন্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি 'মোহামেডান হল' নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ হল নির্মাণের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ১,৪৬,৯০০/- টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।[১১৭]

ব্রিটিশ সরকারের বংগবিভাগ সমর্থনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর জমিদারি পরিচালনায় তেমন নজর দিতে পারেননি। ফলে এস্টেটের আয় ক্রমশ কমতে থাকে। তদুপরি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতির' সম্মেলন আয়োজন করার যাবতীয় ব্যয় বহন করতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ফলে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দানকার্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ আগের মত আর বাস্তবতা দেখাতে পারেননি। এদিকে বাহুল্য খরচ বিবেচনায় এবং পরিবারের শরীকগণের চাপে তিনি এস্টেটের হাতী-ঘোড়া বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন।[১১৮] আর্থিক টানা পোড়েনের কারণে ১৯০৭ সালে নওয়াবের জন্য ধার্যকৃত মাসিক ভাতা মাত্র ৫০৫০ টাকার বেশী খরচ করতে দিতে তাঁর শরীকগণ আপত্তি তোলেন।[১১৯] কাজেই এরপর থেকে এস্টেটের ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় থেকে দান কাজে নির্ধারিত ব্যয় করা ছাড়া নওয়াবের পক্ষে অধিক কোন দান করার মত কোন আর্থিক সংগতি ছিল না। ১৯০৭ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর নিজের অংশের সমুদয় সম্পত্তি সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রনে দিয়ে দিতে বাধ্য হন।[১২০] এদেশের শত শত অনাথ ও দীন-দুঃখী নওয়াব এস্টেটের স্থায়ী দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। নওয়াব এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রনে চলে যাওয়ায় তাঁরা সেসব অনুদান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ঐসব অসহায় মানুষদের দুঃসহ জীবন যাপনের কথা ভেবে স্থানীয় পত্রিকাগুলো ১৯০৭ সালে আফসোস করে খবর প্রকাশ করেছিল।[১২১] ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসরে 'নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতির' অধিবেশনে নওয়াব সলিমুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। ঐ শহরে অনেক কাশ্মিরী থাকার কারণে তিনি সেখানে বিশেষভাবে সমাদৃত হন। তিনি সেখানকার কোন কোন সংস্থায় মুক্ত হস্তে দান করেন।[১২২] ১৯০৯ খ্রীঃ কলকাতা টাউন হলে মুসলমানদের এক সভায় কলকাতা মাদ্রাসাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করা সহ তথায় একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ এতে ৬ হাজার টাকা দানের অংগীকার করেন।[১২৩] ১৯১০ খ্রীঃ আগস্ট মাসে সদ্য প্রয়াত সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের স্মরণে ঢাকার কার্জন হলে লেঃ গভর্নর ল্যান্সলট হেয়ারের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালটির ব্যাপক উন্নয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে অর্থকস্ট সত্ত্বেও তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা মিলে ৫ হাজার টাকা এ কাজে দান করেন।[১২৪] ১৯১১ খ্রীঃ ঢাকার নর্থব্রুক হলে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের প্রতিকৃতি সংস্থাপনের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ৩ শত টাকা দান করেন।[১২৫] ১৯১১ খ্রীঃ জুলাই মাসে আলীগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকায় মুসলমানদের এক সভা আহবান করে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে উক্ত ফান্ডে ৫ হাজার টাকা দেন এবং তাঁর ভাই নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ ১ হাজার টাকা দেন। এছাড়া নওয়াব পরিবারের খাজা আজিজুল্লাহ ৩ শত টাকা এবং খাজা মোঃ আজম ৫ শত টাকা এ ফান্ডে দান করেন।[১২৬] মৌলভী হাজী আব্দুর রহিম লালবাগে ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ শামছুল হুদার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯১২ খ্রীঃ ২৭ জুলাই সকালে উক্ত মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। ঐ সময় নওয়াব সাহেব ছাত্রদেরকে ২৫ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।[১২৭] ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপন্নদের জন্য বড়লাট যে সাহায্য ভান্ডার খোলেন, তার শাখা বংগদেশেও স্থাপন করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত ভান্ডারে ২ হাজার টাকা দান করেন। নওয়াব পরিবারের অন্যান্যরা এতে ১ হাজার টাকা দান করেন।[১২৮] ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভ্যর্থনার জন্য সংগৃহীত তহবিলে তিনি দুই হাজার টাকা দান করেন। এছাড়া রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তহবিলে তিনি তিন হাজার টাকা দান করেন। উক্ত সোসাইটির জন্য তিনি ঢাকার জনগণের নিকট থেকে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা তুলে পাঠান। ১৯১৪ খ্রীঃ ঢাকার চৌবাড়ী ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য তিনি তিন শত টাকা দান করেন।[১২৯] তিনি কেবল অর্থের মাধ্যমেই দান করতেন তা নয়। তাঁর দানের আরো নানা প্রকৃতি ছিল। তিনি বহু গরীব ছাত্রের স্কুল কলেজে ভর্তি ও বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকল্পে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকার শাহবাগে সম্পূর্ণ নিজ খরচে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এজন্য প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছিল। এতে নওয়াবের নিজ ভান্ডার একেবারে শূন্য হয়ে যায়। এজন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীদের অলংকার বিক্রি এমনকি বিপুল অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল।[১৩০] কিন্তু এজন্য জনদরদী সলিমুল্লাহর জনসেবার রাজনীতি থেমে থাকেনি। ১৯১৪ খ্রীঃ অনেক টানা পোড়েনের মধ্যেও আবার তিনি ঢাকায় "বেংগল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ"-এর অধিবেশন আয়োজন করেন। উক্ত অধিবেশনে আগত অতিথি ও ডেলিগেটদের যথোচিত তৃপ্তিকর ভোজনে আপ্যায়িত করতে নওয়াব সলিমুল্লাহর বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল।[১৩১]

জনসাধারণের সাহায্যার্থে নওয়াব সলিমুল্লাহ একটি পৃথক তহবিল গঠন করে রেখেছিলেন। কোন দরিদ্র প্রজা নিজ পরিবারের ভরন পোষণে অক্ষম হয়ে নওয়াবের সাহায্য প্রার্থী হলে তিনি তৎক্ষনাৎ তাকে সাহায্য করতেন[১৩২] প্রতিদিন এরূপ বিভিন্ন দায়ে পড়ে বহুলোক নওয়াবের দারস্থ হতেন। নওয়াব কাউকেও ফেরাতেন না, কিছু না কিছু দিতেন। সাহায্যের আশায় দেয়া গরীব প্রজাদের পেশকৃত এরূপ দরখাস্তের কয়েকটি বান্ডিল এখনো জীর্ণ অবস্থায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত হচ্ছে। তাতে দেখা যায়, নওয়াব সাহেব সকলকেই কিছু না কিছু অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করে স্বাক্ষর ও মন্তব্য দিয়েছেন।[১৩৩] মিরানজালা, ঢাকা-এর জনৈক হাজী গোলাম রেজাকে নওয়াব সলিমুল্লাহ নিজ পকেট খরচ থেকে মাসিক ভাতা দিতেন। নওয়াবের মৃত্যুর পর উক্ত ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ভাতাটা চালু রাখার জন্য পরবর্তী নওয়াবের নিকট এক আবেদন করেন। কিন্তু ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ নওয়াব হাবিবুল্লাহর প্রাইভেট সেক্রেটারী একটি পত্রে তাকে পরবর্তী নওয়াবের আর্থিক অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন।[১৩৪] দামোদর নদীর বন্যায় একবার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে, নওয়াব সলিমুল্লাহ দূর্গতদের জন্য বেশ কিছু অর্থ সাহায্য পাঠান।[১৩৫] নওয়াব সলিমুল্লাহর অমায়িক ব্যবহারে কি রাজা কি প্রজা সবাই তুষ্ট ছিলেন। দেশবাসীর অভাব অভিযোগ অবগত হয়ে তা গভর্ণমেন্টের গোচরীভূত করা তিনি প্রধান কর্তব্য মনে করতেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি ঢাকা নগরবাসীকে এক প্রনয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। কোন নগরবাসী তাঁর ডাক পাওয়ামাত্রই কোন ইতস্ততঃ না করে তাঁর উদ্দেশ্য জ্ঞাত হবার জন্য আহসান মঞ্জিলে গিয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি প্রতিদিন বহুলোকের নানা ধরনের বিবাদ মীমাংসা করে দিতেন। এতে বহু লোকের উকিল- মোক্তার, কোর্ট-কাচারীর টাকা বেঁচে যেতো। নওয়াব সাহেব দীনহীন একজন মুসলমানের চাকুরীর জন্য রাজ দরবারে গিয়ে সুপারিশ করতেও ইতস্ততঃ করতেন না।[১৩৬] তৈফুর সাহেব লিখেছেন, মুসলিমদের চাকুরীর সুপারিশ করে নওয়াব সলিমুল্লাহ এতই অধিক সার্টিফিকেট দিতেন যে, তাঁর সার্টিফিকেটের কদর কমে যেতে পারে বলে তিনি (তৈফুর) আশঙ্কা করেছিলেন। তৈফুর সাহেব যখন তাঁকে এ আশঙ্কার কথা বলেছিলেন, তখন নওয়াব সাহেব উত্তরে বলেছিলেন, "এতে যদি একজন মুসলমানও সফলকাম হয় তবুও নিজেকে ধন্য মনে করবো'।[১৩৭] নওয়াব সিরাজদ্দৌলার এক অধস্তন পুরুষ সৈয়দ জাকি রেজা অর্থ কস্টে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব সলিমুল্লাহর দারস্থ হন। নওয়াব সাহেব ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ একটি পত্র লিখে তৎকালীন বাংলার গভর্ণরের নিকট তাঁকে একটি সম্মানজনক চাকুরী দেয়ার সুপারিশ করেন।[১৩৮]

বংগভংগ ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা দেয়া এবং অনলপ্রবাহ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বিরুদ্ধে ১৯১০ খ্রীঃ ওয়ারেন্ট জারী হয়। সিরাজী বহুদিন আত্মগোপন করে থেকে শেষে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মাধ্যমে নওয়াব সলিমুল্লাহর স্মরণাপন্ন হন। সিরাজী বংগ বিভাগের বিরুদ্ধবাদী হলেও উদারমনা নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর জন্যে সুপারিশ করে একটি পত্র লিখে শিলং-এ অবস্থানরত ছোটলাট হেয়াবের নিকট লোক পাঠান। অবশেষে শীতকালে ছোটলাট ঢাকায় এলে নওয়াব সাহেব সিরাজীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করেন।[১৩৯]

১৯১৩ সালে সরকার বরিশাল জেলায় পথকর বৃদ্ধি করলে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান যৌথভাবে আন্দোলন করে। শরৎচন্দ্র, হেমায়েত উদ্দিন, বিনোদ কুমার রায় চৌধুরী, ওবেদুল গণি, মথুরানাথ সেন প্রমুখ বরিশালের প্রধান ব্যক্তিগণ ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকার কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন পেশ করেন। নওয়াব সাহেব ডেপুটেশনের সভ্যদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বরিশালে উক্ত কর ধার্যের ক্ষেত্রে কি কি অনিয়ম হয়েছে তা কমিশনারকে বুঝিয়ে দিতে বলেন। শরৎ বাবু কমিশনারকে বুঝাতে সক্ষম হলে কমিশনার সাহেব সরকারের লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও উক্ত কর রহিত করে দেন।[১৪০]

আজিমপুর দায়রা শরীফের তৎকালীন গদ্দীনশীন পীর প্রথমবার হজব্রত পালন কালে কোন বিশেষ কারণে মদীনা শরীফ যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি মদীনা শরীফ জেয়ারতের উদ্যোগ নিলে নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ তাঁকে ৮০০ টাকা দান করেছিলেন।[১৪১] পরিশিষ্টে দেয়া নওয়াবদের অর্থদানের পূর্বোক্ত তালিকায় নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলের অনেকগুলো দানের কথা জানা যায়।

৩(৪) নওয়াব হাবিবুল্লাহর দানকাজ ঃ

নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় ঢাকার নওয়াব পরিবার অর্থনৈতিকভাবে পতনের শেষ ধাপে নেমে আসে। তদুপরি ইন্দ্রিয়পরায়ণ নওয়াব হাবিবুল্লাহ প্রচুর টাকা পয়সা উড়িয়ে দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েন। তথাপি নওয়াব এস্টেটের যে সব ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল, সেগুলোর আয় থেকে যথারীতি দান কাজ চলতো। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত একটি সূত্র থেকে জানা যায়, তখনও ঢাকার নওয়াব পরিবার থেকে বছরে কমপক্ষে ৬৫ হাজার টাকা ধর্মীয় এবং সেবামূলক কাজে দান করা হতো।[১৪২] ১৩৩৫ সনে জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত নওয়াবদের ওয়াকফ এস্টেটের সম্পর্কে বলা হয়, এই ফান্ড থেকে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায় কত যে বৃত্তি পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন তার হিসাব করলে মুসলিমদের আজকের দুর্গতি দেখে আফসোস হয়।[১৪৩] ঢাকার স্কুল সমূহে দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের সাহায্যার্থে ১৯২০ সালে 'ঢাকা মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নওয়াব হাবিবুল্লাহ এই সমিতিতে নিয়মিতভাবে মাসিক চাঁদা দিতেন।[১৪৪] মৌলভী আব্দুল হাকিম ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় থেকে বি.এ.অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে সিনিয়ার র‍্যাংলার হওয়ার জন্য বিলেতের কেমব্রিজে ভর্তি হতে যান। নওয়াব হাবিবুল্লাহ তাঁর এস্টেটের ওয়াকফ ফান্ড থেকে তাঁর জন্য বার্ষিক ২০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[১৪৫] ১৯২১ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনে নওয়াব হাবিবুল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তিনি উক্ত হলের মেধাবী ছাত্রদের জন্য 'স্যার সলিমুল্লাহ মেমোরিয়াল ফান্ড' নামক একটি বৃত্তি ফান্ড তৈরীর কাজে ১০ হাজার টাকা দেবেন। ইতোপূর্বে এ হলের ছাত্রদের জন্য নওয়াব সাহেব বার্ষিক ৩ হাজার টাকা দানের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, এই দান ছিল তার অতিরিক্ত।[১৪৬] তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল, ঢাকার

 Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে তিনি অন্যতম দিকপাল হিসেবেই চিরদিন কীর্তিত হবেন। নির্ভিকতা তাঁর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি দান করতেন এবং দানের মত দান করতে জানতেন। এই বেপরোয়া দানের অপরিণামদর্শিতার মাসুল তিনি শেষ জীবনে প্রচুর দিয়েছেন। অন্তরের জোরেই তিনি সকলের মন জয় করেছিলেন।[১৪৭]

৩(৫) নওয়াব পরিবারের অন্যান্যদের দানকাজ ঃ

ঢাকার খাজা পরিবারে কেবল নওয়াবগণই যে দানশীলতায় পারাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তা নয়, এ পরিবারে সবাই কমবেশী দান কাজে মুক্ত হস্ত ছিলেন। নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফ জানও দানকাজে বিশেষ উদারতা দেখাতেন। আবুয যোহা নুর আহমদ লিখেছেন, 'নওয়াব ইউসুফ জান অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিতে সক্ষম হন। তিনি এক ঘোড়ার ছোট একটি টম টমে চড়ে সারা ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতেন আর খলিফা উমর এবং হাজী মোহসীনের মত গোপনে মানুষের দুঃখ দুর্দশার খবর নিতেন।'[১৪৮] ১৮৮৮ খ্রীঃ বড়লাট ডাফরিনের ঢাকা আগমণের স্মরণে তিনি 'ডাফরিন মেমোরিয়াল হোস্টেল' স্থাপনে সহায়তা করেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের কথা ইতোপূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।[১৪৯]

নওয়াব পরিবারের আরেকজন উল্লেখযোগ্য দাতা ছিলেন খান বাহাদুর খাজা মোঃ আজম। আলীগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে ১৯১১ খ্রীঃ তিনি যে ৫ শত টাকা দান করেছিলেন তা আগেই বর্ণিত হয়েছে। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর নওয়াব হাবিবুল্লাহর সুহৃদ ও মুরুব্বী হিসেবে তিনি মূলত খাজা পরিবারের হাল ধরেছিলেন।[১৫০] প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তিনি কত যে দান করেছেন, তার কোন হদীস নেই। পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ১৯১৪ খ্রীঃ 'মুসলিম কাশ্মীরী কনফারেন্স' এর ৫ম বার্ষিকী অধিবেশনে খাজা মোঃ আজম সভাপতিত্ব করেন। উক্ত কনফারেন্সের উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি ৩ হাজার টাকা দান করেন।[১৫১] ১৯১৬ খ্রীঃ খাজা মোঃ আজম সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার জন্য ১০০০ টাকা দান করেন।[১৫২] তিনি ১৯১৮ সনে ঢাকা মিউজিয়ামে পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য ৫০০ টাকা দান করেন।[১৫৩]

নওয়াব সলিমুল্লাহর ছোট ভাই নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ একজন জনদরদী এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। নাজির হোসেন লিখেছেন, তাঁর উদারতার বহু কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে আছে।[১৫৪] তিনি অকৃপণ হস্তে দান খয়রাত করতেন বলে বহুবার ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।[১৫৫] একবার এক মহাজন আদালতের মাধ্যমে তাঁর পাওনা টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে নওয়াবজাদার নিকট নতি স্বীকার করেন। খাজা আতিকুল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে ঐ মহাজনের টাকা সুদাসলে দিয়ে দেন।[১৫৬] আগেই বলা হয়েছে, ১৯১১ খ্রীঃ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডে তিনি ১ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন। নওয়াব আব্দুল গণির জামাতা ও ঢাকা পৌর সভার এককালীন চেয়ারম্যান খাজা মোঃ আজগর একজন সদাশয়, সাধু ও অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিনামূল্যে গরীবদের তিনি হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন। নওয়াব আব্দুল গণির মত তিনিও ঢাকার রাস্তায় রূপার টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতেন।[১৫৭] এক পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, নওয়াব আহসানুল্লাহর জামাতা খাজা মোঃ ইসমাইল জবীহ, মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি একদিন ভোরবেলা শহরে ঘুরতে গিয়ে পোশাক বিহীন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখতে পান। তখন তাঁর কাছ দেয়ার মত কিছু না থাকায় তিনি নিজের গায়ের জামাটাই তাকে দান করে খালি গায়ে ঘরে ফিরে স্ত্রীর বকুনি খেয়েছিলেন।[১৫৮]

নওয়াব পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি অন্তপুর বাসিনী বেগম সাহেবারাও দান কাজে পিছিয়ে ছিলেন না। এ পরিবারের বেগমদের দান কাজ সাধারণত গোপনেই সাধিত হতো। কিন্তু অর্থ কষ্টের কারণে পরবর্তীকালে নওয়াবের দানশীলতায় ভাটা পড়লে পরিবারের অন্যান্যদের মতো অন্তপুরবাসিনীদের দান কাজও লোকের গোচরীভূত হতে শুরু করে। এবং তা থেকে বুঝা যায় দানকাজে তাঁরাও যথেষ্ট উদার ছিলেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর বিধবা স্ত্রী খোদেজা বেগম এবং নওয়াবজাদী পরীবানু কলকাতা অবস্থানকালে ১৯১৩ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাদেয় খাদ্য ভোজনের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তাঁরা ঐ বিদ্যালয়ের তহবিলে ১ শত টাকা দান করেন।[১৫৯] ১৯২৬ সালে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা অনাথ আশ্রমের এক হিন্দু যুবতীর বিয়ের জন্য আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকার ধনীদের নিকট অর্থ চেয়ে ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায় খোদেজা বেগম ঐ বিয়ের প্রায় সমস্ত ব্যয় বহনের মত ৫০ টাকা প্রদান করেন।[১৬০] ১৯১৩ খ্রীঃ নওয়াবজাদী আমিনা বানু লেডী কারমাইকেলের সাথে ঢাকা ইডেন স্কুলের এক বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদেন। ঐ অনুষ্ঠানে নওয়াবজাদী জনৈকা মুসলিম ছাত্রীকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন।[১৬১] নওয়াব সলিমুল্লাহর ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ঢাকার মুসলিম এতিমখানাটি নওয়াবের মৃত্যুর পর অর্থকষ্টে পতিত হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ নওয়াবের ভগ্নী নওয়াবজাদী আমিনা বানু এবং নওয়াবজাদী আক্তার বানু প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫০ টাকা করে দান করেন।[১৬২] নওয়াবজাদী আমিনা বানু ১৯১৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে লেডী কারমাইকেলের যুদ্ধ তহবিলে এককালীন ৫০০ টাকা দান করেন এবং প্রতি মাসে আরো ২৫ টাকা করে দানের প্রতিশ্রুতি দেন।[১৬৩] এছাড়া নওয়াব পরিবারের অন্তপুরবাসিনীরা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের এবং নিজ সন্তানদের পোশাকাদি এতিমখানায় অকৃপণভাবে দান করতেন। ১৯১৩ খ্রীঃ নওয়াবজাদী পরীবানু তাঁর গৃহ চিকিৎসক রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে নিজ সন্তানদের ব্যবহৃত অনেকগুলো মূল্যবান পোশাকাদি অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকাদের প্রদান করেন। ঐগুলোর মধ্যে কয়েকটি রেশম নির্মিত বহু মূল্যবান পোষাকও ছিল।[১৬৪] নওয়াব পরিবারের মহিলারা অনেক সময় এতিম সন্তানদের নিজের বাড়ীতে কাছে এনে লালন পালন করে বড় করে তুলতেন। খান বাহাদুর খাজা মোঃ আজমের স্ত্রী নওয়াবজাদী মেহেরবানুর সাথে কয়েকটি এতিম সন্তানদের এরূপ একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[১৬৫] ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার ক'দিন পরই উপাচার্য মিঃ হার্টগকে নওয়াব পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ এক সম্বর্ধনা দেয়া হয়। মেহেরবানু এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন।[১৬৫(ক)]

১৯১৩ খ্রীঃ জুন মাসে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকায় স্কুল সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ভোজন করানোর এক আয়োজন করা হয়। এসময় নওয়াবজাদী আমিনা বানু জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভোজন করানোর যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। এছাড়া নওয়াব আহসানুল্লাহর বিধবা স্ত্রী খোদেজা বেগম এবং নওয়াবজাদী পরীবানু উভয়ে মিলে ঢাকার দুটি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের ভোজন করানোর যাবতীয় ব্যয় বহন করেন।[১৬৬] নওয়াবজাদী আক্তার বানু দানকাজে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখে গেছেন। দরিদ্র মহিলাদের চিকিৎসার্থে ১৯৩৫ সালে তিনি তাঁর পিতার নামে ঢাকার টিকাটুলীতে 'আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হসপিটাল' নামে ৮ শয্যার একটি হাসপাতাল চালু করেছিলেন।[১৬৭] পরবর্তীতে হাসাপাতালের স্থলে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে তাঁর মায়ের নামে কামরুন্নেছা গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ তিনি তাঁর পিতার স্মরণে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের ভোজনালয়টি নিজ খরচে পাকা দালানে পরিণত করে দেন।[১৬৮]

৩(৬) ঢাকা নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা ঃ

ইস্টার্ণ বেংগল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের লেখক মিঃ বি.সি. এলেন জনকল্যাণমূলক কাজে ঢাকার নওয়াবদের উল্লেখযোগ্য দানের কথা জানতে চেয়ে ২১ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারকে এক পত্র দিয়েছিলেন। উক্ত পত্রোত্তরে নওয়াব এস্টেটের তৎকালীন চীফ ম্যানেজার কর্ণেল জে.হডিং.সি.আই.ই. ২৪ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ নওয়াবদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দানকাজের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছিলেন।[১৬৯] (পরিশিষ্ট নং ১১ পৃঃ৪১২তে পত্র দুটোর অনুলিপি দেয়া হলো)

 Dhaka University Institutional Repository

(১) ঢাকায় বিজলী বাতি প্রদানের কাজ	-	৪,৫০,০০০/- টাকা
(২) ঢাকায় পানীয় জলের কল সংস্থাপন	-	২,৫০,০০০/- "
(৩) স্যার আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড (ঢাকা) গঠন	-	১,০০,০০০/- "
(৪) স্যার আহসানুল্লাহ প্লেগ ফান্ড (ঢাকা) গঠন	-	১,০০,০০০/- "
(৫) ঢাকা ডাফরিন মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপন	-	৫০,০০০/- "

উক্ত পত্রে চীফ ম্যানেজার সাহেব আরো জানিয়েছিলেন যে, নওয়াব এস্টেট থেকে তখন দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে বা প্রতিষ্ঠানে কিংবা দুঃস্থদেরকে অনুদান বাবদ প্রতিবছর ২০,৫১১/-টাকা ব্যয় করা হতো।[১৭০] পরিশিষ্ট নং ১২ পৃঃ৪২৪ তে ১৮৬৮ খ্রীঃ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ঢাকার নওয়াবগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে এবং হিসাব রেখে যেসব দান করা হয়েছিল, তার একটি তালিকা দেয়া হলো। এই দুস্প্রাপ্য তালিকাটি 'ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট'- এর পুরানো অফিস, এডওয়ার্ড হাউস, কুমারটুলি, ঢাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় এস্টেটের তৎকালীন চীফ ম্যানেজার কর্ণেল জে.হডিং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ লিমেসুরিয়র-কে প্রদানের জন্য ১৯০৭ খ্রীঃ তালিকাটি তৈরী করেছিলেন।[১৭১] তালিকাটি প্রদানের সময় চীফ ম্যানেজার সাহেব এর সংশ্লিষ্ট অগ্রায়ন পত্রে (১৪ ফেব্রুঃ ১৯০৭) লিখেছিলেন, 'এই তালিকাটি পূর্ণাংগ নয়। কারণ- হিসাব রাখা ছাড়া বহু অর্থই দান অথবা ধার দেয়ার নামে প্রদান করা হতো, যা আর আদায় হতো না। এছাড়া নওয়াব আহসানুল্লাহর একক দায়িত্বে বি. ই. প্রপার্টি থাকাকালে তিনি তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে যেসব দান-খয়রাত করতেন তাও জানা সম্ভব নয়। তদুপরি এ তালিকায় বর্ণিত দান ছাড়াও মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে ৭টি দাতব্য চিকিৎসালয় চালানোর জন্য বছরে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা এবং স্কুল ও মাদ্রাসা চালানোর জন্য বছরে ৫,২০৮/- টাকা খরচ করা হয়ে থাকে। এছাড়া হোসেনী দালানের খরচের ঘাটতি পূরণেও বছরে ১ থেকে ২ হাজার টাকা দান করা হয়ে থাকে।'[১৭২]

উল্লেখ্য, ঢাকার নওয়াবদের অর্থ দানের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ তাঁর 'নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছিলেন।[১৭৩] কিন্তু ১৯০২ সালের পরে দানকৃত তথ্যগুলি তাঁর উক্ত তালিকায় ছিলনা। আমাদের সংগৃহীত তালিকায় ১৯০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত দানের বিস্তারিত তথ্যাদি রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, জমিদারি পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক টানা পোড়েনের জন্য ১৯০৭ খ্রীঃ থেকেই নওয়াব এস্টেট সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে চলে যাওয়া শুরু করে। তাই এর পর আর দানকাজে ঢাকার নওয়াবরা তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। তবুও ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যারা ঐ সময় যেসব দান খয়রাত করেছিলেন তাও নেহায়েত কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অনুরূপ কোন প্রমাণ্য তালিকা না থাকায় পরবর্তী কালে তাঁদের দান কাজের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। এছাড়া ১৮৬৮ খ্রীঃ পূর্বে অর্থাৎ ঢাকার খাজা পরিবারের উত্থানকালে খাজা আলীমুল্লাহ কর্তৃক এবং নওয়াব আব্দুল গণির প্রথম জীবনে যেসব দানের কাজ করা হয়েছিল, তথ্যের অভাবে সেটাও অত্র তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়নি।

যাহোক নওয়াবদের অর্থ দানের বিষয়ে প্রফেসর আব্দুল্লাহর প্রকাশিত উক্ত তালিকার সাথে আমাদের উদ্ধারকৃত তালিকাটি মিলিয়ে যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করে বর্তমান তালিকাটি উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৮১
২। বার্ট, *ট্রুয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১
৩। বাকল্যান্ড, *গ্রীম্পসেস অব বেংগল,* পৃঃ ২০০ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১
৪। ঢাকা প্রকাশ ২ ও ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬ পৃঃ ২৯৬, ৩০৬। ১৮৬৬ সালে মামলা চালাতে অপারগ, ঢাকার এক ফরিয়াদিকে আঃ গণি অর্থ প্রদানসহ নিজের মোক্তারকে নিযুক্ত করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১০ জুন, ১৮৬৬ পৃঃ ১৫৩।
৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩ বৈশাখ, ১২৭১ (১৮৬৪) পৃঃ ৫১
৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেম্বর ১৮৬৪ পৃঃ ৪২৬। সম্ভবত ঢাকা প্রকাশ আঃ গণির দানকাজের কথা যথাযথ স্টাডি না করেই ৩ বৈশাখ প্রকাশিত প্রবন্ধে তাঁকে সমালোচনা করেছিলেন। পরে হয়তো আঃ গণির পক্ষ থেকে ঢাকা প্রকাশকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেয়া হলে- ঢাকা প্রকাশ উক্ত খরব প্রকাশ করে।
৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ পৃঃ ৪৩৬-৩৭। ১৮৭২ খ্রীঃ গণি মিয়া তাঁর অবৈতনিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে পুরস্কার বিতরণ করেন তা প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল, এ কার্যটি গণি মিয়ার পক্ষে একাদশীর উপবাস স্বরূপ। তিন-চার বছর পর ছাত্রদের দেড়-দু'শ টাকার পুরস্কার দেয়া তাঁর জন্য বড় সুখ্যাতির বিষয় নয় এবং সেটা না দিলেও আমরা অখ্যাতি করতাম না। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মে ১৮৭২ পৃঃ ৯০।
৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ পৃঃ ৪৩৬-৩৭ এবং হান্টার, ভল্যুম-৫, পৃঃ ১৪৯ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* পৃঃ ৫৭ এবং ক্লে থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১০।
৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬
১০। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃ- ৩৫
১১। ঢাকা প্রকাশ, ৪মে ১৮৭৩ পৃঃ ৯১
১২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ মে ১৮৭৪ পৃঃ ৯২
১৩। দি ইংলিশম্যান, ২৫ আগস্ট ১৮৯৬ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩।
১৪। ঢাকা প্রকাশ, ৮ আগস্ট১৮৬৯ পৃঃ ২৫৬ এবং লোকনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯০।
১৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৫ নভেম্বর ১৮৮৫, পৃঃ ৩৪৩ ও ৩৭৯।
১৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ পৃঃ ৭
১৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪ (আবুযোহা নুর আহমদ ও তৈফুর সাহেব ঐ সময় নওয়াবের অর্থদানের অংকটা ২৫ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন)
১৮। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৪-৪৫ এবং অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং- ২ দ্রঃ
১৮(ক) খাজা লতিফুল্লাহ, *দি ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচী ১ এপ্রিল ১৯৯২।*
১৯। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৪-৪৫ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* পৃঃ ৫৪।
২০। আবুয যোহানুর আহমদ, ঊনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, ১ম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫, পৃঃ ১৬-১৭।
২১। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *ঐ* পৃঃ ২৪৫ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪১
২২। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৬ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪৬।
২৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০
২৪। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৮ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *আব্দুল গণিও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫।
২৫। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৪৯।
২৬। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৮
২৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেম্বর ১৮৭৪ পৃঃ ৪০৩
২৮। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৮ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪১। কৃষ্ণ প্রসাদ ওরফে রাজাবাবু ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ও ইংরেজ সরকারের দেওয়ান, ভীখণ লাল ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন। লক্ষ্মী বাজারে তাঁর বাসভবন ও মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট ময়দান ছিল। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৪৩-৪৫ এবং দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১০
২৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫ পৃঃ ৫
৩০। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৫০ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২
৩১। ঐ পৃঃ ২৪৯ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ৩৩
৩২। ঐ পৃঃ ২৫২-৫৩ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪২
৩৩। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৪৭ থেকে উদ্ধৃত- *ঐ মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪২, এবং *পুরানো দলিল* দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। মামুন, ঢাকার কাগুজে নবাব (হৃদয় নাথের ঢাকা শহর, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুঃ ১৯৯৫) প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৯ এবং মামুন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১। উল্লেখ্য, প্রফেসর মামুন, ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত নওয়াবের দানের তালিকাটি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু উক্ত তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল যে, "৫০০ টাকার উর্ধ্বের দানগুলোই শুধু এখানে প্রকাশ করা হলো। বলা বাহুল্য, অনেক দানের কথাই আমাদের জানা নাই- এছাড়া দৈনন্দিন ও বিভিন্ন পর্বোপলক্ষে যে বিপুল পরিমাণে দান করা হতো, তাও এখানে উল্লেখ করা হলো না। এছাড়া আমরা নিজেরাও বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিকট থেকে যে আর্থিক সাহায্য পেয়েছি, তাও এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না"। যে যুগে টাকার মূল্য আজকের তুলনায় ৩/৪শ গুণ বেশি ছিল, সে যুগে নওয়াবের ৫০০ টাকার নিচে সংখ্যায় অগণিত দানের কথা কোন বিবেচনায় না এনেই প্রফেসর মামুনের দেয়া উপরোক্ত বক্তব্যে, নওয়াব আব্দুল গণিকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ধার্মিক মুসলমানেরা প্রায় সকলেই প্রকাশ্যের চেয়ে অপ্রকাশ্যে দান বেশী করে থাকেন। নওয়াব আব্দুল গণিও এর ব্যতিক্রম নয়। এছাড়া ঢাকা প্রকাশ যেখানে নিজেরাই জানিয়েছে, অনেক দানের কথাই তাদের অজানা ছিল। সম্প্রতি ঢাকা নওয়াব এস্টেট পুরাতন অফিস এডওয়ার্ড হাউজ থেকে আমরা নওয়াবদের অর্থদানের একটি তালিকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তাতে দেখা যাচ্ছে, নওয়াব আব্দুল গণি, বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের প্রজা সাধারণের জন্য দান করেছেন। (পরিশিষ্ট নং ১২ দ্রঃ)
যদিও উক্ত তালিকাটিও স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় এবং তালিকা প্রস্তুতকারী নওয়াব এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজারের ভাষায়, 'এ ছাড়াও তালিকা বিহীনভাবে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দরিদ্র-দুঃস্থদের মধ্যে প্রচুর দান করা হয়'। তবুও আমাদের উদ্ধারকৃত নওয়াবদের উক্ত দানের তালিকাটিই প্রফেসর মামুনের উক্ত বক্তব্য অসার প্রমাণ করতে যথেষ্ট।

৩৫। সি.ই. বাকল্যান্ড, *বেংগল আন্ডার লেঃ গভঃ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২৯।

৩৬। মোসলেম ক্রনিকল, ২৯ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৩৮৯।

৩৭। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১।

৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭

৩৯। সি.ই. বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩০।

৪০। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ পৃঃ ৪

৪১। ঢাকা প্রকাশ ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ পৃঃ ৩০৩।

৪২। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জুলাই, ১৮৭২ পৃঃ ২১১।

৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ৪মে ১৮৭৩ পৃঃ ৯১।

৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৪মে ১৮৭৪ পৃঃ ১৩০।

৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেম্বর ১৮৭৪ পৃঃ ৩৯৯।

৪৬। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক-৮১ দ্রঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২১ নভেম্বর ১৮৭৫ পৃঃ ৩৯১। উল্লেখ্য, ১৮৭২ খ্রীঃ মিটফোর্ড হাসাপাতালে 'আহসানুল্লাহ ফিমেল ওয়ার্ড' নির্মাণে নওয়াব আব্দুল গণি ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন বলে আবু যোহা নুর আহমদ যে তথ্য দিয়েছেন, তার কোন ভিত্তি নেই। (আবু যোহা নুর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬-১৭ এবং আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলি, ৩৩) অন্যদিকে তৈফুর সাহেব লিখেছেন, ১৮৯৬ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত ফিমেল ওয়ার্ড নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালকে ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন (তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃ- ৩২৭) তথ্যটিও সঠিক নয়।

৪৭। ঢাকা প্রকাশ ৪ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৪৪ এবং মোঃ আব্দুল কাইউম চকবাজারের কেতাবপট্টি, ঢাকা- নভেম্বর ১৯৯০ খ্রীঃ পৃঃ ৪৮ দ্রঃ। সমাজ সম্মিলনীর বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় নং ৪ দ্রঃ)

৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৬৮।

৪৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ মে ১৮৮২ পৃঃ ১২৮।

৫০। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জুলাই ১৮৮২ পৃঃ ২২৮।

৫১। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮২ পৃঃ ৪২৮।

৫২। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ পৃঃ ৫৩৬।

৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগস্ট ১৮৮৪ পৃঃ ২৭২ এবং ৮ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ১০।

৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ পৃঃ ৩৪৩, এজন্য নওয়াব আব্দুল গণি ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন, ঐ ১৫ নভেম্বর ১৮৮৫ পৃঃ ৩৮০।

৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ নভেম্বর ১৮৮৫ পৃঃ ৩৮০।

৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেম্বর ১৮৮৮ পৃঃ ৮।

৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মে ১৮৮৮ পৃঃ ৭

৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন ১৮৮৮ পৃঃ ৬

৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৯ পৃঃ ৬।

৬০। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জানুয়ারী ১৮৯৬ পৃঃ ৬-৮। পরে খবর বের হয় ঐ টাকায় বুড়ীগংগা খনন ও নওয়াবের বেগুনবাড়ী প্রাসাদে যাওয়ার পথে তুরাগ নদী খননেই প্রধানত ব্যয় হবে (ঢাকা প্রকাশ, ১৬ফেব্রুঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৬) এবং সেই সাথে ডিঃ বোর্ডের আরো ১০ হাজার টাকা দিয়ে নদীতে যে স্পার নির্মাণ করা হয়, তাতে তেমন ফল হয়নি। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেম্বর ১৮৯৬ এবং ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ পৃঃ ৭।

৬১। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬২। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ পৃঃ ৫।
৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ও ২০ সেপ্টেম্বর, ১১ অক্টোবর ১৮৯৬ পৃঃ ৬, ৫ ও ৭ এবং ২ অক্টোবর ১৯৯৮ এবং ২০ আগস্ট ১৮৯৯, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯০৫; ১ এপ্রিল ১৯০৬ দ্রঃ
৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোবর ১৮৯৬ পৃঃ ৭।
৬৫। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মে ১৯০১ এবং আবদুল্লাহ, *আবদুল গণি ও আহঃ* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭।
৬৬। ঢাকা প্রকাশ বলেন, এরমধ্যে ৮ হাজার টাকা ইংরেজরা তাঁদের ক্লাবেই খরচ করেছেন। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন ১৯০০ পৃঃ ৬।
৬৭। *পুরানো নথি*, ডি ঃ পৃঃ ১৭-১৮ দ্রঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৮ মে ১৮৯৮ পৃঃ ৬-৭।
৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ও ২৭ নভেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৭ এবং ১০ জুলাই ১৯০৪ পৃঃ ৪ এবং মামুন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭।
৬৮(ক)। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ পৃঃ ৫৫৮ (১৭ ফাল্গুন ১২৯২ বাংলা)।
৬৯। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জানুয়ারী ১৮৯৯ পৃঃ ৬।
৭০। ঢাকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ পৃঃ ৫।
৭১। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জানুয়ারী ১৯০০ পৃঃ ৪।
৭২। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ এপ্রিল ১৯০০ পৃঃ ৭।
৭৩। নওয়াব এস্টেট থেকে এই হাসাপাতালের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৯০০ পৃঃ ৭।
৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃঃ ৮।
৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ পৃঃ ৭।
৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ আগস্ট, ১৯০১ পৃঃ ৭।
৭৭। মোসলেম ক্রনিকেল একাজে দানের অংক আড়াই লক্ষ টাকা বলেছেন। দেখুন ঃ- ৫ নভেম্বর ১৮৯৮ পৃঃ ১০৬২ এবং আবদুল্লাহ, *আবদুল গণি ও আহসানুল্লাহ* পৃঃ ৭৫। তায়েশ দানের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা বলেছেন। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, বংগানুবাদ পৃঃ ২০০।
৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪ এবং বাকল্যান্ড গ্লিম্পসেস অব বেংগল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৭।
৭৯। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, পৃঃ ২৮৪-৮৮ থেকে উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *আবদুল গণি ও আহসানুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬। ঢাকা প্রকাশে ৪০,০০০ টাকার কথা বলা হয়েছে। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৬৩।
৮০। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, পৃঃ ২৮৪-৮৮ থেকে উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬।
৮১। জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১ এবং আবদুল্লাহ, *আবদুল গণি ও আহসানুল্লাহ*, পৃঃ ৭৬। ১৯১২ সালে প্রকাশিত উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা চরিতাভিধান থেকে নওয়াব আহসানুল্লাহর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্থদানের অংক সম্বলিত একটি তালিকা প্রফেসর মুনতাসির মামুন তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। মামুন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।
৮২। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯২।
৮৩। *পুরানো নথি*, চীফ ম্যানেজারের পত্র, ডি-পৃঃ ১৩-১৪।
৮৪। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৭।
৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ পৃঃ ৪।
৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জুলাই, ৬ ও ১৩ আগস্ট, ১২ নভেম্বর ১৮৯৩ এবং ১৪ জানুঃ ১৮ ফেব্রুঃ ১৮৯৪।
৮৭। দেওয়ান শফিউল আলম, নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর ১ম প্রকাশ ১৯৬৪ পৃঃ ৮-১০ এবং আবুযোহা নুর আহমদ, ঊনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ পৃঃ ১৯।
৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ১২ নভেম্বর ১৮৯৩ পৃঃ ৫।
৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪ পৃঃ ৯।
৯০। *পুরানো নথিপত্র*, ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে প্রাপ্ত।
৯১। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৫ থেকে উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ৩৯।
৯২। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০২ পৃঃ ৬।
৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪, *পুরানো নথি*, দ্রঃ এ প্রসংগে ঢাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নিতে নগরবাসীর পক্ষে ঢাকা প্রকাশ নওয়াব সাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪।
৯৪। ঢাকা প্রকাশ, ১১ মে ১৯০২ পৃঃ ৪।
৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ১১ মে ১৯০২ পৃঃ ৪।
৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুন ১৯০২ পৃঃ ৩।
৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগস্ট ১৯০২।
৯৮। *ঐ*, ২১সেপ্টেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৫। এছাড়া নওয়াব সলিমুল্লাহ নেত্রকোনা মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ৩৩৩০ টাকা দান করেন। অর্থ দানের তালিকায় ১৯০২ সালের দান দ্রঃ এবং মুক্তি দূত, প্রাগুক্ত পৃঃ৭৫।
৯৯। *ঐ* সময় স্কুলের ছাত্রদের ভোজনের ব্যয় বাবু লাল মোহন সাহা বহন করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ নভেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৪ এবং ২৮ ডিসেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৪ এবং ৪ জানুয়ারী ১৯০৩ পৃঃ ৩।
১০০। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ নভেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

১০১। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ডিসেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৩।
১০২। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৪ এবং ২৯ নভেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর ১৯০৩ পৃঃ ৩।
১০৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ পৃঃ ৪।
১০৪। ঢাকা প্রকাশ, ১০ মে ১৯০৩ পৃঃ ৬।
১০৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৯০৩।
১০৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ নভেম্বর ১৯০৩ পৃঃ ৩।
১০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল ১৯০৪ পৃঃ ৩।
১০৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুন ১৯০৪ পৃঃ ৩।
১০৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জুলাই ১৯০৪ পৃঃ ৩।
১১০। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ মে ১৯০৪ পৃঃ ৪।
১১১। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ মার্চ ১৯০৫ পৃঃ ৩ (দানের তালিকায় এ কাজে ২৫ হাজার টাকার কথা উল্লেখ আছে)।
১১২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ বৈশাখ ১৩২২ বাংলা পৃঃ ৩।
১১৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জুলাই ১৯০৫ পৃঃ ৩।
১১৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৫ পৃঃ ৩। ১৮৮৮ খ্রীঃ বড়লাট ডাফরিনের ঢাকা আগমনোপোলক্ষে ঢাকার কমিশনার ও নওয়াব আহসানুল্লাহ বড়লাটের নামে উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০২ খ্রীঃ ২৪ জুলাই ছোটলাট উডবার্ণ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। (ঢাকা প্রঃ ১১ নভে, ১৮৮৮ পৃঃ ৬ এবং ২৭ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৩ এবং নওয়াবদের অর্থদানের তালিকায় ১৯০৪ সালের দান দ্রঃ।
১১৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জানুয়ারী ১৯০৬। উল্লেখ্য, নওয়াব সলিমুল্লাহই প্রথম ঢাকা শহরে মোটরগাড়ী কিনে এনে ব্যবহার শুরু করেছিলেন।
১১৬। ঢাকা প্রকাশ, ১১ মার্চ ১৯০৬ পৃঃ ৪।
১১৭। দানী, *ঢাকা*, ২য় সংস্করণ ১৯৬২ পৃঃ ১৩৩। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এজন্য ৩৫,১৫০ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। বাঁকী টাকা চাঁদা তুলে এবং সরকারের নিকট থেকে আবেদনের মাধ্যমে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চাঁদা সংগ্রহের জন্য সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯১২ খ্রীঃ ছোট লাট স্যার স্টুয়ার্ট বেলী ঢাকা কলেজ প্রাংগনে এ হলের ভিত্তিও স্থাপন করেন। (ঢাকা প্রকাশ, ২৪ মার্চ ১৯১২) কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি মোহামেডান হলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে কাজটি স্থগিত হয়ে যায়। (*প্রসিডিংস অব দ্য ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স* ১৯০৬, ১৯০৮, ১৯১০ (উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১৩২-৩৩ দ্রঃ)।
১১৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ ৩। রাজনীতি করতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০১ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ করেন। মোহতারাম, *সাপ্তাহিক হোলিডে*, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।
১১৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ ৪।
১২০। ১৯৫৯ সালে লেখা চীফ ম্যানেজারের রিপোর্ট, *পুরানো দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩-৪।
১২১। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জুলাই ১৯০৭ পৃঃ ৩।
১২২। এস.এম. ইকরাম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮ এবং আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ৭০।
১২৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ পৃঃ ৪।
১২৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ আগস্ট ১৯১০ পৃঃ ৩-৪।
১২৫। বদরুদ্দিন আহমদ, *জাগরণ*, ১৩৩৫ বাংলা ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা পৃঃ ১৬৮, এবং ঢাকা প্রকাশ, ৭ মে ১৯১১ পৃঃ ৪।
১২৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জুলাই ১৯১১ পৃঃ ৩ এবং বদরুদ্দিন আহমদ, জাগরণ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ বাং, পৃঃ ১৬৮।
১২৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জুলাই ১৯১২ পৃঃ ৭।
১২৮। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯১৪।
১২৯। বদর উদ্দিন আহমদ, *মাসিক জাগরণ*, এস. আহমদ সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ঢাকা-১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৫ বাং, পৃঃ ১৬৮-৬৯।
১৩০। উক্ত কনফারেন্সে আগত অতিথিদের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করেছিলেন। ঐ ট্রেনের ভাড়া বাকী থাকায় তাগাদা দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ নওয়াবকে যে পত্র দেন তা আজো আহসান মঞ্জিলে সংরক্ষিত আছে। পুরাতন দলিলপত্র, প্রাগুক্ত দ্রঃ।
১৩১। বদর উদ্দিন আহমদ, *জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৮-৬৯।
১৩২। বদর উদ্দিন আহমদ, *জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৮-৬৯।
১৩৩। উক্ত দরখাস্তগুলো নওয়াবদের আর্থিক টানা পোড়েন কালের। তবুও তাতে তিনি জনপ্রতি ২/১ টাকা থেকে শুরু করে ২০/৫০ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুর করেছিলেন। *পুরানো দলিলপত্র*, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।
১৩৪। *পুরানো দলিলপত্র*, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।
১৩৫। বদর উদ্দিন আহমদ, *জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৮-৬৯।
১৩৬। বদর উদ্দিন আহমদ, *জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৯-৭০।
১৩৭। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮। মোঃ আঃ হালিম, মুর্শিদাবাদ ও সিরাজ পরিবার পৃঃ ৭৬-৭৭ এবং ৪৮।

১৩৯। সাধনা, ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩২৮ বাংলা পৃঃ ২-৬।

১৪০। অক্ষয় কুমার বসু, মজুমদার-বরিশালে জননেতা শরৎচন্দ্রগুহ ও তৎকালীন বরিশাল ও বাংলা, কলকাতা ১৩৬৪ পৃঃ ৪৯ থকে উদ্ধৃত করেছেন, ওয়াকিল আহমদ, হেমায়েতউদ্দিন আহমদ, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ১০ সংখ্যা ১৯৮১ পৃঃ ১৮। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুপন্ডিত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন, একবার রোগাগ্রস্ত হয়ে অর্থকষ্টে পড়েন। মহারাজা সুর্য্যকান্ত আচার্য ১৮/২/১৯০২ তারিখে একটি পত্র দ্বারা নওয়াব সলিমুল্লাহকে তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে অনুরোধ করেন। (পুরাতন দলিল পত্র দ্রঃ) জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পৌত্র বাবু নিশিকান্ত বোস, প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন বিভাগে ম্যাজিঃ চাকুরী প্রার্থী ছিলেন। তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহর সুপারিশের আশায় সন্তোষের রাজা এম.এন.রায় চৌধুরীর ২০ সেপ্টেঃ ১৯০৪ তাং লেখা একটি অনুরোধ পত্র নিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে দেখা করেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত উক্ত বাবু নিশিকান্ত বোস,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ধারী এবং সন্তোষের রাজার আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের উপর নওয়াবের এতই প্রভাব ছিল যে, তাঁর সুপারিশ ছাড়া সেদিন নিশিকান্তের চাকুরী হচ্ছিল না *(পুরাতন দলিল* পত্র, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত দ্রঃ।)

১৪১। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত ৩য় সংস্করণ ১৯৯৫ পৃঃ ৪৯৪।

১৪২। বাংলায় ভ্রমণ (দ্বিতীয় খন্ড) ১৯৪০, পুর্ববংগ রেলওয়ে প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত পৃঃ ৫২)।

১৪৩। *জাগরণ,* ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫ পৃঃ ৩৫।

১৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ আগস্ট ১৯২৩ পৃঃ ৩।

১৪৫। *জাগরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

১৪৬। *লেইং অব ফাউন্ডেশন স্টোন অব দি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, স্পিচবাই, ভি.সি. আগস্ট* ২২, ১৯২৯ *পৃঃ ৪।*

১৪৭। আজাদ, ঢাকা ২২ নভেম্বর ১৯৫৮ থেকে উদ্ধৃত আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ১৭১।

১৪৮। মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ন, পৌষ, মাঘ, ১৩৭৩ পৃঃ ১১৭ থেকে উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৭২।

১৪৯। ঢাকা প্রকাশ, ৯ ডিসেম্বর ১৯২৩ থেকে উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৬৮।

১৫০। আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪২।

১৫১। জ্যোতিষ চন্দ্র দাসগুপ্ত, পৃঃ ১১-১২ থেকে উদ্ধৃত, আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ১৪৩।

১৫২। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ এপ্রিল ১৯১৬ পৃঃ ৩।

১৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুন ১৯১৮ পৃঃ ৩।

১৫৪। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪৫।

১৫৫। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৫৫২।

১৫৬। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৫৪৫-৪৬।

১৫৭। আদিনাথ সেন, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত-মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯।

১৫৮। খাজা ইসমাইলের কন্যা, নাজমাকদর-এর মৌখিক ভাষ্য থেকে সংগৃহীত। (জানুয়ারী ১৯৯৪)

১৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জানুয়ারী ১৯১৩ পৃঃ ৩।

১৬০। ঢাকা প্রকাশ, ৬ জুন ১৯২৬ পৃঃ ৩।

১৬১। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ পৃঃ ৩।

১৬২। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ পৃঃ ৩।

১৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ পৃঃ ৩।

১৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুন ১৯১৩ পৃঃ ৩।

১৬৫। চিত্রটি নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর পুত্র মরহুম খাজা লতিফুল্লাহর সৌজন্যে প্রাপ্ত। অত্র গ্রন্থের অধ্যায় নং ২ পৃঃ দ্রঃ

১৬৫(ক)। মুহঃ আবুতালিব, নওয়াবজাদি মেহেরবানু, দৈনিক ইনকিলাব ২৪ জুন ১৯৯৪ এবং অনুপম হায়াত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪

১৬৬। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুন ১৯১৩ পৃঃ ৩।

১৬৭। *পুরানো দলিল পত্র,* প্রাগুক্ত এ্যানুয়াল রিপোর্ট, ---- হসপিটাল, ১৯৩৮ দ্রঃ এবং আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৯।

১৬৮। উক্ত ভোজনালয়ের গাত্রে স্থাপিত শিলালিপিতে আজো নওয়াবজাদির সেই দানের কথা ঘোষণা করছে। (চিত্র নং ২৪ দ্রঃ)

১৬৯। *পুরানো নথি,* ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৫-১৬।

১৭০। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৬।

১৭১-১৭২। মিঃ লিমেসুরিয়ারকে প্রদত্ত চীফ ম্যানেজারের পত্র, ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৩-১৪।

১৭৩। মোঃ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯০।

 Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জনকল্যাণে বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান

৪(১) নওয়াব আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড গঠন ঃ

আগেই বর্ণিত হয়েছে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পিতা নওয়াব আব্দুল গণিকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। পিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই গভীর ছিল যে, পিতাকে ছেড়ে তিনি বেশীক্ষণ বাইরে কোথাও থাকতে পারতেন না।[১] ১৮৮৮ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড ডাফরিন এবং লেডী ডাফরিন ঢাকা সফরে এলে নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁদেরকে আহসান মঞ্জিলে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। আগন্তুকেরা ঐ সময় পিতা ও পুত্রের মধ্যে গভীর সৌহার্দ ও মমত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। লেডী ডাফরিন তাঁর সফর নামায় নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহর পারস্পরিক হৃদ্যতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল গণির এতই বেশী অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি পিতার সাহচর্য্য ব্যতীত বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না। পিতাকে ছাড়া শিকারে কিংবা অন্য কোন কাজে ঢাকার বাইরে গিয়ে তিনি অর্ধদিবসও থাকতেন না।[২] ক্লাউড ক্যাম্পবেলও তাঁর গ্রন্থে নওয়াব আহসানুল্লাহর পিতৃভক্তি সম্পর্কে অনুরূপ তথ্যাদি দিয়েছেন।[৩]

১৮৯৬ খ্রীঃ ২৪ আগষ্ট সোমবার প্রাতে ৮টা ১০ মিনিটের সময় ৮৩ বছর ২৫ দিন বয়সে নওয়াব আব্দুল গণি ইন্তেকাল করেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ পিতৃশোকে এতই কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, দাফন কাজের জন্য পিতার মরদেহের অনুগমন করে গোরস্থান পর্যন্ত যাওয়ার শক্তিটুকুও তাঁর ছিল না। ফলে নওয়াব আহসানুল্লাহকে রেখেই তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা আব্দুল গণির মরদেহ কবর স্থানে নিয়ে দাফন করেন।[৪]

যদিও ১৮৬৮ খ্রীঃ নওয়াব এস্টেট পরিচালনার দায়িত্বভার আনুষ্ঠানিকভাবে নওয়াব আহসানুল্লাহর উপর বর্তায়। কিন্তু পরোক্ষভাবে নওয়াব আব্দুল গণিই এস্টেটের কাজ চালাতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর নামে তা পরিচালিত হতো মাত্র। অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পিতার সাথে পরামর্শ ছাড়া নওয়াব আহসানুল্লাহ কোন কাজই করতেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেকে একেবারে অসহায় ভাবলেন। এমতাবস্থায় পিতার মৃত্যুর ক'দিন পর ১৮৯৬ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি ঢাকার সাধারণ মুসলমানদের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রত্যেক মহল্লার সর্দারকে নিজগৃহে ডেকে এনে একটা সভা করেন। উক্ত সভায় তিনি বিনীতভাবে বলেছিলেন, "পিতার মৃত্যুতে আমি পরামর্শ করতে পারি পরিবারে এমন কেউ নেই। পরিবারের অনেকেই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তাঁরা আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেছে। মোকদ্দমায় অন্যূন ১০ বছর সময় লাগবে। আমার বয়স বর্তমানে ৫০ বছর। মোকদ্দমায় জিতলেও আর অধিক দিন ভোগের আশা নেই। হারলে নিঃসম্বল হতে হবে। অতএব পূর্বেই আমি সব পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করি। এই যে সম্পত্তি দেখছেন, এতে আপনাদেরও অধিকার আছে। এমতাবস্থায় যাতে এটা রক্ষা পায়, আপনারা সকলে মিলে তার উপায় বের করুন। আপনারা এখন নিজ নিজ ঘরে গিয়ে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ করুন। সকলের পরামর্শে যা ভাল হয় অবিলম্বে আমাকে সে উপদেশ দেবেন। আমি দেখেছি সম্প্রতি এখানে অনেকের অন্ন কষ্ট হচ্ছে। যাতে সকলে স্বল্পমূল্যে চাল পেতে পারে, সেজন্য আমি

Dhaka University Institutional Repository

চাল আনাচ্ছি। ইতোমধ্যে চাল কতক এসেছে, আরো আসবে। দরিদ্ররা যাতে সে চাল পেতে পারে আপনারা তার ব্যবস্থা করবেন।"[৫]

এরপর নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খ্রীঃ বুধবার সকালে ঢাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজ বাসভবনে ডেকে এনে পুনরায় এক সভা করেন। উক্ত সভায় তিনি বলেন যে, তাঁর মরহুম পিতার স্মরণে তাঁদের পরামর্শমত তিনি ঢাকার জনগণের হিতার্থে কোন একটি স্থায়ী কাজ করতে চান। এজন্য প্রয়োজনে তিনি ৫০ হাজার টাকারো বেশি দিতে রাজী আছেন বলে জানান। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে দু'দিন সময় চেয়ে বিদায় নেন।[৬]

শেষ পর্যন্ত ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খ্রীঃ শুক্রবার ঢাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরামর্শে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পিতার স্মরণে এতটা পরিমাণ অর্থ স্থায়ীভাবে দান করতে সম্মত হন, যা দ্বারা বার্ষিক অন্যূন ৫ হাজার টাকা আয় হতে পারে। প্রথমত সুদের মাধ্যমে বার্ষিক ৫ হাজার টাকা আয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পৌণে দুইলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ (প্রমেসরী নোট) ক্রয়ের কথা উঠেছিল। নওয়াব বাহাদুর তাতে প্রায় সম্মতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিমদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় কারণে সুদ গ্রহণে আপত্তি উঠে। অবশেষে বার্ষিক ৫ হাজার টাকা আয়ের উপযোগী জমিদারি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ ৫ হাজার টাকা দূর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-খরা, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি দৈব-দূর্ঘটনায় দুর্গত লোকের কষ্ট নিবারণে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ব্যয় করা হবে। কিন্তু অনুরূপ দুর্ঘটনা না ঘটলে ২/৪ বছরের টাকা একত্রে ব্যাংকে জমিয়ে রাখা হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনের সময় ঐ সঞ্চিত টাকা থেকে যথাসাধ্য ব্যয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭]

নওয়াবের দানকৃত টাকায় বার্ষিক ৫ হাজার টাকা আয়যোগ্য জমিদারি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং আয়কৃত টাকার যথোপযুক্ত ব্যয়ের নিমিত্তে ১৮৯৬ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন।[৮]

(১) নওয়াব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন খান বাহাদুর, শায়েস্তাবাদ (বরিশাল) এর জমিদার।
(২) বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী
(৩) বাবু পূর্ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,
(৪) বাবু মোহিনী মোহন দাস,
(৫) বাবু রাধিকা মোহন বসাক,
(৬) বাবু অক্ষয় কুমার সেন,
(৭) বাবু ত্রৈলক্য নাথ বসু,
(৮) মৌলভী আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক,
(৯) খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন (সেক্রেটারী),
(১০) মৌলভী ফজলুল করিম,
(১১) সৈয়দ মুহম্মদ আলী।

নওয়াব বাহাদুর আরো ঘোষণা করেন যে, উক্ত আয়ের জমিদারি ক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি বার্ষিক ৫ হাজার টাকা করে উক্ত রিলিফ ফান্ডে জমা দিতে থাকবেন। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীঃ উক্ত ফান্ডে নওয়াবের দানকৃত ৫ হাজার টাকায় ঢাকা অঞ্চলের দূর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য চাল কেনা হয়েছিল।[৯] উক্ত ট্রাস্টি যাতে পরবর্তীকালে অটুট ও কার্যক্ষম থাকে সেজন্য নিয়ম করা হয় যে, ট্রাস্টির সদস্যরা মিলে শূন্যপদে উপযুক্ত লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। কোন সময় তাঁরা লোক নিয়োগে অপারগ হলে ডিঃ জজ সাহেব ট্রাস্টি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে নওয়াবের শুভাকাঙ্খী ছাড়া কেউ ট্রাস্টি হতে পারবেন না।[১০] আরো নিয়ম করা হয় যে, নওয়াব বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মত নিয়ে প্রতি বছর ট্রাস্টিগণ নিজেদের মধ্যে থেকে তিনজনকে কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। কার্য নির্বাহকগণ নওয়াবের মত নিয়ে ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের কাজ করবেন। প্রথম বছর কার্য নির্বাহের জন্য (১) বাবু অক্ষয় কুমার সেন, (২) বাবু মোহিনী মোহন দাস ও (৩) সৈয়দ আওলাদ হোসেনকে মনোনীত করা হয়। নওয়াব সাহেব ঘোষণা দেন যে, তিনি দুই বছরের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কিনে দেবেন। অন্যথায় ট্রাস্টিরাই তা কিনে নিতে পারবেন।[১১] শেষ পর্যন্ত নওয়াব এস্টেটের বি.ই.প্রপার্টি থেকে বাকেরগঞ্জ কালেকটরেটের অন্তর্গত, বোজরগ উমেদপুর পরগণায় তৌজি নং-

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮৭, তালুকদার- জীবন কৃষ্ণ সেন, এই নামে পরিচিত বিস্তর ভূ-সম্পত্তি উক্ত রিলিফ ফান্ডের জন্য ধার্য্য করা হয়। বার্ষিক ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে উক্ত রিলিফ ফান্ড পরিচালকদের নিকট থেকে পত্তনি নিয়ে নওয়াব এস্টেট কর্তৃক তা পরিচালিত হতো।[১২] উপরোক্ত ব্যবস্থা দেখে কোন কোন মহল নওয়াবের ভূমিদান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। কিন্তু ঢাকা প্রকাশ তাদের প্রতিবাদ করে নওয়াবের পক্ষে খবরাদি প্রকাশ করেছিল।[১৩]

১৯০১ খ্রীঃ মে মাসে দুর্ভিক্ষাবস্থার কারণে ঢাকায় চালের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। গরীব দুঃখীদের কষ্ট নিবারণে ঐ সময় নওয়াব আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ডের অর্থে নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রচুর চাল কিনে সুলভ মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করেন।[১৪] আগেই বলা হয়েছে সে আমলে কলেরা, বসন্ত মহামারীর আকার ধারণ করে ঢাকা শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতো। এমনকি বসন্তের টিকা আবিষ্কার হবার পরেও তা যথাযথভাবে জনগণের মাঝে প্রয়োগের অভাবে শহরের অবস্থা ছিল তথৈবচ। ১৯১৯ সালে ঢাকায় এরূপ বসন্ত রোগের প্রকোপ দমনের জন্য 'নওয়াব আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ডের' ট্রাস্টিগণ ঢাকা শহরে টিকা দানের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ২৩ মার্চ ১৯১৯ শনিবার তাঁরা একটি সভা করে উক্ত কাজে নিয়োজিত টিকাদানকারীদের কাজটি যথাযথ করার ব্যবস্থা নেন। এজন্য তাঁরা মাসিক ১৫ টাকা বেতনে ৪০ জন পুরুষ এবং ৪০ টাকা বেতনে ২ জন মহিলা টিকাদানকারী নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করেন। এছাড়াও ঐ সময় ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন বসন্ত রোগীদের যে সেবাদান কাজ চালাচ্ছিল, তাতেও ২শত টাকা অর্থ সাহায্য দেয়া হয়।[১৫]

খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন বহুদিন এই রিলিফ ফান্ডের অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে এই রিলিফ ফান্ড কত যে দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঝড়-তুফান, বন্যা, মহামারী, দূর্ভিক্ষে ভাগ্যাহত মানুষদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দানে 'আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড' সেকালে ঢাকা অঞ্চলবাসীদের নিকট ছিল একটি আশির্বাদস্বরূপ। সকলের অবগতির জন্য সেক্রেটারী সৈয়দ আওলাদ হোসেন সাহেব প্রতি বছর এই ফান্ডের আয়-ব্যয়ের এক হিসাব পত্রিকায় প্রকাশ করতেন।[১৬] ঢাকা প্রকাশের সৌজন্যে এরূপ ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৯, ১৯১০ ও ১৯১৩ মোট পাঁচ বছরের যে হিসাব পাওয়া গেছে তা পরিশিষ্ট নং ১৩ পৃঃ৪২৭তে দেয়া হলো। আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড সম্ভবত ঢাকার নওয়াবদের জমিদারী সরকারীভাবে উচ্ছেদের আগ পর্যন্ত চালু ছিল। খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেনের পর বাবু ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায় এই রিলিফ ফান্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত পুরানো নথি থেকে জানা যায় ১৯৩২ খ্রীঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উক্ত রিলিফ ফান্ডের ট্রাস্টি ছিলেন।[১৭]

(১) রায় সাহেব শতীস চন্দ্র ঘোস।
(২) রায় বাহাদুর সতেন্দ্র নাথ দাস।
(৩) বাবু ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়- সেক্রেটারী।
(৪) বাবু ভূপেন্দ্র নাথ রায়, প্লেডার।
(৫) খান বাহাদুর জহিরুল হক
(৬) সৈয়দ শরফুদ্দিন
(৭) প্রফেসর সৈয়দ নূরুল হক
(৮) মীর্জা মোঃ জাফর।

ঐ সময় ট্রাস্ট অফিসটি সেক্রেটারী বাবু ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে (বিনা ভাড়ায়) অবস্থিত ছিল এবং একজন কেরানীও একজন চাপরাসী সেখানে কর্মরত ছিল। তখন কর্মচারীদের বেতনাদিতে খরচের পরিমাণ ছিল মাসিক ৪৭ টাকা। স্থানীয় অনুসন্ধান কাজে ট্রাস্টের সদস্যদের গাড়ী ভাড়া দেয়া হতো। নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের রিলিফ ফান্ডের উপর প্রত্যক্ষ কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু ট্রাস্টিগণ বছরে চার বার ম্যানেজারের মাধ্যমে ফান্ডের হিসাবাদি নওয়াবের নিকট পাঠাতেন বলে জানা যায়।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

৪(২) নওয়াব আব্দুল গণি প্লেগ ফান্ড ট্রাস্ট গঠন[১৯] ঃ

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতের বোম্বে নগরে মহামারী আকারে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকার এবং বোম্বে মিউনিসিপ্যালিটি প্লেগ নিবারণে ২৫ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু প্লেগের ভয়াবহতা এতই ব্যাপক ছিল যে, অতি শীঘ্রই তা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় এসে আঘাত হানে।[২০] আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্লেগের কারণে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজান ১৮৯৮ খ্রীঃ এক বিজ্ঞাপন প্রচার করে এতদাঞ্চলের মুসলমানগণকে ঐ বছর হজ্ব যাত্রা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। এছাড়া হজ্ব যাত্রীদের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রতি বছর যে দশ হাজার টাকা দান করতেন, তাও সেবার স্থগিত রাখা হয়।[২১]

১৮৯৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে শহরে ভয়ানক হুলস্থুল পড়ে যায়। প্লেগে শহরের বেশ কয়েকজন মারা যায়। ডাক্তারেরা এ রোগ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শহরের অধিবাসীরা দিশেহারা হয়ে গ্রামে-গঞ্জে চলে যাওয়া শুরু করে। পূর্ব বাংলার নানা স্থান থেকেও প্লেগের খবর আসতে থাকে। এমতাবস্থায় ঢাকা শহরেও যে কোন মুহূর্তে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। স্থানীয় রাজপুরুষেরা এতে ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।[২২] প্লেগাতঙ্কে নওয়াব আহসানুল্লাহও কম বিচলিত হননি। কিন্তু ঢাকার জনগণের অভিভাবক হিসেবে কেবলমাত্র ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হলেই তো আর চলবে না, নওয়াবকে এজন্য কিছু একটা করতে তো হবে। এমতাবস্থায় প্লেগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সব কিছু করার জন্য তিনি ঢাকার কমিশনার মিঃ সেভেজ-এর হাতে ১ লক্ষ টাকা তুলে দেন। এছাড়া প্রয়োজন পড়লে এজন্য তিনি আরো একলক্ষ টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।[২৩]

৪মে ১৮৯৮ খ্রীঃ বুধবার প্লেগ প্রতিরোধে করণীয় কার্যাবলী নির্ধারণে ঢাকার কমিশনার মিঃ সেভেজ-এর সভাপতিত্বে নর্থব্রুক হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ ঢাকার প্রায় সব ইংরেজ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। কমিশনার সাহেব তাঁর ভাষণে ঢাকায় প্লেগ দেখা দিলে রোগীদের পৃথক ভাবে রেখে চিকিৎসা করা সহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করেন।[২৪] এভাবে নানা স্থানে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সভা করে শহরের লোকদের প্লেগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সৌভাগ্যবশত ঢাকার আশে পাশে প্লেগে ২/৪ জন মারা গেলেও পূর্ব সতর্কতার কারণে ঢাকায় তা মহামারী আকারে আঘাত হানতে পারেনি।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি সরকার ইতোপূর্বে ৫০০ টাকা বেতনে একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ৩০০ টাকা বেতনে একজন সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে এতদিন তারা তা করতে পারেননি। নওয়াবের দানকৃত উক্ত প্লেগ ফান্ডের টাকায় বেতনের সংস্থান করে তাঁদেরকে নিয়োগদান করা হয়।[২৫]

১৮৯৯ খ্রীঃ কলকাতায় আবার প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিলে ঢাকার সর্বত্র লোকদের সতর্ক ও সচেতন করা হয়। ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরে প্লেগে প্রায় ২০ জন মারা গেলে ঢাকা শহরে আতঙ্ক দেখা দেয়।[২৬] ঢাকার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাঙ্কিন সাহেব মুন্সিগঞ্জের তাবুতে অবস্থান করে বিক্রমপুরের প্লেগ যাতে অন্যত্র ছড়াতে না পারে সে ব্যবস্থার তদারকি করেন।[২৭] ৭ মার্চ ১৯০২ সালে বিক্রমপুরের কৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড় যতীন্দ্র মোহন রায় প্লেগে মারা যান।[২৮]

যাহোক সার্বিক সতর্কতার কারণে প্লেগ ঢাকা অঞ্চলে তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। তাই এজন্য নওয়াবের দানকৃত টাকারও খুব একটা বেশী পরিমাণ খরচ হয়নি। ১ লক্ষ টাকার মধ্যে তিন বছরে মাত্র ৪,৩৩২ টাকা ৯ আনা খরচ হয়েছিল। বাকী ৯৫,৭৬৭ টাকা ৬ আনা ৬ পাই দ্বারা নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাসে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। ভবিষ্যতে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী যে কোন স্থানে প্লেগ দেখা দিলে এই ট্রাস্ট ফান্ড তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেবে বলে নীতি নির্ধারণ করা হয়।[২৯] ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা জেলা কালেকটর এবং নওয়াব এস্টেটের একজন স্থানীয় অফিসার (নওয়াব কর্তৃক মনোনীত) পদাধিকার বলে উক্ত ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পর্যায়ে এভাবে তিন বছর চলার পর দেখা গেল, এতে এর আসল উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা একে একটি জনকল্যাণমুখী সাধারণ ট্রাস্টে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাতে ঢাকা ও এর অধিবাসীদের কল্যাণমূলক কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।[৩১] আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, চেয়ারম্যান খাজা মোঃ ইউসুফ ১৮৯৮ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে না পেরে উক্ত প্লেগ ফান্ডের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি জেলা প্রশাসকের নিদের্শে উক্ত ফান্ড থেকে ১৯৫৭ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করেছিলেন।[৩২]

১৯২২ খ্রীঃ নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ এক পত্র মারফৎ ঢাকার কমিশনার সাহেব, কালেকটর সাহেব, নওয়াব নিজে, নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রধানকে উক্ত প্লেগ ফান্ডের ট্রাস্টি মনোনয়ন করেন। তিনি ঢাকা শহরের কেবল মুসলিমদের শিক্ষা উন্নতির জন্য ফান্ডের অর্থকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু মূল ট্রাস্ট দলিলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বদলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মংগলের জন্য ফান্ড উন্মুক্ত থাকবে বলে নির্দেশ থাকায়, নওয়াবের উক্ত মনোনয়ন ও প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।[৩৩]

১৯২৬ খ্রীঃ নওয়াব সাহেব নিম্নলিখিতভাবে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন। তবে আগের নিয়মেই ট্রাস্টি হিসেবে কমিশনার, কালেকটর এবং নওয়াবের মনোনীত এস্টেটের একজন স্থানীয় অফিসার বলবৎ থাকে।[৩৪]

(১) এই ট্রাস্ট ফান্ড জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঢাকা শহরের দরিদ্র-নারীপুরুষদের স্বাস্থ্য সহায়তা দেবে। বিশেষ করে মহামারীর সময় রোগীদের চিকিৎসা ও সেবাদানের ব্যবস্থা করবে। (২) শহরের জনকল্যাণমূলক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহ, যেমনঃ- এতিমখানা, মাতৃমংগল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। (৩) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং পাগলা গারদে নিঃসম্বল অথবা বেওয়ারিশ লাশের সৎকারের ব্যয় বহন করবে।[৩৫]

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্লেগ ফান্ড থেকে নানা ধরণের জনকল্যাণমূলক কাজ করা হতো। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার যে কোন পরিকল্পনায় এই ফান্ড থেকে সহায়তা দেয়ার নিয়ম চালু হয়।[৩৬] টিকাটুলী মসজিদটি উক্ত পরিকল্পনা নির্ধারণের স্থান হিসেবে কাজ করতো এবং এ ফান্ডের সাথে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। উপরোক্ত ভাবে নওয়াব সাহেব ট্রাস্টের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করে দিলেও অনুদান নির্ধারণে ট্রাস্টিদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। নওয়াব সাহেব নিজে একজন ট্রাস্টি না হলেও এর মিটিং এ যোগ দিতে পারতেন।[৩৭]

ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ বিপুল অংকের টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুতে তিনি তা পূরণ করে যেতে পারেননি। তাঁর পুত্র নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে তাঁর উত্তরাধিকারীরা ১৯০২ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর ঐ মহান সদিচ্ছা পূরণে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা সরকারের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন।[৩৮] কিন্তু নওয়াব এস্টেটের কোষাগারে তখন দেয়ার মত নগদ অর্থের অভাব ছিল। এমতাবস্থায় ঐ দান কাজের জন্য তাঁরা পূর্বোক্ত প্লেগ ফান্ড থেকে ৬০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণ গ্রহণের সময় তাঁরা (বি.ই.প্রপার্টির মালিকেরা) প্লেগ ফান্ড ট্রাস্টের অনুকূলে তাঁদের বেশকিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। ঐ সম্পত্তি আবার বার্ষিক ৩ হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে ট্রাস্টের নিকট থেকে পত্তনি নিয়ে নওয়াব এস্টেট কর্তৃক পরিচালিত হতো। প্রতি কিস্তিতে ৭৫০ টাকা করে (মোট ৪ কিস্তিতে আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র) উক্ত টাকা নওয়াব এস্টেট থেকে পরিশোধ করতে হতো। এটা প্লেগ ফান্ড ট্রাস্টের একটি স্থায়ী আয় হিসেবে বিবেচিত ছিল।[৩৯]

আগেই উল্লেখিত হয়েছে ১৯০৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের নিকট থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে জলের কলের উন্নয়ন ও সম্প্রাসারণ করে। উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য বাধ্য হয়ে কলের জলের উপর কর ধার্য করা হয়। কিন্তু তাতেও সংকুলান না হওয়ায় উক্ত প্লেগ ফান্ড থেকে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা করে নিয়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৪০] মোট কথা এ ফান্ডটি তৎকালীন ঢাকার নিম্নবিত্তের দুঃসময়ের সহায়রূপে কাজ করতো।

 Dhaka University Institutional Repository

৪(৩)মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

ব্রিটিশ শাসকদের নিকট উপমহাদেশের অবহেলিত মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ ও প্রতিকার সমূহ তুলে ধরা এবং শিক্ষা দীক্ষায় উজ্জীবিত করে তাঁদের স্বীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে ১৮৬৩ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল লতিফ কলকাতায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীনতা দূর করে যুগোপযোগী শিক্ষিত করে তোলা, এবং তাঁদেরকে ইংরেজ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ সংসারের প্রতিটা কাজে অংশ গ্রহণের উপযোগী করাই ছিল এই সোসাইটির লক্ষ্য।[৪১]

ঢাকার নওয়াবগণও মুসলমানদের ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য নওয়াব আব্দুল গণি এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ মনে প্রাণে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির যাবতীয় কার্যকলাপ সমর্থন করতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রতিষ্ঠানটির সদস্য হওয়া ছাড়াও এর উন্নয়নে নিয়মিত নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। এছাড়াও তিনি স্থানীয় খ্যাতনামা লোকদের সোসাইটির কর্মকান্ড সমর্থন ও সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এমনকি তিনি নিজোদ্যোগে ঢাকাতে সোসাইটির একটি শাখাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঢাকাস্থ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির কার্যকলাপ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে নওয়াব আব্দুল লতিফ ও নওয়াব আহসানুল্লাহর মধ্যে প্রায়ই পত্র যোগাযোগ হতো। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের সংগ্রহে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নওয়াব আহসানুল্লাহর বেশকিছু ফার্সী পত্র থেকে এ বিষয়ে জানা যায়। নিম্নে এরূপ কয়েকটি পত্রের বিষয়ে আলোকপাত করা হলো ঃ

আব্দুল লতিফ, নওয়াব আহসানুল্লাহকে তাঁর অনুপস্থিতিতেই মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির সদস্য নিযুক্ত করেন এবং একটি পত্র মারফত বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। তদুত্তরে নওয়াব আহসানুল্লাহ ১২৭২ (১৮৬৫ ইং) সনের ১২ আশ্বিন তারিখে লেখা একটি পত্রে নওয়াব আব্দুল লতিফকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি উক্ত পত্রে সোসাইটির সদস্য নিযুক্ত করার জন্য ঢাকা থেকে তাঁর চারজন নিকটাত্মীয়ের নাম প্রেরণ করেন।[৪২]

১২৭২ বাংলা সালের (১৮৬৫ খ্রীঃ) ১৬ কার্ত্তিক নওয়াব আব্দুল লতিফ- এর নিকট লিখিত অনুরূপ আরেকটি পত্র থেকে জানা যায়, নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত পত্র বাহকের মাধ্যমে সোসাইটির জন্য অনুদান হিসেবে দুইশত টাকা পাঠিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে আরো টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এছাড়া সোসাইটির পরবর্তী সভায় যোগদানের জন্য তিনি ঢাকার সদস্যদের মধ্যে থেকে তিনজনের নাম পাঠান। ঐ সদস্যরা ছিলেন (১) খাজা আহমদ হুসাইন (২) খাজা আব্দুল গাফফার এবং (৩) খাজা সদরুদ্দিন। পত্রের শেষাংশে তিনি সোসাইটির কার্যাবলীর মুদ্রিত কপি প্রতিমাসে ঢাকার অন্যান্য সদস্যদের জন্যেও পাঠাতে নওয়াব আব্দুল লতিফকে অনুরোধ করেছিলেন।[৪৩]

নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক ১৮৬৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে (১২৭৪ বাংলা ৬ বৈশাখ) নওয়াব আব্দুল লতিফকে লেখা আরেকটি পত্র থেকে জানা যায়, নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক ১০ এপ্রিল ১৮৬৭ খ্রীঃ ঢাকার আহসান মঞ্জিলেই মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সোসাইটির প্রতি ঢাকার মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং এতদসংক্রান্ত কর্মসূচী পত্রে ঢাকার পাঁচশত লোকের স্বাক্ষর নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ তা ১৫ এপ্রিল ১৮৬৭ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল লতিফের নিকট পাঠিয়েছিলেন।[৪৪]

নওয়াব এস্টেট থেকে প্রায় প্রতি বছর মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির জন্য অনুদান বাবদ দুইশত টাকা করে পাঠানো হতো। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময়েও এই অনুদান পাঠানোর নিয়মটি চালু ছিল।[৪৫] নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির শাখার জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে একবার ৫০ টাকা সাহায্য পাঠানো হয়েছিল।[৪৬] ১৮৮২ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ এতদাঞ্চলে তাঁর সংগঠনের কার্যকলাপ পরিদর্শনে ঢাকায় আসেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ ও ঢাকার জনগণ তাঁকে ২৭ আগস্ট সোমবার বিকেলে নর্থব্রুক হলে এক আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[৪৬(ক)]

Dhaka University Institutional Repository

ওহাবী এবং ফারায়েজীদের প্ররোচনায় উপমহাদেশের মুসলমানদের অনেকেই এদেশকে শত্রুভূমি(দারুলহরব) বলে মনে করতো। এজন্য তাঁরা এদেশ ঈদ, জুম্মার নামাজ ইত্যাদি ধর্মীয় কাজের অনুপযুক্ত স্থান ভেবে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দিত।[৪৬(খ)] মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি উক্ত গোঁড়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিল না। এজন্য ১৮৭০ খ্রীঃ ২৩ নভেম্বর সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জৌনপুরের বিখ্যাত মৌলভী কারামত আলী বক্তৃতা দিতে আহুত হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকলেও ভারতবর্ষ দারুল হরব নয় বরং দারুল ইসলাম(শান্তি বা মিত্রভূমি)। সুতরাং শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইসলাম ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী। তিনি মুসলমান ধর্ম ও আইন শাস্ত্র থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৪৭] উন্নত শক্তিশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ আত্মঘাতী ও ধ্বংসমুখী। নওয়াব আব্দুল লতিফ ও তাঁর সহকর্মীরা এটা অনুধাবন করে ঐরূপ একটি মীমাংসা বাণী কামনা করেছিলেন। আব্দুল লতিফ কারামত আলীর বক্তৃতাসহ সভার পুরো ধারা বিবরণীর পাঁচ হাজার কপি ছাপিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এমনকি তা মক্কায় পাঠিয়ে মুফতির কাছ থেকে সমর্থন সূচক ফতোয়াও আনা হয়েছিল।[৪৮]

ঢাকার নওয়াবরাও এদেশকে দারুল ইসলাম বলার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই তাঁরা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির উক্ত কার্যাবলী সমর্থন করেন। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, কলকাতায় অনুষ্ঠিত সোসাইটির সভাগুলোতে ঢাকার নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রতিনিধি পাঠাতেন। তাঁরা সেখানে আলোচিত বক্তব্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতেন এবং সোসাইটির কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পূর্বক ঢাকায় এসে করণীয় ব্যবস্থাদি নিতেন। মৌলভী কারামত আলীর বক্তব্যসহ উক্ত সভার ছাপানো ধারাবিবরণী নওয়াব আহসানুল্লাহর তৈরী সোসাইটির ঢাকাস্থ শাখার মাধ্যমে পূর্ববংগের মুসলিম সমাজে প্রচারিত হয়েছিল।

এছাড়া ঢাকার নওয়াবদের সাথে অনেক আগে থেকেই জৌনপুরের পীর সাহেবদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। মৌলানা কারামত আলী ও তাঁর পুত্রগণ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার কাজে বহুদিন পূর্ববংগে অতিবাহিত করেন। ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদেরকে একাজে প্রচুর সহায়তা করতেন। কারণ ঢাকার খাজা পরিবারটিও জৌনপুরী, দেওবন্দী ও ফুরফুরী মতবাদীদের ন্যায় তাকলীদ পন্থী (চার ইমামের মধ্যে যে কোন একজনের মতাবলম্বী) ছিলেন। তাঁরা পীর-মুরিদী ও আধ্যাত্মিক তরিকার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে পীর পূজা, কবর পূজা, জিকিরের নামে গান বাজনা তাঁদের উভয়ের নিকটই অগ্রহণযোগ্য ছিল।[৪৯]

১৮৯৭ সালের ১২ জুন বাংলা ও আসামে সংঘটিত ভূমিকম্পে নওয়াব বাড়ীসহ ঢাকা শহরের ঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের সময় মৌলভী কারামত আলীর কনিষ্ঠপুত্র মওলানা আঃ আউয়াল জৌনপুরী ঢাকায় ছিলেন। ঐ ভূমিকম্প শেষ হবার পর ২৭ জুন ১৮৯৭ নওয়াব আহসানুল্লাহ ১০ হাজার মুসলমান সহকারে রমনার মাঠে গিয়ে মওলানা আঃ আউয়াল জৌনপুরীর ইমামতিতে শোকরানা নামাজ আদায় করেন। অতপর ২ জুলাই শুক্রবার লালবাগ কেল্লার ময়দানে নওয়াব সাহেব বহু সহস্র মুসলমানসহ উক্ত মওলানা জৌনপুরীর ইমামতিতে নামাজ পড়েন। নামাজান্তে মওলানা জৌনপুরী ঢাকার মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করেছিলেন।[৫০] মওলানা আঃ আউয়াল জৌনপুরীর ধর্মীয় বিষয়ক পান্ডিত্য ও সমাজ সংস্কার কাজের দরুণ ঢাকার নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করেছিলেন।[৫১]

মওলানা কারামত আলীর বড়পুত্র মওলানা হাফিজ আহমদ চাঁদপুরে ধর্ম প্রচারকালে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে কলেরা ও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজ খরচে তাঁর সুচিকিৎসার জন্য ঢাকার সিভিল সার্জনকে চাঁদপুর পাঠান। এছাড়া তাঁর একটি জাহাজও মওলানা সাহেবকে ঢাকায় আনার জন্য প্রেরণ করেন। ঢাকায় এসে উক্ত জাহাজেই তিনি ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। তাঁকে চকবাজার জামে মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।[৫২] নওয়াব আব্দুল লতিফ যেমন তাঁর মতবাদের সমর্থনে মওলানা জৌনপুরীর ফতোয়া সংগ্রহ করে প্রচার করেছিলেন। অনুরূপ ঢাকার নওয়াবদের কার্যকলাপও মওলানা জৌনপুরী সমর্থন করতেন। ফলে তাঁদের পক্ষে পূর্ববাংলার মুসলিমদেরকে সোসাইটির মতবাদে বিশ্বাসী বানাতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অগ্রহী করতে সুবিধা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৪(৪)সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে ১২মে ১৮৭৮ খ্রীঃ কলকাতায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এটি ছিল প্রধানত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তবে সমাজ ও শিক্ষার উন্নতি সাধন করাও এর কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঢাকার নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ড বিশেষভাবে সমর্থন করতেন এবং সর্বোতভাবে এর সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ এই এ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ছিলেন।[৫৩] এ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮৩ সালের চাঁদা দেয়া সদস্যগণের নামের তালিকায় নওয়াব আহসানুল্লাহর নাম পাওয়া যায়।[৫৪] ১৮৮২ খ্রীঃ ১৭ জানুয়ারী এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী সভায় বড়লাট রিপন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতি স্বরূপ ঐ বছর থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ৪টি রিপন বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের সাহায্যের জন্য ১৫,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনাও নেয়া হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ তহবিলে ৩০০০ টাকা চাঁদা দেন। পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ঐ বৃত্তি দেয়া হতো।[৫৫]

১৮৮২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারী এ্যাসোসিয়েশন বড়লাট লর্ড রিপনকে সম্বর্ধনা প্রদান কালে একটি দীর্ঘ স্মারকপত্র দেয়। উক্ত স্মারকলিপিতে শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এবং সরকারী অফিস আদালতে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা স্বল্পতার কথা প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়।[৫৬] এ্যাসোসিয়েশনের এই স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়নি। ১৮৮৫ খ্রীঃ ১৫ জুলাই বড়লাট ডাফরিনের এক প্রস্তাবে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা হয়।[৫৭] এছাড়া বড়লাট আশা করেন যে, যেসব প্রদেশে মুসলমানেরা সরকারী চাকুরীতে তাঁদের ন্যায্য অংশ পায়নি, সেসব স্থানের কর্তৃপক্ষ যেন তাঁদের সুবিধানুসারে এই অভিযোগের প্রতিকার করেন এবং প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেন।[৫৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, আলিগড়ের সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশেও গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাঃ এ্যাসোসিয়েশন এক স্বাক্ষর অভিযান শুরু করেন।[৫৯]

এ্যাসোসিয়েশনের পথ অনুসরণ করে ঢাকার নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ এতদাঞ্চলের গণ্যমান্য পাঁচশত মুসলমানের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। উক্ত স্মারকলিপিতে তাঁরা মুসলমানগণ যাতে জনসংখ্যা অনুপাতে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে বলেন। এজন্য তাঁরা সরকার কর্তৃক হাইকোর্ট ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানান।[৬০] এই স্মারকলিপি প্রেরণের কাজটা ছিল ঢাকার নওয়াবদের স্বাজত্যবোধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যুতে ৩০ আগষ্ট ১৮৯৬ কলকাতার রয়েড ষ্ট্রীটে নওয়াব সৈয়দ আমির হোসেনের বাসভবনে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাঃ এ্যাসোসিয়েশনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।[৬০(ক)] ১৮৯৯ সালে উক্ত ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের পাবনা শাখার উদ্যোগে সেখানকার জেলা স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণে নওয়াব আহসানুল্লাহ একজন অন্যতম প্রধান অর্থ সাহায্য দাতা ছিলেন।[৬১] নওয়াবদের অর্থ দানের তালিকায় দেখা যায়, উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের জন্য একবার ৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল।[৬১(ক)] এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের রাজশাহী শাখার জন্য ১০০ টাকা দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আমির আলীর প্রতিষ্ঠিত উক্ত সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাঃ এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এরই সূত্র ধরে দীর্ঘদিন পরে নওয়াব সলিমুল্লাহ সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪(৫)ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী' এবং 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'-এর পৃষ্ঠপোষকতাঃ

ঢাকার নওয়াবগণ কেবল জনকল্যানমূলক কাজে অর্থদান করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা এদেশের মুসলিম সমাজ সংস্কার এবং সংস্কৃতি পরিমার্জনায় বিভিন্ন সময়ে গঠিত সংগঠনগুলোর উন্নয়নেও বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীঃ ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সম্পূর্নভাবে মুসলিম সদস্য দ্বারা গঠিত এটাই ছিল ঢাকার প্রথম সমিতি।[৬২] জাতীয় উন্নতি ছাড়াও এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতিসাধন। এজন্য সংশ্লিষ্টরা সভা সমিতির আয়োজন করে এবং বক্তৃতা ও রচনার মাধ্যমে সমিতির উদ্দেশ্য সবার মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ এ' সমাজ সম্মিলনীর' সাহায্যার্থে এককালীন ৩০০ টাকা দান করেন এবং এর পৃষ্ঠপোষক হওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৬৩] ঢাকার 'পূর্ববংগ রংগভূমি ' গৃহে মাঝে মাঝে এই সমিতির অধিবেশন হতো। ১৫ আগস্ট ১৮৮০ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত এমন একটি সভায় একজন টোলের পন্ডিত এবং একজন সুশিক্ষিত মুসলমান সংগঠনটির প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন।[৬৪]

এই সমিতি বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ১৮৮০ খ্রীঃ পরে এর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ক্ষণস্থায়ী হলেও তা ঢাকার তদানীন্তন মুসলিম সমাজে যে বিশেষ চেতনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে নব্য শিক্ষিত তরুন ছাত্র সমাজ আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন।' 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' নামে উক্ত নতুন সংগঠনটি ২৪ ফেব্রুঃ ১৮৮৩ খ্রীঃ শনিবার গঠিত হয়।[৬৫] মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে সমাজের হিত সাধন করাই ছিল এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা কারণে প্রথম কয়েক বছর সেটা প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠ্য তালিকা নির্বাচন এবং সে অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা এবং উর্দু এ দু'ভাষার মাধ্যমেই পরীক্ষা নেয়া হতো। বঙ্গদেশের যে কোন মুসলমান মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের আলোকে নিয়মিত নিজগৃহে থেকেই পরীক্ষা দিতে পারতো। তবে মৌখিক পরীক্ষা দেয়ার সময় সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষকও থাকতেন। এভাবে অনেক ছাত্রীই শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এ জাতীয় জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে ঢাকার নওয়াবগণ সব সময়ই সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য দিতেন। ১৩ ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রীঃ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার খবর প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে, আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে ঢাকার মুসলমান সমাজের শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত নওয়াব আব্দুল গণি বাহাদুর এই হিতকর কাজে তাঁর সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন।[৬৭] তবে ঢাকার নওয়াবের নিকট থেকে পূর্বোক্ত 'সমাজ সম্মিলনীর' মত এ নতুন সমিতি কোন অর্থ সাহায্য পেয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। তবে অনুরূপ সংগঠন সমূহের প্রতি তাঁদের উদারতার কথা ভেবে ধারণা করা যায় যে, তাঁরা নিশ্চয়ই এতে কোন সাহায্য করেছিলেন। কারণ আমরা দেখতে পাই সমসাময়িক কালে কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোকের দ্বারা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' এর জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ ত্রিশ টাকা দান করেছিলেন।[৬৮] সমাজ সম্মিলনীর ১৮৮৮ সালের কার্য বিবরণী থেকে জানা যায়, ঢাকা নওয়াব পরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এ সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তাঁরা এর উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদান সহ সর্বোতভাবে সাহায্য করতেন। এঁরা হলেন- খাজা মোঃ ইউসুফজান, খাজা মোঃ মনসুর, খাজা আব্দুল লতিফ প্রমুখ।[৬৯] এছাড়া খাজা মোঃ ইউসুফজানের উদ্যোগে এই সময় ঢাকায় একটি মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। উক্ত সংগঠনটি পরবর্তীকালে মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল এ্যাসোসিয়েশনে উন্নীত হয়।[৬৯(ক)] ১৯০৩ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বংগবিভাগের পরিকল্পনা করা হলে ঢাকার স্থানীয় জনগণ এর বিরোধিতা করেন। বালিয়াটির জমিদার কাজেমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর প্রচেষ্টায় ২৫ জানুঃ ১৯০৪ খ্রীঃ 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর' উদ্যোগে ঢাকায় মুসলমানদের একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বংগ বিভাগের বিরোধিতা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৭০] অপরদিকে ১৯০৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন পূর্ববংগ সফরে এসে বংগবিভাগের প্রতি জনগণের প্রতিবাদের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করেন। ঐ সময় আহসান মঞ্জিলে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে বড়লাটের আলোচনার ফলে বংগবিভাগ পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে এ নতুন প্রদেশের সীমারেখা বৃদ্ধি পেয়ে তা এতদাঞ্চলের মুসলিমদের স্বার্থানুকুল হয়ে উঠে।[৭১]

আসাম ও পুর্ববঙ্গের সম্মিলিত এলাকা নিয়ে পৃথক নতুন প্রদেশ গঠন এবং ঢাকায় এর রাজধানী স্থাপনের প্রস্তাব নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সর্বস্তরের মুসলমানদের কাছে অভিনন্দিত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস ও বাঙ্গালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। এমতাবস্থায় মুসলিম জাতির মধ্যে সংহতি বৃদ্ধির জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবিভাগ কার্যকর হবার দিনে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে এবং সভাপতিত্বে ঢাকায় নর্থব্রুক হলে মুসলমানদের উচ্চ পর্যায়ের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'মোহমেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' নামে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ঢাকার মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী কর্তৃক ২৬ বছর পূর্বে যে সমাজ সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা হয়, নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক উক্ত রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে তার পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলে সুহৃদ সম্মিলনী সহ স্থানীয় ছোট ছোট মুসলিম সংগঠনগুলো উক্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।[৭২]

৪(৬) সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়নে নওয়াব আহসানুল্লাহর ভূমিকা ঃ

আজকাল এদেশে কোন মেয়ের বিয়ে রেজিস্ট্রী হতে হলে তাকে কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স্কা হতে হয়। কিন্তু ঢাকার নওয়াবদের আমলে এমনটি ছিল না। তখন নানা কারণে এদেশে হিন্দু মুসলিম উভয় জাতিতে ব্যাপক বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। কোলের বাচ্চা থেকে শুরু করে ১০/১২ বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় যাবতীয় শিশু বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো। এর ফল ছিল বিষময়। বাল্য কিংবা যুবতী বধূর বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু, তালাক প্রভৃতি কারণে সমাজে অসংখ্য বাল্য ও যুবতী বিধবা বিরাজ করতো। বিশেষ করে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় তারা দুঃসহ ও অমানবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও বাল্য ও বহুবিবাহ রীতির কারণে সেখানকার অবস্থা মোটেই সুখকর ছিলনা। বাল্য বিবাহ করা ও বিধবা বিবাহ না দেয়ার মত হিন্দু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কুপ্রথা মুসলমান সমাজকেও ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল। বহু বিবাহ ও তালাক প্রথার কঠোর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেয়া হতো।[৭৩] সর্বোপরি বাল্য বিয়ের কারণে অপরিণত বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে শিশু ও মায়ের মৃত্যুর হার ছিল অতি ভয়ানক। বেঁচে থাকা সন্তানদের মধ্যেও অনেকেই এজন্য অস্বাভাবিকতা কিংবা বিকলাংগের স্বীকার হতো।

সমাজে বাল্য ও বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় সবচেয়ে জঘন্য যে ঘটনাটি ঘটতো তাহলো-বয়স্ক বা বৃদ্ধ পরুষ কর্তৃক এক বা একাধিক নাবালিকাকে বিয়ে করা। মুসলমান সমাজে একত্রে উর্ধ পক্ষে চারটি স্ত্রী রাখার সীমাবদ্ধতা থাকলেও হিন্দু সমাজে এর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। ফলে কুল-মান রক্ষা প্রভৃতি কারণে তাঁদের অনেকেই কয়েক ডজন স্ত্রী গ্রহণ করত। এ ব্যাপারে কোন নিয়ম-নীতি না থাকার ফলে অনেক সময় বয়স্ক পুরুষগণ তাদের নাবালিকা স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে গিয়ে প্রায়ই বলাৎকারের আশ্রয় নিতো। ফলে ঐ সব নাবালিকা বধুরা অসহ্য নির্যাতন ভোগ করতো। এমনকি অনেক সময় মারাও যেতো। এ প্রথাটি নিঃসন্দেহে একটি অমানবিক কাজ ছিল এবং বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে সেটা অবশ্যই মানবাধিকার লংঘনের মত জঘন্য অন্যায় কাজ বলে বিবেচিত। কিন্তু তৎকালে সুবিধাভোগী ও প্রভাবশালীরা এ প্রথার অনুকূলে থাকায় সেটা সমাজের স্বাভাবিক প্রথা বলে বিবেচিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজরা এদেশীয় সমাজের এসব কুপ্রথাগুলো দূর করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রথাগুলো এদেশীয়দের ধর্ম ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে প্রচলিত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতীয়দের ধর্মীয় রীতি নীতির উপর হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন।[৭৫] ফলে ইংরেজরা ঐসব কুপ্রথার ব্যাপারে তেমন কিছু করতে পারতো না। সৌভাগ্যবশতঃ দেশীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় কিছু বুদ্ধিজীবি উনিশ শতকের গোড়াতেই সমাজের এসব বিষময় কুপ্রথাগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং সেগুলোর মুলোৎপাটন করতেও তাঁরা সচেষ্ট হন। এভাবে রাজা রামমোহন রায়-এর পরিচালিত সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার ১৮২৯ খ্রীঃ এদেশে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে। অতপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত বিধবা বিবাহ ও বাল্য বিবাহ আন্দোলনের জের হিসেবে ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। অন্যদিকে দশ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ বলে ঘোষণা করে ১৮৬০ খ্রীঃ যে আইন পাশ হয় তাতেও বিদ্যাসাগরের হাত ছিল।

১৮৮৪ সালে বি.এম. মালাবারী নামক গুজরাটের জনৈক পার্সী কবি ও সাংবাদিক বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে মত প্রকাশ করলে প্রশ্নটি পুনরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ভারত ও ইংল্যান্ডে ব্যাপক ভ্রমণ করে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস পান।[৭৭] ইতোমধ্যে ফুলমনির ধর্ষণ মামলা বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে। ৩৫ বছর বয়স্ক হরিমোহন মাইতি তার ১০ বছর বয়স্কা স্ত্রী ফুলমনির উপর বলাৎকার করলে, মেয়েটি মারা যায়। কিন্তু আদালত হরিমোহন মাইতি-কে খালাস দেয় এই যুক্তিতে যে, ঘটনার সময় ফুলমতির বয়স ১০ বছর পুরো হয়ে ১১ বছর শুরু হয়েছিল। এ কারণে হরিমোহনের জন্য এদেশে প্রচলিত ধর্ষণ আইনটি প্রযোজ্য নয়।[৭৮] এ ঘটনা মালাবারীর আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। কলকাতার হেলথ সোসাইটি বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশের অনুরোধ জানিয়ে ব্রিটিশ সরকার ও মহারানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৭৯]

১৮৯১ সালের ৯ জানুয়ারী স্যার এন্ড্রু স্কোবল সরকারের পক্ষে সহবাস সম্মতি আইন প্রথমে বিল আকারে বড়লাট আইন সভায় উত্থাপন করেন। বিলে বলা হয়, ১২ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে কোন বালিকার সাথে সম্মতি কিংবা অসম্মতিতে সংগম করলে এমনকি স্বামীকেও ধর্ষণের দায়ে দন্ডিত হতে হবে।[৮০] হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান সকলের ক্ষেত্রেই এ আইনটি প্রযোজ্য ছিল। বিলটি হিন্দুদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাঁরা ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা করে। কলকাতায় এর প্রতিক্রিয়া খুব বেশী না হলেও ঢাকায় বিলটির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়।[৮১] ঢাকার জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জলাল নাগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁকে সহায়তা দেন ঢাকার মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান বাবু ঈশ্বরচন্দ্র শীল, পন্ডিত ত্রিলোচন তর্কালংকার প্রমুখ ঢাকার খ্যাতনামা হিন্দু ভদ্রলোকগণ। ঢাকা প্রকাশ তাঁদের মত প্রকাশের বাহন হয়।[৮২] তাঁরা স্থানীয় কিছু রক্ষণশীল মুসলিম ও মোল্লাদের সমর্থন লাভ করেন। বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান প্রধান বক্তব্য ছিল- উক্ত আইনের ফলে নারীর পর্দানশীলতা ও মান সম্ভ্রমের হানি হবে। এই আইনটি হিন্দু-মুসলমানদের ধর্ম ও কৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ করেছে। স্ত্রীর বয়স কম ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে শত্রুভাবাপন্ন লোকেরা এই আইনের সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোকদের অপদস্থ করার সুযোগ পাবে।[৮৩]

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নেতা নওয়াব আবদুল গণি ও আহসানুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত এই বিলটি সমর্থন করেন। কারণ নওয়াব আহসানুল্লাহ ছিলেন একজন কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তমনা, যুক্তিবাদী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। তৎকালীন সমাজের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সমাজের কুপ্রথাগুলোকে প্রশ্রয় দেননি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজের বিবাহিত স্ত্রী ব্যতিত কারো দিকে নজর দিতেন না। এমন কি কোন বাঁদীকেও উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতেন না। তিনি সামর্থ থাকা সত্বেও একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখতেন না।[৮৪] তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাল্য ও বহুবিবাহ প্রথাকে তিনি অপছন্দ করতেন। উল্লিখিত ধারণার বশবর্তী হয়ে বড়লাট আইন সভার একজন সদস্য হিসেবে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন।[৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

২৩ জানুয়ারী ১৮৯১ খ্রীঃ শুক্রবার কলকাতার গভঃ হাউসে উক্ত আইনের সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ বলেন, "ঢাকা এবং কলকাতায় অনুসন্ধান চালিয়ে, নেতৃস্থানীয় মুসলিম এবং খ্যাতনামা আলেমদের মতামত গ্রহণ করে, আমার ধারণা হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মত প্রস্তাবিত বিলের পক্ষে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মতও এর অনুকূলেই হবে।[৮৬]

আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে বিলটি বালিকা বধূদের পরিত্রাণ ও আশ্রয় প্রদান করবে বিধায় আমি নির্দ্বিধায় বলবো, আইনটি খুবই প্রয়োজনীয় ও যথাযথ। আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী স্ত্রী বালেগা হবার আগে অভিগমন নিষিদ্ধ এবং অনুসন্ধান করে আমি যতদূর জেনেছি, মেয়েরা সাধারণত ১১/১২ বছরেই বালেগা হয়। অবশ্য এ বয়সের আগেও কদাচিত বালেগা হবার লক্ষণ মেলে। তবে সেটা এতই বিরল যে, তা সার্বিক ক্ষেত্রে বিবেচ্য নহে।[৮৭]

নওয়াব বাহাদুর আরো বলেন, আমাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক বিলের ব্যাপারে আশঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু বিলটি তাঁদের ধর্ম ও আচারে হস্তক্ষেপ করছে, এজন্যে নয় বরং এই আইনের পরে ক্রমান্বয়ে তাঁদের ধর্মীয় মতবাদের উপর আঘাত হানার মত আরো কঠিন আইন করা হতে পারে, এই ভেবে তাঁরা ভীত। কিন্তু আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত কাউন্সিল মিটিং-এ বড়লাট এ বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে আমাদের সে ভয় দূর হয়েছে এবং এই প্রেক্ষিতে আমি বিলটি সমর্থন করছি।"[৮৮] (নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক ইংরেজীতে দেয়া উক্ত ভাষণটি পরিশিষ্ট নং ১৪ পৃঃ৪২৮তে উদ্ধৃত করা হলো) এখানে উল্লেখ্য যে, সমমনোভাবাপন্ন মুসলমানরা ছাড়া এতদাঞ্চলে আর যাঁরা নওয়াব আহসানুল্লাহর মতো এ বিলের সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা হলেন-পূর্ব বাংলার মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম সমাজ। কারন ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন হিন্দুদের তুলনায় প্রগতিবাদী। এছাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঢাকা গেজেট পত্রিকা ছাড়া অন্য প্রায় সব পত্রিকাই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।[৮৯]

প্রস্তাবিত বিল এবং এর সমর্থনে নওয়াব আহসানুল্লাহর দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে ২৭ জানুয়ারী ১৯৯১ খ্রীঃ মংগলবার ঢাকার নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ পূর্ববঙ্গ রংগভূমিগৃহে প্রায় ৩ হাজার লোক নিয়ে এক সভা করে। সভায় জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জলাল নাগ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান বাবু ঈশ্বরচন্দ্র শীল, নওয়াব এস্টেটের দেওয়ান গোবিন্দদাস প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। সভায় তাঁরা কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরবর্তী ব্যবস্থাদি গ্রহনের জন্য ঐ সভায় ১৬ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়।[৯০]

অতপর ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ খ্রীঃ রবিবার পন্ডিত ত্রিলোচন তর্কালংকার-এর সভাপতিত্বে জনগন্নাথ কলেজ প্রাংগনে ৭ হাজার লোকের এক প্রতিবাদ সভা হয়। ঐ সভায় হিন্দুদের সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকার খ্যাতনামা উকিল ও জমিদার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা এবং উকিল উসমান উদ্দিন ভূঁইয়া বিলের প্রতিবাদে ব্যাংগোক্তি করে বক্তৃতা দেন। উল্লেখ্য, নওয়াব আহসানুল্লাহর ভগ্নিপতি খাজা মোঃ ইউসুফজানও এই বিলের একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে বিলের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা করেন।[৯১] কিন্তু খাজা মোঃ ইউসুফের দ্বিমত সত্ত্বেও সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও তাঁদের অনুগামী কতিপয় মুসলিমদের সমর্থনে বিলের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিলটি আইনে পরিণত না করার দাবী জানিয়ে ১০ হাজার লোকের স্বাক্ষরে একটি আবেদনপত্র বড় লাটের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[৯২] শুধু ঢাকা শহরেই নয় পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর, বরিশাল, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও হিন্দুদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা করে বড়লাটকে অনুরূপ আবেদনপত্র ও টেলিগ্রাম পাঠানো হয়।[৯৩] এছাড়াও পূর্ববঙ্গের প্রায় সবগুলো রাজা-মহারাজাই বিলের প্রতিবাদকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, মহারাণী স্বর্ণময়ী, দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায়, মুক্তাগাছার রাজা সূর্যকান্ত, ধুবলহাটির রাজা হরনাথ, যশোরের রাজা রাধা গোবিন্দ, নলডাংগার রাজা প্রমদভূষণ দেব রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৯৪]

অন্যদিকে ঢাকার নওয়াব আহসানুল্লাহ ও তাঁর সহযোগীরাও বিলের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির বিষয়ে চেষ্টারত ছিলেন। তাঁরাও বিলের পক্ষ অবলম্বনকারীদের স্বাক্ষর জোগাড় করে সরকারের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বিলের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদানকারী ঢাকার জনৈক মুন্সী আহমদ আলী আবার এক সময় বিলের প্রতিবাদকারীদের কথায় ভুলে প্রকাশ্য সভায় বিলের বিপক্ষে মত দেন।[৯৫] ১৮৯১ সালের ১৭ মার্চ ঢাকাস্থ রাজাবাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে বাবু জগবন্ধু তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে প্রায় ৬ হাজার লোকের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলটির বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার ঐ সভায় মুসলমানদের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সুধাকরের মালিক মৌলবী সৈয়দ শামছুল হুদা, বেঙ্গল টাইমসের সম্পাদক মিঃ কেম্প এবং বিখ্যাত লেখক সাঈদ আব্দুল সোবহান চৌধুরীকে ধন্যবাদ দেয়া হয়। অন্যদিকে বিলের পক্ষাবলম্বন করায় নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ও জয়পুরের মহারাজা মিঃ কে. এল. নালকারের প্রতি দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।[৯৬]

কবি কায়কোবাদও এ সময় বিলের বিরুদ্ধে একটি বিরাট কবিতা রচনা করেছিলেন।[৯৭] ঢাকা শহরের হিন্দুরা কেবল বিলের প্রতিবাদে সভা সমিতিই করেনি। মার্চ ১৮৯১ সালে ঢাকার হিন্দুরা সপ্তাহকাল ধরে দিবানিশি অবিশ্রান্তভাবে হরিনাম সংকীর্তন করে এই বিলের ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন।[৯৮] যাহোক হিন্দুদের আবেদন আন্দোলন অগ্রাহ্য করে ১৯ মার্চ ১৮৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত বড়লাট আইন সভায় বিলটি পাশ হয়ে যায়।[৯৯] আইনটি পাশ হবার পরে ঢাকার হিন্দু নেতারা সেটা যাতে কার্যে পরিণত না হয় তার চেষ্টাও চালিয়েছিল।[১০০]

এই আইনটি দেশীয় সামাজিক প্রথার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে কুলীন প্রথা কিংবা প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে যাঁরা এতদিন ডজন ডজন নাবালিকা বিয়ে করত, আইনটি তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতায় বাঁধ সাধে। বিভিন্ন স্থানে অপরিণত বালিকা বধূদের অনেকেই স্বামী কর্তৃক ধর্ষিতা হলে বিচারের আশ্রয় নিতে শুরু করেন। ১৯০৪ সালে ঢাকা জিন্দাবাহারের ফয়জুন্নেছা নাম্নী জনৈকা ১০ বর্ষীয়া বালিকা বধূ স্থানীয় আদালতে স্বীয় স্বামী কর্তৃক বলাৎকারের অভিযোগ উত্থাপন করে। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর ডাক্তারী পরীক্ষা করে আদালত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১০১] এই আইনের জের ধরে পরবর্তীতে বাল্য বিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে বহুদিন যাবৎ অনেক বাকবিতন্ডা চলে। শেষে ১৯৩০ সালে ১৮ বছরের কম ছেলের এবং ১৪ বছরের কম মেয়ের বিয়ে নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয়।[১০২]

পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি, তৎকালে মুসলিম সমাজে উচ্চ শিক্ষিত লোকের অভাব থাকলেও হিন্দু সমাজে তেমন অভাব ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত বাস্তবতাকে সানন্দে গ্রহণ করে নেয়ার মত সংস্কারমুক্ত এবং উদার মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল বিরল। তাঁরা প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত দেশীয় রীতিনীতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে যাচাই করে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিরূপনে সক্ষম ছিলেন না। অন্যদিকে ঢাকার নওয়াবরা এসব ক্ষেত্রে ছিলেন প্রগতিশীল। সমাজের কুসংস্কারগুলোর মুলোৎপাটনে তাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে স্বাগত জানাতেন। সে জন্যই তাঁরা শিক্ষা দিক্ষা, মেলা-মেশা, আহার-বিহার, এমনকি ধর্মাচরণেও কুপমন্ডুকতার প্রশ্রয় দিতেন না। এসব কারণেই তাঁদের কর্মকান্ডগুলো কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। এজন্যই তাঁরা যুগযুগ ধরে স্মরণীয়।

৪(৭) দেশীয় মদ তৈরীর কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে ভূমিকা ঃ

সে আমলে মাদকদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তেমন কোন কঠোর নিয়ম নীতি ছিল না। প্রচলিত মাদকের মধ্যে গাঁজা, আফিম, তাড়ী এবং মদিরাই ছিল প্রধান। সুষ্ঠু নিয়ম নীতি না থাকায় হাটে বাজারে গ্রামে গঞ্জে যত্র তত্র মাদকদ্রব্য বিশেষ করে দেশীয় মদ উৎপন্ন হতো। ফলে মাদকাসক্ত ও মাতালের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে সামাজকে কলুসিত করতো।[১০৩] ১৮৪৫ খ্রীঃ এবং ১৮৫৬ খ্রীঃ দেশীয় মদ তৈরীর কারখানার উপর কিছু শুল্ক ধরা হয় এবং থানার দারোগার উপর কারখানাগুলোর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তাতে ঐসব দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেলেও সহজলভ্যতা কমেনি।[১০৪] পরবর্তীকালে ১৮৮০ এর দশকে মদ তৈরীর অবৈধ কারখানা এতই বেড়ে যায় যে, কুলি-মুজুর, চাকর-বাকর থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা মদিরার স্রোতে ভেসে যেতে থাকে।[১০৫] এই প্রেক্ষিতে সেটা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। এমতাবস্থায় নওয়াব আহসানুল্লাহ এবং দেশীয় কয়েকজন খ্যাতনামা জমিদার সরকারী কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। সরকারের আবগারী শুল্ক বিভাগের কমিশনার এ জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একটি কমিশন গঠন করেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ কমিশনকে খোলাভাটির অপকারিতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। তিনি আরো পরামর্শ দেন যে, অন্তত ১২ মাইলের কম দূরত্বে কোন খোলাভাটি তৈরী করা যাবে না বলে আইন চালু করা যায়। এছাড়া ঐসব কারখানায় নির্দিষ্ট পরিমানের বেশী মদ তৈরী করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেয়া যেতে পারে এবং লাইসেন্স ধারী এজেন্টরা ছাড়া মদ বিক্রি করতে নিষেধ করা যেতে পারে। এর ফলে মদ প্রভৃতি সহজলভ্য না হওয়ায় লোকেরা পাপ প্রবৃত্তি থেকে ক্রমে সরে আসতে বাধ্য হবে।[১০৬] নওয়াব আহসানুল্লাহ এবং এদেশীয় নেতাদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সরকার এদেশ থেকে খোলাভাটি উঠিয়ে দেবার আইন পাশ করে এবং কেবলমাত্র সরকারের নিয়ন্ত্রিত কারখানায় মদ তৈরী করা হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়।[১০৭] এমতাবস্থায় দেশে ঢালাওভাবে মদ তৈরী ও ব্যবহার কমে যায়।ফলে মুসলমানদের বেশ উপকার হয়।

৪(৮) বারবনিতা নিয়ন্ত্রন আইন প্রণয়নে ঢাকার নওয়াবের ভূমিকা ঃ

তৎকালে লাইসেন্সধারী বারবনিতা যেকোন এলাকায় দেহ ব্যবসা করতে পারতো। এমনকি ভদ্র পল্লীতেও ঘরভাড়া নিয়ে তারা এসব কুকাজ করতো। এর ফলে সমাজে অনাচার-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও ছাত্রাবাসের নিকট বেশ্যালয় থাকায় ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।[১০৮] ঐ আমলে ঢাকাকে অনেকে বারবনিতার শহর বলেও উল্লেখ করতেন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯০১ সালে ঢাকা শহর বাসী মোট ৯০,৫৪২ জনের মধ্যে ২,১৬৪ জনই ছিল বারবনিতা।[১০৯]

ঢাকার নওয়াবগন এরূপ বল্গাহীনভাবে বেড়ে ওঠা পতিতালয় নিয়ন্ত্রন করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট পল্লী নির্ধারিন করে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ স্কুল-কলেজ ও ভদ্র এলাকা থেকে বেশ্যাদের দূর করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এতদসংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট ও ভদ্র পল্লীতে বেশ্যালয় থাকার কুফল সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। এর ফলে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত আইনটির খুঁটিনাটি দিক পর্যালোচনা করার জন্য চার সদস্যের একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।[১১০]

১৯০৭ সালের ১২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত উক্ত সিলেক্ট কমিটির সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রস্তাবিত আইনটির দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের প্রয়াস পান।[১১১] পরবর্তীতে সিলেক্ট কমিটির অনুরূপ আরেকটি সভায় প্রস্তাবিত আইনটি পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ ব্যাবস্থাপক সভার পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯০৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনুষ্ঠিত পূর্ববংগ ব্যবস্থাপক সভায় সিলেক্ট কমিটির পর্যালোচনাকৃত উক্ত আইনটি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। বহু যুক্তি তর্ক ও বাক বিতন্ডার পর আইনটি পাশ হয়।[১১২]

উক্ত আইনে বলা হয়, ভদ্র পল্লী, স্কুল-কলেজ কিংবা ছাত্রাবাস প্রভৃতির নিকট অবস্থিত কোন বেশ্যালয় দূর করতে হলে কমপক্ষে তিনজন প্রতিবেশীকে একত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবেদনের যৌক্তিকতা বিচার করে বারবনিতাদেরকে ঐ স্থান পরিত্যাগে বাধ্য করবেন। এই আইনের ফলে ঢাকা ও এতদাঞ্চলের শহরগুলোতে বারবনিতার দৌরাত্ম বেশ কমে যায়। এই আইন প্রয়োগের কারণে ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকা শহরে ঈশ্বর চন্দ্র দাসের গলিতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট থেকে কয়েকজন বারবনিতা অনত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।[১১৩]

এ অধ্যায়ে আলোচিত কল্যাণমূলক সংগঠনগুলো বাংলার মুসলমানদের সমাজ চেতনা বৃদ্ধিতে যে সহায়তা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সংগঠনগুলোর সাথে ঢাকার নওয়াবদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন সমাজের কুপ্রথাগুলো দূরীকরণে যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে ঢাকার নওয়াবদের ভূমিকার কথাও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। আইনগুলো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এদেশে সমাজ সংস্কারের কাজ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। পিতৃ মাতৃভক্তি করা ছিল নওয়াব আহসানুল্লাহর একটি বিশেষ গুন। তিনি ৩/৪ ঘন্টার বেশী জননীর চোখের আড়ালে থাকতেন না। তাঁর মা ০৭ এপিল ১৮৮৭ সালে মারা যান (ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৮৮৭ পৃঃ৭)

২। মারছিওনেস অব ডাফেরিন্ এন্ড আভা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০১।

৩। ক্লাউড ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৮। উল্লেখ্য, পিতৃভক্তি ছাড়াও অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন নওয়াব আব্দুল গণির সার্বক্ষনিক অভিভাবকত্ব নওয়াব আহসানুল্লাহর জন্য প্রয়োজন ছিল। ফলে যথাসম্ভব তিনি পিতার সাহচর্যেই থাকতেন।

৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ পৃ ৫-৭।

৫। ঢাকা প্রকাশ থেকে মন্তব্য করা হয়, নওয়াবের এরূপ বিনীত ব্যবহারে সবাই খুশী হয়েছেন। আমরা তাঁকে যথোচিত ধন্যবাদ দিচ্ছি। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ পৃঃ ৬।'

৬। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬।

৭। ঢাকা প্রকাশ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ পৃঃ ৫ এবং নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত *পুরানো দলিলপত্র,* পৃঃ ডি-২৪, শরফুদ্দিন শরফ আল হুসেনীর এক উর্দূ লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রফেসর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড গঠনের তারিখ ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খ্রীঃ। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৫৬।

৮। ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোবর ১৮৯৬ পৃঃ ৭ এবং *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৬।

৯। -ঐ- -ঐ-

১০। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২৪। ১৮৯৯ খ্রীঃ আগস্ট মাসে উক্ত আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ডের জন্য গঠিত ট্রাস্টি নিয়োগের বিষয়ে একটি কার্যবিবরণী ঢাকা প্রকাশকে দেয়া হলে, উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হয়নি এ অজুহাতে তারা তা প্রকাশ করেনি। (ঢাকা প্রকাশ, ২০ আগস্ট ১৮৯৯ খ্রীঃ পৃঃ ৭)

১১। ঢাকা প্রকাশ, ১১ অক্টোবর ১৮৯৬ খ্রীঃ পৃ ৭।

১২। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২৪ দ্রঃ। উক্ত সম্পত্তি নতুন করে কেনা হয়নি বরং বিই, প্রপার্টি থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। এভাবে বার্ষিক ৫ হাজার টাকা লাভ প্রদানের ফলে এক পর্যায়ে উক্ত রিলিফ ফান্ডে নওয়াব এস্টেট থেকে দেয় অর্থের মোট পরিমাণ দাড়ায় ২,৪৫,০০০/- টাকা ; দেখুন নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা উদ্ধৃত করেছেন- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯২।

১৩। ঢাকা প্রকাশ, ২ অক্টোবর ১৮৯৮ পৃঃ ৬।

১৪। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মে ১৯০১ এবং আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭।

১৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ মার্চ ১৯১৯ পৃঃ ৩।

১৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ ফেব্রুঃ ১৯০৫ পৃঃ ৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৯০৬ পৃঃ ৩।

১৭। *পুরানো নথি,* ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২৫।

১৮। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-২৫।

১৯। নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত পুরানো নথি থেকে প্লেগ ফান্ডের উক্ত নাম পাওয়া যায়। আগেই বর্ণিত হয়েছে, নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৮৯৬ খ্রীঃ তাঁর পিতা মরহুম আব্দুল গণির স্মরণে একটি রিলিফ ফান্ড চালু করেন। পিতৃভক্ত নওয়াব আহসানুল্লাহ জনকল্যাণমুলক এই প্লেগট্রাস্ট ফান্ডও যে পিতার নামেই করবেন সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

২০। ঢাকা প্রকাশ, ৮ মে ১৮৯৮, পৃঃ ৬-৭। তায়েশ বলেন, ১৮৯৪ খ্রী লর্ড এলগিন ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং তাঁর আমলেই ভারতে সর্বপ্রথম প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সরকার প্লেগ রোগ নিবারণে অনেক চেষ্টা করেও আশানুরূপ ফল পায়নি। তায়েশ তাওয়ারিখ, প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ১১৬।

২১। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ফেব্রুঃ ১৮৯৮।

২২। ঢাকা প্রকাশ ৮ মে, ১৯৯৮ পৃঃ ৭।

২৩। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৬। এ দানের খবর প্রকাশ করে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল, একযোগে এরূপ বিশাল দান কেবল নওয়াব আহসানুল্লাহর আয় অনুসারেই শোভা পায়। আমরা তাঁকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিভাবে এই প্রচুর টাকার সদ্ব্যবহার হবে বলা কঠিন ..... তবে গভর্নমেন্ট যখন আমাদের ন্যায় অদৃষ্টবাদী নন ... তাই তাঁরা যা ভাল মনে করেন, আমরা তার বিরুদ্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। ঢাকা প্রকাশ, ৮মে ১৮৯৮ পৃঃ ৬-৭।

২৪। ঢাকা প্রকাশ, ৮মে ১৮৯৮ পৃঃ ৬-৭।

২৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুলাই ১৮৯৮ পৃঃ ৬। ২৫ জুলাই ১৮৯৮ খ্রীঃ সোমবার বিকেল ৫ টায় নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বংগের লেঃ গভর্নর লর্ড উডবার্ন নওয়াব আহসানুল্লাহকে কে. সি. আই. ই. উপাধির স্টার চিহ্ন প্রদান করেন। উক্ত দরবারের ছোট লাট উডবার্নকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ডিঃ বোর্ড এবং মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র দেয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনপত্রে প্লেগ নিবারণে নওয়াব বাহাদুরের ১ লক্ষ টাকা দানের বিষয় উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জুলাই ১৯৯৮ পৃঃ ৪।

২৬। ঢাকা প্রকাশ, ৫ মার্চ ১৮৯৯ পৃঃ ৬।

২৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ১৮৯৯ পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ মার্চ ১৯০২ পৃঃ ৭। ১৯২৩ খ্রীঃ মে মাসে ঢাকায় প্লেগ রোগে কয়েকজন মারা যায়, তবে সেটি আসল প্লেগ ছিল না বিধায় অচিরেই নিয়ন্ত্রনে আসে। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ মে ১৯২৩ খ্রীঃ।

২৯। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৭-১৮, প্লেগ ফান্ড দ্রঃ।

৩০, ৩১ ও ৩৩ । *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৭-১৮,প্লেগ ফান্ড দ্রঃ।

৩২। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ পৃঃ ৬।

৩৪। ১৯৩২ খ্রীঃ নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার উক্ত ফান্ডে নওয়াবের মনোনীত ট্রাস্টি ছিলেন। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত ঐ।

৩৫,৩৬,৩৭। *পুরানো নথি,* (প্লেগ ফান্ড দ্রঃ) পৃঃ ডি-১৭-১৮।

৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪ এবং *পুরানো নথি,* প্লেগ ফান্ড দ্রঃ পৃঃ ডি-১৮।

৩৯। *পুরানো নথি,* প্লেগ ফান্ড, দ্রঃ পৃঃ ডি- ১৮। এভাবে বাৎসরিক লাভ প্রদানের ফলে এক পর্যয়ে উক্ত প্লেগ ফান্ডে নওয়াব এস্টেট থেকে দেয়া অর্থের পরিমান দাড়ায় ১,৩৫,০০০ টাকা। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা-উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯২

৪০। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জুন ১৯০৮ পৃঃ ৩ এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ ৪।

৪১। এনামুল হক, নওয়াব বাহাদুর আঃ লতিফ, হিজ রাইটিংস এন্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস, ঢাকা-১৯৬৮ পৃঃ ১৬।

৪২। নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখা ব্যক্তিগত পত্রের (ফার্সী) কপি থেকে উদ্ধৃত করেছেন, মোঃ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৯।

৪৩। নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখা ব্যক্তিগত ফার্সী পত্র, প্রাগুক্ত।

৪৪। নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক নওয়াব আব্দুল লতিফকে লেখা পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন, মোঃ আবদুল্লাহ, নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০০। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রফেসর শরিফুদ্দিন জানিয়েছেন, নওয়াব আহসানুল্লাহর ভগ্নিপতি খাজা মোঃ আজগর, ঢাকায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন এবং তাকে সহায়তা করেন মৌলভী ইলাহাবাদ খান। (শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ৭৯) কিন্তু উপরোক্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেই কাজটি করেছিলেন। তবে খাজা মোঃ আজগর তাঁকে একাজে সহায়তা করতে পারেন।

৪৫। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-২০০,২৫৯ এবং ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল দ্রঃ।

৪৬। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-২৫৯।

৪৬। (ক) ঢাকা প্রকাশ, ২ সেপ্টেঃ ১৮৮২ পৃঃ ২৯৪ এবং ৩৬৯।

৪৬। (খ) সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পাক-বাংলার ইসলামী বিপ্লব, মাহে নও, ২০ বর্ষ ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৮ পৃঃ ৮-৯।

৪৭। *এ্যাবস্ট্রাক্ট অব প্রসিডিংস অব মোহামেডান সোসাইটি অব ক্যালকাটা ...* থেকে উদ্ধৃত করেছেন- প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান..,* ১ম খন্ড পৃঃ ১৪৫।

৪৮। সুফিয়া আহমেদ, *মুসলিম কম্যুনিটি ইন বেংগল পৃঃ ১৭২।*

৪৯। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মাহে নও,* ডিসেম্বর ১৯৬৮ পৃঃ ৮-৯। মোঃ আব্দুল্লাহ, মওলানা আঃ আউয়াল জৌনপুরী (রঃ) ঢাকা-১৯৯৫ পৃঃ ১৫২ এবং ইসলাম প্রচারক, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৯ বাংলা থেকে উদ্ধৃত করেছেন-মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ১ম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৭৭ পৃ ১২৬।

৫০। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুলাই ১৮৯৭ পৃঃ ৬-৭।

৫১। মোঃ ইব্রাহিম, ইসলামিয়া প্রেস, সাতরওজা, ঢাকা থেকে ছাপানো প্রশংসাপত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন -মোঃ আব্দুল্লাহ, *মওলানা আঃ আউয়াল জৌনপুরী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯।

৫২। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ পৃঃ ৮ এবং মোসলেম ক্রনিকেল ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদসান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৫৬।

৫৩। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশশতকে বাঙালী..*১ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৭।

৫৪। ঐ ঐ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৮। উল্লেখ্য নওয়াব আহসানুল্লাহ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। ৩ এপ্রিল ১৮৭২ খ্রীঃ থেকে সোসাইটির সদস্য তালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যায়। ঐ, ২য় খন্ড পৃঃ ২৩৭।

৫৫-৫৬। *রুলস এন্ড অবজেক্ট অব সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাঃ এসোসিয়েশন ... এন্ড এ্যানুয়াল রিপোর্টস এন্ড লিস্ট অব মেম্বারস,* কলকাতা ১৮৮৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী..*১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৭-৫৮।

৫৭। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী ...* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬০।

৫৮। ইনাম উল হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ১২০-২১।

৫৯। ওয়াকিল আহমদ, প্রগুক্ত ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭১।

৬০। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ নভেঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৩৭৯।

৬১। মোসলেম ক্রনিকেল, ৪ফেব্রুঃ ১৮৯৯ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ১৭২।

৬১ (ক) আর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত, ক্রমিক ৭০,১৪১।

৬২। মামুন, ঢাকা প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩।

৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ৪এপ্রিল ১৮৮০ এবং মোঃ আঃ কাইউম, চক বাজারের কেতাবপট্টি (মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী) ঢাকা নভেঃ ১৯৯০ পৃঃ ৪৮। এবং *ওয়াকিল আহমদ, মুসলিম অরগানাইজেশন অব ঢাকা, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২২-২৩।* উল্লেখ্য, সমসাময়িক

Dhaka University Institutional Repository

কালে আঞ্জুমানে হেমায়েতুল ইসলামের উদ্যোগে বরিশালে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং নির্মানে ১৮৯৫ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ ২০০ টাকা দান করেন। যাদ্বারা জমি কেনা হয়। (সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরিশাল বেল ইসলামিয়া হোস্টেল, বরিশাল, ১৯৪০ পৃঃ ৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-ওয়াকিল আহমদ (*হেমাওয়ত উদ্দিন আহমদ*) ইতিহাস সমিতি পত্রিকা ১০ সংখ্যা ১৯৮১ পৃঃ ৯ এবং উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খন্ড পৃঃ ১১৮ দ্রঃ) এছাড়া নওয়াব আহসানুল্লাহ ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনে ৩০০ টাকা দান করেন। অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত ক্রমিক নং -৭০। ঢাকাতেও ফুলারের নামে ছাত্রাবাস নির্মাণে নওয়াব আহসানুল্লাহ অর্থ দান করেন। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে ঐ*, ২য় খন্ড পৃঃ ১১৯।

৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ২২ আগস্ট ১৮৮০ এবং আঃ কাইউম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮।

৬৫। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণ, ১৮৮৩ সালে গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত , পৃঃ ১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আঃ কাইউম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭ এবং ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে..* ধারা, ১ম খন্ড পৃঃ ১৭৬-৭৯।

৬৬। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্র, পৃঃ ১-৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে* ....ধারা ২য় খন্ড পৃঃ ২৫৩-৫৪। ১২৯৬ বাংলা সনে ঢাকা সার্ভে স্কুলে জনৈক ছাত্রের ১৩ টাকা মূল্যের সার্ভে যন্ত্রসম্বলিত বাক্সটি হারিয়ে গেলে সুহৃদ সম্মিলনী তার সেটা কেনার জন্য দাম দিয়েছিল, সুধাকর, ১২ মাঘ ১২৯৬ বাংলা পৃঃ ৯৫।

৬৭। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ডিসেঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৪৩৯।

৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ৪মে ১৮৭৩। উল্লেখ্য, কলকাতার বামাবোধিনী সভার অনুকরণে ঢাকার নবকান্ত চট্টো, কালী প্রসন্ন ঘোষ, দীন নাথ সেন প্রমুখ সহযোগিদের নিয়ে ১৮৭০ খ্রীঃ ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, "অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা " নামক সংগঠন। (মামুন , ঢাকা পৃঃ ১৪৫) এছাড়া ঢাকা জন সাধারণ সভার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ ৮০০ টাকা দান করেছিলেন। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং ১৯৪। উল্লেখ্য, আব্দুল কাইউম লিখেছেন, উবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর এমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিলনা যিনি অনুরূপ অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হন এবং এর সাথে জড়িতরা ছিল তখন কলেজ ছাত্র অথবা সদ্য স্নাতক তরুন সমাজ। কিন্তু ১৮৮৮ খ্রীঃ ঢাকা প্রকাশে দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় , ঐ সময় ঢাকা মাদ্রাসার সুপার মৌঃ আঃ খায়ের মোঃ সিদ্দিক-এর সভাপতি এবং মৌঃ আঃ মজিদ সম্পাদক সহ ঢাকার খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এ সভার কার্যনির্বাহী কমিটিতে সদস্য ছিলেন। (ঢাকা প্রকাশ, ডিসেঃ ১৮৮৮।)

৬৯। ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রীঃ। আজিমুশ্শান হায়দার ও প্রফেসর আব্দুল্লাহ লিখেছেন, খাজা মোঃ ইউসুফজান এ সমিতির একজন সংগঠক ছিলেন। আজিমুশ্শান হায়দার, *সিভিক বডি*, ৮১ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৭০।

৬৯।(ক) আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১

৭০। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জানুঃ ১৯০৪ পৃঃ ৫।

৭১। সুফিয়া আহমেদ, *নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*, ভল-২১,১৯৭৬ পৃঃ ১৫৩ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রগুক্ত পৃঃ ৮৪।

৭২। দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১-২৩। উল্লেখ্য, ঢাকা মাদ্রাসার সংশ্রবে পরিচালিত মুসলিম সমিতিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ ৪০০ টাকা দান করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১১ মার্চ ১৯০৬।

৭৩। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড,পৃঃ ১২।

৭৪। টেইলর, *টপোগ্রাফী*, বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬২।

৭৫। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে নিজ হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব নিয়ে মহারানী যেসব ঘোষনা দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে প্রজাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও কৃষ্টির উপর শাসক কর্তৃক হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি ছিল অন্যতম।

৭৬। প্রীতি কুমার মিত্র, হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৮-৮৯। উল্লেখ্য, ১৮৭২ খ্রীঃ কেবলমাত্র ব্রাহ্মদের বিয়ের আইনে স্ত্রীর বয়স কমপক্ষে ১২ ধার্য করা হয়েছিল। মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িকপত্র, ৪র্থ খন্ড ঢাকা ১৯৯১ পৃঃ ৭৮।

৭৭। প্রীতি কুমার মিত্র, ঐ এবং মামুন ঐ পৃঃ ৮১।

৭৮। প্রীতি কুমার মিত্র, ঐ এবং ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ১৫।

৭৯। প্রীতি কুমার মিত্র, ঐ পৃঃ ২৮৯।

৮০। স্ত্রী ছাড়াও বারবনিতা প্রভৃতি আইনসিদ্ধ স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলনের ক্ষেত্রও আইনটি প্রযোজ্য ছিল।

৮১। ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ১৫

৮২। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ পৃঃ ৩-৭।

৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জানুঃ ১, ৮, ১৫ ফেব্রুঃ ১৮৯১ এবং ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ১৫ এবং মামুন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২-৮৩।

৮৪। ঢাকা প্রকাশ ২২ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ১৪। যদিও তিনি ৪টি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু ঐ স্ত্রীদের একজন মারা যাবার পর তিনি অন্য জনকে গ্রহণ করেছিলেন। শেষের জন ছিলেন একজন জ্ঞাতি বিধবা।

৮৫। নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৮৯১ সালে এবং ১৮৯৯ সালে মোট দুইবার বড় লাট আইন সভায় সরকার মনোনীত সদস্য হয়েছিলেন। উক্ত আইন সভায় যোগদানের জন্য ৬ ডিসেঃ ১৮৯০ একটি বৃহৎ জাহাজ ভাড়া করে নওয়াব সাহেব পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনের বিরাট বহর নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতা যান। সে সময় তাঁর ভ্রমনে ব্যয়ানুমান ধরা হয়েছিল ২ লক্ষ টাকা। ঢাকা প্রকাশ ৭ ডিসেঃ ১৮৯০ পৃঃ ৬। সে যাত্রায় তিন মাস কলকাতায় থাকার পরিকল্পনা থাকলেও ছোট লাট ইলিয়ট বাহাদুর ঢাকা ভমনে আসায় নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৮৯১ সালের ফেব্রুঃ প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ফেরত আসেন। (ঢাকা প্রকাশ ১ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৭)

Dhaka University Institutional Repository

৮৬। *এ্যাবস্ট্রাক্ট অব প্রসিডিংস অব দি কাউন্সিল অব দি গভঃ জেনাঃ অব ইন্ডিয়া এ্যাসেমব্লেড ফর দি পারপাস অব মেকিং লজ এন্ড রেগুলেশনস,* ১৮৯১ পৃঃ ৩০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৬-৯।

৮৭। *ঐ এ্যাবস্ট্রাক্ট অব প্রসিডিংস,* ১৮৯১ পৃঃ ৩০ (*এমেন্ডমেন্ট অব ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড এন্ড কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর.-১৮৮২. তাং ২৩ জানুঃ ১৮৯১।*

৮৮। *ঐ , এ্যাবস্ট্রাক্ট অব প্রসিডিংস,* পৃঃ ৩০।

৮৯। মামুন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

৯০। ঢাকা প্রকাশ, ১ ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৪।

৯১। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃ ৩-৬।

৯২। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ফেব্রুঃ ১৮৯১পৃঃ ৪-৫

৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ফেব্রুঃ ২২ ফেব্রুঃ ১ মার্চ ১৮৯১ দ্রঃ।

৯৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ও ২২ ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৬-৯।

৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ২২ মার্চ ১৮৯১ পৃ ৩।

৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ২২ মার্চ ১৮৯১, পৃঃ ৩। এছাড়া উক্ত সভায় বক্তারা নওয়াবের দাড়ি না রাখার বিষয়ে কটাক্ষ করেন এবং তাঁর কাজের দ্বারা ইসলামের পবিত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন। যদিও তাঁরা কোরান হাদীসের কোন উদ্ধৃতি এজন্য দিতে পারেননি তথাপি কেবলমাত্র গোড়ামী ও রক্ষনশীলতার জন্যই এরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ বর্ষ ৪ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত-মামুন, প্রাগুক্ত, *সাময়িক পত্র* ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৮৪।

৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ মার্চ ১৮৯১।

৯৯। *এ্যাবস্ট্রাক্ট অব প্রসিডিংস,* প্রাগুক্ত ১৮৯১ পৃঃ ৭৬-১৫০।

১০০। ঢাকা প্রকাশ, ৫ এপ্রিল ১৯৮১ পৃঃ ৫।

১০১। ঢাকা প্রকাশ, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ পৃঃ ৩।

১০২। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে*..প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ১৫।

১০৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই, ১৮৮৪ পৃঃ ২৩৫।

১০৪। ঢাকা প্রকাশ, ২০ এপ্রিল ১৮৮৪ পৃঃ ৬৬।

১০৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই ১৮৮৪ পৃঃ ২৩৫।

১০৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ মার্চ ১৮৮৪ পৃঃ ৩১।

১০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২২ মার্চ ১৮৯১। এর পরেও ছোট লাট নাকি মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার কোন কোন জায়গায় খোলাভাটি প্রতিস্থাপনের আদেশ দেন। ঐ ২২ মার্চ ১৮৯১ পৃঃ ৫।

১০৮। কুমারটুলীতে আঃ গণি হাইস্কুলের নিকট অনুরূপ একটি পতিতালয় থাকায় স্কুলের ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ পৃঃ ৩২০।

১০৯। বি. সি. এলেন, *ইস্টার্ন বেংগল ডিঃ গেজেঃ ঢাকা,* ১৯১২ পৃঃ ৮।

১১০। সিলেক্ট কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন- দিনাজপুরের মহারাজা, মিঃ কক্স এবং মিঃ স্টুয়ার্ট। ১৯ জানুঃ ১৯০৭ তারিখের মধ্যে তাঁদেরকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেঃ ১৯০৬ পৃঃ ৪-৫।

১১১। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জানুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩।

১১২। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ফেব্রুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক ভদ্রপল্লী থেকে বেশ্যালয় উঠিয়ে দেয়ার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাঁর সমর্থক মুসলিমগণ ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়। ৫ মার্চ ১৯০৭ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ কুমিল্লায় সভা করতে গেলে তাঁর উৎসাহী সমর্থকেরা গোলযোগের সুযোগে সেখানকার কয়েক জন বেশ্যাকে বিতাড়িত করেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১০ মার্চ ১৯০৭।

১১৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জুলাই ১৯০৭ পৃঃ ৩। নাজির হোসেন লিখেছেন, ১৯৬০ এর দশকে তিনি জনৈক প্রভাবশালী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণ মামলা পরিচালনা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ থানা পুলিশকে হাত করে ফেলে। এমতাবস্থায় তিনি তৎকালীন মিউনিঃ ভাইস চেয়ারম্যান খাজা খায়রুদ্দিনের স্মরণাপন্ন হলে খাজা সাহেব এস. পি.-কে বলে বিষয়টি ট্যাকেল করেন। ঐ, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৪৬ ও ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জনস্বার্থে হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ

জনকল্যাণে ঢাকার নওয়াবগণ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। তৎকালে যখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ঔষধপত্র ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল না। নানা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে জনসাধারণ হাতুড়ে চিকিৎসক, কবিরাজ প্রভৃতির কুচিকিৎসার আশ্রয় নিত। ঢাকার নওয়াবরা তখন তাঁদের জমিদারির এলাকায় প্রায় প্রত্যেকটি কাচারিকে কেন্দ্র করে একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এভাবে তাঁরা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেন। এছাড়া ঢাকা শহর ও দেশের মফস্বল শহর এলাকায় তাঁরা কয়েকটি আধুনিক হাসপাতালও নির্মাণ করেছিলেন। দেশের বাইরেও বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে তাঁরা অর্থ সাহায্য পাঠাতেন।[১] নিম্নে এরূপ কয়েকটি হাসপাতাল নির্মাণ ও উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবদের অবদানের কথা বর্ণনা করা গেলঃ

৫(১) মিটফোর্ড হাসপাতাল উন্নয়নে অবদান ঃ

ব্রিটিশ বাংলার স্বাস্থ্যোন্নয়নের ইতিহাসে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইতোপূর্বে এতদাঞ্চলে এরূপ স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্বলিত কোন চিকিৎসালয় ছিল না।[২] পুরাকাল থেকে এদেশে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগে হাজার হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। কোথাও এসব রোগ দেখা দিলে ক্রমান্বয়ে তা মহামারীর আকার ধারণ করে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর একে একে উজাড় করে দিত। তৎকালে এরূপ মহামারীতে ঢাকা শহরে যে কত লোক মারা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। পরিকল্পিত আধুনিক হাসপাতালের অভাবে ধনুষ্টংকার, নিউমোনিয়া, জলাতঙ্ক, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি কঠিন রোগের যথাযথ চিকিৎসা তখন হতো না। ইংরেজরা ১৮০৩ খ্রীঃ ঢাকায় একটি আঞ্চলিক হাসপাতাল এবং ১৮৩৯ খ্রীঃ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ঐগুলো ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। বিশেষ করে জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নয়নে সেগুলো তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। মিটফোর্ড হাসপাতাল একদিকে যেমন দেশের শাসক গোষ্ঠীসহ উচ্চ শ্রেণীর লোকদের চিকিৎসা করতো তেমনি জনসাধারণেরও সেবা দান করতো। তাই এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার ঐসব চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো এর সাথে একীভূত হয়ে যায়। ঐসব আঞ্চলিক হাসপাতালে সরকারের প্রদেয় সমুদয় অর্থ মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়।[৩] ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নয় বরং এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রবার্ট মিটফোর্ড নামক এক মহাপ্রাণ ইংরেজ সাহেবের ব্যক্তিগত অনুদানে। তাই আমরা দেখি পরবর্তীকালে হাসপাতালটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজও হয়েছিল এদেশের বিত্তশালী ও জনদরদী লোকদের আর্থিক সাহায্যে।

রবার্ট মিটফোর্ড ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঢাকায় কালেকটর ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রাদেশিক আপীল আদালতের জজ এবং সিভিল সার্ভিসের সদস্য হয়েছিলেন।[৪] চিরকুমার রবার্ট মিটফোর্ড দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সময়ে ঢাকাবাসীর দুর্দশা ও অসহায়ত্ব দেখে বিচলিত হতেন। তাঁর সময় একবার ভয়াবহ কলেরার মহামারীতে ঢাকায় প্রতিদিন দেড় থেকে দু'শ লোক মারা গিয়েছিল।[৫] ১৮৩৬ খ্রীঃ লন্ডনে মৃত্যুর আগে রবার্ট মিটফোর্ড তাঁর প্রায় আট লক্ষ টাকার

Dhaka University Institutional Repository

সমুদয় সম্পত্তি ঢাকাবাসীর উপকারার্থে দান করে যান। মিটফোর্ডের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়গণ সম্পত্তির এই পরিমাণ দেখে উইল বাতিলের জন্য মামলা করেন। শেষে বিলাতের চেন্সিরি কোর্টে ১৮৫০ খ্রীঃ এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। রায়ে বাংলা সরকার আংশিক ডিক্রী মোতাবেক ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা পান। ঐ অর্থ দ্বারা ঢাকায় একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৬] বুড়িগংগা নদীর তীরে পুরানো ওলন্দাজ কুঠির স্থানে ১৮৫৪ খ্রীঃ হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তা ১৮৫৮ খ্রীঃ শেষ হয়। ১ মে ১৮৫৮ খ্রীঃ হাসপাতালটির উদ্বোধন করা হয় এবং দাতার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় "মিটফোর্ড হাসপাতাল"। এই হাসপাতালে তখন পুরুষদের জন্য দুটি সার্জিকেল ও দুটি মেডিকেল ওয়ার্ড এবং মহিলাদের জন্য একটি ওয়ার্ড ছিল। সেখানে মোট ৯২ জন রোগীর চিকিৎসা করা যেত।[৭]

এই হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য দুটি উৎস ছিল। মিটফোর্ডের দেয়া অর্থের সুদ এবং সরকারী অনুদান।[৮] ১৮৭৭ খ্রীঃ মিটফোর্ড হাসপতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি সাড়ে সাত থেকে আট ভাগ গৃহকর বৃদ্ধি করেন।[৯] প্রধানত সরকার নিযুক্ত সিভিল সার্জন ও সাব এ্যাসিসট্যান্ট সিভিল সার্জনের উপর এই হাসপাতাল পরিচালনার কার্যভার দেয়া ছিল। কিন্তু নীতি নির্ধারণ কিংবা পরিবর্তনের জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিচালনা কমিটিও ছিল। হাসপাতালটি পরিচালনা পরিষদের নাম ছিল 'কমিটি অব ভিজিটর্স' যার সদস্য ছিলেন- কমিশনার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং শহরের ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮৬৯ খ্রীঃ ঐ পরিচালনা কমিটিতে যে চারজন দেশীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ (১) খাজা আব্দুল গণি, (২) খাজা আহসানুল্লাহ, (৩) লালা মৃত্যুজিৎ সিং এবং (৪) বাবু অভয় কুমার দত্ত।[১০] কমিটি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট দায়ী ছিল। অর্থাৎ হাসপাতালটি তখন মিউনিসিপ্যালিটির অধীনেই ছিল।[১১] ১৯১৭ খ্রীঃ এই হাসপাতালটি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে এবং একে সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা হয়।[১২]

১৮৫৮ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা সরকার হাসপাতালটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দেশের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৩] হাসপাতালটির উন্নয়নে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে ঢাকার নওয়াব পরিবারের নাম সবার আগে উল্লেখযোগ্য। নওয়াব আব্দুল গণির সময় থেকে শুরু করে নওয়াব হাবিবুল্লাহ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় মিটফোর্ড হাসপাতালের নানা উন্নয়ন কাজে তাঁরা প্রভূত অর্থদান করেছেন। ঐ সবের মধ্যে ছিল নতুন নতুন ওয়ার্ড নির্মাণ, গৃহ ও ডিসপেন্সারী নির্মাণ, মৃতদেহ সৎকার কাজ প্রভৃতি। এছাড়া নওয়াব এস্টেটের ওয়াকফ ফান্ড থেকে প্রতি বছর মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকতো। অধিকন্তু দুস্থ ও গরীব রোগীর চিকিৎসা এবং হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ সৎকারের জন্য যখন যা প্রয়োজন দেয়া হতো। ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত নওয়াব আব্দুল গণির অর্থদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে জানা যায়, তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য নিম্নলিখিত অর্থদান করেছিলেন।[১৪]

(১) মিটফোর্ড হাসপাতালে ১ম বার দান	৫০০/-টাকা
(২) মিটফোর্ড হাসপাতালে (১৮৭৫ খ্রীঃ) মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য	২৫,২৪৫/-টাকা
(৩) মিটফোর্ড হাসপাতালে ২য় বার দান	৫০০/-টাকা

নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় মিটফোর্ড হাসপাতাল উন্নয়নের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থদান করা হয়। আগেই বর্ণিত হয়েছে, ১৮৭৫ খ্রীঃ মিটফোর্ড হাসপাতালে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য একটি মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণে নওয়াব আব্দুল গণি ২৫,২৪৫/- টাকা দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় নওয়াব আহসানুল্লাহর নামে এস্টেট পরিচালিত হতো বিধায় ঐ দান কাজটি তাঁর মাধ্যমেই হয়েছিল।[১৫] মিটফোর্ড হাসপাতালের আঙ্গিনায় নওয়াব শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত একটি সুন্দর মসজিদ রয়েছে। উক্ত মসজিদের উত্তরে এক সময় নওয়াব শায়েস্তা খাঁর কন্যা শাহজাদী খানম ওরফে লাডলী খানমের সমাধি সৌধ ছিল। ঢাকার নওয়াবদের দানে হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণের সময় উক্ত সমাধি সৌধটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং কবর থেকে মৃতের হাড়-গোড় সব উত্তোলন করা হয়। কবরের ভিতর থেকে একটি সোনার আতরদান, একটি রূপার গোলাপ পাশ এবং একটি রূপার লোবান দানও পাওয়া যায়। কবরটি ভেঙ্গে ফেলাতে স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং শহরে শান্তি ভংগের উপক্রম হয়েছিল। অবশেষে নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে বিষয়টির মীমাংসা হয়। যেহেতু পরিকল্পিত ভবনটি একটি দাতব্য ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, তাই নওয়াব সাহেব উত্তেজিত জনতাদের ধৈর্য্য ধারণ করতে পরামর্শ দেন। তিনি ধর্মীয় নেতাদের নিকট থেকে ফতোয়া নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে কবর থেকে উত্তোলিত কংকাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পুনঃ কবরস্থ করে বিক্ষোভ নিরসন করেন। মহিলা ওয়ার্ডের পশ্চিমে ঐ কবরটির চিহ্ন বহুদিন ছিল।[১৬] নওয়াবদের অর্থ দানের তালিকা থেকে জানা যায় মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ নিম্নলিখিত অর্থদান করেছিলেন ঃ

(১) মিটফোর্ড হাসপাতালের রুগীর শুশ্রূষার জন্য	৬০০/- টাকা	(দানের ক্রমিক-১২২)
(২) ঐ হাসপাতালের জন্য দান	২০০/- টাকা	(ঐ - ২৩৫)
(৩) ঐ হাসপাতালের সংস্কার কাজের জন্য	২,০০০/- টাকা	(ঐ - ২৪১)
(৪) ঐ হাসপাতালের জন্য, পুনর্বার	২০০/- টাকা	(ঐ - ২৮২)

১৯০০ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে ৫,১৫০/- তিনি মিটফোর্ড হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ হাসপাতাল এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করেন।[১৮] এতদব্যতীত উক্ত হাসপাতালে যে পানি ও বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হয় সেখানেও ঢাকার নওয়াবদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৯] উল্লেখ্য যে, ১৮৭৪ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণির দানে ঢাকা শহরে পানীয় জলের কল সংস্থাপনের শুরুতেই মিটফোর্ড হাসপাতালে এর সংযোগ দেয়া হয়।[২০] তাই ১৮৭৮ খ্রীঃ মে মাসের ২৪ তারিখে উক্ত জলের কলের উদ্বোধনের সাথে সাথেই মিটফোর্ড হাসপাতালে কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আজো অব্যাহত আছে। নওয়াবদের পূর্বোক্ত অর্থ দানের তালিকার প্রারম্ভিক সার সংক্ষেপে দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নওয়াব এস্টেট থেকে মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য যে অর্থাদি দান করা হয়েছিল তার মোট পরিমাণ ছিল ১,৫০,০০০/- টাকা।[২১]

নওয়াব সলিমুল্লাহও তাঁর পিতা এবং পিতামহের ন্যায় মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নয়নে অর্থদান ও পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। ১৯০২ খ্রীঃ সিভিল সার্জন ক্যাম্পবেল সাহেব মিটফোর্ড হাসপাতালে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ ওয়ার্ডের অভাবের কথা ঢাকার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট জে.টি. র‍্যাংকিন সাহেবকে অবহিত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ-কে অনুরোধ জানান। নওয়াব সাহেব তাঁর দাদীর নামে একটি মহিলা ওয়ার্ড তৈরী করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[২২] ১৯০২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতামহী আসমাতুন্নেছার নামে মিটফোর্ড হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[২৩] নিঃসহায় স্ত্রীলোকদের পীড়াকালে হাসপাতালে অবস্থানের জন্য নওয়াব সাহেব এই ওয়ার্ড নির্মাণ করে দেন। ঐ বছর একই সাথে আউটডোর রোগীদের সুবিধার জন্য ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য জমিদার বাবু হরেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী তৎকালীন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট জে.টি. র‍্যাংকিনের নামে র‍্যাংকিন ওয়ার্ড তৈরী করে দেন।[২৪] ১৯০২ খ্রীঃ ২১ জুলাই বংগের ছোট লাট উডবার্ণ ঢাকা সফরে এসে নওয়াবের অতিথি হিসেবে আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। পরদিন ২২ জুলাই মংগলবার বিকেলে তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের আউটডোর গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৫]

বংগের ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার ঢাকা সফরে এসে ৫ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রীঃ শনিবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় উক্ত ওয়ার্ডদ্বয়ের উদ্বোধন করেন।[২৬] এতদুপলক্ষে সকাল ৯টায় মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাংগণে একটি মন্ডপ সজ্জিত করা হয়। সেখানে ঢাকার নওয়াব, ভাওয়ালের রাজকুমারগণসহ স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পদস্থ রাজকর্মচারী এবং ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাংকিন সাহেব নবনির্মিত ওয়ার্ড দুটো নির্মাণে বদান্যবর নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ এবং হরেন্দ্র লাল রায় চৌধুরীর দানের কথা পূর্বাপর বর্ণনা করেন। তিনি ছোটলাট বাহাদুরকে

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলো উদ্বোধনের জন্য আহ্বান জানান। উদ্বোধনী ভাষণে ছোটলাট বাহাদুর ওয়ার্ড দুটো স্থাপনের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দাতা নওয়াব সলিমুল্লাহ ও বাবু হরেন্দ্র- এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি অন্যদেরকেও অনুরূপ প্রশংসনীয় কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।[২৭] উল্লেখ্য, এডওয়ার্ড হাউজ থেকে উদ্ধারকৃত ঢাকার নওয়াবদের ব্যবহৃত এ্যালবাম থেকে মিটফোর্ড হাসপাতাল ভবনের তৎকালীন দৃশ্য সম্বলিত কয়েকটি আলোকচিত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলো থেকে পরিশিষ্টে চিত্র নং ১৪ ও ১৫তে দুটো চিত্র দেয়া হলো।

নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, উক্ত আসমাতুন্নেছা মহিলা ওয়ার্ড সাজানোর নিমিত্তে আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ১৯০৩ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ ৫শত টাকা দান করেছিলেন। তিনি সেখানে বিজলী বাতি সংস্থাপনের জন্য আরো ২শত টাকা দান করেন.। এছাড়া ঐ বছর তিনি বার্ষিক নিয়মিত অনুদান হিসেবে এস্টেট থেকে ৪০০ টাকা দানের ব্যবস্থা করেন।[২৮] নওয়াব এস্টেট থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানুযায়ী দুই বছরের অনুদান হিসেবে ৮০০ টাকা একত্রে পরিশোধ করা হয়।[২৯] আগেই বলা হয়েছে, নওয়াব আব্দুল গণির সময় থেকেই মিটফোর্ড হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ সৎকারের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে প্রতিমাসে অর্থ দেয়া হতো। নওয়াব সলিমুল্লাহ'র সময়েও এটা যথারীতি অব্যাহত ছিল। নওয়াব এস্টেট থেকে এরূপ বৈশাখ ১৩১৬ বাংলা (মে ১৯০৯) মাসের কিস্তি বাবদ ৬০/- টাকা প্রদানের একটি পত্র ও রশিদ এখনো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৩০]

সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে কোন একটি মহৎকাজ করার জন্য লেঃ গভর্ণর স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের সভাপতিত্বে ১৯১০ খ্রীঃ ৮ আগষ্ট বিকেল ৪টায় ঢাকার কার্জন হলে এক সভা হয়। প্রদেশের গণ্যমান্য প্রায় দেড় হাজার লোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছোটলাট সর্বপ্রথম নওয়াব সলিমুল্লাহকে সভায় প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। নওয়াব বাহাদুর ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালটির ব্যাপক উন্নয়নের প্রস্তাব পেশ করেন।[৩১] নওয়াব বাহাদুরের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন দীঘাপতিয়ার মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য, ভাগ্যকুলের রাজা সতীনাথ রায় বাহাদুর এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। আলোচনা শেষে সম্রাট এডওয়ার্ডের নামে উক্ত হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত বিত্তশালীরা বিপুল অংকের চাঁদা দানের অংগীকার করেন। উক্ত চাঁদার পরিমাণ ছিল ৩,১৯,০৪৫/- টাকা ১০ আনা। ঐ সময় নওয়াব এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় নওয়াব অর্থকষ্টে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব পরিবারের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা দান করা হয়। এছাড়া নওয়াব পরিবারের খান সাহেব খাজা মোহাম্মদ আজমও ঐ সময়ে ১ হাজার টাকা দান করেন।[৩২]

আগেই বর্ণিত হয়েছে, নওয়াব আহসানুল্লাহর তৈরী 'আব্দুল গণি প্লেগ ফান্ড' থেকে নওয়াব হাবিবুল্লাহর প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরের লোকদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ১৯২৬ সাল থেকে ঐ ফান্ডের অর্থে মিটফোর্ড হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশের সৎকারের ব্যবস্থা করা হতো।[৩৩] ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জন স্টোন- এর উদ্যোগে ২৪ জুন, ১৯১১ খ্রীঃ নর্থব্রুক হলে এক সভা করে ঢাকায় 'সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি স্বাস্থ্য সহায়ক সমিতি গঠিত হয়। দুস্থ, রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিদের সেবাদান এবং তাঁদেরকে দ্রুত ডাক্তারের নিকট প্রেরণের জন্য সমিতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। এছাড়া পুরবাসীদের খোলা বাতাস সেবন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা দানও সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ এই সমিতি তৈরীতে সর্বপ্রকার সহায়তা দেন এবং তিনি নিজে ও খাজা মোঃ ইউসুফজান এর আজীবন সদস্য হন।[৩৪] ১৯১৯ সালে জানুয়ারী মাসে ঢাকা শহরে বসন্ত রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হয়। এই রোগ নিবারণে সরকারী ব্যবস্থা যথেষ্ঠ ছিল না। নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফজান তখন উক্ত সমিতির মাধ্যমে রোগাক্রান্ত লোকদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৫]

ঢাকা প্রকাশ থেকে জানা যায়, ঢাকায় একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৬৩ খ্রীঃ ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের নিকট এক আবেদন জানানো হয়েছিল।[৩৬] ১৮৭৩ খ্রীঃ 'ঢাকা গণসভা'র পক্ষ থেকে মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য লেঃ গভর্ণরের নিকট পুনরায় আবেদন করা হয়।[৩৭] অবশেষে মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে ১৮৭৫ খ্রীঃ ১৫ জুন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কাজ শুরু হয়।[৩৮] প্রথম বছর ছাত্র ভর্তি হয়েছিল ৩৮৪ জন। ১৮৭৫-১৮৮৫ খ্রীঃ মধ্যে এই মেডিকেল স্কুল থেকে ১৩৬ জন এল.এম.এফ. ডাক্তার পাশ করে বেরিয়েছিল। দেশের বিত্তশালী লোকদের অর্থানুকূলে মেডিকেল স্কুলটিও সম্প্রসারিত হয়। ১৮৮৯ খ্রীঃ ২২ সেপ্টেঃ এই স্কুলের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়।[৩৯] ১৯২৪ খ্রীঃ ঢাকা মেডিকেল স্কুলটিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত করে নেয়া হয়।[৪০] ১৯৬২ খ্রীঃ স্কুলটি মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়। ঢাকার বদান্যবর নওয়াব সলিমুল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় "স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ"। ১৯৭২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ড হাসপাতাল একত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

৫(২) লেডী ডাফরিন মহিলা হাসপাতাল নির্মাণ ঃ

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে রুগ্ন মহিলাদের চিকিৎসার জন্য ১৮৭৫ খ্রীঃ নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ ২৫ হাজারেরও বেশী টাকা ব্যয় করে মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণ করে দেন। উক্ত মহিলা ওয়ার্ড হাসপাতালের মূল ভবনের সাথে যুক্ত থাকায় পর্দানশীল মহিলারা তথায় যেতে চাইতো না। বিশেষ করে মুসলিম অভিভাবকরা পর্দা নষ্টের ভয়ে তাঁদের মেয়েদের তথায় যেতে দিতেন না। এই সমস্যা সমাধানকল্পে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁদের জন্য পৃথক একটি মহিলা হাসপাতাল তৈরী করতে মনস্থ করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও লেডী ডাফরিনের ঢাকা আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ লেডী ডাফরিনের নামে ঢাকায় উক্ত মহিলা হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দেন।[৪১] উল্লেখ্য, লেডী ডাফরিন ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতায় তিনি ১৮৮৫ সালে মহিলা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ঢাকার নওয়াবগণ বহু অর্থ দান করেন।[৪১(ক)] বড়লাটের আগমণ উপলক্ষে ২ নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রীঃ ঢাকার কমিশনার সাহেব, নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহসহ স্থানীয় গণ্যমান্যদের নিয়ে এক সভা করে করণীয় নীতি নির্ধারণ করেন। উক্ত সভায় ঢাকা মাদ্রাসার সামনে ডাফরিন বোর্ডিং হাউস নির্মাণের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪২] লর্ড ডাফরিনের আগমণের আগের দিন ২৫ নভেঃ রবিবার নর্থব্রুক হলে আরেকটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ঢাকায় লর্ড ডাফরিনের আগমণ স্মরণীয় করার নিমিত্তে করণীয় কাজের ব্যয় মিটানোর জন্য চাঁদা দাতাদের নামের তালিকা তৈরী করা হয়।[৪৩] উক্ত সভায় নওয়াব আহসানুল্লাহ ঘোষণা করেন যে, অন্যান্য চাঁদা দাতারা সবাই মিলে যে পরিমাণ টাকা দেবেন, তিনি একাই তার সমপরিমাণ টাকা একাজে দান করবেন।[৪৪] অবশেষে নওয়াব আহসানুল্লাহ লেডী ডাফরিন মহিলা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন।[৪৫] পরবর্তীতে নওয়াবের দানকৃত ঐ টাকায় ঢাকার নলগোলায় একটি ভবন তৈরী করা হয়। উক্ত ভবনে ৪ শয্যাবিশিষ্ট লেডী ডাফরিন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে আউটডোর চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৬ সালে এই হাসপাতালে মোট ২৭০৪ জন নারীর চিকিৎসা করা হয়েছিল।[৪৬] নওয়াবদের দানের তালিকা থেকে আরো জানা যায়, উক্ত হাসপাতালের জন্য বছরে ৫শত টাকা করে অনুদান বরাদ্দ রাখা হতো।[৪৭] এতদ্ব্যতীত অনিয়মিতভাবে মোটা অংকের টাকা এজন্য দান করা হতো। উক্ত দানের তালিকা থেকে একবার এতে ১,০০০/- টাকা, আরেকবার ৩,৫০০/- টাকা এবং আরেকবার ২,০০০/- টাকা দানের কথাও জানা যায়।[৪৮] তবে এটা কখনও পূর্ণাংগ হাসপাতাল রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বলে মনে হয়। নলগোলাস্থ ঐ ভবনটির শীর্ষে এখনো 'ডাফরিন ডিসপেন্সারী' কথাটি লেখা আছে। বিগত চল্লিশের দশকে অর্থাভাবে লেডী ডাফরিন হাসপাতালটি মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে একীভূত হয়ে যায়। পরবর্তীতে নলগোলাস্থিত হাসপাতাল ভবনটিতে সিভিল সার্জনের দপ্তর স্থাপন করা হয়।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

৫(৩) পটুয়াখালী বেগম হাসপাতাল নির্মাণ ঃ

ঢাকার নওয়াবগণ ঢাকার বাইরে মফস্বল শহর এলাকায় যতগুলো জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন, তন্মধ্যে পটুয়াখালীতে বেগম হাসপাতাল নির্মাণ কাজটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পটুয়াখালীতে নওয়াব এস্টেটের পক্ষ থেকে বহু আগেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালানো হতো। প্রতিমাসে ঐ চিকিৎসালয়ের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে ৫ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া ছিল।[৫০] নওয়াব আহসানুল্লাহর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ১৯০০ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। তিনি উক্ত স্ত্রীর স্মরণে পটুয়াখালীতে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তিনি এর নাম দেন-পটুয়াখালী বেগম হাসপাতাল।[৫১] নওয়াব আহসানুল্লাহর উক্ত স্ত্রীর নাম ছিল কামরুন্নেসা বিবি। তাঁর গর্ভে পরীবানু, মেহেরবানু ও আখতার বানু নামে নওয়াবের তিনটি কন্যা ছিল। সুতিকা ও শোতরোগে দীর্ঘদিন কষ্ট ভোগ করে তিনি ২২ জুন ১৯০০ খ্রীঃ শুক্রবার দুপুর ১.০০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। নওয়াব সাহেব তাঁর চিকিৎসার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় সিভিল সার্জনদেরকে তিনি এজন্য হাজার হাজার টাকা দেন। এছাড়া দৈনিক পাঁচশত টাকা করে ফিস দিয়ে কলকাতা থেকে সান্দর সাহেব নামক এক ইংরেজ ডাক্তারকে এনে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে প্রায় ১৬ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল।[৫২] কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। এর আগে নওয়াব আহসানুল্লাহর দুটি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তাই উক্ত তৃতীয় স্ত্রীর রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি সব কাজকাম এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু আয়ু না থাকলে যা হয়। বেগম সাহেবা পরপারে চলে গেলে নওয়াব সাহেব খুবই মর্মাহত হন।[৫৩] উক্ত বেগমের মৃত্যুতে নওয়াব বাহাদুরের শোকে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ২৫ জুন ১৯০০ খ্রীঃ ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এক সভায় মিলিত হয়ে নওয়াবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।[৫৪] ১৯০০ খ্রীঃ জুলাই মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত মৃত স্ত্রীর নামে তাঁর জমিদারি এলাকা পটুয়াখালীতে একটি হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দেন। এতদুপলক্ষে তিনি ঐ মাসেই পটুয়াখালীর মহকুমা প্রশাসকের নিকট ৮ হাজার টাকা প্রদান করেন এবং হাসপাতালটি নির্মাণের সমুদয় ব্যয় নির্বাহে সম্মত হন।[৫৫] হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা হবার পর তা পরিচালনার জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেয়া হতো। এছাড়া যে কোন সময় হাসপাতালের বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য মোটা অংকের টাকাও দেয়া হতো। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, উক্ত হাসপাতালের জন্য ১৯০৩ খ্রীঃ ১ হাজার টাকা এবং ১৯০৪ খ্রীঃ ৪ হাজার টাকা নওয়াব এস্টেট থেকে প্রদান করা হয়েছিল।[৫৬]

৫(৪) জামুর্কি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ ঃ

টাংগাইলের জামুর্কি নামক স্থানে ঢাকার নওয়াবদের বড় ধরনের একটি জমিদারি কাচারী ছিল। উক্ত কাচারী এলাকায় ঢাকার নওয়াবরা একটি মসজিদ, একটি স্কুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টিতে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা দানের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে জামুর্কী কাচারীতে পূন্যাহ চলাকালে ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন সাহেব ডিসপেন্সারিটির ব্যবস্থাপনা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নওয়াবের এজেন্ট মিঃ ওয়েদারেল ঐ সময় টাংগাইলের ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় জমিদারদের নিয়ে এক সভা করে ডিসপেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত ডাঃ বাবু যোগেষ চন্দ্র ঘোষকে একটি রৌপ্য মেডেল পুরস্কার দেন।[৫৭] ১৮৮৬ খ্রীঃ ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এলাকা ভ্রমণকালে ১৮ সেপ্টেম্বর জামুর্কিতে নওয়াবের উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করেন। নওয়াবের এজেন্ট মিঃ ওয়েদারেল তাঁর সংগে ছিলেন। কমিশনার সাহেব দাতব্য চিকিৎসালয়টির সুব্যবস্থা দেখে বিশেষ আনন্দিত হন এবং এর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার মিঃ ঘোষকে খুব প্রশংসা করেন। কমিশনার সাহেবের পরিদর্শনের স্মরণে নওয়াবের এজেন্ট চিকিৎসালয় ভবনটির ভিত্তি পাকা করার ব্যবস্থা করেন।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯০২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ তাঁর চীফ ম্যানেজার মিঃ জি. এল. গার্থসহ জামুর্কি কাচারী পরিদর্শনে গমন করেন। ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার স্থানীয় জমিদারগণ ও সাব রেজিস্ট্রার, নওয়াবের স্টীমারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দনপত্র দেন।[৫৯] উক্ত অভিনন্দন পত্রের জবাবে নওয়াব সাহেব জামুর্কির দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তরিত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি কাচারী এলাকায় একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করে দিতেও সম্মত হন। পরদিন নওয়াবের আদেশে চীফ ম্যানেজার, উক্ত সাব রেজিস্ট্রার ও খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় উক্ত হাসপাতাল ও মসজিদের জন্য স্থান নির্ধারণ করেন।[৬০] বলা বাহুল্য, অচিরেই কাজগুলো বাস্তবায়িত হয়েছিল। জামুর্কিতে নির্মিত উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকার নওয়াবদের জনকল্যাণ কাজের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জামুর্কিতে নওয়াব আব্দুল গণির নামে তৈরী একটি নামকরা হাইস্কুল নওয়াব এস্টেটের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হতো।[৬১] যার সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

৫(৫) আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতাল নির্মাণ ঃ

ঢাকার নওয়াব পরিবারের মহিলাদের মধ্যে নওয়াবজাদী আখতার বানু বেগম নানা জনকল্যাণ কাজের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি তাঁর পিতা নওয়াব আহসানুল্লাহর স্মরণে ঢাকা শহরের টিকাটুলীতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে সেটার নাম দিয়েছিলেন 'দি স্যার আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতাল'। ৯ জুলাই ১৯৩৫ খ্রীঃ তৎকালীন বাংলার গভর্নর বাহাদুর এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেছিলেন।[৬২] নওয়াবজাদী আখতার বানু এই হাসপাতালের জন্য ১০ বিঘারো অধিক ভূসম্পত্তিসহ একটি উপযুক্ত অট্টালিকা দান করেন। তিনি এটা পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৬৩] সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত, দরিদ্র নারী-পুরুষদের চিকিৎসা সেবা দেয়া, বিশেষ করে পর্দানশীল মহিলারা যাতে পর্দা রক্ষা করে তাঁদের রোগ ব্যাধি চিকিৎসা করাতে পারেন, সেজন্যই মূলতঃ এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নানা কারণে ১৯৪০ এর দিকে উক্ত হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে নওয়াবজাদীর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলে এর সম্পত্তি আত্মীকৃত করা হয়। তদুপরি প্রয়োজনীয় তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে হাসপাতালটির উত্থান-পতন ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আজ প্রায় অসম্ভব। তবে সৌভাগ্যবশত হাসপাতালটি বন্ধ হবার পর সেখানে ব্যবহৃত কিছু সার্জিকেল যন্ত্রপাতি ও কাগজপত্র কোন কারণে আহসান মঞ্জিলে এনে রাখা হয়েছিল, যেগুলো এখনো সেখানে রয়েছে। উক্ত কাগজপত্রের মধ্য থেকে উক্ত হাসপাতালের ১৯৩৮ সালের একটি বার্ষিক রিপোর্ট উদ্ধার করা গেছে। উক্ত রিপোর্ট এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে নিম্নে উক্ত হাসপাতাল সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়া গেল ঃ

হাসপাতাল ভবন ও এর সামর্থ ঃ হাসপাতালের কেন্দ্রীয় ভবনে রুগীর জন্য ৬টি বেড ছিল এবং জরুরী প্রয়োজনে আরো ২টি বেডের ব্যবস্থা করা যেত। এছাড়া পৃথক একটি বন্ধ্যাকরণ কক্ষ ও একটি লেবার রুমও ছিল। অন্য দিকে আউটডোর রুগীদের জন্য ২টি ওয়েটিং রুম ছিল। এছাড়া আউটডোর এলাকায় মহিলা ডাক্তারের জন্য ১টি কক্ষ, পুরুষ ডাক্তারের জন্য ১টি কক্ষ, অস্ত্রপচারের জন্য ১টি কক্ষ, ঔষধপত্র রক্ষণ ও প্রদানের জন্য ১টি কক্ষ এবং মহিলাদের রোগ পরীক্ষার জন্য ১টি কক্ষ, মোট ৫টি কক্ষ ছিল। আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নার্সগণ, কম্পাউন্ডার এবং বেয়ারাদের ফ্রী থাকার জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া পৃথক একটি শবাগারও ছিল।[৬৪] আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রাপ্ত উক্ত বার্ষিক রিপোর্টের কপিতে প্রকাশিত উক্ত হাসপাতালের একটি দুর্লভ ছবি পরিশিষ্টে চিত্র নং ১৬তে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত উক্ত বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যেই হাসপাতালটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, স্থানাভাবে অনেক রুগীকে ফেরত দিতে হচ্ছিল। তৎকালীন ঢাকা শহরে হাসপাতালটির ঠিকানা ছিলঃ ১৩, রায় এ.কে.দাস বাহাদুর লেন, টিকাটুলী, ঢাকা; ফোন নং- ১৭৫। এর অফিসের ঠিকানা ছিলঃ- ৪১, র‌্যাংকিন ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।[৬৫]

<u>হাসপাতালের কার্যাবলী ঃ</u> আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতালের বহির্বিভাগটি প্রতিদিন সকাল ৮.০০ টা থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকতো। মহিলা রুগীদেরকে পৃথকভাবে মহিলা ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো হতো। ১৯৩৮ খ্রীঃ এর বহির্বিভাগে মোট ১৮,৭১১ জন রুগীর চিকিৎসা করা হয়। এদের মধ্যে ৫,৩২৮ জন ছিল পুরুষ, ৬,২০৭ জন মহিলা এবং ৭,১৭৬ জন শিশুরুগী। বহির্বিভাগে গরীব রুগীদের জন্য ঔষধপত্র ও ইনজেকশন বিনামূল্যে দেয়া হতো।[৬৬]

হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ সারা বছর রাতদিন খোলা থাকতো। সেখানে প্রধানত স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিদের চিকিৎসা করা হতো। তবে সংক্রামক রোগ না হলে অন্যান্য রুগীদেরকেও ইনডোর বিভাগে নেয়া হতো। ১৯৩৮ সালে ইনডোর বিভাগে মোট ১৬৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার একজন ভিজিটিং সার্জন এখানে রুগী দেখতেন।[৬৭]

<u>ট্রেনিং ক্লাশ ঃ</u> অল ইন্ডিয়া ওমেন কনফারেন্সের অর্থ সাহায্যে ১৯৩৬ খ্রীঃ ৫ সেপ্টেম্বর থেকে উক্ত হাসপাতালে একটি ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রীরা এসে শিক্ষা গ্রহণ করতো। ১৯৩৭ খ্রীঃ কয়েকজন খ্যাতনামা ডাক্তারের সমন্বয়ে গঠিত পরীক্ষা কমিটির কাছে এরূপ ৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে ৫ জনই কৃতকার্য হয়ে সনদপত্র লাভ করেছিল। ১৯৩৮ খ্রীঃ ঐ কোর্সে ১২ জন শিক্ষার্থী ছিল।[৬৮] উক্ত হাসপাতালে নিম্নলিখিত ষ্টাফ ছিল ঃ আবাসিক মেডিকেল অফিসার- ১ জন, ভিজিটিং সার্জন- ১ জন, নার্স- ৩ জন, কম্পাউন্ডার- ১ জন এবং প্রয়োজনীয় বেয়ারা, মালী ও সুইপার। বিভিন্ন সময় স্থানীয় নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নানাভাবে উক্ত হাসপাতালকে সাহায্য সহযোগিতা করতো। ১৯৩৮ সালে হাসপাতালের রিজার্ভ ফান্ডে অর্থের পরিমাণ ছিল ২,০০০ টাকা।

<u>ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঃ-</u>

একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি দ্বারা হাসপাতালটি পরিচালিত হতো। কমিটির প্রাণ পুরুষগণ যদিও সবাই নওয়াব পরিবারের লোক ছিল, তথাপি স্থানীয় খ্যাতনামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উক্ত কমিটিতে থাকতেন। ১৯৩৮ সালে কমিটিতে যেসব ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ[৬৯]

পৃষ্ঠপোষক ঃ মাননীয় নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ বাহাদুর (কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী, বাংলা সরকার)

প্রেসিডেন্ট ঃ নওয়াবজাদা কে.এম. আফজাল খান বাহাদুর

সেক্রেটারী ঃ এস.সি. মজুমদার, এসকয়ার

সদস্য ঃ (১) নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ এম.এল.এ. (২) রায় সাহেব ডাঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ এম.বি. (৩) এস.এস. আলম, এসকয়ার (৪) ডাঃ আবেদুদ্দিন আহমেদ এম.বি. (৫) খান বাহাদুর এম.ইয়াহিয়া বি.সি.এস. (৬) কে.এম. সুকুর এসকয়ার।

আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনে অস্ত্রপচার করার সুব্যবস্থাও ছিল। অস্ত্রপচার যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণ করার জন্য ১৯৩৮ সালে বেশকিছু সার্জিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এছাড়া ১ হাজার টাকা ব্যয় করে একটি উন্নতমানের অটো-ক্লাভ মেশিন ক্রয়ের পরিকল্পনাও করা হয়।[৭০] পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, ঢাকার নওয়াবদের আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করে যাদুঘরে রূপান্তরিত করার সময় সেখানে উক্ত হাসপাতালে ব্যবহৃত বেশকিছু সার্জিকেল যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়। এছাড়া একটি মাইক্রোস্কোপ ও ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্রসহ অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রপাতিও সেখানে আছে। উন্নতমানের এসব যন্ত্রপাতিগুলোর প্রায় সবই জার্মানীর তৈরী। বর্তমানে সেগুলোর কিছু সংখ্যক নমুনা উক্ত জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। যাদুঘরে প্রদর্শিত উক্ত যন্ত্রপাতির একটি আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ১৭তে দেয়া হলো।

নওয়াব পরিবারের জনদরদী ও বিদূষী রমণীগণ বিভিন্ন সময় উক্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করতে যেতেন। তাঁরা রুগীদের সুযোগ সুবিধার জন্য পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা দিতেন। ১৯৩৮ সালে এরূপ কাজে মিসেস খাজা নসরুল্লাহ, মিসেস খাজা ইসমাইল ও মিসেস খাজা সাহেবে আলম হাসপাতালটি পরিদর্শন করেছিলেন।[৭১]
উনিশ'শ চল্লিশের দশকে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যায়। নওয়াবজাদী আখতার বানু এর পাশে তাঁর জান্নাতবাসিনী মায়ের নামে কামরুন্নেছা গার্লস হাই স্কুল পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উক্ত স্কুলের নিমিত্তে হাসপাতালের জায়গা জমি ছাড়াও স্কুলের ভবনাদি নির্মাণের জন্য আখতার বানু এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বলে জানা যায়।[৭১(ক)] ১৯৪৮ সালে স্কুলটির সরকারীকরণ করা হয়। এটাই ছিল ঢাকার প্রথম সরকারী গার্লস হাই স্কুল। স্কুলটি এখনো সগৌরবে চলছে। সেটা সম্পর্কে পরে আলোচিত হবে।

৫(৬) ঢাকায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও ফার্মেসী স্থাপন ঃ

ঢাকার নওয়াবগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে এরূপ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য তৎকালীন বংগের লেঃ গভর্ণর সাহেব, খাজা আব্দুল গণিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।[৭২] তৎকালে ইউরোপীয় দেশগুলোতে নানা প্রকার আধুনিক ঔষধপত্র ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি তৈরী হতো। কিন্তু সুষ্ঠু আমদানির অভাবে এদেশের লোকেরা ঐসবের যথাযথ উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হতো। এই অবস্থা দূরীকরণার্থে নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকায় একটি উপযুক্ত ঔষধের ফার্মেসী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেশ বিদেশ থেকে উন্নতমানের ঔষধপত্র এনে এদেশীয় লোকদের নিকট তা সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করেন। এই ফার্মেসী প্রতিষ্ঠার পিছনে নওয়াব আব্দুল গণির ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিও যে কাজ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ফার্মেসীটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, নওয়াব কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে তৎকালীন ঢাকার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কৈলাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নিজে উক্ত ফার্মেসীতে উপস্থিত থাকতেন। তিনি ঔষদের গুণাগুণ বিচার করতেন এবং রোগী ও ক্রেতাদের যথাযথ ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন।[৭৩]

দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকার নওয়াবের প্রতিষ্ঠিত এই ঔষধের ফার্মেসীটি এতদাঞ্চলের লোকদের সেবা দিয়েছিল। স্থানীয় পত্রিকাসমূহে মাঝে মধ্যেই উক্ত ফার্মেসীর গুণাগুণ সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো। ঢাকা প্রকাশের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই প্রথম পাতায় উক্ত ফার্মেসীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো।[৭৪]

প্রথম দিকে ফার্মেসীটির নাম ছিল- কে.সি. বন্দোপাধ্যায় এন্ড কোং, ডাঃ ঔষধ বিক্রেতা। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ ৮ অক্টোবর প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে উক্ত ফার্মেসীর নাম "ভিক্টোরিয়া মেডিকেল হল" উল্লেখ করা হয়। তৎকালীন ইংলন্ডেশ্বরীর প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর ফার্মেসীর উক্ত নাম দিয়েছিলেন, সেটা সহজেই অনুমেয়। ঐ বিজ্ঞাপন থেকে ঔষধের ফার্মেসীটি যে ঢাকার বাবু বাজারে অবস্থিত ছিল সেকথাও জানা যায়।[৭৫]

১৮৯০ এর দশকের শুরুতে নওয়াব আহসানুল্লাহ 'শাহীন মেডিকেল হল' নামে আরেকটি বড় ধরনের ঔষধালয় স্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য, 'শাহীন' ছিল নওয়াব আহসানুল্লাহর কবি নাম। এই ঔষধালয়টির মালিকানা তিনি তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র খাজা সলিমুল্লাহকে প্রদান করেছিলেন। এই ঔষধালয়টি খুবই স্বচ্ছল ছিল এবং সেটা দেশ-বিদেশ থেকে উন্নতমানের ঔষধপত্র আমদানি ও সরবরাহ করতো। প্রতি বছর এই ঔষধালয়টির পক্ষ থেকে সুন্দর সুন্দর ওয়াল ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা হতো। ১৮৯৫ খ্রীঃ এরূপ একটি বিলেতী বালিকা

Dhaka University Institutional Repository

মূর্তির উৎকৃষ্ট চিত্র সম্বলিত ক্যালেন্ডার উপহার পেয়ে ঢাকা প্রকাশ উক্ত ঔষধালয়ের অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে খবর প্রকাশ করেছিল।[৭৬] পর বছর ১৮৯৬ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ট- এর পুষ্পসজ্জিত চিত্র সম্বলিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়।[৭৭] ১৮৯৭ খ্রীঃ প্রবল ভূমিকম্পে 'শাহীন মেডিকেল হল' এর ভবনটি ভেংগে পড়লে ঔষধালয়টি আরেকটি ঘরে স্থানান্তর করা হয়।[৭৮] শেষ জীবনে অর্থ কষ্টের দরুণ নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত ঔষধালয়টি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এছাড়া ঢাকা শহরে নওয়াব সলিমুল্লাহর একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ছিল, যা তাঁর পুত্র নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় বিক্রি করে দেয়া হয়।[৭৯] সমসাময়িককালে বিশ্বের উন্নত এলাকা থেকে বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক ও উন্নতমানের ঔষধ আমদানি এবং সরবরাহে নওয়াবদের উক্ত ফার্মেসীগুলো তৎকালীন ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৫(৭)অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে অর্থদান ঃ

বিভিন্ন সূত্রাদি এবং নওয়াবদের পূর্বোক্ত অর্থদানের তালিকা থেকে দেশে-বিদেশে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ঢাকার নওয়াবদের আরো যেসব অর্থদানের কথা জানা গেছে, তা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো।[৮০]

অর্থদানের তালিকারসূত্র	ক্রমিক নং ও বিবরণ	টাকার পরিমাণ
ক্রমিক নং - ৮৮	১) কুমিল্লা হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ড এর জন্য	৩,০০০ টাকা
১৯০০ সালের তালিকা	২) প্রিটিরিয়ার পতন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে দান	৩,০০০ ,,
ক্রমিক নং ১৩৩	৩) পুনরায় নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালের জন্য	২,০০০ ,,
ঢা, প্র, ১৩ ফেব্রু ১৮৮৭	৪) বরিশাল শহরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য	৫,০০০ ,,
ক্রমিক- ১৪৮	৫) বলদাখালের রুগ্ন প্রজাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণের জন্য	২০০ ,,
ক্রমিক- ১৫৩ এবং	৬) কলকাতা হাসপাতালের জন্য (ধাত্রী শিক্ষা)	৫০০ ,,
১৮৯৬ খ্রীঃ ঢা, প্র,তালিকার		
ক্রমিক নং- ৫০	৭) কলকাতাস্থ দেশীয় হাসপতালের জন্য	৫০০ ,,
.. ঐ... ক্রমিক নং [৮১]	৮) কলকাতা মেডিকেল কলেজের জন্য	১২,০০০ ,,
ক্রমিক-১৬৫ এবং ঢা,প্র,		
তালিকা দ্রঃ	৯) ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, মাদ্রাজ - এর জন্য	২,০০০ ,,
ক্রমিক নং -২০৬	১০) দাউদকান্দি হাসপাতাল, কুমিল্লা-এর জন্য	২০০ ,,
ক্রমিক নং -২০৮	১১) সিরাজগঞ্জ হাসপাতালের জন্য	৫০ ,,
ক্রমিক নং -২৫৭	১২) হাসপাতাল ও নার্সেস ইনস্টিটিউট এর জন্য	১০০ ,,
ক্রমিক নং -২৫৮	১৩) জেলা দাতব্য সোসাইটি এর জন্য	৫০০ ,,
১৯০১ খ্রীঃ তালিকা দ্রঃ[৮২]	১৪) লর্ড কার্জন হাসপাতাল আলিগড় এর জন্য	১০০০ ,,
১৯০৩ খ্রীঃ তালিকা দ্রঃ	১৫) কলকাতা হাসপাতাল নার্সেস এসোসিয়েশেনে জন্য	১০০ ,,
--- ঐ ----	১৬) জেলা দাতব্য সোসাইটি, কলকাতা এর জন্য	২০০ ,,
১৯০৪ খ্রীঃ ঐ	১৬) পিরোজপুর ডিসপেনসারী এর জন্য	৫০০ ,,
ঢাকা প্র.১৮৯৬ খ্রীঃ তাঃ দ্রঃ	১৭) চক্ষু চিকিৎসাগারে	৫০০ ,,
পুরানো দলিল দ্রঃ	১৮) কলকাতা হাসপাতাল নার্সেস ইনস্টিটিউট, মাসিক	৫ ,,

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। ১৯০৭ সালে চীফ ম্যানেজারের লেখা এক পত্রে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বছরে ৭-৮ হাজার টাকা দেয়া হতো। *পুরানো নথি*, ডি-পৃঃ ১৩-১৪ দ্রঃ।

২। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেনশাহ ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এদেশে যে সরকারী হাসপাতালের কথা জানা যায় (টেইলর, *টপোগ্রাফী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৪) সেগুলো মূলতঃ মধ্যযুগীয় চিকিৎসালয়। আধুনিক পরিকল্পিত হাসপাতালের সাথে তার তুলনা হয় না

৩। যতীন্দ্রনাথ মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১ এবং কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৮ ফুটনোট দ্রঃ। মামুন, ঢাকা পৃঃ ২২১ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ২৬৩। ১৮০৩ খ্রীঃ কলকাতার দেশীয় হাসপাতালের শাখারূপে ঢাকায় আঞ্চলিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার এর ব্যয় নির্বাহে মাসে ১৫০ টাকা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতেন। জনগণের নিকট থেকে চাঁদা হিসেবে এর জন্য ২২শ' টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। ঐ টাকার সুদ থেকেও এর ব্যয় নির্বাহ হতো। কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১-৫৩ এবং যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃঃ২৯০-৯৯।

৪। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯০ এবং কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১৭; মামুন, *ঢাকা*,পৃঃ ২২০ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা* পৃঃ ৪৭, নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* পৃঃ ২৬২ এবং দানী, *ঢাকা* পৃঃ ১১৭।

৫। নির্মল কুমার গুপ্ত, *ঢাকার বিবরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৮ ফুটনোট দ্রঃ। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১৭। কেউ কেউ আবার বলেছেন, মিটফোর্ডের ৭টি ঘোড়া এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা সঞ্চিত ছিল যা তিনি জনকল্যাণে ও ঘোড়াগুলোর ভরনপোষণে দান করে যান। রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, ১ম সংস্করণ, নভেঃ ১৯৮২ পৃঃ ১২৯ এবং নির্মল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮-৩৯।

৬। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১ এবং কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ*, পৃঃ ১৫১ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা রোমান্স* পৃঃ ৩৮।

৭। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১ এবং মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২২১ উদ্ধৃত-ক্লে এর ডাইরী থেকে এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, পৃঃ ৪৭

৮। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১ এবং মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২। ১৮৬৬ সালে মিটফোর্ডের দেয়া অর্থের মাসিক সুদ হয়েছিল ৫৭৭ টাকা ১২ আনা এবং সরকারের দেয়া মাসিক সাহায্য ছিল ৪৫৩ টাকা ১২ আনা, মোট ১০৩১/- তখন মাসে এই টাকায় হাসপাতাল চলতো। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২।

৯। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৬।

১০-১১। ঢাকা প্রকাশ, ২১ নভেঃ ১৮৬৯ পৃঃ ৩৮৭ এবং মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২২৪।

১২-১৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*. পৃঃ ২৬৫ এবং মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২২৪।

১৪। ৫০০ টাকার কম অধিকাংশ দানের কথা উক্ত তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি, ঢাকা প্রকাশ ৩০ আগস্ট ১৮৯৬। উল্লেখ্য, ১৮৭১ খ্রীঃ হাসপাতালের দরিদ্র ও বেওয়ারিশ লাশ দাফনের জন্য ৪,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, প্রাগুক্ত অর্থদানের তালিকা ক্রমিক ২১ দ্রঃ।

১৫। ঢাকা প্রকাশ জানিয়েছে যে, সরকার এর সাথে আরো ১০ হাজার টাকা দিয়ে কাজটি সম্পাদন করে। ঢাকা প্রকাশ, ২১ নভেঃ ১৮৭৫ পৃঃ ৩৯১। তবে ঢাকা প্রকাশ ঐ কাজে নওয়াবের দানের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা উল্লেখ করেছে যা সত্য নয়। কারণ পরবর্তীকালে ঢাকা প্রকাশেই প্রকাশিত নওয়াবের দানের তালিকায় ঐ কাজে ২৫,২৪৫/- টাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যে সংখ্যাটি নওয়াব এস্টেট থেকে প্রাপ্ত তালিকার পরিমাণের সাথে সংগতিপূর্ণ। এছাড়া ১৮৭২ খ্রীঃ উক্ত মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণে নওয়াব আঃ গণি ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন বলে আবুয যোহা নুর আহমদ যে তথ্য দিয়েছেন তাও সঠিক নয়। (আবুয যোহা নুর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬-১৭)। অন্যদিকে তৈফুর সাহেবও লিখেছেন, ১৮৯৫ খ্রী নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত ফিমেল ওয়ার্ড নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালকে ৬০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। তৈফুর, ঢাকা পৃঃ ৩২৭। ঢাকার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক যতীন্দ্র মোহন রায় এবং কেদারনাথ মজুমদারকে অনুসরণ করে নাজির হোসেন তাঁর গ্রন্থে মিটফোর্ড হাসপাতাল মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণে ১৮৮২ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ এগিয়ে আসেন ২৭,০০০/- টাকা নিয়ে এবং ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র আসেন ২০,০০০/- টাকা নিয়ে বলে যে তথ্য দিয়েছেন, তাঁর সমর্থনে তাদের গ্রন্থে কোন সূত্র নেই।(নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ২৬৩ এবং যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২ এবং কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৩) আরেকটি সূত্র থেকে জানা যায়, মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ একবার ৭৫,০০০/- টাকা দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ এ দানের অংকটি তাঁর পিতা ও তাঁর নিজের আমলের দানের মোট হিসাব। আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৫। তাই জনাব কামরুদ্দিন তাঁর লেখা স্মৃতি কথায় মিটফোর্ড হাসপাতালের আহসানুল্লাহ ওয়ার্ড নির্মাণে এ খান্দানের (নওয়াব পরিবারের) কোন অবদান ছিলনা বলে যে তথ্য দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। কামরুদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন, তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতি, স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ফেব্রুঃ ১৯৯২, পৃঃ ১১৭।

১৬। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৯।

১৭। অর্থদানের তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ১২ দ্রঃ

১৮। আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬, উদ্ধৃত- জ্যোতিশচন্দ্র দাস গুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০-৩১ থেকে।

১৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুন ১৯০২ পৃঃ ৫।

২০। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, পৃঃ ২০৩।

২১। আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯১ (অর্থদানের তালিকা দ্রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

২২। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ডিসেঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩।

২৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ডিসেঃ ১৯০২ পৃঃ ৪।

২৪। র‍্যাংকিন ওয়ার্ডের জন্য বাবু হরেন্দ্র লাল ২৪ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুন ১৯০৩ পৃঃ ৫। এর আগে ১৮৮৯-৯০ সালে ভাগ্যকুলের শ্রীনাথ রায় তাঁর স্বর্গীয় জননীর স্মরণে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি চক্ষু ওয়ার্ড তৈরী করেছিলেন। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২ এবং কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, পৃঃ ১৫৩।

২৫। *দি বেংগল টাইমস ২৩ জুলাই ১৯০২* এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৩।

২৬। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ডিসেঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩ এবং *দি বেংগল টাইমস*, ২ ডিসেঃ ১৯০২।

২৭। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ডিসেঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩। মিটফোর্ড হাসপাতালের উক্ত ওয়ার্ডদ্বয় উদ্বোধনের পর ছোট লাট পুরো হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল পরিদর্শন করে নওয়াবের প্রাসাদ আহসান মঞ্জিলে গমন করেন এবং সেখানে দুপুর থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। ঐ সময় স্থানীয় স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার মৌলভী সৈয়দ আওলাদ হাসান ছোটলাটকে তাঁর নিজের লেখা বই উপহার দেন। উক্ত বইটি ছিল ঢাকার প্রাচীন কীর্তি ইতিহাস নিয়ে লেখা *'নোটস অন দ্যা এন্টিকুইটিজ অব ঢাকা'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ যা ১৯০৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। লেখক বইটি উক্ত ছোট লাটের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

২৮। পরিশিষ্টে দেয়া দানের তালিকার শেষাংশ ১৯০৩ সালের দান দ্রঃ।

২৯। পরিশিষ্টে দেয়া দানের তালিকা ১৯০৫ খ্রীঃ এবং ১৯০৩ খ্রী দ্রঃ।

৩০। *পুরানো দলিল*, প্রাগুক্ত দ্রঃ।

৩১। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ আগস্ট ১৯১০ পৃঃ ৩-৪।

৩২। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ আগস্ট ১৯১০ পৃঃ ৩-৪ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৮।

৩৩। *পুরানো নথি*, প্লেগ, ফান্ড দ্রঃ।

৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুলাই, ১৯১১ পৃঃ ৩।

৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ মার্চ ১৯১৯ পৃঃ ৩।

৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৬৩ পৃঃ ১৩৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, পৃঃ ৭৫।

৩৭। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মে এবং ৬ জুলাই ১৮৭৩ পৃঃ ৯৫।

৩৮-৩৯। কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা*, পৃঃ ৭৬ এবং মামুন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৬-২৭, নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ২৬৫।

৪০। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ২৬৫।

৪১। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২ এবং কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৩ এবং আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১৭। লেডী ডাফরিনের স্মরণে আরেকটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য কলকাতায় সিনেট হাউসের নিকট ৫০ হাজার টাকায় একটি জমি ক্রয় করা হয়। ঐ হাসপাতাল ভবন নির্মাণে ৭০ হাজার টাকা চাঁদা উঠে। এছাড়া জুবিলি ফান্ড থেকেও ২৭ হাজার টাকা দেয়া হয়।(ঢাকা প্রকাশ, ২৫ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৭) ঢাকার নওয়াবের অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-১০ এ লেডী ডাফরিন ফান্ডে যে ১০ হাজার টাকা দানের উল্লেখ আছে, তা সম্ভবত কলকাতায় উক্ত লেডী ডাফরিন হাসপাতালের জন্য দেয়া হয়েছিল। সুধাকর থেকে জানা যায় নওয়াব আহসানুল্লাহ লেডী ডাফরিন ফান্ডে বার্ষিক ৫০০ টাকা এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের জন্য বার্ষিক ৩০০ টাকা চাঁদা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। (সাপ্তাহিক সুধাকর, ১৫ নভেঃ ১৮৮৯ পৃঃ ১৪) ঢাকা প্রকাশ থেকে জানা যায়, ১৮৮৫ খ্রীঃ লেডী ডাফরিন স্ত্রী চিকিৎসা ও শিক্ষা ফান্ডে নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ ১০ হাজার টাকা দান করেন। এ বদান্যতার জন্য বংগেশ্বর তাঁদেরকে লিখিতভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ নভেঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৩৮০।

৪১(ক) সোনিয়া নিশাত আমিন, *দি ওয়ার্ল্ড অব মুসলিম ওমেন ইন কলোনিয়ান বেঙ্গল*, ১৯৯৬ পৃঃ ১৮১ এবং উপরোক্ত ফুটনোট নং-৪১ দ্রঃ।

৪২। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৬। ১৯০৪ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলের জন্য ১০ হাজার টাকা দান করেন। অর্থদানের তালিকা ১৯০৪ খ্রীঃ দ্রঃ। ১৯০৫ সালে সরকারের মোহসীন ফান্ড ও নওয়াবের দানে ছাত্রাবাসটি নির্মাণ হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ডিসেঃ ১৯০৫ পৃঃ ৩।

৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৮ এবং ঢাকা প্রকাশে এক খবরে বলা হয়, লর্ড ডাফরিনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে ৬১ হাজার টাকা উঠেছে। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৭।

৪৫। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২ এবং দানী, *ঢাকা*, পৃঃ ১১৭ এবং *পুরানো নথি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৬ এবং কেদারনাথ, পৃঃ ১৫৩, আজিমুশ্মান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১৭ এবং নওয়াবের দানের তালিকা দ্রঃ, আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৮ এবং পরিশিষ্টে দেয়া অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-২১৭ দ্রঃ। লর্ড ডাফরিন ঢাকা সফরে এসে লেডী ডাফরিনসহ মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শনকালে তাঁদের সামনেই নওয়াব আহসানুল্লাহ ৫০ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষনা করেন বলে নাজির হোসেন তাঁর কিংবদন্তীর ঢাকা গ্রন্থে যে তথ্য দিয়েছেন- তা সত্য নয়। কারণ লর্ড ডাফরিন ঐ সফরে হাসপাতাল পরিদর্শনই করেননি। (নাজির হোসেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৪ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৪ দ্রঃ)।

৪৬। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের উক্ত হাসপাতালের ফান্ডে ৬১,৮০৬/- টাকা জমা ছিল, কেদারনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫।

৪৭। অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত ক্রমিক-১২।

৪৮। ঐ অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-১২,১৩৫ ও ১৮৪ দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৪।

৫০। নওয়াবের অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত, ক্রমিক নং-৭৭ দ্রঃ। এছাড়া নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৮৭ খ্রীঃ বরিশাল শহরের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে ৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৭ পৃঃ৭। ঢাকা প্রকাশের একটি খবর থেকে জানা যায় যে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর মৃত পুত্র হাফীজুল্লাহর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার জন্য একটি বৃহৎ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। তবে সেটা কোথায় তা জানা যায়নি। ঢাকা প্রঃ ২৫ ডিসেঃ ১৮৮৭ পৃঃ ৬।

৫১। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৯০০ পৃঃ ৭।

৫২। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৯০০ পৃঃ ৭।

৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ জুন ১৯০০ পৃঃ ৫।

৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ১ জুলাই ১৯০০ পৃঃ ৬।

৫৫। অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত ১৯০০ খ্রীঃ দানের তালিকা দ্রঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৯০০ পৃঃ ৭, *তারিখে খান্দানে* ... বলা হয়েছে, নওয়াব আহসানুল্লাহর দানে বরিশালের মহিলা হাসপাতাল তৈরী করা হয়। *তারিখে খান্দান*, পৃঃ ২৮৪-৮৮ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৫৫।

৫৬। অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের দান দ্রঃ।

৫৭-৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ পৃঃ ১০ এবং *পুরাতন নথি*, কাচারী সংক্রান্ত নোট দ্রঃ।

৫৯। পূর্ববঙ্গের সর্ববৃহৎ জমিদার ও মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের জমিদারি কাচারিগুলো পরিদর্শনকালে কিংবা মফস্বলে সফরে গেলে স্থানীয় জমিদার ও সরকারি কর্মচারীগণ কর্তৃক সমাদরে সম্বর্ধিত হতেন। জামুর্কিতে নওয়াবের সম্বর্ধনার জন্য রাজপথে বড় বড় তোরণ নির্মিত হয়েছিল। স্টীমার থেকে নেমে হস্তীপৃষ্ঠে কাচারিতে গমনকালে পথিপার্শ্বে অসংখ্য জনতা দাঁড়িয়ে নওয়াবকে অভিবাদন করেন। পরদিন সকালে পাকুল্যার জমিদার মৌলভী আঃ গাফফার খাঁ চৌধুরী, মৌলভী নওশের আলী খাঁ ইউজুপজী সাব-রেজিস্ট্রার, মৌলভী আব্দুল গফুর চৌধুরী, মৌঃ তোজাম্মেল আলী, বাবু প্রকাশ চন্দ্র ব্যাণার্জী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নওয়াবের স্টীমারে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। উক্ত সাব-রেজিঃ সাহেব অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। পরদিন বিকেলে আটিয়া পরগনার গণ্যমান্য প্রজাগণ এসে নওয়াবকে অভিনন্দন পত্র দেন।(ঢাকা প্রকাশ, ২১ সেপ্টম্বর ১৯০২ পৃঃ ৫)

৬০। ঢাকা প্রকাশ, ঐ।

৬১। *পুরানো নথি*, কাচারি সংক্রান্ত নোট দ্রঃ। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, আটিয়া অঞ্চলের প্রজাদের কল্যাণে একবার ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-৩০ দ্রঃ।

৬২-৬৩। *এ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি স্যার আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হসপিটাল*, ১৯৩৮ খ্রীঃ পৃঃ ১-২। উল্লেখ্য, উক্ত রিপোর্টের একটি কপি আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

৬৪-৬৫। ঐ, *এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ১৯৩৮ পৃঃ ১-৩।

৬৬-৬৭। ঐ, *এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ১৯৩৮ পৃঃ ২-৪।

৬৮। ঐ, ঐ পৃঃ ৪।

৬৯। ঐ *এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ১৯৩৮ খ্রীঃ পৃঃ ৫।

৭০-৭১। ঐ *এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ১৯৩৮ খ্রীঃ পৃঃ ২ ও ৬।

৭১(ক) আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯।

৭২। একই সাথে বাবু কালী নারায়ণ রায় ও কৈলাশ চন্দ্র ঘোষকে একই ধরণের কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুলাই ১৮৬৬ পৃঃ ২১১। দেশে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৭-৮ টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঢাকার নওয়াবগণ প্রতি বছর ৭-৮ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। *পুরানো নথি*, পৃঃ ডি-১৩।

৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল ১৮৭৮ পৃঃ ৬০।

৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল ১৮৭৮ পৃঃ ৭ এবং ঐ সালে একই বিজ্ঞাপনের জন্য ঢাকা প্রকাশের পৃঃ নং-৭৫,৮৬ ও ১৩৪ দ্রঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১১ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৫০। একই ধরণের বিজ্ঞাপন ঢাকা প্রকাশে পর পর কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হয়। দেখুন-১৮৮০ সনে পৃঃ ৮৪, ৮৭,১০৮, ১১১, ১২৩ এবং ১৮৮২ সনে পৃঃ নং- ৭২, ৮৪, ৯৬, ১০৮, ১৩২ ইত্যাদি।

৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ৮ অক্টোবর ১৮৮২ পৃঃ ৩৬০ এবং একই পত্রিকার পৃঃ নং-৩৭২, ৩৮৪, ৩৯৬, ৪০৮ দ্রঃ।

৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ২০ জানুঃ ১৮৯৫ পৃঃ ৪।

৭৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৮।

৭৮। ভূমিকম্পে ভবনটি ভেঙ্গে পড়লে এর দোতলায় বসবাসকারী এক আর্মেনীয় পরিবারের ৬ জনের মধ্যে ৩ জনই মারা যায়। ঢাকা প্রকাশ, ১৩, ২০ জুন ১৮৯৭।

৭৯। *পুরানো দলিল, ইনডেক্স অব পেপার্স - ১*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৪।

৮০। তালিকার বাম দিকে দেয়া ক্রমিক নম্বরটি এবং পরিশিষ্টে দেয়া অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং অভিন্ন।

৮১। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস*--- প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৩৫।

৮২। উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, তালিকা থেকে উদ্ধৃত-মামুন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় ইমারত/প্রতিষ্ঠান তৈরি, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ

বাংলাদেশের ধর্মভীরু লোকেরা প্রাচীনকাল থেকে এদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে আসছে। ধর্ম-কর্মের পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানারূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চলে থাকে। এগুলো এদেশের মানুষের সমাজ ও আচার-আচরণকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্দির, মসজিদ, দরগাহ, আখড়া, খানকাহ প্রভৃতি এসব কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। শাসকদের নিকট তাই ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলো কোনদিনই উপেক্ষার বিষয় ছিল না। প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিংবা জনকল্যাণের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই রাজপুরুষেরা এদেশের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বৃত্তি বরাদ্দ ছাড়াও বিভিন্ন সময় এগুলোর জন্য নিস্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু ইংরেজ আমল শুরু হবার পর এ ধরনের প্রভিষ্ঠানগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়। ক্রমশ ব্রিটিশ সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয় নিস্কর ভূমিগুলো নানাভাবে বাজেয়াপ্ত করতে থাকে। ফলে এগুলোর শান-সৌকত ও গুরুত্বে ভাটা পড়তে শুরু করে। এই ক্রান্তিলগ্নে সরকারের বদলে তাই স্থানীয় জমিদারগণকেই ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শেষ ভরসার স্থল রূপে গণ্য করতে থাকে । অন্যদিকে স্থানীয় জমিদারগণও সামাজিক প্রয়োজনের কারণে তাঁদের সাধ্যানুসারে সাহায্য-সহায়তা করে ঐগুলো যতদুর সম্ভব টিকিয়ে রাখেন।

পূর্ব বাংলার সর্ববৃহৎ ও ধনশালী জমিদার হিসেবে স্থানীয় জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের উপর ঢাকার নওয়াবরা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাঁরা এদেশবাসীর অলিখিত অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। এতদব্যতীত উদার ভাবে অর্থদানের ফলে কালক্রমে তাঁদের এ অভিভাবকত্ব সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সমসাময়িককালে দেখা যায়, যাবতীয় সামাজিক কর্মকান্ডে যেমন-ঈদে মিলাদুন্নবী, ঈদ উৎসব, মহররম উৎসব, মেলা লাগানো, দরগাহ-মসজিদ মেরামত, রমজানে তারাবীর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি আয়োজনের জন্য এদেশের বহু লোক ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতার আশা করতো । ফলে ঐসব লৌকিকতায় নানাভাবে নওয়াবের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটতো। এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমীর মিছিল এবং পূজা- পার্বনেও তাঁরা সাহায্য সহযোগিতা দিতেন।

খাজা আলীমুল্লার সময় থেকেই ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে বেশ কিছু সম্পত্তি আল্লাহর নামে ওয়াকফ্ করা ছিল। ঐসব সম্পত্তির আয় থেকে গরীব দুঃখীদের দান করাসহ উল্লিখিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হতো।[১] নওয়াব আব্দুল গণির সময় এই সম্পত্তির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। উক্ত ওয়াকফ ফান্ডে বহু লক্ষ টাকা আয় হতো। এজন্য ঢাকার নওয়াবদের পক্ষে এ জাতীয় সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করাটাও বেশ সহজ ছিল। সর্বোপরি এ জাতীয় জনকল্যাণকর কাজে তাঁদের ছিল উদার মানসিকতা। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, এতদাঞ্চলে এমন কোন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানই ছিল না যেখানে ঢাকার নওয়াবরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেননি।[২] এখানে উল্লেখ্য যে, খাজা আলীমুল্লাহর আমল থেকেই নওয়াব বাড়ীর উত্তর প্রাঙ্গনে ঢাকার নওয়াবদের একটি বড় ধরনের জামে মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদের যাবতীয় ব্যয় অদ্যাবধি নওয়াব পরিবারের ওয়াকফ এস্টেটের পক্ষ থেকে নির্বাহ করা হয়। এতদ্ব্যতিত নওয়াব বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোনায় ইসলামপুর রোডের সাথে আরেকটি মসজিদ রয়েছে। জাব্বু খানম

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ নামে পরিচিত মসজিদটির ব্যয়ও এই পরিবারের সংশ্লিষ্ট আরেকটি ওয়াকফ ফান্ড থেকে মেটানো হয়ে থাকে। ঢাকা শহরের দিলখুশায় অবস্থিত শাহজালাল দাখিনীর মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এখনো নওয়াবদের ওয়াকফ এস্টেট থেকেই মেটানো হয়। নিম্নে এরূপ আরো কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার তথ্যাদি পেশ করা হলোঃ

৬(১) হোসেনী দালান সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

ঢাকার ঐতিহাসিক হোসেনী দালানটি এতদাঞ্চলের শিয়া মুসলিমদের সর্বপ্রধান ইমামবাড়া রূপে পরিগণিত। মোগল সুবাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে শিয়াদের প্রাধান্য বিস্তার ঘটে। ঢাকার নায়েবে নাজিমদের বিলুপ্তি পর্যন্ত এদেশে শিয়াদের প্রাধান্য মোটামুটি অটুট ছিল। বলা হয়ে থাকে, সুবাদার শাহ সুজার আমলে নৌ-বিভাগের দারোগা মীর মুরাদ ১৬৪২ খ্রীঃ বর্তমান হোসেনী দালানের স্থানে একটি ছোটখাট ইমামবাড়া তৈরী করেছিলেন।[৩] পরবর্তীকালে ঢাকার নায়েবে নাজিম জসরত খাঁ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে হোসেনী দালানটিকে দ্বিতল ও জাঁকালো আকারে পুনর্নির্মাণ করেন।[৪] ঢাকার নায়েবে নাজিমগণ হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লীরূপে নিজামতের কোষাগার থেকে এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। নিজামত থেকে এই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল তৎকালীন বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা।[৫]

তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হোসেনী দালানে পবিত্র মহররম পর্ব উৎযাপিত হয়ে আসছে। তৎকালীন ঢাকার মুসলমানগণের বিশেষ করে শিয়াদের নেতা হিসেবে নায়েবে নাজিমরা ঘটা করে মহররম উৎসব উৎযাপন করতেন। নিমতলীর নওয়াব কুঠি থেকে তখন জৌলুস সহকারে মহররম মিছিল বের হতো। নায়েবে নাজিমগণ নানাবর্ণে সাজানো হাতীতে চড়ে মিছিলের নেতৃত্ব দিতেন। নওয়াব নুসরাত জংগ-এর আমলে জলরঙে আঁকা এরূপ মহররম মিছিল ও হোসেনী দালানের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মহররমের মেলার কয়েকটি চমৎকার দৃশ্য এখন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।[৬] ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই ঢাকার নায়েবে নাজিমগণ হোসেনী দালানের পবিত্র প্রাঙ্গনে নিজেদের সমাধির জায়গা নির্বাচিত করেছিলেন। হোসেনী দালানের মূল ভবনের পূর্ব পার্শ্বে (১) নওয়াব নুসরাত জঙ্গ (২) নওয়াব শামসুদ্দৌলা (৩) নওয়াব কামরুদ্দৌলা (৪) নওয়াব গাজী উদ্দিন হায়দার সমাহিত আছেন।[৭] এ সমাধিগুলোর উপর নির্মিত সুন্দর এক তলা সৌধটি এখন ধ্বংস হয়ে গেছে।

নায়েবে নাজিম জসরত খান এক সময়ে হোসেনী দালানের জন্য নিজামত থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ঢাকার শিয়াদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুর্শিদাবাদের নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা তা পূর্বের ন্যায়ই রাখতে নির্দেশ দেন।[৮] ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি মিঃ শোর ১৭৮৮ খ্রীঃ ঢাকায় এসে হোসেনী দালানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় বৃত্তি বন্ধ করে দেন। কিন্তু তৎকালীন নায়েবে নাজিম হাসমত জংগ বিষয়টি কোম্পানীর সরকারের গোচরীভূত করেন। ফলে সরকার পূর্বানুরূপ আড়াই হাজার টাকা বৃত্তি দেয়া বহাল রাখে। সরকার এই ইমামবাড়ার জীর্ণ ভবন মেরামত করার জন্য ১৮০৭ খ্রীঃ এককালীন তিন হাজার টাকা এবং ১৮১০ খ্রীঃ ৪ হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৯]

১৮৪৩ খ্রীঃ ঢাকার শেষ নায়েবে নাজিম গাজীউদ্দিন হায়দার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী নির্বাচনে সংকট দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব ব্রিটিশ সরকারের নিকট এর মোতাওয়াল্লী নিযুক্তির জন্য পত্র পাঠান। কিন্তু উক্ত পত্রের উত্তর আসার আগেই মহররমের উৎসব সমাগত হয়। এদিকে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের ফয়সালা না হওয়ায় সরকারী বৃত্তি দেয়া বন্ধ থাকে। ফলে সেবার উৎসব পালনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় নওয়াব আব্দুল গণির পিতা খাজা আলীমুল্লাহ ঢাকার শিয়া মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি এই ঐতিহ্যগত উৎসবের ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে সেবারকার উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। সরকার অবশেষে খাজা আলীমুল্লাহকেই হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর থেকে হোসেনী দালানের যাবতীয় কাজকর্ম ও নেতৃত্বের ভার খাজা পরিবারের উপরই বর্তায়। খাজা আলীমুল্লাহর পরে এ পরিবারের প্রধানগণ হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী হতেন। তাঁরা সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও প্রতি বছর নিসংকোচে অজস্র টাকা পয়সা শিয়া ইমামবাড়ার জন্য অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যয় করে গেছেন। প্রতি বছর হোসেনী দালানের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে ১২৮৩ টাকা ৮ আনা স্থায়ী বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। তদুপরি বিভিন্ন প্রয়োজনে যখন যা লাগতো দেয়া হতো। এছাড়াও রমজান মাস, মিলাদুন্নবী এবং ঈদ উৎসবের ন্যায় মহররম উৎসবের ব্যয়ের জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ ছিল।[১২]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে নওয়াব আব্দুল গণির সুপারিশক্রমে ১৮৫৯ খ্রীঃ খাজা আবদুর রহিম ও মীর মোহাম্মদকে সরকার হোসেনী দালানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।[১৩] আব্দুল গণি হোসেনি দালান মেরামতের জন্য বিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৩(ক)]

১৮৯৭ খ্রীঃ ১২ জুনের ভূমিকম্পে ঢাকার হোসেনী দালানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ তখন লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ইমামবাড়াটা পুনর্নির্মাণ করে দেন।[১৪] নওয়াবের এই অবদানের জন্য কলকাতার শিয়া সম্প্রদায়ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁরা ১৮৯৮ সালের ১২ অক্টোবর শনিবার ঐ শহরে ১৪৭ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডে গোলকুঠিতে একটি সভা করেন। সভায় তাঁরা নওয়াব আহসানুল্লাহর এই দান কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এছাড়া নওয়াবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য তাঁরা শিয়াদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে ঢাকায় পাঠান।[১৫]

নওয়াব আহসানুল্লাহ তখন যেভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, হোসেনী দালানের মূলভবন ও নহবত খানাটি মোটামুটি সেই অবস্থায় আজো বিদ্যমান। তবে এর চতুষ্পার্শ্বের খোলা জায়গা বেশ সংকুচিত হয়েছে। বিশেষ করে মুল দালানের পূর্ব দিকে ঢাকার নায়েবে নাজিমদের সমাধি সৌধগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইতোমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে।[১৬] এডওয়ার্ড হাউসে প্রাপ্ত ঢাকার নওয়াবদের পুরানো এ্যালবাম থেকে হোসেনী দালান এবং এর নহবত খানার তৎকালীন দৃশ্য সম্বলিত দুটো আলোকচিত্র উদ্ধার করা গেছে। পরিশিষ্টে চিত্র নং- ১৮ ও ১৯-এ চিত্র দুটো দেয়া হলো। হোসেনী দালানের পশ্চিম পার্শ্বে ঢাকার নওয়াব সুন্দর একটি বাগানবাড়ী নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য দালান কোঠাও ছিল। বর্তমানে তাঁদের সেই বাগানবাড়ীটিও নেই।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, নওয়াব সলিমুল্লাহ আহসান মঞ্জিল এলাকা থেকে নওয়াবদের পুরানো গ্যাসপ্লান্টটি হোসেনী দালানের জন্য প্রদান করেন। ১৯০২ সালের ২ মার্চ উক্ত যন্ত্রটি চালিয়ে হোসেনী দালানের পুরো এলাকাটি আলোকায়নের ব্যবস্থা করা হয়। হোসেনী দালান এলাকা আলোকায়নের জন্য ঐ বছরেই নওয়াব সলিমুল্লাহ কলকাতা থেকে আরো ৪০টি বাতি কিনে এনে তথায় সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন।[১৯] এছাড়াও নওয়াব সলিমুল্লাহ হোসেনী দালানে ইমাম হোসেনের কবরের মডেলরূপে ব্যবহৃত তাজিয়াটি বহু শততোলা সোনা-রূপা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।[২০]

আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত পুরানো কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ১৯০৬ সালে বজ্রপাতের দরুণ হোসেনী দালানের নহবতখানার একটি টাওয়ার ভেংগে পড়ে। এছাড়া একটি বড়গাছ গজিয়ে নায়েবে নাজিমদের সমাধি সৌধটি ধ্বংসের উপক্রম করে। গ্যাস প্লান্ট হাউসের নিকট বেশ খানিকটা বহির্দেয়াল ভেংগে পড়ে। ঐগুলো মেরামত এবং গ্যাস হাউসের দক্ষিণে একটি ছোট গেট তৈরীর জন্য নওয়াব এস্টেটের হেড ওভারসিয়র ১৯০ টাকার একটি ব্যয়ানুমান তৈরী করেন। ব্যয়ানুমানটি চীফ ম্যানেজার মিঃ জে.হর্ডিং ২৭ মার্চ ১৯০৬ নওয়াবের নিকট পেশ করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ অনুমোদন করলে অচিরেই কাজটি সম্পাদিত হয়।[২১] এ থেকে বুঝা যায় হোসেনী দালানের ছোট বড় যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ তখন নওয়াব এস্টেট থেকেই হতো। বলাই বাহুল্য, উক্ত হোসেনী দালানটি এতদাঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠি বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং এখনো বেশ কিছুটা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬(২) কদম রসুলের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

এদেশের আরো সব সমাজ কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের মত নারায়ণগঞ্জের কদম রসুলের রক্ষণাবেক্ষণও আলোচ্য যুগে ঢাকার নওয়াবগণই করতেন। নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে শীতলক্ষ্যার পূর্বপাড়ে নবীগঞ্জ গ্রামে অবস্থিত কদমরসুল দরগাহে নবীজির কথিত পদচিহ্ন সম্বলিত একটি প্রস্তর খন্ড সংরক্ষিত আছে। পাথরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাই থাকুক না কেন, এতদাঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতির ক্ষেত্রে সেটার একটি ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

১৫৮০ খ্রীঃ ঈশা খাঁর সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী আরব দেশীয় জনৈক সওদাগরের নিকট থেকে বহুমূল্যে নবীজির পদচিহ্ন সম্বলিত এ পাথরটি সংগ্রহ করেন। তিনি পাথরটি সংরক্ষণের জন্য এখানে একটি ভবন নির্মাণ করেন।[২২] সুবাদার ইসলাম খান ও যুবরাজ শাহজাহান বাংলায় থাকাকালে এই কদমরসুলের প্রতি সম্মান দেখাতেন। ১৬৪২-৪৩ খ্রীঃ শাহ্ সুজা কদম রসুলের ভবন ও মসজিদের জন্য এর আশপাশ থেকে ৮০ বিঘা জমি জায়গীর দান করেছিলেন।[২৩] ঢাকার নায়েবে নাজিম নুসরাত জংগ বাহাদুর প্রায়ই কদম রসুল পরিদর্শনে গিয়ে এর হুজরা খানায় বসে ইবাদত বন্দেগী করে রাত্রি কাটিয়ে দিতেন।[২৪] নওয়াব নুসরাত জংগ এবং গাজী উদ্দিন হায়দার এখানে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা হুজরাখানা এবং লংগরখানাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও চালু রাখার খরচ দিতেন।

বর্তমানে বিদ্যমান কদম রসুলের ভবনটি ঈশা খাঁর প্রপৌত্র দেওয়ান মনোয়ার খাঁ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ত্রিপুরার তোরা পরগনার জমিদার শেখ গোলাম নবী ১১৯১ হিঃ মোতাবেক ১৭৭৭ খ্রীঃ সেটা নতুন ভাবে পুনঃনির্মাণ করেন।[২৬] তাঁর ছেলে শেখ গোলাম মোহাম্মদ ১২২৫ হিঃ মোতাবেক ১৮১৪ খ্রীঃ নদী তীরবর্তী এর দ্বিতল নহবত খানাটি তৈরী করেন।[২৭] শেখ গোলাম নবী কর্তৃক কদমরসুলের উক্ত মেরামতের তারিখ সম্বলিত শিলালিপিটি এখন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। আওলাদ হাসান জানিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কদম রসুলের জনৈক তত্ত্বাবধায়ক শিলালিপিটি ভবন থেকে তুলে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা সেটা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর হস্তক্ষেপে শিলালিপিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।[২৮]

ঢাকার নায়েবে নাজিমদের পতনের পর হোসেনী দালানের ন্যায় কদম রসুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ঢাকার নওয়াবদের উপর এসে পড়ে। ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে প্রতি বছর একটি বড় অংকের টাকা কদম রসুলের সংস্কার এবং উৎসবাদি পালনের জন্য নির্ধারিত থাকতো।[২৯] মিলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে নওয়াব এস্টেটের পক্ষ থেকে কদমরসুলে মিলাদ শরীফ ও ভোজের আয়োজন করা হতো। এ উপলক্ষে কদম রসুলের আংগিনায় একটি বড় ধরনের মেলা বসতো।[৩০] তায়েশ বলেন, নওয়াব আহসানুল্লাহ বহু টাকা খরচ করে কদম রসুলের ইমারতটিকে উত্তমরূপে সংস্কার করে দেন।[৩১] ঢাকার নওয়াবদের এ্যালবাম থেকে প্রাপ্ত কদম রসুলের নহবতখানার তৎকালীন দৃশ্য সম্বলিত একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং- ২০-এ দেয়া হলো।

ঢাকার নওয়াবদের দানের তালিকা থেকে জানা যায় যে, নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় একবার কদম রসুলের সাধারণ ব্যয় মিটাতে ১১৯৭ টাকা দেয়া হয়েছিল।[৩২] এছাড়াও আরেকবার তিনি ৩,২৯৬ টাকা কদম রসুলের কিছু সংস্কার কাজে ব্যয় করেছিলেন।[৩৩] নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতার ন্যায় কদম রসুলের প্রতি বিশেষ আগ্রহও সম্মান দেখাতেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণে যাবতীয় সহায়তা দিতেন।[৩৪] মোট কথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ব্যাপী ঢাকার নওয়াবদের সমৃদ্ধির যুগে তাঁরা উক্ত কদম রসুলের রক্ষণাবেক্ষণে মোগলযুগের স্থানীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পূরণ করেছিলেন। তাঁরা এই ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির গৌরব ও শান সৌকত অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬(৩) হযরত শাহ্ আলীর দরগাহ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

ঢাকা অঞ্চলে প্রাচীন ও খ্যাতনামা দরগাহগুলোর মধ্যে মীরপুরের শাহ্ আলী বাগদাদীর দরগাহটি অন্যতম। এ দরগাহটির সংস্কার ও উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন। গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে ১৪৮০ খ্রীঃ এখানে একটি ছোট্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৩৫] পরবর্তীতে বাগদাদ থেকে হযরত শাহ্ আলী সাহেব এখানে এসে আশ্রম গড়ে তোলেন। তিনি উক্ত মসজিদের মধ্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ১৫৭৭ খ্রীঃ পরলোকগমন করলে তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।[৩৬] এর পর থেকেই তাঁর মাজারটিকে এতদাঞ্চলের লোকেরা ভক্তি শ্রদ্ধা করে আসছে। ১৮০৬ খ্রীঃ (১২২১ হিঃ) নায়েবে নাজিম নুসরাত জঙ্গের আমলে মগবাজারের পীর শাহ্ মোহাম্মদী সাহেব এ মাজারটিকে নতুন ভাবে মেরামত করে দেন।[৩৭]

শাহ্ আলী সাহেবের কবরটি ঐ ছোট্ট মসজিদের অভ্যন্তরে থাকায় দূর-দূরান্ত থেকে যেসব লোক জিয়ারতের জন্য আসতেন, তাঁদের এমনকি বসার জায়গাও সেখানে হতো না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ঢাকার জনদরদী নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ বহু অর্থ ব্যয় করে এ মাজারটি সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীতে জায়গার আরো প্রয়োজন হলে, উক্ত মসজিদের সাথে একটি বারান্দাও তিনি নিজ ব্যয়ে তৈরী করে দেন।[৩৮] এতে জিয়ারত কারীদের নামাজ পড়তে সুবিধা হয়। এই মাজার এলাকায় মহিলাদের জন্য দেয়ালঘেরা চত্বর এবং তৎসংলগ্ন পাকা ঘরগুলোও নওয়াব আহসানুল্লাহ তৈরী করে দিয়েছিলেন।[৩৯]

ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকার মধ্যে দেখা যায় মীরপুরের শাহ্ আলীর দরগাহের প্যাভিলিয়ন তৈরী করার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ একবার ২,৫০০/- টাকা দান করেছিলেন।[৪০] সম্ভবত তিনি মাজার প্রাংগনে মহিলাদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণে এ অর্থ ব্যয় করেছিলেন। উক্ত দানের তালিকা থেকে আরো জানা যায়, শাহ্ আলীর দরগাহে যাতায়াতের জন্য দুটি রাস্তা নির্মাণ কাজে নওয়াব আহসানুল্লাহ ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৪১] এছাড়া এর মূল দরগাহটি সংস্কারে তিনি একবার তিন শত টাকা ব্যয় করেছিলেন।[৪২] নওয়াব পরিবারের বদান্যতায় মীরপুরের এই দরগায় প্রতি বছর উরস অনুষ্ঠিত হতো।[৪৩] মীরপুরের এই এলাকাটি ঢাকার নওয়াবদের জমিদারির অন্তর্ভূক্ত ছিল। এখানকার প্রজারা তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। বিপদে আপদে নওয়াবরা যেমন প্রজাদেরকে মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন তেমনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে নওয়াবকেও সাহায্য করতে প্রজারা কুণ্ঠিত হতেন না। বলকান যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে তুর্কী মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্য ঢাকার নওয়াবগণ ১৯১২ সালে পূর্ববাংলা থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহর উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ঐ বছর নভেম্বর মাসে মীরপুরে শাহ্ আলীর দরগাহ প্রাংগনে একটি জনসভা হয়। গ্রামের সব মুসলমানেরা পতাকা হাতে সভায় উপস্থিত হয়ে তকবির ধ্বনি দিতে থাকে। সভাস্থলে লোকেরা ২ হাজার টাকা চাঁদা দেয় এবং নওয়াবজাদাকে পরবর্তী শুক্রবার এজন্য পুনরায় আসতে অনুরোধ করেন।[৪৪]

৬(৪) সাত মসজিদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

মোগল বাংলার সমৃদ্ধির যুগে যখন ঢাকা শহর পূর্ব দিকে পোস্তগোলা এবং পশ্চিমে বুড়ীগংগার তীর ধরে জাফরাবাদ পর্যন্ত প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত ছিল।[৪৫] তখন নওয়াব শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজর্গ উমেদ খাঁ কর্তৃক জাফরাবাদ মৌজায় সাত মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। আসলে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের চারকোনার টাওয়ারোপরি নির্মিত আরো ৪টি মিলিয়ে এতে মোট ৭টি গম্বুজ রয়েছে। এজন্যই মসজিদটিকে সাত গম্বুজ মসজিদ তথা সাত মসজিদ বলে অভিহিত করা হয়। ইংরেজ আমলে শহর সংকুচিত হবার ফলে সাত মসজিদটি মূল শহর থেকে ৩/৪ মাইল দূরে জন বিরল এলাকায় পড়ে যায়।[৪৬] সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থাভাবে অযত্ন ও অবহেলায় মসজিদটি জীর্ণদশায়

Dhaka University Institutional Repository

পতিত হয়। ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ এই মসজিদটির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে নওয়াব সাহেব বহু টাকা খরচ করে মসজিদটিকে নতুনভাবে সংস্কার ও মেরামত করে দেন।[৪৭] এছাড়াও তিনি সাত মসজিদের জন্য একজন ইমাম-কাম-মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করে দেন। তিনি তাঁর ভরণপোষণের জন্য প্রায় ১২ পাখী জমির উপস্বত্ব দানসহ মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করে দেন।[৪৮] এতে মসজিদটি পুনরায় সচল হয়ে ওঠে এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আজান ও নামাজ চলতে থাকে।[৪৯] মসজিদের আশে পাশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এতে বিশেষভাবে উপকৃত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময়েও উক্ত মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেয়া যথারীতি চালু ছিল। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, সাত মসজিদ সংস্কারে ঢাকার নওয়াব একবার ১৬৯৯ টাকা দান করেছিলেন।[৫০]

৬(৫) শাহ্ মালিক পীর ইয়ামেনীর দরগাহ সংস্কার ঃ

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান জিরো পয়েন্টের পশ্চিম-দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হযরত শাহ্ মালিক পীর ইয়ামেনীর দরগাহটি ঢাকায় সুলতানী আমলের একটি অন্যতম নিদর্শন। তৈফুর সাহেব জানিয়েছেন, চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে শেখ মালিক পীর ইয়ামেনী শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজীর সংগী হিসেবে এসে এখানে আস্তানা গাড়েন।[৫১] হাকিম হাবিবুর রহমান বলেছেন, শাহ্ মালিক হযরত শাহ্ জালালের সাথে সিলেট যান এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় ঢাকায় ফিরে এসে এখানে স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়েন।[৫২] বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই বুজুর্গের মাজারটির উপর কোন সৌধ কিংবা আচ্ছাদন ছিল না। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা চিরদিন এখানে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করতো। বহুদিন পর্যন্ত দুটো বটগাছের কান্ড ও শিকড় মাজারটিকে প্রাচীরের ন্যায় বেস্টন করে রেখেছিল।[৫৩]

১৮৮৪ খ্রীঃ ঢাকায় প্রথম রেলগাড়ীর প্রচলন হলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এখানের ঝুপড়ি- বস্তি সব উচ্ছেদ করে জায়গাটিকে পরিস্কার করে। অতপর আসামের মনিপুরী রাজবংশের জনৈক নও মুসলিম এখানে এসে মাজারটির খেদমত শুরু করেন।[৫৪] তিনি 'ফকির রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ তাঁকে সামাজিক ও আর্থিক সাহায্য দান করেন। তিনি মাজার সংলগ্ন একটি বিরাট এলাকা দেয়াল বেস্টন করে নিয়ে আবাসগৃহ নির্মাণ করেন।[৫৫] নওয়াব আহসানুল্লাহর আর্থিক সহায়তায় তিনি এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। মাজারটির দক্ষিণ পার্শ্বে চৌচালা বাঙলো টাইপের আচ্ছাদন দিয়ে মসজিদটি তৈরী হয়েছিল।[৫৬] এই ছোট্ট স্থাপত্যটিতে এদেশের ঐতিহ্যবাহী চৌচালা কুঁড়ে ঘরের বৈশিষ্ট্য স্বার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।[৫৭] ঢাকার নওয়াবের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, নওয়াব আহসানুল্লাহ একবার হযরত শাহ্ মালিকের দরগাহের মসজিদ নির্মাণের জন্য ১,১০০ টাকা দান করেছিলেন এবং আরেকবার ঐ পীরের দরগাহটি মেরামতের জন্য ২৪৪ /- টাকা দান করেছিলেন।[৫৮]

শাহ্ মালিক পীর ইয়ামেনীর মাজারের উপর বর্তমানে দৃশ্যমান গম্বুজযুক্ত সুন্দর স্থাপত্যটি ১৯০৯ খ্রীঃ নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে তৈরী করে দেন। এটির নির্মাণ কাজ তদারক করেন মরহুম কাজী রফিকউদ্দিন।[৫৯] অস্টকোন বৈশিষ্ট্যে নির্মিত সমাধি সৌধটির সারা গাত্রে চিনিটিকরীর মোজাইক দ্বারা সুন্দরভাবে নকশা করা হয়েছে। ভারতীয় মুসলিমদের ইতিহাসে অষ্টকোন মুনোমুগ্ধকর সমাধি সৌধ নির্মাণের যে বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি রয়েছে, তন্মধ্যে পীর ইয়ামেনীর উক্ত সমাধি সৌধটি ছোট্ট হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলা চলে। এতদাঞ্চলে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে নির্মিত সমাধি সৌধ বিরল।

Dhaka University Institutional Repository

৬(৬) চিশতি বেহেশ্‌তির মাজার সংস্কার ঃ

ঢাকা শহরে বর্তমান হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে অবস্থিত খ্যাতনামা মাজারটি কিছুকাল আগেও চিশতি বেহেশ্‌তির মাজার বলে পরিচিত ছিল। ঢাকায় মোগল সুবা বাংলার রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব ইসলাম খান চিশতি ১৬১৩ খ্রীঃ আগস্ট মাসে ভাওয়ালের জংগলে শিকার করতে গিয়ে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মরদেহ ঢাকায় এনে তৎকালীন বাগ-ই-বাদশাহীর (বর্তমান হাইকোর্ট এলাকা) উক্ত স্থানে প্রথমে সমাহিত করা হয়।[৬০] পরবর্তীতে ইসলাম খাঁর পুত্র হোসংগ চিশতি সম্রাট জাহাংগীরের সাথে দেখা করে বিস্তারিত জানান। সম্রাটের আদেশে ইসলাম খাঁর মরদেহ ঢাকার উক্ত স্থান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফতেহপুর সিক্রিতে তাঁর দাদা, পীর সেলিম চিশতির মাজারের কাছে পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়।[৬১] কিন্তু ঢাকায় ইসলাম খাঁর প্রথম কবরের চিহ্নটি তারপরেও থেকে যায়। সম্ভবত তাঁর পরবর্তী সুবাদার (ইসলাম খাঁর ছোট ভাই) নওয়াব কাশেম খান চিশতি, ঢাকায় তাঁর বড় ভাইয়ের প্রাক্তন কবরের উপর ভক্তিভরে একটি চৌচালাকার ছাদযুক্ত সৌধ নির্মাণ করে দেন।[৬২]

চিশতিয়া তরিকার বিখ্যাত দরবেশ সেলিম চিশতির পৌত্র ইসলাম খান চিশতি মৃত্যুর পর স্বভাবতই বেহেশ্‌তে গেছেন। এই ধারনায় তাঁর সাথী ও স্থানীয় লোকেরা বাগ-ই-বাদশাহীতে তাঁর উক্ত কবরস্থানকে চিশতির বেহেশ্‌ত গমনের স্থান বলে অভিহিত করতো। কালক্রমে এই শূণ্যগর্ভ মাজারটি চিশতি বেহেশ্‌তির মাজার নামে পরিচিত হয়ে যায়। বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মপ্রাণ লোকেরা আদিকাল থেকেই মাজারটির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করতো।[৬৩] কালক্রমে এই মাজারটি জীর্ণদশায় পতিত হলে ঢাকার বদান্যবর নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ বহু টাকা খরচ করে সেটাকে সুন্দরভাবে মেরামত করে দেন।[৬৪]

১৯০৫ খ্রীঃ বংগবিভাগ কার্যকর হয়ে ঢাকা পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়। সে সময় লেঃ গভর্নরের সরকারী বাসভবন নির্মাণের জন্য এই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পুরানো, জীর্ণ ভবন ও সমাধি সৌধ ধ্বংস করে ফেলা হয়। ঐ সময় ঢাকার কাজী রফিক উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা চিশতি বেহেশ্‌তির মাজারটি রক্ষার জন্য আন্দোলন করে।[৬৫] অবশেষে নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুরের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে একটি শর্ত সাপেক্ষে মাজারটি রক্ষা পায়। শর্তটি ছিল মুসলিমরা বিশেষ বিশেষ দিনে মাজারটি জিয়ারত করতে পারবে, তবে কোন মেরামতাদি করতে পারবেনা।[৬৬]

পাকিস্তান আমলে পূর্বোক্ত লেঃ গভর্নর হাউসে হাইকোর্ট বসলে এক শ্রেণীর ধূর্ত লোকেরা রঙ চঙ চড়িয়ে মাজারটির গুরুত্ব বাড়াতে থাকে। এখন সেখানে খাজা শরফুদ্দিন চিশতি ওরফে ওলি বাংলা বলে কথিত পীরের কল্পিত অস্তিত্বের যে কথা প্রচার করা হয়ে থাকে, ইতিহাসে তার কোনই প্রমান নেই।[৬৭] ধর্মান্ধ ও ধর্মপ্রাণ মানুষেরা না জেনে শুনেই মাজারটি জিয়ারত করে চলেছেন।[৬৮]

৬(৭) লালবাগ শাহী মসজিদ সংস্কার ঃ

মোগল সুবাদার শাহজাদা আজিমুশ্শানের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পুত্র ফররুখশিয়র ঢাকায় থাকাকালে (১৭০৩-৬ খ্রীঃ) এই বৃহদাকার মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু করেন। কিন্তু তিনি এর নির্মাণ কাজ পুরোপুরি শেষ করে যেতে পারেননি।[৬৯] পাকাছাদ বা গম্বুজের বদলে কাঠের ছাদ নির্মাণ করেই মসজিদটি তখন চালু করা হয়। ১৭১৭ খ্রীঃ নওয়াব মুর্শিদকুলী খান এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংলগ্ন এলাকার কিছু জমি এবং মাসিক সাড়ে বাইশ টাকা প্রদনের ব্যবস্থা করেন।[৭০] ইংরেজ আমলে ঐসব সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়াসহ মসজিদের জমিজাতি সব বেহাত হয়ে যায়। কালক্রমে সংস্কারের অভাবে মসজিদটির কাঠের ছাদ নষ্ট হয়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭০ খ্রীঃ দিকে ঢাকার বদান্যবর নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর ওয়াকফ ফান্ড থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে মসজিদটিতে পাকা ছাদ নির্মাণ করেন।[৭১] লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ ফটকের সামনে অনতিদূরে অবস্থিত এ মসজিদটি ঢাকার প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। ১৬৪ ফুট X ৫৪ ফুট আয়তন বিশিষ্ট এর নামাজগৃহের মধ্যেই একত্রে দেড় হাজার মুসল্লী নামাজ পড়তে পারতো।[৭২] ঢাকা নওয়াব এস্টেট-এর পুরানো অফিস এডওয়ার্ড হাইসে প্রাপ্ত নওয়াবদের আমলের এ্যালবাম থেকে উদ্ধারকৃত লালবাগ শাহী মসজিদের তৎকালীন দৃশ্য সম্মলিত একটি আলোকচিত্র পরিশেষ্টে (চিত্র নং ২১ দ্রঃ) দেয়া হলো।

ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে লালবাগ শাহী মসজিদ সংস্কার কাজে দুইবার অর্থদানের কথা জানা যায়। প্রথমবার দেয়া হয় ৩,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয়বার দেয়া হয় ১,৮৩০ টাকা।[৭৩] নওয়াব আব্দুল গণির সংস্কারের পর স্থানীয় মুসলিমরা যত্নের সাথে মসজিদটি রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। পরবর্তীকালে মসজিদটিতে একটি সুন্দর মিনারেরও সংযোগ করা হয়। ১৯০৮ খ্রীঃ ২৮ সেপ্টেম্বর নওয়াব সলিমুল্লাহ লালবাগ শাহী মসজিদের সংস্কার কাজের জন্য কাজী রাজী উদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে তিন শত টাকা প্রদান করেন।[৭৪] এতদাঞ্চলে খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তিকে এই মসজিদের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট বিখ্যাত ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যিক-কবি, মৌলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী অন্যতম। এছাড়া এখানে ঢাকার প্রখ্যাত আলেম মুফতী দীন মোহাম্মদ, পাঞ্চু খলিফা, মৌলানা কুদরতুল্লাহ, মৌলানা নোয়াম প্রমুখ মনীষীর কবর রয়েছে।[৭৫]

৬(৮) খাজা আম্বরের মসজিদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

ঢাকা শহরে কাওরান বাজারে বর্তমানে ময়মনসিংহ রোডের পূর্বপার্শ্বে নওয়াব শায়েস্তা খাঁর আমলে খোজাদের প্রধান খাজা আম্বর ১৬৮০ খ্রীঃ একটি মসজিদ ও কূপ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের আংগিনায় নির্মাতার কবর রয়েছে।[৭৬] মসজিদটির অধীনে মোগল আমলে অনেক জমিজমা থাকলেও কালক্রমে তা বেহাত হয়ে যায়। ফলে অর্থাভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা দেখা দেয়। স্থানীয় মুসলমানেরা কোন রকমে মসজিদটি চালু রাখলেও সংস্কারের অভাবে সেটার জীর্ণ দশা ঘটে।[৭৭] এমতাবস্থায় নওয়াব আসহানুল্লাহ বহু টাকা ব্যয় করে মসজিদটির সংস্কার করেন এবং তাঁর ওয়াকফ এস্টেট থেকে বেশকিছু সম্পত্তি তিনি এ মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারণ করে দেন।[৭৮] ফলে ধ্বংসের বদলে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হয়ে মসজিদটিতে নিয়মিত নামাজ চলতে থাকে। হাল আমলে মসজিদটির ব্যাপক সংস্কার করা হলেও এর আদি নামাজগৃহটি এখনো অটুট রয়েছে।[৭৯]

৬(৯) শাহ্জালাল দাখিনীর মসজিদ ও মাজার এবং শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকিনের মাজার সংস্কার ঃ

ঢাকার নওয়াবদের দিলখুশা বাগানের অন্তর্গত এই মসজিদ এবং মাজারগুলো নওয়াব এস্টেটের খরচে যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ করা হতো। বর্তমান ডি.আই.টি (রাজউক) ভবনের প্রাঙ্গনে অবস্থিত দাখিনী সাহেবের মসজিদটি দিলখুশা বাগান এলাকায় প্রবেশ পথের উত্তর পার্শ্বে ছিল। এখনো ঢাকার নওয়াব ওয়াকফ এস্টেট থেকে মসজিদটির রক্ষনাবেক্ষণ ও ইমাম-মোয়াজ্জিনের ভাতাদির ব্যবস্থা করা হয়। তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও আজানের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। উক্ত মসজিদের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে উঁচু টিবির উপর শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকিনের মাজারটিও এস্টেটের খরচে সংস্কার করা হয়।[৮০] এই মসজিদ ও মাজার প্রাংগনে দিলখুশাবাসী নওয়াব পরিবারের অনেক নামকরা নারী-পুরুষকে সমাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে নওয়াবজাদী মেহেরবানু, খাজা মোঃ আজম ও জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। দিলখুশার দক্ষিনাংশে বর্তমান বংগভবন এলাকায় অবস্থিত শাহ্জালাল দাখিনীর মাজারটি ইতিহাস খ্যাত

 Dhaka University Institutional Repository

বুজুর্গের মাজার। সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে দাক্ষিনাত্য থেকে আগত এই বুজুর্গ অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারনে বাদশাহের কোপানলে পড়ে ১৪৭৫ খ্রীঃ (৮৮১ হিঃ) শহীদ হন।[৮১] তাঁর মাজারের উপর নির্মিত গম্বুজটি মোগল আমলের। এই মাজার এলাকায় আরো কয়েকটি কবর রয়েছে। এ মাজারগুলোতে দূর-দুরান্ত থেকে লোকেরা জিয়ারত করতে আসতো। নওয়াব এস্টেট থেকে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো।

৬(১০) হযরত শাহ্ মাসউদ ও পীর জংগীর দরগাহ্ সংস্কার ঃ

মাতুয়াইলের পথে ধোলাই নদীর পশ্চিম তীরে এক উঁচু স্থানের উপর হযরত শাহ্ মাসউদের মাজার অবস্থিত। জনশ্রুতিতে তিনি মীরপুরের শাহ্ আলীরও আগে বাগদাদ থেকে এদেশে এসেছিলেন। সাধারণত বর্ষাকালে নৌকায় করে নারীপুরুষ নির্বিশেষে দর্শনার্থীরা দূর দুরান্ত থেকে এখানে আসতো। তাঁরা সারাদিন থেকে এখানেই রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া ও জেয়ারত করতো।[৮২] পূর্ব থেকেই এখানে কয়েকটি পাকা ঘর ও একটি মুসাফিরখানা ছিল। কিন্তু কালক্রমে সংস্কারের অভাবে সেগুলো ভগ্ন দশায় পতিত হয়। ঢাকার বদান্যবর নওয়াব আহসানুল্লাহ বহু অর্থ ব্যয় করে সেগুলো নতুন করে তৈরী করে দেন। ঢাকা শহরের পূর্ব প্রান্তের লোকেরা বিশেষ করে মহিলারা এই মাজার জিয়ারত করার জন্য অত্যন্ত ভীড় জমাতো। পরবর্তীতে নওয়াব আহসানুল্লাহর তৈরীকৃত ঘরটি জীর্ণ হয়ে গেলে তাঁর কন্যা নওয়াবজাদী আখতারবানু নিজ ব্যয়ে সেটাকে পুনঃনির্মাণ করে দেন।[৮৩] ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকায় শাহ্-মাসউদের দরগায় একবার ২০০ টাকা দানের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৮৪]

নওয়াবজাদী আখতারবানু দানকার্যে তাঁর পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। ঢাকা শহরের শাহজাহানপুর এলাকায় পীর জংগীর মাজারটির উপর তিনি একটি টিনের ছাপড়া তৈরী করে দেন এবং সেখানে অবস্থিত কাঁচা কবর দু'টিকে পাকা করার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া মাজারের উচ্চ জায়গাটিতে উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়।[৮৫] জনকল্যাণ কাজে নওয়াবজাদী আখতার বানু হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ করতেন না। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে তাঁর পিতা নওয়াব আহসানুল্লাহর নামে একটি ভবন নির্মাণ করে দেন, যা আজো বিদ্যমান।[৮৬]

৬(১১) বাইগুনবাড়ী মসজিদ নির্মাণ ঃ

সাভারের সাদুল্লাপুর মৌজায় বাইগুনবাড়ীতে ঢাকার নওয়াবগণ একটি বাগানবাড়ী ও শিকারগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পরিবার পরিজন ও পাইক পেয়াদা সমভিব্যহারে ঢাকার নওয়াবরা শিকারের আনন্দ ভ্রমনে বাইগুনবাড়ীতে গিয়ে অবস্থান করতেন। সেখানে তাঁদের থাকা-খাওয়া, আমোদ-প্রমোদের জন্য যেমন উপযুক্ত দালান কোঠা নির্মাণ করা হয়েছিল[৮৭] তেমনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য সেখানে তাঁরা একটি সুন্দর জামে মসজিদ ও একটি বড় দীঘি খনন করেছিলেন। সাভারের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সুন্দর মসজিদটি নির্মাণে স্থানীয় মুসলিমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। কালের প্রবাহে বাইগুনবাড়ীতে নির্মিত ঢাকার নওয়াবদের প্রায় সব কীর্তিই বিলীন হয়ে গেছে। তবে ঐ জামে মসজিদটি আজো তাঁদের গৌরবময় স্মৃতি বহন করে চলছে। পরবর্তীকালে মুসল্লীদের স্থান সংকুলানের জন্য মসজিদটির পূর্বদিকে কিছুটা বর্ধিত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট চিত্র নং ২২-তে নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলে তোলা উক্ত জামে মসজিদের একটি দুস্প্রাপ্য চিত্র দেয়া হলো।[৮৮] মসজিদটির চতুর্দিকে সংলগ্ন নওয়াব এস্টেটের জমি এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি বড় দীঘির আয় দ্বারা মসজিদটি আজো পরিচালিত হয়ে থাকে। মসজিদটির বর্তমান কালের (১৯৯৮) দৃশ্যের জন্য পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ২৩ দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৬ (১২) মাদারীপুর খাজা হাফিজুল্লাহ মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

ঢাকার নওয়াবগণ দেশে বিদেশে যতগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা করেছেন, তন্মধ্যে মাদারীপুরের জামে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা নির্মাণের কাজটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাদারীপুর শহরে তৎকালে যে একটি জীর্ণ-শীর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার মসজিদ ছিল, তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই ছোট। মসজিদটি মেরামত ও উন্নয়নের জন্য সমাজ সেবক এবং উক্ত মহকুমার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী মোহাম্মদ আজহার ২৬ জুন ১৮৮৪ খ্রীঃ শহরের মুসলিম বাসিন্দাদের নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় উক্ত মসজিদটি মেরামত ছাড়াও তথায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই মহৎ কাজটি সম্পাদন ও এজন্য চাঁদা সংগ্রহের জন্য ঐ অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সাধারণ কমিটি ও একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এই উভয় কমিটিতেই ঢাকার নওযাব খাজা আহসানুল্লাহর শশুর ও কার্তিকপুরের জমিদার জনাব কফিলউদ্দিন চৌধুরী সদস্য ছিলেন।[৯০]

কমিটি বহু চেষ্টা করে মাদারীপুর এলাকার জনগণ ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে মাত্র ৬০০ টাকা তুলতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে কমিটি ঢাকার বদান্যবর নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর নিকট এ কাজে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। নওয়াব সাহেব এর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে এগিয়ে আসেন এবং প্রথমবারেই ৪,৫০০ টাকা দান করেন।[৯১] নওয়াবের দানে উৎসাহিত হয়ে কমিটি পুরানো মসজিদটি সংস্কার না করে সেটা ভেংগে ফেলে নতুন করে নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ৬ আগষ্ট নতুন ও বৃহদায়তন মসজিদটির ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ শেষ দিকে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ ১৪ জানুয়ারী এক বিরাট জনসভা করে মসজিদটির উদ্বোধন করা হয়।[৯২]

মসজিদটি নির্মাণের পাশাপাশি মাদ্রাসার জন্য ৩৬ X ১৮ ফুট পরিমাপের একটি টিনের ঘর তৈরী করা হয়। মসজিদের পাকা ভবন তৈরীর আগেই মাদ্রাসাগৃহ তৈরীর কাজ ১৮৮৪ খ্রীঃ ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে একজন মৌলভীও একজন পন্ডিত নিয়োগ করে মকতব হিসেবে তা চালু করা হয়। মসজিদের উপরোক্ত উদ্বোধনীর দিনে মাদ্রাসারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়।[৯৩]

মাদারীপুর জামে মসজিদ ভবনের অবকাঠামো নির্মাণে প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ২৫০ টাকা দিয়ে টিনশেড ছাত্রাবাস ও মুয়াজ্জিনের বাসস্থান এবং কুমার নদীর তীরে মুসল্লিদের অজু গোছলের জন্য সিঁড়ি তৈরী করা হয়। মসজিদটি সজ্জিত করার জন্য ঝাড়বাতি, কার্পেট ইত্যাদি ক্রয়ের নিমিত্তে নওয়াব আহসানুল্লাহ আরো এক হাজার টাকা দান করেন।[৯৪] নওয়াবের মহানুভবতা ও বদান্যতার দরুন মসজিদ কমিটি তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মসজিদ কমিটির তরফ থেকে নওয়াবের মৃত পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর নামানুসারে মসজিদটির নামকরন করা হয় 'খাজা হাফিজুল্লাহ জামে মসজিদ'।[৯৫] খাজা হাফিজুল্লাহর নামটি একটি কালো পাথরে ফার্সী অক্ষরে লিখে মসজিদের প্রধান প্রবেশদ্বারের উপর স্থাপন করা হয়।

উক্ত মসজিদটি সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভী মোহাম্মদ আজহার সভাপতি; মোক্তার , মুনশী বশীর উদ্দিন আহমদ- সম্পাদক এবং নওয়াব আহসানুল্লাহর শশুর জমিদার কফিলুদ্দীন চৌধুরী একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটি তাঁদের কার্যবিবরণীর নকল নওয়াব আহসানুল্লাহর অবগতির জন্য নিয়মিত পাঠাতেন।[৯৬] মসজিদটি পরিচালনার জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ মাসিক ২৫ টাকা করে চাঁদা দিতেন।[৯৭] এছাড়া রমজান মাসে খতম তারাবীহ পড়ানো এবং রোজাদার মুসল্লীদের এফতারের জন্য পৃথকভাবে অর্থ দেয়া হতো। নওয়াবের দানের তালিকা থেকে একবার রমজান মাসের জন্য উক্ত মসজিদে ১০০ টাকা প্রদানের কথা জানা যায়।[৯৮] এছাড়াও উক্ত অর্থদানের তালিকা থেকে এ মসজিদের জন্য আরো দু'বার যথাক্রমে ১৫০০ টাকা এবং ২০০ টাকা দানের কথাও জানা যায়।[৯৯]

আগেই বর্ণিত হয়েছে মসজিদটি রক্ষণাবেক্ষণ করে স্থায়ীত্বদান ও সরব রাখার জন্য এর সাথে একটি মাদ্রাসাও নির্মাণ করা হয়। উক্ত মাদ্রাসা নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণেও নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রচুর অর্থদান করেছেন। উক্ত মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য নওয়াব সাহেব মাসিক ২৫ টাকা করে অর্থ সাহায্য দিতেন।[১০০] পরবর্তী অধ্যায়ে উক্ত মাদ্রাসার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬(১৩) নেত্রকোনা খাজা আহসানুল্লাহ মসজিদ নির্মাণ ঃ

নেত্রকোনা মহকুমা শহরে পূর্ব থেকেই একটি জীর্ণ-শীর্ণ মসজিদ ছিল। সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভগ্নদশায় পতিত হয়। স্থানীয় মুসলমানদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে নেত্রকোনার তৎকালীন মহকুমা প্রকাশক মৌলভী মোহাম্মদ আজহার মসজিদটির সংস্কার সাধন ও এর সাথে একটি মাদ্রাসা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে তিনি ১৮৯৭ খ্রীঃ ৬ মার্চ একটি কমিটি গঠন করে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। মৌঃ মোঃ আজহার নিজে ঐ কমিটির সভাপতি এবং মৌলভী তালাত্তাফ হোসেন বি. এ. (সাব রেজিস্ট্রার) সেক্রেটারী ছিলেন।[১০১] কমিটি চাঁদা আদায় এবং তা খরচের জন্য একটি নীতিমালাও নির্ধারণ করেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত ঢেউটিনের ছাউনি ও হোগলার বেড়া দিয়ে মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করতে সক্ষম হন। ১৮৯৯ খ্রীঃ মৌঃ মোঃ আজহার বালাশোরে বদলী হয়ে গেলেও মসজিদটি মোটামুটি চলতে থাকে। ১৮৯৭ খ্রীঃ থেকে ৪/৫ বছরে কমিটি মাত্র ৮০৮ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, যা'দ্বারা তাঁরা উপরোক্ত সংস্কার কার্যাদি করেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁদের কাজ স্থবিরতায় পর্যবসিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯০২ সালে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকার বদান্যবর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। নওয়াব সাহেব এজন্য তদন্ত করে সুপারিশ দেয়ার জন্য বিষয়টি নেত্রকোনার তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক বাবু নিখিল চন্দ্রের নিকট পাঠান।[১০২] নিখিল বাবুর সুপারিশ অনুযায়ী নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০২ সালের মে মাসে ৩৩৩০ টাকা উক্ত মসজিদের তহবিলে দান করেন।[১০৩]

নওয়াবের দানকৃত উক্ত অর্থে মসজিদের উন্নয়ন ও মাদ্রাসাগৃহ তৈরীসহ আনুসাংগিক পূর্ত কাজ করা হয়। এ সময় উক্ত নেত্রকোনা মসজিদের ভিত ও মেঝে পাকা করা হয়। মসজিদের চার দেয়ালে হোগলার বেড়ার পরিবর্তে কাঠের ফ্রেমের উপর ঢেউটিনের বেড়া তৈরী করা হয়। এছাড়া মসজিদের পূর্ব চত্বরে বিশুদ্ধ পানির জন্য একটি পাকা ইন্দারা তৈরী করা হয় এবং মসজিদের পার্শ্ববর্তী প্রধান রাস্তাটিতে একটি পাকা কালভার্ট তৈরী করা হয়। শেষে মসজিদের চারিদিক দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া দেয়া হয়।[১০৪]

মৌলভী মোহাম্মদ আজহার নেত্রকোনা থেকে বদলী হয়ে চলে যাওয়ার পর অর্থকষ্টে পতিত মসজিদটি শুধুমাত্র নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের বদান্যতার উপর নির্ভর করে চলতে থাকে। মসজিদ কমিটি নওয়াব বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর মরহুম পিতার নামে উক্ত মসজিদটির নামকরণ করেন 'খাজা আহসানুল্লাহ জামে মসজিদ।'[১০৫]

৬(১৪) অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থদান ঃ

উল্লেখিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ঢাকার নওয়াবগণ দেশে বিদেশে আরো বহু সংখ্যক ধর্মীয় ইমারত ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবগুলো দান কাজের তথ্য আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ধর্মপ্রাণেরা প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপনীয় দানকেই বেশী প্রাধান্য দেয় এবং নওয়াবদের দানের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নওয়াবদের অর্থ দানের পূর্বোক্ত তালিকাটি তৈরী করার সময় এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের পেশকৃত নোট থেকে জানা যায়, নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ বহুবার ব্যক্তিগতভাবে যেসব অর্থাদি দান করেছিলেন সেগুলোর হিসেব তাঁর জানা ছিলনা। তদুপরি ঋণ দেয়ার মাধ্যমেও বহু অর্থই নওয়াব সাহেব দান করেছিলেন এবং সেগুলো পরিশেষে শোধ করা থেকে ঋণগ্রহীতাকে তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন। অর্থদানের তালিকা তৈরীকালে সেগুলো তাই হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছিল।[১০৬] বিভিন্ন সূত্র ও উক্ত অর্থদানের তালিকা থেকে প্রাপ্ত তাঁদের এরূপ আরো কিছু ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ইমারত ও প্রতিষ্ঠানে অর্থদানের একটি তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অর্থদানের তালিকার ক্রমিক	দানকাজের বিবরণ	দানের পরিমাণ
০১।	২৫	কাশ্মীরে দরগাহ সংস্কার ও ভূমিকম্পে প্রপীড়িতদের জন্য	১৫,০০০/-
০২।	৭৪	রামচন্দ্রপুর মসজিদ ও ঘাটের জন্য	১০,০০০/-
০৩।	১০১	কলতাবাজার মসজিদ (ঢাকা) হুজুরা সংস্কারে	২০০/-
০৪।	১০৬	মগবাজার খানকার ঘর সংস্কারে	৩,০০০/-
০৫।	১০৯	ফতুল্লাহর মসজিদ সংস্কারে	৩০০/-
০৬।	১১০	সিলেটের একটি মসজিদ সংস্কারে	১,৩০৭/-
০৭।	১১৬,১৩২,১৪৮,	আজমীরের দরগাহ সংস্কারে (তিনবার)	১১০০+৫০০+২০০/-
০৮।	১২৮	বাবুপুরা দরগাহ (ঢাকা) সংস্কারে	১৬৬/-
০৯।	১৩০	কাজীবাগ দরগাহ (ঢাকা) সংস্কারে	২৪৯/-
১০।	১৩১	ধুবড়ীর একটি মসজিদ সংস্কারে	২০০/-
১১।	১৪০	বিবিকা রওজা (ঢাকা) সংস্কারে	২৩৫/-
১২।	১৫৫, ২৮৬	চান্দপুর মসজিদের জন্য (দুইবার)	১০০+৫০০০/-
১৩।	১৫৬	সেন্ট ভিন্সেন্ট চার্চের জন্য	৩০০/-
১৪।	১৬৬	ঢাকা নিউ চার্চের জন্য	২০০/-
১৫।	২০৩	বেগম বাজার মসজিদ (ঢাকা)	৫০০/-
১৬।	২০৫	খাজা আব্দুল হামিদ মসজিদ	৪,০০০/-
১৭।	২২৮	আলীগড় কলেজের মসজিদের জন্য	৫০০/-
১৮।	২৪০	মানিকগঞ্জের মসজিদের জন্য	৫০/-
১৯।	(১৯০২ সাল)	ঐ (মসজিদের জন্য)	১০০০/-
২০।	(১৯০৩ সনে)	কুমিল্লা কালেকটরেট সংগ্রগ্ন মসজিদ পুনঃ নির্মাণে	২০০/-
২১।	ঐ	পাঞ্জাবে একটি মসজিদ নির্মাণে	৫০০/-
২২।	ঐ	ধামরাই মসজিদ নির্মাণে	১,০০০/-
২৩।	১৯০৩ খ্রীঃ	নড়াইল (যশোর) একটি মসজিদ নির্মাণে	১০০/-
২৪।	১৯০৮, ১৯ সেপ্টেঃ,	আলীগড় মসজিদের জন্য চাঁদা প্রদান	৫০/-
২৫।		মুলতানে (পাকিস্তান) একটি সরাইখানা ও কূপ নির্মাণে (নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক দান)	৪,৫০০/-
২৬।		নওয়াব আব্দুল গণি কর্তৃক মক্কার জোবাইদা খাল সংস্কারে	৪০,০০০/-

আগেই বর্ণিত হয়েছে, নওয়াব পরিবারের মহিলারাও দান কাজে মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সময় মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে দান করতেন। ঢাকা শহরে বর্তমান সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেন্টারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মসজিদটি খুব পুরাতন ও জরা জীর্ণ ছিল। নওয়াব পরিবারের আতরবানু (আখতার বানু?) প্রচুর অর্থ ব্যয়ে উক্ত মসজিদটি পুনঃ নির্মাণ করে দেয়ায় মসজিদটিকে আতরবানু মসজিদ বলা হতো।[১০৯] নওয়াবজাদি আখতারবানু ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য কিছু ভূমিদান করেছিলেন বলে জানা যায়।[১১০]

এছাড়াও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাঁর পিতা নওয়াব আহসানুল্লাহর নামে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে একটি সুন্দর একতলা ভবন নির্মাণ করে দেন। উক্ত মিশন কমপ্লেক্স-এর আঙ্গিনায় দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় অবস্থিত উক্ত ভবনটি আজো বিদ্যমান। মিশনারীদের খাবার গৃহ হিসেবে এখন সেটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উক্ত ভবনের পশ্চিম বারান্দায় দেয়াল গাত্রে স্থাপিত একটি শিলালিপিতে ফার্সী ও বাংলা ভাষায় লেখা তথ্যে সেই বিদুষী নওয়াবজাদীর দানের কথা আজো ঘোষণা করছে। শিলালিপিটির একটি আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ২৪-এ দেয়া হলো। এতদ্ব্যতিত নওয়াবজাদি আখতার বানু ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের অদূরে তাঁর মায়ের নামে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে কামরুন্নেসা গালস্ হাই স্কুল তৈরী করেছিলেন। উক্ত স্কুলের পূর্ব আঙ্গিনায় খননকৃত পুকুরের পূর্বপাড়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সুন্দর মঠ তৈরী হয়েছিল। মঠটি এখনো সেখানে জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

অত্র অধ্যায়ে ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত, সংস্কারকৃত কিংবা পরিচালিত যে সব ধর্মীয় ইমারত ও প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচিত হলো- সেগুলো এদেশের মুসলমানদের সমাজ সংস্কৃতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ ধর্মীয় ব্যবস্থাদি সব সময়ই মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে থাকে। আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করেই আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃঃ ৭।

২। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ.৩২৭।

৩। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৩৩৮; দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ৯০ এবং ১৯৬ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিস* পৃঃ ১৮। মীর মুরাদ ১৭১৭ খ্রীঃ মারা যান বিধায় তাঁর পক্ষে মৃত্যুর ৭৫ বছর আগে এই ইমারতটি নির্মাণ করা স্বাভাবিক ছিল না বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। তিনি হয়তো ১৬৪২ খ্রীঃ অনেক পরে এখানে ছোট খাট ইমারত তৈরী করেন। দেখুন ঃ আ. কা. ম. জাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৪ পৃঃ ৪৫৫ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭।

৪। দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ১৯৭ এবং জাকারিয়া, *প্রত্নসম্পদ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫৫।

৫। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২০০ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* পৃঃ ১৮।

৬। চিত্রগুলি আদিতে ছোট কাটরা নিবাসী নওয়াব শায়েস্তা খাঁর জনৈক বংশধরের নিকট ছিল এবং মহররমের সময় বেচারাম দেউড়ীর এক কক্ষে ঝুলানো হতো-তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ২৯৮ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৮ আগস্ট ১৯০২ পৃঃ ৩।

৭। তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ২৯৮-৩০৫ এবং হাকিম, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৯৮ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* পৃঃ ২০ এবং দানী *ঢাকা,* পৃঃ ১৯৭।

৮-৯। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* ৩য় সংস্করণ পৃঃ ২৭০ এবং যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ৪১৮ এবং টেইলর, *টপোগ্রাফী,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৫৬।

১০-১১। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* ১ম খন্ড ১৩১৯ বাংলা পৃঃ ৪২১।

১২। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৬।

১৩। রতন লাল, *সিপাহীযুদ্ধ ও বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯।

১৩ (ক) ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ দানের তালিকা দ্রঃ।

১৪। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২০০-২০১ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৯ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* পৃঃ ১৯ এবং দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ১৯৬। মোসলেম ক্রনিকেল এই নির্মাণ ব্যয়ের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টাকা বলেছেন। (৫ নভেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ১০৬২) যা অতিরঞ্জিত হতে পারে। কারণ ঢাকাস্থ সমসাময়িক লেখক ও পত্রিকায় দানের পরিমান এক লক্ষ বলা হয়েছে, যা নওয়াবদের অর্থদানের তালিকাতেও সমর্থিত হয়েছে। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-২১৫ দ্রঃ।

১৫। মোসলেম ক্রনিকেল, *কলকাতা,* ৫ নভেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ১০৬২।

১৬। বর্তমানে সেখানে কেবল খোলা চত্বরের মধ্যে জীর্ণ সমাধি ফলকগুলো দেখা যায়।

১৭। *পুরাতন দলিলপত্র, ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬।

১৮। দি বেংগল টাইমস, ৫ মার্চ ১৯০২।

১৯। দি বেংগল টাইমস, ২৩ এপ্রিল ১৯০২।

২০। আবুয যোহা নূর আহমদ, *উনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন,* ফেব্রুঃ ১৯৭৫ পৃঃ ৮১।

২১। ঐ ব্যয়ানুমানের সাথে সেবারকার হোসেনী দালানের আলোকসজ্জার ব্যয়ও ধরা হয়েছিল। উক্ত গেটের ড্রয়িং এখনো আহসান মঞ্জিলে পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে। হোসেনী দালানের পুকুরের দক্ষিণ পূর্বকোনে নির্মিত উক্ত গেটটি বহুবার সংস্কার হলেও এর উভয় পাশের পিলার দুটোর বৈশিষ্ট্য এখনো উক্ত নক্শানুরূপ বিদ্যমান।

২২। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৫। তৈফুর সাহেব পাথরটি ১৫৭০ খ্রীঃ দিকে সংগৃহীত বলেছেন, তৈফুর *ঢাকা,* পৃঃ ৬৩, এবং ৩৪৬। তায়েশের অনুকরণে সৈয়দ আওলাদ হাসান বলেন, উক্ত পাথরটি দেওয়ান মনাওয়ার খাঁ ঢাকায় মোগল সুবাদারের নিকট খাজনা দিতে যাওয়ার পথে জনৈক বৃদ্ধ লোকের নিকট দেখতে পান এবং এর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে এখানে দরগাহ নির্মাণ করে দেন। তবে তাদের এ গল্পের বর্ণনা ঐতিহাসিকগণ গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২১৯ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* পৃঃ ৬০ এবং যতীন্দ্র মোহন রায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২২।

২৩-২৪। তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৬৩ এবং ৩৪৬ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ২১১ এবং আওলাদ হাসান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬১-৬২।

২৫। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৫ এবং জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২৭।

২৬-২৭। এখানে ইংরেজী সাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। আওলাদ হাসান বলেছেন-১৭৫৮ খ্রীঃ ঐ, এন্টিকুইটিজ পৃঃ ৬২ এবং *এ জেনারেল গাইড টু দা ঢাকা মিউজিয়াম, ঢাকা, ১৯৬৪ পৃঃ ৪৭।* তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ২২০-২১; তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৩৪৬-৪৭; দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ২৫৫। ঢাকার বাংলা বাজারের সংগতটোলা মহল্লায় জমিদার গোলাম নবীর আলীশান গেটওয়ে সহ বাড়ী ছিল-তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৩৪৭ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ১৪৬ এবং দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ৩২। শিলালিপিটি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত। সংগ্রহ নং -ই- ১২৭।

২৮। আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* পৃঃ ৬২, ঐ বৃদ্ধা পাথরটিকে বসার টুলরূপে ব্যবহার করতো।

২৯-৩০। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪।

৩১। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২১১।

৩২। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-১২১ দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। *ঐ*, দানের তালিকা, ক্রমিক নং-১৭১ এবং আগস্ট ১৮৯৬ তারিখে ঢাকা প্রকাশে দেয়া দানের তালিকা দ্রঃ।

৩৪। আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ*, পৃঃ ৬২।

৩৫। ডঃ মুহঃ এনামুল হক, *সুফিজম ইন বেংগল*- দ্রঃ

৩৬। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩০ ও ২৮০ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসদুগান*, পৃঃ ৮৭ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ৭৯ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ*, পৃঃ ৩৭-৩৮, দানী, *ঢাকা*, পৃঃ ২৬৩-৬৪ এবং যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৪।

৩৭। *ঐ ঐ*, প্রফেসর মামুন ভুলক্রমে জসরত খানের আমলে উল্লেখ করেছেন, মামুন, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৩।

৩৮-৩৯। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৪ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৮৮ এবং তায়েশ, প্রাগুক্ত এবং ২০৮ এবং আওলাদ হাসান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮ এবং জাকারিয়া, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩৪।

৪০। পূর্বোক্ত দানের তালিকার ক্রমিক নং-১০৮ দ্রঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬-তে প্রকাশিত দানের তালিকা দ্রঃ।

৪১-৪২। দানের তালিকা, ক্রমিক ১৪৫ এবং ১৬৮ এবং নওঃ আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৭-৮৮।

৪৩। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩৪।

৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ১ ডিসেঃ ১৯১২ পৃঃ ৪।

৪৫। তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ৬৭ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, পৃঃ ৬৩ এবং টেইলর, *টপোগ্রাফী*, বংগানুবাদ পৃঃ ৫৩।

৪৬। তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ২১৩ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ*, পৃঃ ৪০ এবং জাকারিয়া, *প্রত্ন সম্পদ*, পৃঃ ৪৬০ এবং মোঃ আলমগীর, *ঐতিহাসিক সাতমসজিদ*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৪ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯১ পৃঃ ৫২-৬১।

৪৭। আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ*, পৃঃ ৪১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, পৃঃ ২০৭। উল্লেখ্য যে, ১৮৪০ খ্রীঃ দিকে ডা'ওলি -এর আঁকা চিত্রে সাতমসজিদের জীর্ণদশা দেখা যায়। ডা'ওলি, *এন্টিকুইটিজ অব ঢাকা, লন্ডন ১৮২৪।* কিন্তু নওয়াব আহসানুল্লাহর সংস্কারের পর তোলা ও ব্রেডলি বার্ট এর গ্রন্থে দেয়া বিশ শতকের গোড়ার সময়কার ছবিতে মসজিদটিকে সুন্দর রূপে দেখা যায়।

৪৮। নওয়াব আহাসনুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৭-৮৮ উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *সুধী* পৃঃ ৫৫। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ১৬৭ এবং যতীন্দ্র, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত-১ম খন্ড ১৩১১ বাং, পৃঃ ৩৪৩।

৪৯। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, পৃঃ ২০৭।

৫০। অর্থদানের তালিকা, ক্রমিক নং-১৪৪ দ্রঃ।

৫১। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০ এবং মোঃ শামসুল হক, প্রাক মোগল ঢাকা, ঢাকা বিশ্বঃ পত্রিকা, ২৯ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৮৭ পৃঃ ১২৩।

৫২। হাকিম হাঃ রহমান, *আসদুগান*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৩৫।

৫৩। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, পৃঃ ১৩১। হাকিম হাঃ রহমান বটগাছের বদলে পিপল গাছের কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন-জ্বিন ভুতের ভয়ে লোকেরা এখানে রাতে আসতো না। (হাকিম হা. রহমান, *আসদুগান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪)।

৫৪-৫৫। হাকিম হা. রহমান, *আসদুগান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫।

৫৬। মসজিদটি নির্মাণে তত্বাবধায়কের (মনিপুরীরাজবংশীয় নও মুসলিম) মানসিকতার কারণেই সম্ভবত এর ছাদটি স্থানীয় কুঁড়ে ঘরের বৈশিষ্ট্যানুরূপ হয়েছিল।

৫৭। মোঃ আলমগীর, বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে গম্বুজ, সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, '৩৫ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর, *ঢাকা*, ১৯৯০ পৃঃ ১৭।

৫৮। অর্থ দানের তালিকা, প্রাগুক্ত, ক্রমিক নং-১১৯ ও ১২৯ দ্রঃ।

৫৯। হাকিম হা. রহমান, আসদুগান, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৩৪-৩৫।

৬০। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২২, ৩৩৬ এবং মীর্জা, নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়বী, খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫।

৬১। দানী, *ঢাকা*, পৃঃ ৬৪, ৭৬, ১৭৩ এবং *মোগল টুমস ইন ঢাকা*, আসমা সেরাজুদ্দিন, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৪ এবং ৩৪২।

৬২। ঐ আমলে এরূপ গম্বুজের বেশ প্রচলন ছিল। (হাকিম হা. রহমান, আসদুগান, পৃঃ ৪০) ঢাকায় এরূপ বাঙলো টাইপের আরো যেসব গম্বুজ ছিল, সেগুলো হলো-বিবি চম্পার সমাধি, লাড়ু বিবির সমাধি, সাত মসজিদ সমাধি, চুরিহাট্টা মসজিদ, প্রভৃতি।

৬৩। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৬ এবং জাকারিয়া, *প্রত্ন সম্পদ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৩-৬৪।

৬৪। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান*, পৃঃ ২৮৭-৮৮ থেকে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ, *মুসলিমসুধী*, পৃঃ ৫৫।

৬৫। হাকিম হা. রহমান, *আসদুগান*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৩৯।

৬৬। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৬, হাকিম, *আসদুগান*, পৃঃ ৩৯।

৬৭। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী* , প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৪ এবং জাকারিয়া, *প্রত্ন সম্পদ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৪।

৬৮। মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ৩০৯ এবং মোঃ আলমগীর, জাহাংগীর নগরে নবাব থেকে নায়েবে নাজিম, সচিত্র বাংলাদেশ, ১০ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৪ এপ্রিল ১৯৮৯ পৃঃ ২৬।

৬৯-৭০। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৭ এবং যতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ৩৪২।

৭১-৭২। দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৮ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, পৃঃ ১৯৫ এবং আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ*, পৃঃ ১১ এবং জাকারিয়া, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪৬।

৭৩। দানের তালিকার ক্রমিক নং-১০৭ এবং ২০২ দ্রঃ।

৭৪। *পুরানো দলিলপত্র*, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, প্রাগুক্ত ।

৭৫। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪২-৪৩ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী*, পৃঃ ৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৭৬। আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১-৪২ এবং জাকারিয়া, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৬।
৭৭। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ২০৫ এবং আওলাদ হাসান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১-৪২, দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২০-২১।
৭৮। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৪।
৭৯। জাকারিয়া, *প্রত্ন সম্পদ,* পৃঃ ৪৬৬।
৮০। হাকিম হা. রহমান, *আসদুগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২৯-৩১ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ২৮৭-৮৮ উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৫৫।
৮১। হাকিম ঐ পৃঃ ২৯-৩১ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৮১।
৮২। হাকিম হা. রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৯১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৫।
৮৩। হাকিম হা. রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৯১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৫।
৮৪। দানের তালিকা, প্রাগুক্ত, ক্রমিক নং- ২১৯। ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বারা তৈরী উক্ত তালিকায় সম্ভবত ভুলক্রমে শাহ মাসউদের দরগাহের বদলে শাহ মাকসুদের দরগাহ লেখা হয়েছে।
৮৫। হাকিম হা. রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৯১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৫।
৮৬। ভবনটিতে স্থাপিত শিলালিপি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য অত্র অধ্যায়ের শেষ পৃঃ ও অনুচ্ছেদ দ্রঃ।
৮৭। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৮৭ ক্রমিক ১৯০ এবং পৃঃ ১০৭ ক্রমিক ১৯২।
৮৮। আলোকচিত্রটি ঢাকার নওয়াব এস্টেট পুরানো অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে উদ্ধারকৃত এবং বর্তমানে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত।
৮৯। *লাইফ স্কেচ অব খান বাহাদুর মৌলভী মোঃ আজহার, ঢাকা ১৯১৮* খ্রীঃ বংগানুবাদ ও সম্পাদনা মোঃ ইলাহী বখশ' মুক্তিদূত' প্রথম মুদ্রণ, সেপ্টেঃ ১৯৮৮ পৃঃ ৫৯-৬২ (উল্লেখ্য-বইখানি সমকালীন ডেপুটি ম্যাজিঃ মৌলভী মোঃ আজহার (১৮৫৩-১৯২১ খ্রীঃ) -এর জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখিত একটি তথ্য বহুল গ্রন্থ যা সমসাময়িক প্রমাণ্য দলিলাদির উদ্ধৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ।
৯০। ঐ, ইলাহী বখশ, *'মুক্তিদূত'* প্রথম মুদ্রণ-সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৮৮ পৃঃ ৫৯-৬২)।
৯১। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগস্ট ১৮৮৪ পৃঃ ২৭২। ঢাকা প্রকাশ আরো লিখেছে-মসজিদটি নওয়াবের মৃত পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর নামে হবে এবং নওয়াব সাহেব মোতাওয়াল্লী হবেন।
৯২-৯৩। ইলাহী বখস, *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ১০।
৯৪। ঐ *মুক্তিদূত,* পৃঃ ৫২ এবং ৬৬ এবং নওয়াবদের অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং- ১৩৯।
৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগস্ট ১৮৮৪ পৃঃ ২৭২। খাজা হাফিজুল্লাহ-নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রথমা স্ত্রী ওয়াহিদুন্নেসার গর্ভজাত পুত্র এবং নওয়াব সলিমুল্লাহর বড় ভাই ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ জুলাই মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর স্মরণে ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে নির্মিত স্মৃতি স্তম্ভটি আজো বিদ্যমান। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫, পৃঃ ৫৪২।
৯৬। ঐ *মুক্তিদূত,* পৃঃ ৫১।
৯৭। অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত, ক্রমিক নং-৭৩ দ্রঃ।
৯৮। ঐ অর্থদানের তালিকা ক্রমিক নং-১২৭।
৯৯। ঐ তালিকার ক্রমিক নং-৭৩ এবং ১১২ দ্রঃ। উল্লেখ্য, মাদারীপুর গণপূর্ত বিভাগের ওভারশিয়র বাবু চুনীলাল নির্মাণ শেষে মসজিদটির পূর্তকাজ পরীক্ষা করে প্রশংসা করেন। ঐ, *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭-৬৮।
১০০। মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্টের কাছে দেয়া নওয়াবের পত্র দ্রঃ, ঐ মুক্তিদূত, পৃঃ ৬৬ এবং ঢাকা প্রকাশ ৮ জুলাই, ১৮৮০ পৃঃ ১০।
১০১-১০২। ৬ মার্চ ১৮৯৭ খ্রীঃ নেত্রকোনা মসজিদ কমিটির উদ্বোধনী সভার কার্যবিবরণী, উদ্ধৃত-ঐ ইলাহী বখশ, *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২-৭৫
১০৩। নওয়াবদের অর্থদানের প্রাগুক্ত তালিকায় ১৯০২ সালের দানের হিসাব দ্রঃ এবং *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫।
১০৪-১০৫। মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী মৌঃ তালাত্তাফ হোসেন কর্তৃক ১৫-৩-১৯০৫ তারিখে মৌঃ মোহাঃ আজহারের নিকট লিখিত পত্রের সারাংশ দ্রঃ উদ্ধৃত-ঐ *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬।
১০৬। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৩।
১০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ পৃঃ ৭।
১০৮। *পুরাতন দলিলপত্র,* আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত দ্রঃ।
১০৯। সম্ভবত মহিলার নামটি আক্তারবানু হবে, কারণ নওয়াবজাদী আক্তারবানুর এরূপ অনেক জনকল্যাণমুলক কাজের কথা জানা যায়। পক্ষান্তরে আতর বাবু নামে নওয়াব পরিবারে তেমন কারো কথা জানা যায় না। পাক আমলে জনৈক রেলওয়ে গার্ড পুনঃসংস্কার করায় বর্তমানে সেটা গার্ড সাহেব মসজিদ নামে পরিচিত। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৪।
১১০। সোনিয়া আমিন, শরীফ বিবিয়াঁ ভদ্র মহিলা জুলিখাবানুর সংস্কৃত পাঠ, দৈনিক সংবাদ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৪ এবং অনুপম হায়াত, *মেহেরবানু খানম,* ১৯৯৭ পৃঃ ৪৮।
১১১। ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, প্রেমানন্দ প্রেম কথা, ৩ সংস্করণ, কলকাতা ১৩৯৫ পৃঃ ১৭৮ শিলালিপিটির আলোকচিত্র প্রাপ্তিতে সহায়তা দানের জন্য লেখক ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মিন্টু মহারাজের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নওয়াবদের শিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী

৭ (১) ঢাকার নওয়াবদের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ধারা ঃ

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগে অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলিমরা ধর্মবিরোধী-বিজাতীয় শিক্ষা ভেবে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকতো। কিন্তু ঢাকার নওয়াবগণ নিজেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ঢাকা শহর ব্যতীত দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[১] দেশের বাইরেও বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা প্রচুর অর্থদান করেছেন। নওয়াব এস্টেট থেকে বৃত্তি নিয়ে সেকালে বহু ছাত্র দেশে বিদেশে লেখাপড়া করতো।[২]

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করাই ছিল ঢাকার নওয়াবদের শিক্ষাদর্শ। এজন্য একদিকে তাঁরা যেমন মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যদিকে স্কুল-কলেজ স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকালে নওয়াব আব্দুল গণি এ্যাংলো এ্যারাবিক ধরণের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাই চিন্তা করেছিলেন। যার ফলে উক্ত মাদ্রাসায় অতি সহজেই ইংরেজি বিভাগ খোলা সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্যে আধুনিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু শুরু থেকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানে আরবী-ফার্সী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাখার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহসহ খাজা পরিবারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন।[৩] আদিতে খাজা পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হতো তা জানা যায়নি। তবে ঢাকায় এ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী আব্দুল্লাহ ও তাঁর পুত্র পীর খাজা আহসানুল্লাহ এবং খাজা হাফিজুল্লাহ উভয়েই বিজ্ঞ আলেম ছিলেন, একথা জানা যায়।[৪] আগেই বর্ণিত হয়েছে, খাজা আলীমুল্লাহই প্রথম স্বধর্মীদের ইউরোপীয় বিমুখনীতি পরিহার করে খাজা পরিবারে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চালচলনের প্রবর্তন করেন।[৫] খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর পুত্র খাজা আব্দুল গণিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে (১৮৩৫ খ্রীঃ) ভর্তি করেছিলেন।[৬] অতপর অঢেল বৈভব ও নওয়াবী সম্মান অর্জিত হলে তৎকালীন ভারতীয় বিত্তশালী ও কুলীনদের ন্যায় খাজা পরিবারের ছেলেদের গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশুনার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এক্ষেত্রে তাঁদের জন্য একদিকে যেমন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য আরবী-ফার্সী জানা উস্তাদ থাকতো, অন্যদিকে তেমন ইংরেজি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য ইউরোপীয় শিক্ষকও নিয়োগ করা হতো।[৭] নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ও নওয়াব সলিমুল্লাহ অনুরূপ গৃহ শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া করেছিলেন। তাঁদের সমসমায়িক কালে খাজা পরিবারের অন্যান্য সন্তানেরাও শ্রেণীমত এস্টেট থেকে দেয়া ভাতায় তাঁদের গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যার্জন করতো কিংবা নওয়াবদের পারিবারিক মক্তবে পড়তো। একারণেই ঐ যুগে নওয়াব পরিবারে ডিগ্রীধারী উচ্চ শিক্ষিত লোকের নাম পাওয়া যায় না।

নওয়াব সলিমুল্লাহ খাজা পরিবারের গৃহশিক্ষক প্রথা অতিক্রম করে তাঁর পুত্রদের ইংরেজি স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর দুই পুত্র খাজা হাবিবুল্লাহ এবং খাজা আবদুল গণি ছোটবেলায় দার্জিলিং-এ সেন্ট পল-এর স্কুলে পড়াশুনা করতেন।[৮] ঢাকার নওয়াব পরিবারে সর্বপ্রথম উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাগিনা খাজা নাজিমুদ্দিন। পরবর্তীকালে তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর, পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল এবং দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি আলীগড় কলেজ এবং লন্ডনের ডানস্টাবল গ্রামার স্কুলে অধ্যয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি হল থেকে এম. এ. এবং মিডল টেম্পল থেকে ১৯২০ সালে ব্যারিস্টারী পাশ করেন।[৯] নওয়াব পরিবারের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট ছিলেন নওয়াব আহসানুল্লাহর দৌহিত্রী (পরী বানুর কন্যা) জুলেখা বানু। চিত্র নং ২৫ দ্রঃ। তিনি ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে ভাল নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পাশ করেন।[১০]

নওয়াব আব্দুল গণি, নওয়াব আহসানুল্লাহ ও নওয়াব সলিমুল্লাহ এদেশে জনশিক্ষা বিস্তারে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। ঢাকাসহ এদেশে তাঁদের জমিদারি এলাকাগুলোতে তাঁরা অনেকগুলো স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ন্যায় মুসলিম শিক্ষা বিস্তারেও নওয়াব সলিমুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য তিনি একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার করে এদেশের মুসলমানদের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে দেশীয় ইংরেজি স্কুলগুলোতে মুসলিমদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুসলিম শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টা চালান। তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষার একজন বড় প্রবক্তা ছিলেন।

৭ (২) শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আব্দুল গণি ঃ

জনশিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আব্দুল গণি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[১১] ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলীগড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবগণ বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের শিক্ষান্নোতির বিষয়েও তাঁদের দরদ কম ছিলনা। ১৮৭২ খ্রীঃ আলীগড় কলেজের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ নওয়াব আব্দুল গণিকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। উক্ত পত্রের উত্তরে নওয়াব আব্দুল গণি লিখেছিলেন, 'বাংলার অধিবাসীরা প্রায়শই অন্য স্থানের অধিবাসীদের দুঃখ দৈন্যে সাড়া দিয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে আসছে। অথচ বাংলাদেশের দুঃখ কষ্টে অন্য অঞ্চলের লোকেরা সাড়া দিচ্ছে না। আলীগড় কলেজে সাহায্য দিলে তাতে ঢাকার লোকেরা তো উপকৃত হবে না।"[১২] ঐ একই পত্রে নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদকে আরো লিখেছিলেন যে, আমার পুত্র আহসানুল্লাহ এখন সবকিছু যথাযথ ও সন্তুষ্টির সাথে সম্পাদন করছে। সেও আপনার মতই শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে একজন বড় সমর্থক। সে এই ঢাকা শহর ছাড়াও অন্যান্য জেলা এবং শহরে বহু স্কুল ও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।[১৩]

সমসাময়িক কালের লেখক লোকনাথ ঘোষ নওয়াব আব্দুল গণির শিক্ষা বিষয়ক অবদানের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "His contribution towards the extention of education in the Districts of Dacca, Maimensing and Backergonj have been munificient." [১৪] ঐ একই প্রসংগে মিঃ ব্রেডলী বার্ট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন- "Keenly appreciating music and poetry, He was a laberal patron of the acts and everything that tended to the spread of modern education among the Muhammadan Community, received his warm support." [১৫] আগেই বর্ণিত হয়েছে , জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নর্থব্রুক হলে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনে নওয়াব আব্দুল গণি সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ তিনি উক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রায় সাত শত খন্ড বই তাতে দান করেন।[১৬] তিনি বহু সংখ্যক বই কিনে নিজ প্রাসাদ ভবন আহসান মঞ্জিলের দোতলায় একটি কক্ষে আলমারীতে সাজিয়ে ব্যক্তিগত লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।১৯০৪ সালে ফ্রিৎজকাপ-এর তোলা আলোকচিত্র থেকে আহসান মঞ্জিলের উক্ত লাইব্রেরীর ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। পরিশিষ্টে (চিত্র নং ২৬) উক্ত লাইব্রেরী কক্ষের একটি ছবি দেয়া হলো। নওয়াবদের ঐ বইগুলোর অধিকাংশের আজ কোন হদিস নেই। তবে আহসান মঞ্জিল যাদুঘর প্রতিষ্ঠার সময় নওয়াব এস্টেটের পুরানো অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে প্রায় বার শত জীর্ণ বই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বইগুলো এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের সংশ্লিষ্ট কক্ষে ফ্রিৎজকাপের চিত্রের অনুরূপ আলমারী ও অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরী করে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ইংরেজি ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রিত বইগুলোর মধ্যে উপন্যাস, ক্রীড়া, ঘোড়দৌড়, শিকার, আইন ও আইন সভার কার্যবিবরণী প্রভৃতি বিষয়ক বই রয়েছে।[১৭] নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর বৈঠকখানা ও এস্টেটের অফিসার কর্মচারীদের জন্য সমকালীন বিভিন্ন ধরণের বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় করতেন। তাঁর জমিদারিতে নিয়োজিত কর্মচারী ও কাচারী সমূহের জন্য তিনি বহু সংখ্যক ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা ক্রয় করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ক্রয় করে তিনি কর্মচারীদের সন্তুষ্টি বিধানের সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে জ্ঞান চর্চায় সহায়তা করতেন।[১৮] খাজা আব্দুল গণি ঢাকার প্রথম সংবাদ পত্র সাপ্তাহিক ঢাকা নিউজ (এপ্রিল ১৮৫৬)-এর একজন সত্ত্বাধিকারী ছিলেন।[১৯]

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বিনা খরচে বিদ্যা শিক্ষা দানের জন্য তিনি কুমারটুলীতে একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি নওয়াব সলিমুল্লাহর আমল পর্যন্ত চালু ছিল।[২০] ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাতে নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকার মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। তিনি নিজ তহবিল থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে উক্ত মাদ্রাসার জন্য জমি কিনে দেন।[২১] নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবগণ হাজার হাজার টাকা দান করেছেন। তাই ঢাকাইয়া কুট্টিদের অনুগত করে রাখার প্রয়োজনে তাঁদেরকে লেখাপড়া থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে কামরুদ্দিন আহমদের বরাত দিয়ে প্রফেসর মামুন যে তথ্য দিয়েছেন, সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।[২২] পরবর্তী আলোচনা থেকে বুঝা যাবে যে, ঢাকার নওয়াবগণ এদেশে শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টার ক্রুটি করেননি।

৭(২) শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আহসানুল্লাহ ঃ

জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে একজন বিদ্বান ও উঁচুদরের সাহিত্যক ছিলেন। উর্দূ-ফার্সীতে তাঁর যেমন অগাধ পান্ডিত্য ছিল, তেমনি ইংরেজি ভাষায়ও তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এতই ভাল ইংরেজি জানতেন যে, আড়াল থেকে তাঁর কথা শুনে মনে হতো কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ সাহেব কথা বলছেন।[২৩] নওয়াব আব্দুল গণির প্রতিষ্ঠিত ফ্রি হাই স্কুলের ছাত্রদের পড়াশুনা উন্নয়নের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে প্রতি সোমবার উক্ত স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের পড়াশুনা পরীক্ষা করতেন।[২৪] ঢাকা মাদ্রাসার উন্নয়নে নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রচুর অর্থদান করেন। উক্ত মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে নওয়াব আহসানুল্লাহ এর প্রতিটি কর্মকান্ডে স্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন।[২৫]

এদেশের ছাত্রদের বাস্তব, কর্মোপযোগী ও কারিগরী শিক্ষা দেয়ার মানসে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নির্মাণার্থে নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রয়োজনীয় অর্থ দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু বরণ করায় তিনি উক্ত অর্থ হস্তান্তর করে যেতে পারেননি। তাঁর পুত্র নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০২ সালে এ জন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা সরকারের হাতে প্রদান করেন।[২৬] নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর মৃত পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর নামে মাদারীপুরে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণে প্রায় যাবতীয় খরচ বহন করেন। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য বাৎসরিক প্রায় যাবতীয় খরচাদি বহন করতেন।[২৭] নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায় দেশে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রচুর অর্থ দান করেছেন।[২৮]

আগেই বর্ণিত হয়েছে জনসাধারণের হিত সাধনে ঢাকা মাদ্রাসার সুপার মৌঃ উবায়দুল্লাহ উবায়দী 'সমাজ সম্মিলনী' নামে যে সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, নওয়াব আহসানুল্লাহ তাতে তিনশত টাকা সাহায্য দেন এবং এর পৃষ্ঠপোষক হন।[২৯] এই সমিতির সূত্র ধরে ঢাকার নব্য তরুণগন ১৮৮৩ খ্রীঃ 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' নামে একটি জন-

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তপুর বাসিনী স্ত্রীলোকদের শিক্ষাদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করতো।[৩০] নওয়াব আহসানুল্লাহ সৈয়দ আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের একজন আজীবন সদস্য ছিলেন। ঐ এসোসিয়েশন ১৮৮২ সালে মুসলিম ছাত্রদের জন্য রিপন বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে ফান্ড সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাতে ৩ হাজার টাকা দান করেন।[৩১] ঢাকার খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব মিঃ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮৭০ খ্রীঃ ঢাকায় ' অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ ৩০ টাকা দান করেছিলেন।[৩২] মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে নওয়াব আঃ লতিফ ১৮৬৩ খ্রীঃ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি গঠন করেন। উক্ত সোসাইটির একজন সদস্য হিসেবে নওয়াব আহসানুল্লাহ আঃ লতিফের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ও পত্র দ্বারা যোগাযোগ রাখতেন এবং সর্বপ্রকার আর্থিক সহায়তা দিতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখা ব্যক্তিগত পত্র থেকে জানা যায় ১৮৬৫ খ্রীঃ তিনি একটি পত্রের সাথে উক্ত সমিতির জন্য অনুদান বাবদ ২০০ টাকা নওয়াব আঃ লতিফকে পাঠিয়েছিলেন।[৩৩] নারী শিক্ষার জন্যও নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রচুর অর্থ দান করেছেন। ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ১০০০ টাকা এবং ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ১০০০ টাকা দান করেছিলেন।[৩৪] মুসলমান ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার না থাকায় কলকাতার প্রভাবশালী ডাঃ জহিরুদ্দিন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। ঐ ঘটনার দেড় মাস পর কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ১০মে ১৮৯৬ খ্রীঃ ব্যারিস্টার ই. এ. খোন্দকারের বাসায় একটি সভা করে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকার নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ১ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী লেডী ম্যাকেঞ্জী ঐ বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন।[৩৫]

তৎকালে মুসলমান সমাজে শিক্ষা গ্রহণে জায়গীয় প্রথা প্রচলিত ছিল। অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজগৃহে ছাত্রদের রেখে তাদের ভরনপোষন চালাতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নাগরিক জীবনে ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের ফলে ঐ ছাত্রপোষন প্রথা উঠে যেতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে নওয়াব আঃ লতিফ ও মুসলিম নেতারা মোহসীন ফান্ডের অনুকূলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণের পরামর্শ দেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এরূপ অনেক ছাত্রাবাস গড়ে উঠে। ঢাকাতেও মিঃ ফুলারের নামে ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ ছাত্রাবাস নির্মাণে ১৮৯৮ খ্রীঃ ভূমি দান করেছিলেন।[৩৬]

৭ (৪) মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঃ —

আলীগড়ের সৈয়দ আহমদ খাঁর ন্যায় নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ রাজনীতির চেয়ে মুসলিমদের শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে রাজনীতিই তাঁর জীবনে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ শিক্ষা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্মজীবনের গোড়াতেই গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকার মুসলিম মহল্লাসমূহে নৈশ স্কুল স্থাপন করেন।[৩৭] নওয়াবী পদে আসীন হবার পর পরই তিনি তাঁর মরহুম পিতার প্রতিশ্রুত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের হাতে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা তুলে দেন। এছাড়া তাঁর পিতামহের প্রতিষ্ঠিত আব্দুল গণি হাই স্কুল এবং ঢাকা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে যারা ঐ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হতে পারতো তাঁদের অন্তত ৪ জনকে তিনি বৃত্তি প্রদান করতেন।[৩৮]

অনাথ আশ্রয়হীন ছেলেমেয়েদের লালন করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৯ সালে যে এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে আশ্রয় প্রাপ্ত এতিমদেরকেও তিনি নিজ ব্যয়ে লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন।[৩৯] নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের পূর্বেই নওয়াব সলিমুল্লাহ শিক্ষামন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করার কর্মসূচী গ্রহন করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, তখনো মুসলিম সমাজে হিন্দুদের ন্যায় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেনী গড়ে উঠেনি। তখন উচ্চবিত্তসম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরাই ব্রিটিশ আনুগত্য বজায় রেখে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ এতদাঞ্চলের মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেনীর লোকদের সংগঠিত করে স্যার সৈয়দ আহমদের প্রতিষ্ঠিত *'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'* এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯০৬ সালে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল নওয়াবের শাহবাগ বাগান বাড়ীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী যথাক্রমে এ সমিতির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[৪০] শিক্ষা সমিতির উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নওয়াব সলিমুল্লাহ। নতুন প্রদেশের প্রতিটি জেলা এবং পশ্চিম বংগ থেকেও গন্যমান্য লোকসহ এতে প্রায় ৫ হাজার সুধী যোগ দেন।[৪১]

সভায় ২০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার, সরকারী ও বেসরকারী দানে ঢাকায় একটি মোহামেডান হল প্রতিষ্ঠা, প্রাইমারী স্কুলে পাঠ্যভুক্ত বাংলা বইটি ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের উপযোগী নয় বলে বিকল্প পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এবং স্বদেশীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মুসলিম মনীষীদের উৎসাহ দান ছিল অন্যতম। এছাড়া আরবী, ফারসী ও অন্যান্য ভাষার মান সম্পন্ন পুস্তক থেকে মুসলমানী বাংলায় অনুদিত গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন, স্কুলে কৃষক সন্তানদের জন্য উপযোগী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে নতুন প্রদেশের অর্থ বন্টনের আবেদন প্রভৃতি সিদ্ধান্তগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য।[৪২]

উল্লেখ্য, এ শিক্ষা সমিতির পিছনে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। এর ফলে সমিতির উত্থাপিত বেশ কয়েকটি শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হয়। এ সমিতি নতুন প্রদেশের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষা চেতনা সঞ্চার ও শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কংগ্রেসীদের সৃষ্ট অরাজকতার মধ্যেও প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। ১৯১১ খ্রীঃ ১২ ডিসেম্বর বংগবিভাগ রহিত হবার পূর্ব পর্যন্ত নতুন প্রদেশে এর ৪টি অধিবেশন হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত প্রথম অধিবেশন ছাড়াও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশন যথাক্রমে ১৯০৮ খ্রীঃ ময়মনসিংহে, ১৯১০ খ্রীঃ বগুড়ায় এবং ১৯১১ খ্রীঃ রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৪৩] নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে শিক্ষা সমিতির চতুর্থ অধিবেশন ১৯১১ খ্রীঃ ১৫ ও ১৬ এপ্রিল রংপুরে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক যোগ দেন। ১৬ এপ্রিল সমিতির সেক্রেটারী নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহর অনুপস্থিতিতে তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি তার বার্তা পড়ে শোনান। নওয়াব বাহাদুর উক্ত তার বার্তায় শিক্ষা সমিতির প্রচেষ্টায় শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য দানে উৎসাহিত করেন। সমিতির প্রস্তাবানুসারে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমিতির চেষ্টা ও সরকারের সাহায্যে অনেকগুলো মুসলিম হোস্টেল স্থাপিত হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এছাড়া মোহসীন ফান্ড থেকে আরো অর্থ আদায়ের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করার জন্য তিনি মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৪৪]

বংগ বিভাগ রদের পর নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯১৪ খ্রীঃ ১১ ও ১২ এপ্রিল ঢাকার রমনা প্রেস ভবনে যুক্ত বাংলার প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ছয়শত প্রতিনিধি ও দর্শক সমবেত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী।[৪৫] নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বলেন, 'কোন প্রতিবাদের আশংকা না করে বলা যায়-ঢাকা কনফারেন্সের নগরী। এখানে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম সভা হয়। এখানে পুর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম সভা হয়েছিল। আজ আবার যুক্ত বংগের সভা হচ্ছে।[৪৬] আমাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য এরূপ সমিতিতে শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্নে পরস্পর ভাব বিনিময় একান্ত আবশ্যক। স্বাস্থ্যহানির কারণে দুই বছর পূর্বে আমি জনসাধারণের কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের দুর্দশা দেখে নীরব থাকতে পারলাম না। আমার ক্ষুদ্র শক্তি আমার পরম প্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগ করবো। পূর্ব ও পশ্চিম বংগ এক হয়েছে তাই আমাদের আর পৃথক থাকা উচিত নয়। উভয় বংগের মুসলমানদের স্বার্থকে একীভূত করার জন্য ঢাকায় আমি এই কনফারেন্স আহবান করেছি।

আধুনিক শিক্ষার প্রতি আমাদের উদাসীনতা দূর হয়ে গত কয়েক বছরে শিক্ষার প্রতি আমাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। গত নয় বছরে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ৫০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার শিক্ষা খাতে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, তার সুবিধা গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থবহ ও উন্নত করার জন্য বিশেষ বিবেচনায় রচিত মাদ্রাসা সংস্কার স্কীমটি বাস্তবায়ন করা কর্তব্য। কারণ স্থানাভাবে স্কুল কলেজে আমাদের ছাত্ররা প্রবেশাধিকার পায় না। এ বিষয়ে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করবো। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সভ্য বৃদ্ধি করা দরকার। স্থানীয় শিক্ষা বিষয়ক অভিযোগ কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে উত্থাপনের জন্য জেলায় জেলায় সমিতির শাখা স্থাপন আবশ্যক। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে একটি জাতীয় ধনভান্ডার স্থাপনের প্রস্তাব আমি বহু আগেই করেছিলাম, এখন সেটার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য প্রাইমারী অথবা মধ্যবাংলা পর্যন্ত শিক্ষাই যথেষ্ট। তাদেরকে পেশাগত শিক্ষা যেমন ঃ উন্নত ধরনের কৃষি কাজ শিক্ষা দেয়া উচিত। যাতে তাঁরা আরো অধিক ফসল ফলাতে পারে।'[৪৭] নওয়াব সলিমুল্লাহ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি দেশ ও জাতির তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গতানুগতিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার চেয়ে যুগোপযোগী আধুনিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি ভাবতেন মুসলিমরা যদি তাঁদের পূর্ব পুরুষদের পশ্চাৎপদতা পরিহার করে আধুনিক জ্ঞানের গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে, তবে তাঁরা কালচক্রের গতিধারার সাথে পিষে যেতে বাধ্য।[৪৮] নওয়াব বাহাদুর আরো বলতেন, আজকাল বহু সংখ্যক সার্টিফিকেটধারী বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকায় চাকুরীর চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। বর্তমানে স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের দৈনন্দিন ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। ছাত্ররা রাত দুপুর পর্যন্ত বাতির তেল পুড়িয়ে রোম-গ্রীসের যেসব ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য চষে বেড়ায়, বাস্তব জীবনে তা তাদের কোন কাজেই আসে না। অন্য দিকে যদি তাঁরা নথিপত্র লেখা কিংবা কারিগরী জ্ঞান অর্জন করতে পারতো, তবে চাকুরীর জন্য প্রভাবশালীদের দ্বারে দ্বারে না ঘুরে জীবিকার্জনের একটা পথ পেয়ে যেতো।[৪৯]

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা লক্ষ্য করে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলতেন, কোন শিক্ষাই ধর্ম বিরোধী নয়। ইংরেজী শিক্ষায় যদি ধর্মের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তবে শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিই এজন্য দায়ী। এজন্য শিক্ষা পদ্ধতিকে ইসলাম সম্মত করতে হবে।[৫০] শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের ইসলামী বিশ্বাস ও কায়দায় চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাঠ্যসূচীতে এমন বই রাখতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নাস্তিক্য থেকে রক্ষা পায়। আবাসিক স্কুল স্থাপন করে হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রদের কচিমনে ইসলামী ধ্যান ধারণার আলো বিস্তার করতে হবে। ধর্মভীরু আলেমদের নিয়োগ করে ছেলেবেলায়ই শিক্ষার্থীদের ইসলামী চাল-চলন ও নামাজ-রোজা শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। কারণ বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত নিয়মাধীনে ছাত্রদের এসব বিষয়ে শিক্ষা করা কষ্টকর। তিনি দুঃখ করে বলতেন, এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে-আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মুসলমানই নামাজ পড়তে জানেন না এবং শিক্ষার ইচ্ছাও পোষণ করেন না। কিন্তু ইসলামের নির্দেশানুসারেই তো মুসলমানদের জীবনের উন্নতি হওয়া উচিত। উচ্চ শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলতেন, তাঁদেরকে ইসলামী বিষয়াদি ও ইসলামীদর্শন অধ্যয়ন করা উচিত। ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ ছিলেন প্রগতিবাদী। আলীগড় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নকে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি দেয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, রাজনৈতিক বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও ছাত্রদের সভা-সমিতির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে দেয়া উচিত। এতে করে তাঁদের ধর্ম সংক্রান্ত ভ্রমাত্মক ধারণা সংশোধন হতে সহায়ক হবে।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববংগ প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি তথা নওয়াব সলিমুল্লাহর শিক্ষাক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো এদেশে রিফরমড মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা। এ সমিতির নেতৃবৃন্দ জানতেন মুসলিমরা ধর্মবিবর্জিত শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন। তাই তাঁরা নিছক লোকায়ত শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁরা ধর্ম শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় চেয়েছিলেন। এজন্য নওয়াব সলিমুল্লাহর আয়োজিত ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনেই তাঁরা 'মিডল মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৫৩] নবগঠিত প্রদেশের লেঃ গভঃ স্যার ব্যমফিল্ড ফুলার মুসলিমদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। মিডল ইংলিশ স্কুলের পাশাপাশি মিডল মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তন করে ঐ প্রাদেশিক সরকার মুসলমানদের সাধারণ শিক্ষাকে অনেকদূর এগিয়ে দেন। মিডল মাদ্রাসায় আরবী, ফার্সী, উর্দু, তথা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী, ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। লোকায়ত ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে প্রবর্তিত এসব মিডল মাদ্রাসার প্রতি ধর্মভীরু মুসলিমদের কোন অনীহা ছিল না বলে তাঁরাও আধুনিক শিক্ষার প্রতি ধাবিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে হাইস্কুলে ভর্তি হতে পারতো।[৫৪]

মিডল মাদ্রাসা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিভাগে। ১৯০৭ খ্রীঃ ৩০ মার্চ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এরূপ ১৬টি মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬০০। ১৯১১ খ্রীঃ মিডল মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে হয় ৫১টি, ছাত্র সংখ্যা হয় ৬৮৫৯, তম্মধ্যে ৫৫৭১ জনই ছিল মুসলিম। এই মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি আরো বাস্তবমুখী ও যুগোপোযোগী করে তোলার জন্য সরকার একটি স্কীম হাতে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯১৫ খ্রীঃ সরকারীভবে রিফরমড নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তিত হয় এবং মিডল মাদ্রাসার প্রায় সবগুলোই জুনিয়র কিংবা হাই মাদ্রাসায় পরিণত হয়।[৫৫]

বংগদেশে 'রিফরমড নিউ স্কীম মাদ্রাসা' শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছিল। নবগঠিত প্রদেশে মুসলিম নেতৃবৃন্দ দেখলেন, ইংরেজ সরকারের প্রচলিত লোকায়ত শিক্ষার প্রতি সাধারণ মুসলমানেরা ঝুঁকছেনা। আবার যুগের অনুপযোগী মাদ্রাসা শিক্ষা তাদের বাস্তব জীবনে তেমন কোন কাজে আসছে না। ওদিকে হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করে চাকুরী ও বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় আয়োজিত প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনেই নওয়াব সলিমুল্লাহ শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার কথা বর্ণনা করে বলেন, 'এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জার বিষয় যে, আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের বিশেষ করে এই প্রদেশের মুসলমানগণ খুবই পিছিয়ে আছে। অতীতে আমাদের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ভাবতেন আরবী-ফারসীর মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেই কেবল প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্ভব। তাঁরা ভাবতেন পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁদেরকে জাতিচ্যুত করবে। কিন্তু তাঁদের ঐ নীতি বর্তমান প্রজন্মের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আধুনিক চিন্তাধারা বর্জনের কারণে মুসলিমরা জীবন চলার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। এজন্য তাঁদেরকে আরো উন্নততর ও আধুনিক মতবাদ অনুসরণ বিশেষ প্রয়োজন'।[৫৬]

এমতাবস্থায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে 'রিফরমড মাদ্রাসা' প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনেই মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ সময় ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট, মওলানা আবু নসর মোঃ ওহীদ-কে সেক্রেটারী করে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। লেঃ গভর্নর মিঃ ফুলারের নির্দেশে মওলানা ওহীদ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং ১৯০৮ সালে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।[৫৭] ১৯০৭ সালে পূর্ববংগ ও পশ্চিমবংগের গভর্ণরদ্বয়ের উদ্যোগে বংগের জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক মিঃ আর্কডেল-এর নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারকল্পে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে পশ্চিম বংগ থেকে ৩৪ জন এবং পূর্ববংগ থেকে ১০ জন সদস্য ছিলেন। নতুন প্রদেশ গঠিত হবার পরেও পূর্ববংগের মাদ্রাসাসমূহ কলকাতাস্থ বংগীয় মাদ্রাসা বোর্ডের অধিনেই পরিচালিত হতো। তাই সকলের

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধার্থে উক্ত কমিটির সভাগুলো কলকাতাতেই বসতো। ১৯০৮ সালে এরূপ এক সভায় ইংরেজী শিক্ষা বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই প্রদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতোবিরোধ ঘটে। পূর্ববংগের প্রতিনিধিদের মাদ্রাসায় ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করার দাবী পশ্চিম বংগের প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে নাকচ করে দেয়। যদিও মাদ্রাসায় পড়া মোট ছাত্র সংখ্যার ৫ ভাগের ৪ ভাগই ছিল পূর্ববংগ থেকে আগত। এমতাবস্থায় কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববংগের প্রতিনিধিগণ স্বাধীনভাবে নিজ প্রদেশেই মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[৫৮]

১৯০৮ খ্রীঃ ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ববংগ জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালককে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের অনুরোধ করা হয়। তদানুসারে ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে জনশিক্ষা পরিচালক মিঃ হেনরি শারপ, তাঁর নেতৃত্বাধীনে নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, মওলানা আবু নসর ওহীদকে প্রধান সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করেন।[৫৯] কমিটির উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করা। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলা এবং ছাত্রদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে আধুনিক শিক্ষিতদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে সহায়তা করা। হেনরী শারপ এ পরিকল্পনাকে উপমহাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। তিনি মওলানা ওহীদ-কে ভারতের খ্যাতিমান আলেমগণ ও প্রধান প্রধান মুসলিম সমিতির মতামত গ্রহণের পরামর্শ দেন।[৬০] মওলনা ওহীদ লখনৌ, দেওবন্দ, রামপুর প্রভৃতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিমত নেন। ১৯১০ খ্রীঃ মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা সংস্কার কমিটির সভায় এতদসংক্রান্ত রিপোর্টটি চূড়ান্ত হলে তা জনশিক্ষা পরিচালকের কাছে পেশ করা হয়। হেনরি শারপ ১৯১০ সালে আগস্ট মাসে দুটি প্রাইভেট মদ্রাসায় স্কীমটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন।[৬১]

১৯১১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রস্তাবিত মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারকে কার্যে পরিণত করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।[৬২] বংগ বিভাগ রদের পর নওয়াব সলিমুল্লাহ ২০ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর নিকট ৮টি দাবী সম্বলিত যে পত্র দেন তাতেও তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবীটি তুলে ধরেন।[৬৩] ১৯১৪ খ্রীঃ ১১ ও ১২ এপ্রিল ঢাকার রমনায় আয়োজিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির ৫ম অধিবেশনে নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত শিক্ষা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনটি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।[৬৪] বংগবিভাগ রদ এবং অন্যান্য কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশটি বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। শেষ পর্যন্ত যুক্তবংগীয় সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠিত ন্যাথান কমিটিকে এ বিষয়ে মতামত দিতে অনুরোধ করে। ন্যাথান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৪ খ্রীঃ সরকার মাদ্রাসা সংস্কার কমিটির রিপোর্টটি কিছুটা রদ বদলসহ অনুমোদন করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ কলকাতা মাদ্রাসা ছাড়া বংগের সব সরকারী মাদ্রাসায় এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। অনেক প্রাইভেট মাদ্রাসাও তা গ্রহণ করে।[৬৫] উল্লিখিত ভাবে রিফরমড মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এর রিপোর্ট প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত নওয়াব সলিমুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মাদ্রাসায় পড়ুয়া মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ যেমন মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তেমনি তিনি মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরীর প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্যে শিক্ষা দানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় সেখানে আরবী ফারসী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন। যাতে করে রিফরমড মাদ্রাসা পাশ ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেন।[৬৭] তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ক সাব কমিটির একজন অন্যতম প্রধান ও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। উক্ত সাব কমিটি স্কুল-মাদ্রাসা থেকে শুরু করে আই. এ, বি. এ. (পাশ ও অনার্স) এবং এম. এ. ক্লাশ পর্যন্ত পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী প্রস্তুত করেন।[৬৮]

নওয়াব সলিমুল্লাহ শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। ছাত্ররা যাতে শৃংখলাবদ্ধভাবে থাকতে পারে, তাদের চরিত্র যাতে সুন্দর ও সুষমামন্ডিত হয়, সেজন্য তিনি আলীগড় কলেজ হোস্টেলের ন্যায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রাবাস নির্মাণের উপর জোর দেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে তিনি বলেন, 'আমাদেরকে আলীগড়ের মডেলে হল প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যেখানে ছাত্ররা ঐসব হলে নিয়মানুবর্তীতার মাঝে থেকে শিষ্টাচার শিখবে যা প্রতিটি যুবকের চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ জরুরী।"[৬৯] উক্ত অধিবেশনে আলীগড়ের অনুকরণে ঢাকায় একটি 'মোহামেডান হল' নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ব্যয়ানুমান প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১,৮৬,৯০০ টাকা এবং নওয়াব আলী চৌধুরী ৩৫,০০০ টাকা দানের কথা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন।[৭০] বাকী অর্থ চাঁদা তুলে এবং সরকারের নিকট থেকে যোগাড়ের লক্ষ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৭১] উল্লেখ্য, বরিশালের বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং পরিচালনায় নওয়াব সলিমুল্লাহ হেমায়েত উদ্দিনকে অর্থ দেয়াসহ সর্বোতভাবে সাহায্য করেন।[৭২]

স্কুল কলেজের আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতার আরেকটি কারণ হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহ সেখানে ইসলামী ভাবধারা বিরোধী পরিবেশ চিহ্নিত করেন।[৭৩] নাস্তিক প্রভাবিত স্কুল-কলেজ গুলোকে শয়তানের কারখানা আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে অনৈসলামিক পাঠ্যসূচী ও হিন্দু-গরিষ্ঠ শিক্ষক মন্ডলীর কারণেই মুসলিম অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের তথায় পাঠাতে উৎসাহ পায় না।[৭৪] অমুসলিমদের সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা ভাষা মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার অন্তরায় দেখে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলেছিলেন, বাংলাদেশের শহুরে মুসলমান ছেলেপেলেরা সাধারণত উর্দুতে কথা বলে, আর গ্রামাঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা বলে মুসলমানী বাংলা। সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষার সাথে এর কোন মিল নেই বলে হিন্দু শিক্ষাগুরুদের ভাষা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়'।[৭৫] এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তিনি পর্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। তাঁর এই প্রচেষ্টায় অনেক মুসলিম শিক্ষক নিযুক্ত হয়। এমনকি দেশে যথেষ্ট শিক্ষক না পাওয়ায় পূর্ববংগের জনশিক্ষা পরিচালক অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম শিক্ষকদের নিকট থেকে চাকরীর দরখাস্ত আহ্বান করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে এরূপ অনেক মুসলিম শিক্ষকের দরখাস্ত সংগ্রহ করে তাঁদের চাকুরীর ব্যবস্থা করেন।[৭৬] তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ব বংগের প্রাদেশিক সরকারও অফিস-আদালতে কোন পদ শূন্য হলে মুসলমান সমিতিকে তা অবহিত করতেন এবং সমিতি উপযুক্ত মুসলিম প্রার্থী খুঁজে ঐ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতো।[৭৭] মুসলিম শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মুসলিম পরিদর্শকের অভাবের কারণটি উপলব্ধি করে নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অধিক সংখ্যক শিক্ষকের সাথে মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগেরও দাবী জানান।[৭৮] ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধিগণ ঢাকা সফররত বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাট তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ছাড়াও মুসলিমদের শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগেরও প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে বড় লাটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মিঃ টেইলর নামক এক সাহেবকে মুসলিমদের শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। এজন্য ১৯১৪ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৭৯] পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকার প্রত্যেক জেলায় মুসলিম সংখ্যানুপাতে মুসলিম সাব-ইন্সপেকটর এবং সরকারী হাইস্কুলে অন্তত ৩৩% মুসলিম শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ জারী করে।[৮০] এ নির্দেশ খুবই ফলপ্রসু হয় এবং এ প্রদেশে মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বংগবিভাগকে সমর্থন দিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ নতুন প্রদেশের উন্নয়নমুলক নীতি নির্ধারণে কার্যত সরকারের একজন বেসরকারী উপদেষ্টার মর্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছিলেন।[৮১] তাই তাঁর প্রচেষ্টা ও পরামর্শে ইংরেজ সরকার এদেশে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ অতিদ্রুত ও নিশ্চিন্তে গ্রহন করতে পেরেছিলেন।[৮২]

স্যার সৈয়দ আহমদ উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। কিন্তু নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকা শহরের মহল্লায় মহল্লায় তাঁর নৈশস্কুল স্থাপনের কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯১১ খ্রীঃ বড়লাট আইন সভায় বাধ্যতামূলক ফ্রী প্রাইমারী শিক্ষা বিল পেশ করলে তিনি তার প্রশংসা করেন। এছাড়া নওয়াব সলিমুল্লাহ ৩ মার্চ ১৯১২ খ্রীঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভায় সভাপতির ভাষণে ঐ বিলটির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[৮৩] উল্লেখ্য যে, নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাগিনা খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালে ঢাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৯ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়ে এ দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাসের চেষ্টা করেন এবং ১৯৩০ সালে তা পাশ হয়।[৮৪]

১৯০৬ সালের ১৪ জুন হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলিমুল্লাহর শিক্ষানুরাগ ও জাতীয় দরদ ফুটে উঠে। তিনি বলেছিলেন. 'আমাদের অনেক ইবাদতখানা ও মসজিদ আছে। বড় বড় শহরে প্রতি আধা মাইলে একটি করে মসজিদ আছে যা আমাদের ধর্মকর্মের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এখন জরুরী প্রয়োজন হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং তাতে ছোট বড় সবাই হবে লাভবান। যদি কেউ ভাল কাজ করতে চায় তবে তাঁকে এখন শিক্ষার জন্য সাহায্য করা উচিত। আমাদের সমাজে পুরানো ধ্যান ধারণার লোকেরা এমন কাজে হাজার টাকা দান করেন, যাতে শিক্ষারত দরিদ্রের কোন কাজে আসে না। সমাজের প্রয়োজনে একটু চিন্তা করে তাঁদের এ ভুল শুধরানো উচিত'।[৮৫] নওয়াব সলিমুল্লাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে অজস্র দান করেছেন। ১৯০৩ সালে তিনি কুমিল্লার নবীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ১ হাজার টাকা এবং মুরাদনগর স্কুলের জন্য ১০৭৫ টাকা দান করেন।[৮৬] এছাড়া ১৯০৪ সালে তিনি ময়মনসিংহের মুসলমান বোর্ডিং-এর জন্য ১ হাজার টাকা দান করেন।[৮৭]

নওয়াব সলিমুল্লাহ নারী শিক্ষারও একজন প্রবক্তা ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ তিনি পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে নারী শিক্ষার উন্নতি কামনা করে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমি দেখতে পাই আমাদের নারীরা দুঃখজনকভাবে এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তবে সুখের বিষয় এই জটিল বিষয়টির দিকে সরকার বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। শিশুরা তাদের মায়ের কাছেই প্রথম শিক্ষা পায় এবং মায়েরা সহজেই তাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। আমরা আশা করবো জনগণ সরকারের দেয়া এই নারী শিক্ষার সুযোগটি গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হবেন'।[৮৮] ১৯০৮ সালে পূর্ববংগ ও আসাম সরকার, নারী শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তাতে নওয়াব সলিমুল্লাহ একজন সদস্য ছিলেন।[৮৯]

প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকল্পে পূর্ববংগ ও আসাম সরকার কর্তৃক রবার্ট ন্যাথান-এর নেতৃত্বে ফিমেল এডুকেশনাল কমিটি গঠন করা হয়।[৯০] এ কমিটিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী সদস্য ছিলেন। কমিটির পেশকৃত প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করেন।[৯১] এ কমিটির অধিনে ঐ বছরই 'সাব কমিটি ফর মোহামেডান ফিমেল এডুকেশন' কমিটি গঠিত হয়। এ সাব কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী হন যথাক্রমে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী। এ কমিটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এ কমিটির চেষ্টায় নারী শিক্ষার প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০৮-১২ সালের কুইন-কুইনাল রিপোর্টে জনশিক্ষা পরিচালক সেটা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকারও করেন। মুসলমান সমাজে কিভাবে নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারে এবং এর পাঠ্যপুস্তকই বা কিরূপ হওয়া উচিত এসব বিষয়ে উক্ত সাব-কমিটি বিবেচনা করে। সাব-কমিটি শহরের বালিকা-

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় গুলোর সুবন্দোবস্ত করতে এবং মধ্য বাঙলা, মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রভৃতির শিক্ষয়ত্রীর সংখ্যা ও তাঁদের বেতনাদির বিষয়ে মন্তব্য প্রদান করে। এ সাব-কমিটি ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, সরকারী ব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি বিষয়েও বিবেচনা করেন। এ সাব-কমিটি ঢাকা ইডেন স্কুলের (১৮৭৮) মুসলমান বালিকাদের জন্য ঐ স্কুল সংলগ্ন একটি হোস্টেল নির্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। রংপুর ও কুমিল্লার বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করাও কর্তব্য মনে করেন। মুসলমানদের সামাজিক পর্দা প্রথা রক্ষা করে যাতে বালিকারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পেতে পারে এবং ইচ্ছা করলে উর্দু-ফার্সী ইত্যাদি শিক্ষা করতে পারে, সাব কমিটি সে ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করেন। ভারত সরকার সেসব সুপারিশ সমর্থনও করেন।[৯২]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীর চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষা অবকাঠামোর আমূল সংস্কারের প্রয়োজনিয়তা বৃটিশ সরকার অনুভব করে। এজন্য গঠিত উক্ত নারী শিক্ষা কমিটি ১৯০৯, ১৯১০ ও ১৯১১ সালে আলোচনায় বসে। উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে সিমলা সম্মেলনে 'মুসলিম নারী শিক্ষা' বিষয়ে নানা ধরণের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯০৫ সালে বংগবিভাগের দরুন সরকারের শুরু করা এই কার্যক্রম ব্যাপক বেড়ে যায়। সরকার তখন বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন মক্তব-পাঠশালাকে যথাসম্ভব ধর্মনিরপেক্ষ করে এবং অনেক নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। পূর্ব বংগ ও আসাম নিয়ে নবগঠিত প্রদেশে নওয়াব সলিমুল্লাহ, জনশিক্ষা পরিচালককে (ডি.পি.আই) এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁরা নারী শিক্ষার উন্নতি সাধনে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। এ কাজের জন্যই পূর্বোক্ত নারী শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়।[৯৩]

ব্যক্তিগতভাবে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের স্কুলে পাঠাতে পেরেছিলেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। তবে তিনি নারী শিক্ষার বিরোধী নয় বরং পক্ষেই ছিলেন সেটা তাঁর উক্ত কার্যকলাপ থেকেই পরিস্কার হয়ে যায়। তাই নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর ন্যায় নওয়াব সলিমুল্লাহ নারী শিক্ষার বিষয়ে নীরব ছিলেন বলে জনাব আঃ কুদ্দুস ও শরিফা খাতুন যে তথ্য দিয়েছেন তা সত্য নয়।[৯৪] এছাড়া জনৈকা জোবায়দা খাতুন মুসলিম মেয়ে হয়ে ১৯০৭ সালে ঢাকা ইডেন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, এ জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বলে তিনি যে তথ্য দিয়েছেন,[৯৫] নওয়াবদের উক্ত কার্যকলাপের আলোকে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। মুসলিম নারী শিক্ষার ব্যাপারে নওয়াব সলিমুল্লাহর ফুপা খাজা মোহাম্মদ আজগরও [৯৬] যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল ঢাকার শাহবাগে 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির' অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনিয়তার কথাটি জোরালোভাবে তুলে ধরেন।[৯৭]

৭(৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব পরিবারের অবদান ঃ

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববংগের ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার জোয়ার আসে। বিশেষ করে এতদাঞ্চলের মুসলিম ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এর আগে সুদূর কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান থাকায় পূর্ববাংলার অনেকেই সেখানে গিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পেত না। এছাড়া হিন্দু ও খ্রীষ্টান আধিপত্যে তৈরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অঞ্চলের মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেরা তেমন পাত্তাও পেতনা। উল্লিখিত কারণে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠা ছিল পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ও আর্শীবাদস্বরূপ। কিন্তু ঢাকার নওয়াব ও পূর্ববংগের মুসলিম নেতারা স্যার সৈয়দ আহমদের পরিকল্পিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করতেন। এজন্য ১৯১২ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দেয়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ততটা চেষ্টা না করে আলীগড়ের প্রতিই বেশী মনোযোগী ছিলেন।[৯৮]

বংগবিভাগ কার্যকরী হবার পর এতদাঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দের করো কারো মনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাগৃত হয়। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে বংগ বিভাগের ফলে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার স্কুল-কলেজে মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা সংস্কারের ফলে সেখানকার ছাত্রদের পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সব কারণে আগের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উপযুক্ত মুসলিম ছাত্র সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়।

১৯০৬ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগে' 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতির' বিংশতি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে উক্ত সমিতির অনারারী জয়েন্ট সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খাঁ সর্বপ্রথম ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনিতার কথা ব্যক্ত করেন।[৯৯] তাঁর প্রস্তাবের দীর্ঘদিন পর ১৯১০ খ্রীঃ ৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় রায় বাহাদুর আনন্দ মোহন নাহা, ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেন।[১০০] তদুত্তরে পূর্ববংগ জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক মিঃ হেনরী শারপ বলেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে। কিন্তু ঢাকা এখনো স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী হয়েছে বলে মনে হয়না। এবং তিনি প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন।[১০১]

নতুন প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে সরকার প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষাস্তরে অধিকতর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়া সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোতে ৮% আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করেন। বৃহৎ মাদ্রাসাগুলোর জন্য সরকারের অনুদান বৃদ্ধি করেন এবং দু'টি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়কে বিশেষ সাহায্য দেন। এছাড়া সর্বত্র বেশী করে হোস্টেল নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।[১০২] মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে সরকার ঢাকায় একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জনশিক্ষা ও পরিদর্শন দপ্তরের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধিমালা এবং সরকারী নীতির সম্মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী ও অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী কলেজগুলোর ভৌতসুযোগ ও শিক্ষকদের গুণগত মানের উন্নতি করা হয়। ফলে ১৯১১ সালের শেষ নাগাদ নতুন পূর্ববাংলা প্রদেশের পাঁচটি বিভাগের সব কটিতে সরকারী কলেজ দেখা যায়-যার চারটিতেই স্নাতক পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি ছিল।[১০৩] প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় আলোচ্য যুগে উচ্চ শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ঝোঁকটা ছিল লক্ষ্যনীয়। ১৯০৬-৭ সালে পূর্ব বাংলা ও আসামে স্নাতকদের মধ্যে যেখানে শতকরা ২.৪ জন ছিল মুসলমান সেখানে ১৯১১-১২ সালে তা হয়েছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ।[১০৪] মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখিত শিক্ষাগ্রহ ও সুযোগ সুবিধা তাঁদের নেতাদেরকে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ লিখেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তানায়কদের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ একজন অন্যতম অগ্রদূত ও পথিকৃত ছিলেন। ১৯০৫ সালে বংগবিভাগের পর থেকেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকরের উপর বিভিন্নভাবে চাপ দিয়ে আসছিলেন।"[১০৫] পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের লেঃ গভর্নর স্যার ল্যান্সলট হেয়ার-কে বিদায় এবং স্যার স্টুয়ার্ট বেইলীকে স্বাগত জানানোর জন্য ১৯ আগস্ট ১৯১১ খ্রীঃ সকাল ৮.৩০ মিঃ কার্জন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রদেশের নওয়াব, রাজা, মহারাজা, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ, উচ্চ রাজ-কর্মচারীগণ এবং ঢাকা কলেজের ছাত্রবৃন্দ নিমন্ত্রিত হয়ে হল ঘরটি একেবারে পরিপুর্ণ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, বিদায়ী ছোট লাট হেয়ারকে যে অভিনন্দনপত্র দেয়, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। মুসলমান সমিতির উক্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ।[১০৬] উক্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে ছোট লাট হেয়ার সাহেব বলেন, "এ প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীও

Dhaka University Institutional Repository

আপনারা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের এই ইচ্ছার প্রতি মনোযোগ দেয়া হবে। কিন্তু স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ঠ টাকা ব্যয় করা দরকার। আমার মনে হয় আপনারা সত্বর বিশ্ববিদ্যালয় পাবেন না।'[১০৭] এছাড়া ঐ অভিনন্দন পত্রে ঢাকায় হাইকোর্ট স্থাপনের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ছোট লাট বাহাদুর বলেন, "আমি আপনাদের এই প্রস্তাব সমর্থন করি এবং আমার বিশ্বাস এটাই অধিকাংশ লোকের মত। এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ট লোকের প্রতিনিধিবর্গ যে পরিস্কার করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা অর্থব্যঞ্জক।'[১০৮] বিদায়ী ছোট লাট মিঃ হেয়ার উক্ত মন্তব্য করলেও মুসলিম নেতৃবৃন্দের উল্লিখিত দাবীর প্রেক্ষিতে নতুন ছোট লাট স্যার স্টুয়ার্ট বেইলী ১৯১১ খ্রীঃ ২৮ অক্টোবর ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য বড় লাট হার্ডিঞ্জের নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।[১০৯] কিন্তু বড়লাট তখন ঐ প্রস্তাবে সাড়া দেন নি।

বংগবিভাগ কার্যকর হবার ফলে পুর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক বিকাশ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে ১৯১১ খ্রীঃ ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বংগবিভাগ রদের ঘোষনা দেন। এ ঘোষনার ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানগণ বিশেষ করে তাদের অবিসংবাদিত নেতা নওয়াব সলিমুল্লাহ ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। তাঁর এই মনোক্ষোভ কোন দিনই প্রশমিত হয়নি।[১১০] দিল্লীর দরবারে বংগবিভাগ রদের কথা আঁচ করতে পেরে নওয়াব সলিমুল্লাহ নানা অজুহাত দেখিয়ে তাতে যোগ দিতে চান নি। কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জের পক্ষে বড়লাট ব্যক্তিগত পত্র দিয়ে তাঁকে দরবারে যোগ দিতে বাধ্য করেন।[১১১] সেই দরবারে নওয়াব সলিমুল্লাহকে জি. সি.আই. ই. খেতাব দেয়া হয়। তিনি বাধ্য হয়ে ঐ খেতাব গ্রহণ করলেও তখন বলেছিলেন, "আজ আপনারা যে সুতা দ্বারা আমার কণ্ঠে উপাধিভূষণ সংযোজিত করেছেন, সেটা কালে আমার জন্য ফাঁসির রজ্জু হবে।"[১১২] সাইমন কমিটির নিকট দেয়া একটি নোটে ডঃ স্যার আব্দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, বংগবিভাগ রদের ফলে বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির দূর্গবলে খ্যাত নওয়াব সলিমুল্লাহর বিশাল হৃদয় ভেংগে চুরমার হয়ে যায়। দিল্লীর দরবারে খেতাব পাওয়ার দিনে তিনি মনের যন্ত্রনায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "A bait a Bribe and Halter of disgrace round my neck."[১১৩] তাঁর পুত্র নওয়াবজাদা খাজা আহসানুল্লাহ লিখেছেন, 'তিনি এই ব্যাজ কখনো পরিধান করেননি। ঢাকায় ফিরে তিনি সেটা ফেলে রাখেন।"[১১৪]

বংগবিভাগ রদের পর নওয়াব সলিমুল্লাহ অন্যান্য বিষয়গুলোর সাথে পূর্ববাংলার শিক্ষান্নোতির বিষয়েও ভীষনভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি ১৯১১ খ্রীঃ ২০ ডিসেম্বর বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ৮টি দাবী সম্বলিত যে পত্র দেন, তাতে শিক্ষা বিষয়ক দাবীগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ঐ দাবীগুলো ছিল-(১) পূর্ববাংলার মুসলমানদের শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য একজন যুগ্মপরিচালক নিয়োগ করতে হবে। (২) মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা খাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।[১১৫] এছাড়া পূর্ববাংলার অভাব অভিযোগ পেশ করার জন্য এখানকার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বড় লাটের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার দাবীও ছিল উক্ত পত্রের অন্যতম দিক।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই আবেদনের সুযোগ নিয়ে ১৯১২ খ্রীঃ ২৯জানুয়ারী ঢাকা সফরে এসে এখানে তিনদিন অবস্থান করেন। ৩১ জানুয়ারী সকাল ১১.০০ টায় নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বড় লাটের সাথে স্বাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি মানপত্র দেন।[১১৬] তাঁরা কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে পূর্ববংগের মুসলিমদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। মানপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হয়নি বললেই চলে। তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেন যে, বংগবিভাগ রদের ফলে তাঁদের শিক্ষান্নোতির ধারাবাহিকতা হয়তো বিঘ্নিত হয়ে।[১১৭] বংগ বিভাগ রদজনিত ক্ষতি পূরণের জন্য এবং মুসলমানদের প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বেষ পোষণের পরিপ্রেক্ষিতে[১১৮] প্রফেসর আঃ রহিম উল্লখ করেছেন, প্রতিনিধি দল ঐদিন ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বড়লাটের কাছে জোরালো দাবী উত্থাপন করেছিলেন।[১১৯] ১৯২১ সালে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশের পক্ষে দেয় ভাষনে নওয়াবজাদা খাজা মোহাম্মদ আফজাল বলেছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুরোধে সাড়া দিয়েই ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা দিয়েছিলেন।[১২০] যাহোক মুসলমান প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবের জবাবে বড় লাট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পূর্ববংগের জন্য একজন স্পেশাল শিক্ষা অফিসার নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন।[১২১] নওয়াব সলিমুল্লাহ তথা মুসলমানদের ক্ষোভ ও আশংকাকে প্রশমিত করাই ছিল উক্ত ঘোষনার অন্যতম উদ্দেশ্য। বংগবিভাগ প্রত্যাহারে পূর্ববংগের মুসলিমদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুদানরূপে পেশ করেন।[১২২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে মুসলমানেরা বংগবিভাগ প্রত্যাহারের ক্ষতিপূরণ মনে করে নয় বরং শিক্ষালাভের সোপান বিবেচনা করেই স্বাগত জানায়। তাঁরা এর বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে থাকেন। অন্যদিকে হিন্দুরা এর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগেন। যদিও হিন্দু প্রতিনিধি দলের কাছে বড়লাট হার্ডিঞ্জ পরিস্কার করে বলেছিলেন যে, প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে ছাত্রাবাস সম্বলিত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং এর জন্য কোন সীমা নির্দেশ করা হবেনা।[১২৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দ খুব সম্ভব সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুণ এর বিরোধিতা করেন । কারণ এর মাধ্যমে পুর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উঠলে, চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হবার সম্ভাবনা ছিল।

৩১ জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ মুসলিম প্রতিনিধি দলের কাছে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেও সম্ভবত হিন্দুদের বিরোধিতার কথা ভেবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কেউই তা প্রকাশ করেননি।[১২৪] ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ সকাল ৮ টায় ঢাকার সূত্রাপুরে পন্ডিত মাধবচন্দ্রের সংস্কৃতটোলে পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তৃতাকালে ছোট লাট বেইলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ করেন।[১২৫] উক্ত তথ্য প্রকাশের সাথে সাথেই হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে এর বিরোধিতার যাবতীয় প্রস্তুতি চলতে থাকে। তাঁদের বিরুদ্ধাচারণের অজুহাত ছিল প্রধানত দুই প্রকারের। কোন কোন সভায় পূর্ববাংলাবাসীরা চাষাভুষা, দরিদ্র ও অশিক্ষিত বিধায় এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক বলা হয়। আবার কোন কোন সভায় বলা হয়, এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারা তথা এদেশের শিক্ষার মানের ক্ষতি হবে। ফলে মেধার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে ভাষা ও দেশের আভ্যন্তরিন বিভাগ সাধিত হবে। তারা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে, ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপ্রয়োজনিয়তার কথা তুলে ধরেন।[১২৬] কংগ্রেস সমর্থিত কিছু মুসলিমও তাদের সুরে সুর মিলায়।[১২৭]

নওয়াব সলিমুল্লাহ ছিলেন পূর্ববাংলার শিক্ষান্নোতির জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় তিনি বংগবিভাগ রদজনিত নিরাশার অন্ধকারেও তাঁর স্বপ্নে দেখা পূর্ববাংলার কিছুটা আভা দেখতে পান এবং এ ঘোষণাকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানান। হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার মুখেও নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং তাঁর সহযোগী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালান। বড়লাট কর্তৃক ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেয়ার পর নওয়াব সলিমুল্লাহ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেটা বাস্তবায়নে যে কি পরিমাণ উৎকন্ঠিত ও চেষ্টিত ছিলেন, তা ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিস থেকে প্রাপ্ত দুস্প্রাপ্য তিনটি পত্র থেকে পরিস্কার বুঝা যায়। পত্রগুলো উক্ত ঘোষনার পর পরই সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী কর্তৃক কলকাতা থেকে ঢাকায় নওয়াব সলিমুল্লাহকে লেখা হয়েছিল। পরিশিষ্ট নং ১৫, পৃঃ নং ৪২৯তে পত্রগুলো উদ্ধৃত করা হলো।[১২৮] উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে নওয়াব সলিমুল্লাহর পরই ছিল সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা। হিন্দুদের বিরোধিতার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে নওয়াব আলী চৌধুরী তাৎক্ষনিকভাবে কলকাতায় গমন করেন। সেখানে তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহকে ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ একটি পত্র দেন। উক্ত পত্রে তিনি বলেন, নওয়াব সলিমুল্লাহ যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

বড়লাটের ঘোষণাকে সমর্থন করার জন্য ভারতবর্ষের সব মুসলিম আঞ্জুমানকে তারবার্তা পাঠান। এছাড়া মফস্বলের আঞ্জুমানগুলো যেন কালক্ষেপন না করে বড়লাটকে উক্ত ঘোষনার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। অধিকন্তু প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষামূলক ও আবাসিক হয় তাঁরা যেন এরূপ আবেদনও করেন। উক্ত পত্রে নওয়াব আলী চৌধুরী আরো জানান যে মাননীয় আগা খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবকে অকুন্ঠভাবে সমর্থন করে এর পক্ষে উল্লিখিত কাজ করতে বলেছেন। তিনি তাঁকে দেয়া আগাখানের অনুরূপ পরামর্শ সম্বলিত পত্রের একটি অনুলিপি নওয়াব সলিমুল্লাহকে প্রেরণ করেন।[১২৯] উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকা থেকে নওয়াব আলী চৌধুরীকে একটি তার বার্তা প্রেরণ করেণ। ১২ ফেব্রুয়ারী নওয়াব আলী চৌধুরী পুনরায় নওয়াব সলিমুল্লাহকে পত্র লেখেন। তাতে তিনি বলেন, পত্রিকান্তরে বিরুদ্ধবাদীদের কথা প্রায়ই বের হলেও আমাদের কোন সমিতির সমর্থনের কথা বের হচ্ছেনা। কোন কোন প্রাদেশিক লীগের সদস্যরা আগে ঢাকায় আমরা এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেই, সেদিকে তাকিয়ে আছে। পত্রে তিনি আরো জানান যে, কলকাতায় অনুষ্ঠিত বেংগল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কার্যনির্বাহী) সভায় এমন কয়েকজনও আছেন, যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। তিনি এবং জনাব শামছুল হুদা বিশেষভাবে প্রতিবাদ না করলে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিত। এসব বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার জন্য বেংগল মুসলিম লীগের সাধারণ সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বার লাইব্রেরীতে জনৈক মুসলিম উকিল আব্দুল ওয়াজেদ বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন জানতে পেরে, নওয়াব আলী চৌধুরী খুবই আশ্চর্য হন। উক্ত পত্রে তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহকে তার উপর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের দলে আনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[১৩০]

১৯১২ সনের ৩-৪ মার্চ কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ৫ম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সকলের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপকারিতার বিষয়টি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেন।[১৩১] উক্ত অধিবেশনে ভাষণদানরত নওয়াব সলিমুল্লাহর একটি কল্পিত চিত্র পরিশিষ্ট চিত্র নং ২৬ তে দেয়া হলো। নওয়াব সলিমুল্লাহর দেয়া উক্ত ভাষণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু পরিশিষ্ট নং ১৬ পৃঃ৪৩১তে উদ্ধৃত করা হলো। ১৯১২ সালের ২৭ মে বেংগল গভর্ণমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কীম রচনার জন্য রবার্ট ন্যাথানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। ন্যাথান কমিটির সুপারিশে বলা হয়, প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিক্ষামূলক ও আবাসিক ধরনের এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে শুধু ঢাকা শহরের কলেজগুলো। ন্যাথান কমিটি ২৪ টি স্পেশাল সাব কমিটির সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।[১৩২] ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের সাব কমিটিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে, ঐ সাব কমিটি স্কুল-মাদ্রাসা থেকে শুরু করে আই.এ., বি.এ.(পাশ-অনার্স) এবং এম. এ. পর্যন্ত পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী প্রস্তুত করেন।[১৩৩]

১৯১২ সালেই ন্যাথান কমিটির রিপোর্ট দাখিল হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। ইতোমধ্যে ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারী নওয়াব সলিমুল্লাহর ইন্তেকালের মাধ্যমে এ নিয়ে সর্বোচ্চ সোচ্চারকারীর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৯১৭ সালে নওয়াব আলী চৌধুরী ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাটি উত্থাপন করেন। উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের খসড়া প্রস্তুত রয়েছে এবং যুদ্ধ শেষে তা বাস্তবায়ন করা হবে।[১৩৪] ১৯১৭ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠিত স্যাডলার কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কীমটি পরীক্ষা করেন। উক্ত কমিটি ন্যাথান কমিটির সুপারিশ মত সরকারের পুরোপরি নিয়ন্ত্রণ প্রথা বাতিল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একে একটি স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন।[১৩৫] কিন্তু মুসলিমদের তীব্র চাপের প্রভাবে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি প্রধান সংস্থায় মুসলিম প্রতিনিধি শক্তিশালী করার সুপারিশ করতে বাধ্য হয়।[১৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের ১৮ মার্চ ভাইসরয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হয়। সেখানেও হিন্দু সদস্যগণ এর বিরোধিতা করেন।[১৩৭] হিন্দুদের ঐ বিরোধিতার কথা জানতে পেয়ে খান বাহাদুর খাজা মোহম্মদ আজম (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৬৭ দ্রঃ) তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেন। খাজা মোহাঃ আজম ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহর ভগ্নিপতি (নওয়াবজাদী মেহের বানুর স্বামী)। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নওয়াব হাবিবুল্লাহর কম বয়স, চঞ্চলমতি, প্রভৃতির কারণে খাজা মোহাঃ আজম বাংলার রাজনীতি ও সমাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৬ সালে তিনি বংগীয় প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির সেক্রেটারী হয়। মুসলমানদের মধ্যে সঠিক জনমত সৃষ্টির জন্য প্রাদেশিক মুসলিম সমিতির আওতায় তিনি ১৯২০ সালে ঢাকা জেলা মুসলমান সমিতি গঠন করেন। উক্ত সমিতির উদ্বোধনী ভাষণে তিনি মুসলিমদের শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এছাড়া ঐ ভাষণে তিনি বড়লাট পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট পাশের সময় কিছু হিন্দু সদস্যের বিরোধিতার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, We have been sorry to see that a number of Hindu members of the Vice-regal council vented their malice against the Musalmans and showed unkindness to them during the passage of bill. We never expected such treatment from them.[১৩৮] ১৯২১ সালের ১৭ মার্চ বাংলা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৯ লক্ষ টাকা গ্রান্ট প্রদানের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু পরিষদের কোন কোন হিন্দু সদস্য ঐ গ্রান্টের বিরোধিতা করেন। মিঃ ডি.সি. ঘোষ ৯ লক্ষের স্থলে ৩ লক্ষ এবং প্রফেসর শতীসচন্দ্র মুখার্জী ২ লক্ষ করার সংশোধনী প্রস্তাব করেন। তখন মুসলিম সদস্যের মধ্যে ঢাকা নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা মোহঃ আজম ও খাজা মোঃ আফজাল এবং এ. কে. ফজলুল হক ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। খাজা আজম বলেন, বংগ বিভাগের পর পূর্ব বংগের শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যলয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন অনেক আগে। কিন্তু বহু টানা হেঁচড়া ও বাক বিতন্ডার মধ্যে দিয়ে সবে মাত্র তা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব গ্রহনের বেশ পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অথচ সেটা এর অনেক আগেই ১৯১৭ খ্রীঃ অস্তিত্ব লাভ করেছে।[১৩৯] খাজা মোহাঃ আজম আরো বলেন, Eastern Bengal Supplies the bulk of Bengal income and we do not grudge that the bulk of its expenditure is swallowed by west Bengal, and I cannot understand why west Bengal people should grudge us a pittance which has been long overdue and should have been given to us years back. I cannot also understand the Jealousy of Calcutta University men for Dacca. The establishment of Dacca University will not certainly effect them, and Calcutta can as long as it likes enjoy the luxury of having more Professors than students or Professors without students. We do dot want to question its patronage or charity.[১৪০] খাজা মোঃ আফজালও দৃঢ়ভাবে সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখান করে প্রস্তাবিত গ্রান্ট অনুমোদনের দাবী জানান। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বাগ্মীতা গুনে বিরুদ্ধবাদীদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবের যুক্তিগুলো খন্ডন করেন।[১৪১]

১৯২১ সালের ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের প্রথম অধিবেশনে চ্যান্সেলররূপে সভাপতিত্ব করার জন্য বংগের গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকা জেলা মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি খাজা মোহাঃ আজম একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে ১৬ আগস্ট মংগলবার সকালে গভর্নরের সাথে দেখা করে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন।[১৪২] এতে তিনি বলেন, 'মুসলমানেরা আশা করেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তাঁরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে। এর শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্ররা হবে প্রধানত মুসলিম। কিন্তু সে ব্যবস্থা না হওয়ায় মুসলিমরা দুঃখিত। ভবিষ্যতে যাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় সেজন্য এ্যাসোসিয়েশন গভর্নরকে অনুরোধ জানাচ্ছে।' জবাবে লর্ড রোনাল্ডশে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকালে মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে লর্ড হার্ডিঞ্জ যেসব কথা বলেছিলেন, তাতে

Dhaka University Institutional Repository

আপনাদের এরূপ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় সর্বসাধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল বাংলা সরকারের কাছে দেয়া ভারত সরকারের অনুমোদন পত্রেও তাই বলা হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে এখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে আমিও নিরাশ হয়েছি। মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভেবে আমি নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরামর্শ সভার সদস্য হতে আহ্বান করেছিলাম।[১৪৩] উক্ত সভার অনুমোদন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউকে নিয়োগ করি নাই। যথাসাধ্য চেষ্টা করে উপযুক্ত মুসলিম শিক্ষক যে ক'জন পাওয়া গেছে তাঁদের নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করার জন্য গঠিত কার্যকরী সভা আপনাদের দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন। ভি.সি. সাহেবও আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি না করে মুসলমানদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয়, তিনি সে বিষয়ে চেষ্টার ক্রটি করবেন না। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার সময় মোট ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৮ জন ছিলেন মুসলমান। আবার এই ৮ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন আরবী-ফার্সীর শিক্ষক।[১৪৪] ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২২ খ্রীঃ শিক্ষামন্ত্রী মিঃ কার বংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিগত বছরের ন্যায় ৯ লক্ষ টাকা গ্রান্ড প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করলে খাজা মোঃ আজম শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।[১৪৫] উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অমুসলিম সদস্যের অনেকেই টাকার অংক হ্রাসের সংশোধনী প্রস্তাব আনলে নওয়াবজাদা খাজা মোহাম্মদ আফজাল (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ২৮ দ্রঃ) যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাব রোধ করেন।[১৪৬]

১৯২১ সালের জুলাই মাস থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি পড়াশুনা শুরু হয়।[১৪৭] নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর স্বপ্ন - সাধের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবরূপ দেখে যেতে পারেননি। নওয়াবের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে এ. কে. ফজলুল হক ১৭ই আগস্ট ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের প্রথম সভাতেই একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা গৃহীত হয়।[১৪৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে যেমন বাংলার মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা প্রসারে সহায়তা করেছিল, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছিল। আগেই বলা হয়েছে, মুসলমানদের দাবীর মুখে স্যাডলার কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে বিশেষ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রেখেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংস্থায় মুসলমান প্রতিনিধির অভাবের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৪৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম কোর্টে (১৯২১-২৪) মোট ১৫৮ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন মুসলমান। কিন্তু মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা কম থাকায় এদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে চ্যান্সেলর মনোনীত সদস্য।[১৫০] ঢাকা নওয়াব পরিবার থেকে নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা মোঃ ইউসুফজান এবং খাজা মোঃ আজম এবং খাজা মোঃ আফজাল ঐ কোর্টের সদস্য ছিলেন।[১৫১] এছাড়া প্রথম নির্বাহী কাউন্সিলে মোট ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মুসলমান। এঁদের মধ্যে ঢাকা নওয়াব পরিবার থেকে ছিলেন দু'জন, খাজা মোঃ ইউসুফ জান ও খাজা মোঃ আজম।[১৫২] প্রথম একাডেমিক কাউন্সিলে ১৯ জনের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মুসলমান সদস্য।[১৫৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, এর বিভিন্ন সংস্থা এবং মুসলিম হলে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। তদুপরি মুসলিম ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তিরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণে প্রতিষ্ঠানটিতে মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্রদের সংখ্যায় বহুদিন পর্যন্ত কোন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ১৯২১ সালে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ছিল মুসলমানদের চেয়ে ৫ গুন বেশী। ১৯৩৭ সালে ছিল প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশী।[১৫৪] কিন্তু উদীয়মান বাংগালী মুসলিম সত্ত্বার বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কেবল সংখ্যার নিরিখে বিচার করা ঠিক হবে না। কারণ দেখা গেছে, মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম হলকে কেন্দ্র করে মুসলিম ছাত্রদের সংগঠিত পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। মুসলিম হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষ স্যার এ.এফ. রহমান ও তাঁর সহযোগীরা সচেতনভাবে একে ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট একটি আবাসিক হলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আবাসিক ছাত্রদের জন্য নামাজ ছিল অবশ্য পালনীয়। প্রতি শুক্রবার ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নিয়মিত আলোচনা বসতো এবং রবিবার অপরাহ্ন নির্দিষ্ট ছিল কোরাণ শরীফের ক্লাশের জন্য।[১৫৫] মুসলিম হলের ছাত্ররা সুপরিচিত মুসলমানী পোশাক যেমন-শেরওয়ানী, চুড়িদার পায়জামা ও টুপি পরবে এটাও প্রায় অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৫৬]

৭(৫)(ক) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য তৎকালীন সর্ববৃহৎ হল তথা 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' নির্মাণের মাধ্যমে নওয়াব সলিমুল্লাহর আরেকটি স্বপ্ন রাস্তবায়ন হয়। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, ১৯০৬ সালে শাহবাগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে নওয়াব সলিমুল্লাহ আলীগড়ের অনুকরণে ঢাকা কলেজের সংশ্রবে একটি মোহামেডান হল নির্মানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর জন্য তিনি নিজে ১,৮৬,৯০০/- টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এজন্য ৩৫,০০০ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। বাকী অর্থ চাঁদার মাধ্যমে সংগ্রহের চেষ্টা চলে।[১৫৭] ১৬ অক্টোবর ১৯১০ নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে নওয়াব ইউসুফজানের সভাপতিত্বে পূর্ববংগের সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত 'পূর্ববংগ ও আসাম মুসলিম লীগের' এক সভায় ঢাকায় উক্ত মোহামেডান হল নির্মাণের প্রস্তাবটি জোর দিয়ে পূণর্ব্যক্ত করে আবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১২ সালের ২১ মার্চ ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে পূর্ববঙ্গের শেষ ছোট লাট মিঃ বেইলী উক্ত হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[১৫৯] বংগ বিভাগ রদের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত ন্যাথান কমিটি, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি কলেজ তৈরী এবং উক্ত হলকে সে কলেজের অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৬০] কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠিত স্যাডলার কমিশন স্বতন্ত্র মুসলিম কলেজ ও তাঁর সংশ্রবে হলের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুসলিম হল নির্মাণের সুপারিশ করে।[১৬১] (*অত্র অধ্যায়ের তথ্যসূত্র নং ৭১ দ্রঃ)*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হয় বিধায় মুসলিম হল নির্মাণও স্থগিত থাকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মুসলিম ছাত্রদের জন্য স্থাপিত হয়েছিল 'মুসলিম হল'। তখন কলাভবনের (বর্তমান-ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবন) দোতলার কিছু অংশ উক্ত হলের জন্য ব্যবহৃত হতো।[১৬২] ক্রমে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে গেলে স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণের প্রয়োজন হয়। ১৯২৫-২৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এজন্য একটি নতুন কমিটি গঠন করেন। মুসলিম হলটি প্রথমে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নিকট তৈরীর পরিকল্পনা হয়। কিন্তু ঢাকা জেলা হিন্দু সভা ৭ জুলাই ১৯২৬ এক সভা করে এর প্রতিবাদ জানায় ও প্রতিনিধি পাঠায়। এমতাবস্থায় একটি কমিটি গঠন করে স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটি জগন্নাথ হলের পশ্চিমে স্থান নির্বাচন করেন।[১৬৩] ১৯২৭ সালেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এ হলটির নামকরণ করেন "সলিমুল্লাহ মুসলিম হল"।[১৬৪] ১৯২৭ সালের মার্চে বংগীয় আইন পরিষদ মুসলিম হল তৈরীর জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯২৯ সালের ২২ আগস্ট বংগের গভর্নর ও চ্যান্সেলর স্যার স্ট্যানলি জাকসন এ হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন[১৬৫] এবং ১৯৩১ সালের ১১ আগস্ট চ্যান্সেলর এর উদ্বোধন করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনে ভি.সি. মিঃ জি.এইচ. ল্যাংলি-এর দেয়া ভাষণ থেকে জানা যায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের জন্য নওয়াব হাবিবুল্লাহ বার্ষিক ৩০০০ টাকা দান করতেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনে ভি.সি. সাহেব আরো জানান যে, মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদানের নিমিত্তে স্যার সলিমুল্লাহর স্মৃতিতে একটি তহবিল গঠনের জন্য নওয়াব হাবিবুল্লাহ ১০ হাজার টাকা দান করবেন।[১৬৬] এ হলের উদ্বোধনী দিনে প্রভোস্টের দেয়া ভাষণ থেকে জানা যায় যে নওয়াব পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্নভাবে হলটি নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন।[১৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের স্থাপত্য কর্মও তৎকালে ঢাকা শহরের গর্বের বিষয় ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক হল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মুলত মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ইসলাম ধর্মীয় মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। নওয়াব সলিমুল্লাহও সেটাই চেয়েছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের পিতামাতা যেমন তাদের ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তেমনি উক্ত হলে মুসলমান অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণে তাঁরা সেরূপ পরিবেশেই শিক্ষা লাভ করতেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে, এ কারণে উক্ত হলে নিয়মিত নামাজ আদায়সহ ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে হতো এবং ইসলামী ভাবধারায় পোষাক-আশাক পরতে হতো। ফলে একদিকে ছাত্ররা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র শিক্ষকদের সাথে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতো অন্যদিকে নিজস্ব কৃষ্টিকলাপ তথা ইসলাম ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ ধরে রাখতে পারতো। এ অঞ্চলে ইসলামী মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত তরুণ গড়তে হলটি বিশেষ অবদান রেখেছিল। ত্রিশ চল্লিশের দশক থেকে পূর্ববাংলায় যেসব মুসলমান তরুন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাঁদের একটি বড় অংশই উক্ত হলের ছাত্র ছিল।

৭(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ঃ

৭(৬)(ক) আবদুল গণি ফ্রী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা ঃ

জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকার নওয়াবগণ যতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পৃষ্টপোষকতা করেছেন, তন্মধ্যে আবদুল গণি ফ্রী হাই স্কুলই প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নওয়াব বাড়ীর পুর্ব-উত্তর দিকে কুমারটুলী মহল্লায়[১৬৮] ১৮৬৩ খ্রীঃ খাজা আবদুল গণি তাঁর নিজের নামে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬৯] নওয়াব এস্টেটের তহবিল থেকে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ১৮৬৩ সালের ৯ জুলাই ঢাকা প্রকাশে বলা হয়, 'আমরা শুনে আহ্লাদিত হলাম যে, খাজা আবদুল গণি মিঞা একটি অবৈতনিক ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এতে গরীব ও উপায়হীন বালকদের বিলক্ষণ উপকার হবে। খাজা আবদুল গণি একজন প্রধান ধনাঢ্য, কিন্তু ঢাকার উন্নতি সাধনে তিনি এই প্রথম সচেষ্ট হলেন। ইচ্ছে করলে খাজা আবদুল গণি অনায়াসে একটি কলেজ স্থাপন করতে পারেন। এরূপ স্থলে তিনি যে এতদিন একটি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপনেও নিতান্ত উদাসীন ছিলেন, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। যা হোক মিঞা সাহেবের নিকট বক্তব্য এই যে, বিদ্যালয়টি যাতে চিরস্থায়ী হয়, তৎপ্রতি যেন তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকে।'[১৭০]

১৮৬৩ খ্রীঃ ২৩ জুলাই উক্ত পত্রিকায় বলা হয়, 'খাজা আবদুল গণি একটি অবৈতনিক ইংরেজী বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এর দ্বারা এ প্রদেশের অবশ্য অনেক উপকার হবে। কিন্তু নিয়মের দোষে আপাতত কিছু অনিষ্ট ঘটছে। এখানে (ঢাকায়) অন্য যে কয়টি ইংরেজী স্কুল আছে, তার শিক্ষকগণ ছাত্রদের যথোচিত শাসন করতে পারেন না।'[১৭১] উক্ত স্কুলটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশের নিস্বম্বল, গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা।[১৭২] স্কুলটি ছিল নওয়াবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাইভেট স্কুল। প্রতিষ্ঠানটিতে সরকারী রেজিস্ট্রেশন নিয়ে গরীব ছাত্রদের দেশে প্রচলিত মানের লেখা-পড়া করানো হতো। ১৮৬৪ খ্রীঃ একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ঐ সময় স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক অন্যূন ২০০ টাকা নওয়াব এস্টেট থেকে দেয়া হতো।[১৭৩] স্কুলের ছাত্রদের নিকট থেকে কোনরূপ বেতনাদি নেয়া হতো না বরং ভাল ফলাফল করলে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হতো। উল্লিখিত কারণে স্থানীয় লোকদের কাছে প্রতিষ্ঠানটি' আবদুল গণির স্কুল' নামে পরিচিত ছিল এবং পত্রিকায় প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় স্কুলটিকে গণিজ স্কুল (Ghani's School) নামে উল্লেখ করা হতো।[১৭৪]

গণিজ স্কুলে মোট কতজন শিক্ষক ছিলেন তা জানা না গেলেও শুরু থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এর প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেছিলেন বাবু মোহন চাঁদ বসাক নামক এক নিবেদিত প্রাণ হিন্দু ভদ্রলোক।[১৭৫] নওয়াব সাহেব যদিও মূলত মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৭৬] কিন্তু বিভিন্ন সময়ে উক্ত স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশের তালিকা থেকে জানা যায়, উক্ত স্কুলে মুসলিমদের তুলনায় হিন্দু ছাত্র সংখ্যাই বেশী ছিল।[১৭৭] আগেই বর্ণিত হয়েছে, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নওয়াব আব্দুল গণি হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ জ্ঞান খুব কমই করতেন।[১৭৮] তাই দরিদ্র ও মেধাবী হিন্দু ছাত্রদের তিনি তাঁর স্কুলে বিনা বিতনে পড়াশুনা করতে কোন আপত্তি তোলেননি। উক্ত স্কুলটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা ছিল একাধারে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষাগার। ইতোপূর্বে যেসব কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলোতেও দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে নওয়াব আবদুল গণির স্কুলে বাংলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ স্কুলটি স্থাপনের ফলে বাংলা ভাষার প্রতি নওয়াব আবদুল গণির শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পায়।[১৭৯]

নওয়াব আবদুল গণির সদিচ্ছার কারণে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্ভবত যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে স্কুলটি কোনদিনই আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি।[১৮০] প্রথমদিকে হয়তো এই অব্যবস্থা একটু বেশী ছিল। যার দরুণ প্রতিষ্ঠা বছরের শেষ দিকে জনৈক পত্র লেখক ঢাকা প্রকাশে বিরূপ মন্তব্য করে লিখেছিলেন, 'নওয়াবের অবৈতনিক স্কুলটির নাম শুনে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু এখন শুনতে পাই সেটি কেবল ব্রত রক্ষার ন্যায় হয়েছে। তাতে না আছে পড়ার নিয়ম না আছে অভিভাবদের যত্ন। এমন কি প্রায় ছয় মাস যাবৎ স্কুলটি হয়েছে, এর মধ্যে ছাত্ররা প্রতিষ্ঠাতার শুভাগমন দেখেনি। ছাত্রদের জল খাওয়ানোর জন্য একজন গোয়ালা কিংবা বাহ্যে যাওয়ার মত কোন পায়খানাও নেই। বাসনা করি প্রতিষ্ঠাতা একদিন স্কুলে গিয়ে বাস্তব অবস্থা অবলোকন করবেন।[১৮১] তৈফুর সাহেব লিখেছেন, প্রশাসনিক দুর্বলার জন্য আবদুল গণি ফ্রী স্কুল খারাপ অবস্থায় টেনে হিঁছড়ে চলতো।[১৮২] ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রকাশিত খবরে জানা যায় স্কুলের ছাত্রদের পড়াশুনার প্রতি নওয়াবের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। ঐ সময় নওয়াব আবদুল গণির পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজে প্রতি সোমবার গণিজ স্কুলে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের পড়াশুনা পরীক্ষা করবেন এবং প্রতি মাসের শেষে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করবেন।[১৮৩] ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী না হলেও প্রতি বছর বেশ কয়েকজন ছাত্র গণিজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতো। ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত এরূপ কয়েকটি বছরের পাসকৃত ছাত্রদের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

<u>১৮৬৬ খ্রীঃ</u> [১৮৪]

(১) চন্দ্রনাথ দাস	তৃতীয় বিভাগ
(২) জানকী নাথ রায়	ঐ
(৩) নবীন চন্দ্র সেন	ঐ
(৪) রজনীকান্ত রায়	ঐ
(৫) হরিদাস সেন	ঐ

<u>১৮৬৯ খ্রীঃ</u> [১৮৫]

(১) আলী এমদাদ	দ্বিতীয় বিভাগ
(২) গংগাচরণ বসু	ঐ
(৩) গৌরাংগ দাস	ঐ
(৪) হরকিশোর চক্রবর্তী	ঐ
(৫) মদন মোহন দত্ত	তৃতীয় বিভাগ
(৬) বৃন্দাবন দাস	ঐ

<u>১৮৭০ খ্রীঃ</u> [১৮৬]

(১) বেনী মাধব ধর	দ্বিতীয় বিভাগ
(২) পূর্ণ চন্দ্র গুহ	ঐ
(৩) কিশোরী মোহন লাহিড়ী	তৃতীয় বিভাগ

<u>১৮৭২ খ্রীঃ</u> [১৮৭]

(১) অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী	দ্বিতীয় বিভাগ
(২) রাজীব লোচন চক্রবর্তী	ঐ
(৩) রামসুন্দর দাস	ঐ
(৪) গিরীশ চন্দ্র দাস	তৃতীয় বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৪ খ্রীঃ [১৮৮]

(১) আনন্দ চন্দ্র দাস দ্বিতীয় বিভাগ
(২) মুথুরানাথ দাস ঐ
(৩) অভয়চন্দ্র চক্রবর্তী তৃতীয় বিভাগ
(৪) কৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্তী ঐ
(৫) সৈয়ামুদ্দিন আহমদ ঐ
(৬) মহিমচন্দ্র শর্মা ঐ
(৭) ব্রজনাথ রায় ঐ

১৮৮০ খ্রীঃ [১৮৯]

(১) আফসার উদ্দিন দ্বিতীয় বিভাগ
(২-৭) আরো ৭ জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে পাস করেন

১৯০৬ খ্রীঃ [১৯০]

(১) চিন্তহরণ বন্দোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিভাগ

প্রবেশিকা পরীক্ষার মত সাধারণ লাইনের পড়াশুনা ছাড়াও গণিজ স্কুলে কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭৩ সালে উক্ত স্কুল থেকে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ প্রাকৃতিক ভুগোল জরিপ পরিচিত এবং চিত্র বিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।[১৯১] (১) কৃষ্ণ চন্দ্র দাস-২য় শ্রেণী (২) কালিভূষণ রায়-২য় শ্রেণী (৩) শরৎ চন্দ্র বসু-২য় শ্রেণী (৪) জগচন্দ্র গুপ্ত-২য় শ্রেণী (৫) মোহিনী মোহন বসাক-২য় শ্রেণী। ১৮৭০ খ্রীঃ প্রকাশিত এক খবরে শিক্ষকের অভাবে উক্ত স্কুলের একটি শ্রেণী উঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাবের কথা জানা যায়। ঐ খবরের সাথে মন্তব্য করা হয়, গণি মিয়ার মত ধনীর পক্ষে কেবল মাত্র ২০/২৫ টাকায় একজন শিক্ষক রাখতে না পারার খবরটা যদি সত্য হয়, তবে তা হবে বড় হাস্যের বিষয়।[১৯২] পত্রিকার আশংকাটি নিশ্চয় কার্যে পরিণত হয়নি। কারণ দেখা যায় এর পরেও স্কুলটি যথারীতি চলছিল।

নওয়াব আবদুল গণি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে ঘটাকরে অনুষ্ঠান করে ভাল ফলাফলকৃত ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করতেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তৎকালীন অন্যুন ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকার পুরস্কার দেয়া হতো। ১৮৭২ খ্রীঃ মে মাসে অনুরূপ একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ঢাকা কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ ব্রেনান্ড সহেব। এছাড়া অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন স্কুল ইনসপেকটর ক্লার্ক সাহেব। তাঁরা উভয়েই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশ করে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল যে, "এই সভাতে উপস্থিত থেকে অধ্যক্ষ ব্রেনান্ড সাহেব বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, ক্লাশ থেকে গোপনে গোপনে রংমহলে ডেকে এনে ছাত্রদের পুরস্কার না দিয়ে অনুরূপ সভায় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তদিগের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করাই উচিত। এতে একদিকে যেমন ছাত্রগণ উৎসাহিত হন, অন্যদিকে তেমন উপস্থিত ধনাঢ্যগণ পুরস্কার ফান্ডে অর্থদান করে বিদ্যোৎসাহিতার তৃপ্তিলাভ করতে পারেন।" গণিজ স্কুল থেকে যেসব মুসলিম ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস্ করতো নওয়াব সাহেব তাঁদের জন্য প্রতিবারই যথোচিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেন। ১৮৮০ খ্রীঃ উক্ত স্কুল থেকে জনৈক আফসার উদ্দিন নামক মুসলিম ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস্ করলে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাকে ৫০/-টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। এছাড়াও নওয়াবের ঘোষণা ছিল যে, উক্ত স্কুল থেকে যদি কোন মুসলিম ছাত্র প্রথম বিভাগে পাস্ করতে পারে তবে তাঁকে ২০০/-টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। উল্লেখ্য, উক্ত ১৮৮০ সালে গণিজ স্কুল থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জনই উত্তীর্ণ হয়েছিল।[১৯৫]

দীর্ঘ ৩৩ বছর হেড মাস্টার পদে চাকুরী করার পর ১৮৯৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে বাবু মোহন চাঁদ বসাককে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি অবসর দেন। নওয়াব সাহেব তাঁকে বার্ষিক ২৫০/- টাকা পেনশন প্রদান করেন।[১৯৬] ১৮৯৭ খ্রীঃ দেশব্যপী যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় তাতে নওয়াবদের প্রধান কাচারীবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এস্টেটের জরুরী কাজকর্ম চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে তখন গণিজ স্কুল ঘরে সাময়িকভাবে নওয়াবের কাচারী বসানো হয়। স্কুলটি তখন পতিতালয়ের পার্শ্বে একটি ভবনে স্থানান্তরের কথা হয়।[১৯৭] এরূপ অবস্থায় নওয়াবের ইংরেজ ম্যানেজার মিঃ উইদ্রল তখন স্কুলটিকে উঠিয়ে দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু নওয়াবের দেওয়ান বাবু চন্দ্রকান্ত গাংগুলী মৃত নওয়াব আবদুল গণির কীর্তি বলে তা রক্ষা করেন।[১৯৮] যাহোক শেষ পর্যন্ত কাচারীটি সরিয়ে নেয়া হলে স্কুলটি তাঁর পূর্বস্থানে ফিরে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ও জনশিক্ষা বিস্তারে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের চেয়েও বেশী অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর সময়ে আবদুল গণি ফ্রী হাইস্কুলটি প্রভূত উন্নতি লাভ করে। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, ১৯০২ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতার প্রতিশ্রুত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।[১৯৯] সেই সাথে তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, ঐ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের জন্য তিনি ৪টি বৃত্তিও প্রদান করবেন। তবে যারা আবদুল গণি স্কুল ও ঢাকা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স পাস করে উক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হতে পারবে, কেবলমাত্র তারাই ঐ বৃত্তি ভোগ করতে পারবে।[২০০]

নওয়াব সলিমুল্লাহ দেখতে পেলেন, দরিদ্র ছাত্রেরা গণিজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস্ করে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারেন না। এরূপ দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ গণিজ স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ফ্রি কলেজে পরিণত করতে মঞ্জুর করেন।[২০১] নানা কারণে নওয়াবের পরিকল্পিত ফ্রী কলেজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। তবে নওয়াব আবদুল গণি ফ্রি স্কুল যথারীতি চলতে থাকে। ১৯০৬ খ্রীঃ উক্ত স্কুল থেকে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন তাদের মধ্যে চিন্তহরণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম অন্যতম। যিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাস্ করেছিলেন।[২০২] আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, গণিজ স্কুলে এতদাঞ্চলের দরিদ্র ও নিসম্বল লোকদের সন্তানেরা বিনাবেতনে পড়াশুনা করতো। তাই ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা যারা পয়সা খরচ করে অন্যান্য স্কুলে পড়তে পারে, স্বভাবতই তাদের এখানে ভর্তির সুযোগ ছিল না। আর আজ থেকে শতাধিক বছর আগে সেই শিক্ষা বিমুখ যুগে দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষায় আগ্রহী ও মেধাবী ছাত্রসংখ্যা স্বভাবতই খুব অল্প ছিল। তদুপরি স্কুলের বেতন ছাড়াও থাকা-খাওয়া ও আনুষংগিক খরচাদি মেটানোও যে একজন নিসম্বল অভিভাবকের জন্য বেশ কষ্ঠকর ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আজো যে সমস্যাটি বাংগালী জাতীর শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার পেছনে একটি বড় কারণ বলে বিবেচিত। উল্লিখিত কারণে আবদুল গণি স্কুলে কোন দিনই বেশী সংখ্যক ছাত্রের ভীড় দেখা যায়নি। হৃদয়নাথ মজুমদার বলেছেন, গণিজ স্কুলটি কোনদিনই ভাল চলেনি এবং ছাত্রাভাবে এক সময় সেটা বন্ধ হয়ে যায়।[২০৩]

তবে গণিজ স্কুলটি কবে বন্ধ হয়ে যায় কিংবা আদৌ বন্ধ হয়েছিল নাকি নওয়াব সলিমুল্লাহর পরিকল্পিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা আজো জানা যায়নি। ঢাকা প্রকাশ ১৯০৭ সালেও স্কুলটির অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে। মুসলিম লীগের প্রচার কাজে নওয়াব সলিমুল্লাহ যখন দেদারছে অর্থাদি খরচ করছিলেন, তখন তাঁর সমালোচনা করে বিরুদ্ধ মনোভাবপন্ন ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল যে, 'এভাবে অর্থের অপচয় না করে গ্রামে গ্রামে স্কুল করুন। আবদুল গণির সৃষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের দুর্দশার কথা আমরা জানি। অবৈতনিক হলেও আজো মুষ্টিমেয় বিদ্যার্থী কেন?[২০৪] ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ সালে নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের তৈরী নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায়, ঐ সময় উক্ত স্কুলের জন্য বার্ষিক ২৫২৬ টাকা নওয়াব এস্টেট থেকে বরাদ্দ ছিল।[২০৫]

৭(৬)(খ) ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ঃ

আরবী ফার্সী তথা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপশি ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়ে নওয়াব আব্দুল গণি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। ধর্মীয় ও সামজিক মানসিকতা এবং অত্যধিক খরচের দরুন সরকারের ইংলিশ স্কুল সমুহে তৎকালে মুসলিম অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করতে অনীহা প্রকাশ করতো। বিষয়টি লক্ষ্য করে নওয়াব আব্দুল গণি ও ঢাকার নেতৃস্থানীয় মুসলিমরা কলকাতা ও হুগলীর অনুরূপ স্বল্প বেতনে পড়ার মত ঢাকায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করেন। উল্লিখিতের প্রেক্ষিতে নওয়াব আব্দুল গণির নেতৃত্বে ঢাকার প্রভাবশালী মুসলিমগণ ৫ নভেম্বর ১৮৭১ খ্রীঃ[২০৬] ইংরেজ সরকারের নিকট একটি আবেদন করেন। উক্ত আবেদন পত্রে তাঁরা কলকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী মোহামেডান কলেজের ন্যায় স্বল্প বেতনে লেখাপড়া করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে বলেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলে এতদাঞ্চলের মুসলিমদের সরকারী স্কুল কলেজে ভর্তি না হবার যাবতীয় অসুবিধা দূর হতে পারে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন।[২০৭]

এই প্রেক্ষিতে সরকার চট্রগ্রাম অঞ্চলে আরবী ফার্সী শিক্ষার চাহিদা বেশী ধারণা করে তথায় একটি মাদাসা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় নওয়াব আব্দুল গণিসহ পূর্বোক্ত আবেদনকারীরা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য ঢাকার দাবীই অধিকতর জোরালো এটা তুলে ধরলে সরকার তাঁদের যুক্তি মেনে নেয়।[২০৮] ওদিকে নওয়াব আব্দুল লতিফ বংগের ছোট লাট স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, দাতার ইচ্ছানুযায়ী মোহসীন ফান্ডের টাকা মুসলিমদের শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছেনা। ছোট লাটের সুপারিশে ১৮৭৩ খ্রীঃ ভারত সরকার হুগলী কলেজের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ দেন। এছাড়া মোহসীন ফান্ড থেকে যে ৫৫ হাজার টাকা উক্ত কলেজের জন্য এতদিন ব্যয় হচ্ছিল তা শুধু মুসলিমদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। উক্ত টাকায় কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার উন্নতি এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।[২০৯] বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল ঢাকায় মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিষয়টি সুপারিশ সহকারে ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।[২১০] ১৮৭৩ খ্রীঃ বাংলা সরকার ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য মোহসীন ফান্ড থেকে ১০ হাজার টাকা ধার্য করে রাখে। মাদ্রাসাটির স্থাপনকাজ তত্ত্বধান করার জন্য ঢাকার পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায়, তিনি ১৮৭৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ১১টায় এবং ১০ মার্চ উক্ত মাদ্রাসা কমিটির সভায় যোগ দিয়েছিলেন[২১১(ক)] এবং ২৮ এপ্রিল তিনি মাদ্রাসা এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উক্ত মাদ্রাসা স্থাপনে জমি ক্রয়ের জন্য বদান্যবর নওয়াব আব্দুল গণি ৫,৫০০/- টাকা দান করেন।[২১২] ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৬ মার্চ ঢাকা মাদ্রাসা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়।[২১৩] একই সময় মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাসেরও ব্যবস্থা করা হয়। এ মাদ্রাসাটি ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের মধ্যে এতই সাড়া জাগিয়েছিল যে, প্রথম বছরেই ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের সংখ্যা হয়েছিল ৪০০ জন, যার মধ্যে সীটের অভাবে মাত্র ১৬৯ জনকে নেয়া হয়েছিল।[২১৪] উল্লেখ্য, তৎকালে ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের সবাই ছিল মুসলমান। অন্য সম্প্রদায়ের কেউ ছিলনা।[২১৫] এ মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন খ্যাতনামা মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, যিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। মেদিনীপুরের অধিবাসী মওলানা উবায়দুল্লাহ আগে হুগলী কলেজের আরবীর শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি ঢাকা মাদ্রাসার সুপার নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দূভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাও ভাল জানতেন। আরবী, ফার্সী, উর্দূভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। খুবই উদার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী এই পন্ডিত ব্যক্তিকে শহরের গন্যমান্যরা বিশেষ করে নওয়াব আবদুল গণি খুবই সম্মান করতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ৬ ফেব্রুঃ পরলোক গমন করলে তাঁকে লালবাগ শাহী মসজিদের চত্বরে দাফন করা হয়।[২১৭] প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী ছিলেন তাঁর দৌহিত্র। এতবড় বিদ্যান ও যশস্বীর অধিকারী হয়েও সচ্চরিত্রবান মওলানা উবায়দুল্লাহ মৃত্যুকালে কোন অর্থ-বিত্ত রেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অভাবগ্রস্থ পরিবারের জন্য নওয়াব এস্টেট হতে অর্থ সাহায্য দেয়া হতো। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে এরূপ কয়েকটি দানের কথা জানা যায়।[২১৮] ফিকহ্, উসুল ও হাদীস শাস্ত্রে সুপন্ডিত ফরিদপুরের মৌলাভী আব্দুস সালাম, ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। ঢাকার নওয়াবগণ তাঁকেও খুব সম্মান ও মর্যাদা দিতেন।[২১৯] এ মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন মৌলভী তাসাদ্দক হুসাইন বর্ধমানী।[২২০]

আরবী ফার্সী শিক্ষার জন্য প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা মাদ্রাসা যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা নওয়াব আব্দুল গণি ও তাঁর সহযোগিদের ইচ্ছা ছিল এদেশের মুসলিম ছাত্ররা ইংরেজি এবং আধুনিক শিক্ষাও গ্রহণ করুক। এজন্য ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দেই উক্ত মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। বিভাগটি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে ১৮৮৩ সালের এক হিসেবে জানা যায়, ঐ বছর মাদ্রাসায় মোট ৩৩৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২০২

Dhaka University Institutional Repository

জনই ছিল এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে।[২২১] এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগটি অচিরেই ইংলিশ হাইস্কুলের সমমানে পৌঁছে। ইংরেজী বিভাগের প্রথম হেড মাস্টার ছিলেন শ্রী রাজেন্দ্র মোহন দত্ত নামে একজন হিন্দু পন্ডিত ব্যক্তি।[২২২]

১৮৮০ খ্রীঃ ঢাকা মাদ্রাসার জন্য বর্তমান বাহাদুর শাহপার্কের পূর্ব- উত্তর পার্শ্বে সুরম্য একটি নতুন ভবন তৈরী করা হয়।[২২৩] তৎকালীন লেঃ গভর্নর স্যার এ্যাসলে ইডেন ২৯ জুলাই ১৮৭৭ খ্রীঃ এই নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২২৪] এই নতুন ভবন নির্মাণে জমি খরিদসহ মোট ৫৯,১৫৩/- টাকা ব্যয় হয়। এর মধ্যে নওয়াব আহসানুল্লাহ ৫,৫০০/- টাকা দান করেন। বাকী টাকা স্থানীয় চাঁদা ও মোহসীন ফান্ড থেকে পরিশোধ করা হয়।[২২৫] আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত ঢাকার নওয়াবদের পুরানো এ্যালবাম থেকে প্রাপ্ত উক্ত মাদ্রাসা ভবনের তৎকালীন দৃশ্য সম্বলিত একটি আলোকচিত্র পরিশিষ্টে (চিত্র নং ২৯ দ্রঃ) দেয়া হলো।

১৮ সেপ্টেঃ ১৮৮০ খ্রীঃ উক্ত নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে জাঁকালো অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকার সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ইউরোপীয় নারী পুরুষদের সাথে নওয়াব খাজা আব্দুল গণি ও খাজা আহসানুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার কমিশনার মিঃ বিমস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাদ্রাসার সেক্রেটারী ও ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ পোপ মাদ্রাসা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন। অতপর সভাপতি সাহেব ছাত্রদেরকে বার্ষিক পুরস্কার প্রদান পূর্বক ইংরেজী ও উর্দুতে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। শেষে নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ কমিশনার সাহেব ও সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা দেন।[২২৬] অল্পদিনেই ঢাকা মাদ্রাসার প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এমনকি বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মাদ্রাসাকেও সে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে।[২২৭] ১৮৮২ সালে সারা বঙ্গদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ ক্লাসের পরীক্ষায় ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্র মোহাঃ খলিলুল্লাহ ১ম স্থান অধিকার করেন এবং আরো তিনজন ১ম শ্রেণীতে পাশ করেন।[২২৮]

১৮৮১ খ্রীঃ ঢাকা মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এতই বেড়ে যায় যে নবনির্মিত নতুন ভবনেও এর স্থান সংকুলান হয়না বলে আরো সম্প্রসারণের প্রয়োজন পড়ে।[২২৯] ১৮৮১ খ্রীঃ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ক্রপট ঢাকা মাদ্রাসার উন্নতি এবং মুসলিম ছাত্রদের ইংরেজী পড়ায় বিশেষ আগ্রহ দেখে সেখানে এন্ট্রান্স খোলার অনুমতি দেন।[২৩০] ১৮৮২ খ্রীঃ প্রথম বারের মত ঢাকা মাদ্রাসার ইংলিশ বিভাগের ছাত্ররা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং তিনজন পাশ করেন।[২৩১] ঐ সময় দূরের ছাত্রদের জন্য মনোরম ছাত্রাবাস ছিল। সেখানে মাসে মাত্র দেড়টাকা ফিস দিলেই থাকা-খাওয়াসহ বিনা বেতনে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করা যেতো। এছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য আরবী বিভাগে ৬টি এবং ইংলিশ বিভাগে ১২টি বৃত্তির ব্যবস্থাও ছিল।[২৩২] উক্ত বৃত্তিগুলোর মধ্যে অন্তত ৪টি ঢাকার নওয়াব এস্টেট থেকে বহন করা হতো, যার প্রতিটির জন্য বার্ষিক অর্থের পরিমাণ ছিল ৬ টাকা।[২৩৩] প্রতিবছর ভাল ফলাফলকৃত ছাত্রদের মধ্যে যে পুরস্কার বিতরণ করা হতো, তাতেও ঢাকার নওয়াব এস্টেট থেকে অর্থ সাহায্য করা হতো। ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য 'হাফেজ আব্দুর রহমান প্রাইজ ফান্ড' নামে বার্ষিক একশ টাকার একটি তহবিল পরিচালিত হতো।[২৩৪] নওয়াব আব্দুল গণির মৃত্যুতে উক্ত মাদ্রাসা ছুটি ঘোষণার খবর প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ লিখেছিলো, ঢাকা মাদ্রাসা বলতে গেলে নওয়াবের দানেই পরিচালিত।[২৩৫] ঢাকা মাদ্রাসার প্রতি নওয়াব আব্দুল গণির অবদানকে উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করতেন। নওয়াবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থে ঢাকা মাদ্রাসা ১ দিনের বন্ধ দেয়া হয়। এছাড়া ২৬ আগষ্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এক শোকসভা করে এবং পরলোকগত নওয়াবের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ কিছু একটা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২৩৬] নওয়াব আব্দুল গণির স্মরণার্থে তাঁরা উক্ত মাদ্রাসা ভবনের দেয়াল গাত্রে একটি উৎকীর্ণ মার্বেল ফলক স্থাপন করেন। ঢাকা মাদ্রাসা (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) এর মূল ভবনের পশ্চিম বারান্দায় দেয়ালে ফলকটি আজো বিদ্যমান। ফলকটিতে লেখা আছে- 'Is erected to the Memory of Nawab Sir Khajeh Abdul Ghony Bahadur K.C.S.I. (Born 1813-died 24th August, 1896)

By the evergrateful students of the Dacca Madrasah in recognition of his wide-spread liberality and single devotion to the advacement of Education.'[২৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মাদ্রাসা পূর্ব বাংলার মুসলিমদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে এক ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে অচিরেই এতদাঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষিত একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সূচনা হয়। স্যার ডঃ আব্দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, বিচারপতি জাহিদুর রহিম, কবি কায়কোবাদ, ঐতিহাসিক এস.এম. তৈফুর প্রমুখগণ ছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম।[২৩৮] ১৮৮০ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড ডাফরিনের ঢাকা আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার কমিশনার, নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রমুখগণ নর্থব্রুক হলে একটি সভা করে লর্ড ডাফরিনের নামে ঢাকা মাদ্রাসায় একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।[২৩৯] নানা কারণে কাজটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। শেষ পর্যন্ত নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে ১৯০২ খ্রীঃ বংগদেশের ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ঢাকা পরিদর্শনে এসে ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাতে মাদ্রাসা প্রাংগণে উক্ত ডাফরিন ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে একটি বড় সভার আয়োজন করা হয়েছিল।[২৪০] উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়। সরকার ও মোহসীন ফান্ডের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহও এই ব্যয়ের একটা বড় অঙ্ক বহন করেন। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকায় এজন্যে ১০ হাজার টাকা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। ঐ ছাত্রাবাসে নামাজগৃহ ছাড়াও অসুস্থদের জন্য একটি রোগ নিবাস এবং সুপারের থাকার জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা হয়।[২৪১] নওয়াব সলিমুল্লাহর পরামর্শে ১৯০৬ সালে ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ 'মুসলিম ইনষ্টিটিউট' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে এ সমিতির সাহায্যার্থে নওয়াব সলিমুল্লাহ বার্ষিক ৪০০ টাকা দান করতেন। ৮ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সমিতি একটি সভানুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ উক্ত সভায় যোগ দেন। উক্ত সভায় সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ববংগের ছোটলাট ফুলার সাহেবকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়।[২৪২]

নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯১১ সালের এপ্রিলমাসে পূর্ববংগ ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসার জন্য অধিক হারে অর্থ বরাদ্দের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন।[২৪৩] ২৯ জুন ১৯১২ খ্রীঃ সকালে লর্ড ও লেডী কারমাইকেল ঢাকা মাদ্রাসা পরিদর্শনে এলে মাদ্রাসা গভর্ণিং বডির সদস্যরূপে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও খাজা মোঃ ইউসুফজান তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড ও লেডী আরবী ও এ্যাংলো পারসিয়ান উভয় বিভাগই পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হন। ইংরেজী বিভাগের নবম শ্রেণীতে লেডী কারমাইকেল জনৈক ছাত্রকে নিজে নির্বাচিত করে দেয়া একটি গল্পাংশের পাঠ শুনে মুগ্ধ হন।[২৪৪]

শিক্ষা ও ছাত্রাবাসের জন্য অর্থদান ছাড়াও ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে প্রায় প্রতি বছরই মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হতো। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে এরূপ ৫/৬টি অর্থদানের হিসাব পাওয়া যায়। দানগুলোর কোনটাই ৫০ টাকার কম নহে।[২৪৫] ১৮৯১ সালে নওয়াব আহসানুল্লাহর বদান্যতায় ঢাকা মাদ্রাসায় একটি স্পোর্টিং ক্লাব চালু করা হয়। ক্লাবটির মাধ্যমে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলা হতো।[২৪৬] ১৯০৮-৯ সালে ঢাকা মাদ্রাসায় মোট ২১ জন শিক্ষক ছিলেন।[২৪৭] ১৯১৫ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রচেষ্টায় বংগদেশে নিউস্কীম মাদ্রাসা চালু হলে প্রতিষ্ঠানটি নিউস্কীম মাদ্রাসায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ১৯১৬ খ্রীঃ ঢাকা মাদ্রাসা থেকে এ্যাংলো পারসিক বিভাগটিকে স্থানান্তর করে নিয়ে ঢাকা মুসলিম হাইস্কুলে পরিণত করা হয়।[২৪৮] ১৯১৯ খ্রীঃ ঢাকা মাদ্রাসায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হলে সেটা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। স্বাধীনতার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় - কবি নজরুল কলেজ।

৭(৬)(গ) আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠাঃ

ঢাকার নওয়াবদের শিক্ষামূলক কীর্তিগুলোর মধ্যে ঢাকায় আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ১৮৭৬

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ঢাকা কলেজের সংশ্রবে পুরানো ঢাকার নলগোলায় একটি ভাড়া করা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা সার্ভে স্কুল। ভূমি জরিপ কাজে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য। উক্ত সার্ভে স্কুলে শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ছিল দুই বছর। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ছাত্রদের বেশ আগ্রহ জন্মে। ১৮৯০ সালে স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা ছিল ২২২ জন এবং ১৮৯৬ সালে এর সংখ্যা বেড়ে হয় ৪০০ জন।[২৪৯]

ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ সেভেজ ১৮৯৯ সালে ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেও অর্থাভাবে তা কার্যে পরিণত হয়নি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে ১৯০১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পল্টনের ময়দানে নওয়াব আহসানুল্লাহ ও এতদাঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারী কর্মচারীগণ সম্মিলিতভাবে একটি বড় ধরনের শোক সভা করেন। উক্ত সভায় মহারাণীর স্মৃতিতে ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব পুনরায় আলোচিত হয়।[২৫০] শেষ পর্যন্ত উক্ত বিভাগীয় কমিশনার ঢাকার সার্ভে স্কুলটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে উন্নীত করার উদ্যোগ নেন এবং এজন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ানুমান নির্ধারিত হয়।[২৫১] এই পর্যায়ে ঢাকার বদান্যবর নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেন।[২৫২] কিন্তু ১৯০১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি অকস্মাৎ ইন্তেকাল করায় উক্ত অর্থ প্রদান করে যেতে পারেননি। তবে তাঁর পুত্র নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পরিবারের সদস্যারা পরলোকগত নওয়াবের এই মহান প্রতিশ্রুতি পূরণে এগিয়ে আসেন। তাঁরা ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে এজন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা সরকারের হাতে অর্পণ করেন।[২৫৩] এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তখনই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় 'আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল'[২৫৪] উক্ত অর্থ প্রদানের সময় নওয়াব সলিমুল্লাহ ঘোষণা করেন যে, আব্দুল গণি ফ্রী হাই স্কুল এবং ঢাকা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে যাঁরা উক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হতে পারবেন, তাঁদের অন্তত ৪ জনকে তিনি বৃত্তিদান করবেন।[২৫৫]

বংগের ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ১৯০২ সালের ২১ জুলাই সস্ত্রীক ঢাকায় এসে নওয়াবের অতিথিরূপে আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। পরদিন ২২ জুলাই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তিনি আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[২৫৬] ১৯০৩-৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উক্ত স্কুলে তিন বছর মেয়াদী ওভারশিয়র কোর্স চালু করা হয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিলেবাস অনুযায়ী উক্ত কোর্সের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হয়। এন্ট্রান্স কিংবা ইউরোপীয় ৭ম ষ্টান্ডার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা উক্ত কোর্সে ভর্তি হতে পারতো।[২৫৭] ১৯০৫ সালের মে মাসে স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু হরিচরণ নাগ পদত্যাগ করলে মিঃ আর্নল্ড- কে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়।[২৫৮] ১৯০৫ সালেই চার বছর মেয়াদী ওভারশিয়র কোর্স চালুর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মর্যাদা লাভ করে।[২৫৯] ১৯০৬ সালে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নবনির্মিত ভবনে স্কুলটিকে স্থানান্তর করা হয়।[২৬০] ১৯০৮ সালে মোট ২২ জন উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সরকার নওয়াব সলিমুল্লাহকেও উক্ত স্কুলের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন।[২৬১] ঐ সালেই প্রতিষ্ঠানটির ওভারশিয়র কার্যক্রম, কারিগরী পরীক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[২৬১] ঐ সময় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৭৫ জন।[২৬৩] ১৯১৩ সালে এখানে যন্ত্র ও তড়িৎকৌশলে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হলেও ১৯১৬ সালে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[২৬৪] ১৯০৯ সালের ২৬ মার্চ পূর্ববংগ ব্যবস্থাপক সভায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করার প্রস্তাব করেন।[২৬৫]

শুরু থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলটি ঢাকা কলেজের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯২০ সালে সেটাকে জনশিক্ষা পরিচালকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রধানকে অধ্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। মিঃ এন্ডারসন এ স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[২৬৬] ১৯২০ সালেই পূর্ববংগ ও আসাম সরকারের ছাপাখানার জন্য নির্মিত ফুলার রোড সংলগ্ন সুপরিসর ভবনে স্কুলটিকে স্থানান্তর করা হয়।[২৬৭] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের আগেই বাংলা সরকার ঢাকায় একটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।[২৬৮] ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এখানে আই.এস.সি. পাশ ছাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

ডিগ্রী পর্যায়ে এবং ম্যাট্রিক পাশ ছাত্রদের ডিপ্লোমা পর্যায়ে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। জনাব হাকিম আলী এ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হন। এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির নাম থেকে নওয়াব আহসানুল্লাহর নাম বাদ দিয়ে এর নতুন নামকরণ করা হয়, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তবে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্দুল হামিদ উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নাম 'আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' রাখার নির্দেশ দেন।[২৬৯] কিন্তু এই নামটি আরমাত্র ১৫টি বছর স্থায়ী হয়েছিল।

১৯৬২ সালের ১ জুন পাকিস্তান সরকার উক্ত কলেজটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে। তখন এর নামটি বদলিয়ে রাখা হয়- পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়।[২৭০] তবে নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিশ্বদ্যিালয়ের একটি হলের নামকরণ করেন, আহসানুল্লাহ হল। উল্লেখ্য, কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবার কয়েক বছর আগেই হলটি তৈরী হয়েছিল এবং আগে সেটার নাম ছিল নিউ হোস্টেল। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে নওয়াব খাজা হাসান আসকারী চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ছিলেন।[২৭১]

৭(৬)(ঘ) মাদারীপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

বাংলার মফস্বল এলাকায় ঢাকার নওয়াবগণ যেসব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, তন্মধ্যে মাদারীপুর মাদ্রাসা ও বংগ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল। ঢাকা মাদ্রাসার অনুকরণে মফস্বল এলাকার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এটা ছিল একটি সফল প্রচেষ্টা। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, মাদারীপুর মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী মোহাম্মদ আজহার। তিনি ২৬ জুন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ এলাকার মুসলিমদের নিয়ে স্থানীয় জীর্ণ মসজিদটিকে সংস্কার ও সেইসাথে সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ নেন। একাজে চাঁদা সংগ্রহের জন্য তিনি ঐ অঞ্চলের গণ্যমান্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটিতে ঢাকার নওয়াব আহসানুল্লাহর শ্বশুর ও কার্তিকপুরের জমিদার কফিল উদ্দিন চৌধুরী একজন সদস্য ছিলেন।[২৭২]

কমিটি বহু চেষ্টা করে এলাকার জনগণের নিকট থেকে মাত্র ৬০০ টাকা চাঁদা তুলতে সক্ষম হন। এমতাবস্থায় তাঁরা ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য লিখিত আবেদন জানান। নওয়াব সাহেব তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মসজিদটি নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে এগিয়ে আসেন এবং প্রথম বারেই ৪,৫০০/- টাকা দান করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এলাকাবাসী নওয়াবের মৃত পুত্রের নামে মসজিদটির নামকরণ করেন 'খাজা হাফিজুল্লাহ জামে মসজিদ' এবং নওয়াব সাহেবকে এর অনারারী মোতাওয়াল্লী করা হয়।[২৭৩] স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। মাদ্রাসা স্থাপনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল মসজিদের সহযোগী হিসাবে এমন একটি স্থায়ী অংগ প্রতিষ্ঠান করা, যা মসজিদটিকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আবাদ রাখবে। ফলে মসজিদটির স্বার্থ স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হবে।[২৭৪] মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরুর পাশাপাশি মাদ্রাসার জন্য ৩৬ x ১৮ ফুট পরিমাপের একটি টিনের ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদের পাকা ভবণ নির্মাণের আগেই উক্ত মাদ্রাসা গৃহ তৈরীর কাজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে শেষ হয়। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে একজন মৌলভী ও একজন পন্ডিত নিয়োগ করে মক্তব রূপে সেটা চালু করা হয়।[২৭৫] টিনের মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণে ৬০০ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ২৫০ টাকা ব্যয়ে টিনের একটি ছাত্রাবাসও নির্মাণ করা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক পুনরায় দানকৃত ১০০০ টাকায় মসজিদের জন্য ঝাড়বাতি, কার্পেট ইত্যাদি ক্রয় ছাড়াও মাদ্রাসার জন্য চেয়ার টেবিল ক্রয় করা হয়।[২৭৬] মাদ্রাসা নির্মাণে নওয়াব আহসানুল্লাহর দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মাদ্রাসা কমিটির প্রেসিডেন্ট মৌলভী মোহাঃ আজহার ৯ মার্চ ও ১৫ মে ১৮৮৬ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর নিকট দুটি পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তিনি মাদ্রাসাটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য আরো কিছু অনুদান

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে আবেদন করেন। এর উত্তরে ১৭ জুন ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রেরিত একপত্রে নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত মাদ্রাসার জন্য মাসিক ২৫ টাকা করে চাঁদা দেয়ার কথা ঘোষণ করেন।[২৭৭] খাজা হাফিজুল্লাহ মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে ১৪ জানুয়ারী ১৮৮৭ খ্রীঃ এক বিরাট জনসভা করে মসজিদ ও মাদ্রাসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।[২৭৮]

উক্ত উদ্বোধনী সভায় মসজিদ কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের দেয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঐ সময় মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬০ জন। মাদ্রাসায় বিভাগ ছিল দুটি (১) আরবী, (২) এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল। প্রথমটায় কলকাতা মাদ্রাসার সেকেন্ড ষ্টান্ডার্ড পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টায় মধ্য ইংরেজী কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়। মাদ্রাসায় তখন একজন হেড মৌলভী সহ দুইজন মৌলভী শিক্ষক এবং দুইজন হিন্দু পন্ডিত কর্মরত ছিলেন। সরকারী সাহায্য মাত্র ৪ টাকা সহ মাদ্রাসার মোট আয় ছিল ৪৯ টাকা। যার মধ্যে ২৫ টাকা ছিল নওয়াব আহসানুল্লাহর দানকৃত অর্থ। রিপোর্টে আরো বলা হয়, নওয়াব সাহেবের মহানুভবতা ও বদান্যতার জন্য মাদ্রাসা কমিটি তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এজন্য এতদাঞ্চলের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঢাকার নওয়াবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।[২৭৯] আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র প্রাচীন পদ্ধতিতে বিদ্যা শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে মুসলমানদের ইংরেজী ও আধুনিক শিক্ষা দানের জন্য ঢাকার নওয়াবগণ প্রচেষ্টা চালাতেন। তাই নওয়াব আহসানুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী মাদারীপুর মাদ্রাসায় আরবী, ফার্সি বিভাগের পাশাপাশি এন্ট্রান্স স্কুলের ব্রাঞ্চ তথা বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা করা হয়।[২৮০]

প্রথম দুই বছর মাদ্রাসার ছাত্রদের নিকট থেকে কোন বেতন নেওয়া হয়নি। ১৮৮৭ সাল থেকে মাসিক দুই আনা করে বেতন নেয়া হতো। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাসায় মোট ২৫৪ জন ছাত্র ভর্তি হয়, তন্মধ্যে ১৩২ জন মুসলিম, ১২০ জন হিন্দু এবং ২ জন ছিল খ্রীষ্টান। ছাত্রদের মাসিক গড় হাজিরা ছিল ১১১ জন। ১৮৮৮ খ্রীঃ বাংলা ও ইংরেজী বিভাগকে দুটো টিনের বাঙলা ঘরে স্থান সংকুলান করা হয়। এ বছর ২৫ টাকা বেতনে একজন সুযোগ্য হেডমাষ্টার এবং ১৪ টাকা বেতনে এজন হেড পন্ডিত নিয়োগ করা হয়। এছাড়া মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে অনেক বই এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়। ঐ বছর মাদ্রাসার মোট আয়-ব্যয় ছিল ৭৫৫ টাকা।[২৮১] ১৮৯০ সাল থেকে মাদ্রাসাটি ক্রমান্বয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এসময় মাদ্রাসায় হাজিরা দেয়া গড় ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫ জন। এরমধ্যে ৪৫ জন আরবী এবং ১৩০ জন ছিল বাংলা, ইংরেজী বিভাগে। বার্ষিক পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ১৮৯১ সন থেকে মাদ্রাসাটি সরকারী সাহায্য পেতে থাকে। ১৯০৪ সালে মাদ্রাসার বার্ষিক গড় আয় ছিল ১৫০০ টাকা। ঐ সময় মোট আটজন শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে তিনজন আরবী এবং ৫ জন বাংলা ইংরেজী বিভাগে।[২৮২]

১৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রীঃ স্কুল ইন্সপেক্টর মিঃ সি.এ.মার্টিন মাদ্রাসাটি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন ঃ 'আজ মাদারীপুর মাদ্রাসা পরিদর্শন করে চমৎকৃত হয়েছি। এর আশাতীত সাফল্য অর্জনে বিলম্ব হবে না। একাজে অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য মৌঃ মোঃ আজহার মুসলমানদের কাছে বিশেষ প্রশংসার পাত্র। এর ব্যবস্থাপকরা ঢাকার মাননীয় নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর কাছে চিরঋণী। এবছর সরকার এবং মোহসীন ফান্ডের কাছে অনুদানের জন্য আবেদন পাঠানো হচ্ছে। ... অন্তত মোহসীন ফান্ড থেকে অনুদান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।'[২৮৩] অনুরূপ ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মিঃ সি.ডব্লিউ বোলটন ৯ ফেব্রুঃ ১৮৮৮ খ্রীঃ উক্ত মাদ্রাসা পরিদর্শন করে মন্তব্য দেন ঃ ... 'এ শহরে একটি ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক ছাত্র নিয়ে মাদ্রাসাটি যে অনিবার্য প্রয়োজন মেটাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। আমি সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী, উর্দু ও ফার্সি পাঠদান পরীক্ষা করেছি। সবক্ষেত্রেই পাঠের মান উন্নত।... মাদ্রাসাটির আর্থিক সংকটের কারণে নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। ... এখানের বিপুল সংখ্যক মুসলিম ছাত্রের কথা বিবেচনা করে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কিংবা মোহসীন ফান্ড থেকে সাহায্য পাওয়ার দাবী খুবই যুক্তিসংগত।'[২৮৪]

নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পরেও নওয়াব এস্টেট থেকে উক্ত মাদ্রাসা ও স্কুলটি যথারীতি পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে। ১৯০৪ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ মাদারীপুর কাঁচারীসমূহ পরিদর্শন কালে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক দুর্দশা দেখতে পান।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এর জন্য পূর্ব নির্ধারিত সাহায্য ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করে দেন। এছাড়া স্কুল গৃহ পুনর্নির্মাণে একহাজার টাকা দান করেন। উক্ত মাদ্রাসার দ্বিতীয় মৌলভী নওয়াব সাহেবকে তাঁর সাংসারিক অস্বচ্ছলতার কথা জানান। নওয়াব সাহেব তাঁকে একশত টাকা দান করেন।[২৮৫]

৭(৬)(ঙ) নেত্রকোনা মাদ্রাসা স্থাপন ঃ

মাদারীপুরের ন্যায় ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় চাকুরীকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌঃ মোহাম্মদ আজহার সেখানকার গণ্যমান্য মুসলমানদের নিয়ে ৬মার্চ ১৮৯৭ খ্রীঃ একটি সভা করেন। তিনি স্থানীয় মসজিদটির সংস্কার এবং এর সাথে একটি মাদ্রাসা তৈরীর উদ্যোগ নেন। জনাব আজহার এজন্য গঠিত কমিটির সভাপতি এবং মৌলভী তালাত্তাফ হোসেন (সাব-রেজিঃ) সেক্রেটারী হন।[২৮৬] কমিটি বহু চেষ্টা করে ঢেউ টিনের ছাউনি এবং হোগলার বেড়া দিয়ে মসজিদটির সংস্কার করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ মৌঃ মোহাঃ আজহার বালাশোরে বদলী হয়ে যান। কমিটি ৪-৫ বছরে মাত্র ৮০৮ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করতে পেরেছিল। যার দ্বারা তাঁরা উপরোক্ত মসজিদের কাজটি কোনরকমে করেছিল। কিন্তু মাদ্রাসা তৈরীর কাজ তেমন হয়নি। অর্থাভাবে পরিকল্পনাটি ক্রমে স্থবিরতায় পর্যবসিত হতে থাকে।

এমতাবস্থায় কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকার বদান্যবর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর নিকট প্রতিষ্ঠানটির জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। নওয়াব সাহেব বিষয়টি তদন্ত করে সুপারিশ দেয়ার জন্য তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক বাবু নিখিলেশ চন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দেন। উক্ত প্রশাসকের অনুকূল সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০২ সালের মে মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহ ৩৩৩০ টাকা উক্ত প্রতিষ্ঠানে দান করেন।[২৮৭] নওয়াবের প্রদত্ত উক্ত অর্থ দ্বারা মসজিদের উন্নয়ন ছাড়াও ১৯০২ সালেই পূর্ণাঙ্গ ভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এছাড়া মাদ্রাসার জন্য ১৬০০ টাকা ব্যয় করে ৪৮ X ২২ ফুট পরিমাপের একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। ছাত্রাবাসটি পাকা ভিতের উপর কাঠের খুঁটি ও ঢেউটিনের ছাউনি দিয়ে তৈরী করা হয়। এছাড়া ছাত্রাবাসের জন্য ঢেউটিনের রান্নাঘর ও একটি পাকা শৌচাগারও নির্মিত হয়। ছাত্রাবাসটিতে ২৫জন আবাসিক ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং মাদ্রাসার একজন মৌলভী শিক্ষককে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রাবাসটির ছাঁদ পাকা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।[২৮৮] তৎকালে উক্ত মাদ্রাসা ও মসজিদ গৃহটিই ছিল নেত্রকোনা শহরে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমারত। ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মাদ্রাসার মত নেত্রকোনা মাদ্রাসাটিও ছিল এ্যাংলো এরাবিক মাদ্রাসা। এখানে দুইজন মৌলভী শিক্ষক এবং একজন পন্ডিত শিক্ষক নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০৫ সালে মাদ্রাসার সেক্রেটারীর প্রদত্ত এক রিপোর্টে জানা যায়, শুধুমাত্র নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর বদান্যতার উপর নির্ভর করেই এই প্রতিষ্ঠানটি ভালভাবে স্থাপন ও পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। এজন্য সেক্রেটারীর উক্ত রিপোর্টে নওয়াবের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছিল।[২৮৯] সেই শিক্ষা বিমুখ যুগে মাদ্রাসাটি ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

৭(৬)(চ) জামুর্কী আব্দুল গণি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠাঃ

আগেই বর্ণিত হয়েছে, টাঙ্গাইলের জামুর্কীতে ঢাকার নওয়াবদের গুরুত্বপূর্ণ জমিদারী আটিয়া পরগণার জন্য একটি বড় ধরনের কাচারী ছিল। নদীর তীরে অবস্থিত জামুর্কীর বাজারটি ঐ এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠায় সেটা এতদাঞ্চলের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে পরিচিত হয়েছিল। জামুর্কীতে ঢাকার নওয়াবরা জনকল্যাণার্থে একটি মসজিদ, একটি হাসপাতাল[২৯০] এবং একটি হাই স্কুল স্থাপন করেছিলেন। হাই স্কুলটি নওয়াব আব্দুল গণির নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে জামুর্কীর প্রতি ঢাকার নওয়াবদের দায়িত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল।[২৯১] বলা বাহুল্য, নওয়াব এস্টেট থেকে দেয়া বার্ষিক অনুদানে স্কুলটি পরিচালিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৬ খ্রীঃ ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ এলাকা ভ্রমন কালে ১৮ সেপ্টেম্বর নওয়াবের জামুর্কী কাঁচারী পরিদর্শন করেন। তবে সময়ের অভাবে তিনি চিকিৎসালয় ও কাঁচারী পরিদর্শন করলেও সেদিন স্কুলটি পরিদর্শন করতে পারেননি।[২৯২] ১৯০২ খ্রীঃ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ তাঁর চীফ ম্যানেজার মিঃ জি. এল. গার্থ সহ জামুর্কী কাঁচারী পরিদর্শন করেন। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে নওয়াব সাহেব মোহরা তৈল ঘাটে তাঁর 'তুরাগ' নামক ষ্টীমার থামিয়ে তা থেকে ছোট নৌকায় চড়ে জামুর্কীতে পদার্পন করেন। সেখান থেকে নওয়াব সাহেব হাতীতে চড়ে অসংখ্য দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে জমিদারী কাঁচারীতে পৌছেন। কাঁচারীর হলঘরে স্থানীয় গণ্যমান্যদের সাথে তিনি একটি দরবারে মিলিত হন। পরদিন বুধবার সকালে পাকুল্যা ও জামুর্কীর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে স্থানীয় জমিদার আব্দুল গফফার চৌধুরী ও মৌলভী নওশের আলী ইউসুপজি, সাব-রেজিষ্ট্রার, মৌঃ তোজাম্মল আলী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নওয়াবের স্টীমারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। উক্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে নওয়াব সলিমুল্লাহ জামুর্কী হাসপাতাল ও স্কুলটির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।[২৯৩]

১৯২৯ -৩০ সালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে পড়ে স্কুলটি সমস্যায় নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় প্রধান শিক্ষক সাহেব স্কুল সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গণ্যমান্যদের নিয়ে স্কুল গৃহে একটি সভা করেন। উক্ত সভায় নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার মিঃ পি.জি. গ্রিফিথ যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, পুনরায় ঐরূপ পলিটিক্সে জড়িত হলে এস্টেট থেকে স্কুলের অনুদান দেয়া বন্ধ করা হবে। উক্ত চীফ ম্যানেজারের তৈরী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এরপর থেকে স্কুলটি যথাযথভাবে চলতে থাকে।[২৯৪]

৭(৬)(ছ) বিক্রমপুর দিঘিরপাড় ছলিমিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন ঃ

বাংলা ১৩০৯ মোতাবেক ১৯০২ খ্রীঃ জনৈক মোহাঃ আব্দুল হালিম বিক্রমপুরের দিঘিরপাড় পুরাতন বাজার নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ঐ যুগে অত্র এলাকায় ইসলামী নিয়ম নীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে স্থানীয় মুসলমানেরা হিন্দুদের ন্যায় অনৈসলামিক আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উক্ত অবস্থা নিরসনকল্পে নোয়াখালী অঞ্চল থেকে আগত উক্ত মোঃ আব্দুল হালিম স্থানীয় জনগণের সহায়তায় মাদ্রাসাটি গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণে উলানিয়ার জমিদার এসলাম উদ্দিন চৌধুরী, ভূমি দান এবং দিঘিরপাড় নিবাসী জনৈক বছির উদ্দিন মোল্লা অর্থদান করেছিলেন।[২৯৫] তাঁদের দানে একটি টিনের ঘর তৈরী করে মাদ্রাসাটি কোনরকমে চলছিল। অর্থাভাবে এর তেমন কোন উন্নতি হচ্ছিল না।

১৯০৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মৃগয়া উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুর বিক্রমপুর গিয়ে ঐ মাদ্রাসাটির অর্থ কষ্টের কথা অবগত হন।[২৯৬] তাঁর আগমণার্থে ৮ নভেম্বর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত মাদ্রাসাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাসিক ২০ টাকা করে অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। নওয়াব এস্টেট থেকে উক্ত অর্থ নিয়মিত প্রদান করা হতো। এছাড়া মাদ্রাসাটির উন্নয়নেও প্রচুর অর্থ সাহায্য দেয়া হতো। নওয়াবের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে গিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক মন্ডলী ও স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেন 'ছলিমিয়া মাদ্রাসা'। এছাড়াও তাঁরা ঘটনার সংক্ষিপ্তসার সহ নওয়াবের উক্ত দান কাজের জন্য একটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পত্র প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত পত্রের একটি কপি এখনও আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। পরিশিষ্ট নং ১৭ পৃঃ৪৩২তে পত্রটির কপি দেয়া হলো।

৭(৬)(জ) নওয়াব হাবিবুল্লাহ স্কুল প্রতিষ্ঠা ঃ

আহসান মঞ্জিলের উত্তরে নওয়াবদের জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে নওয়াব হাবিবুল্লাহর নামে একটি স্কুল রয়েছে। খাজা সোলেমান কাদরের নেতৃত্বে নওয়াব পরিবারের মধ্যবিত্ত সদস্যরা ১৯১৪ সালের ৮ জানুয়ারী স্কুলটি প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[২৯৭] তৎকালে খাজা পরিবারের অনেকেরই স্কুলগামী সন্তানদের গৃহশিক্ষক রেখে পড়ানোর সমর্থ ছিলো না। খাজা সোলেমান কাদর তাই উক্ত মক্তবের মাধ্যমে এরূপ ছাত্রদের কোচিং দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এজন্য প্রথমদিকে স্কুলটির নাম ছিলো 'ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি বয়েজ মক্তব এন্ড কোচিং ক্লাসেস।'[২৯৮] খাজা সোলেমান কাদর একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও খেলোয়াড় ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী কংগ্রেসের সাথে মিলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি ঢাকায় উক্ত আন্দোলনের স্তিমিত অবস্থা দেখে হতাশ হন। তদুপরি উক্ত আন্দোলন কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের কারণে সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দু সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন এবং মুসলিম সন্তানদের লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া দেখে তিনি ব্যথিত হন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে উন্নত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[২৯৯] এই প্রেক্ষিতে উপরোক্ত মক্তবটিকে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুলে পরিণত করার প্রয়াস পান। তিনি বহু চেষ্টা করে অবশেষে ১৯২৫ সালে ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে মাসিক ২৫০ টাকা উক্ত স্কুলের জন্য বরাদ্দ করতে সক্ষম হন। ঐ সময়ে স্কুলটির নামকরণ করা হয় 'নওয়াব হাবিবুল্লাহ বয়েজ স্কুল।' এই আমলেও যথারীতি আগের মতই সকাল ও সন্ধ্যায় ছাত্রদেরকে কোচিং দেয়া হতো। তবে শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছিল এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো। এমনকি নওয়াব পরিবারের বাইরে আশেপাশের মহল্লা থেকেও অনেক ছাত্র এখানে পড়তে আসতো। সরকারী স্কুলের সিলেবাস অনুযায়ীই এখানে বই পুস্তক পড়ানো হতো। ছাত্রদের নিকট থেকে মাসে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা করে বেতন নেয়া হতো। পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্রদেরকে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা শিক্ষা দেয়া হতো। গোল পুকুরের পাড়ে ছাত্রদেরকে দৌড় শিক্ষা দেয়া হতো।[৩০০] উক্ত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে খাজা মোঃ কায়সার, খাজা খায়রুদ্দিন, খাজা আব্দুল হালিম, খাজা মোঃ আজাদ, খাজা রহমান কাদর, খাজা মাহমুদুল হাসান, খাজা ফরিদ, খাজা শফিউদ্দিন প্রমুখগণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্কুলটি পরিচালনার জন্য নওয়াব আব্দুল গণির কন্যা মুনিজা খানম (বাককা বিবি) তাঁর একতলা ভবনের কয়েকটি কক্ষ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কিছু অর্থের বিনিময়ে জায়গাটি স্কুলের নামে লিখে দেন।[৩০১]

১৯৫২ সালে ঢাকা নওয়াব এস্টেট সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করা হলে অর্থাভাবে স্কুলটি দুর্দশায় পতিত হয়। ১৯৬০ সালের পর এস্টেট থেকে অর্থদান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এসময় খাজা পরিবারের কয়েকজন উদ্যোগী সদস্যের প্রচেষ্টায় সেটা কোনরকমে টিকে থাকে। ১৯৭০ এর গণ আন্দোলনকালে স্কুলটি বন্ধ থাকে। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালে খাজা খায়রুদ্দিনের সহায়তা নিয়ে কিছুদিন সেখানে যুদ্ধাহত রাজাকারদের রেখে চিকিৎসা করা হয়। স্বাধীনতার পর স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা স্কুল ভবনটিকে তাঁদের ওয়ার্ডের কার্যালয়ে পরিণত করে রাখেন। খাজা পরিবারের কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় অবশেষে ১৯৭৬ সালে পুনরায় সেখানে পূর্বোক্ত নামে একটি প্রাইমারী স্কুল (সহশিক্ষা) চালু করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থানের কারণে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে সেলামী নিয়ে আশির দশকে পুরানো ভবনটি ভেঙ্গে সেখানে চার তলা ভবন তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে নীচতলা ও দোতলায় মার্কেট এবং তিন ও চার তলায় স্কুল চলছে। উক্ত স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার চেষ্টা চলছে।[৩০২]

৭(৬)(ঝ) কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠাঃ

ঢাকা শহরের টিকাটুলী এলাকায় অভয় দাস লেনে কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের অবস্থান। নওয়াবজাদী আখতার বানুর বদান্যতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পিছনে ঢাকার বিখ্যাত সমাজসেবী লীলা নাগ রায়েরও বেশ ভূমিকা রয়েছে। ১৯২০ এর দশকে লীলা নাগ স্বদেশী আন্দোলনকারীদের সহায়তায় দীপালী সংঘ নামে একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান তৈরী করে এতদাঞ্চলের নারী শিক্ষা উন্নয়নে সচেষ্ট হন। উক্ত সংঘ ঢাকা শহরে চারটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এগুলোর মধ্যে দিপালী-১ নামে প্রথম স্কুলটি মুসলিম বালিকাদের শিক্ষা দানের জন্য খোলা হয়েছিল। স্কুলটির অর্থাভাব মোচনের জন্য বিদুষী নওয়াবজাদী এগিয়ে আসেন। তিনি ১৯২৪ সালে তাঁর মাতা কামরুন্নেসার নামে নামকরণের বদলে প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ও অর্থাদি প্রদান করেন।[৩০৩]

Dhaka University Institutional Repository

বেগম কামরুন্নেসা ছিলেন ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সুতিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯০০ সালের ২২ জুন ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্মরণে নওয়াব সাহেব পটুয়াখালীতে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন একথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গর্ভে আখতার বানু ছাড়াও পরীবানু এবং মেহেরবানু নামে নওয়াবের আরো দুটি কন্যা জন্মেছিলেন। উক্ত কন্যারাও এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩০৪]

আগেই বর্ণিত হয়েছে, অভয় দাস লেনে উক্ত স্কুলের পাশেই নওয়াবজাদী আখতার বানু তাঁর পিতা নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর নামে ১৯৩৫ সালে মহিলাদের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নানা কারণে ১৯৪০ এর দিকে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যায়। ভবনাদিসহ হাসপাতালের জায়গাটিও তিনি স্কুলটিকে দান করেছিলেন। এছাড়াও নওয়াবজাদী উক্ত স্কুলের ভবনাদি নির্মাণে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩০৪(ক)] স্কুলটির অদূরে রামকৃষ্ণ মিশনে ভূমিদান সহ সেখানে তিনি একটি ভবন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একথাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নওয়াবজাদী আখতার বানু ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের একজন মহিলা পরিদর্শকও ছিলেন।[৩০৪(খ)]

১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ইডেন গার্লস স্কুলটি ১৯৪০ এর দশকে এসে দূর্দশায় পতিত হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে সেটা কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের সাথে মিশে যায়। ১৯৪৭ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী থাকাকালে স্কুলটি সরকারীকরণ করা হয়।[৩০৫] এটাই ছিল ঢাকার প্রথম সরকারী গার্লস হাইস্কুল। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরের একটি অন্যতম বৃহৎ বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিচিত। সেটা সগৌরবে আজো সেই বিদূষী নওয়াবজাদীর বদান্যতার কথা ঘোষণা করছে। পরিশিষ্টে উক্ত স্কুলের ভবনগুলোর মধ্যে উত্তর ভবনের সম্মুখ দিকের আলোকচিত্র দেয়া হলো (চিত্র নং-৩০ দ্রঃ)

৭(৬) (এঃ) নওয়াব সলিমুল্লাহ কলেজ উন্নয়ন ঃ

১৯২৬ সালে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায়, ঢাকার ফরিদাবাদ পল্লীতে কলঘর নামক প্রকান্ড একটি ভবনে নওয়াব সলিমুল্লাহর নামে একটি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বাবু দীনবন্ধু মজুমদার এম. এ.।[৩০৬] মানবিক বিভাগের প্রায় সবগুলি বিষয়ই উক্ত কলেজে পড়ানো হতো। ছাত্রদের জন্য উক্ত কলেজের প্রথম বর্ষে ১৫টি বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল এবং তাদের মাসিক বেতন ছিল ছয় টাকা।[৩০৭] উক্ত কলেজের পূর্বাপর বিষয়ে আর কিছু জানা যায়নি।

বর্তমানে ঢাকা শহরে টিপু সুলতান রোডে নওয়াব সলিমুল্লাহর নামে একটি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। উক্ত কলেজটি ১৯২৫ সালে জনৈক মন্মথ মোহন রায় (অধ্যক্ষ) কর্তৃক ফরাশগঞ্জের একটি ভাড়া করা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩০৮] শুরুতে কলেজটির নাম দেয়া হয়েছিল 'ইমপেরিয়াল ইন্টারমেডিয়েট কলেজ'। অর্থকষ্ট এবং নিজস্ব ভবন না থাকার দরুন কলেজটিকে ১৯২৯ সালে মিল ব্যারাক এলাকায় এবং সেখান থেকে ১৯৩৪ সালে পুরানো মোগলটুলীতে স্থানান্তর করা হয়।

কলেজের বর্তমান ভবনটি ছিল ঢাকার বিত্তশালী জমিদার লালমোহন সাহার বাসভবন।[৩০৯] ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি উক্ত ভবনে স্থানান্তর করা হয়। এই সময় নওয়াব হাবিবুল্লাহ আর্থিক দূর্দশায় পতিত কলেজটির সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি নওয়াব এস্টেট থেকে এককালীন ছয় হাজার টাকা এর জন্য প্রদান করেন। বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ কলেজটির নতুন নামকরণ করেন ' সলিমুল্লাহ কলেজ'।[৩১০] ১৯৬০ সালে কলেজটিতে ডিগ্রীক্লাশ খোলা হয়।

অত্র অধ্যায়ে ঢাকার নওয়াবদের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ধারা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কিংবা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এদেশের মুসলমানদের শিক্ষিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আর শিক্ষা লাভই তাঁদেরকে সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হতে সহায়তা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯০।

২। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪।

৩। নওয়াব সলিমুল্লাহ, ঢাকা বিশ্বঃ কমিশনে ইসঃ স্টাডিজ বিষয়ের সাব কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন, *রিপোর্ট অব দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি, ১৯১২, কলকাতা. দি বেংগল সেক্রেটারীয়েট বুক ডিপো* ১৯১২ পৃঃ ১ থেকে উদ্ধৃত-প্রফেসর আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬১।

৪। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,*পৃঃ ১৮১ এবং আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* পৃঃ ৪৪-৪৭ এবং সাবা, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ৩৪।

৫। বার্ট, *ট্রেয়েলভমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫-৭৬ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬। প্রাথমিক যুগে ঢাকায় ইংরেজী স্কুল- কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে খাজা আলীমুল্লাহর মত ধনাঢ্য ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি যে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৩৫ সালে ঢাকায় কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি সার্বিক সহযোগিতা করা ছাড়াও নিজ পুত্র আঃ গণিকে উক্ত স্কুলে ভর্তি করান। ১৮৪১ খ্রীঃ এ স্কুলের সাথেই ঢাকা কলেজ শাখা খোলা হয় এবং তাতেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। ১৮৪৮-৫০ সালে ঢাকা কলেজ পরিচালনা কমিটিতে খাজা আলীমুল্লাহর নাম পাওয়া যায় (*এ্যানুয়াল রিপোর্ট অব -- কলেজ অব ঢাকা ---* ১৮৪৭ খ্রীঃ থেকে উদ্বৃত মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭।

৬। আজিমুশ্শান হায়দার, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫ । অবশ্য খাজা পরিবারের নওয়াবী রেস ছাড়া অন্যান্য শরীকের সদস্যরা যাঁরা ঢাকার বাইরে কলকাতা ইত্যাদি শিক্ষাস্রোত শহরে বসবাস করতো, তাঁদের কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতো বলে জানা যায়। খাজা পরিবারের বিখ্যাত ফার্সী কবি খাজা আসাদুল্লাহ কাওকাব কলকাতা আলিয়া মদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে ইংরেজদের অধিনে বড় চাকুরী করতেন এবং পরে তিনি ঢাকায় এসে ওকালতি করতেন। (নওঃ আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ,-*ফার্সী সাহিত্য,* পৃঃ১১)।

৭। নওয়াব আহসানুল্লাহকে ছোট বেলায় ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার জন্য লন্ডনের জনৈক ইংরেজ শিক্ষককে মাসিক এক হাজার টাকা বেতন দিয়ে রাখা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭।

৮। পুরানো দলিল, *ইনডেক্স অব পেপার্স* -১, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৮। আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত জীর্ণ দলিলপত্রের মধ্যে উক্ত স্কুলে তাঁদের ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসের বেতন বাবদ ১২৬ টাকা ১ আনা ৯ পাই পরিশোধের একটি রশিদ রক্ষিত আছে। উল্লেখ্য, নওয়াব হাবিবুল্লাহ দার্জিলিং- এর উক্ত স্কুল ছাড়াও ইংল্যান্ডের সেন্ট ভিসেন্ট ও ইস্টবোর্নে লেখাপড়া করেছিলেন। ইনডেক্স অব পেপার্স -১, ঐ পৃঃ ২২৩ এবং ২২৫, ২২৮-২৯।

৯। মাহেন ও, ডিসেম্বর ১৯৬৪ (পৌষ- ১৩৭১) পৃঃ ৫১ এবং *এস. এম. ইকরাম, মডার্ন মুসলিম ইন ইন্ডিয়া এন্ড দি বার্থ অব পাকিস্তান,* ১৯৬৫ পৃঃ ২২৪। উল্লেখ্য, কেমব্রিজের উক্ত ট্রিনিটি হল থেকেই অত্র পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান, ১৯৬৩-৬৭ সালে অধ্যয়ন করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

১০। ঢাকা প্রকাশ ৭ আগস্ট ১৯২৭ পৃঃ ৩ , জুলেখা বানু (১৯০৪-৭৪ খ্রীঃ) ১৯২০ সালে কলকাতার ডায়োসিসান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২৫ সালে আই. এ. এবং ১৯২৭ সালে ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পাশ করেন। ভাল ফলাফলের জন্য পুরস্কার স্বরূপ মাতা পরীবানু তাঁকে বিমানে চড়ার সুযোগ করে দেন। ১৯২৭ সালে সিভিল সার্ভিসের খোন্দকার গোলাম মোর্শেদের সাথে তার বিয়ে হয়। (এক পুত্র ও এক কন্যা) ১৯২২ সালে জুলেখা বানু মায়ের সাথে বিলাত ভ্রমন করেন। সোনিয়া আমিন, শরিফ বিবি যাঁ, ভদ্র মহিলা জুলেখা বানুর সংস্কৃত পাঠ, দৈনিক সংবাদ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৪।

১১। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬, দানের তালিকা দ্রঃ।

১২+১৩। ইউসুফ হোসেন সম্পাদিত, *সিলেকটেড ডকুমেন্টস ফরম দি আলিগড় আর্কাইভস,* ১৯৬৭ পৃঃ ১৮০ -৮১ থেকে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৯, এবং *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৩৬।

১৪। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস,* পৃঃ ২৯০

১৫। বার্ট, *ট্রেয়েলভ মেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৭।

১৬। ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৮৮২ পৃঃ ৩১। ঢাকা ক্লাবের পাঠাগারেও তিনি একবার ৪ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬, দানের তালিকা দ্রঃ।

১৭। বইগুলোর একটি তালিকাও আহসান মঞ্জিল যাদুঘরের গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, নওয়াব এস্টেট অফিসে থাকাকালে পাক আমলে জনাব মোহর আলী কর্তৃক বইগুলোর জন্য তৈরীকৃত তালিকার দুইটি কপি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রেয়ার সেকশনে জমা আছে। সংযোজন নং- এ-৫৬৮৬৫/০১০ এন.এ.এল.সি-১।

১৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭।

১৯। কেদারনাথ রায়, *ঢাকার বিবরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪ এবং চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ, ফেব্রুঃ ১৯৯৭ পৃঃ ৩৪

২০। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুলাই ১৮৬৩ পৃঃ ১৯৬ এবং ২৭ জানুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩। স্কুলটির বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২১। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ দানের তালিকা দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

২২। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩। এখানে উল্লেখ্য যে, কামরুদ্দিন আহমেদ ব্যক্তিগতভাবে নওয়াব হাবিবুল্লাহ ও খাজা নাজিমুদ্দিনের আমলে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন রাজনীতি করতেন। তাঁর ধারণা ছিল নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় থেকে বাংলার মুসলিম লীগের নেতৃত্ব আহসান মঞ্জিলে বন্দী রয়েছে এবং তা মুক্ত করতে তিনি সর্বোতভাবে তৎপর ছিলেন। তিনি আহসান মঞ্জিলের রাজনীতির পতনের মধ্যে বাস্টিলের পতনের ছবি দেখতেন। (কামরুদ্দিন আহমেদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্ম বিকাশ, ২য় খন্ড, ১৩৮২ পৃঃ ১৯, ২১, ২৪, ৪০ ১০৩ দ্রঃ) এছাড়া আগের দিনে ঢাকার নওয়াবরা বিরুদ্ধবাদীদের গুন্ডা দিয়ে আহসান মঞ্জিলে ধরে এনে নির্যাতন করতেন বলে তিনি যে তথ্য দিয়েছেন তার সপক্ষে কোন প্রমাণ তিনি দেননি। প্রাগুক্ত বইয়ের পৃঃ ১০৩ দ্রঃ। এছাড়া মিটফোর্ড হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণে নওয়াব খান্দানের কোন দান ছিল না বলে তিনি (জনাব কামরুদ্দিন) যে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। অত্র গ্রন্থের অধ্যায় ৫ তথ্যসূত্র নং - ১৫ দ্রঃ।

২৩। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেঃ ১৯০১ এবং *মোসলেম ক্রনিকেল,* ২১ ডিসেঃ ১৯০১ এবং ২৫ ফেব্রুঃ ১৮৯৯।

২৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ আগস্ট ১৮৬৬ পৃঃ ২৮৬।

২৫। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ১৮৭৪ খ্রীঃ দ্রঃ আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত। (সংগ্রহ নং আ-৯৩.২৭৪)

২৬। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ১৮। উক্ত ইঞ্জিঃ স্কুল সম্পর্কে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৭। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ও ১৭ আগস্ট, ১৮৮৪ পৃঃ ১০ ও ২৭২ এবং *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১-৫২।

২৮। পরিশিষ্ট নং ১২ তে দেয়া অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং- ৫৬, ৫৭, ৬৬, ৬৯, ৮২, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৪-৯৬, ৯৮, ১১১, ১২৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৪, ১৬০, ১৭৫-৭৬, ১৮৮, ১৯৩, ২১০, ২২৯, ২৩৩, ২৩৬, ২৪৬, ২৬০, ২৭০, ২৮৫ দ্রঃ।

২৯। ঢাকা প্রকাশ, ৪ এপ্রিল ১৮৮০ এবং মোঃ আঃ কাইউম, চকবাজারের কেতাবপট্টি, ঢাকা নভেঃ ১৯৯০ পৃঃ ৪৮।

৩০। ঢাকা প্রকাশ, ২০ ডিসেম্বর ১৮৮৫ পৃঃ ৪৩৯ এবং আঃ কাইউম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬২।

৩১। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী...* ধারা, ১ম খন্ড, ঢাকা ১৯৮৩ পৃঃ ১৫৭।

৩২। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মে ১৮৭৩ খ্রীঃ।

৩৩। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত পত্র, উর্দু ও ফার্সী, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৯। এছাড়াও বহুবার উক্ত সোসাইটির জন্য অর্থদান করা হয়।

৩৪। উপেন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *চরিতাভিধান,* কলকাতা- ১৯১২ থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭।

৩৫। *দি মোসলেম ক্রনিকেল, ১৬মে ১৮৯৬ পৃঃ ১২২ এবং* ২৩ ও ১৬ *জানুয়ারী* ১৮৯৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী*--- ধারা, ২য় খন্ড, পৃঃ ১২৭।

৩৬। *মোসলেম ক্রনিকেল,* ১ অক্টোবর ১৮৯৮ পৃঃ ৯৯৮ থেকে উদ্ধৃত- ওয়াকিল আহমদ, ঐ ২য় খন্ড পৃঃ ১১৭-১৯।

৩৭। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৮।

৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪

৩৯। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত। আগেই বর্ণিত হয়েছে ঐ এতিম বালকেরা হাম্মাদিয়া মদ্রাসায় পড়াশুনা করতো।

৪০। *প্রসিডিংস অব দ্য ফার্ষ্ট প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অব ইস্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম,* ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬ ও ২৩৯-৪৪। উল্লেখ্য পূর্ব থেকেই যুক্তবঙ্গে বংগীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি নামে যে সংগঠন ছিল, নওয়াব সলিমুল্লাহ সেটার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলাম প্রচারক, ৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ (১৯০৩) থেকে উদ্ধৃত- মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,* (১৯৭৭) পৃঃ ৪৮।

৪১। ঐ, *প্রসিডিংস,* ১৯০৬ দ্রঃ।

৪২। ঐ, *প্রসিডিংস,* ১৯০৬ দ্রঃ।

৪৩। আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭-১৯

৪৪। *রিপোর্ট অব দি প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স ১৯১১ পৃঃ ১* থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২০।

৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩।

৪৬। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩ (সংক্ষেপিত)

৪৭। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩ (সংক্ষেপিত)

৪৮। ঐ *প্রসিডিংস,* ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৯-৪২

৪৯। ঐ *প্রসিডিংস,* ১৯০৬ দ্রঃ

৫০। সভাপতির ভাষণ, *অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স,* অমৃতসর ১৯০৮ পৃঃ ৪-১০ মূল উর্দু থেকে বাংলায় অনুদিত, আব্দুল্লাহ- *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯ দ্রঃ

৫১। ঐ সভাপতির উর্দু ভাষণ, অমৃতসর ১৯০৮, অনুদিত আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৪। উল্লেখ্য, এই প্রেক্ষিতে 'মুসলিম শিক্ষা ও সরকারী সার্কুলার' এই শিরোনামে ঢাকা প্রকাশ ১৯০৬ সালে একটি সংবাদ প্রকাশ করেন যে, মুসলিম ছাত্রদের জন্য স্কুল কলেজে ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে এবং অভিজ্ঞ মৌলভীর তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাস থাকবে। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৬ পৃঃ ৫।

৫২। ঐ, সভাপতির ভাষণ, অমৃতসর ১৯০৮, উর্দু থেকে অনুদিত, আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩। *ঐ. প্রসিডিংস অব দি ফার্স্ট সেশন. মোহাঃ এডুঃ কনফাঃ ১৯০৬ রেজুলেসন- ১০ পৃঃ ২৫* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১২৬-২৭।

৫৪+৫৫। আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬-২৭।

৫৬। ঐ, *প্রসিডিংস অব দা ফার্স্ট ... কনফারেন্স*, ১৯০৬ পৃঃ ৮ থেকে কপিকৃত, আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ২৩৯-৪০ এবং ১২৮, ১৩৮

৫৭। *ঐ প্রসিডিংস, ১৯০৬ রেজুলেশন নং- ১১ এবং ঐ, প্রসিডিংস অব দ্য সেকেন্ড কনফারেন্স ১৯০৮ ইং পৃঃ ৫৬* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৯।

৫৮-৫৯। সৈয়দ মুর্তজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসংগ, ঢাকা ১৯৭৬ পৃঃ ১৩৯ থেকে উদ্ধৃত-*আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১৩১। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন- নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, এইচ.ই. স্টেপলটন, কাজী রেয়াজুদ্দিন আহমদ, আমীরুদ্দিন আহমদ, কামালুদ্দিন আহমদ ও হাফেজ আঃ রাজ্জাক।

৬০। ঐ, সৈয়দ মুর্তজা আলী থেকে উদ্ধৃত-*আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১৩০।

৬১। *রিপোর্ট অব দি মোসলেম এডুকেশন এডভাইজরি কমিটি, ১৯৩৪ পৃঃ ৭৬-৭৭* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১৩১।

৬২। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ এপ্রিল ১৯১১ খ্রীঃ। উল্লেখ্য, উক্ত পরিষদে নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে সরকারের ধীর গতিরও কঠোর সমালোচনা করেন।

৬৩। মতিউর রহমান, *এ স্টাডি অব দি মুসলিম লীগ ইন ব্রিটিশ পলিটিক্স, লন্ডন ১৯৭০* পৃঃ ৩৩৯-৪০ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১৩১ ও ২১৬।

৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ১১ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩।

৬৫। *রিপোর্ট অব দি মোসলেম এডুঃ এভাইজরি কমিটি ১৯৩৪ পৃঃ ৭৬-৭৭* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিঃ* পৃঃ ১৩১। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঊনিশ'শ ষাটের দশকে নিউ স্কীম মদ্রাসাগুলোকে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়। কিন্তু ধাপে ধাপে আধুনিকায়ন করায় বর্তমানে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর অনুসৃত নীতিরই পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে এবং সেগুলো এখন সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার কাছাকাছি এসে গেছে। এমনকি তাঁর প্রচেষ্টার ফলে নিউস্কীম মাদ্রাসার পাশাপাশি যুগের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ওল্ডস্কীম মাদ্রাসারও অগ্রগতি হয়। ধাপে ধাপে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করায় ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলো বর্তমানে অনেকটা তৎকালীন হাই মাদ্রাসার রূপ ধারণ করেছে। প্রফেসর আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬ পৃঃ ৩২-৩৩।

৬৭। আঃ রহিম, *হিস্টরী অব ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৮১ পৃঃ ৯*।

৬৮। *রিপোর্ট অব দা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি, ১৯১২ পৃঃ ১* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিঃ* পৃঃ ১৬২

৬৯। ঐ, প্রসিডিংস, ফার্স্ট মোহাঃ এডুঃ কনফারেন্স ১৯০৬ পৃঃ ৭-৯ থেকে কপিকৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিঃ* পৃঃ ২৪৩-৪৪।

৭০। ঐ, *প্রসিডিংস*, ১৯০৬ পৃঃ ৬-৯, কপিকৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিঃ* পৃঃ ২৪৪ এবং দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৩।

৭১। ঐ, *প্রসিডিংস*, ১৯০৬ রেজুলেশন নং- ৫ পৃঃ ২৩ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, পৃঃ ১৩২।
১৯১১ খ্রীঃ ১৫ ও ১৭ মার্চ আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় সভাপতি নওয়াব সলিমুল্লাহ ঘোষণা দেন যে, এই প্রদেশের বহিস্থ দুইজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম এই প্রদেশের শিক্ষার জন্য প্রত্যেকেই ১৫ হাজার টাকা করে দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ১৯১১ পৃঃ ৫) প্রফেসর আব্দুল্লাহ মনে করেন, ঐ দুজন ছিলেন আলীগড় নেতা আগাখান ও মাহমুদাবাদের রাজা এবং তাঁরা সলিমুল্লাহর প্রস্তাবিত ঢাকা মোহামেডান হল নির্মাণে উক্ত অর্থ দান করেন। (আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিঃ পৃঃ ১৫৪) ঢাকা কলেজের সংশ্রবে এই হল নির্মাণের কথা হয়। কিন্তু দাতাদের প্রতিশ্রুত চাঁদার প্রায় সবই ছিল স্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকা ছিল অল্প। তাই সম্পত্তি রেহান রেখে ঋণের মাধ্যমে হল নির্মাণ করে সম্পত্তির আয় থেকে তা পরিশোধের পরিকল্পনা নেয়া হয়। (ঐ প্রসিডিংস অব দ্য থার্ড কনফারেন্স ১৯১০ পৃঃ ২৫ উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, ঐ পৃঃ ১৩৩)। কিন্তু কোথাও ঋণ না মেলায় পূর্ববংগ সরকার ১৯১১ সালে এর সম্পূর্ণ নির্মাণ খরচ দিতে চান। ১৯১২ খ্রীঃ ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা কলেজ প্রাংগনে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের শেষ লেঃ গভর্নর স্যার বেইলী প্রস্তাবিত মোহামেডান হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। (ঢাকা প্রকাশ, ২৪ জুন ১৯১২ পৃঃ ৩)। বংগ বিভাগ রদের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কমিটি মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন এবং উক্ত মোহামেডান হলকে উক্ত কলেজের অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কলেজে মোহাঃ হলের বদলে ঢাকা বিশ্বঃ জন্যে মুসলিম হল নির্মাণের সুপারিশ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কার্যারম্ভের আগে হোস্টেল স্থাপনের কাজও আর হয়নি বিধায় উক্ত মোহামেডান হল তৈরীর কাজটি চাপা পড়ে যায়। তবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কালে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক মুসলিম হলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ সময় কলা ভবনের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভবন) দোতলার কিছু অংশ উক্ত মুসলিম ছাত্রাবাসের জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেলে স্বতন্ত্র নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয় এবং বংগের গভর্নর নওয়াব সলিমুল্লাহর নামে নির্মিত মুসলিম হলের ভিত্তি স্থাপন করেন যা, ১৯৩১ সালে উদ্বোধন করা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন পরে হলেও ঢাকায় মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণে নওয়াব সলিমুল্লাহর স্বপ্নসাধ বাস্তবতা পায়। (পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ১৯০৬-১২, কলকাতা ১৯১৪ পৃঃ ২৫ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, নওঃ সলিঃ পৃঃ ১৩২-৩৩ এবং মামুন, ঢাকা প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৫ এবং ঢাকা বিশ্বঃ রিপোর্ট ১৯২২-২৩। আগেই বলা হয়েছে, ঢাকা মাদ্রাসার জন্য ডাফরিন ছাত্রাবাস নির্মাণে নওয়াব সলিমুল্লাহ মোটা অংকের অর্থদান করেন। (ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ডিসেঃ ১৯০৫ পৃঃ ৩)।

৭২। উক্ত কাজে ৭-৮-১৯১১ তারিখ হেমায়েতউদ্দিন- কে দেয়া ১০ টাকার একটি রশিদ এখনো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩+৭৪। ১৯১২ সালের ৩-৪ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ৫ম অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রদত্ত ভাষণ দ্রঃ। উদ্ধৃত করেছেন, পীরজাদা শরিফুদ্দিন, *ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান, করাচী- ১৯৬৯, ভল্যুম ১ পৃঃ ২৪০-৪১* এবং আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১৪৭।

৭৫। সভাপতির উর্দু ভাষণ, *অল ইন্ডিয়া মোহাঃ এডুঃ কনফারেন্স,* অমৃতসর ১৯০৮ পৃঃ ১১, অনুবাদকৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ২৯৬

৭৬। উক্ত শিক্ষা সমিতি মুসলিম শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বেশ কিছু বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে। ঐ ভাষণ, ১৯০৮ খ্রীঃ। *অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ* এর ৫ম সেসন, মার্চ ১৯১২, কলকাতাতে নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, উদ্ধৃত- শরিফুদ্দিন পীরজাদা, *ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান,* প্রাগুক্ত ভল্যুম-১, পৃঃ ২৪০-৪২ এবং আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১৪৮।

৭৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ ৩।

৭৮-৭৯। ১১ এপ্রিল ১৯১৪ শিক্ষা সমিতির সভায় দেয় সলিমুল্লাহর ভাষণ দ্রঃ। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩।

৮০। *রিপোর্ট অব দি কমিটি* -মোহাঃ এডুকেশন ১৯১৫ পৃঃ ১৩ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১৬৮। নওঃ সলিমুল্লাহর চেষ্টায় সরকার প্রণীত উক্ত ব্যবস্থার ফলে বঙ্গদেশে ক্রমে মুসলিম ছাত্র ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯ খ্রীঃ এক সরকারী হিসেবে জানা যায় যে, ঐ সময় পর্যন্ত কলেজে ১০%, উচ্চ ইং বিদ্যালয়ে ২০%, মধ্য বাংলা স্কুলে ৩৩% এবং নিম্ন পাঠশালাতে ৪০% মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছিল (ঢাকা প্রকাশ, ৩০ মার্চ ১৯১৯ পৃঃ ৩) এছাড়া ১৯০৫ সালে বংগ বিভাগের ফলে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা এতই বাড়ে যে, ১৯১২ সালে এক হিসেবে দেখা যায়, ঐ সময় মুসলমান ছাত্র ছিল ৫৩.৫ জন, অর্থাৎ ৪৪.৫ জন বেড়েছিল। (নওয়াব আলী চৌঃ পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা ১৯০৬-১২, কলকাতা, এপ্রিল ১৯১২ পৃঃ ১-৩।

৮১। সুফিয়া আহমেদ, *মুসলিম কম্যুনিটি ইন বেংগল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৫।*

৮২। এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী, বংগভংগ ও তৎকালীন বংগীয় সমাজ ও রাজনীতি, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্বঃ ২৪বর্ষ ১৩৯৭,পৃঃ ৩৬

৮৩। নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ভাষণের কপি দ্রঃ উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বিতর্ক চলার পর ১২ মার্চ ১৯১২ বিলটি নাকচ হয়ে যায়।

৮৪। মোঃ নুরুজ্জামান, হুজহু-ঢাকা, ২য় সংস্করণ পৃঃ ১৫৬ এবং বাংলা বিশ্বকোষ, আঃ হাকিম সম্পাদিত, ৩য় খন্ড ১৯৭৩ পৃঃ ৪৯ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৩ এবং সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৫ পৃঃ ৫৬।

৮৫। নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ১৪ জুন ১৯১৪, মোসলেম ইনস্টিটিউট হল, কলকাতা, কপিকৃত-আব্দুল্লাহ, নওঃ সলিমুল্লাহ, পরিশিষ্ট ২ পৃঃ ২৩৮।

৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুঃ এবং ১৫ নভেঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩ ও ৪

৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জুলাই ১৯০৪ পৃঃ ৩

৮৮। *প্রসিডিংস অব দি লেজিসলেটিব কাউন্সিল অব ইষ্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম,* ৬ এপ্রিল ১৯০৮, পার্ট-৬ পৃঃ ৭১ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিঃ* পৃঃ ১৪৯।

৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ফাল্গুন, ১৩১৪ বাংলা (১৯০৮) পৃঃ ৫।

৯০। *রিপোর্ট অব দ্য প্রসিডিংস অব দ্য সেকেন্ড প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল কনফারেন্স হেল্ড এট ময়মনসিংহ অন দ্য এইটিন এন্ড নাইনটিন এপ্রিল ১৯০৮ পৃঃ ৬১-১১০* থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি পৃঃ ৪৬-৪৭।

৯১। *ঐ প্রসিডিংস অব দ্য থার্ড কনফারেন্স হেল্ড এট বগুড়া, ২৬-২৭ মার্চ ১৯১০ পৃঃ ৩৯,* উদ্ধৃত-ঐ পৃঃ ৪৭ ঐ কমিটিতে আরো কজন ইংরেজ ও হিন্দু-মুসলমান সদস্য ছিলেন।

৯২। নওয়াব আলী চৌধুরী পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১২) কলিকাতা, এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩০-৩১) থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ... প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি পৃঃ ৪৭ এবং ১৬০।

৯৩। *এস.কে.ইউ. মোল্লা ওমেনস এডুকেশন ইন আর্লি টুয়েনটিনথ সেঞ্চুরী বেংগল,* থেকে উদ্ধৃত করেছেন, সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড পৃঃ ৭০৫।

৯৪। মোঃ আঃ কুদ্দুস, আলোর দিশারী, ঢাকা ১৯৭৯ পৃঃ ৯৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, শরিফা খাতুন, আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকে বাংলা নারী সমাজ, মুহঃ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, (মোঃ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত, ১৯৮৫ ইং পৃঃ ৩০১-২।

৯৫। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫। কামরুদ্দিন আহমেদকে উদ্ধৃত করে-ডঃ ওয়াকিল আহমেদ লিখেছেন, ঢাকার নওয়াবরা নারী শিক্ষাতো দূরের কথা গৃহের কন্যারা পাছে সম্পত্তির ভাগ দাবী করে এজন্য প্রায় অশিক্ষিত, অকর্মণ্য, অথর্ব- পুরুষের সংগে বিয়ে দিয়ে তাঁদের ঘরে বন্দিনী করে রাখতেন। কামরুদ্দিন আহমেদ, বাংলার মধ্য বিত্তের আত্মপ্রকাশ, ঢাকা ১৩৮২ পৃঃ ৩৫ থেকে উদ্ধৃত-ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী ... ধারা,* ২য় খন্ড পৃঃ ১২৫-২৬।

৯৬। খাজা মোঃ আজগর নওয়াব আঃ গণির জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং ১৮৯১-৯৪ খ্রীঃ এর নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১২৯-৩২।

৯৭। *প্রসিডিংস অব দি প্রভিন্সিয়াল মোহাঃ এডুঃ কনফাঃ ইষ্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম ১৯০৬ পৃঃ ৬* থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,*পৃঃ ৬৪

৯৮। পূর্ববংগের মুসলিম নেতারা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনকে নতুন পূর্ববাংলা প্রদেশে জোরালো করে তোলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা সভায় এবং ১৯০৮ খ্রীঃ অমৃতসরে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে নওয়াব সলিমুল্লাহ, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নয়ন কামনা করেন। এমনকি ১৯১১ খ্রীঃ ১৫ ও ১৭ মার্চ আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত 'প্রাদেশিক মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগের' সভায়ও তিনি আলীগড় বিশ্বঃ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ কমিটির সভাপতি হন। (সভাপতির ভাষণ, মোহাঃ এডুঃ কনফারেন্স ১৯০৮, কপিকৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ১৯১১) ১৯১১ খ্রীঃ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শওকত আলীসহ চেষ্টা চালিয়ে নতুন প্রদেশ থেকে আলীগড়ের জন্য দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ ১৮-১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির সভায় নওয়াব আলী চৌধুরী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম ভারতের একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববংগ এখনো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর জন্য উপযোগী হয়নি বলে বর্ণনা করেন (মতিউর রহমান, পৃঃ ২১৯ এবং *রিপোর্ট অব দ্য সেকেন্ড প্রভিন্সিয়াল মোহাঃ এডুঃ কনফাঃ ১৯০৮ পৃঃ ৪৮* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিঃ* পৃঃ ১৫২)।

৯৯। *রিপোর্ট, অল ইন্ডিয়া মোহাঃ এডুঃ কনফারেন্স- ১৯০৬ পৃঃ ৯২* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১৫৬।

১০০-১০১। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৯১০ পৃঃ এবং ২১ এপ্রিল, ১৯১২ পৃঃ ৩ এবং *দি ইস্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম গেজেট, পার্ট- ৬, এপ্রিল- ২৭, ১৯১০ পৃঃ ৭৮ এবং ৮৯।*

১০২। পূর্ববাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯০৭-৮, ১৯১১-১২, ১ম খন্ড পৃঃ ৮১ থেকে উদ্ধৃত- জাহেদা আহমদ, *রাষ্ট্র ও শিক্ষা,* বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ই, সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৯৩, ৩ খন্ড পৃঃ ১০৭।

১০৩। ঐ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত- জাহেদা আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮-৯।

১০৪। ঐ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত- জাহেদা আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮-৯।

১০৫। সুফিয়া আহমেদ, *নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ, জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ভল্যুম-২১ নং ৩ ডিসেঃ ১৯৭৬ পৃঃ ১৫২ ও ১৬৯* (অবশ্য নওয়াব সাহেব কিভাবে বা কোন্ কাজের মাধ্যমে সরকারকে এ ব্যাপারে চাপ দিচ্ছিলেন তা প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ লিখেন নাই।

১০৬। ঢাকা প্রকাশ, ২০ আগস্ট ১৯১১ পৃঃ ১০।

১০৭-১০৮। ঢাকা প্রকাশ, ২০ আগস্ট ১৯১১ পৃঃ ১০।

১০৯। মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪১ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১৫৮, এবং *দি ক্যালকাটা গেজেট,* পার্ট- ৪-এ. সে-৩, ১৯১৬ পৃঃ ২৯১ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ...* পৃঃ ১৫৪।

১১০। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে এ. কে.ফজলুল হক উক্ত মন্তব্য করেন। দেখুন-উক্ত ভাষণ, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ পৃঃ ২।

১১১। নওয়াবজাদা আহসানুল্লাহ, *দি মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৬ জানুঃ ১৯৬৮* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ৭৭।

১১২। বংগ বিভাগ রদের পর লর্ড কার্জন ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ কাজের সমালোচনা করে দেয়া বক্তৃতায় নওয়াবের উক্ত উক্তির উদ্ধৃতি দেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুঃ ১৯১২ পৃঃ ৩।

১১৩। নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, *প্রেসিডেন্সিয়াল এড্রেস বাই হিম, এট অল ইন্ডিয়া কমুনাল এ্যাওয়ার্ড কনফারেন্স হেল্ড অন দি ২৪ মার্চ ১৯৩৫ এট দিল্লী পৃঃ ২।*

১১৪। নওয়াবজাদা আহসানুল্লাহ, *দি মর্নিং নিউজ,* ঢাকা ১৬ জানুঃ ১৯৬৮ পৃঃ ৭ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৭।

১১৫। মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৯-৪০ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ২১৬।

১১৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জানুঃ ও ৪ ফেব্রুঃ ১৯১২ পৃঃ ৩ এবং কমরেড ৩ ফেব্রুঃ ১৯১২। এ সফর উপলক্ষে শাহবাগ বাগান বাড়ী সুন্দরভাবে সাজানো এবং সেখানে দেশীয় শিল্প কর্মের প্রদর্শনী করা হয়।

১১৭। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত ১৩৬-৩৭।

১১৮। *ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার, ১৯২১-২৪ পৃঃ ১* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১৫৫।

১১৯। *এম.এ.রহিম, হিস্টরী অব দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮১ পৃঃ ৫।*

১২০। *প্রসিডিংস অব দি বেংগল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ৭ মার্চ ১৯২১* , ভল-১, পার্ট-২, ১৪ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল ১৯২১ পৃঃ ২২০-২২৩ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১।

১২১। প্রাগুক্ত *ঢাকা ইউনিঃ ক্যালেন্ডর,* ১৯২১-২৪ এবং ঢাকা প্রকাশ , ৪ ফেব্রুঃ ১৯১২ এবং দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৭।

১২২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের প্রথম সভায় প্রদত্ব ভি. সি. মিঃ হার্টগের দেয়া ভাষণ এবং ১৯২২ সালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর লর্ড লিটনের দেয়া ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১। নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধিদল বড়লাটের সাথে স্বাক্ষাৎ করে মুসলিমদের শিক্ষান্নোতির বিষয়ে নানা কথার অবতারণা করলেও তাঁরা তখন সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি উথাপন করেছিলেন বলে মনে হয় না। প্রফেসর আঃ রহিম তাঁর পূর্বোক্ত তথ্যের সমর্থনে কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি।

১২৩। ১৬ ফেব্রুঃ ১৯২২ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের হিন্দু প্রতিনিধিদল বড়লাটের সাথে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বিপক্ষে নানা যুক্তি পেশ করলে, বড়লাট উত্তরে উক্ত বক্তব্য দেন। ঢাকা প্রকাশ ১৮ ফেব্রুঃ ১৯১২ পৃঃ ৩ এবং এম .এ. রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬

১২৪। ঢাকা প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৯১২ পৃঃ ৩। সম্ভবত মুসলিমরা ঘোষণাটি প্রথম সরকারের তরফ থেকে প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিল, যাতে সরকার তার দেয়া ঘোষণা সহজেই প্রত্যাহার করে নিতে না পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১২৫। ঢাকা প্রকাশ, ৪ ফেব্রুঃ ১৯১২ পৃঃ ৪ । দানী লিখেছেন, ২ ফেব্রুঃ ১৯১২ সরকার একটি ইশতেহার প্রকাশ করে ঢাকা বিশ্বঃ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৭ এবং কলকাতা বিশ্বঃ কমিশন রিপোর্ট, ভল -৪, পার্ট-২ পৃঃ ১৩৩ থেকে উদ্ধৃত করে প্রফেসর রহিম উক্ত তথ্য দিয়েছিলেন। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ-৫।

১২৬। ঢাকা প্রকাশ, ১১ ও ১৮ ফেব্রুঃ ১৭,২৪ ও ৩১ মার্চ, ২১ এপ্রিল ৯ মে ১৯১২ খ্রীঃ এবং ফেব্রুঃ ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্বঃ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেয়া এ. কে. ফজলুল হকের প্রাগুক্ত ভাষণ পৃঃ ২ এবং আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫।

১২৭। যেমন-ব্যারিষ্টার আঃ রসুল, মওলানা আকরম খাঁ, মৌঃ আবুল কাসেম, প্রমুখ ঢাকা প্রকাশ ৩১ মার্চ ১৯১২।

১২৮। পত্রগুলোর মূল কপি ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ্‌ এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

১২৯। আগাখানের উক্ত পত্রের অনুলিপির জন্য পরিশিষ্ট ১৫ দ্রঃ। উক্ত তথ্য থেকে বুঝা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রিটিশদের গৃহীত কৌশল সমর্থন করে এবং মুসলমানদের জনসমর্থন প্রচার করে তাঁরা হিন্দুদের বিরোধীতার মোকাবেলা করেন।

১৩০। উল্লেখ্য, ১০ ফেব্রুঃ ১৯১২ খ্রীঃ ঢাকার উকিল সমাজের উদ্যোগে বাবু ত্রৈলক্যনাথ বসুর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উকিল মৌঃ আব্দুল ওয়াজেদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি ব্যারিষ্টার মিঃ আর. কে. দাস এবং পি. কে. বসু সমর্থন করেন। (ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ফেব্রুঃ ১৯১২ পৃঃ ৩)।

১৩১। ভাষণটির একটি ছাপা কপি নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে আছে। এছাড়া শরিফুদ্দিন পীরজাদার ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান নামক পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভল্যুম ১, ১৯৬৯ পৃঃ ১৩১-৩৩ দ্রঃ।

১৩২। আঃ রহিম ২৫টি সাব কমিটির কথা লিখেছেন। আঃ রহিম প্রাগুক্ত পৃঃ ৮।

১৩৩। *রিপোর্ট অব দি ঢাকা ইউনিভারসিটি কমিটি, ১৯১২ কলকাতা, দি বেংগল সেক্রেটারীয়েট বুক ডিপো ১৯১২ পৃঃ ১৫৯* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, পৃঃ ১৬১-৬২। উল্লেখ্য, নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে বাস্তবায়িত বিফরমড মাদ্রাসার ছাত্ররা যাতে উক্ত উচ্চ শিক্ষালাভ করতে পারে, সেজন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিভাগ রাখা হয়। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯।

১৩৪। এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৫ চৈত্র, ১৩২৩ এবং ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক ইংরেজিতে দেয়া ভাষণের পৃঃ ৩ দ্রঃ।

১৩৫। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১-১২ এবং বাংলা সরকারকে লিখিত ই. ই. বিস, -এর পত্র ৯ জুলাই ১৯১৯ থেকে উদ্ধৃত-জাহেদা আহমদ, *রাষ্ট্র ও শিক্ষা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৩। উল্লেখ্য, ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি উক্ত বিশঃ কমিশন বিশ্ববিদ্যায়ের স্থান পরিদর্শনে ঢাকায় এলে অনেক হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ করে। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেঃ ১৯১৬, পৃঃ ৩।

১৩৬। জাহেদা আহমেদ, *ঐ* পৃঃ ১১৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩ ও ১৭ আগষ্ট ১৯১৯ পৃঃ ৩। উক্ত কমিশন তাদের রিপোর্টে বলেছিল, " We do not forget that the creation of the Dacca University was largely due to demand of the Moslem Community of Eastern Bengal for greater facilities for higher education." কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট, প্যারা-৭৪, চ্যাপটার-৩৩ থেকে উদ্ধৃত, *জাগরন*, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫ পৃঃ ৩৩।

১৩৭। ঢাকা প্রকাশ, ৪ এপ্রিল ১৯২০ পৃঃ ৪। গভঃ জেনারেল ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ বিলে সম্মতি দেন।

১৩৮। *প্রেসিডেন্সিয়াল এ্যাড্রেস অব দি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন অন ১১, ৪, ২০ ঢাকা ১৯২০ থেকে উদ্ধৃত*-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৭-৪৮।

১৩৯। ঐ, উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৪৮।

১৪০। *বেংগল লেজিসলেটিব কাউন্সিল প্রসিডিংস, ভল-১ পার্ট ২, ১৪ মার্চ-৭এপ্রিল ১৯২১ পৃঃ ২২৩-২৪* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

১৪১। *প্রসিডিংস অব দি বেংগল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ৭ মার্চ ১৯২১ ভল-১, পার্ট-২, ১৪ মার্চ-০৭ এপ্রিল-১৯২১* পৃঃ ২২০-২৩ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৯০-৯৪।

১৪২-৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ২১ আগস্ট ১৯২১ পৃঃ ৪। উল্লেখ্য, শামছুল হুদার অবর্তমানে খাজা আফজাল ঐ পদে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন (আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭) আরো উল্লেখ্য, নওয়াব সলিমুল্লাহ এমন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মুসলিম স্বার্থের প্রয়োজনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োজনে খবরদারী করতেও দ্বিধা করতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এর রেজিস্ট্রার মুসলিম ছাত্র, কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না বলে ১৯৩৫ খ্রীঃ প্রকাশিত জাগরণ পত্রিকা আক্ষেপ করে বলেছিল, আজ যদি নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবিত থাকতেন, তবে তিনি তার এই বুজুর্কি সমঝে দিতে পারতেন। (জাগরণ ১ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৩৩৫ বাংলা পৃঃ ৭৩)। খাজা মোহাম্মদ আজম ১৯১৪ সালে ৯ জুলাই আরেকবার এজন্য গভঃ সাথে স্বাক্ষাৎ করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১২ জুলাই ১৯১৪ পৃঃ ৩।

১৪৪। অন্য দুজন মুসলমান শিক্ষক হচ্ছেন ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত এবং এ. এফ. রহমান ইতিহাস বিভাগের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২১।

১৪৫। *বেংগল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস, ভল-৮ পার্ট-২, ২৭ ফেব্রু, -৩১ মার্চ, ১৯২২ পৃঃ ৯৪-৯৫* থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ১৪৯।

১৪৬। ঐ *প্রসিডিংস*, ২৩ মার্চ ১৯২২, ভল-৭, পার্ট-২ নং ৩, ২৭ ফেব্রু ৩১মার্চ ১৯২২ থেকে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, পৃঃ ৯৪-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৭। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০ এবং ঢাকা প্রকাশে ১৫ মে ১৯২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেকটাস, কর্মকর্তাদের তালিকা এবং ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১১ফেব্রুঃ ১৯২৩ ঢাকা বিশ্বঃ প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ জানু, ১৯২৩ পৃঃ ৩।

১৪৮। *এ্যাড্রেস বাই এ. কে. ফজলুল হক, গভর্নর অব ইস্ট পাকিস্তান, এট দি এনুয়াল কনভোকেশন অব দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯ ফেব্রুঃ ১৯৫৭ পৃঃ ৪*। একই সাথে নওয়াব সৈয়দ শামছুল হুদাও উক্ত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

১৪৯। জাহেদা আহমদ, *রাষ্ট্র ও শিক্ষা,* প্রাগুক্ত বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১১৬।

১৫০। এদের অধিকাংশ ছিলেন ব্রিটিশ খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, ঢাকার নওয়াব পরিবার থেকে ঐ সময় নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফ এবং খান বাহাদুর খাজা মোঃ আজম-এর মনোনীত সদস্য ছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১১সেপ্টেম্বর ১৯২১ পৃঃ৩

১৫১। আঃ রহিম, *হিস্টরী অব দি ইউনিঃ অব ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪।

১৫২। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৯। উল্লেখ্য, নওয়াব পরিবার থেকে এক্সিকিউটিব কাউন্সিলে ১৯২৪ সালে চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য ছিলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন, বার-এট -ল এবং খাজা মোহাঃ আজম, ঢাকা প্রকাশ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, নির্বাহী কমিটির ১ম সভায় (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২১) গঠিত অর্থ বিষয়ক কমিটিতে খাজা মোঃ ইউসুফ একজন সদস্য ছিলেন। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০।

১৫৩। জাহেদা আহমদ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত ৩য় খন্ড পৃঃ ১১৬ এবং ঢাকা প্রকাশ, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯২৫। ১৪ সেপ্টেঃ ১৯২২ খ্রীঃ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্বঃ কোর্ট এর যে সভা হয়, তাতে সদস্য হিসেবে খাজা মোঃ ইউসুফজান ও খাজা নাজিমুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল-জওয়াব হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২ পৃঃ ৩।

১৫৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২১ এবং ১৯৩৭-৩৮ থেকে উদ্ধৃত-জাহেদ আহমদ, *রাষ্ট্র ও শিক্ষা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭।

১৫৫। ঐ রিপোর্ট, ১৯২২-২৩ পৃঃ ৪ এবং ২৩।

১৫৬। সৈয়দ মুস্তফা আলী, আত্মকথা পৃঃ ৯২ এবং আবুল ফজল, রেখাচিত্র পৃঃ ১৩৪ থেকে উদ্ধৃত- জাহেদ আহমদ, ঐ। উল্লেখ্য, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে রমজান মাসে দিনের বেলায় ডাইনিং হল বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে ৩য় বর্ষ আইনের ছাত্র এ. কে. এন, রহমান ১৯২৮ সালে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতে ইনজানশন চেয়ে আবেদন করেন। মুনসেফ কর্তৃক ইনজানশন জারী করা হলেও উচ্চ আদালত তা রদ করে দেয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ ফেব্রুঃ ১৯২৮, ১৩, ২০, ও ২৭ফাল্গুন, ১৩৩৪ বাং পৃঃ ৩।

১৫৭। *প্রসিডিংস অব দি ফার্স্ট প্রভিঃ মোহাঃ এডুকেশনাল কনফারেন্স ১৯০৬ পৃঃ ৭-৯ থেকে কপিকৃত*-মোহাঃ আব্দুলাহ, নওঃ সলিমুল্লাহ, পৃঃ ২৪৩-৪৪ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ১৯১১ পৃঃ ৫ এবং অত্র অধ্যায়ের ফুটনোট নং ৭১ দ্রঃ।

১৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ৬ নভেঃ ১৯১০ পৃঃ ৫ এবং অত্র গ্রন্থের অধ্যায় ৩ ফুটনোট ১১৭ দ্রঃ।

১৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ জুন ১৯১২ পৃঃ ৩।

১৬০। পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী, ১৯০৬-১২ কলকাতা ১৯১৪, পৃঃ ২৫ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৩।

১৬১। আঃ রহিম, *হিস্টরী অব দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭ এবং অত্র অধ্যায়ের ফুটনোট নং ৭১ দ্রঃ।

১৬২। আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২ এবং ১৩৩-৩৪।

১৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুলাই ১৯২৬ এবং ২ ও ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩ বাংলা।

১৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জুলাই ১৯২৭ পৃঃ ৩।

১৬৫। *লেইং অব দি ফাউন্ডেশন স্টোন অব দি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা-দি ভি.সি. স্পিচ এন্ড এইচ. ই. দি চ্যান্সেলর স্পিচ এন্ড প্রভোস্ট স্পিচ, কলকাতা, আগস্ট ২২, ১৯২৯ দ্রঃ* এবং আঃ রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৫।

১৬৬। এছাড়া বালিয়াটির জমিদার কাজেমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী কর্তৃক ২ বছরের জন্য ২৫ জন মুসলিম ছাত্রের, জন প্রতি-৭ টাকা করে প্রতি সেশনে বৃত্তি দানের প্রতিশ্রুতির কথাও ঐ ভাষণে বলা হয়। লেইং অব দি ফাউন্ডেশন স্টোন- ভি.সি স্পিচ, প্রাগুক্ত ২২ আগস্ট ১৯২৯ দ্রঃ।

১৬৭। *ওপেনিং অব দি মুসলিম হল, ঢাকা,* কলকাতা ১৯৩১ থেকে উদ্ধৃত-মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ২১৬।

১৬৮। আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত নওয়াবদের ঘরবাড়ী দালানকোঠার হিসাব থেকে উক্ত স্কুলের অবস্থান সম্পর্কে যে চৌহদ্দীর বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ মহল্যা কুমারটুলীস্থ গণিজ স্কুল নামীয় দালান। তাহার চৌহদ্দি-সড়কের উত্তর ও পূর্ব শুকলাল মিস্তরীর মুদাফতি জমি ও বাহাদুর ব্যাপরীর বাড়ীর দক্ষিণ, চান্দিনার প্রজা কালূ ও আসুরীর বাড়ীর পশ্চিম, এই চৌহদ্দীর মধ্যে হাবিলী ও ভমির দরবস্ত হক হকুক-১০০০ টাকা। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ-৮৬-৮৭।

১৬৯। হৃদয়নাথ ও আজিমুশ্বান বলেছেন, আঃ গণি স্কুলটি পোগজ স্কুলেরও (১৮৪৬ খ্রীঃ) আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২ এবং আজিমুশ্বান, *সিডিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭) উল্লিখিতের আলোকে প্রফেসর মুনাতসীর মামুন অনুমান করেছেন, স্কুলটি উনিশশতকের চল্লিশের দশকে স্থাপিত হয়েছিল (মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০)। কিন্তু সমসাময়িক পত্রিকা ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত খবর পর্যালোচনা করলে তাঁদের ঐ তারিখের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। (পরের অনুচ্ছেদ দ্রঃ) এছাড়া ১৮৪০ এর দশকে খাজা পরিবারের উপর আবুদল গণির পিতা খাজা আলীমুল্লাহর কর্তৃত্ব বহাল থাকায়, ঐ সময় আবদুল গণির পক্ষে নিজের নামে অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান করার সুযোগ ছিল না। ১৮৫৪ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পরই মুলত তিনি পরিবারের সার্বিক কর্তৃত্ব হাতে পান। ১৮৬০ দশকের আগে তিনি এমন কোন জনকল্যাণ কাজ করেননি যা তেমন উল্লেখযোগ্য। যার দরুণ ঢাকা প্রকাশ ১৮৬০ দশকের প্রথম দিকে

Dhaka University Institutional Repository

আঃ গণিকে বার বার সমালোচনা করতো। (ঢাকা প্রকাশ, ৩ বৈশাখ, ১২৭১ বাং ১৮৬৪ইং পৃঃ ৫১) পরে অবশ্য নানা জনকল্যাণ কাজের দরুণ তাঁর এই দুর্নাম ঘুঁচে যায় এবং ঢাকা প্রকাশই বার বার তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করে।

১৭০। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুলাই ১৮৬৩ পৃঃ ১৯৬। ঢাকা প্রকাশ আবদুল গণির ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তখন কম পরিমাণ জনকল্যাণ কাজ করতে দেখে অসন্তুষ্ট ছিল। তাই একবার তাঁরা আঃ গণিও তাঁর স্কুল সম্পর্কে লিখেছিল যে, "খাজা সাহেব অত্যন্ত ধনশীল। ঢাকায় তাঁর তুল্য ঐশ্বর্যশালী লোক আর নেই। ক্ষোভের বিষয় এই যে, তিনি দেশ হিতকর সৎকার্য সাধনে নিতান্ত উদাসীন। তাঁহার কার্যের মধ্যে কেবল মৃগয়া, ভোজ এবং ঘোড়দৌড়ই দেখতে পাওয়া যায়। অল্পকাল তিনি একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছেন বটে। কিন্তু তাদ্দরা লোকের বিশেষ উপকার হইতেছে না (ঢাকা প্রকাশ, ৩ বৈশাখ, ১২৭১ বাং (১৮৬৪) পৃঃ ৫১।

১৭১। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জুলাই ১৮৬৩। উদ্ধৃতাংশটির সংক্ষিপ্ত ও চলতিরূপ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের মধ্যে নওয়াব আবদুল গণিই প্রথম ইংরেজী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং যা ছিল-অবৈতনিক। এর পরের বছর ১৮৬৪ খ্রীঃ সৈয়দ আহমদ গাজীপুরে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেছা ১৮৭৩ খ্রীঃ পশ্চিম গাঁয়ের কান্দির পাড়ে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রওশন আরা বেগম, নবাব ফয়জুন্নেসা ও পুর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ পৃঃ ৩৭-৩৮।

১৭২। ঢাকা প্রকাশ, ২ মার্চ ১৮৭৯ পৃঃ ৫৫৬।

১৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেম্বর ১৮৬৪ পৃঃ ৪২৬। এছাড়া ১৮৭৪ খ্রীঃ মে মাসে ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, ঐ সময় হয়তো কোন এক বিশেষ কাজের প্রয়োজনে নওয়াব সাহেব উক্ত স্কুলে এককালীন ২০০ টাকা দান করেছিলেন। উক্ত খবর ছাপিয়ে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেন যে, দেশীয় অন্য জমিদারেরা যদি (শিক্ষার জন্য) এমন করতো তবে বংগভূমির কি এহেন দুর্দশা হতো? ঢাকা প্রকাশ, ২৪ মে ১৮৭৪ পৃঃ ১৩০।

১৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ৬ জানুয়ারী ১৮৬৭, ২ জানুঃ ১৮৭০, ৮ জানঃ ১৮৭১ এবং ৩ জানু ঃ ১৮৭৫ দ্রঃ।

১৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৬৮ এবং ৩মে ১৮৯৬ পৃঃ ৬ ও৯।

১৭৬। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

১৭৭। ঢাকা প্রকাশ, ৬ জানুঃ ১৮৬৭ এবং ২ জানুঃ ১৮৭০ এবং ৮ জানুঃ ১৮৭১, ৩ জানুঃ ১৮৭৫দ্রঃ।

১৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬।

১৭৯। প্রফেঃ আব্দুল্লাহ , *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮।

১৮০। হৃদয়নাথ বলেছেন, স্কুলটি কোনদিনই ভালচলেনি এবং এক সময় ছাত্রাভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

১৮১। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ডিসেম্বর ১৮৬৩ পৃঃ ৪২৫ এবং ৯ জুন ১৮৬৪ পৃঃ ১৫৪।

১৮২। তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ৩৪। তবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল ও প্রশাসনিক দুর্বলতার দরুণ ১৭/১৮ বছর টেনে-হিঁছড়ে চলে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল-বলে তৈফুর সাহেব যে তথ্য দিয়েছেন, তা যে সত্য নয় পরবর্তী আলোচনাই সেটা প্রমাণ করে।

১৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ আগস্ট ১৮৬৬ পৃঃ ২৮৩।

১৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ৬ জানুঃ ১৮৬৭ পৃঃ ৫১৩। উল্লেখ্য, ঐ বর্ষে ঢাকা বোর্ডে মোট ১৩৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল।

১৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুঃ ১৮৭০ পৃঃ ৪৬১।

১৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জানুঃ ১৮৭১ পৃঃ ৪৭৬।

১৮৭। সেবার বাংলা বাজার এবং গণিজ স্কুলের প্রবেশিকা ফলাফল সন্তোষজনক হয়নি। ঢাকা প্রকাশ, ৫ জানুঃ ১৮৭৩ পৃঃ ৪৪৯-৪৫০।

১৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জানুঃ ১৮৭৫ পৃঃ ৪৬৬। উল্লেখ্য, এরপর ২ জানুঃ ১৮৭৬ পৃঃ ৪৬৩ অনুযায়ী ঢাকা প্রকাশ প্রবেশিকা পরীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশ করছিল তাতে গণিজ স্কুলের কারো নাম দেখা যায় না। হয়তো সেবার কেউ পাশ করেনি।

১৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৬৮।

১৯০। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন ১৯০৬ পৃঃ ৭।

১৯১। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেঃ ১৮৭৩ পৃঃ ৪১৯-২০।

১৯২। ঢাকা প্রকাশ, ১ মে ১৮৭০ সম্বাদাবলী।

১৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মে ১৮৭২ পৃঃ ৯০, অধ্যক্ষ. ব্রেনান্ড সাহেবেরে লেখা ডাইরী থেকে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। *ক্লে'র ডাইরী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮-৬২।

১৯৪। তদবধি ঢাকা প্রকাশ আবদুল গণির ধনের তুলনায় দান কাজে সন্তুষ্ট ছিল না বলে মনে হয়। কারণ স্কুলের জন্য আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা নওয়াবের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছিলেন যে, 'একাজটি গণি মিঞ্রার জন্য একাদশীয় উপবাস স্বরূপ। ৩/৪ বছর পর ছাত্রদের-কে ১৫০/২০০ টাকার পুরস্কার দেয়া তাঁর পক্ষে বড় সুখ্যাতির বিষয় নয়, না দিলেও আমরা অখ্যাতি করতাম না। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মে ১৮৭২ পৃঃ ৯০ (উদ্ধৃতিটি সংক্ষেপিত)।

১৯৫। উক্ত খবর প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল যে, হেডমাস্টার বাবু মোহনচাঁদ বসাকের যত্নের ফলেই উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ন হচ্ছে। সরকারী চাকুরীতে থাকলে মোহন বাবুর উন্নতি হতো। তাই নওয়াব সাহেব যেন তাঁর বেতন বাড়িয়ে দেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৬৮।

১৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩মে ১৮৯৬ পৃঃ ৬। এর পরেও মোহন বাবু চাকুরীতে থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তা বিবেচিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭। তৎকালে লাইসেন্স প্রাপ্ত পতিতারা শহরের প্রায় প্রতি মহল্লায়ই ঘরবাড়ী ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যবসা চালাতো। কুমারটুলী মহল্লায় নওয়াবের মালিকাধীন বাড়ীতেও বেশ্যারা ভাড়া থাকতো। (পুরানো নথিপত্র, ১৮৮১ সালের মেমেরেন্ডাম অব এগ্রিমেন্টের দলিলে ভবনের তালিকা দ্রঃ) স্কুলের পাশে এরূপ বেশ্যালয় থাকায় চরিত্র নষ্ট হবার ভয়ে ছাত্ররা অনেক সময় অভিযোগ তুলতো। ১৮৬৬ খ্রীঃ এরূপ গণিজ স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর একছাত্র আবেদন করেছিল যে, হয় বেশ্যালয় নতুবা স্কুলটিকে দূরে সরিয়ে নেয়া হোক (ঢাকা প্রকাশ, ১৬ সেপ্টেঃ ১৮৬৬ পৃঃ ৩২০)।

১৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুলাই ১৮৯৭ পৃঃ ৭।

১৯৯। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৮ এবং জ্যোতিশচন্দ্র দাসগুপ্ত, *ন্যাশনাল বায়োগ্রাফী ফর ইন্ডিয়া ভল-৫, ঢাকা* ১৯১৯ পৃঃ ১৩ থেকে উদ্ধৃত- আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৫৫।

২০০। ঢাকা প্রকাশ ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪।

২০১। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৬।

২০২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন ১৯০৬ পৃঃ ৭।

২০৩। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেনন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

২০৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জানুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩। উল্লেখ, কংগ্রেসের সমর্থক ঢাকা প্রকাশ নওয়াবের মুসলিম লীগ করা পছন্দ করতো না। তাই মুসলিম লীগ ও নওয়াবের সমালোচনামূলক খবরাদি ফলাও করে প্রচার করতো।

২০৫। ঢাকার কমিশনার মিঃ লিমেসুরিয়ারকে লেখা চীফ ম্যানেজারের পত্র, ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, পৃঃ ডি-১৩-১৪। উল্লেখ্য, ঐ সময় আহসান মঞ্জিল মাদ্রাসার জন্যও বার্ষিক ১৯৩৮ টাকা বরাদ্দ ছিল। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে ঐ সময় এস্টেটের খরচে আহসান মঞ্জিল এলাকায় একটি মাদ্রাসাও স্বগৌরবে চালু ছিল। ঐ-ঐ দ্রঃ।

২০৬। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৯, নোটস ক্রমিক-১১৭।

২০৭-২০৮। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯।

২০৯। এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৯ পৃঃ ১৪৮। উল্লেখ্য, হুগলী কলেজের ইংরেজী বিভাগের জন্য মোহসীন ফান্ড থেকে ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হতো। অথচ সেখানে প্রায় সব ছাত্রই ছিল হিন্দু। দাতার ইচ্ছানুযায়ী কেবল মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্যই মোহসীন ফান্ডের টাকা খরচ হতে হবে। এই কারণে ব্রিটিশ সরকার হুগলী কলেজে ঐ টাকা দেয়া বন্ধ করে এবং পূর্ববংগে উল্লেখিত মাদ্রসাগুলো তৈরীর ব্যবস্থা করেন। (ঢাকা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী-এর লেখা জীবনী। 'দাস্তান-ই-ইবরাতবার' ফার্সী পান্ডুলিপি-এর বংগানুবাদ করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ, মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, আগষ্ট-১৯৮৪ পৃঃ ১৪৭-৪৮ এবং ১৩-১৪।

২১০। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃ-১৮ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৬ ফেব্রুঃ ১৮৮১ পৃঃ ৫৩৩। তৈফুর বলেন, উক্ত লেঃ গভর্নরই মূলত মাদ্রাসাটি ১৮৭৪ খ্রীঃ স্থাপন করেন। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫। তায়েশও অনুরূপ কথাই বলেন, তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৭৭।

২১১। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯-৮০। এখানে উল্লেখ্য যে, হাজী মোহসীনের দানকৃত অর্থে হুগলী কলেজ চলতো, অথচ সেখানে মুসলিম অপেক্ষা হিন্দু ছাত্রই বেশী অধ্যয়ন করতো। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরেজ সরকার মুসলমানদের অভাব অভিযোগ বিশেষ করে শিক্ষার দিক নজর দেয়। এই প্রেক্ষিতে মুসলিম মনষীরা বিশেষ করে নওয়াব আবুদল লতিফ মোহসীন ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, প্রভৃতি স্থানে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য সরকারকে পরমর্শ দিলে সরকার তা গ্রহণ করে। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে-ধারা,* ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮। এবং ডঃ এনামুল হক, *নওয়াব বাহাদুর আবদুল লতিফ হিজ রাইটিংস এন্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস্, সমুদ্র প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৬৮, পৃঃ ১৬৬-৬৮ এবং ২০০-৭।*

২১১(ক)। নওয়াব আহসানুল্লাহর সহস্তে লেখা ব্যক্তিগত ডাইরী, (ইংরেজী ভাষায়, অপ্রকাশিত) তাং ২ ফেব্রুয়ারী, ১৮ এপ্রিল এবং ২৮ এপ্রিল, ১৮৭৪ আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত। ডাইরীটির সংগ্রহ নং-আঃ ৯৩২৭৪।

২১২। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬, অর্থদানের তালিকা দঃ এবং আবদুল্লাহ, নওঃ সলিমুল্লাহ পৃঃ ৩৯৪।

২১৩। উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর আত্ম জীবনী, ফার্সী থেকে বংগানুবাদ, মোঃ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৮। একই সাথে মোহসীন ফান্ড থেকে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে অনুরূপ দুটো মাদ্রাসা তৈরী করা হয়। (আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৮) এবং ঢাকা প্রকাশ, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮১ পৃঃ ৫৩৩। মাদ্রাসাটি প্রথম জনসন রোডে একটি দ্বিতল ভবনে শুরু হয়েছিল, তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

২১৪। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।

২১৫। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮।

২১৬। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৮, ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৮৭৪ খ্রীঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী মাসিক সাড়ে তিনশত টাকা বেতনে উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীকে অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী গেজেট প্রকাশিত হয় এবং তিনি ১ মার্চ ঢাকা এসে কাজে যোগ দেন উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর আত্মজীবনী (ফার্সী) এর বংগানুবাদ, আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৮।

২১৭। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮।

২১৮। অর্থদানের তালিকা, পরিশিষ্ট নং ১২, ক্রমিক ১৫৮ দ্রঃ।

২১৯। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

২২০। অধ্যক্ষ, উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর বন্ধুবর মৌঃ তাসাদ্দুক হুসাইন আবজাদ হরফের গণনা মোতাবেক ঘটনাবলীর সন তারিখ রচনায় সিদ্ধহস্ত কবি ছিলেন এবং তিনি উবায়দুল্লাহর জন্য তারিখ যুক্ত ফার্সী কবিতা রচনা করেন। উবায়দুল্লাহর আত্ম জীবনীর বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০।

২২১। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯।

২২২। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ পৃঃ ৬২ এবং প্রফেঃ আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫। গোড়ার দিকে এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইং ক্লাশ চালু করা হয়। তখন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদেরকে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দেয়া হতো। ১৮৭৭ সালে আরবী ও ইংরেজীর শিক্ষক বাড়ানো হয়। ইংলিশ সেকশনেও প্রতি বছর উচ্চতর শ্রেণী খোলা হতে থাকে। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে দশম শ্রেণী প্রবর্তন করা হয় এবং ইংরেজী বিভাগটি পূর্ণ হাই স্কুলের সমান তথা এ্যাংলো পার্শিয়ান পুর্ণবিভাগে পরিণত হয়। উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর ১৮৮০ সালে লেখা আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ঐ সময় ইংরেজী ও আরবী দুটি বিভাগ ছিল। আরবী বিভাগে কেবল আরবীর ছাত্ররা পড়তো। এতে কলকাতা মাদ্রাসার ন্যায় ৭টি শ্রেণী ছিল এবং মওলানা উবায়দী উচ্চতর তিনটি শ্রেণীতে পড়াতেন। ইংরেজী বিভাগেও কেবল ইংরেজী শিক্ষার্থীরা পড়তো এবং সেখানে এন্ট্রান্স পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হতো। ঐ সময় ইং বিভাগে তিনজন শিক্ষক ছিল এবং শীঘ্রই আরো দুজন নিয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই মাদ্রাসাটি কলকাতার শ্রেষ্ঠ আলিয়া মাদ্রাসার সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। (*হিস্টরী অব ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, প্রিজাভড ইন দি প্রেজেন্ট কবি নজরুল কলেজ, ঢাকা। প্যারা নং-১৯* থেকে উদ্ধৃত করেছেন প্রফেঃ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে... দিশারী, প্রাগুক্ত-পান্ডুলিপি পৃঃ ৭৮) এবং উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর প্রাগুক্ত আত্মজীবনীর বংগানুবাদ পৃঃ ১৫০-৫১।

২২৩। ইসলামী স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী উক্ত দ্বিতল ভবনটি আজো বর্তমান। সেটা এখন কবি নজরুল কলেজের পুরানো (পশ্চিম) ভবন নামে পরিচিত।ঊনিশ শতকের শেষ দিকে (১৮৯০ খ্রীঃ) তোলা উক্ত মাদ্রাসা ভবনের একটি সুদৃশ্য ছবি পরিশিষ্ট চিত্র নং ২৯-এ দেয়া হলো। মাদ্রাসার ১ম অধ্যক্ষ উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী ভবনটির নির্মাণ শেষে বলেছিলেন, এই জাঁকালো ভবনটি দেখতে খুবই সুন্দর, ঢাকা শহরে এর জুড়ি নেই। (ঐ আত্মজীবনীর বংগানুবাদ, আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১)।

২২৪। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

২২৫। *হিস্টরী অব ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ,* প্রাগুক্ত, প্যারা ৩ এবং ৯ থেকে উদ্ধৃত-আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ...* প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি পৃঃ ১১৩।

২২৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ পৃঃ ৩৩৯। ঢাকা মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রদের মধ্যে প্রতিবছর পুরস্কার দেয়া হতো। এরূপ ১৮ মে ১৮৯৪ খ্রীঃ নর্থব্রুক হলে আয়োজিত এক সভায় ঢাকার কমিশনার লটমন জনসন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২০ মে ১৮৯৪ পৃঃ ৬।

২২৭, ২২৯-২৩০। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮১ পৃঃ ৫৩৩। ঐ সময় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাবু প্রসন্ন কুমার গুহ বি.এ. -কে ইংরেজী বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ঢাকা প্রকাশ ঐ।

২২৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জানুয়ারী ১৮৮৩ পৃঃ ৫০০।

২৩১। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।

২৩২। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮১ পৃঃ ৫৩৩।

২৩৩। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত ক্রমিক নং-৯০। উল্লেখ্য, ঢাকা কলেজের ছাত্রদের জন্যও অনুরূপ ৩ টাকা মুল্যের বৃত্তি নওয়াব এস্টেট থেকে দেয়া হতো। ঐ তালিকা, ক্রমিক ৮৯ দ্রঃ।

২৩৪। অর্থদানের তালিকা, ১৯০২-৬ সাল দ্রঃ।

২৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬।

২৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ও ৬ সেপ্টেঃ, ১৮৯৬ পৃঃ ৮ ও ৭।

২৩৭। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৩৫। শিলালিপিটি এই গ্রন্থকার সরেজমিনে নিরীক্ষা করেছেন।

২৩৮। শরিফুদ্দিন, ঢাকা পৃঃ ৮১ আজিমুশ্শান হায়দার, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৮, তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬।

২৩৯। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

২৪০। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ১৭৯। ঐ সফরকালে ছোটলাট আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ও ২৭ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৫ও ৩। এছাড়া ছোট লাট এড্রুফ্রেজার ঢাকা নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার, মিঃ গার্থের অকস্মাৎ মৃত্যুতে ১১ জুলাই ১৯০৪ খ্রীঃ ঢাকা এসে মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১০ জুলাই ১৯০৪ পৃঃ ৩।

২৪১। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ডিসেঃ ১৯০৫ পৃঃ ৩। আজিমুশ্শান হায়দার লিখেছেন, উক্ত হোস্টেল নির্মাণে ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৮। অর্থদানের তালিকায় ১৯০৪ সালের দান দ্রঃ।

২৪২। উক্ত সমিতির জন্য নওয়াব আলী চৌধুরী বার্ষিক ২০ টাকা এবং এককালীন ৫০ টাকা এবং ঢাকা কমিশনার ৫০ টাকা দেন। ঢাকা প্রকাশ, ১১ মার্চ ১৯০৬ পৃঃ ৪।

২৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ এপ্রিল ১৯১১ এবং আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ১২৫।

২৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ৪ আগস্ট ১৯১২।

২৪৫। অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং- ২২৫,২৪৪, ১৯০২ খ্রীঃ ১৯০৪ খ্রীঃ দ্রঃ

২৪৬। *হিস্টরী অব ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ---* প্রাগুক্ত, প্যারা-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৪৭। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮।

২৪৮। তৈফুর *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬ এবং মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২৩৬।

২৪৯। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭ এবং শরিফুদ্দিন, ঢাকা প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬-৭৭।

২৫০। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ফেব্রুঃ ১৯০১ পৃঃ ৬-৭।

২৫১। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২। উক্ত ব্যয়ানুমানের মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার টাকা সরকার দিতে চান এবং বাকী এক লক্ষ টাকা চাঁদার মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাকিন সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তৎকালীন ডাকবাংলোর কাছে স্কুলটির গৃহ নির্মাণের স্থান নির্ধারিত হয়। ঢাকা প্রকাশ, তাং ঐ।

২৫২। *পুরানো নথি*, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-১৮।

২৫৩। উল্লেখ্য, নওয়াব এস্টেটের কোষাগারে তখন উক্ত অর্থদানের মত সঞ্চয় ছিল না। এজন্য তাঁরা পূর্বোক্ত প্লেগ ফান্ড থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণ গ্রহণকালে নওয়াবের উত্তরাধিকারীরা (বি. ই, প্রপার্টির মালিকেরা) প্লেগ ফান্ড ট্রাস্টের অনুকূলে কিছু ভূমি প্রদান করেন। উক্ত সম্পত্তি আবার বার্ষিক ৩ হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে নওয়াব এস্টেট থেকেই পরিচালিত হতো। পুরানো নথি, প্রাগুক্ত ,ডি-১৮।

২৫৪-২৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল ১৯০২ পৃঃ ৪।

২৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ জুন ১৩ ও ২৭ জুলাই ১৯০২ এবং দি বেংগল টাইমস, ২৩ জুলাই ১৯০২।

২৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল এবং ১৯ জুন ১৯০৪ পৃ ৩। উল্লেখ্য, ১৯০৬ সালে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অনুরোধে কয়েক জন প্রবেশিকা অকৃতকার্য ছাত্রকে উক্ত স্কুলে ভর্তি করা হলে ছোট লাটের নির্দেশে তাদেরকে বহিস্কার করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৯০৬। বিভিন্ন সালে উক্ত ওভারশিয়র পরীক্ষার ফলাফলের জন্য, ঢাকা প্রকাশে ৩০ ডিসেঃ ১৯০৬ পৃঃ ৫, ২৬ মার্চ ১৯১১ পৃঃ ৫, ১০ বৈশাখ ১৩১৮ (১৯১১), ২১ এপ্রিল-১৯১২ দ্রঃ।

২৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ২১ মে, ১৯০৫ পৃঃ ৩।

২৫৯। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, প্রাগুক্ত পৃ ১৭।

২৬০। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৯০৬ পৃঃ ৪। উক্ত স্থানান্তরকালে গরুগাড়ী বোঝাই করে যন্ত্রপাতি নেবার সময় গাড়ীর চাকা মাটিতে বসে যায়। ছাত্ররা টেনে সেটা উঠিয়ে দেয়ায় হেডমাস্টার তাদেরকে ১০ টকা বখশিশ দেয়। টাকাটা ছাত্ররা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের দিয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, তাং-ঐ।

২৬১। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ এপ্রিল ১৯০৮ পৃঃ ৩।

২৬২। প্রফেসর আ. সা. ও. কারণী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অতীত ও বর্তমান, সমাবর্তন (স্মরণিকা) ২৯ ফেব্রুঃ ১৯৯২ পৃঃ ১।

২৬৩-৬৪। আজিমুস্মান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১৭। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ১৯৪৬ সালে কোর্সটা পুনরায় চালু করা হয়।

২৬৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ মার্চ ১৯০৯ পৃঃ ৩।

২৬৬। প্রফেসর কারনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১।

২৬৭-৬৮। আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি*, পৃঃ ১৭-১৮।

২৬৯-২৭০। প্রফেসর কারনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ২-৩।

২৭১। আহমদ কবির, ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অবঃ), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, সমাবর্তন, (স্মরনিকা) ১৯৯২ পৃঃ ৯০।

২৭২। মাদারীপুর মসজিদ কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী, *মুক্তিদূত*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯-৬২।

২৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগস্ট ১৮৮৪, পৃঃ ২৭২ এবং *মুক্তিদূত*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১-৫৩। মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণের খরচ ছাড়াও এর ঝাড়বাতি, কার্পেট ইত্যাদি ক্রয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ হাজার টাকা দান করেণ। এছাড়া তিনি এ মসজিদের জন্য মাসিক ২৫ টাকা চাঁদা ছাড়াও প্রতি রমজানে সামিনা খরচের জন্য শত শত টাকা দান করতেন। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-৭৩, ১১২, ১২৭, ১৩৯, ২৬৭ ও ৯ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ১০।

২৭৪। মাদ্রাসা কমিটির প্রেসিডেন্ট মৌঃ আজাহার কর্তৃক ১৫ মে ১৮৮৬ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহকে দেয়া পত্র উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬

২৭৫। ১৪ জানুঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ মাদ্রাসা ও মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিটির সভাপতির পঠিত রিপোর্ট, উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫২।

২৭৬। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং-১৩৯ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঠিত সভাপতির রিপোর্ট ঐ পৃঃ ৫২। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়-বিশেষতঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর অর্থ সাহায্যেই সমিতি মাদ্রাসার পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া মাদ্রাসার মাসিক আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রদানান্তে, উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়-উপরোক্ত হিসাবের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নওয়াব আহসানুল্লাহ খান বাহাদুরের মহানুভবতা ও বদান্যতার দরুন মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটি তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। (ঐ-ঐ, সভাপতির রিপোর্ট পৃঃ ৫৩)।

২৭৭। মৌলভী মোঃ আজহারের দেয়া পত্র এবং নওয়াব আহসানুল্লাহর ১৭-৬-১৮৮৮ তারিখে দেয়া পত্রোত্তর দ্রঃ উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৫-৬৬। তবে পত্রে নওয়াব আহসানুল্লাহ শর্তারোপ করেন যে, যদি মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে যায় তবে এই অনুদানও বন্ধ হয়ে যাবে।

২৭৮। মাদারীপুর মসজিদ ও মাদ্রাসার উদ্বোধনী সভায় সভাপতির রিপোর্ট দ্রঃ। উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫৪। উল্লেখ্য, ১৮৮৭ খ্রীঃ ২ সেপ্টেম্বর মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির এক সভায় এর কার্যপরিবিধি, পাঠদানের ও ছুটির সময় নির্ধারণসহ ছাত্রদের নিকট থেকে মাসিক বেতন আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, *মুক্তিদূত*-ঐ পৃঃ ৫৪-৫৭।

২৭৯। মাদ্রাসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঠিত রিপোর্ট, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৮০। প্রথমদিকে এতদুভয় বিভাগের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল বলে ঢাকা প্রকাশের এক খবর থেকে জানা যায়। ফলে মাদ্রাসায় বিপুল পরিমাণে ছাত্র থাকলেও পরীক্ষার ফলাফল অশানুরূপ হয়নি এবং সরকারী সাহায্যও তখন বন্ধ হয়ে যায় বলে বলা হয়। পত্রিকা এজন্য কতিপয় প্রস্তাব রেখে মাদ্রাসার পৃষ্টপোষক নওয়াব আহসানুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ১০।

২৮১। ১৮৮৭ থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মাদ্রাসা পরিচালনার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত, ঐ* পৃঃ ৬৩-৬৫।

২৮২। ঐ মাদ্রাসার রিপোর্ট, *মুক্তিদূত,* পৃঃ ৬৪।

২৮৩। মিঃ সি.এ. মার্টিন (জনশিক্ষা পরিচালক) এর পরিদর্শন মন্তব্য। *মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৮।

২৮৪। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসকের মাদ্রাসা পরিদর্শন মন্তব্য, *মুক্তিদূত* ঐ পৃঃ ৭০।

২৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ নভেম্বর ১৯০৪ পৃঃ ৪।

২৮৬। নেত্রকোনা মসজিদ কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭০-৭১।

২৮৭। মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী তালাত্তাফ হোসেন কর্তৃক ১৫ মার্চ ১৯০৫ তাং মোঃ আজহারকে লেখাপত্রের সারাংশ, উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪-৭৫ এবং ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকায় ১৯০২ সালের দানের তালিকা দ্রঃ।

২৮৮। নেত্রকোনা মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী ১৫ মার্চ ১৯০৫ তাং মোঃ আজহারকে লেখা পত্রের সারাংশ থেকে উদ্ধৃত-*মুক্তিদূত,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪-৭৫।

২৮৯। উল্লেখ্য নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে কমিটি নেত্রকোনা মসজিদটি নওয়াবের পিতা খাজা আহসানুল্লাহর নামে নামকরণ করেন। সেক্রেটারীর প্রদত্ত ঐ পত্র, *মুক্তিদূত,* পৃঃ ৭৬।

২৯০। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত, কাচারী পৃঃ ১৯।

২৯১। জামুর্কী হাসপাতালের কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে, অধ্যায় ৫(৪) দ্রঃ।

২৯২। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ পৃঃ ১০।

২৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০২ পৃঃ ৫।

২৯৪। *পুরানো নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ কাচারী-১৯।

২৯৫। উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোঃ আঃ হালিম, পোঃ আঃ মুলচর, জেলা-ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত, নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্র। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত দ্রঃ।

২৯৬। উল্লেখ্য, উক্ত ভ্রমণকালে নওয়াব সাহেব মাদারীপুর কাচারীতেও যান এবং সেখানকার হাফিজুল্লাহ মাদ্রসা ও মসজিদের জন্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ নভেম্বর ১৯০৪।

২৯৭। খাজা মওদুদের ব্যক্তিগত ডাইরী, খাজা হালিমের নিকট রক্ষিত (উর্দু, অপ্রকাশিত) তাং ৮ জানুয়ারী ১৯১৪ দ্রঃ।

২৯৮। খাজা হালিম এবং উক্ত স্কুলের বর্তমান হেডমাস্টার খাজা শফিউদ্দিনের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৮ খ্রীঃ) থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

২৯৯-৩০০। খাজা রহমান কাদর, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজলেটার, মার্চ ও এপ্রিল ১৯৯৩* এবং ঢাকা প্রকাশ, ৮ জানুয়ারী, ২২ জানুয়ারী, ১৮ জুন ও ২১ অক্টোবর ১৯২২।

৩০১। সংশ্লিষ্ট দলিলে কপি দ্রঃ স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত।

৩০২। স্কুলের বর্তমান হেডমাস্টার খাজা শফিউদ্দিন ও খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৮ খ্রীঃ)।

৩০৩। সোনিয়া নিশাত আমিন, *দি ওয়ার্ল্ড অব মুসলিম ওমেন ইন কলোনিয়াল বেংগল (১৮৭৬-১৯৩৯)* প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬ পৃঃ ১৬২-৬৩।

৩০৪। সোনিয়া আমিন, শরিফ বিবিয়াঁ, দৈনিক সংবাদ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন অনুপম হায়াত, *মেহের বানু খানম,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮।

৩০৪(ক)। আজিমুশ্শান হায়দার, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯।

৩০৪(খ)। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ পৃঃ ৩।

৩০৫। সোনিয়া আমিন, *মুসলিম ওমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

৩০৬। এ কলেজটির সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহর পরিকল্পিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা উদ্যোগের কোন যোগসূত্র ছিল কিনা তা জানা যায়নি।

৩০৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জুন ১৯২৬ পৃঃ ৩।

৩০৮। উক্ত ভবনে এখন একটি হিন্দু অনাথ আশ্রম রয়েছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ৮/১০ বছর আগেই মিঃ মন্মথ রায় সেখানে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নাম ছিল-ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউশন। উক্ত কলেজটি মিল ব্যারাক এলাকায় অবস্থানকালে সেটার সাথে পূর্বোক্ত সলিমুল্লাহ কলেজটি মিশে গিয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

৩০৯। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তীর ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৭।

৩১০। সলিমুল্লাহ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মিয়া এম.এ.হামিদের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৮) থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

ঢাকার নওয়াবদের সাংস্কৃতিক কার্যাবলী

৮(১) নওয়াব পরিবারের সাহিত্য চর্চা ঃ

৮(১)(ক) উর্দু-ফার্সী চর্চার কারণ ঃ

কাশ্মীর থেকে আগত ঢাকার খাজা পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাস করা সত্ত্বেও এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁরা তেমন কোন অবদান রাখতে পারেননি।[১] বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে কেন বাঙালী হয়েও ঢাকার নওয়াবরা বাংলা ভাষাকে আয়ত্ব করেননি? কিন্তু সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে সেটা স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

দীর্ঘ ৬ শতাধিক বছর ধরে মুসলিম শাসনামলে এদেশে ফার্সী ছিল রাজভাষা। আরবী বরাবরই ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা যা এখনো বিদ্যমান। মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠা লাভে আগ্রহী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজভাষা ফার্সী চর্চা করতেন।[২] যেসব বিদেশী ভাষা বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে ফার্সী সেসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য।[৩] তাই ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি ভাষা চালু হলেও ফার্সী উর্দুর প্রভাব শেষ হতে বহু দিন কেটে যায়।

তৎকালে বাংলায় প্রায় সব সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ভাষায়ই ছিল উর্দু-ফার্সী। বলা হয়ে থাকে বাংলার বনেদী মুসলিমদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। বাদশাহী আমলে এঁদের বেশীর ভাগই জায়গীর অনুরূপ বিভিন্ন রাজকাজে নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের মাতৃভাষা আরবী, ফার্সী, তুর্কী যাই থাকুক না কেন চর্চা করতেন ফার্সী। ব্রিটিশ আমলে চাকুরী হারিয়ে এঁদের একটি শ্রেণী জমিদারি তালুকদারি করে মফস্বলে টিকে থাকেন। আভিজাত্যের মোহে এঁরা উর্দু-ফার্সী চর্চা করতেন। এঁরা আধুনিক ভাষা তথা ইংরেজী শিক্ষাও পছন্দ করতেন না।[৪] অন্যদিকে এঁদের আরেক শ্রেণী ছিলেন শহরমুখী। তাঁরা ইংরেজ শাসনও আধুনিক শিক্ষাকে স্বাগত জানান। তাঁরা ইংরেজদের অধীনে চাকুরী-বাকরী, উকিল-মোক্তারী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তবে জীবিকা ও প্রতিষ্ঠা লাভের কারণে ইংরেজী শিখলেও পারিবারিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কারণে তাঁরা ফার্সী-উর্দু চর্চাও অব্যাহত রাখেন। কেবলমাত্র জমিদারির কাজকর্ম করা ছাড়া বাংলা ভাষা তাঁদের তেমন আবশ্যকও হতো না। জমিদারি পরিচালনার জন্য তাঁরা বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু কর্মচারী রাখতেন। ইংরেজী শিক্ষা তাঁদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করলেও এসব পরিবারেই আমরা দেখতে পাই বংগীয় উর্দু-ফার্সী অনুশীলনের শেষ নিদর্শন।[৫]

আমরা জানি বহিরাগত আরবী ফার্সীর সাথে হিন্দীসহ দেশীয় ভাষার সংমিশ্রণেই উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এতে আরবী অক্ষর ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের নিকট দ্রুত গ্রহণীয় ও সহজপাঠ্য হয়েছে। উর্দি পরা লোকেরাই (সৈনিকেরা) প্রথমে এটা জনপ্রিয় করায় ভাষাটির নাম হয়েছে উর্দু।[৬] ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, সিন্ধি, কাশ্মিরী ইত্যাদি ভাষা নিয়ে যাঁরা বংগদেশে এসেছেন, কালক্রমে তাঁদের ভাষা স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও এতদাঞ্চলের মুসলমানদের সার্বজনীন ভাষা তথা উর্দু ভাষী হয়ে পড়েন। অনেকে আবার উর্দু-ফার্সী উভয় ভাষাতেই অভ্যস্ত হন। তাঁরা আভিজাত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে এদেশে উর্দু-ফার্সী সাহিত্য চর্চাও করেন। ঠিক এমনই একটি

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার হলো কাশ্মীর থেকে আগত ঢাকার খাজা পরিবার। এঁদের আদি মাতৃভাষা ছিল কাশ্মীরি। পরবর্তীতে মোগলদের সংস্পর্শে এসে এ পরিবারের ভাষা হয়ে যায় ফার্সী। ঢাকায় বসতি স্থাপনের পর পূর্বোক্ত কারণে তা হয়ে যায় উর্দু। ব্রিটিশ আমলে ব্যাপক ইংরেজী চর্চা করলেও ফার্সী-উর্দুই এঁদের সাংস্কৃতিক তথা পারিবারিক ভাষা থেকে যায়।[৭]

মুসলিম শাসন অবসানের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও বহুদিন যাবত রাজভাষা রূপে ফার্সী চর্চা অব্যাহত থাকে। এমনকি শাসনকাজে নিয়োগের উপযুক্ত ফার্সী-জানা লোক সৃষ্টির জন্য ইংরেজরা ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা তৈরী করেন।[৮] ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে উর্দু হলো কমবেশি ভারতের সব অঞ্চলের ভাষা। এজন্য তাঁদের পরিকল্পনা ছিল উর্দুকে ফার্সীর স্থলাভিষিক্ত করা। এজন্য ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করে তাঁরা ব্রিটিশ আমলাদের উর্দু শেখানোর ব্যবস্থা করেন।[৯]

অন্যদিকে ১৭০৩ সালে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারালেও এখানে সাহিত্য সংস্কৃতিতে তেমন ভাটা পড়েনি। এখানে দীর্ঘদিন যাবত বসবাসকৃত কবি-সাহিত্যিক ও তাঁদের উত্তরাধীকারীগণ প্রায় সবাই এখানে থেকে যান। ১৮৪৩ সালে নায়েবে নাজিমদের বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের পদ ও দরবারটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। সেখানে রাজনীতি না থাকলেও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার তেমন অভাব ছিল না।[১০] ১৮৩৭ খ্রীঃ কোম্পানীর সরকার এক আদেশে অফিস আদালতে ফার্সীর ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। উক্ত আদেশের প্রতিবাদে কলকাতার ন্যায় ঢাকা থেকেও ৪৮১ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রতিবাদ পত্র সরকারকে দেয়া হয়। উক্ত স্বাক্ষর দাতাদের ১৯৯ জনই ছিলেন হিন্দু।[১১] ব্রিটিশদের উক্ত ঘোষণায় ফার্সীর বদলে ইংরেজী অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে বলা হয়। ঐ ঘোষণার পর পরই বাংলার লেঃ গভঃ এদেশের আদালত সমূহে উর্দু ব্যবহারের নির্দেশ দেন।[১২]

আলোচ্যযুগে অফিস আদালতের বাইরে সাহিত্য সংস্কৃতি মহলে উর্দু-ফার্সীর ব্যাপক চর্চা ছিল। এদুটো ভাষার মাধ্যমে মাদ্রাসা সমূহে ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়া হতো। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে বাংলায় মাদ্রাসা সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার।[১৩] সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এগুলোর অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেলেও যা অবশিষ্ট ছিল তার সংখ্যাও ছিল অনেক। আলেম উলামাগণ ধর্মীয় মাহফিলে উর্দু-ফার্সীতে বয়ান-কেয়াম করতেন যার কিছু নমুনা এখনো রয়েছে। ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে মুসলিম ছাত্ররা ইংরেজী স্কুল বিমুখ ছিল। তাই মোহসীন ফান্ডের অর্থানুকূলে ১৮৭৪ সালে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে মাদ্রাসা তৈরী করা হয়। ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্ররা ভালভাবেই উর্দু-ফার্সী রপ্ত করতেন। সরকারী মাদ্রাসা ছাড়াও তখন অনেক বেসরকারী কওমী মাদ্রাসা ছিল। রক্ষণশীল মুসলমানেরা ঐগুলোর মাধ্যমে আরবী, ফার্সী-উর্দু চর্চাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে।[১৪] ব্রিটিশ আমলে গণমাধ্যম হিসেবে পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব এদেশে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার মত উর্দু-ফার্সীর বিস্তারেও ব্যাপক সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত তৎকালে একশ্রেণীর রক্ষণশীল মুসলমানদের কাছে বাংলাও ইংরেজীর মত ইতর শ্রেণীর ভাষা বলে গণ্য হতো। কোরান শরীফের বাংলা তরজমা মহাপাপ মনে করে এদেশের খ্যতনামা আলেমরা উর্দু-ফার্সীতে গাদা গাদা তরজমা করলেও বাংলায় কিছুই করতেন না।[১৫] উর্দু-ফার্সী না জানলে এদেশে খান্দানী মুসলমান বলে গণ্য হওয়া যেত না। এজন্য অনেক নব্য ধনীরা বাংলার স্থলে উর্দু-ফার্সী চর্চা করতেন।

ঢাকার নায়েবে নাজিমরা ফার্সী চর্চা করতেন। শেষ দিকে কিছুটা উর্দু-শিখলেও তাঁরা বাংলা শেখার চেষ্টা করেননি। ১৮৪৩ খ্রীঃ নায়েবে নাজিমদের বংশ বিলুপ্ত হলে অর্থের প্রাচুর্যের সাথে সাথে উর্দু ভাষার ঐতিহ্যটি ঢাকার খাজাদেরকে হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী পদে অধিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। কারণ ঢাকার শিয়ারা প্রায় সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। হোসেনী দালানকে কেন্দ্র করে শিয়া-সুন্নীদের মিলিত এই কৃষ্টি বহুদিন পর্যন্ত ঢাকায় উর্দু-ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল। এখনো তার কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। পুরান ঢাকায় ঘরোয়া পরিবেশে এখনো কিছু উর্দুভাষীর প্রমাণ মেলে। বিংশ শতাব্দীর

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা থেকেই ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের প্রতি বৃহত্তর বাঙালী মুসলমানেরা মনোনিবেশ করলে উর্দু-ফার্সী চর্চা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হলে পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত থেকে বহুসংখ্যক উর্দু ভাষী ঢাকায় আসেন। ভাষাগত সাদৃশ্য থাকার কারণে ঢাকায় তখনো টিকে থাকা উর্দু-প্রেমিকদের সাথে তাঁরা সহজেই মিশতে পেরেছে। বিশেষ করে উর্দুভাষী ঢাকার খাজা পরিবারটি এদেশে নেতৃস্থানীয় থাকায় পাকিস্তানীরা সহজেই তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পেরেছিল। পাকিস্তান সরকার এতদাঞ্চলে উর্দু ভাষীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উর্দুকে বাংলা ভাষার উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। ফলে উর্দু ভাষা এদেশ থেকে বিলুপ্ত হতে বিলম্ব হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে অনুকূল পরিবেশের কারণে পুরো উনিশ শতক এমনকি বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এদেশে ফার্সী বিশেষ করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বনেদী মুসলমান পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত কারণেই খান্দানী মুসলমান পরিবার বলে দাবীকৃত ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরা উর্দু ভাষা চর্চা করতেন। এমনকি তাঁরা পূর্ববাংলায় এভাষাটি জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সাহিত্য চর্চায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[১৬]

৮(১)(খ) নওয়াব পরিবারের সাহিত্যিকগণের তালিকা ঃ

ঢাকার নওয়াব পরিবারে বেশ কয়েকজন উর্দু-ফার্সী সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার অনেকেই সম-সাময়িককালে কবিতা ও সাহিত্যের জগতে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁদের অনেকেরই রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। আবার কারো কারো রচিত গ্রন্থাবলী পান্ডুলিপি আকারে ছিল। কালক্রমে পান্ডুলিপিগুলোর প্রায় সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ গুলোও এখন দুষ্প্রাপ্য। রহমান আলী তায়েশ থেকে শুরু করে, হাকিম হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ইকবাল আজিম, প্রফেসর মোঃ আব্দুল্লাহ খাজা পরিবারের খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৭] নিম্নে ঢাকার খাজা পরিবারের উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকদের নাম দেয়া হলো ঃ

(১) খাজা ফয়েজুদ্দিন হায়দার জান শায়েক (মৃত্যু- ১৮৫২ খ্রীঃ)
(২) খাজা আসাদুল্লাহ কাওকাব (মৃত্যু- ১৮৫৯ খ্রীঃ)
(৩) খাজা আব্দুর রহিম সাবা (মৃত্যু- ১৮৭১ খ্রীঃ)
(৪) নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ শাহীন (১৮৪৬-১৯০১)
(৫) খাজা আব্দুল গাফফার আখতার
(৬) নওয়াবজাদা খাজা মোঃ আফজাল খান বাহাদুর (১৮৭৫-১৯৪০)
(৭) খাজা আতিকুল্লাহ শাহজাদা শায়দা (১৮৫৩-১৯২৮)
(৮) খান বাহাদুর খাজা মোঃ ইসমাইল জবিহ (১৮৮১-১৯৫৯)
(৯) মীর্জা ফকির মোহাম্মদ (১৮৭৭-১৯৫৮)
(১০) খাজা মোহাঃ আজগর (মৃত্যু- ১৯০৮)
(১১) খান বাহাদুর খাজা মোহাঃ আজম (১৮৭৪-১৯৫৪)
(১২) খান বাহাদুর খাজা মোহাঃ মোয়াজ্জম (মৃত্যু ১৯৩৮)
(১৩) খাজা মোহাঃ আদেল (১৯০৪-১৯৭৩)
(১৪) খাজা বেদার বখত
(১৫) খাজা আব্দুল আলীম
(১৬) খাজা মোহাঃ সেলিম (১৯০১-১৯৮৫) প্রমুখ

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে খাজা পরিবারের খ্যাতনামা তিনজন নওয়াব কর্তৃক সাহিত্য চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হলো ঃ

৮(১)(গ) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব আব্দুল গণি ঃ

ঢাকার খাজা পরিবারের সর্বাপেক্ষা নামকরা ব্যক্তিত্ব নওয়াব আব্দুল গণি ব্যক্তিগতভাবে কোন সাহিত্য চর্চা না করলেও তিনি কবিতা ও গান চর্চায় ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মহররম ও ইংরেজী নববর্ষ উৎসবের সময় তিনি উর্দু-ফার্সী কবিদের মুশায়ারা (কবিতা প্রতিযোগিতা) অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তাঁর নিকট থেকে ঢাকার বহু কবি সাহিত্যিক ও সংগীত শিল্পী আর্থিক সাহায্য পেতেন।[১৭(ক)] নওয়াব আব্দুল গণি ১৮ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখে প্রকাশিত ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র তথা ইংরেজী সাপ্তাহিকী ঢাকা নিউজের অন্যতম একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন।[১৮]

আব্দুল গফুর নাসসাখের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ঢাকায় তাঁর অবস্থান কালে নওয়াব আব্দুল গণির বদান্যতায় ঢাকায় একটি বড় ধরনের মুশায়ারা আয়োজন করা হয়েছিল।[১৯] উর্দু-ইংরেজীতে বাক্যালাপ ও সাহিত্য শ্রবণ করলেও বাংলা ভাষার প্রতি আব্দুল গণির অশ্রদ্ধা ছিল না। জমিদারির প্রয়োজনে তাঁর কাচারি সমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যে রীতি ছিল তা কোন দিন তিনি ইংরেজী বা উর্দু করার চেষ্টা চালাননি। গরীব ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তিনি কুমারটুলিতে যে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটাও ছিল ইংরেজী-বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি সব শ্রেণীর পন্ডিতজনের সমাদর করতেন। এদেশে সংস্কৃত ভাষার কিরূপ চর্চা হয় তা জানার জন্য ১৮৮৫ সালে জনৈক ইটালিয়ান পন্ডিত ঢাকায় আগমন করেন। নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষে ৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীঃ দিলখুশা বাগান বাড়ীতে এক মহতী অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন করেন। দেশীয় এবং ইউরোপীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া বিক্রমপুর ও ঢাকার খ্যাতনামা পন্ডিতগণ সব নিমন্ত্রিত হয়ে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশী- বিদেশী গান বাজনা পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। পন্ডিতগণ প্রথমে নিজেদের মধ্যে শাস্ত্রালাপ করেন। নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ উক্ত ইটালীয় পন্ডিতকে সাথে করে নিয়ে এসে দেশীয় পন্ডিতদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর দেশীয় পন্ডিতগণ তাঁকে সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান এবং এদেশে সংস্কৃত ভাষা চর্চা ও শিক্ষা প্রণালীর বিষয়ে অবহিত করেন। তাঁরা ইটালিতে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তাও জানতে চান। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলে হাজার হাজার আলোকমালা দ্বারা নওয়াবের উক্ত বাগানবাড়ী সজ্জিত করে অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করা হয়।[২০] নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর পুত্র আহসানুল্লাহকে সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা করে দিতেন।

৮(১)(ঘ) নওয়াব আহসানুল্লাহর সাহিত্য চর্চা ঃ

নওয়াব আহসানুল্লাহ ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তাঁর কাব্য নাম ছিল শাহীন (বাজপাখী) এবং কাব্য উস্তাদ ছিলেন আব্দুল গাফফার আখতার। তায়েশ বলেন, 'নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রায় সময় বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে এটুকু বলা যায়, বাদশাহদের কাব্যও কাব্যের বাদশাহ হয়ে থাকে।'[২১] প্রফেসর আব্দুল্লাহ বলেন, শাহীনের বেশীর ভাগ কবিতা বন্ধুদের আসরে উপস্থিত প্রয়োজনে রচিত। তাই তাঁর কাব্যে স্বতস্ফূর্ততা ও আনন্দের হিল্লোল আছে কিন্তু ভাবগাম্ভীর্যতা নেই।[২২] নওয়াব আহসানুল্লাহর কাব্য সংকলন 'কুল্লিয়াতে শাহীন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, যার একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।[২৩] তাঁর রচিত 'তারিখে খান্দানে কাশ্মিরীয়াহ' শীর্ষক বইটি ইতিহাস ও সাহিত্য উভয় দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটিতে খাজা পরিবারের কাশ্মীর হতে ঢাকায় আগমন থেকে শুরু করে তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, জমিদারি ক্রয়, বংশ বিস্তার এবং বংশের গণ্যমান্যদের চারিত্রিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি লেখা আছে। ২৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটির (অপ্রকাশিত) একটি পান্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।[২৪] নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর পিতার ন্যায় কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর উৎসাহে মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী নওয়াবের শাহবাগ ও দিলখুশা বাগান বাড়ী নিয়ে কবিতা রচনা করেন। এছাড়া নওয়াবের অনুরোধেই মওলানা সাহেব তাঁর নিজের আত্মজীবনী 'দাস্তান-ই-ইবরাত বার' রচনা করেন।[২৫] নওয়াবের পৃষ্ঠপোষকতায় খাজা আজগর নকশবন্দী আমেরিকার ইতিহাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং মৌঃ আঃ রহমান 'আহসানুল আকিয়াদ' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[২৫(ক)] নওয়াব আহসানুল্লাহর সম্পাদনায় ১৮৮৪ খ্রীঃ ঢাকা থেকে 'আহসানুল কাসাস' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হয়।[২৬] নওয়াব সাহেব বেশ কয়েকটি উর্দু নাটক রচনা করেন এবং সেগুলো তিনি নওয়াব বাড়ীর মঞ্চে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেন। পরিবারের লোকজন ছাড়াও শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করে এনে তিনি ঐসব নাটক দেখানোর ব্যবস্থা করতেন।[২৭] নওয়াব আহসানুল্লাহ উর্দুতে নিয়মিত ডাইরী লিখতেন। তবে ডাইরী গুলোতে তাঁর ঘটনা বহুল জীবনের তথ্যাদি আশানুরূপভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এতে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম, পাঠাভ্যাস, বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন, শিকার, ক্রীড়ানুষ্ঠান, উৎসবাদিতে যোগদান, পরিবারে জন্ম-মৃত্যু, বিয়েশাদী ও অতিথি আপ্যায়ন, দান-খয়রাত ও ধর্মানুষ্ঠান এবং সমকালের আবহাওয়া ও ঋতু প্রকৃতির কথা জানা যায়।[২৮] ডাইরীগুলোর বেশীর ভাগেরই কোন হদিস নেই। সৌভাগ্যবশত নওয়াব এস্টেটের পুরোনো অফিস থেকে এরূপ ৫/৬টি ডাইরী আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংগৃহীত হয়েছে।[২৯] নমুনা স্বরূপ নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখা ডাইরীর দু'টো পাতার ফটোকপি পরিশিষ্ট নং ১৮ পৃঃ৪৩৩-এ দেয়া হলো। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায় ব্যক্তিগত ও এস্টেটের প্রয়োজনে প্রায় প্রতিদিন তিনি চিঠিপত্র লিখতেন। ১২৭২-৭৫ বংগাব্দে (১৮৬৫-৬৮ খ্রীঃ) বিভিন্ন লোকের কাছে তাঁর লেখা একটি ফার্সী পত্র সংকলন (অপ্রকাশিত) আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রয়েছে।[৩০] এছাড়া ১৮৬৮-৬৯ খ্রীঃ তাঁর লেখা অনুরূপ আরেকটি ফার্সীপত্র সংকলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রয়েছে।[৩১] উক্ত পত্রগুলোর মধ্যে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির প্রসংগ নিয়ে নওয়াব আব্দুল লতিফকে লেখা নওয়াব আহসানুল্লাহর বেশ কয়েকটি পত্রের কপিও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইতিহাস পরিমার্জনায় পত্রগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

৮(১)(ঙ) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ঃ

নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতার ন্যায় সাহিত্য চর্চা না করলেও তিনি যে একজন সাহিত্যরসিক ছিলেন তার প্রমাণ মেলে। তাঁর লেখা উর্দু ও ইংরেজী ভাষণ এবং চিঠিপত্রগুলো ভাষাগুনের বিচারে যেমন উন্নতমানের তেমনি সাহিত্যের দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে জীর্ণকাগজপত্রের মধ্যে সলিমুল্লাহর রচিত এমন একটি দাওয়াত পত্র রয়েছে, যা থেকে তাঁর কবি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কার্তিকপুরের জমিদার কফিলুদ্দিন চৌধুরীর পুত্র মহিউদ্দিন চৌধুরীর সাথে নওয়াবের কন্যা আয়শা খানমের বিবাহ উপলক্ষে উর্দু-ফার্সী ভাষায় কবিতাছন্দে দাওয়াত পত্রটি লেখা হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখ সম্বলিত দাওয়াত পত্রটি কলকাতার রেদোয়ানী প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল।[৩২] পরিশিষ্ট নং-১৯ পৃঃ৪৩৪তে দাওয়াত পত্রটির প্রতিলিপি এবং বংগানুবাদ দেয়া হলো।

তৎকালে কলকাতা থেকে মুসলমান সমাজের মুখপত্র হিসেবে মিহির ও সুধাকর নামে একটি নামকরা সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ অর্থ সাহায্য দিতেন।[৩৩] ১৯১০ সালের ১৬ অক্টোবর নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় পুর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যে সভা হয়, তাতে মিহির ও সুধাকরকে কলকাতা থেকে উঠিয়ে এনে ঢাকা থেকে প্রকাশের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক ও ঢাকার বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক, কালীপ্রসন্ন ঘোষ- এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯১১ খ্রীঃ নর্থব্রুক হলে আয়োজিত সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ সভাপতির যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর দরদ ফুটে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষের চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও ভাবময় গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমালংকৃত ও সমুন্নত করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অভাব পূরণ হবার নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যতদিন থাকবে ততদিন তিনি অমর হয়ে থাকবেন।[৩৫] নওয়াব সলিমুল্লাহ কবি সাহিত্যিকদের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। বাংলার সুপন্ডিত ও সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯০২ সালে অসুস্থতার কারণে অর্থকষ্টে পড়ে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্তের স্মরণাপন্ন হন। মহারাজা ১৯০২ খ্রীঃ ১৮ ফেব্রুঃ একটি পত্র লিখে তাঁকে নওয়াব সলিমুল্লাহর নিকট পাঠান। নওয়াব সাহেব তাঁকে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করেন।[৩৬]

খাজা পরিবারের নওয়াবজাদা খাজা মোহাঃ আফজাল খান বাহাদুর (১৮৭৫-১৯৪০) (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ২৮ দ্রঃ) একজন বিশিষ্ট উর্দু-ফার্সী কবি ছিলেন। তাঁর রচিত দুটো দুস্প্রাপ্য কবিতার তথ্য নিম্নে দেয়া হলো। তিনি ছন্দোবদ্ধ বাক্যদ্বারা ঘটনাবলীর সন তারিখ নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেশ বিদেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জন্ম মৃত্যু তারিখ নিয়ে তিনি এরূপ বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু কালের কবলে আজ সেগুলোর প্রায় সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি ১৯১০ সালে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড-এর তিরোধান উপলক্ষে ফার্সীতে অনুরূপ একটি শোকগাঁথা এবং সেটার ইংরেজী অনুবাদ তৈরী করে নওয়াব সলিমুল্লাহকে সেটা প্রদান করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত পুরানো কাগজপত্রের মধ্য থেকে খাজা আফজালের রচিত উক্ত শোকগাঁথাটি উদ্ধার করা গেছে। পরিশিষ্ট নং ২০ পৃঃ৪৩৬তে সেটা দেয়া হলো। উল্লেখ্য, ১৯১২ সালে যুক্তবংগের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল প্রথম ঢাকায় এলে খাজা আফজাল তাঁকে অভিনন্দিত করে একটি ফার্সী কবিতা ও তার ইংরেজী অনুবাদ রচনা করেছিলেন। তিনি কবিতাটি গভর্নরকে উপহার দিলে তিনি যারপরনাই খুশী হন।[৩৭]

৮(২) সংগীত, নাটক, ফটোগ্রাফী ও সিনেমা চর্চায় নওয়াব পরিবার

৮(২)(ক) সংগীত চর্চা ঃ

কাশ্মীর থেকে ঢাকায় এসে নওয়াব পরিবারের আদি পুরুষরা এখানে ধর্মীয় গুরুর ভূমিকা পালন করতেন। তাই প্রথম যুগে রক্ষণশীল মনোভাবের দরুণ খাজা পরিবারে কোন গান-বাজনার প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে বৈষয়িক কাজ কারবার বিশেষ করে জমিদারি পরিচালনায় লিপ্ত হলে, তাঁদের এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। খাজা হাফিজুল্লাহর সময় পর্যন্ত ঢাকার খাজা পরিবারে কোন নাচ-গান হয়নি। তবে তাঁর পুত্র খাজা আব্দুল গফুরের বিয়ের সময় কিছু গান-বাজনা হয়েছিল। সেটাও নিজেদের বাড়ীতে নয়, তাঁদের খরচে অন্যদের বাড়ীতে। আব্দুল গফুরের আমলে তাঁর আত্মীয় জনৈক মুনশী আহমদ হোসেনের বিয়েতে খাজাদের বাড়ীতে প্রথম নাচ-গানের আসর হয়েছিল। সেটাও খাজাদের উদ্যোগে নয়, উক্ত আহমদ হোসেনের পিতা মুনশী ফয়জুদ্দিনের উদ্যোগে হয়েছিল।[৩৮]

খাজা আলীমুল্লাহই প্রথম এই পরিবারে নাচ-গানের আসর বসানো শুরু করেন। এই সময় বিয়ে শাদী কিংবা অনুরূপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাইজীও আনা হতো।[৩৯] আগেই বর্ণিত হয়েছে প্রতি বছর ঘোড়দৌড়ের সময় ঢাকায় আগত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ইংরেজ সাহেবদের সম্মানার্থে খাজা আলীমুল্লাহ নৈশ ভোজ ও বল-নাচের অয়োজন করতেন।

নওয়াব আব্দুল গণির আমলে ঢাকার খাজা পরিবারের সাথে গান-বাজনার সম্পৃক্ততা আরো বেড়ে যায়। তিনি নাচ-গানে বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। প্রায় রাতেই তিনি আহারের পর নাচ-গানের আসর জমাতেন। তাঁর সমমনা অন্যরাও ঐ আসরে যোগ দিতেন। আব্দুল গণি বেনারস, ফররোখাবাদ, রামপুর, কলকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে বাইজী এনে তাঁর বাড়ীতে

Dhaka University Institutional Repository

রাখতেন এবং তাদের নাচ-গান উপভোগ করতেন। ঐ বাইজীদের মধ্যে হুসায়নী, হায়দরী, বেলায়তি, বন্দী, লোনডী, মুজলিয়া প্রমুখের নাচ-গান বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল বলে জানা যায়।[৪০]

হাকিম হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, নওয়াব আব্দুল গণির চা-খানায় প্রতিদিন সকালে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জমা হতো। তাঁদেরকে চা-পানে আপ্যায়ন করা ছাড়াও বাইজীদের গান শোনানো হতো। উত্তর ভারত থেকে আগত ঐসব বাইজীদের নওয়াব সাহেব মাসিক বেতন দিয়ে রাখতেন। তাদের মধ্যে আন্নু গান্নু এবং নওয়াবীন নামে তিন বোন খুব নামকরা গায়িকা ছিল। ঢাকায় তারা ঘরবাড়ী এবং বাগ-বাগিচাও তৈরী করেছিল।[৪১] উল্লেখ্য, ঐ আমলে বাইজীরা কেউ বাংলায় গান গাইতো না। তারা উর্দু- অথবা হিন্দীতে গান গাইত।[৪২] তায়েশ বলেন, ঢাকার নওয়াব সাহেবগণ গান শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সংগীত শিল্পীদের বিশেষ মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন।[৪৩]

নওয়াব আব্দুল গণির পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর প্রথম বিয়ের সময় নওয়াবের ব্যয়ে ঢাকা শহরের ঘরে ঘরে নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৪৪] ঐ সময়েও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, বাদক ও ভাঁড় আনা হয়েছিল। এই উপলক্ষে আগত শিল্পীদের মধ্যে শাহজাদী, মন্নুজান, জাসুখান, সবজা, বাগোবাহার, আশরাফ খান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।[৪৫]

নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহর খেতাব প্রাপ্তি এবং আহসানুল্লাহর পুত্রের সুন্নতে খাতনা উপলক্ষে ১৮৭৬ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে ১৬ দিন ব্যাপী নাচ গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। তখন লখনৌ ও কলকাতা থেকে বাইজী আনা হয়েছিল এবং কলকাতা থেকে পার্শী থিয়েটার এনে অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। ঢাকার গন্যমান্য ও পদস্থ লোকদের দাওয়াত করে ঐসব অনুষ্ঠানাদি উপভোগ করানো হয়েছিল।[৪৬] উক্ত গানের অনুষ্ঠানে একজন খ্যাতনামা গায়িকার ঘরনা তালে পরিবেশিত গজলের রচনা ও কথা নিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক ও রসালাপ হয়েছিল।[৪৭] আগেই বর্ণিত হয়েছে মহররম ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে নওয়াব আব্দুল গণি উর্দূ ফার্সী কবিদের সমন্বয়ে মুশায়রার আয়োজন করতেন।

সেকালে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছর ঢাকায় হোলি বা বসন্তোৎসব পালিত হতো। এতে হিন্দু-মুসলমান সমান উৎসাহে যোগ দিতেন। মোগল নায়েবে নাজিমদের ন্যায় ঢাকার নওয়াবরাও উক্ত হোলি উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রতি বছর এজন্য উর্দু ভাষায় হোলির গান রচিত হতো।[৪৮] হোলি উপলক্ষে সমাজের উঁচু-নীচু সবাই নিজ নিজ পছন্দ মত আবীর রঙ খেলতো। আগেই বর্ণিত হয়েছে, নওয়াব আব্দুল গণি কয়েকবার তাঁর বাসভবন এলাকায় বসন্তোৎসব ও হোলির গানের আয়োজন করেন।[৪৯] নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে, শিউলি ও কুসুম ফুলের হলুদ রঙ ছিটিয়ে নওয়াব পরিবারে হোলি খেলা হতো। এছাড়া ফাগ রঙের খেলাও প্রচলিত ছিল।

নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলে ঢাকার নওয়াব পরিবারের সংগীত চর্চা শীর্ষস্থানে আরোহন করে । তিনি নিজেই একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, গীতিকার ও কন্ঠশিল্পী ছিলেন। রাগ-রাগিনীতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ ব্যাপারে বড় বড় উস্তাদরাও তাঁকে সমীহ করতেন। তিনি ছিলেন বেহালা, পিয়ানো, হারমোনিয়াম ও সেতারের একজন কুশলী বাদক। সংগীতের প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল যে, রাত্রিবেলা গান না গাইলে বা না শুনলে তাঁর ঘুম আসতে চাইত না। তিনি শত শত ঠুমরি গান রচনা করে গেছেন।[৫০] তাঁর রচিত নাত ঢাকার মিলাদ-মাহফিল সমূহে কিছুদিন আগেও পঠিত হতো।[৫১] কুল্লিয়াতে শাহীন নামে নওয়াব আহসানুল্লাহর যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ৪টি ফার্সী গজল, ৩০টি উর্দু গজল, ৫টি উর্দু রেখতি এবং ৮৫ টি হিন্দী গীত ছিল। তাঁর গীতগুলো হোরী, বাহার, পীলু, ভৈরবী, মালার, জুগিয়া, টোরী, রামকেলী, মালকোশ ইত্যাদি রাগে রচিত।[৫২] নওয়াব আব্দুল গণি খাজা পরিবারে নাচ-গানের আসর জমানোর যে ধারা শুরু করেছিলেন, তা নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় অব্যাহত থাকে। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী থেকে জানা যায় তিনি প্রায়শই আহসান মঞ্জিলের হিন্দুস্থানী কক্ষে নাচ-গান ও গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান করতেন। (১৯০৪ সালে মিঃ ফ্রিৎজকাপের তোলা উক্ত হিন্দুস্থানী কক্ষের একটি দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং -৩১ এ দেয়া হলো।) এসব অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই অনেক

Dhaka University Institutional Repository

সময় বাজনা বাজাতেন। তাঁর আসরে যেসব গায়িকারা নাচ-গান করতো তন্মধ্যে দিলজান, রাজলক্ষী, বানুয়া, আমানী এবং নওবীন-এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৩] নওয়াব আব্দুল গণির ন্যায় তিনিও অনেক সময় আহসান মঞ্জিল এলাকায় হোলি গানের আসর জমানোর ব্যবস্থা করতেন। তিনি অনেকগুলো হোলি গান রচনাও করেছেন। এ গানের কয়েকটা তাঁর কুল্লিয়াতে শাহীন পুস্তকে স্থান লাভ করেছে।[৫৪]

নওয়াব আহসানুল্লাহ দেশবাসীর মধ্যে সংগীত প্রসারের প্রচেষ্টাও চালাতেন। ঢাকা সংগীত বিদ্যালয় পরিচালনার্থে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য দিতেন।[৫৫] তাঁর সময় বিয়ে সাদী কিংবা অনুরূপ পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে নওয়াব বাড়ীতে নাচ-গানের সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।[৫৬] এছাড়া বিভিন্ন সময় উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদের আগমন উপলক্ষে প্রায়ই আহসান মঞ্জিলে নাচ-গানের আসর বসতো।[৫৭] লেডী ডাফরিনের লেখা থেকে জানা যায় ১৮৮৭ সালের ৬ জানুঃ তিনি নওয়াবের কলকাতার প্রাসাদে এবং ১৮৮৮ সালে ২৬ নভেম্বর তিনি ঢাকায় আহসান মঞ্জিলে বড় লাটের সাথে নওয়াবের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। উভয় দিনই নৈশ ভোজের পর তাঁদেরকে দেশীয় নাচ-গানে আপ্যায়ন করা হয়েছিল।[৫৮]

ঢাকায় ঘোড়দৌড় উপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহও তাঁর পিতার ন্যায় নৈশ ভোজ এবং বলনাচের আয়োজন করতেন।[৫৯] ইংরেজ সাহেব ও মেমদের সাথে নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেও বলনাচে অংশগ্রহণ করতেন।[৬০] আগেই বর্ণিত হয়েছে ১৮৭৫ খ্রীঃ থেকে প্রতি বছর ইংরেজী নব বর্ষ উপলক্ষে নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে কৃষি ও শিল্পমেলা লাগানো হতো। ঐ মেলায় নওয়াবের ব্যয়ে নৃত্য-গীত, ম্যাজিক, কৌতুক প্রভৃতির আয়োজন করা হতো।[৬১]
নওয়াব আহসানুল্লাহর পুত্র খাজা আতিকুল্লাহ ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। নওয়াব সাহেব তাঁকে জনৈক জার্মান শিক্ষকের কাছে বেহালা বাজানো শিখতে দিয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে জানুয়ারী মাসে ইনসপেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন, মৌলভী দেলবর হোসেন ঢাকায় এলে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর সম্মানে শাহবাগে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাত্র ১০ বছর বয়সে নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহ বেহালা বাজিয়ে শোনান।[৬২]

নওয়াব সলিমুল্লাহ গান-বাজনার একজন সমঝদার ছিলেন। নওয়াবী পদে আসীন হয়েই তিনি ২ মার্চ ১৯০২ খ্রীঃ ঢাকার গণ্যমান্যদেরকে আহসান মঞ্জিলে দাওয়াত করে এনে ভোজ ও গান-বাজনার মাধ্যমে আপ্যায়িত করেছিলেন।[৬৩] কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজে এবং রাজনীতিতে এত বেশী জড়িত ছিলেন যে সংগীতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। তবে তাঁর আর্থিক সাহায্য পেয়ে ঢাকার কয়েকজন কারুশিল্পী সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বানিয়ে ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন।

নওয়াব হাবিবুল্লাহ গান-বাজনার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলে অর্থাভাবে শানসৌকতে ভাটা পড়ায় আনুষ্ঠানিক গান-বাজনা তেমন হয়নি। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী মাঝে মধ্যে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা দেয়া উপলক্ষে আহসান মঞ্জিল কিংবা শাহবাগে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে কিছু গান-বাজনা করা হতো। ১৯২০ সালে মার্চ মাসে তিনি আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গনে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী হোলি গানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁতী বাজার ও শাঁখারী বাজার দলের সাথে শহরের পশ্চিমাঞ্চলের দলের গানের পাল্লা হয় এবং এতে তাঁতী বাজার দল জয়লাভ করে।[৬৪]

১৯২৬ সালে ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলে গান-বাজনা বন্ধ করার জন্য উগ্রপন্থী মুসলমানেরা চাপ দিতে থাকে। কিন্তু নওয়াব হাবিবুল্লাহ সেটা ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে বিধায় তা যথারীতি চলতে দেয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।[৬৫] এতে সংগীত ও পরধর্মের প্রতি তাঁর উদার মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নওয়াব পরিবারের খাজা আতিকুল্লাহ শাহজাদা শায়দা একজন বিশিষ্ট উর্দু-ফার্সী সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি একজন উঁচু দরের সংগীতজ্ঞ ছিলেন বলেও জানা যায়। তিনি বলতেন গানের বিষয়বস্তু অবশ্যই সুরুচি মাফিক হওয়া উচিত। তিনি প্রচলিত রাগ রাগিনীগুলো বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন রাগ রাগিনী সৃষ্টি করতেন। তাঁর লেখা দুটো গানের পান্ডুলিপি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

বলে জানা যায়।[৬৬] তাঁর পুত্র খাজা মোঃ আজমেরও গানের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাঁর ভবিষ্যত প্রয়োজনের কথা ভেবেই খাজা শায়দা গানের বইগুলো রচনা করেছিলেন।

এছাড়া নওয়াব পরিবারের খাজা বেদার বখত, খাজা মোঃ সেলিম এবং মীর্জা ফকির মোহাম্মদ প্রমুখের গান-বাজনার প্রতি আগ্রহ ছিল বলে জানা যায়। তাঁদের রচিত কিছু হামদ নাতের পান্ডুলিপি তাঁদের বংশধরদের নিকট এখনো রয়েছে।

৮(২)(খ) নাট্য চর্চায় অবদান ঃ

ঢাকার নাট্য আন্দোলনে নওয়াবদের একটা বড় অবদান রয়েছে। বিশেষ করে এতদাঞ্চলে উর্দু-নাটক রচনা ও মঞ্চায়নে তাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত নীল দর্পন নাটক ১৮৬১ সালে ঢাকাতেই মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৮৬০ দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার প্রথম নাট্যশালা পূর্ববংগ রংগভূমি। বর্তমান জগন্নাথ কলেজের স্থানে সেটি প্রতিষ্ঠা করেছিল ঢাকার কয়েকজন সংস্কৃতিমনা হিন্দু ভদ্রলোক।[৬৭] এই নাট্যশালায় ১৮৭২ খ্রীঃ মঞ্চস্থ হয়েছিল নাটক'রামাভিষেক'। এতে অনেক গন্যমান্যদের সাথে ঢাকার নওয়াব সাহেবও দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।[৬৮]

১৮৭৩ খ্রীঃ কলকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার দল ঢাকায় এসে মাসাধিক কাল ধরে পূর্ববঙ্গ রংগভূমিতে নীলদর্পণসহ অনেকগুলো নাটকের অভিনয় করেন। নাটকগুলো পরিচালনায় নওয়াব আবদুল গণি তাঁর নিজস্ব ব্যান্ড পার্টি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[৬৯]

ঢাকার নওয়াবগণ বিভিন্ন সময় কলকাতা, বোম্বে প্রভৃতি স্থান থেকে নামকরা নাট্যদলকে ঢাকায় এনে স্থানীয়দেরকে উন্নতমানের অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করতেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে নওয়াবের খেতাবপ্রাপ্তি এবং নওয়াবপুত্রের সুন্নতে খাতনা উপলক্ষে ১৮৭৬ খ্রীঃ নওয়াব বাড়ীতে ১৬ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে (এপ্রিল মাসের শেষ দিকে) কলকাতা থেকে পার্সী থিয়েটার দলকে এনে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে অভিনয় দেখানো হয়েছিল।[৭০] ঢাকা প্রকাশ থেকে জানা যায় ঐ বছরই মার্চমাসে নওয়াব আব্দুল গণির আমন্ত্রণে বোম্বাই থেকে একটি নাট্যদল ঢাকায় আসে। পুর্ববংগ রংগভূমিতে তারা ১১ মার্চ ১৮৭৩ খ্রীঃ হিন্দি ভাষায় মঞ্চস্থ করেছিল 'ইন্দ্রসভা' নামক জনপ্রিয় নাটক। ইতোপূর্বে ঢাকায় এতো উৎকৃষ্ট দৃশ্য, সাজ-পোশাক এবং অভিনয় কখনো দেখা যায়নি। ঐ নাট্যদল সেবার সপ্তাহকাল ধরে অনেকগুলো নাটক মঞ্চায়িত করেছিল।[৭১]

তৎকালে ঢাকার নাটকে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষেরা মহিলা সেজে অভিনয় করত। ১৮৭৯ খ্রীঃ কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে অভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রে প্রথম বারের মত মহিলাদের অংশ গ্রহণ করান। এত প্রাচীন পন্থী হিন্দু মুসলমান বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজ ভীষণভাবে রুষ্ট হয়।[৭২] তাঁরা সভা করে ঐ নাটক দেখা থেকে জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্রদেরকে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নওয়াব আবদুল গণি নাটকে মহিলাদের অংশ গ্রহণের বিরোধিতা করেননি। তিনি বরং এর বিরুদ্ধবাদীদের সংকীর্ণ মনমানসিকতার সমালোচনা করেছিলেন।[৭৩] ব্রেডলী বার্ট বলেন, নওয়াব আবদুল গণি সংগীত ও কবিতার একজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তিনি অভিনয় শিল্পে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়কে তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন।[৭৪]

আগেই বর্ণিত হয়েছে উত্তর ভারত থেকে আগত আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন নামে তিন বোন নওয়াব এস্টেট থেকে ভাতা প্রাপ্ত বাইজী ছিল।[৭৫] তারা ১৮৮০ সালে ঢাকার পূর্ববংগ রংগভূমিতে হিন্দী নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় ইন্দ্রসভা, যাদুনগর প্রভৃতি নাটক সেখানে অভিনীত হয়। ঢাকায় শুধু মহিলাদের দ্বারা অভিনয় ছিল এটাই প্রথম।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষ দিকে (আনুঃ১৮৯০-৯২ খ্রীঃ) ক্রাউন থিয়েটার নামে ঢাকায় একটি পেশাদারী নাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা পূর্ব বংগ রংগভূমির পুরানো হলঘরটি ভেংগে সেখানে নতুন ঘর তৈরী করেন। এরপর সেটা 'নাটকঘর' নামে পরিচিত হয়।[৭৭] ক্রাউন থিয়েটার প্রথমে স্থানীয় অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করে। পরে তাঁরা কলকাতা থেকে অভিনেত্রী নিয়ে আসেন। তাঁদের অভিনীত নাটক বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ঐ নাটক ঘরের পার্শ্বে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজ ও ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে শান্তি ভংগের অভিযোগ তোলেন।[৭৮] এমতাবস্থায় তাঁরা বাধ্য হয়ে কুমারটুলীর আহসানুল্লাহ রোডে নাটকঘরটিকে স্থানান্তর করেন। সংস্কৃতমনা নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর বরফের কলের পাশে অবস্থিত টিনের ঘরটি একাজে ব্যবহার করতে দিতে কোনই আপত্তি করেননি। ক্রাউন থিয়েটার বহুদিন যাবৎ সাফল্যের সাথে এখানে অভিনয় চালিয়েছিল।

হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন, উনিশ শতকের শেষার্ধে নওয়াব আবদুল গণি ও আহসানুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার প্রতিটি মহল্লায় নাটকের চর্চা হতো। নাট্যকারেরা তাঁদের উৎসাহে নাটক রচনা করতেন। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নাট্যামোদিদের উদ্যোগে সেগুলো মঞ্চস্থ করা হতো।[৮০] নওয়াব আহসানুল্লাহর নির্দেশে তাঁর নিকটাত্মীয় ঢাকা মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষক আহমদ হুসাইন ওয়াফির বিখ্যাত উর্দু-নাটক 'বিমার বুলবুল' রচনা করেন। ঢাকা মোহাম্মদী প্রেস থেকে ১৮৮০ সালে সেটা প্রকাশিত হয়। রচনার সাথে সাথে নাটকটি খুবই সমাদৃত হয় এবং সেটা বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছিল।[৮১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নওয়াব আহসানুল্লাহ একজন বিশিষ্ট উর্দু ও ফার্সী কবি ছিলেন। তিনি নিজেও কয়েকটি উর্দু নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকগুলো তিনি নওয়াববাড়ী এলাকায় নির্মিত তাঁর পারিবারিক থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ করেছিলেন।[৮২] নওয়াব সাহেবের নিকটাত্মীয় মীর্জা ওলিজান কমর একজন নামকরা উর্দু ফার্সী কবি ছিলেন। নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করার প্রতি তাঁরও বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর নাটকে জনৈক শেখ হায়াত মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৮৩]

১৮৯৫ সালে নওয়াব আহসানুল্লাহ কলকাতা থেকে নিজ ব্যয়ে স্টার থিয়েটারকে ঢাকায় এনে নিজ পরিবার ও ঢাকা বাসীদের অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করেন। পরিবারের লোকদের বিশেষ করে মহিলাদের নাটক দেখানোর সুবিধার্থে তিনি আহসান মঞ্জিল প্রাংগনে একটি নাট্যশালা তৈরী করেন।[৮৪] ঢাকার কমিশনার থেকে শুরু করে শহরের সব গন্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করে এনে উক্ত অভিনয় দেখানো হয়েছিল।[৮৫] ঢাকার সব ভদ্রলোককে একত্রে নাটক দেখানো সম্ভব ছিল না। তাই নওয়াব সাহেব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পৃথক দিনে ডেকে এনে নাটক দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[৮৬] ঐ সময় প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে নওয়াববাড়ীর নাট্যমঞ্চে চন্দ্রশেখর, লায়লা-মজনু, বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এতে নওয়াব সাহেবের কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।[৮৭]

আগেই বর্ণিত হয়েছে জনকল্যাণমূলক কাজ ও রাজনীতি করতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ সংগীত ও নাটক চর্চায় তেমন নজর দিতে পারেননি। তবে তিনি এ বিষয়ে তাঁর পিতা ও পিতামহের ন্যায় উদার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতায় ক্লাসিক থিয়েটারে 'শিবাজী' নাটক দেখেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯০৩ সালে জানুয়ারী মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহ অন্তপূর বাসিনীদের দেখানোর জন্য পার্সী থিয়েটার কোম্পানীকে দিয়ে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে অভিনয় করানোর ব্যবস্থা করেন। মহিলাদের কঠোর পর্দা প্রথার যুগে এই ব্যবস্থাটি ছিল নওয়াবের উদার মনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী কাজ।[৮৮] ১৯০৪ সালে কলকাতা থেকে ক্লাসিক থিয়েটার দল নওয়াব সলিমুল্লাহর আমন্ত্রণে ঢাকায় এসে কয়েকটি নাটক প্রদর্শন করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ খ্রীঃ কোরবানীর ঈদ উৎসবের দিনে নওয়াব সাহেব খাজা পরিবারের সকলকে নিজ খরচে উক্ত থিয়েটারের অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করেন।[৮৯] ১৯০৯ সালে জানুয়ারী মাসে স্বরস্বতী পূজা উপলক্ষে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা ' পদ্মিনী নাটক' অভিনয় করার জন্য আয়োজন করেন। কিন্তু উক্ত নাটকে মুসলমানদের জন্য কিছু আপত্তিকর দৃশ্য থাকায় এক শ্রেণীর মুসলিম ছাত্র ও অভিভাবকেরা সেটা অভিনয়ের প্রতিবাদ জানায়। এ বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব সলিমুল্লাহর মতামত চাওয়া হয়। তিনি নাটকটির অপ্রীতিকর দৃশ্যগুলো পরিবর্তন করে অভিনয় করতে দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। কিন্তু যে কোন ধরনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ শার্প শেষ পর্যন্ত নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেন।[৯০] খাজা শামছুল হকের ডাইরী থেকে জানা যায় ১৯০৫ সালের জুন মাসে নওয়াববাড়ীতে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। আলফ্রেড আলেকজান্ডার নামক ঐ নাটকটির সাথে খাজা শামসুল হক, খাজা ইসমাইল প্রমুখরা জড়িত ছিলেন।

নওয়াব হাবিবুল্লাহও একজন সংস্কৃতিমনা লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকায় নওয়াবের পক্ষে এসব বিষয়ে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া সম্ভব ছিল না। তবে তাঁর আমলে খাজা পরিবারের কিছু সংস্কৃতিমনা সদস্যদের উদ্যোগে তাঁদের নাট্যচর্চা নবরূপ পরিগ্রহ করে। খাজা পরিবারের উৎসাহী যুবকেরা এসময় নিজেরাই নাটকে অভিনয় করা শুরু করেন। আহসান মঞ্জিলের বড় বড় হলরুমের কোন একটিতে মঞ্চ সাজিয়ে তাঁরা অভিনয় করতেন। নাটকগুলো সব উর্দু ভাষায় হতো। সাধারণতঃ পুরুষেরাই মেয়ে সেজে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তবে অনেক সময় বাইরে থেকেও অভিনেত্রী আনা হতো।[৯১] নাটকগুলোতে সাধারণত নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ নায়কের অভিনয় করতেন। নায়িকা চরিত্রে অনেক সময় খাজা শরফুদ্দিন মেয়ে সেজে অভিনয় করতেন। খাজা ইসমাইল সাধারণত বাবা কিংবা বয়স্কদের চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং নওয়াবজাদা খাজা আলীমুল্লাহ ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতেন। খাজা ইসমাইল একজন ভাল অভিনেতা হিসেবে নাম করেছিলেন।[৯২] নাটক দেখার জন্য নওয়াব পরিবারের বাইরে থেকে কেবল নিমন্ত্রিত অতিথিদেরকেই আহসান মঞ্জিলের ভেতরে যেতে দেয়া হতো। তবে অনেক সময় দর্শনীর বিনিময়েও তাঁরা এখানে নাটক দেখাতেন।[৯৩] নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্য খাজা লতিফুল্লাহ এবং খাজা হালিম জানিয়েছেন, বিশ শতকের ত্রিশের দশকে আহসান মঞ্জিলে তাঁরা এরূপ ৪/৫টি নাটকের অভিনয় হতে দেখেছেন। ঐ সময় ইহুদিকা লাড়কী, ইন্দ্রসভা, সোহরাব রুস্তম, বিমার বুলবুল, লায়লা-মজনু, শিঁরি ফরহাদ প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করা হতো। খাজা মওদুদের ডাইরী থেকে জানা যায়, ১৯১৭ সালের ৮ আগস্ট রাতে নওয়াববাড়ীর খাজা আতিকুল্লাহ, খাজা আজাদ, খাজা খলিল, খাজা মওদুদ প্রমুখরা একত্রে ডাক্তারখানা (বর্তমানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) মঞ্চে নাটক দেখতে গিয়েছিলেন।

৮(২)(গ) বায়োস্কোপ দেখানোঃ

ইংল্যান্ডের জনৈক স্টীফেন সাহেব ১৮৯৬ সালে কলকাতায় প্রথম বায়োস্কোপ দেখান। তিনি স্টার থিয়েটার মঞ্চে তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে তা প্রদর্শন করেছিলেন।[৯৪] এর দুবছর পরে ১৮৯৮ খ্রীঃ ব্রেডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানী কর্তৃক ঢাকায় ক্রাউন থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছিল।[৯৫] ঐ সময় ইংলন্ডেশ্বরীর হীরক জয়ন্তির মিছিল, গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য, রুশ জারের অভিষেক, ফ্রান্সের অশ্বারোহী ও রেলগাড়ী যাতায়াত প্রভৃতি দৃশ্য দেখানো হয়। ক্রাউন থিয়েটারের ঐতিহ্যমত ঐ সময় চার আনা থেকে দুই টাকা পর্যন্ত টিকিটের দাম নেয়া হয়েছিলো।[৯৬]

নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানীর লোকদেরকে তাঁর নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে বায়োস্কোপ দেখার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।[৯৭] ঐ সময় নওয়াব পরিবারের সদস্যগণ ছাড়াও তাঁদের আত্মীয় স্বজন এবং শহরের বেশকিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি নওয়াবের ব্যয়ে বায়োস্কোপ দেখে আনন্দিত হন। নওয়াব খাজা ইউসুফজানের নওয়াব উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ম্যাজিক ও বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছিল। নওয়াবজাদি আমিনা বানু ১৯১১ সালের ২২মার্চ নওয়াব ইউসুফের সম্মানে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানীকে দিয়ে আহসান মঞ্জিলে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এর দুদিন পর খাজা আঃ আলীম তাঁর নিজ বাড়ীতে (গোলপুকুরের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত) উক্ত কোম্পানীকে দিয়ে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এতে নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের ছোট বড় সবাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।[৯৮] ১৯১১ সালের ২৮ মার্চ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ফ্রেঞ্চ-এর বিদায় উপলক্ষে নওয়াব হাবিবুল্লাহ নর্থব্রুক হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে বংগের গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে ম্যাজিক ও বায়োস্কোপ প্রদর্শন করা হয়।[৯৯]

৮(২)(ঘ) ফটোগ্রাফী চর্চাঃ

উপমহাদেশের প্রথম ফটোগ্রাফার হচ্ছেন ফ্রান্সের এফ. এম. মন্টিরো। তিনি ১৮৪৪ খ্রীঃ প্রথম কলকাতায় ছবি তোলেন। ১৮৫৬ সালে কলকাতায় বেংগল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী, স্থানীয় জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উনিশ শতকেই ফটোগ্রাফী চর্চা শুরু হয়েছিল। মানিকগঞ্জের হীরালাল সেন একাজে সুনাম অর্জন করেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতায় গিয়ে একটি ফটোগ্রাফী স্টুডিও খোলেন।[১০০]

সংস্কৃতিমনা নওয়াব আহসানুল্লাহ ফটোগ্রাফী চর্চাও করতেন। তৎকালীন বাজারে প্রাপ্ত সেরা জাতের ক্যামেরা কিনে তিনি নিজ হাতে ছবি তুলতেন। আলোকচিত্র তোলা তাঁর নেশা ছিল। যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা দৃশ্যকে তিনি তাঁর ক্যামেরায় বন্দী করে রাখতেন। এমনকি প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার ছবিও তিনি তুলতেন। তাঁর ডাইরী পাঠে জানা যায়, ১৮৯৪ সালের ৬ এপ্রিল সকাল বেলা ঢাকা অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐদিন আহসান মঞ্জিলের ছাদের উপর ক্যামেরা বসিয়ে সূর্যগ্রহণের ৮টি ছবি তুলেছিলেন।[১০১] এছাড়া ঐদিন সূর্যগ্রহণের ছবি তোলার জন্য জনৈক ইংরেজ জ্যোতিষি ২৫ মার্চ ১৮৯৪ খ্রীঃ ঢাকায় এসে নওয়াব আহসানুল্লার সাহায্য কামনা করেন। নওয়াব সাহেব তাঁর যাবতীয় খরচাপাতি দিয়েছিলেন।[১০২] ১৮৮৮ সালের ৭ জুনের টর্নেডোয় নওয়াব বাড়ীসহ ঢাকা শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত টর্নেডোর ধ্বংসলীলার দৃশ্যগুলো ক্যামেরা বন্দী করে রাখেন। এছাড়া তিনি তাঁর বাগানবাড়ী সমূহ এবং তৎকালীন ঢাকার উল্লেখযোগ্য ইমারতাদির চিত্রও ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে এরূপ দুস্প্রাপ্য ছবি সম্বলিত কয়েকটি এ্যালবাম রয়েছে।

বিভিন্ন সময় উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীগণ ঢাকা পরিদর্শনে এলে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁদের সম্বর্ধনা দেয়ার সাথে সাথে আলোকচিত্র তোলার ব্যবস্থা করতেন। অনেক সময় তিনি নিজ হাতেই এসব ছবি তোলার কাজ করতেন। ১৮৯৬ সালের ২৫ জানুয়ারী মৌলভী দেলবর হোসেনকে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে সম্বর্ধনা প্রদানকালে নওয়াব সাহেব নিজহাতে সংশ্লিষ্টদের ছবি তুলেছিলেন।[১০৩] নওয়াব আহসানুল্লাহ কলকাতার পূর্বোক্ত বেংগল ফটোগ্রাফী সোসাইটির পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৮৯ সালে উক্ত সোসাইটির সদস্যের তালিকায় তাঁর নাম ছিল এক নম্বরে।[১০৩(ক)] নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে ঢাকার নওয়াবদের ফটোগ্রাফী চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া অব্যাহত ছিল। তাঁর সহায়তা নিয়ে মিঃ ফ্রিৎজকাপ নামক জনৈক জার্মান ফটোগ্রাফার ঢাকার ওয়াইজঘাটে একটি স্টুডিও তৈরী করেন।[১০৪] ফ্রিৎজকাপ খুবই নিপুন ফটোগ্রাফার ছিলেন। তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহর নির্ধারিত ফটোগ্রাফার ছিলেন। নওয়াবদের যে [illegible] উল্লেখযোগ্য কার্যোপলক্ষে ফ্রিৎজকাপ ছবি তুলতে আসতেন। ফ্রিৎজকাপ ১৯০৪ সালে আহসান মঞ্জিল প্রসাদ ভবন এবং এর আভ্যন্তরীণ কক্ষগুলোর ছবি তুলেছিলেন। তাঁর তোলা ঐ আলোকচিত্রগুলো সমসাময়িক কালের এই প্রাসাদের জন্য প্রামান্য ও সচিত্র দলিল হিসেবে স্বীকৃত ।[১০৫] আহসান মঞ্জিল জাদুঘর বাস্তবায়ন করার সময় ফ্রিৎজকাপের উক্ত ছবিগুলো অনুকরণ করে এর নয়টি গ্যালারী মূলানুরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভা সমিতিগুলোর ছবি তোলার জন্য মিঃ ফ্রিৎজকাপ আদিষ্ট ছিলেন। নওয়াব এস্টেট থেকে এজন্য তাঁকে যথাযথ মূল্য পরিশোধ করা হতো। ফ্রিৎজকাপের ছবির মূল্য সম্বলিত এরূপ বিলের কয়েকটি কপি এখনো

Dhaka University Institutional Repository

আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১০৬] নওয়াব সলিমুল্লাহও কলকাতা কেন্দ্রিক ইন্ডিয়ান ফটোগ্রাফী সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

১৯০৮ সালের ১ আগস্ট ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা সর্দারগন পূর্ব বাংলার ছোটলাট সাহেবকে নওয়াবের শাহবাগ বাগান বাড়ীতে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও মহল্লা সর্দারদের সাথে ছোটলাটের ছবি তোলা হয়।[১০৭] ১৯১৪ সালের ২০ জুলাই খান বাহাদুর খাজা মোঃ আজমের আমন্ত্রণে লর্ড ও লেডী কারমাইকেল তাঁর দিলখুশার বাড়ীতে শুভাগমন করেন। ঐ দিন আপ্যায়ন শেষে তাঁদের আলোকচিত্রও তোলা হয়।[১০৮] নওয়াব পরিবারের খাজা সুলেমান কাদর একজন ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন। তিনি নিজের ক্যামেরায় ছবি তুলে নিজস্ব ডার্করুমেই তা প্রিন্ট করতেন বলে জানা যায়।[১০৯]

৮(২)(ঙ) সিনেমা চর্চায় অবদান ঃ

নওয়াব হাবিবুল্লাহর আমলে খাজা পরিবারের কিছু উৎসাহী তরুণ মুভিক্যামেরা চালানোর কাজ শিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে খাজা আজাদ, খাজা আজমল, খাজা জহির প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে আহসান মঞ্জিলে নাট্যানুষ্ঠান করার সময় তাঁরা এর কিছু কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করতেন। এভাবে নাট্যাভিনয় ও ছবিতোলার শখটি তাঁদেরকে শেষ পর্যন্ত চলচিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নওয়াব পরিবারের এসব সংস্কৃতিমনা যুবকেরা ১৯২০-এর দশকের শেষ দিকে চলচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এজন্য তাঁরা গঠন করেন বাংলাদেশের প্রথম চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ' ঢাকা ইস্টবেংগল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি'। এই প্রতিষ্ঠানের সফল ও পুর্নাঙ্গ নির্বাক চিত্র ছিল ' দি লাস্ট কিস' নামক বিখ্যাত চলচিত্র।

দি লাস্ট কিস বা শেষ চুম্বন তৈরীর আগে, তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করেছিলেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি ছবি 'সুকুমারী'। ছবিটির পরিচালক হয়েছিলেন জগন্নাথ কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক অম্বুজ গুপ্ত। চিত্রগ্রাহক ছিলেন খাজা আজাদ। নায়ক ছিলেন খাজা নসরুল্লাহ এবং খাজা আদেল। নায়িকার চরিত্রে মেয়ে সেজে অভিনয় করেন সৈয়দ আব্দুস সোবহান। দিনের আলোতে দিলখুশা বাগানবাড়ীতে এই ছবির সুটিং হয়েছিল। ছবিটি কোন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়নি। নওয়াব পরিবারের লোকজন ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই ছবিটা দেখানো হয়েছিল।[১১০]

স্বল্পদৈঘ্য 'সুকুমারী' ছবির সাফল্য এর নির্মাতাদের পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি 'শেষ চুম্বন' তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই ছবিরও পরিচালক ছিলেন অম্বুজ গুপ্ত। ছবিতে প্রথমদিকে নায়ক ছিলেন খাজা নসরুল্লাহ। পরেরদিকে তাঁর স্থলে কাজী জালালুদ্দিন ও খাজা আজমল নায়কের অভিনয় করেন। ছবিটির চিত্রগ্রাহক ছিলেন খাজা আজাদ এবং খাজা আজমল।[১১১] তাঁদেরকে ক্যামেরায় সহযোগিতা করেন খাজা জহির। ছবির নায়িকা ছিলেন লোলিটা। অন্যান্য অভিনেত্রীদের মধ্যে চারুবালা, দেববালা ও হরিমতির নাম জানা যায়। অভিনেত্রীরা সবাই ছিল বাইজী। ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছিল ১৯২৯ সালে। ঢাকার নওয়াবদের দিলখুশা, শাহবাগ, পরিবাগ, বায়তুল আমান (খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ী) আজিমপুর বাগান প্রভৃতি স্থানে ছবির সুটিং হয়েছিল। নির্বাক এই ছবিটির বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু সাব টাইটেল করা হয়। ১২ রিলের ছবিটি তৈরী করতে প্রায় ১২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১৯৩১ সালের শেষ দিকে ছবিটি মুক্তি পায়। ছবিটি অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে একমাসব্যাপী বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছিল।

'দি লাস্ট কিস' ছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছিল দু'টি পরিবারের সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এক পক্ষে ছিলেন খাজা আদেল ও তাঁর স্ত্রী এবং শিশুপুত্র (খাজা শাহেদ)। অপরপক্ষে ছিলেন খাজা আজমল ও তাঁর স্ত্রী এবং শিশুকন্যা (টুনটুন)।[১১২] দুই পরিবারের শিশুদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নির্মল সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু নানা ঘটনার আবর্তে এই দুই

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের মধ্যে আসে বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের মুহূর্তে দুই শিশু শিল্পী পরস্পর পরস্পরকে শেষবারের মত চুম্বন করে। এজন্যই ছবিটির নাম রাখা হয় শেষ চুম্বন বা দি লাস্ট কিস।[১১৩]

দি লাস্ট কিস ছবি নির্মাণের পর খাজা পরিবারের আর কেউ কোন ছবি নির্মাণ করেননি। এমনকি খাজা নসরুল্লাহ ছাড়া অন্যরা সবাই অভিনয় করাও ছেড়ে দেন। খাজা নসরুল্লাহ পরবর্তীকালে কলকাতায় দেবী চৌধুরানী ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়।[১১৪] এতদব্যতীত নওয়াব পরিবারের এক কন্যা মেহেরজাবীনের স্বামী জনাব সিবতাইন ফজল ১৯৪০- এর দশকে ভারতীয় চলচিত্র জগতে একজন নামকরা পরিচালক ছিলেন বলে জানা যায়।[১১৫]

সমকালীন মানুষের মনোবৃত্তি এবং তাঁদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সবার সামনে তুলে ধরার কাজে চলচিত্র একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আজকাল আমরা অহরহ নানা বিষয় ও ঘটনাবলী নিয়ে চলচিত্র তৈরী ও প্রদর্শিত হতে দেখি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় পৌণে এক'শ বছর আগে সেই পিছিয়ে পড়া বাঙালী মুসলিম সমাজে ছায়াছবি তৈরী করাটা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঢাকা নওয়াব পরিবারের উদার মানসিকতা সম্পন্ন কতিপয় যুবকেরা সেদিন যে সাহসী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল সেজন্য আজ তাঁরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণযোগ্য।

৮(২)(চ) নওয়াবজাদি মেহেরবানুর চিত্রকর্ম ঃ

নওয়াবজাদি মেহেরবানু একজন অসাধারণ প্রতিভাময়ী চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি ছিলেন নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর কন্যা। মেহেরবানু ১৮৮৫ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ খ্রীঃ মারা যান। কবি নজরুলের খেয়া পারের তরণী নামক অমর কবিতাটি রচনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল মেহেরবানুর আঁকা একটি ছবি। মেহেরবানু যখন অঙ্কণ শিল্পের চর্চা করতেন তখন বাঙালী মুসলমান সমাজে নারী তো দূরের কথা পুরুষেরাও এদিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। তাঁর আগে ঢাকায় আর কোন মুসলমান মহিলা চিত্রশিল্পীর নাম জানা যায় না। নওয়াবজাদি মেহেরবানু ব্যক্তিগত উদ্যম, নিরলস শ্রম ও মেধার গুনে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। নওয়াব পরিবারের বিভিন্ন লোকের মুখে মেহেরবানুর চিত্র শিল্পচর্চার কথা প্রবাদ বাক্যের মত শোনা যায়। কলকাতার 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৯২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় মেহেরবানুর মাত্র দুটো রঙিন ছবি ছাপা হয়েছিল। এ প্রসংগে জানা যায় যে, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক আফজালুল হক পত্রিকার জন্য বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজনে ঢাকায় এসে নওয়াব পরিবারের লোকদের সাথে পরিচিত হন। তিনি নওয়াবজাদি মেহেরবানুর চিত্রাঙ্কন প্রতিভার খোঁজ পেয়ে তাঁর আঁকা দু'টো ছবি নিজ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নিয়ে যান। ছবি দুটো প্রথম বর্ষ মোসলেম ভারত পত্রিকায় চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১১৭]

প্রথম ছবিটি ছিল তিন রঙে অঙ্কিত। এতে নদীতে খেয়াপারের একটি অপূর্ব দৃশ্য বর্তমান। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ভরা নদী গর্জন সহকারে প্রবাহিত হচ্ছে। দু'টো তরণী সেই তরংগ-সঙ্কুল নদী পাড়ি দিতে চলমান। চিত্রে কাল রঙের তরীটি নিমজ্জমান অবস্থায় দেখানো হয়েছে। কিন্তু লাল রঙের অন্য তরীটি শত ঝঞ্জা উপেক্ষা করে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে। প্রথম তরীটি পাপের আর দ্বিতীয়টি পূণ্যের। পূণ্যের তরীটির চারটি দাড়ের মাথায় ইসলামের চার খলিফা এবং হালের মাথায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর নাম লেখা আছে। এছাড়া তরীটির পালের গায়ে লেখা আছে 'শাফয়াত'। মেহেরবানুর দ্বিতীয় চিত্রটি ছিল একটি নৈসর্গিক দৃশ্য সম্বলিত চিত্র। সেটাতে নদীমাতৃক গ্রাম বাঙলার এক নয়নাভিরাম দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

কবি নজরুলের সংগী মোজাফফর আহমদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আফজালুল হক পত্রিকায় ছাপানোর আগে ছবিটার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখে দেয়ার জন্য সেটা কবি নজরুলের নিকট দেন। কবি ছবিটির সাধারণ পরিচিতি লেখার

Dhaka University Institutional Repository

বদলে সেটা ভালভাবে নিরীক্ষা করে এর ভাবাবলম্বনে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত খেয়া পারের তরণী কবিতাটি। কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ নজরুলের হলেও চিন্তা ও দর্শন মেহেরবানুর চিত্র থেকে উৎসারিত। চিত্রটির সাথে নজরুলের উক্ত কবিতাটিও সেদিন উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১১৮]

ঢাকা নওয়াব পরিবারে অনেক কবি-সাহিত্যিক ও সংগীত শিল্পীর নাম পাওয়া গেলেও চিত্রশিল্পীর কথা তেমন একটা জানা যায় না। নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ চিত্রশিল্পের কদর করতেন। আহসান মঞ্জিলকে তাঁরা নানা ধরনের চিত্রাদি দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৮৮০ খ্রীঃ কলকাতা থেকে মিঃ উইলস নামে একজন শিল্পীকে আহসান মঞ্জিলের সামিয়ানা চিত্রায়নের জন্য এনেছিলেন।[১১৮(ক)] আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ (জাদুঘর) লাইব্রেরীতে নওয়াবদের সংগৃহীত চিত্রকলা বিষয়ক অনেকগুলো সচিত্র বই ও এ্যালবাম রয়েছে। ঐগুলোর মধ্যে জলরঙে আঁকা ইংরেজ সাহেবদের শিকার দৃশ্য সম্বলিত ক্ষুদ্র চিত্রগুলো খুবই সুন্দর। ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যে আঁকা চিত্রগুলোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের ভারতীয় প্রকৃতি ও পরিবেশ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নওয়াব সলিমুল্লাহর নিকটাত্মীয় ও প্রাইভেট সেক্রেটারী মীর্জা ফকির মোহাম্মদ অবসরে ছবি আঁকতেন বলে জানা যায়। তাঁর আঁকা গাছ পালা ও ফুল পাতার ছবির কয়েকটি নমুনা এখনো তাঁর বংশধরদের কাছে রয়েছে।[১১৮(খ)]

মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত চিত্রদুটো ছাড়া মেহেরবানুর আর কোন চিত্রকর্মের হদিস পাওয়া যায় না। হয়তো অযত্ন অবহেলায় সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। মেহেরবানু তাঁর সংস্কৃতিমনা পিতা নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর সংগীত ও সাহিত্য প্রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে চিত্র শিল্প চর্চা করতেন। বয়প্রাপ্ত হলে নওয়াব সাহেব তাঁকে নিজ পরিবারেরই খাজা মোহাম্মদ আজমের সাথে বিবাহ দেন এবং জামাই মেয়েকে দিলখুশা বাগানবাড়ীতে বসবাস করতে দেন। সংস্কৃতিমনা খাজা মোহাঃ আজমও ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও সুসাহিত্যিক খাজা আতিকুল্লাহ শায়দার পুত্র। তাই সংস্কৃতিমনা পরিবার ও স্বামীর অনুপ্রেরণাও যে মেহের বানুর চিত্রাঙ্কণে উৎসাহ যুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। নওয়াবজাদি মেহের বানু স্বামী পুত্র কন্যা পরিবৃত অবস্থায় বৃহৎ সংসার নিয়েও যে চারুশিল্পের সেবায় মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন, এটা তাঁর মত সম্ভ্রান্ত মুসলিম রমনীর জন্য কম শ্লাঘার বিষয় নয়। দিলখুশা বাগানবাড়ীতে ছবি আঁকা অবস্থায় তোলা নওয়াবজাদির একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র (<u>পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৩২ দ্রঃ</u>) খাজা লতিফুল্লাহর সৌজন্যে পাওয়া গেছে। এছাড়া স্বামী সন্তানদের নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে বসা অবস্থায় মেহেরবানুর আরেকটি আলোকচিত্র <u>পরিশিষ্টে চিত্র নং ৩৩-এ দেয়া হলো</u>। নওয়াবজাদি মেহেরবানু নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯২৫ সালের ৩ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টায় ইন্তেকাল করেন।[১১৯] দিলখুশায় শাহজালাল দাখিনী সাহেবের মসজিদের আঙিনায় তাঁকে দাফন করা হয়।[১২০] তাঁর কবরের পশ্চিম পার্শ্বেই তাঁর স্বামী খান বাহাদুর খাজা মোহাঃ আজমের সমাধিও রয়েছে।

৮(৩) <u>নওয়াব পরিবারের উৎসব পালন, ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি এবং মেলার আয়োজন</u>

৮(৩)(ক) <u>ঈদ উৎসব</u> ঃ বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের সার্বজনীন রূপ প্রদানে ঢাকার নওয়াবদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেকালে এদেশের সাধারণ মুসলমানদের অনেকেরই ঈদের নামাজ ও উৎসব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ছিল না। এছাড়া আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাঁরা উৎসবাদির তেমন আয়োজনও করতে পারতোনা। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে তারা স্থানীয় বিত্তবান লোকেদের অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকতো। ঐসব বিত্তবানেরা অমুসলিম হলেও তাঁদের আয়োজিত উৎসবে এসব মুসলমানেরা যোগদিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে তারা অনেক অনৈসলামিক কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কাশ্মীর থেকে আগত ধর্মগুরুর বংশধর হিসেবে ঢাকার খাজারা অনেকটা বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা করতেন। তাই তাঁদের আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এতদাঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের জন্য অনুকরণযোগ্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এক ব্যাপক এলাকা জুড়ে জনৈক আম্বের আলীর নেতৃত্বে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইংরেজ প্রশাসন তাদের সুপথে আনতে ব্যর্থ হয়ে ১৯১৩ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়। নওয়াব বাহাদুর তখন খ্যাতনামা আলেম এবং স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিদের সহায়তায় পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলা করেন। বিপথগামী মুসলমানেরা পুনরায় স্বীয় ধর্মাচরণ শুরু করে।

মোগল আমলে উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারীগণ ঢাকায় ব্যাপকভাবে ঈদ-উৎসব পালন করতেন। মীর্জা নাথনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে বড় বড় কামান দাগানো হতো। পদস্থ লোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচুর খানা পিনা হতো। তাঁদের ছেলে- মেয়ে ও নারী- পুরুষেরা সুন্দর সুন্দর নতুন পোশাক পরতো।[১২১] রাজ পুরুষেরা কেল্লা থেকে পাত্র মিত্র লোকলস্কর সমভিব্যহারে শোভাযাত্রা করে কয়েক মাইল দূরে ধানমন্ডির ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়তেন। বিত্তবান ও পদস্থ লোকেরা ঈদগাহে যাতায়াতের পথে টাকা পয়সা ও উপহার দ্রব্য ছড়িয়ে দিতেন।[১২২] দরিদ্র ও সাধারণ মুসলমানেরা ঈদের ঐসব শোভাযাত্রা দেখে বিত্তবানদের ছুঁড়ে দেয়া টাকা পয়সা কুড়িয়ে কিংবা গণভোজে শরীক হয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতো।

ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পর নায়েবে নাজিমরা এখানে ঈদ ও মহররম উৎসবে নেতৃত্ব দিতেন। ঢাকার নায়েবে নাজিমরা শিয়া মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁরা ঈদের চেয়ে মহররম পর্বকেই বেশী গুরুত্ব দিতেন। তবু তাঁদের আমল পর্যন্ত ঢাকায় ঈদ ও মহররম উৎসব যে ঘটা করেই পালিত হতো তা বুঝা যায় আলম মুসাব্বিরের আঁকা চিত্রাবলী থেকে। নওয়াব নুসরাত জংগের আমলে ঈদ ও মহররম উৎসবের উপর আঁকা চিত্রগুলো এখন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে।[১২৩]

১৮৪৩ খ্রীঃ ঢাকার নায়েবে নাজিম বংশের বিলুপ্তি ঘটলে ঢাকার মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব পড়ে ঢাকার খাজা পরিবারের উপর। ঢাকার খাজারা প্রশাসনের কেউ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ইরেজ সরকারের উপাধিপ্রাপ্ত নওয়াব। তাই রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবের জাঁকজমক হারাতে থাকে। হিন্দুদের পূজা পার্বণ ও জন্মাষ্টমী মিছিল এই সময় ঈদ মহররম উৎসবের চেয়ে বেশী বর্ণাঢ্যরূপ পায়। মুসলমানদের এই ক্ষয়িষ্ণু কালে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের নেতারূপে ঢাকার নওয়াবরাই ছিলেন ঈদ মহররম উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তা।

ঢাকার নওয়াবদের আমলে শহরের লোকসংখ্যা এতই কমে গিয়েছিল যে, ধানমন্ডির ঈদগাহ শহর থেকে বেশ দূরে পড়ে যায়। সংস্কারাভাবে জরাজীর্ণ ও জংগলাকীর্ণ হয়ে পড়ায় এর প্রতি লোকের আকর্ষণও কমে যায়।[১২৪] তাই এ সময় ঢাকার বড় বড় মসজিদগুলোতে ঈদের জামাত হতো। তবে এ সময় ঢাকায় ঈদের প্রধান প্রধান জামাতের একটি হতো লালবাগ শাহী মসজিদে এবং আরেকটি হতো নওয়াব বাড়ীর জামে মসজিদ ও এর প্রশস্ত প্রাংগণ জুড়ে। ঈদ উপলক্ষে নওয়াববাড়ী রঙবেরঙের নিশান ও পত্র পল্লবে সজ্জিত করা হতো।[১২৫]

নওয়াব বাড়ীর লোকেরা সাধারণত শেরওয়ানী, আচকান, চুড়িদার পায়জামা, রুমীটুপি কিংবা নওয়াব পরিবারের মেয়েদের তৈরী নকশাকৃত গোলটুপি পরে ঈদের জামাতে যেতেন। শহরের সংলগ্ন মহল্লাগুলো ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে অনেকে ঈদের এই জামাতে শরীক হতে আসতেন। এখানে আসা মুসল্লীরা পোষাক আশাকে নওয়াব বাড়ীর লোকদের অনুকরণের চেষ্টা করতেন। সেকালে বহুলোক ধূতি পরেও ঈদের নামাজ পড়তে যেতেন।[১২৬] তবে এমন কেউ সাধারণত নওয়াব বাড়ীর জামাতে আসতেন না।[১২৭]

ঢাকার নওয়াবদের আমলে এখানে এক প্রকার নক্শাযুক্ত গোল ও কিশ্তী টুপির প্রচলন হয়। নওয়াব পরিবারের মহিলারা নক্শাযুক্ত (ক্লাবতুনের) এ টুপি তৈরীর কাজ করতেন। নওয়াব বাড়ীর লোকদের দেখাদেখি এই টুপি শহরে এক সময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১২৮] এখনো নওয়াব পরিবারের ২/১ জন এই টুপি তৈরী করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আব্দুল গণি রুমী টুপির সাথে মূল্যবান মনিমুক্তা লাগিয়ে ব্যবহার করতেন। পরে এতে তিনি সোনা রূপা ও মুক্তার লেস লাগান। (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৩৪ দ্রঃ) এ টুপির অনুকরণে ঢাকায় কম উচ্চতাসম্পন্ন রুমী টুপির প্রচলন হয়। ক্রমে এ ধরনের টুপিতে কারুকাজ যুক্ত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। টুপির এই ডিজাইনটি বাংলাদেশে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। এটি ঢাকার টুপি নামে পরিচিত হয়।[১২৯]

আগেই বলা হয়েছে নওয়াব বাড়ীতে প্রতিদিন দুপুর একটার সময় একবার কামান দাগানোর রেওয়াজ ছিল।[১৩০] রমজানের চাঁদ দেখা গেলে সেখান থেকে বার বার কামান দেগে শহরবাসীকে তা জানানো হতো। এছাড়া প্রতিদিন এফতারের সময়েও আরেকটি কামান দাগানো হতো।[১৩১] ঢাকার নওয়াবদের অর্থে শহরের প্রায় প্রতিটি মসজিদেই তারাবীর নামাজ পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগ করা হতো।[১৩২] তৎকালে কোরানে হাফেজের অভাবে বেশীর ভাগ মসজিদেই সুরা তারাবীহ পড়া হতো।[১৩৩] ঢাকার নওয়াবগণ উল্লেখযোগ্য মসজিদগুলোতে খতম তারাবীর জন্য হাফেজ নিয়োগ করতেন। তৈফুর সাহেবের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে খতম তারাবীহ পড়ার জন্য কয়েকজনকে নিয়ে প্রতিদিন নওয়াবদের দিলখুশা মসজিদে যেতেন।[১৩৪]

খাজা পরিবারের প্রবীন সদস্যদের নিকট থেকে জানা যায়, রোজাদারদের ঘুম ভাঙাতে ঢাকার নওয়াব পরিবারেই প্রথম সেহেরী গানের প্রচলন হয়েছিল। পরে সেটা ক্রমান্বয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ২০ রোজার পর থেকে আলবেদা অর্থাৎ রমজনের বিদায় জানিয়ে কোরাস গান গাওয়া হতো। রমজানের শেষ দিকে আলবেদা ও সেহেরী গানের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো।[১৩৫] সেহেরীতে খাজা পরিবারের লোকেরা ভাত কিংবা রুটি যার যা ইচ্ছা খেতেন। তবে সেহেরীতে কখনো তাঁরা সাবুদানার শিরবিরঞ্জ (দুধের পায়েস) খেতে ভুলতেন না। আর খেতেন প্রচুর চা। ঢাকায় তখনো চা এত জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু কাশ্মীরি খাজারা ছিলেন অনেক আগে থেকেই চা পানে অভ্যস্ত। তাঁরা বলতেন, চা খেলে রোজার দিনে পিপাসা কম লাগে।[১৩৬] ঢাকার নওয়াবরা শহরের প্রায় প্রতিটি মসজিদেই রোজাদার মুসল্লীদের জন্য এফতারীর ব্যবস্থা করতে অর্থ দান করতেন। এছাড়া প্রতিদিন আহসান মঞ্জিলে কিংবা দিলখুশার জামে মসজিদে নওয়াব সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে রোজাদারদের ইফতারী ও ভোজে আপ্যায়ন করতেন।[১৩৭]

তৎকালীন ঢাকার প্রধান ইমারত হিসেবে পরিচিত আহসান মঞ্জিলের ছাদই ছিল ঈদের চাঁদ দেখার উপযুক্ত স্থান। এর ছাদে চড়ে নওয়াব বাড়ীর লোকেরা চাঁদ দেখতেন। এছাড়া মহল্লার লোকেরা এজন্য এসে ভিড় করতো নওয়াব বাড়ীর গোলপুকুর পাড়ে।[১৩৮] ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে নওয়াব বাড়ীর ঘোড়াচক্করের মাঝে রাখা কামান থেকে বার বার তোপধ্বনি করে সারা শহরে খুশীর বার্তা পৌঁছে দেয়া হতো। চাঁদ দেখার পরে মুরব্বীদের সালাম ও কদমবুঁচি করার প্রথা নওয়াব পরিবারেও প্রচলিত ছিল।[১৩৯]

ঈদের দিনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরা মুক্ত হস্তে দান খয়রাত করতেন। খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকেই দান কাজের জন্য যে পৃথক তহবিল বরাদ্দ ছিল, তা থেকে ঈদের দিনে দানের জন্য অর্থাদি রাখা থাকতো।[১৪০] নওয়াব পরিবারের অন্যরাও সাধ্যমত অর্থাদি, কাপড়-চোপড় ঈদ উপলক্ষে দান করতেন। ঈদের দিনে নওয়াব পরিবারের পুরুষদের সবাইকে নওয়াব সাহেব আহসান মঞ্জিলে দাওয়াত করতেন। ঈদের নামাজের পর পরই তাঁরা সেখানে গিয়ে নওয়াবের সাথে কুশল বিনিময় ও কোলাকুলি করতেন। আহসান মঞ্জিলের ডাইনিং হলে সেদিন তাঁদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হতো। ঈদের দিনের খাবারের মধ্যে সাধারণত মোরগ পোলাও, শামী কাবাব, বোরহানী ও ফিরনী থাকতো।[১৪১] গরীবদের মধ্যেও ঈদের দিনে প্রচুর খাবার বিতরণ করা হতো। এসব খাবারের মধ্যে থাকতো সেমাই ও বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন। এছাড়া কোরবানীর ঈদে গরীবদের জন্য সেমাইয়ের সাথে মাংসই থাকতো প্রধান।

ঈদের দিন বিকেল বেলা ঢাকার সব পঞ্চায়েত সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করে আহসান মঞ্জিলে ঈদ-পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান করা হতো। সেদিন আমন্ত্রিত সব অতিথির সাথে নওয়াব সাহেব ও পরিবারের অন্যান্যরা কুশলাদি

Dhaka University Institutional Repository

বিনিময় করতেন। আজকাল সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান যেমন ঈদের দিনে বংগভবনে ঈদ মিলন অনুষ্ঠান করেন, সেটা ছিল অনেকটা এমন ধরনের অনুষ্ঠান। সেদিন নওয়াব বাড়ীর ভূরিভোজ থেকে কেউ বাদ পড়তেন না।[১৪২]

হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দৌরাত্ম্যে সেকালে মুসলমানেরা আজকের মত নির্বিঘ্নে গরু কোরবানী করতে পারতো না। লোকেরা বাধ্য হয়ে ছাগল (বকরী) কোরবানী দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় ক্রমে কোরবানীর ঈদের নাম বকরী ঈদ হয়ে যায় বলে অনেকে অনুমান করেন।[১৪৩] হিন্দুদের ন্যায় অনেক মুসলমান আবার পৌষ সংক্রান্তিতে দেবতাজ্ঞানে গরু পূজাও করতো।[১৪৪] ঢাকার নওয়াবরা বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁরা ঐসব অনৈসলামিক প্রথা পালনে মুসলমানদের বিরত থাকতে বলতেন। এছাড়া তাঁরা গরু কোরবানী করা তাঁদের ধর্মীয় অধিকার বলে মনে করতেন। ঢাকার খাজা পরিবারে প্রথম থেকেই নির্দ্বিধায় গরু কোরবানী করা হতো। হিন্দুদের চাপের মুখে গরু কোরবানী করতে না পারাকে তাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের অপমান বলে মনে করতেন। এজন্য তাঁরা তাঁদের জমিদারি এলাকায় যাতে নির্বিঘ্নে গরু কোরবানী হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতেন। গরু কোরবানীর বিপক্ষে সুসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন প্রবন্ধ লেখায় টাংগাইলের মৌলবী নঈমুদ্দিন তাঁকে কাফের ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষিতে মীর সাহেব টাংগাইলের আদালতে মৌলবী নঈমুদ্দিনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন।[১৪৫] ঢাকার নওয়াব মৌলবী নইমুদ্দিনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ সারা পূর্ব বাংলায় যাতে মুসলমানেরা নির্বিঘ্নে গরু কোরবানী করতে পারে সে প্রচেষ্টা চালাতেন। তাঁর সময় একবার জয়দেবপুরের মুসলমানেরা এসে অভিযোগ করেন যে, হিন্দুদের ভয়ে তাঁরা গরু কোরবানী দিতে পারছেন না। তখন নওয়াব সাহেব লোকজন পাঠিয়ে তাঁদের কোরবানী দিতে সহায়তা করেন।[১৪৬]

ভারতের টিটাগড়, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে কোরবানীর ঈদ উপলক্ষে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে।[১৪৭] এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নওয়াব সলিমুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারী ঢাকার নওয়াব বাড়ীতে মুসলমানদের বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সালে কানপুরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটলে নওয়াব সাহেব চিঠি পত্রাদি লিখে ইংরেজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদেরকে উক্ত বিষয়ে পূর্ববাংলার মুসলমানদের উদ্বেগের কথা অবহিত করেন।[১৪৮] আজকে আমরা ঈদুল আজহার সময় যে নির্বিঘ্নে গরু কোরবানী করি, এই অধিকার আদায়ে নওয়াব ও তাঁর সহযোগিদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

ঈদের আনন্দ উপলক্ষে নওয়াব বাড়ীতে নাচ গানের আসরও বসানো হতো। ঈদ উপলক্ষে শহরের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় বিশেষ করে চকবাজারে, আরমানীটোলা ও রমনার মাঠের মেলায় নওয়াব বাড়ীর লোকেরা নানা দ্রব্যাদি কিনতে যেতেন। পরবর্তীকালে ঢাকায় সিনেমা বায়স্কোপের প্রচলন হলে তাঁরা ঈদ উপলক্ষে তা নওয়াব বাড়ীতে এনে সকলে মিলে দেখতেন। ঈদ উপলক্ষে নওয়াববাড়ীতে মাঝে মধ্যে নাটক এবং থিয়েটার প্রদর্শনের আয়োজনও করা হতো। কাজী কাইউমের ডাইরী থেকে জানা যায়, ১৯০৪ সালে কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটার কোরবানীর ঈদের দিনে (২৮ ফেব্রুঃ) নওয়াববাড়ীতে নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।[১৪৯]

৮(৩)(খ) মহররম উৎসব ঃ

মোগল আমল থেকেই হোসেনী দালানকে কেন্দ্র করে ঢাকায় মহররম উৎসব পালিত হতো। নায়েবে নাজিমদের আমলে নিমতলী কুঠি থেকে জাঁকজমকের সাথে মহররম মিছিল বের করা হতো। নায়েবে নাজিমরা শিয়া মতাবলম্বী হওয়ায় ঐ মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, ১৮৪৩ খ্রীঃ ঢাকার নায়েবে নাজিমদের বংশ ও পদ বিলুপ্ত হলে হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ঢাকার নওয়াবদের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু তাঁরা সুন্নী হওয়ায় মহররম মিছিলে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। তবে তাঁরা হোসেনী দালানের রক্ষণাবেক্ষণসহ মহররম উৎসব পালনের যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন।[১৫০]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার নওয়াবদের আমলে হোসেনী দালান থেকে মহররমের মিছিল বের হতো এবং চক বাজার, ইসলামপুর, পুরানো পল্টন ও বখশি বাজার হয়ে আজিমপুরের কারবালায় গিয়ে শেষ হতো।[১৫১] ঢাকার নওয়াবদের ব্যয়ে পরিচালিত মহররম মিছিলের মধ্য দিয়ে ১৮৮৬ সালে একবার ইংরেজ সরকারের পুলিশ অফিসারগণ শকটারোহনে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এতে উদ্ভূত সংঘর্ষে মিছিলকারীরা ইটপাটকেল ও নিশান দন্ড দিয়ে পুলিশদের মারধোর করে রক্তাক্ত করে দেয়। ইংরেজ সাহেবরা এতে ভীষণভাবে রেগে যায়। কিন্তু নওয়াব সাহেব তাঁদেরকে নিবৃত্ত করেন।[১৫২]

নওয়াব সাহেব নিজে মহররম মিছিলের নেতৃত্ব না দিলেও নওয়াব বাড়ীর গণ্যমান্য অনেকেই মিছিলে যোগ দিতেন। ১৯০৮ খ্রীঃ এরূপ এক মিছিলের সাথে খাজা মোহাম্মদ ইসমাইল ছিলেন। সেবার চকবাজারে উক্ত মিছিলকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এই প্রেক্ষিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ ইংরেজ প্রশাসকদের দিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইন্সপেক্টরসহ চারজন পুলিশকে সাসপেন্ড করার ব্যবস্থা করেন।[১৫৩] আশুরার দিনে বিবিকা রওজা থেকে যে মহররম মিছিলটি হোসেনী দালানে যেতো, সেটাও আহসানুল্লাহ রোড ধরে নওয়াব বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতো। তবে ঐ মিছিলে নওয়াববাড়ীর তেমন কেউ যোগ দিতেন না।[১৫৪]

মহররম উপলক্ষে হোসেনী দালানে অনুষ্ঠিত ১০ দিন ব্যাপী মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকার নওয়াবগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতেন। মহররম উৎসবের সময় নওয়াব আব্দুল গণি কবিদের মধ্যে মুশায়রা (কবিতা প্রতিযোগিতা) অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।[১৫৫] পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, ১৯০১ সালে ঢাকা নগরীতে বিজলীবাতি চালু হবার পর নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর গ্যাস প্লান্টটি হোসেনী দালান আলোকায়নের জন্য প্রদান করেন। ২ মার্চ ১৯০২ সালে উক্ত গ্যাস প্লান্টটি চালিয়ে হোসেনী দালানের পুরো এলাকাটি আলোকিত করা হয়। এই গ্যাস বাতির উদ্বোধন উপলক্ষে তথায় সেদিন একটি বড় মেলাও বসেছিল।[১৫৬] আগেই বর্ণিত হয়েছে, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে হোসেনী দালান বিধ্বস্ত হলে নওয়াব আহসানুল্লাহ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সেটা পুনর্নির্মাণ করে দেন। এছাড়াও নওয়াব সলিমুল্লাহ হোসেনী দালানে স্থাপিত ইমাম হোসেনের কবর বলে পরিচিত তাজিয়াটি বহু তোলা সোনা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করে দেন।[১৫৭] আশুরা ও মহররমের মিছিলের লোকসমাগম কালে হোসেনী দালান আলোকায়নের জন্য ১৯০২ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ কলকাতা থেকে ৪০টি উন্নতমানের বাতি ক্রয় করে সেখানে সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন।[১৫৮] উল্লেখ্য, ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মহররম মিছিলে ঢাকার সুন্নী সম্প্রদায়ের যোগদান সামাজিকভাবে সহজতর হয়ে যায় এবং ফলে এটা একরূপ সার্বজনীনতা পেয়েছিল। আশুরা উপলক্ষে নওয়াব বাড়ীর অনেকেই রোজা রাখতেন। এছাড়া মহররমের দিনগুলোতে নওয়াব বাড়ীর ঘরে ঘরে ভাব গম্ভীর পরিবেশে আসর বসিয়ে শাহদাতে কারবালার কাহিনী পড়া হতো বলে জানা যায়।

৮(৩)(গ) মিলাদ মাহফিল ঃ

এতদাঞ্চলে ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসব জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে ঢাকার নওয়াবদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়ালে তাঁরা জাঁকজমকের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতেন। এ উপলক্ষে আহসান মঞ্জিল পত্র পল্লবে এবং আলোক মালায় মনোরমভাবে সজ্জিত করা হতো। এছাড়া নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহল্লা সর্দারদের উদ্যোগে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট দোকান পাট সুন্দরভাবে রঙবেরঙের নিশান প্রভৃতি দ্বারা সাজানো হতো।[১৫৯] বহু সংখ্যক মুসল্লী ও অতিথিদের উপস্থিতিতে আহসান মঞ্জিলের দরবার গৃহে-আগরবাতি, গোলাব জলের সুবাসিত স্বর্গীয় পরিবেশে, ইমাম সাহেব মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করতেন।[১৬০] ঐ মিলাদ মাহফিলে নওয়াব আহসানুল্লাহ ও নওয়াব পরিবারের খ্যাতনামা কবিদের রচিত হামদ-নাত পরিবেশন করা হতো।[১৬১] নওয়াব সলিমুল্লাহ অনেক সময় মাহফিলে

Dhaka University Institutional Repository

স্বকণ্ঠে নাত পরিবেশন করতেন।[১৬২] ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে শহরের সব গণ্যমান্য মুসলমান নিমন্ত্রিত হয়ে নওয়াব বাড়ীতে আসতেন। তাঁদেরকে যথারীতি আপ্যায়ন করা হতো। এছাড়া ঐদিন নওয়াবদের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন মসজিদেও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হতো। মওলানা জৌনপুরীদের ন্যায় ঢাকার নওয়াবরা মিলাদ মাহফিলে কেয়াম করতেন এবং অন্যদেরকেও একাজে উৎসাহিত করতেন। এই অঞ্চলে মিলাদ মাহফিল সমূহে কিয়াম করার প্রথাটি জনপ্রিয় করতে ঢাকার নওয়াবদের ভূমিকাটি তাই উল্লেখ করার মত। মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নওয়াব পরিবারে লোকেরা প্রচুর দান খয়রাত করতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ঢাকার নওয়াবদের ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জের কদমরসুল দরগাহে উৎসব পালন করা হতো। সেখানে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়ালে ওয়াজ নসিহত, মিলাদ মাহফিল ও গণভোজের আয়োজন করা হতো। এ উপলক্ষে কদমরসুল প্রাঙ্গনে একটি বড় ধরনের মেলা বসতো।[১৬৩]

মিলাদুন্নবী উপলক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন বৈষয়িক কাজকর্মের সূচনা ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকার নওয়াবরা আহসান মঞ্জিলে মিলাদ ও দোয়ার মাহফিল আয়োজন করতেন। নওয়াব আহ্‌সানুল্লাহর লেখা ব্যক্তিগত ডাইরী থেকে এরূপ অনেকবার মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের খবর জানা যায়।[১৬৩(ক)] নওয়াব পরিবারের অন্যান্য শরীকদের বাড়ীতেও এরূপ নানা কাজ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। সেসব অনুষ্ঠানেও নওয়াব পরিবারের খ্যাতনামা কবিদের লেখা উর্দু-ফার্সী হামদ ও নাত পরিবেশন করা হতো। প্রতি বছর ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় চকবাজার শাহী মসজিদে ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম ঘটা করে পালিত হতো। ১৯১৬ সালে উক্ত মসজিদের মোতাওয়াল্লী বিশেষ কারণ বশত (নিজেদের মধ্যে কোন্দল) সেটা বন্ধ রাখেন। এমতাবস্থায় নওয়াব হাবিবুল্লাহ ও খাজা আব্দুল করিমের হস্তক্ষেপে অনুষ্ঠানটি যথারীতি পালিত হয়।[১৬৪]

রমজান ও ঈদের পরে ঢাকার নওয়াবরা শবেবরাতই বেশী গুরুত্বের সাথে পালন করতেন। শবে বরাতের আগের দিন অনেকেই রোজা রাখতেন। খাজা পরিবারের প্রতি বাড়ীতে দু'তিন পদের হালুয়া তৈরী করে একে অন্যকে আদান প্রদান করা হতো। সাধারণত আটা, ছোলার ডাল, সুজি কিংবা মৌসুম থাকলে গাজরের হালুয়া তৈরী করা হতো। রুটী তৈরী তেমন একটা হতো না। শবেবরাতের দিন সন্ধ্যা হতেই পরিবারের লোকেরা বেগম বাজারে পারিবারিক গোরস্তানে মুরুব্বীদের কবর জেয়ারত করতে যেতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত অনেকেই সেখানে অবস্থান করে দোয়া দরুদ পড়তেন। এস্টেটের পক্ষ থেকে গোরস্তান রক্ষণাবেক্ষণে লোক নিয়োজিত থাকতো। শবেবরাত উপলক্ষে যতদূর সম্ভব গোরস্তানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং রঙ চঙ করা হতো। ঢাকা শহরে নওয়াব পরিবারের সদস্যরা যে যেখানেই থাকুক ঐদিন বেগম বাজারে যেতে ভুলতেন না। এমনকি অনেক মহিলারাও সেদিন তাঁদের মা-বাপ কিংবা নিকটাত্মীয়ের কবর জেয়ারত করতে সেখানে যেতেন। এছাড়া পুরুষদের অনেকে আবার দলবেঁধে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পীর ওলির মাজার জিয়ারত করতে যেতেন। এগুলোর মধ্যে শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকিন, পীর ইয়ামেনী ও হাজী খাজা শাহবাজের মাজার ছিল অন্যতম। এমনকি কেউ কেউ মীরপুরে শাহ্ আলীর মাজারেও যেতেন। শবেবরাতের রাতে দুটা-তিনটা পর্যন্ত এভাবে তাঁরা কবরস্থান ও মাজার সমূহ জিয়ারত করে ঘরে ফিরতেন। নওয়াব বাড়ীর কেউ কেউ আবার মসজিদে নামাজ ও দোয়া দরুদ পড়ে সারারাত কাটাতেন। শবেবরাতের দিন নওয়াববাড়ী এবং দিলখুশার মসজিদে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। কারো কারো ঘরেও সেদিন মিলাদ মাহফিল করা হতো।

ঢাকার নওয়াবরা হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবাদিতেও যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আব্দুল গণি তাঁর এস্টেটের হিন্দু কর্মচারীদের পূজা পার্বনে অর্থ-সাহায্য দিতেন। এমনকি তাঁদের ধর্মানুষ্ঠান দেখতেও যেতেন।[১৬৫] নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায়, ১৮৭৪ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী তিনি ও তাঁর পিতা আর্মেনিয়ান চার্চে ক্রীসমাস উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন।[১৬৫(ক)]

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালে ঢাকার জন্মাষ্টামী মিছিল ছিল ভারত বিখ্যাত। সাধারণত সরকারী হাতী- ঘোড়া সাজিয়ে এ মিছিল করা হতো। ১৮৯৫ সালে বিশেষ কারণে সরকার হাতী না দেয়ায় মিছিল পরিচালনায় অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এমতাবস্থায় নওয়াব আহসানুল্লাহ এ কাজে তাঁর অনেকগুলো হাতী দিয়ে সহায়তা করেন।[১৬৬] ১৮৯৭ এবং ১৮৯৯ সালেও অনুরূপভাবে নওয়াবের হাতীগুলো জন্মাষ্টমীর মিছিলে ব্যবহৃত হয়।[১৬৭] নওয়াব সলিমুল্লাহও জন্মাষ্টমীর মিছিলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি অনেক সময় হাওদা সজ্জিত বৃহদাকার একটি হাতিতে চড়ে মিছিলের সর্বাগ্রে গমন করতেন। এসময় তিনি মুঠি মুঠি রেজগি মুদ্রা দুদিকে রাস্তার উপর ছড়িয়ে দিতেন। মিছিল দেখতে আগতদের অনেকেই সেগুলো কুড়িয়ে নিত এবং সবাই তাঁর প্রতি ছালাম জানিয়ে সম্মান করতো।[১৬৮] নওয়াব সলিমুল্লাহ হিন্দু সাধু সন্যাসীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি ১৯১৪ সালে বেলুড় মঠের ধর্মগুরু কাবুরাম মহারাজকে তাঁর নিজের প্রসাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে সম্মান দেখান। নওয়াব সাহেব নিজেও একবার কলকাতার বেলুড় মঠে গিয়ে বিখ্যাত ধর্মগুরু শরৎ মহারাজের সাথে আলাপ করেছিলেন। গরু কোরবানীর প্রসঙ্গ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের উপায় নির্ধারণ করাও ছিল তাঁদের এই আলোচনার একটি উদ্দেশ্য।[১৬৯] সেকালে ঢাকায় ঝুলন যাত্রা বা বসন্তোৎসবে হিন্দু মুসলিম সবাই যোগ দিতেন। এ উপলক্ষে হোলিগানের পাল্লা হতো। আগেই বর্ণিত হয়েছে, উক্ত উৎসব উপলক্ষে নওয়াব আব্দুল গণি হোলি গানের দলগুলোকে কয়েকবার আহসান মঞ্জিল এলাকায় এনে হোলি গান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৭০] নওয়াব হাবিবুল্লাহও বহুবার অনুরূপ হোলিগানের আয়োজন করেছিলেন।

৮(৩)(ঘ) প্রদর্শনীর আয়োজন ঃ

শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনীর জন্য ঢাকার নওয়াবগণ চিরদিনই উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ১৮৬৪ সালে ঢাকায় একটি বড় ধরনের প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য নওয়াব আব্দুল গণি ২ হাজার টাকা দান করেন।[১৭১] উক্ত প্রদর্শনীর জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহকে মঞ্চোপরি আসন দিয়ে সম্মানিত করা হয়।[১৭২] কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও গৃহপালিত পশু-পাখীর উন্নয়নকল্পে ঢাকার নওয়াবরা আজ থেকে সোয়া'শ বছর আগেই নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ খাজা আব্দুল গণির 'নওয়াব' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি এই প্রদর্শনী শুরু করেছিলেন। প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী নওয়াবের শাহবাগ বাগান বাড়ীতে এই কৃষিমেলা আয়োজন করা হতো।[১৭৩] এতে এতদাঞ্চলের উন্নত জাতের গৃহপালিত পশুপাখী, উৎকৃষ্ট জাতের কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও কৃষিজ যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হতো।

বেশ কিছু দিন আগে থেকেই বিভিন্ন হাট বাজারে ঢোল শহরত এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সর্ব-শ্রেণীর লোকদের উক্ত মেলায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। উক্ত বিজ্ঞাপনে কখন কোথায় কিভাবে দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, তারও নির্দেশনা থাকতো।[১৭৪] এছাড়া প্রদর্শনীতে আগত বিভিন্ন জাতের পশুপাখী ও ফসলাদির জন্য কি কি পুরস্কার দেয়া হবে, উক্ত বিজ্ঞাপনে তাও জানিয়ে দেয়া হতো।[১৭৫] এরূপ নির্ধারিত পুরস্কারের তালিকা সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপনের কপি পরিশিষ্ট নং ২১ পৃঃ৪৩৯তে দেয়া গেল। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলার লোকেরা তাঁদের গৃহপালিত শ্রেষ্ঠজাতের গরু-মহিষ, ঘোড়া, ছাগল- ভেড়া, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি পশু পাখী, ধান-চাল, ডাল-কলাই, আলু-গুড়, আদা-হলুদ, তৈলবীজ, ঘি-মাখন, পাট-তুলা, ফলমূল, তরি-তরকারী শাক-সবজী প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যাদি এবং লাংগল- জোয়াল, দা-কাঁচি, কোদাল-খন্তী, কুড়াল-শাবল প্রভৃতি কৃষিজ যন্ত্রপাতি নিয়ে মহাউদ্যমে শাহবাগের মেলায় হাজির হতেন। সাধারণত ৩০শে ডিসেম্বর প্রদর্শনী ও মেলা শুরু হয়ে ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'দিন মহাসমারোহে চলতো। নওয়াবের পক্ষ থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বিচারক মন্ডলী মেলা প্রাংগণ ঘুরে, প্রদর্শিত দ্রব্যাদির গুনাগুণ বিচার করে, পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যদের তালিকা প্রস্তুত করতেন। তাঁরা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাও করতেন। ঢাকার নওয়াবদের জমিদারী এলাকায় বসবাসকৃত প্রজাদের জন্য আবার অতিরিক্ত বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।[১৭৬]

এই প্রদর্শনীর ফলে কৃষকেরা উৎসাহ পেতেন এবং পরবর্তী প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার জন্য আরো নতুন উদ্যোমে কাজ করতেন। ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উন্নতি সাধিত হতো। শাহবাগের উক্ত মেলায় কৃষি প্রদর্শনী ছাড়াও শিল্পজাত দ্রব্য, তৈজসপত্র, খেলনা প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় হতো। এছাড়া নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা করা হতো। নওয়াবের ব্যয়ে নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকারা সেখানে নাচগানের আসর জমাতেন। যাত্রা, পুতুল নাচ, কৌতুক প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হতো।[১৭৭] ১৮৯০ খ্রীঃ শাহবাগের উক্ত মেলায় বাইজীর নাচ দেখানোকে কেন্দ্র করে লোকের ভিড়ে একটি কাঠের সেতু ভেঙ্গে পড়ে। ফলে পানিতে ডুবে কয়েকজনের প্রাণহানি হয়। এ দুর্ঘটনার পর থেকে ঐ মেলায় আনন্দ উৎসব কমে যায়। তবু নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবদ্দশা পর্যন্ত এই কৃষিমেলা চালু ছিল।[১৭৮]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নওয়াব সলিমুল্লাহ দেশীয় কুটির ও কারুশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শাহবাগে একটি বস্ত্র ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করেছিলেন।[১৭৯] লর্ড কারমাইকেল-এর সম্মানার্থে ১৯১২ সালে তিনি পুনরায় একই স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কিন্তু জাপান সম্রাটের মৃত্যুতে সেটা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিকল্প স্বরূপ বংশালের দুটি বাড়ীতে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রদর্শনীর আয়োজন করে লর্ডকে তা দেখানো হয়।[১৮০] টাংগাইলে অনুরূপ শিল্প প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ৫শত টাকা প্রদান করেন।[১৮১]

৮(৪) ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় অবদান ঃ

ঢাকার নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে আজব ও দুর্লভ বস্তুসমূহের একটি সংগ্রহশালা ছিল। নিশাত মঞ্জিল নামক জাঁকালো একটি দ্বিতল ভবনে ঐসব বস্তু জাদুঘরের ন্যায় প্রদর্শন করা হতো।[১৮২] এছাড়া ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠায়ও নওয়াব পরিবারের লোকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯১২ খ্রীঃ নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফ জান ও ঢাকার গণ্যমান্য লোকেরা নর্থব্রুক হলে লর্ড কারমাইকেলের সাথে ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবী নিয়ে আলোচনা করেন।[১৮৩] ১৯১২ খ্রীঃ ২৩ জুলাই একটি সভায় ঢাকায় প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে উক্ত জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।[১৮৪] ১৯১৩ সালে ৫ মার্চ উক্ত জাদুঘর সংস্থাপনকল্পে নীতিমালা নির্ধারণের জন্য পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ৩০ জন গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন।[১৮৫] উক্ত কমিটিতে ঢাকা নওয়াব পরিবারের নওয়াবজাদা খাজা মোঃ আফজাল একজন সদস্য ছিলেন।[১৮৬] তৎকালীন সচিবালয় তথা আজকের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি কক্ষে প্রাথমিকভাবে ঢাকা জাদুঘর সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার লর্ড কারমাইকেল ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।[১৮৭]

ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর সরকারী আদেশে গঠিত একটি সাধারণ কমিটি এবং একটি নির্বাহী কমিটি জাদুঘরের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতো। উক্ত সাধারণ কমিটিতে নওয়াব পরিবার থেকে খানবাহাদুর খাজা মোহাঃ আজম ও নওয়াবজাদা খাজা মোঃ আফজাল সদস্য ছিলেন।[১৮৮] এছাড়া নির্বাহী কমিটিতে সদস্য ছিলেন ৭ জন। তন্মধ্যে খাজা মোঃ আজম ছিলেন একজন সদস্য।[১৮৯] প্রদর্শনীর প্রয়োজনে উক্ত সচিবালয় ভবনের আরো দুটো কক্ষ জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে এনে ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকা জাদুঘর প্রথমবারের মত দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়।[১৯০] ঐ সময় ঢাকা জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে নওয়াব পরিবারের খাজা শামসুদ্দিন আহমদ-এর উপহার দেয়া তিনটি প্রাচীন পান্ডুলিপি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলোর নাম হলো (১) খাসফুল মজব (আত্মিকদর্শণ গ্রন্থ) (২) জামির সমগ্র গ্রন্থ (৩) সাদীর গুলিস্তা।[১৯১] পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে শেখ গুলাম নবী কর্তৃক নারায়নগঞ্জের কদম রসুল সংস্কার বিষয়ক যে শিলালিপিটি এখন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে, সেটা নওয়াব সলিমুল্লাহ বহু পরিশ্রম করে জনৈকা বৃদ্ধার নিকট থেকে উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।[১৯২]

১৯১৫ সালে উক্ত সচিবালয় থেকে নিমতলীস্থ নায়েবে নাজিমদের পরিত্যাক্ত কুঠিতে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তর করা হয়। ১৯১৬ সালে ঢাকা জাদুঘর নতুন ভবন প্রাঙ্গনে কৃষি, কারু ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের এক ব্যাপক আয়োজন করা হয়। ২২ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটায় লর্ড কারমাইকেল সেটা উদ্বোধন করেন।[১৯৩] উক্ত প্রদর্শনীতে ঢাকা নওয়াব বাড়ী তথা আহসান মঞ্জিলের ফিলিগ্রী মডেলসহ অনেকগুলো উচ্চমানের ফিলিগ্রী শিল্পকর্ম প্রদর্শন করা হয়েছিল।[১৯৪] ঢাকা জাদুঘরের গ্রন্থগারের বই ক্রয়ের জন্য খানবাহাদুর খাজা মোঃ আজম ১৯১৮ সালে ৫ শত টাকা প্রদান করেছিলেন।[১৯৫] ১৯৩৬ সালে ঢাকা যাদুঘর পরিচালনার জন্য ইতোপূর্বেকার সাধারণ কমিটি ও নির্বাহী কমিটি প্রথা বিলুপ্ত করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে কেবলমাত্র ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। নওয়াবজাদা খাজা মোঃ আফজাল খানবাহাদুর উক্ত কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন।[১৯৬] ১৯৭০ সালে ঢাকা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ঢাকা নওয়াব পরিবারের নিকট থেকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সংগ্রহ করে। এগুলোর মধ্যে একটি হাতির দাঁতের শীতলপাটি, আহসান মঞ্জিলের ২টি ও হোসেনী দালানের ১টি ফিলিগ্রী মডেল এবং একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৯৭]

৮(৫) কারু শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব পরিবার ঃ

এতদাঞ্চলে কুটির ও কারুশিল্প চর্চা এবং উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় এক সময় ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই বেশী পরিমানে উৎপাদিত হতো। কিন্তু ঢাকার নওয়াবদের আমলে মসলিন শিল্পটি ধ্বংসপ্রাপ্তির শেষ অবস্থায় পৌঁছেছিল। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে ১৮৭৫ খ্রীঃ ওয়েলসের যুবরাজ কলকাতায় ভ্রমনে আসেন। নওয়াব আব্দুল গণি এ সময় যুবরাজকে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসলিন বস্ত্র উপহার দিতে মনস্থ করেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করে ঐ অঞ্চলে মসলিন তৈরীর যেসব কারিগর তখনো অবশিষ্ট ছিল, তাদেরকে ঐ কাজে লাগান। এভাবে তিনি তিন খন্ড উন্নত জাতের মসলিন কাপড় তৈরী করে যুবরাজকে উপহার দিতে সক্ষম হন।[১৯৮] ঐ তিন খন্ড কাপড়ের মোট ওজন ছিল মাত্র সোয়া নয় তোলা এবং প্রতিটির পরিমাপ ছিল, দৈর্ঘ্য ২০ গজ এবং প্রস্থ ১ গজ।[১৯৯]

উৎপাদন খরচ অধিক, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, কলের তৈরী কাপড়ের সাথে দামের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা প্রভৃতি কারণে মসলিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে মসলিনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ জামদানীরূপে আজো টিকে রয়েছে। এই জামদানীর উন্নয়ন ও স্থায়ীত্ব প্রদানে ঢাকার নওয়াবদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নওয়াব সলিমুল্লাহ জামদানীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে প্রচুর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেছেন। এ বিষয়ে নওয়াব সাহেবের স্ত্রী জান্নাত আরা বেগমের অবদানটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, তাঁদের আমলের পূর্ব পর্যন্ত শুধুমাত্র সাদা রঙের জামদানী তৈরী হতো।[২০০] নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম রঙিন ও জরির কাজের জামদানী তৈরী হয়। তিনি একতার রেশম ও একতার সূতা মিশিয়ে জামদানীর থান ও শাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করেন। এই ধরণের জামদানী কাপড়টি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।[২০১]

এছাড়া উক্ত নওয়াব বেগমই প্রথম ভিন্ন ভিন্ন রঙের জমিনের উপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের বুটি, ফুল এবং অন্যান্য নকশা সহযোগে জামদানী তৈরী করান। তিনি নিজের চেষ্টায় নতুন নতুন ফুল ও অন্যান্য নকশা উদ্ভাবন করেন। শেষ জীবনে তিনি দিনের বেশীর ভাগ সময় একাজে ব্যয় করতেন। কাল ও লাল বুটির জামদানীও তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। জামদানী শাড়িতে তাঁর উদ্ভাবিত অনেক নক্শা এখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২০২] এভাবে বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীন বস্ত্র শিল্পকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ও তাঁর উক্ত বেগম সাহেবা

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। উল্লেখ্য, ঢাকার তৎকালীন জামদানী নগরে (বর্তমান তাঁতী বাজার) তৈরীকৃত শাড়ীগুলো সমগ্র উপমহাদেশে বিখ্যাত হয়েছিল।[২০৩]

এতদাঞ্চলে ধাতব শিল্প কর্মের উন্নয়ন ও বিস্তৃতি প্রদানে ঢাকার নওয়াবগণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তৎকালে ঢাকা এবং কটকে ধাতু দিয়ে উন্নতমানের তৈজসপত্র ও গৃহ সজ্জার সামগ্রী তৈরী হতো। বিশেষ করে এখানকার সোনা-রূপার তারজালি কাজের তৈরী শিল্প সামগ্রীর কোন জুড়ি ছিলনা। এসব শিল্প সামগ্রী বিলাতেও রপ্তানী হতো বলে জানা যায়।[২০৪] বহু আগে থেকেই ঢাকার তারজালি কাজের তৈরী সামগ্রী সারা ভারতব্যাপী এমনকি ভারতের বাইরেও খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৭০১ সালে নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্য ঢাকা থেকে সোনারূপার তারজালি কাজের তৈরী অনেকগুলো সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন।[২০৫] উনিশ শতকে ঢাকার অবনতির সাথে এই শিল্পকর্মেরও অবনতি হতে থাকে। এ সময় ঢাকার নওয়াবগণ বহু চেষ্টা করে এটাকে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন এবং আশাতীত সফলতা অর্জন করেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলস-এর সাথে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকালে নওয়াব আব্দুল গণি তাঁকে ঢাকার কারিগরদের তৈরী দুটো বাচ্চা হাতির মডেল (ধাতব) উপহার দিয়েছিলেন। সোনা-রূপার তারজালি কাজের তৈরী উপহারগুলো পেয়ে যুবরাজ খুবই খুশী হন। বিনিময়ে যুবরাজও নওয়াব সাহেবকে উপঢৌকনাদি প্রদান করেছিলেন।[২০৬] সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য, পেইন্টিং ও ধাতব শিল্পকর্মের নিদর্শন দিয়ে নওয়াব আব্দুল গণি তাঁর প্রাসাদ ভবন, কাঁচারী, বাগান বাড়ী প্রভৃতি সজ্জিত করে রাখতেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ নওয়াব এস্টেটের কাঁচারী বাড়ীর মেঝেতে প্রদর্শিত এরূপ পাঁচ শতাধিক টাকা মূল্যের একটি সুন্দর ভাস্কর্য চুরি হয়ে যায়।[২০৭] সরকারীভাবে নওয়াব এস্টেট অধিগ্রহণের পর ১৯৫৪ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত আসবাবপত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতির একটি তালিকা তৈরী করা হয়। উক্ত তালিকায় অনেকগুলো ধাতব ভাস্কর্য ও গৃহসজ্জার নিদর্শনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে সোনা-রূপার তারজালি কাজের তৈরী আতরদান, গোলাপ পাশ এবং বিভিন্ন ধরণের কাসকেট ছিল উল্লেখযোগ্য।[২০৮] প্রাসাদভবনের তোষাখানায় প্রাপ্ত এবং বর্তমানে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত এরূপ একটি তারজালি কাজের তৈরী রৌপ্য আতর দানের ছবি পরিশিষ্টে চিত্র নং ৩৫-এ দেয়া হলো।

১৮৯৮ খ্রীঃ বংগের লেঃ গভর্নর নওয়াব আহসানুল্লাহকে কে.সি. আই.ই. উপাধির খেলাত প্রদান করতে ঢাকায় আসেন। ঐ সময় ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু অক্ষয় কুমার তাঁর নির্দেশে অনেকগুলো ধাতব শিল্পকর্ম তৈরীর ব্যবস্থা করেন। ছোটলাট ও তাঁর পত্নী শিল্পকর্মগুলো দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন। তাঁরা সেগুলো বিলেতে তাঁদের দেশে নিয়ে যান।[২০৯]

১৯০০ খ্রীঃ ইরানের বাদশাহ ঢাকার ঐতিহাসিক হোসেনী দালানের একটি আলোকচিত্র পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহকে একটি পত্র দেন। নওয়াব সাহেব উক্ত আলোকচিত্রের সাথে হোসেনী দালানের একটি ফিলিগ্রী মডেলও বাদশাহকে পাঠাতে মনস্থ করেন। তিনি ঢাকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ কারুশিল্পী আনন্দ হরিকে এই কাজের দায়িত্ব দেন। তিনি সুচারুরূপে কাজটি সম্পাদন করেছিলেন।[২১০]

নওয়াব আহসানুল্লাহ আনন্দ হরিকে দিয়ে হোসেনী দালান ছাড়াও তাজমহল, আহসান মঞ্জিল প্রভৃতি হর্ম্যরাজির ফিলিগ্রী মডেলও তৈরী করিয়েছিলেন। শিল্পকর্মগুলো তিনি আহসান মঞ্জিলে সাজিয়ে রেখেছিলেন। অনুরূপ শিল্পকর্মের মধ্যে হোসেনী দালানের একটি এবং আহসান মঞ্জিলের একটি ফিলিগ্রী মডেল বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।[২১১] এছাড়া ১৮৮৮ সালে টর্নেডোর পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবনের একটি ফিলিগ্রী মডেল এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।[২১১(ক)] পরিশিষ্ট চিত্র নং ৩৬ ও ৩৭-এ ফিলিগ্রী মডেলগুলোর আলোকচিত্র দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার নওয়াবরা হাতির দাঁতের শিল্পকর্মেরও সমঝদার ছিলেন। ঢাকায় এক সময় উন্নতমানের হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম তৈরী হতো। সিলেট ও কাছাড় থেকে এখানে হাতীর দাঁত আসতো।[২১২] নওয়াব আহসানুল্লাহ বহুমূল্যে সিলেটের কারিগরদের তৈরী হাতির দাঁতের একটি শীতল পাটি সংগ্রহ করেছিলেন। সোনার জরি দিয়ে তৈরী বর্ডারযুক্ত শীতল পাটিটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৯১ ইঃ এবং প্রস্থ ৫১ ইঃ। হাতির দাঁতের তৈরী এতবড় পাটি উপমহাদেশে বিরল। এটি নওয়াবদের বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনের বসার আসন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।[২১৩] ১৯০৩ সালে দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনীতে নওয়াব সলিমুল্লাহ শীতল পাটিটি পাঠিয়ে বহু প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। ঐ প্রদর্শনীতে নওয়াবের উদ্যোগে নানা ধরণের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করে ঢাকার বহুলোক পুরস্কার ও পদক পেয়েছিলেন।[২১৩(ক)] আহসান মঞ্জিল অধিগ্রহণ কালে সেখানে বিভিন্ন তৈজস পত্রের সাথে নওয়াবদের ব্যবহৃত বেশ কিছু হাতীর দাঁতের তৈরী নিদর্শন পাওয়া যায়। নিদর্শনগুলো খুবই উন্নতমানের শিল্পগুন সম্পন্ন ও নকশালংকৃত। এগুলোর মধ্যে ছুরি-চাকু, হাতপাখা, ছড়ি, পাশারগুটি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২১৪] <u>পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৩৮-এ নিদর্শণগুলোর আলোকচিত্র</u> দেয়া হলো। ১৯৫৪ সালে আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত দ্রব্যাদির জন্য তৈরীকৃত পূর্বোক্ত তালিকাতেও অনেক গুলো হাতির দাঁতের নিদর্শনের বর্ণনা পাওয়া যা।[২১৫]

আগেই বর্ণিত হয়েছে নওয়াব সলিমুল্লাহ দেশীয় কুটির ও কারুশিল্পের উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ২৩ জুলাই ১৯০৮ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে 'পূর্ববংগ জমিদার সভা' নতুন প্রদেশের ছোটলাট বেইলীকে এক সম্বর্ধনা প্রদান করেন। নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ছোটলাটকে একটি অভিনন্দন পত্র দেয়া হয়। উক্ত অভিনন্দনপত্রে এদেশীয় কুটির ও কারুশিল্পের দুর্দিনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ঐসব কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকারের সাহায্য কামনা করা হয়। অভিনন্দন পত্রের জবাবে ছোটলাট বেইলী এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেবেন বলেও তিনি আশ্বাস দেন।[২১৬] কারুশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৮ সালেই সরকার মিঃ জি.এল.গুপ্ত, আই.সি.এস-কে তথ্য অনুসন্ধান কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ছোট লাট বেইলী পূর্ববাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি শিল্প উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ আর.ন্যাথান, সি.আই.ই. উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুর ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।[২১৭]

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে, নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বংগের মুসলমানগণ ৩১ জানুয়ারী শাহবাগে বড়লাটকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। ঐদিন বড়লাটকে দেখানোর জন্য শাহবাগ বাগান বাড়ীতে এতদাঞ্চলের বিভিন্ন কুটির ও কারুশিল্প জাত দ্রব্যের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁতীদের ডেকে এনে দেশীয় তাঁতে কাপড় বুনানো পদ্ধতি এবং জামদানীতে জরির কাজ ও ফুল-নক্শা তোলার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে শঙ্খের কারুকাজ, ধাতব শিল্পকর্ম তৈরীর পদ্ধতি প্রভৃতিও প্রদর্শন করা হয়। বড়লাট এসব শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হন। ঢাকার শিল্পকর্মের নিদর্শনস্বরূপ তিনি ঐ প্রদর্শনী থেকে দুটো শাড়ী নিয়ে যান।[২১৮] নওয়াব সলিমুল্লাহর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লর্ড কারমাইকেল ঢাকার কারু শিল্পসমূহের উৎপাদন প্রণালী স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯১২ খ্রীঃ ৩০জুলাই নওয়াব সলিমুল্লাহ নিজে সাথে গিয়ে লর্ড ও লেডী কারমাইকেলকে উক্ত কাজ দেখান। ঐদিন লর্ড ও লেডী কারমাইকেল প্রথমে ঠাঁটারী বাজারে পিতল, তামা ও কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানাগুলো পরিদর্শন করেন। তাঁর পরিদর্শনের এক ঘন্টা আগেই নওয়াবের ছোট ভাই খাজা আতিকুল্লাহ সেখানে গিয়ে আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর ঢাকার বস্ত্রশিল্প তৈরীর পদ্ধতি দেখানোর জন্য নওয়াব সাহেব তাঁদেরকে নিয়ে ঢাকার নওয়াবপুর গমন করেন। সেখানে লর্ড ও লেডী কারমাইকেল মসলিন, কাসিদা, জামদানী প্রভৃতি কাপড় বয়ন পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হন। সেখান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে লর্ড সাহেব শাঁখারী বাজারে গেলে তথায় নওয়াব বাড়ীর খাজা মুসার নেতৃত্বে অনেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। এসব পরিদর্শনকালে কারুশিল্পীরা খুশী হয়ে লর্ড ও লেডীকে বেশকিছু শিল্পকর্ম উপহার দেন।[২১৯]

এর কিছু দিন পরেই নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে তাঁর শাহবাগ বাগানবাড়ীতে এতদাঞ্চলের কুটির শিল্পের বড় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঐ প্রদর্শনীতে কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম উৎপাদন পদ্ধতিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু জাপান সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশের কারণে প্রদর্শনীটি বন্ধ রাখতে হয়।[২২০] উল্লেখ্য, নওয়াবের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ১৬ আগস্ট ১৯১২ খ্রীঃ সকালে লর্ড কারমাইকেল বেচারাম দেউরীর এক বাড়িতে গিয়ে প্রাচীন আমলের নওয়াব ও বেগমদের প্রতিকৃতি দেখেন। ঢাকার ঈদ ও মহররম মিছিলের দৃশ্য এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি ঐ বাড়ীতে সংরক্ষিত ছিল।[২২১]

পূর্বোক্ত কারণে শাহবাগে আয়োজিত উক্ত প্রদর্শনী বন্ধ হওয়ায় নওয়াব সলিমুল্লাহ লর্ড কারমাইকেলকে ঢাকার কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেখানোর বিকল্প ব্যবস্থা করেন। তিনি ঢাকার বংশাল রোডে এবং জেল রোডের দুটো বাড়ীতে ঘরোয়াভাবে আয়োজন করে লর্ডকে শিল্পকর্ম দেখানোর ব্যবস্থা করেন। ২১ আগস্ট বুধবার নওয়াব সলিমুল্লাহ, লর্ড ও লেডী কারমাইকেলকে নিয়ে প্রথমে বংশাল রোডস্থ চাঁদ মিয়ার শিল্প কারখানায় যান। সেখানে কর্মরত শিল্পীদের কার্যদক্ষতা দেখে লর্ড প্রীতিলাভ করেন। সেখান থেকে লর্ড ও লেডীকে নিয়ে নওয়াব সাহেব জেল রোডস্থ প্রদর্শনী গৃহে গমন করেন। তথায় নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। প্রদর্শনীতে কাগজের ফুল, মহিষের শিঙের তৈরী চিরুনী, লাঠী, ছুরি, ভাস্কর্য, প্রভৃতি দেয়া ছিল। গৃহ প্রাঙ্গনে কারুশিল্পীরা কর্মরত ছিল। ঐ সময় লর্ডকে তাদের নির্মিত বিশেষ ধরণের একটি পুতুল উপহার দেয়া হয়। পুতুলটি ঘুরালে সারস, কুকুর, গাধা, হাতী প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করতো। লর্ড কারমাইকেল পুতুলটির শিল্পনৈপুন্য দেখে মুগ্ধ হন। তিনি এধরণের আরো পুতুল তৈরী করে অন্যান্য এলাকায় পাঠানোর জন্য নওয়াব সাহেবকে অনুরোধ করেন। পরিদর্শন শেষে লর্ড কারমাইকেল কারুশিল্পীদের মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।[২২২]

ঢাকার কারুশিল্পীদের নৈপুন্য দেখে লর্ড কারমাইকেল তাঁর দার্জিলিংস্থ শৈলনিবাশ সজ্জিত করার জন্য দুটো কাঠের হাতি নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিতে নওয়াব সলিমুল্লাহকে অনুরোধ করেন। নওয়াব সাহেব ঢাকার বিখ্যাত কারুশিল্পী বিনোদবিহারীকে দিয়ে সেগুন কাঠের দুটো হাতি তৈরী করান। তিন মন ওজনের হাতি দুটো তৈরী করতে ২৫০ টাকা খরচ হয়। হাতি দুটো এতই সুন্দর হয়েছিল যে, তা জীবন্ত মনে হতো। গভর্নর বাহাদুর এই শিল্প চাতুর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।[২২৩] নওয়াব সলিমুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তায় ঢাকার কয়েকজন কারুশিল্পী খুবই উন্নতমানের সেতার ,এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈরী করে ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সুখলাল, চুনীলাল, পুরুষোত্তম, মুন্নালাল প্রমুখ শিল্পীগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। পরবর্তীকালে তাঁদের বংশধরেরা বহুদিন ধরে ঢাকায় উক্ত শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখেন।[২২৩(ক)]

১৯১৩ খ্রীঃ ৮ ফেব্রুঃ শনিবার বিকালে লর্ড ও লেডী কারমাইকেল বুড়িগংগার অপর পারে ঐতিহাসিক জিঞ্জিরা প্রাসাদ পরিদর্শন করতে যান। সেখানে খাজা মোহাম্মদ ইসমাইল এবং খাজা আজিজুল্লাহ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করেন। উক্ত পরিদর্শন কালে খাজা আজিজুল্লাহ ঢাকার শিল্পীদের তারজালি কাজে নির্মিত দুটো রৌপ্য আতরদান লর্ড ও লেডীকে উপহার দেন।[২২৪]

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, ঢাকার নওয়াব বাড়ীর মহিলাদের একটি লেডীস ক্লাব ছিল। সেখানে পুরনারীদের সূচীকর্মসহ নানা ধরণের শিল্পকর্ম শিক্ষা দেয়া হতো। ১৯১৩ খ্রীঃ ২২ জুলাই লেডী কারমাইকেল খাজা মুসার গৃহে উক্ত লেডীস ক্লাব পরিদর্শন করেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে সে সময় লেডীকে একটি মানপত্র দেয়া হয়। তিনি উক্ত ক্লাবের সদস্যদের শিল্পকর্ম দেখে প্রীতি লাভ করেন। তিনি চিরদিন ক্লাবটির মঙ্গলার্থী থাকবেন বলেও ঘোষনা করেন।[২২৫] ঢাকার

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াবদের আমলে নক্‌শাদার গোল ও কিশ্‌তী টুপীর বিশেষ প্রচলন শুরু হয়। নওয়াব পরিবারের মহিলারাও শখের বসে কিংবা অর্থের প্রয়োজনে এসব টুপি প্রস্তুত করে পরিবারের লোকদের ব্যবহার করতে দিতেন ও বিক্রয় করতেন। পরবর্তীকালে তাঁদের এ টুপির নমুনায় ঢাকায় জামদানী, মসলিন ও তসরের নানা রকম টুপি প্রস্তুত হতে থাকে।[২২৬]

ঢাকার নওয়াব এবং সরকারের উল্লেখিত পৃষ্ঠপোষকাতায় ঢাকায় কারুশিল্পের প্রভুত উন্নতি হয়। ১৯১৩ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির এক আদেশে সেখানকার বিভিন্ন দোকানে ঢাকার কারুশিল্পকর্ম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।[২২৭] ঢাকার সমসাময়িক ঐতিহাসিক যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ঢাকার লুপ্তপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ভ্যুদয় সম্ভব। বর্তমানে সহৃদয় রাজপুরুষবর্গ দেশীয় শিল্পোন্নোতি সাধনে যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাতে যথেষ্ঠ আশার সঞ্চার হয়েছে।[২২৮] ঢাকার নওয়াবদের ব্যবহৃত একটি অলংকৃত ধাতব গাছপাত্র এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। জংগলে নানা প্রকার জীব জন্তুর শিকার দৃশ্যের নকশা সমৃদ্ধ গাছপাত্রটি খুবই উন্নতমানের ধাতব শিল্পকর্মের একটি প্রকৃস্ট নমুনা। <u>পরিশিষ্টে চিত্র নং ৩৯-এ সেটার আলোকচিত্র দেয়া হলো</u>। ঢাকার নওয়াবদের সংগ্রহে অনুরূপ বহুসংখ্যক ধাতব শিল্পকর্ম ছিল।

৮(৬) নওয়াবদের জাঁকজমক ও সাজসরঞ্জাম ঃ

ঢাকার নওয়াবগণ ছিলেন পূর্ববংগের সর্ব বৃহৎ জমিদার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তাঁদের চেয়ে বড় জমিদারী এতদাঞ্চলে আর কেউ করতে পারে নি।[২২৯] অঢেল ধন সম্পত্তির অধিকারী ঢাকার নওয়াবদের জাঁকজমকও ছিল সবার শীর্ষে। নওয়াব বাড়ীর বিস্তৃত এলাকায় তাঁদের যেসব সৌধমালা ছিল তা মোগল আমলের ঢাকার নওয়াবদের বাসস্থানকেও হার মানাতো।[২৩০] ঢাকায় বিজলী বাতি চালুর বহু আগেই নওয়াব আবদুল গণি নিজস্ব গ্যাস কারখানা বসিয়ে পুরো নওয়াব বাড়ী এলাকায় গ্যাসালোকের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৩১] খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকেই হাতী-ঘোড়া ক্রয় করে তাঁরা জাঁকজমকের সাথে চলাফেরা করতেন। নওয়াব আব্দুল গণির সময় সরকারীভাবে তাঁকে তলোয়ার সজ্জিত একদল অশ্বারোহী গার্ড দেয়া হয়। এদেরকে তুর্ক সওয়ার বলা হতো।[২৩২] নওয়াবরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একদল ব্যান্ড পার্টি রাখতেন। তারা সকাল সন্ধ্যায় নওয়াব বাড়ীর নহবত খানায় বাদ্য পরিবেশন করতো।[২৩৩]

ভাইসরয় কাউন্সিলে যোগদানের জন্য ঢাকার নওয়াবগণ স্পেশাল স্টীমার অথবা স্পেশাল ট্রেনে যাতায়াত করতেন। তাঁদের সাথে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, অফিসার, কর্মচারী, চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা, যাবতীয় লোকজন যাতায়াত করতেন। এজন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হতো।[২৩৪] বিভিন্ন পরগানায় জমিদারী কাচারী পরিদর্শন কালেও তাঁরা স্টীমার, লঞ্চ,বজরা, হাতী- ঘোড়া, অফিসার, কর্মচারী, পাইক-পেয়াদা, সমভিব্যহারে রাজকীয় চালে গমনাগমন করতেন। এসব ভ্রমনকালে প্রজারা পথঘাট সাজিয়ে আনন্দ উল্লাস করে তাঁদেরকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দিতো। উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদের সম্বর্ধনার ন্যায় স্থানীয় গণ্যমান্যরা সমবেত হয়ে তাঁদেরকে মানপত্র দিতেন। এসব মানপত্রের মাধ্যমে স্থানীয়দের অনেক অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁরা কার্যকরী পদক্ষেপ নিতেন। রাজকীয় দরবারের ভ্রমন থেকে ফিরলে ঢাকার ধনী গরীব নির্বিশেষে পথঘাট সাজিয়ে, বন্দুক-পটকা ফুটিয়ে, নেচে গেয়ে নওয়াব সাহেবকে সম্বর্ধনা প্রদান করতেন।[২৩৫]

খাজা আলীমুল্লাহর সময় প্রতি বছর ঘোড়-দৌড়ে তাঁদের ঘোড়া অংশ নিত। নওয়াব আবদুল গণি ও আহসানুল্লাহর সময় ঢাকা, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রায়ই তাঁদের ঘোড়াগুলো জয়লাভ করতো।[২৩৬] ঢাকার নওয়াবদের বেশ কয়েকটি স্টীমার, লঞ্চ এবং বহু সংখ্যক বজরা ও সাধারণ নৌকা ছিল।[২৩৭] শিকারের জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি-ঘোড়া ও কুকুর ছিল। প্রায় প্রতি মাসেই তাঁরা শিকারে বের হতেন। সাভারের বাইগুনবাড়ীতে তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

শিকারের জন্য সংরক্ষিত বন ছিল। ঢাকায় আগত উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সাহেবরা শিকারের প্রয়োজনে অনেক সময় ঢাকার নওয়াবদের হাতি-ঘোড়ার সাহায্য নিতেন।

বাহ্যিক আড়ম্বরের অনুরূপ ঢাকার নওয়াবদের প্রাসাদের অভ্যন্তরেও দেশী-বিদেশী নানা রূপ দামী আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহসজ্জার সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রীঃ ঘূর্ণিঝড়ে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ক্ষতিগ্রস্থ হবার কিছুদিন আগে বিলেত থেকে লক্ষাধিক টাকা মুল্যের আসবাবপত্র আনা হয়েছিল।[২৩৮] ঝড়ে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় সংগ্রহ করা হয়। আগেই বর্ণিত হয়েছে, ঢাকার নওয়াবরা স্থানীয় খ্যাতনামা কারুশিল্পীদের দ্বারা ধাতব, কাঠ, হাতির দাঁত প্রভৃতি শিল্পকর্ম তৈরী করিয়ে সেগুলো গৃহসজ্জার কাজে লাগাতেন। ঢাকার বিখ্যাত তারজালি কাজে নির্মিত নানা ধরণের পশুপক্ষীর ভাস্কর্য, খ্যাতনামা স্থাপত্যের মডেল ইত্যাদি নওয়াব বাড়ীর কক্ষসমুহে সাজিয়ে রাখা হতো। তাঁদের আমলের ছিদ্র করে তৈরী ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা সম্বলিত একটি অনুপম কাঠের দরমা-বেড়া আজো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। বেড়াটি উনবিংশ শতাব্দীতে এতদাঞ্চলে ইসলামী ঐতিহ্যে নির্মিত কারুময় দারুশিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।[২৩৯] পরিশিষ্টে চিত্র নং ৪০-এ বেড়াটির আলোকচিত্র দেয়া হলো।

ঢাকার নওয়াবরা খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে চীনামাটি ও কাঁচের তৈজসপত্র তৈরী করাতেন। এসব তৈজসপত্রের গায়ে নওয়াবদের নিজস্ব মনোগ্রাম চিত্রিত থাকতো। এতে সাধারণত তাঁদের বহুল ব্যবহৃত মনোগ্রাম তথা খাজা আহসানুল্লাহর সংক্ষেপিতরূপ K.A.O. লেখা থাকতো। এছাড়া ব্রিটিশ পতাকার সাথে জোড়া বাঘের প্রতিকৃতি এবং খাজা আহসানুল্লাহর নাম সম্বলিত অন্য ধরণের মনোগ্রামযুক্ত তৈজসপত্রও নির্মাণ করা হতো। এরূপ মনোগ্রাম সম্বলিত বেশ কিছু চীনামাটির ডিশ, প্লেট, বাটি ও কাঁচের পানপাত্র আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। (পরিশিষ্টে চিত্র নং ৪১-এ এরূপ কয়েকটি তৈজসপত্রের আলোকচিত্র দেয়া হলো। নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে ১৯০৪ সালে মিঃ ফ্রিৎজকাপের তোলা আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের কয়েকটি কক্ষের দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র পাওয়া গেছে। চিত্রগুলো থেকে এর ঐশ্বর্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বিশেষ করে সে সময় এর বেডরুম, ড্রইংরুম ও হিন্দুস্থানী কক্ষে রক্ষিত আসবাবপত্রগুলো ছিল অতুলনীয়। আর ছিল ডাইনিং হলে সজ্জিত নানা ধরণের তৈজসপত্র ও পান পাত্রের চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। ১৯০৪ সালে তোলা এই প্রাসাদের ড্রইংরুম, স্টেট বেডরুম, ডাইনিং রুম ও বলরুমের চিত্রগুলো পরিশিষ্টে চিত্র নং-৪২,৪৩,৪৪, ও ৪৫-এ দেয়া হলো। প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষের ছাদে ঝুলতো অসংখ্য শাখাযুক্ত কাটগ্লাসের ঝাড়বাতি এবং দেয়ালগুলোতে ছিল কাট গ্লাসের তেরী বিশেষ ধরনের ব্রাকেট লাইট।

ঢাকার নওয়াবদের আসবাবপত্রের মধ্যে বর্তমানে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের নাচঘরে রক্ষিত একটি রূপার অলংকৃত চেয়ার, দু'টি ক্রিস্টাল চেয়ার ও দু'টি ক্রিস্টাল টেবিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৪০] ড্রাগনাকৃতির হাতলযুক্ত রূপার চেয়ারটি উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নির্মিত ধাতব শিল্পকর্মের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনও বটে। মোতাওয়াল্লী হিসেবে সফলভাবে সহায় সম্পত্তি পরিচালনা করার জন্য খাজা পরিবারের পক্ষ থেকে ১৮৭০ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণিকে উপহার স্বরূপ চেয়ারটি দেয়া হয়েছিল। পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৩-এ দেয়া চেয়ারটির ছবির কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। ক্রিস্টাল চেয়ার-টেবিলগুলো বেলজিয়াম কাটগ্লাসের তৈরী। এত সুন্দর কাঁচের চেয়ার টেবিল এতদাঞ্চলে আর দেখা যায় না। (পরিশিষ্টে চিত্র নং-৪৬ ও ৪৭-এ দেয়া আলোকচিত্র দ্রঃ) এছাড়াও ছিল কাটগ্লাসের রকমারি তৈজসপত্র ও ঝাড়বাতি, বিভিন্ন ধরণের সোফাসেট, কার্পেট, সোনা-রূপা ও কাটগ্লাসের আফতাবা, রূপার হাত-পাখা, হাতি ও গাড়ি-ঘোড়া সজ্জিত করার অলংকৃত দ্রব্য সামগ্রী, ঝালর, মসলন্দ প্রভৃতি। ১৮৯৫ খ্রীঃ শাহজাদী খানম (খাজা আলীমুল্লাহর এক কন্যা) তাঁর সহায় সম্পত্তির অংশ দাবী করে ঢাকার সাব জজ কোর্টে নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।[২৪১] উক্ত মামলার প্রয়োজনে তিনি তাঁর অংশ দাবীকৃত সম্পত্তির (যা নওয়াবের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল) একটি তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

পেশ করেন। উক্ত তালিকা থেকে ঢাকার নওয়াবদের উল্লেখযোগ্য অলংকারাদি, হাতি-ঘোড়া, গাড়ী ও নৌযান, আসবাব পত্র, ঝাড়বাতি, তৈজসপত্র প্রভৃতির সংখ্যা, নাম ইত্যাদি জানা যায়। পরিশিষ্ট নং-২২ পৃঃ৪৪৯ দ্রঃ।

১৯৫২ সালে ঢাকার নওয়াবদের জমিদারী সাময়িকভাবে অধিগ্রহণের পর সংরক্ষণে অপারগ হয়ে নওয়াব হাবিবুল্লাহ আহসান মঞ্জিল ছেড়ে পরিবাগে চলে যান। এরপর এ প্রাসাদে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা ১৯৫৪ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দায়িত্বে তালিকাভুক্ত করা হয়। তখন এই প্রাসাদের ছিল ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। তথাপি উক্ত তালিকায় যেসব আসবাবপত্র, তৈজসপত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় তা ছিল বহু মূল্যবান। বিশেষ করে গৃহ সজ্জায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পশু-পাখির স্টাফকৃত দৃশ্যগুলো ছিল খুবই আকর্ষনীয়।[২৪২] বর্তমানে সেসব নিদর্শনের কোন হদিস নেই। কেবলমাত্র বৃহদাকার একটি হাতির মাথার কংকাল নওয়াব এস্টেটের পুরানো অফিস (এডওয়ার্ড হাউস) থেকে উদ্ধার করা গেছে। সেটা এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।[২৪৩] পরিশিষ্টে চিত্র নং-৪৮-এ সেটার আলোকচিত্র দেয়া হলো। এছাড়া ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের অনুকরণে স্বর্গীয় দূত ইত্যাদি দ্বারা চিত্রিত এবং কচ্ছপের ফিগার বিশিষ্ট পায়াযুক্ত বিশেষ ধরণের একটি অষ্টকোনাকার টেবিল এখানে উল্লেখযোগ্য। টেবিলটি ইটালিয়ান সরকার নওয়াব আহসানুল্লাহকে উপহার প্রদান করেছিলেন বলে জানা যায়।[২৪৪] আহসান মঞ্জিলের স্ট্রংরুমে রক্ষিত বৃহদাকার লোহার সিন্দুকটি ঢাকার নওয়াবদের ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য-বীর্যের মূর্ত প্রতীক। বড় বড় ৯৪টি লকার বিশিষ্ট সিন্দুকটির প্রস্তুতকারকঃ *চাবস, প্যাটেন্ট সেফ ডিপোজিট,-১২৮, কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লন্ডন।* এর পরিমাপঃ উচ্চতা-২৫৫ সেঃমিঃ, প্রস্থ-১৫০ সেঃমিঃ, বেদ ৮৫ সেঃ মিঃ। এতবড় সিন্দুক বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। সিন্দুকটির ভারী পাল্লা খুলতেই দু'তিন জনের দরকার হয়। পরিশিষ্টে চিত্র নং-৪৯-এ সিন্দুকটির আলোকচিত্র দেয়া হলো। বড় সিন্দুকটি ছাড়াও ঐ কক্ষে আরো তিনটি মাঝারি আকারের লোহার সিন্দুক এবং দুটো কাঠের মজবুত আলমারী রয়েছে। এসবগুলোতে নওয়াবদের সময় টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, মনি-মুক্তা রাখা হতো।[২৪৫]

৮(৭) ঢাকার নওয়াবদের অলংকারাদি ঃ

মণি-মাণিক্য ও মূল্যবান অলংকারাদি সংগ্রহ করা ঢাকার নওয়াবদের একটি উল্লেখযোগ্য শখ ছিল। আবার আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবেও তাঁরা দূর্লভ মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করতেন। প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়ে খাজা আলীমুল্লাহই প্রথম এদিকে মন দেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর আমলে ঢাকার বনেদী জমিদার মীর কুতুবুদ্দিন এ শহর ছেড়ে লখনৌ চলে যান। তিনি চলে যাবার প্রাক্কালে মোগল বাদশা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত রূপার ছড়ি ও মুক্তার মালাটি খাজা আলীমুল্লাহর কাছে বিক্রি করে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু ঈর্ষাবশত মীর সাহেব খাজা আলীমুল্লাহর পরিবর্তে সেগুলো গোপাল দাসের নিকট মাত্র দু'হাজার টাকায় বিক্রি করে যান। খাজা আলীমুল্লাহ পরে সেগুলো গোপাল দাসের নিকট থেকে তেইশ হাজার টাকায় কিনে নেন।[২৪৬]

তৈফুর সাহেব জানিয়েছেন, ১৮৪৩ খ্রীঃ ঢাকার নায়েবে নাজিমদের বংশ ও পদ বিলুপ্তির পর তাঁদের মূল্যবান ধন-সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়। খাজা আলীমুল্লাহ সেখান থেকে একটি অতি মূল্যবান পান্নার অলংকার ক্রয় করেন।[২৪৭] নওয়াবদের বিশ্ব বিখ্যাত দরিয়া-ই-নূর হীরকটিও ১৮৫২ খ্রীঃ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে খাজা আলীমুল্লাহই ক্রয় করেছিলেন। দরিয়া-ই-নূর সম্পর্কে পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, পৃঃ । এছাড়া খাজা আলীমুল্লাহ কয়েকজন ধনাঢ্য ও বনেদী বংশীয় মহিলাকে বিয়ে করেও কিছু মূল্যবান অলংকারের অধিকারী হয়েছিলেন।[২৪৭(ক)] বিশেষ করে খেজারুন নেসা নামে তাঁর এক স্ত্রীর সাথে মোগল শাহী বংশের যোগসূত্র থাকায় তিনি প্রচুর ধন সম্পদ ও অলংকারের অধিকারিনী ছিলেন বলে জানা যায়।[২৪৮] উল্লিখিত বর্ণনা ছাড়া ঢাকা নওয়াব পরিবারের মূল্যবান অলংকারাদি অর্জনের আর তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। তবে নওয়াব আব্দুল গণির সময় খাজা পরিবারের ধন-সম্পত্তি যেমন আগের চেয়ে ৪/৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি অলংকারাদির সংগ্রহও বেড়েছিল বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত জুয়েলারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ্যামিলটন এন্ড কোম্পানীকে দিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ (সম্ভবত ১৮৮০ এর দশকে) তাঁর সংগ্রহে থাকা উল্লেখযোগ্য অলংকারাদির একটি এ্যালবাম প্রকাশ করেন। এতে ১৪টি অলংকারের বর্ণনা , সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং রঙিন চিত্র রয়েছে। সেগুলোর কয়েকটি বাস্তবিকই অনুপম এবং কতকগুলো ছিল ইতিহাসখ্যাত। এ্যালবামটি ঢাকা সফরে আগত বিশিষ্ট অতিথিদেরকে স্মরণিকা হিসেবে দেয়া হতো।[২৪৯] উক্ত এ্যালবামে প্রকাশিত অলংকারগুলোর সংশ্লিষ্ট বর্ণনা ও ইতিহাস ইত্যাদি তথ্য পরিশিষ্ট নং-২৩ পৃঃ৪৯৩তে উল্লেখ করা হলো।

উপরে বর্ণিত অলংকারগুলোর প্রায় সবই ঢাকার নওয়াব সাহেবগণ আনুষ্ঠানিক পোষাকের সাথে পরতেন। আনুষ্ঠানিক পোষাক পরা অবস্থায় নওয়াব আব্দুল গণি, আহসানুল্লাহ ও সলিমুল্লাহর যেসব প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তাতে উক্ত অলংকারগুলোর কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করা যায়।[২৫০] উপরোক্ত অলংকারগুলো ছাড়াও ঢাকার নওয়াবদের সংগ্রহে আরো প্রচুর মণিমুক্তা ছিল। লেডী ডাফরিনের লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৮৭ সালের ৬ জানুঃ তিনি বড় লাটের সাথে নওয়াবের কলকাতার প্রাসাদে গেলে নওয়াব তাঁদেরকে দরিয়া-ই-নূর ছাড়াও আরো বেশ কিছু সুন্দর হীরক দেখিয়েছিলেন।[২৫১] একদা নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মীর্জা ফকির মোহাম্মদকে তাঁদের মূল্যবান রত্নগুলো দেখানোর জন্য আদেশ করেন। নওয়াবের আদেশমত একদিন ভোর বেলা তিনটি বড় বড় টেবিল ভর্তি করে প্রচুর হীরা, রুবী, চুন্নি, পান্না, নীলকান্তমনি, মুক্তার মালা প্রভৃতি থরে থরে সাজানো হয়। নওয়াব সাহেব সেগুলোকে ভালভাবে নিরীক্ষা করে তন্মধ্যে পান্নাগুলোকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করেন।[২৫২]

ঢাকার নওয়াবদের যাবতীয় অলংকারের জন্য পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ তালিকা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে এতদাঞ্চলের পরিবারে যাঁরা সিংহভাগ অলংকার ব্যবহার করেন সেই বেগম মহলে তাঁদের কি পরিমাণে অলংকারাদি ছিল তা আজো জানা যায়নি। তবে শাহজাদি খানম গং কর্তৃক ১৮৯৫ সালে নওয়াব আহসানুল্লাহর বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত মামলা দায়ের করার সময় তিনি এই পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তির যে তালিকা পেশ করেছিলেন, তন্মধ্যে বেশ কিছু অলংকারের নাম ও মূল্য পাওয়া যায়।[২৫৩] পরিশিষ্ট নং- ২২ পৃঃ৪৯১তে উক্ত তালিকাটি দেয়া হলো। উক্ত তালিকায় মূল্যবান অলংকারাদি ছাড়াও ঢাকার নওয়াবদের সংগ্রহে থাকা বেশকিছু পুরানো সোনার মোহরের কথা জানা যায়। উক্ত তালিকায় সেগুলোর মূল্য ধরা হয়েছিল ৪৪,৮০০ টাকা। উল্লেখ্য যে, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করা ঢাকার নওয়াবদের একটি শখ ছিল। এরূপ প্রচুর মুদ্রা সংগ্রহ করে নওয়াব আহসানুল্লাহ সেগুলোর ইতিহাস জানার চেষ্টা করতেন। প্রাচীন মুদ্রার গায়ে লেখা তথ্য পাঠ কিংবা ইতিহাস উদ্ধারে তিনি অনেক সময় কলকাতার হ্যামিল্টন কোম্পানীর বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতেন।[২৫৪] নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর ১৯০২ সালে তাঁর কোষাগার ও ব্যাংকে জমাকৃত নগদ অর্থ ও প্রমেসরী নোটের যে হিসাব করা হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষাধিক টাকা। সেগুলোর মধ্যে কিছু পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ও কিছু অর্ধ স্বর্ণ মুদ্রাও ছিল।[২৫৫]

১৯০৪ সালে সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর অংশের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারের নিকট বন্ধক রাখেন। সে সময় নওয়াব এস্টেটের মালিকানায় থাকা জুয়েলারী সমূহের মূল্য সম্বলিত একটি তালিকা তৈরী করা হয়। হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর তৈরীকৃত উক্ত তালিকায় বর্ণিত জুয়েলারীগুলোর মোট মূল্য তখন ধরা হয়েছিল ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। পরিশিষ্ট নং ২৪ পৃঃ নং-৪৫৫-এ উক্ত তালিকাটি দেয়া হলো।[২৫৬] উক্ত তালিকা থেকে বুঝা যায়, পূর্বোক্ত এ্যালবামে বর্ণিত নওয়াবদের অলংকারগুলো তখনও ছিল। তালিকায় বর্ণিত অলংকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দরিয়া-ই-নূর নামক বিখ্যাত হীরক খন্ড। তখন সেটার মূল্য ধরা হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা।

ঢাকার নওয়াবদের এতসব জুয়েলারী কোথায় গেল তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোহতারামের লেখা থেকে জানা যায়, নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে জমিদারির আয় কমে গেলে পরিবারের অন্যান্য শরিকেরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের জমাকৃত ধন সম্পদের অংশ দাবি করেন। এক সময় তাঁরা সবাই মিলে অলংকার জাতীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি সব বিক্রি করে দেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর নওয়াবদের সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার বাক্সটি এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণে চয়ে যায়। ১৯৩০ এর দশকে হঠাৎ করে

Dhaka University Institutional Repository

সোনা রূপার দাম দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে নওয়াব পরিবারের লোকেরা ১৫ এপ্রিল ১৯৩৬ সালে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে একটি সভা করে মুদ্রাগুলো ধাতব বাজার মূল্যে ওজনে বিক্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[২৫৭] কামরুদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, নওয়াব আহসানুল্লাহর সংগৃহীত মূল্যবান মনি-মুক্তা ভর্ত্তি একটি বাক্স ১৯০১ সালে নওয়াব সাহেব অকস্মাৎ মারা গেলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খাজা আতিকুল্লাহ হস্তগত করেন। পরবর্তীতে খাজা আতিকুল্লাহ কোকেনাসক্ত হয়ে সেগুলো খোয়াতে শুরু করেন। তাঁর বড় মেয়ে ফারহাত বানু একদিন গোপনে বাক্সটি সরিয়ে ফেলেন এবং স্বামী খাজা শাহাবুদ্দিনের সাথে সেটা নিয়ে লন্ডনে পাড়ি জমান।[২৫৮]

নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে অব্যবস্থার কারনে জমিদারিতে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকে। অন্যদিকে রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মোহতারাম জানিয়েছেন, ১৯০১ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে তিনি এজন্য প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।[২৫৯] এসব খরচ যোগাতে গিয়ে তিনি এস্টেটের সব হাতি-ঘোড়া বিক্রি করে দেন।[২৬০] কিন্তু তাতেও কুলাতে না পেরে হিন্দু মহাজনদের নিকট থেকে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। উক্ত ঋণ পরিশোধের চাপে পড়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৮ সালে সরকারের নিকট থেকে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের ঋণ পরিশোধে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এজন্য তিনি দরিয়া-ই-নূর হীরকটিও বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত এ সময়ই নওয়াবদের সংগৃহীত জুয়েলারীর অধিকাংশ বিক্রি করে দেয়া হয়। ১৯১৪ সালে আহসান মঞ্জিলের তোষাখানায় রক্ষিত একটি বাক্স থেকে রৌপ্য নির্মিত কিছু দ্রব্য চুরি হয়ে যায়। নওয়াব সলিমুল্লাহ ভ্রমনকালে যেসব ছোট খাট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন সেগুলো ঐ বাক্সে রাখা ছিল। ঐ দ্রব্যগুলোর মূল্য ছিল প্রায় সাত শত টাকা।[২৬১]

১৯২৩ সালে নওয়াবের দিলখুশা বাগানবাড়ীর প্রাসাদেও অনুরূপ চুরি সংঘটিত হয় এবং তাতে নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহর প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের অলংকার খোয়া যায়।[২৬২] নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর অধিকারে থাকা জুয়েলারীর একটি তালিকা হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানী ২৬ জানুয়ারী ১৯১৫ সালে প্রস্তুত করেছিলেন। উক্ত তালিকায় বর্ণিত অলংকারাদির মূল্য **ছিল** মাত্র ৪,৫৩২/-টাকা।[২৬৩] পরিশিষ্ট নং ২৫ পৃঃ নং৪৪৮এ উক্ত তালিকাটি দেয়া হলো। এ থেকেই বুঝা যায় নওয়াবদের সঞ্চিত অলংকারাদি নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। উক্ত তালিকায় বর্ণিত অলংকারগুলো পরবর্তীতে ঢাকা নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার, খাজা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আগ্রহীদের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করেন। সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ১৯২২ সালে নওয়াবজাদী মেহেরবানু ক্রয় করেন। সেখান থেকে কিছু অলংকার ক্রয় করেন জনাব এস. এম. মোর্শেদ।[২৬৪] নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত একটি সূত্র থেকে জানা যায় ১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল নওয়াব এস্টেট-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের ১৬ টি মূল্যবান অলংকার খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা শাহাবুদ্দিনের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[২৬৫] নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় নওয়াবের অযোগ্যতা, উত্তরাধিকারীদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রভৃতি কারণে পারিবারিক সহায় সম্পত্তি পরিচালনা এতই খারাপ অবস্থায় পতিত হয় যে, নওয়াবদের জুয়েলারী সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় এস্টেটের পক্ষ থেকে প্রাচীন মুদ্রা ভর্তি একটি সিন্দুক কলকাতায় হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর হেফাজতে রাখা হয়। কিন্তু এরপর প্রায় ৪০ বছর যাবৎ কেউই সেটার কোন খোঁজ নেয়নি। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাংগার কারণে উক্ত কোম্পানী যখন দরিয়া-ই-নূর হীরকটি তাঁদের জিম্মাদারী থেকে ফেরত নিতে বলেন, তখন উক্ত মুদ্রাগুলোর কথাও তাঁরা চীফ ম্যানেজারকে অবহিত করেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেখিয়ে মুদ্রাগুলো বুঝে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু চীফ ম্যানেজার কিংবা নওয়াব পরিবারের কেউই উক্ত মুদ্রা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র পেশ করতে সক্ষম হননি। ফলে উক্ত কোম্পানী তাঁদের নিয়মানুযায়ী মুদ্রাগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করে।[২৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

৮(৮) দরিয়া-ই-নূর ঃ

(ক) রূপ ও প্রকৃতি ঃ দরিয়া-ই-নূর সারা বাংলায় এযাবৎ প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সৌন্দর্যশালী এবং মূল্যবান একটি হীরক।[২৬৭] দরিয়া-ই-নূর অর্থ 'আলোর সাগর'। মূল পাথরটি বর্ণহীন এবং আয়ত টেবিলাকার, সমতল পৃষ্ঠতল বিশিষ্ট। কোহিনূরের সমগোত্রীয় এবং ভারতীয় প্রকৃতির তৈরী বিশুদ্ধ হীরকখন্ড। মূল হীরকটির চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দশটি ডিম্বাকার হীরক খন্ডকে সোনার ফ্রেমের সাহায্যে সংযুক্ত করে এর সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেগুলোর কয়েকটি আবার ফিকে পাটল বর্ণের। চতুর্দিকে সংযুক্ত ঐ দশটি হীরকও মহামূল্যবান। তবে এদের মধ্যমণি দরিয়া-ই-নূর এতই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান যে, এর নামের আড়ালে অন্যগুলোর পরিচয় হারিয়ে গেছে। দরিয়া-ই-নূরের বর্তমান রূপটি বাজুবন্দ রূপে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী। তবে এটাকে মাথার বা মুকুটের অলংকার রূপেও ব্যবহার করা যায়। পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং ৫০-এ হীরকটির চিত্র দেয়া হলো। ভারতীয় বিশুদ্ধ টেবিল হীরকে প্রস্তুত দরিয়া-ই-নূর মনিপাথরটি পরিপূর্ণ উজ্জল বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীপ্তমান। বিশ্বের সেরা মনিমুক্তা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর মতে দরিয়া-ই-নূর সর্ব প্রকার ভেজাল ও মালিন্য থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ একটি মনিপাথর।[২৬৮]

(খ) পরিমাপ ঃ দরিয়া-ই-নূরের অকৃত্রিমতা এবং পরিমাপ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ একটা অস্পষ্টতা ও সন্দেহ বিরাজ করছিল। ১৯৮৫ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে হীরকটির বিশুদ্ধতা যাঁচাই এবং পরিমাপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান 'উটাহ জেমোলজিক্যাল সার্ভিসেস' বনানী, ঢাকা-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত তাঁদের জনৈক বিশেষজ্ঞ উক্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন পেশ করেন। মূল্যবান প্রত্নিদর্শনের কারণে হীরকগুলো ফ্রেম থেকে খুলে প্রতিটির পৃথকভাবে ওজন নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে আনুসাংগিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সাইজ মেপে এবং ওজন নিয়ে তাঁরা এর যে পরিমাপ জানিয়েছেন, তা একেবারেই কাছাকাছি বলে তাঁরা দাবী করেছেন। পরীক্ষায় সেগুলো প্রাকৃতিক ও বিশুদ্ধ হীরক বলে প্রমাণিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে যে পরিমাপ রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ মূল হীরকটির ওজন আনুঃ ২৪ থেকে ২৬ ক্যারেট। পার্শ্ববর্তী হীরকগুলোর প্রতিটার ওজন আনুঃ ৪.৫০ থেকে ৫.২৫ ক্যারেট। অতএব, সর্বমোট ১১টি হীরকের ওজন ৭২ থেকে ৭৬ ক্যারেট।[২৬৯]

(গ) দরিয়া-ই-নূরের মূল্যঃ দুর্লভ বস্তু হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মনিপাথর মূল্যায়নের জন্য কোন নির্ধারিত বিধি-বিধান অথবা মানদন্ড নেই। সম্রাট হুমায়ুনের পলায়নকালে মারওয়ারের রাজা মালদেব কোহিনুর ক্রয়ের প্রস্তাব দিলে সম্রাট নাকি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'এটি ক্রয় বিক্রয় হয়না অস্ত্র বলেই জয় করা যায়'।[২৭০] তবে একথা সত্য যে, মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এদের তেমন কোন উপযোগিতা নেই। বরং শৌর্য বীর্য্য, গৌরব ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে লোকেরা এগুলো ব্যবহার করে থাকে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা মানুষকে যেসব প্রতিযোগিতায় সম্পৃক্ত করেছে তন্মধ্যে মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য পাথর সংগ্রহ একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলা যেতে পারে। এদিক দিয়ে দামী হীরক সংগ্রহ করা বিশেষভাবে উপযোগী। কারণ দ্রব্যটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পদার্থ এবং সেই সাথে আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের অধিকারী।[২৭১]

হীরক সাধারণতঃ খনিতে পাওয়া যায়। তবে খনিতে প্রাপ্ত হীরাগুলোর প্রায় সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা যদ্বারা সাধারণত হার, আংটি ইত্যাদি অলংকার বানানো হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের হীরক পাওয়া সত্যই বড় ভাগ্যের ব্যাপার। বড় আকারের হীরাকে তাই মানিক্যও বলা হয়ে থাকে। রাজা-বাদশাহগণ অনেক সময় উপঢৌকন হিসেবে মণি-মানিক্য বিনিময় করতেন। তবে কারো কাছে কোন বিখ্যাত হীরক থাকলে তিনি কখনো সেটা হাতছাড়া করতে চাইতেন না। কারণ সেটা ছিল তার শৌর্যবীর্যের প্রতীক। এজন্যই আমরা জগদ্বিখ্যাত কোহিনুরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, ভীষণ রকমের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া সেটা প্রধানত হাতবদল হয়নি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাপ্ত ঐসব মূল্যবান

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যাদির উপর রাষ্ট্রপ্রধানের মালিকানা রহিত হয়েছে। বর্তমানে সেগুলো জনগণের সম্পদরূপে জাদুঘরে প্রদর্শিত হয় কিংবা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষিত থাকে। ব্যক্তি মালিকানায় থাকা দু'একটি অবশ্য প্রকাশ্য নিলামে হাত বদলও হয়ে থাকে। তবে এখনো লক্ষ- কোটি টাকা এগুলোর বিনিময় মাধ্যম হওয়াতে বুঝা যায় এ জাতীয় দ্রব্যাদির কদর ও মূল্যমান কমতো নাই বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৭২]

দরিয়া-ই-নূরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, সপ্তদশ শতকে (সম্ভবত) এটা অন্ধ্র প্রদেশের মারাঠা রাজার নিকট থেকে ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার বিনিময়ে হায়দারাবাদের নওয়াবের পূর্ব পুরুষ লাভ করেন।[২৭৩] তখন বাংলাদেশে টাকায় আটমণ চাল পাওয়া যেত। এরপর বহুদিন কেটে গেছে। মানুষের জীবন ধারণের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদির দামও যেমন বেড়েছে, তদ্রুপ দরিয়া-ই-নূরের মূল্যও বাড়ার কথা। এখন সেই যুগের চালের মূল্যের অনুপাতে বর্তমান কালের চালের মূল্যদিয়ে মনিটির মূল্য ধার্য্য করতে চাইলে সেটির মূল্য নিম্নরূপে ধার্য করা যেতে পারে। যথা- তখন ১ টাকায় পাওয়া যেত ৮ মণ চাল, আর এখন ১মণ চালের মূল্য গড়ে ৫০০ টাকা। অতএব, বর্তমানে ৮ মণ চালের দাম (৮ X ৫০০) = ৪,০০০/- টাকা। অর্থাৎ চালের মূল্যমানে তখনকার ১ টাকার সমান এখনকার ৪,০০০/- টাকা। তাহলে সে অনুযায়ী বর্তমান টাকায় দরিয়া-ই-নূরের মূল্য দাঁড়াচ্ছে (১,৩০,০০০ X ৪,০০০) = ৫২,০০,০০,০০০/- (বায়ান্ন কোটি টাকা)। এতো গেলো এটার বস্তুগত মূল্য। এছাড়া এর আবার প্রত্নমূল্যও রয়েছে প্রচুর।

তবে ১৮৪৯ খ্রীঃ ব্রিটিশদের অধিকারে আসার পর থেকে দরিয়া-ই-নূরের গুণগত মান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠানো হয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে এর মূল্যের তারতম্যও দেখা যায়। ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবের মহারাজা দিলীপ সিংহের কোষাগার থেকে বলপূর্বক অধিগ্রহণকালে ব্রিটিশগণ এর মূল্য ধরেছিল ৬৩ হাজার টাকা।[২৭৫] ১৯০৮ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ যখন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তখন এর মূল্য ধরা হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা।[২৭৬] এছাড়া ১৯৭৪ খ্রীঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এটাকে সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। সেসময় ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশে ... সংস্কৃতধর্মী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি এর মূল্য ধার্য করেছিল ৫ লক্ষ টাকা।[২৭৭]

(ঘ) ইতি...

...হিনুরের ন্যায় দরিয়া-ই-নূরের প্রাপ্তিস্থান এবং আদি ইতিহাস যথাযথরূপে জানা যায়নি। কোহিনুর অন্ধ্র ... ষ্ণানদীর তীরে কোল্লুর খনিতে পাওয়া যায় বলে পন্ডিতেরা ধারণা করেন।[২৭৮] অপরদিকে বর্তমানে ইরা... মালিকানায় দরিয়া-ই-নূর নামে ১৮৫ ক্যারেট ওজনের আরেকটি হীরক রয়েছে। সেটাও অন্ধ্র প্রদেশের গোল... পাওয়া গিয়েছিল। বলা হয় যে, ফরাসী অলংকার ব্যবসায়ী মিঃ ট্যাভেরনিয়র ১৬৪২ খ্রীঃ ভারতে এসে ... া ডাইমন্ড' দেখেছিলেন এটাই (ইরানের) হলো সেই হীরক খন্ড।[২৭৯] পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৫১ তে উক্ত হীরকটির ... লা।[২৮০]

ঢাকার ... দরিয়া-ই-নূর হীরক খন্ডটিও দক্ষিণ ভারতের খনিতে প্রাপ্ত বলা যেতে পারে। এর বস্তুগত বৈশিষ্ট্য এবং ... মারাঠা রাজার অধিকারে থাকার বিষয়টি এই মতের সমর্থন যোগায়। দরিয়া-ই-নূরের আকৃতি, প্রকৃতি, ইতিহা... নিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেরা মণি-মুক্তা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানী যা বলেছেন, ... নিম্নে দেয়া হলো ঃ "সর্বপ্রকার অবিশুদ্ধতা থেকে মুক্ত ও দীপ্তিমান, বাংলার বৃহত্তম হীরক খন্ড দরিয়া-ই-নূর ... ডাইমন্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। একটি বাজুবন্দের আকার নির্মিত। এটি বহুকাল ধরে মারাঠা রাজের অধিকারে থাক... ,০০০/- টাকার বিনিময়ে হায়দারাবাদের নওয়াব সুরাজুল মূলকের পূর্ব পুরুষের হাতে আসে। বিভিন্ন হাত ঘু... ।টি পাঞ্জাবের শিখ মহারাজা রণজিৎ সিংহের হাতে পৌঁছে এবং তাঁর বংশধর শেরসিং ও নেহাল সিংহের হাতে ... ংল্যান্ডের মহারাণীর সম্মানে আয়োজিত মহামেলায় কোহিনুরের সাথে প্রদর্শনের জন্য ১৮৫০ সালে এটাকে ... না হয়। অকৃত্রিমতা, আকর্ষনীয় উজ্জ্বল্য ও বৃহৎ পৃষ্ঠতলের জন্য মণি পাথরটি অসাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক মূল্য পায় এবং অভিজাত পুঁজিপতি ও রাজপুরুষদের নিকট খুবই আদরনীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার ১৮৫২ খ্রীঃ এটাকে নিলামে উঠালে ঢাকার ভাগ্যবান জমিদার খাজা আলীমুল্লাহ সেটা ক্রয় করেন।"[২৮১]

হ্যামিল্টন কোম্পানী অন্যত্র বলেছেন, 'বাজুবন্দটি ভারতীয় বিশুদ্ধ টেবিল হীরকের তৈরী। কেন্দ্রীয় পাথরটির নাম দরিয়া-ই-নূর অথবা আলোর সাগর। এটা জগদ্বিখ্যাত হীরকগুলোর অন্যতম এবং এর ইতিহাস কোহিনুরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এটা উজ্জ্বল ও দীপ্তিতে পরিপূর্ণ। আদিতে এটা পারস্যের বাদশাহের অধিকারে ছিল। পরে এটি রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। পাঞ্জাব যুদ্ধের পর সেটা ব্রিটিশ সরকারের হাতে আসে এবং তাঁদের নিকট থেকে ঢাকার নওয়াবের পূর্বপুরুষ ক্রয় করেন।'[২৮২]

কিভাবে আলোচনাধীন দরিয়া-ই-নূর পারস্যের বাদশাহের হস্তগত হয়েছিল সে বিষয়ে ইতিহাস নিরব। তবে কোহিনুরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৭৩৯ খ্রীঃ নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনকালে ময়ুর সিংহাসন, কোহিনুর প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদি পারস্যে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আহমদ শাহ দূররানী এটা লাভ করেন। আহমদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদ জোর করে ক্ষমতা দখল করলে জ্যেষ্ঠপুত্র শাহসুজা কোহিনুরসহ মূল্যবান সম্পদাদি নিয়ে পালিয়ে কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর জয় করে শাহসুজার নিকট থেকে ১৮১৩ খ্রীঃ ১ জুন কোহিনুর হস্তগত করেন।[২৮৩] ঐ সময়ই রণজিৎ সিংহ শাহসুজার নিকট থেকে আলোচনাধীন দরিয়া-ই-নূর হীরকটিও লাভ করেন।[২৮৪] অতএব, ধারণা করা যায় হায়দারাবাদ থেকে কোন এক সময় মনিটি মোগল বাদশাহের রাজকোষে আসে এবং নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন কালে সেটা পারস্যে নিয়ে যান।

মারাঠা রাজ কিংবা হায়দারাবাদের নওয়াবের অধিকারে থাকাকালে হীরকটির কোন নামকরণ হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। মোগল বাদশাদের কোষাগারে রক্ষিত হীরকগুলোর মধ্যে দরিয়া-ই-নূর নামে কোন হীরকের কথা জানা যায় না। অবশ্য মোগল আমলে কোহিনুরও উক্ত নামে পরিচিত ছিল না। মোগল বাদশাহগণ এদেরকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত, বর্ণনা ও মূল্যায়ন করলেও এমন কোন নামকরণ করেননি যা পরবর্তীকালে এত জনপ্রিয় হয়েছে। দিল্লী থেকে পারস্যে নিয়ে বাদশাহ নাদিরশাহ মোগল মণির নামকরণ করেন কোহিনুর বা আলোর পাহাড়। তাই ধারণা করা যায়, পারস্যে থাকাকালেই আলোচনাধীন হীরকটির নামকরণ করা হয়েছিল।[২৮৫]

স্টীফেন হাওয়ার্থ তাঁর গ্রন্থে পারস্য বাদশাহের রাজকোষে থাকাকালে আলোচনাধীন দরিয়া-ই-নূরের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। উক্ত ছবি থেকে বুঝা যায়, হীরকটির বর্তমান তথা বাজুবন্দের রূপটি তখনো একই রকম ছিল। পরিশিষ্ট চিত্র নং- ৫২-এ উক্ত আলোকচিত্র দেয়া হলো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, মহারাজা রণজিৎ সিংহ কোহিনুরের দু'দিকে দুটি বৃহদাকার হীরক যুক্ত করে সেটাকে সুন্দর একটি বাজুবন্দের রূপ দিয়ে ব্যবহার করতেন। পরিশিষ্ট চিত্র নং- ৫৩-এ উক্ত বাজুবন্দের চিত্র দেয়া হলো।[২৮৬]

মহারাজা রণজিৎ সিংহের হাতে আসার পর থেকে কোহিনুরের ন্যায় দরিয়া-ই-নূরেরও ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী শের সিং এবং নেহাল সিংহের হাত হয়ে শেষ পর্যন্ত হীরকটি দিলীপ সিংহের অধিকারে আসে। ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব যুদ্ধের পর নাবালক মহারাজা দিলীপ সিংহ ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁদের নিকট ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্য কোহিনুর সমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৮৫০ সালে ৩ জুলাই কোহিনুর মহারাণীর হাতে পৌঁছে। মেসার্স অসলার কর্তৃক আয়োজিত হাইড পার্কের মহামেলায় সেটা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।[২৮৭]

এদিকে কোম্পানীর প্রশাসন লাহোর দূর্গে মহারাজ দিলীপ সিংহের রাজকোষে রক্ষিত জুয়েলারী এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ অধিগ্রহণ করে।[২৮৮] এগুলোর মধ্যে আলোচনাধীন দরিয়া-ই-নূরও ছিল। ব্রিটিশ সরকার ডঃ লগিন সাহেবকে ১৮৪৯ সালের ৭মে ঐ সব দ্রব্যাদির পূর্ণাংগ তালিকা তৈরীর কাজে লাগান। ডঃ লগিন লাহোর দূর্গের জুয়েলারীর

Dhaka University Institutional Repository

যে মূল্য নির্ধারণ করেন তা ছিল মোট ৩৭,১৫,৩০২ রূপী। কিন্তু এর মধ্যে কোহিনুরের মূল্য ধরা হয়নি। কারণ ডঃ লগিনের মতে সেটা ছিল অমূল্য রতন। তবে তিনি উক্ত তালিকায় দরিয়া-ই-নূরের মূল্য ধরেছিলেন ৬৩,০০০/- টাকা।[২৮৯]

১৮৫০ সালে ২ সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ডালহৌসী উক্ত তালিকা থেকে দরিয়া-ই-নূর হীরকসহ কিছু সুন্দর অলংকার হাইড পার্কের মহামেলায় পাঠানোর জন্য বাছাই করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সিন্ধুনদী পথে বোম্বে পাঠানোর জন্য বলা হয়। ১৮৫০ সালের ১৪ নভেম্বর বড়লাট একটি পত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টর'কে অলংকারগুলোর প্রেরণ যাত্রা শুরু করতে বলেন। সেই সাথে তিনি উপদেশ দেন, ঐগুলো বিক্রি করতে হলে ভারতেই ভাল মূল্য পাওয়া যাবে। ১৮৫০ সালে ১৭ ডিসেম্বর দরিয়া-ই-নূর লন্ডনের উদ্দেশ্যে বোম্বে বন্দর ত্যাগ করে।[২৯০] হাইড পার্কের মহামেলায় প্রদর্শিত বিশিষ্ট দ্রব্যাদির মূল্য যাচাই করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। ঐ সময় কোহিনুরের মূল্য স্থির হয়েছিল ১৪ লক্ষ টাকা।[২৯১] কিন্তু দরিয়া-ই-নূরের মূল্য ধার্য্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। ইতোমধ্যে ১৮৫১ খ্রীঃ প্রথমদিকেই প্রশ্ন উঠে যে লর্ড ডালহৌসি এবং মহারাজ দীলিপ সিংহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী শিখ দরবারী সম্পদের উপর ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ করা বৈধ হয়নি। এর ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাজেয়াপ্ত করা ঐসব দ্রব্যাদি বোর্ড অব ডাইরেক্টরের হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৯২] এদিকে ভারত সরকারের পক্ষে মিঃ জন শোফার্ড ইংল্যান্ডে প্রেরিত জুয়েলারী গুলোর তালিকা উপস্থাপন করে বলেন যে, ঐগুলো মহারানীর জন্য উপহার স্বরূপ নয় বরং সেগুলো মহামেলায় প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভারতে সেগুলোর জন্য ভাল দাম পাওয়া যাবে বিধায় সেগুলো এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।[২৯৩] এমতাবস্থায় কোহিনুর ও বড় মুক্তামালা ইত্যাদি কয়েকটি বিশিষ্ট জুয়েলারী বাদে দরিয়া-ই-নূরসহ ইংল্যান্ডের মহামেলায় প্রেরিত প্রায় সব জুয়েলারী ফেরত আসে। ১৮৫২ সালের ৭ জানুয়ারী বোর্ড অব ডাইরেক্টর ঐগুলো ভারতে পাঠায়। জুয়েলারীগুলো সংগ্রহ এবং এদের ঐতিহাসিক তথ্যাদি উদ্ধারের জন্য মহারাণী সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে দরিয়া-ই-নূর কোথায় জমা থাকবে তিনি তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।[২৯৪]

জুয়েলারীগুলো ভারতে ফেরত আসার পর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কলকাতার হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানী সেগুলো ১৮৫২ সালের নভেম্বর মাসে নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় দরিয়া-ই-নূর হীরকটি ঢাকার নওয়াব খাজা আব্দুল গণি ৭৫,০০০/- টাকায় (৭,৫০০ পাউন্ড) ক্রয় করেন।[২৯৫] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজের দরুণ ঢাকার নওয়াবদের দেশে বিদেশে সুখ্যাতি ছিল। দরিয়া-ই-নূরের ন্যায় একটি প্রত্নগুরুত্ব সম্পন্ন ও মূল্যবান হীরকের মালিক হবার কারণে বাংলাদেশে তাঁদের আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। তৎকালে ব্রিটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ঢাকায় এসে দরিয়া-ই-নূর প্রত্যক্ষ করতেন। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন ১৮৮৭ সালের ৬ জানুয়ারী সস্ত্রীক কলকাতায় নওয়াবদের বালীগঞ্জের প্রাসাদে গিয়ে আগ্রহ ভরে হীরকটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লেডী ডাফরিন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, নওয়াব সাহেব আমাদেরকে তাঁর কিছু জুয়েলারী দেখালেন, সেগুলোর মধ্যে কোহিনুরের বোন হিসেবে পরিচিত দরিয়া-ই-নূরও ছিল।[২৯৬]

দরিয়া-ই-নূর হীরকটি ঢাকার নওয়াবগণ সাধারণত আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিধানকালে বাজুবন্দ হিসেবে ব্যবহার করতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায়, ১৮৯২ সালের ৭ জানুয়ারী তিনি কলকাতায় এক নৈশভোজ সভায় যোগদান কালে প্রাচ্য দরবারী পোশাকের সাথে বাহুতে দরিয়া-ই-নূর বাজুবন্দটি পরেছিলেন। এছাড়া ঐ সময় তাঁর গলায় ছিল মোতির মালা এবং ফ্রেঞ্চষ্টার, মাথায় রুমী টুপিতে হীরের তারা লাগানো এবং কোমরবন্দের সাথে ছিল হীরকখচিত তরবারি।[২৯৭] আগেই উল্লেখিত হয়েছে, প্রখ্যাত জুয়েলারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীকে দিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর সংগ্রহে থাকা উল্লেখযোগ্য ১৪টি অলংকারের বর্ণনাও ছবি দিয়ে একটি এ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত এ্যালবামের প্রথম ক্রমিকেই দরিয়া-ই-নূরের বর্ণনা এবং এর বাস্তব পরিমাপে একটি রঙিন ছবি ছাপা হয়েছিল।[২৯৮] নওয়াব আহসানুল্লাহর জীবনকাল পর্যন্ত ঢাকার নওয়াবদের জমিদারী যেমন অটুট ছিল তেমনি তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

অলংকারাদিও অটুট ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে অব্যবস্থাপনার কারণে জমিদারির আয় কমে গেলে প্রথমে তিনি এস্টেটের হাতিঘোড়া ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। তাতেও না কুলালে তিনি ঋণ করা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখার সময় দরিয়া-ই-নূরের মূল্য ধরা হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা।[২৯৯] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি দরিয়া-ই-নূর বিক্রি করে দিতে মনস্থ করেন। এদেশে ভাল দাম না পাওয়ায় ১৯১১ খ্রীঃ হ্যামিলটন এন্ড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে হীরকটিকে আবার ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। কিন্তু ইউরোপেও ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় পুনরায় সেটা ভারতে ফেরত আসে। ইংরেজ বিশেষজ্ঞগণ নিম্নমানের বলায় ঐ সময় এর মূল্য ১৫০০ পাউন্ডের অধিক হয়নি।[৩০০]

হীরকটি কলকাতায় হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর হেফাজতে থাকাকালে ১৯১২ সালে ৮ জানুঃ ইংল্যান্ডের রাজা ৫ম জর্জ ও রাণী মেরী কলকাতায় ভ্রমণকালে সেটা পরিদর্শন করেন। ব্রিটিশ রাজ দরিয়া-ই-নূর সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলেন। তিনি ঐ পরিদর্শনকালে বলেছিলেন, 'এই হীরকটা কোহিনুরে সাথে ইংল্যান্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মহারাণী তখন সেটা পছন্দ না করায় ফেরত আনা হয়।' ব্রিটিশ রাজ হীরকটা সংগ্রহ করতে আগ্রহ না দেখালেও তিনি সেটার অপরিসীম প্রত্নমূল্যের কথা উল্লেখ করেন এবং সেটা জাদুঘরে সংরক্ষণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন।[৩০১]

নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর দরিয়া-ই-নূর এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের দায়িত্বে চলে যায়[৩০২] এবং সেটা বহুদিন যাবৎ কলকাতায় হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর হেফাজতে রাখা হয়। হীরকটি হেফাজত করার ফি বাবদ নওয়াব এস্টেট থেকে উক্ত কোম্পানীকে প্রতি বছর ২৫০ টাকা করে দিতে হতো।[৩০৩] দরিয়া-ই-নূরকে বহুবার বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু হীরকটি ক্রেতাদের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারায় তা সফলকাম হয়নি। ১৯৩৬ সালে খাজা সদরুদ্দিন জনৈক জুয়েলারী ব্যবসায়ীকে কলকাতায় রক্ষিত দরিয়া-ই-নূরটি দেখান। কিন্তু তিনি এর মূল্য ৫ বা ৭ হাজার টাকার বেশী হবেনা বলে জানান। এইপ্রেক্ষিতে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালের ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত নওয়াব এস্টেটের স্বত্বাধিকারীদের একসভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় হীরকটি অন্যূন ৭ হাজার টাকায় নওয়াব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আগ্রহী ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া ঐ সভায় হীরকটি কলকাতা থেকে ঢাকায় এনে আহসান মঞ্জিলের স্ট্রং রুমে রাখার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।[৩০৪] কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায় উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হয়নি।

১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাংগা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে ভারত ভেংগে পাকিস্তান সৃষ্টির উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানী দরিয়া-ই-নূরের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাঁরা ঢাকা নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারকে ১৫ মার্চ ১৯৪৭ একটি পত্র দ্বারা হীরকটি তাঁদের হেফাজত থেকে ফেরত নিতে অনুরোধ করেন।[৩০৫] এমতাবস্থায় সরকারের রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে নওয়াব পরিবারের দু'জন সদস্য এবং এস্টেটের চীফ ম্যানেজারকে হীরকটি কলকাতা থেকে ঢাকায় এনে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ঢাকাস্থ শাখায় রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়। নওয়াব পরিবারের পক্ষ থেকে নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ ও সৈয়দ আহমেদ রেজা এবং এস্টেটের পক্ষে মৌলভী বেলায়েত হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজার, কলকাতায় গিয়ে ২৯মে ১৯৪৮ খ্রীঃ হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর নিকট থেকে দরিয়া-ই-নূর গ্রহণ করেন এবং সেটা ঢাকায় নিয়ে আসেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খ্রীঃ দরিয়া-ই-নূর কাপড়ে মোড়ানো একটি ছোট লোহার বাক্সে ভরে সীল গালা করে উপরোক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ঢাকাস্থ শাখার হেফাজতে বুঝে দেয়া হয়। উক্ত বাক্সের চাবিটি চীফ ম্যানেজারের দায়িত্বে রাখা হয়।[৩০৬]

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা থেকে এভাবে পুনরায় ঢাকায় আসার পরেও দরিয়া-ই-নূরকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া কম হয়নি। কালক্রমে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাঁদের অনেকের মনেই পূর্বপুরুষের সংগৃহীত এই মূল্যবান মণিটি দেখার সাধ জেগেছে। অনেক সময় এর নিরাপত্তা ও অকৃত্রিমতার প্রতি সন্দিহান হয়েও এটা দেখা হয়েছে। এছাড়া বিক্রির ইচ্ছা কিংবা বস্তুগত মান নির্ণয়ে পরীক্ষার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এটাকে দেখেছেন। হিসেব করে দেখা গেছে ১৯৪৮ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত (১৯৯৫) চল্লিশেরও অধিকবার ব্যাঙ্কের লকার খুলে হীরকটিকে দেখা হয়েছে।[৩০৭]

১৯৫৯ সালে নওয়াব পরিবারের একটি গ্রুপ হীরকটিকে পাবলিক নিলামে বিক্রির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়।[৩০৮] কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন সেসময় একাজের বিরোধিতা করেন। তিনি হীরকটির অকৃত্রিমতার বিষয় নিয়ে বিতর্ক তুলে তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী জনাব এম, আজফরের নিকট ১১ মে, ১৯৫৯ তারিখে একটি পত্র দেন। ফলে হীরকটি আসল না নকল এই প্রশ্নের সুরাহা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উক্ত বিক্রয়ের উদ্যোগটি চাপা পড়ে যায়।[৩০৯]

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর ঢাকাস্থ ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া তাঁদের কার্যকলাপ গুটিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঐ ব্যাঙ্কের সব দায়-দায়িত্ব ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের উপর বর্তায়। উক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ১৪ জুলাই ১৯৬৬ খ্রীঃ এক পত্রে দরিয়া-ই-নূর সম্বলিত বাক্সটি তাঁদের হেফাজত থেকে নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারকে ফেরত নিয়ে যেতে বলেন।[৩১০] ১৯৬৬ সালের ২১ জুলাই দরিয়া-ই-নূর উক্ত ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান-এর সদরঘাট শাখার লকারে রাখা হয়। উক্ত ব্যাঙ্কের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলাদেশ আমলে সোনালী ব্যাঙ্ক আত্মপ্রকাশ করায় হীরকটি বর্তমানে সোনালী ব্যাঙ্ক সদরঘাট শাখার ভল্টে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেটা ব্যাঙ্কে রাখার রশিদ চীফ ম্যানেজারের কাছে রয়েছে।[৩১১] দরিয়া-ই-নূরকে ইতোমধ্যে বহুবার বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে। ষাটের দশকের শেষদিকে নওয়াব খাজা হাসান আসকারী জনৈক আমেরিকাবাসীকে বিক্রির উদ্দেশ্যে হীরকটি দেখান। কিন্তু তিনি এর গুণগত মান সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহ করে উপযুক্ত মূল্য দিতে চাননি। নওয়াব হাসান আসকারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমষ্টারডামের এন্টিওয়ার্প থেকে আগত একজন রত্ন বিশেষজ্ঞকে হীরকটি দেখানো হয়েছিল।[৩১২] কিন্তু তাঁর দেয়া মতামত সম্বলিত কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ হীরকটি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে দেশের খ্যাতনামা সংস্কৃতকর্মী ব্যক্তিদের নিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত একটি কমিটি এর মূল্য ধার্য্য করেছিল ৫ লক্ষ টাকা।[৩১৩] কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে সেটা তখন জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহ করা যায়নি। ১৯৮৮ সালে দরিয়া-ই-নূরের গুণগত মান যাচাই, মূল্যমান নির্ধারণ ও জাদুঘরে সংরক্ষণের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য, সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মন্ত্রী পরিষদ সচিবকে সভাপতি করে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বড় ধরনের কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[৩১৪] কিন্তু উক্ত কমিটি কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তবে এর আগে ১৯৮৫ সালে নওয়াব পরিবারের 'বিই' প্রপার্টির মালিকদের পক্ষ থেকে হীরকটির বিশুদ্ধতা যাঁচাই ও পরিমাপ গ্রহণের একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য উটাহ জেমোলজিক্যাল সার্ভিস বনানী, ঢাকা- কে দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁদের বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে হীরকটি অকৃত্রিম পেয়েছিল একথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষার ফলে ইতোপূর্বে হীরকটির বিশুদ্ধতা নিয়ে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়েছে বলা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দরিয়া-ই-নূর শুধু মূল্যবান মণিপাথরই নয় সেটা একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ। ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের ইতিহাসের বহু সংখ্যক মূল্যবান অধ্যায়ের নীরব স্বাক্ষী দরিয়া-ই-নূর তাই প্রকারান্তরে একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। সেজন্যই দেশ ও জাতীর গৌরবের এই স্বাক্ষীকে জাতীয় মর্যাদায় সংরক্ষণ করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। ১৯২০ সালে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা খিলাফত কমিটির সভায় ব্রিটিশ বিরোধী কথা বলার অভিযোগ উঠলে নওয়াব সাহেব বলেছিলেন, বক্তৃতাগুলো বাংলায় হওয়ায় এবং ঐ ভাষায় তাঁর ভাল জ্ঞান না থাকায় তাঁর অজ্ঞাতে এরূপ হতে পারে। ঢাকা প্রকাশ, ৯ মে, ১৯২০।

২। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহ ফার্সীতে সুপন্ডিত ছিলেন। ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ২ খন্ড পৃঃ ৯৮। মীর মশাররফ হোসেনের পিতা মোটেও বাংলা জানতেন না এবং ফার্সীতেই স্বাক্ষর করতেন।

৩। আব্দুস সোবহান, আরবী ফার্সী উর্দু সাহিত্য। বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত ৩য় খন্ড পৃঃ ৩৯২।

৪। ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ২ খন্ড পৃঃ-৯৭-৯৯ ও ১৩৫

৫। আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

৬। এ. আর মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি এন্ড দি মসলিমস ইন বেংগল, ২য় সংস্করণ ১৯৭৭ পৃঃ ১৭৭-৭৮।*

৭। আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩-১৪।

৮-৯। আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭-৬৮

১০। এ, আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি,* প্রাগুক্ত, ২য় সংস্করণ পৃঃ ২৩১।

১১। আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য,* পৃঃ ৬৫

১২। ঐ, *ফার্সী সাহিত্য,* পৃঃ ৬৮।

১৩। আঃ সোবহান, আরবী ফার্সী উর্দু সাহিত্য। বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত ৩য় খন্ড পৃঃ ৩৮৮।

১৪। আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য,* পৃঃ ৬১-৬২

১৫। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্মভুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৭৬ খ্রীঃ কোরআনের বংগানুবাদ করেন। এর পরে টাংগাইলের মৌঃ নঈমুদ্দিন বাংলায় কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ করতে শুরু করলে মোল্লা সমাজে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং ফতোয়াবৃস্টি হতে থাকে। মাসিক মোহম্মাদী, আশ্বিন ১৩৩৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ২৮১ -৮২। ১৯০৫ সালে বংগবিভাগের পর পূর্ববংগের মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষার জোয়ার আসে, সেক্ষেত্রেও উর্দু সেখানোর জন্য কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উর্দু প্রবর্তন করা হয়। (আঃ রহিম, *হিস্টরী অব দি ইউনিঃ অব ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩)

১৬। আঃ সোবহান, আরবী ফার্সী উর্দু সাহিত্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত ৩য় খন্ড পৃঃ ৪০৩।

১৭। তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা,* প্রাগুক্ত বংগানুবদ, পৃঃ ২৩১-৩৪ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *সালাসা গাসসালা* (উর্দু পান্ডুলিপি) এবং ইকবাল আজিম, *মাশরিখি বাঙ্গালমে উর্দু, ঢাকা ১৯৫৪* এবং আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ ফার্সী সাহিত্য ও ঢাকার কয়েক জন মুসলিম সুধী, প্রাগুক্ত, বিস্তারিত দ্রঃ

১৭(ক) তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত এ্যাপেনডিক্স পৃঃ ৩২৪ এবং আবুয যোহ নুর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬।

১৮। কেদার নাথ রায়, *ঢাকার বিবরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪ এবং মুনতাসীর মামুন, ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান, ১ম প্রকাশ ১৯৯১ পৃঃ ৭১-৭২।

১৯। ঐ অনুষ্ঠানে একজন বিখ্যাত গায়িকার ঘরনা তালে পরিবেশিত গজলের রচনা কথা নিয়ে অনেক যুক্তি তর্ক ও রসালাপ হয়েছিল। (সাব্বির আহমেদ, *মুশাইরা ইন ঢাকা, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪১।)*

২০। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫, পৃঃ ৫২১।

২১। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২৩৩।

২২। আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮ এবং *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪৯।

২৩। উক্ত গ্রন্থাগারে বইটির ডাক সংখ্যা -এইচ, আর, ৯৫৯ (৬৮২১১)

২৪। গ্রন্থাটির ডাক সংখ্যা, এইচ, আর, -৬

২৫। মোঃ আব্দুল্লাহ, *উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী,* ১ম সংস্করণ ১৯৮৪ পৃঃ ১৪ এবং ১০৩-৫৩

২৫(ক) এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ, *ডেসক্রিপটিব ক্যাটালগ,* প্রাগুক্ত ভল-২, পৃঃ ৪০৮ এবং ৪৫৪।

২৬। ছয় পাতার পত্রিকাটিতে প্রথম সংখ্যায় (১৫ ফেব্রুঃ ১৮৮৪) তারিখে খান্দানের কিছু অংশ এবং আজগর নকশবন্দীর তারিখে আমেরিকার একটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। দেখুন এ.বি, এম, হবিবুল্লাহ, ডেসক্রিপটিব ক্যাটালগ, প্রাগুক্ত ভল-২ পৃঃ ৪৬৯

২৭। হাকিম হাঃ রাহমান, *পাঁচাস বরস,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৭৪-৭৫।

২৮। মোঃ রেজাউল করিম, শাহীনের দিন লিপি 'ঐতিহ্য' বাঃ জাতীয় জাদুঘর অফিসার সমিতির পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯৬ পৃঃ ২১-৩০।

২৯। জাদুঘরের ডাইরীগুলোর সংগ্রহ নং আ-৯৩. ২৭৩-২৭৯। এছাড়া আরো কয়েকটি ডাইরী খাজা হালিম ও খাজা লতিফুল্লাহর নিকট আছে।

৩০। নওয়াব এস্টেটের পুরানো অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে জীর্ণ কাগজপত্রের সাথে এগুলো সংগৃহীত হয়েছিল।

৩১। আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি পৃঃ ৯৮।

৩২। আয়শা খানম নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রথমা স্ত্রী আসমাতুন্নেসার কন্যা ছিলেন। গৃহ শিক্ষক কাজী কাইউমের নিকট আয়শা খানম ৯ মার্চ ১৯০৪ সালে কোরান শরীফ খতম করেন। এতদুপলক্ষে ঐ দিন নওয়াব বাড়ীর সবাইকে মিস্টি মুখ করনো হয়। আয়শা খানমের একমাত্র সন্তান সুফিয়া বানু ১৯০৮ সালের ৮ এপ্রিল জন্মেন। সুফিয়ার ৩/৪ বছর বয়স কালে আয়শা খানম ইন্তেকাল করেন। কাজী

Dhaka University Institutional Repository

কাইউমের ডাইরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন-অনুপম হায়াত, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা,* ৩১ জুলাই ১৯৯১ পৃঃ ৫২। উল্লেখ্য, কফিলুদ্দিন চৌধুরী নওয়াব সলিমুল্লাহর মামা হতেন। নওয়াব সাহেব নিজেও ৯ মার্চ ১৯০৬ উক্ত মামার এক কন্যাকে বিয়ে করেন। নওয়াবের উক্ত বিয়ের অনুষ্ঠানে বাজী ফুটানোর দুর্ঘটনায় ৬জন নিহত ও বহু আহত হয়। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ মার্চ ১৯০৬ পৃঃ ৩।

৩৩। মুস্তফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৭ পৃঃ ৪৩১ এবং ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে ... প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ৪৫৫-৫৬

৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ৬ নভেঃ ১৯১০ পৃঃ ৫।

৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জুলাই ১৯১১ পৃঃ ৪।

৩৬। ইংরেজীতে লেখা উক্ত পত্রটি এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রয়েছে।

৩৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জুলাই ১৯১২ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, ১৯১১ খ্রীঃ ১১ ডিসেঃ অনুষ্ঠিত দিল্লীর রাজকীয় দরবার উপলক্ষে রচিত খাজা আফজালের একটি কাসিদা, জে. হোগরাথ রচিত-*গ্রেট ব্রিটেন ইন দি করোনেশন ইয়ার (লিডিং মেন অব দি এমপায়ার, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া) লন্ডন-১৯১৪* শীর্ষক গ্রন্থের পৃঃ ১৮৪-৮৭ তে ছাপা হয়েছিল।

৩৮। আব্দুর রহিম সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *আব্দুল গণিও আহঃ* পৃঃ ২৩ ।

৩৯। সাবা বলেন, হাফিজুল্লাহর ভাই আঃ আজিম কানপুরে বিয়ে করেন। তাঁর নববধুকে সোয়ারী ঘাটে নামানোর সময় বাইজীরা অভ্যর্থনা করে এবং সেটাই ছিল খাজা পরিবারে বাইজীর প্রথম আগমন। সাবা, তাওয়ারিখ পৃঃ ৪২-৪৩ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* পৃঃ ২৮।

৪০। নওয়াব আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬০-৬১ থেকে উদ্ধৃত, আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহাসানুল্লাহ,* পৃঃ ৫০।

৪১। হাকিম হাঃ রহঃ, *পাঁচাস বরস,* প্রাগুক্ত রেজাউল করিমের বংগানুবাদ পৃঃ ৮৭-৮৮। উল্লেখ্য, আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্বদিকে বুড়িগংগার তীরে আঃ গণির চা-খানাটি অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে নওয়াবদের জৌলুসে ভাটা পড়লে চা-খানাটি নওয়াবদের পারিবারিক প্রেস ভবনে পরিণত করা হয়।

৪২। সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৫।

৪৩। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২৭৭।

৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ফেব্রুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৭।

৪৫। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৫-৫৬ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহাসানুল্লাহ,* পৃঃ ৫০।

৪৬। ঐ কাজে নওয়াবের দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ ১মে ১৮৭৬ পৃঃ ৮৬-৮৭ এবং আঃ গফুর নাসসাখের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহাসানুল্লাহ,* পৃঃ ৫০ ও ১০০।

৪৭। সাব্বির আহমেদ, *ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪১।

৪৮। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে আহসান মঞ্জিল প্রাংগনে নওয়াব হাবিবুল্লাহ এরূপ হোলিগানের অনুষ্ঠান করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২১ মার্চ ১৯২০ পৃঃ ৩।

৪৯। ঐ যুগে বাংলা ভাষায় কখনো হোলির গজল রচনা হতো না। হাকিম, *পাঁচাস, বরস,*-প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৭৬-৭৭।

৫০। আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭০-৭১ থেকে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৪৯

৫১। আবুয যোহা, নূর আহমদ, *উনিশ শতকে* ..পৃঃ ১৮।

৫২। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,*পৃঃ ৪৯।

৫৩। আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত উর্দু ডাইরী, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, ২০ মার্চ ১৮৮৩ দ্রঃ এবং ইংরেজীতে লেখা ডাইরী, (অপ্রকাশিত) তাং মার্চ ১৯, ২২ এপ্রিল ১৫,২২ সন ১৮৭৪ দ্রঃ

৫৪। আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৬।

৫৫। ১৮ মে ১৮৭৮ ঐ সংগীত বিদ্যালয়ে এক পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মে ১৮৭৮ পৃঃ ১২৮।

৫৬। নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর ৪ ভাগ্নের বিয়ে উপলক্ষে (১৮ ফেব্রু ১৮৯৯) আহসান মঞ্জিলে ব্যাপক নাচগানের আয়োজন করেন। এতে কলকাতা থেকে ৪ জন নামকরা বাইজী আনা হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৯, ২৩ ফেব্রু ১৮৯৯।

৫৭। বংগের ছোট লাট ১৮৮২ সালে আহসান মঞ্জিলে এলে তাঁর সম্মানে বল নাচের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ছোট লাটের আগমন উপলক্ষে ১৬ ফেব্রুঃ ১৮৮৫ খ্রীঃ রাত্রে নওয়াব বাড়ীতে নৃত্য-গীত হয়। (ঢাকা প্রকাশ, ৭ ও ২১ ফেব্রুঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৫২২ ও ৫৪২) ১৮৯৬ খ্রীঃ ৩০ জুলাই ছোট লাট ম্যাকেঞ্জী এলেও নওয়াব বাড়ীতে অনুরূপ আয়োজন হয়। (ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই এবং ২ আগস্ট ১৮৯৬)

৫৮। ডাফেরিন এন্ড আভা; *আওয়ার ভাইস রিগ্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৬ এব ৪০১।

৫৯। ঘোড় দৌড় উপলক্ষ্যে ৪ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ এবং ২০ ফেব্রুঃ ১৮৯২ আঃ মঞ্জিলে বলনাচ হয়। ঢাকা প্রঃ ১০ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ এবং ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯২। ৮ ডিসেঃ ১৮৯৮ সালেও অনুরূপ বলনাচ হয়। (ঢাঃ প্রঃ ১১ ডিসেঃ ১৮৯৮)

৬০। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত। তাং ৯,১১,১৩ জানুয়ারী ১৮৮৩ দ্রঃ থেকে উদ্ধৃত-আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* পৃঃ ১০৬-৭।

৬১। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুঃ ১৮৭৮, ১৮ ডিসেঃ ১৮৮১, ২০ ডিসেঃ ১৮৮৫, ২৫ ডিসেঃ ১৮৮৭, ৮ জানুঃ ১৮৮৮, ৯ ডিসেঃ ১৮৮৮, ৪ জানুঃ ১৮৯০।

৬২। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জানুঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৬।

৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ২ মার্চ ১৯০২, পৃঃ ৫।

৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ২১ মার্চ ১৯২০ পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ১৯২৬ পৃঃ ৩।
৬৬। ইকবাল আজিম, প্রাগুক্ত বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ২৩২-৩৬।
৬৭। মোঃ আঃ কাইউম এর প্রতিষ্ঠার সাল ১৮৬৫ বলেছেন (পূর্ববংগ রংগভূমি ও ঢাকার নাট্য চর্চার ধারা) উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১ম প্রকাশ, নভেঃ ১৯৯০ পৃঃ.৪৬-৪৭ এবং মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, জুন ১৯৭৯ পৃঃ ১০-১১ এবং ঢাকায় প্রথম, ঢাকা ১৯৯৫ পৃঃ ৪০।
৬৮। কাইউম, ঐ পৃঃ ৪৭ এবং মামুন, ঐ পৃঃ ১২ ও ৪২।
৬৯। কাইউম, ঐ পৃঃ ৫২ এবং মামুন, ঐ পৃঃ ৪২- ৪৪।
৭০। আঃ গফুর নাসসাখের আত্মজীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৫-৫৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০
৭১। উল্লেখ্য, পূর্ববংগ রংগভূমিতে দর্শনীর বিনিময়ে নাটকগুলো দেখানো হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১২ মার্চ ১৮৭৩ এবং মামুন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪, ৬০-৬৩।
৭২। ঢাকা প্রকাশ, ১০,১৭,২৪ আগস্ট ১৮৭৯ এবং মামুন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪-৭৪। তখন ভদ্র ঘরের মেয়ে অভিনয়ে আসতো না বলে ঐ অভিনেত্রীরা ছিল বারাংগনা মহিলা।
৭৩। মুর্তজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৭৬ পৃঃ ৯৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩
৭৪। ব্রেডলী বার্ট, *টুয়েলভমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৭।
৭৫। হাকিম, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৮।
৭৬। শিশির কুমার বসাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮ এবং আঃ কাইউম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩ । নওয়াবের আশ্রিতা হিসেবে উক্ত নাটক মঞ্চায়নে তারা নিশ্চয়ই নওয়াবের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছিল।
৭৭-৭৮। আঃ কাইউম প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫ এবং মামুন প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯।
৭৯। নওয়াবের বরফের কলটি সেখানে ১৮৮৯ সালের ফেব্রুঃ মাসে স্থাপিত হয়। ঢাকা প্রঃ ২৪ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৭।
৮০। হাকিম হাঃ রহমান, *সালাসা গাস্‌সালা* (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৬৭ (উর্দু অংশ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন- আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৮।
৮১। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৮-৩৯। ওয়াফির খাজা আব্দুর রহিমের নাতি জামাই ছিলেন।
৮২। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেঃ করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫।
৮৩। হাকিম, ঐ, পৃঃ ৭৫-৭৬। মীর্জা ওলিজান কমর ছিলেন নওয়াব আব্দুল গণির চাচাত বোনের ছেলে।
৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ১০ মার্চ ১৮৯৫ পৃঃ ৬ ।
৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ও ১৪ এপ্রিল ১৮৯৫ পৃঃ ৬ ও ৫
৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ মার্চ ১৮৯৫ পৃঃ ৭-৮।
৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ মার্চ ১৮৯৫ পৃঃ ৭-৮ । উল্লেখ্য, সেবার নওয়াব বাড়ীতে অভিনয় করার পর স্টার থিয়েটার কুমারটুলীর নাটক ঘরে এবং নারায়নগঞ্জে বেশ কিছুদিন ধরে অভিনয় করেছিল। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ মার্চ এবং ৫মে ১৮৯৫ খ্রীঃ।
৮৮। দি বেংগল টাইমস, ৩১ জানু ১৯০৩ এবং অনুপম হায়াত, *মেহের বানু খানম,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।
৮৯। সম্ভবত উক্ত প্রতিষ্ঠান ঐ দিন নওয়াব বাড়ীতেই নাটক দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। কাজী কাইউমের ডাইরী, (অপ্রকাশিত) ২৮ ফেব্রুঃ ১৯০৪ (খাজা হালিমের নিকট রক্ষিত) এবং অনুপম হায়াত, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ৩১ জানুঃ ১৯৯১ পৃঃ ৫২।
৯০। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জানুঃ ১৯০৯।
৯১। তারা নিজেরাই নাটক পরিচালনা করতেন। তবে অনেক সময় নাটকের পরিচালক বাইরে থেকে আনা হতো। এরূপ একজন ডাইরেক্টরের নাম ছিল মোঃ মোস্তফা। মিউজিকও বাইরে থেকে অনেক সময় ভাড়া করে আনা হতো। আবার পরিবারের কেউ কেউ মিউজিকে অংশ নিত। একবার কাদের সর্দার বাইরে থেকে একজন অভিনেত্রী এনে দিয়েছিলেন। তার নাম ছিল বিদ্যুৎ। উল্লেখ্য, উক্ত তথ্যগুলো খাজা লতিফুল্লাহ, পিতা-নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহ এবং খাজা আঃ হালিম, পিতা- আঃ গফুরের মৌখিক ভাষ্য (মার্চ ১৯৯৪) থেকে সংগৃহীত।
৯২। খাজা আলীমুল্লাহর বাস্তব চরিত্রও অনেকটা ভিলেনের মতই ছিল। তিনি অনেক সময় মাতাল এবং গুন্ডা স্বভাবের হয়ে যেতেন। এজন্য একবার ঢাকার কমিশনার ও সরকারের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে নওয়াব হাবিবুল্লাহকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তাঁকে কিছু দিনের জন্য নওয়াব সাহেব বাংলার বাইরে পাটনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর চরিত্র সংশোধনের জন্য। প্রাগুক্ত পুরানো নথি দ্রঃ।
৯৩। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ঢাকার টুটাফাটা কাগুজে নবাব, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা ১৯৭৮ ইং
৯৪। অনুপম হায়াত, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭ পৃঃ ১-৩।
৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ এপ্রিল ১৮৯৮।
৯৬-৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, ঐ সময় ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ন ২৫০ টাকা দিয়ে এপ্রিল মাসেই ২ দিনের জন্য নিজবাড়ী জয়দেবপুরে ঐ বায়োস্কোপ নিয়ে যান। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল ১৮৯৮ পৃঃ ৬। এছাড়া ১৯০০ সালের ১৫ এপ্রিল একই কোং ভাওয়ালের রাজবাড়ীতে পুনরায় সেটা দেখান। (অনুপম হায়াত, প্রাগুক্ত পৃঃ ২) ১৯০২ সালের ১২ মে জগনাথ কলেজে বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছিল। (ঢাকা প্রকাশ, ১১ মে, ১৯০২ পৃঃ ৪) তবে ঐ গুলোর সাথে নওয়াবের সম্পৃক্ততার কথা জানা যায় নি।
৯৮। খাজা শামছুল হকের ব্যক্তিগত ডাইরী, খাজা হালিমের কাছে রক্ষিত (অপ্রকাশিত, উর্দু) তারিখ ১৬-২২ ও ২৪ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ দ্রঃ
৯৯। ঢাকা প্রকাশ, ২ মার্চ ১৯১৯ পৃঃ ৩।
১০০। অনুপম হায়াত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯
১০১। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, অপ্রকাশিত (আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত) তাং ৬ এপ্রিল ১৮৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

১০২। নওয়াবকে অনুরোধ করে লেখা লেঃ গভর্নরের পত্র নিয়ে উক্ত জ্যোতিষি ঢাকায় এসেছিলেন। ঐ ব্যক্তিগত ডাইরী, ২৫ মার্চ ১৮৯৪।

১০৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জানুঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৬।

১০৩ (ক) সিদ্ধার্থ ঘোষের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অনুপম হায়াত, *মেহের বানু খানম,* ঢাকা ১৯৯৭ পৃঃ ২২

১০৪। ফ্রিৎজকাপ ছিলেন একজন জার্মান। ১৯১৬ সালে কাদের নামে জনৈক দরজি পাওনা টাকার দাবীতে তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকায় ৪র্থ মুনসেফ কোর্টে মামলা করে। (ঢাকা প্রকাশ, ১৪ মে ১৯১৬ পৃঃ ৩) ফ্রিৎজকাপ জার্মান হওয়ার কারণে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় দার্জিলিং-এ সস্ত্রীক আটক থাকেন। অথচ তার পুত্র ইংরেজদের পক্ষে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। (ঢাকা প্রকাশ, ৬ আগস্ট ১৯১৬) ঢাকায় ফ্রিৎজকাপের স্টুডিওর ঠিকানা ছিল-৮, ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা।

১০৫। উক্ত আলোকচিত্র গুলো লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। আহসান মঞ্জিল জাদুঘর সজ্জিত করার সময় সেখান থেকে চিত্রগুলোর যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে, তা এখন উক্ত জাদুঘরে রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে লেঃ গভঃ স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার আহসান মঞ্জিলে আগমন করলে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁকে অভ্যর্থনা করে উপস্থিত গণ্যমান্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ সময় ফিৎজকাপের তোলা একটি দুস্প্রাপ্য অথচ খুবই সুন্দর ছবি এখন খাজা মোঃ হালিমের নিকট রয়েছে।

১০৬। ১৯১১ খ্রীঃ ২১ আগস্ট তারিখে স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে নর্থব্রুক হলে আয়োজিত সভার ছবি তোলা বাবদ ফ্রিৎজকাপ ১৪-৯-১৯১১ তারিখে নওয়াবের নিকট যে ৫০ টাকার বিল পেশ করেছিলেন, সেটা এখনো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে।

১০৭। ঢাকা প্রকাশ, ২ আগস্ট ১৯০৮।

১০৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই ১৯১৪।

১০৯। তাঁর শিকার করা রয়েল বেংগল টাইগারের সাথে তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় তোলা একটি ছবি খাজা হালিমসহ নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্যদের অনেকেই দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন।

১১০। অনুপম হায়াত, বাংলাদেশের চলচিত্রের ইতিহাস, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯-১০ এবং খাজা লতিফুল্লার মৌখিক ভাষ্য(১৯৯৫) থেকে তথ্য সংগৃহীত।

১১১। খাজা আজমল ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন কৃতি হকি ও টেনিস খেলোয়াড় এবং বহুদিন ওয়ারী ক্লাব ও ঢাকা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি পাকিস্তান বেতারে ঘোষক হিসেবে চাকুরী নেন এবং অনেক বেতার নাটকে অংশ নেন। ১৯৪৪ সালে প্রথম উর্দু নাটকেও তিনি অভিনয় করেন। (অনুপম হায়াত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪)

১১২-১১৩। টুনটুন ছিলেন ঢাকার রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাসের কন্যা। *দি ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচী, ১ জানুঃ ১৯৯২ এবং ১ ফেঃ ১৯৯৩।*

১১৪। অনুপম হায়াত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬।

১১৫। খাজা লতিফুল্লাহর *অটোবায়োগ্রাফী, ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচী, ১ জানুঃ ১৯৯৪ পৃঃ ১৪*।

১১৬। নওয়াব পরিবারের খাজা মওদুদ ও খাজা শামসুল হকের ব্যক্তিগত ডাইরী (অপ্রকাশিত, উর্দু) খাজা হালিমের কাছে রক্ষিত।

১১৭। মুজাফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৩ পৃঃ ৫৩-৫৪

১১৮। সেই সংগে সৈয়দ এমদাদ আলীর লিখিত চিত্র পরিচিতিও ছাপা হয়। আব্দুল আজিজ আল আমান, নজরুল পরিক্রমা, দ্বিতীয় খন্ড কলকাতা, ১৩৭৬ বাংলা পৃঃ ২৫-২৬ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অনুপম হায়াত, দোলন চাপার হিন্দোল, খেয়াপারের তরণী উৎস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃঃ ৩।

১১৮।(ক)(খ) অনুপম হায়াত, *মেহের বানু খানম,* ঢাকা-১৯৯৭ পৃঃ ৫৮-৬০।

১১৯। খাজা মওদুদ ও খাজা শামসুল হকের ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু) এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৮ অক্টেবর ১৯২৫ পৃঃ ৩

১২০। ঐ ঐ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২৯-৩২।

১২১। বাহারিস্তান-ই-গাইবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন-এম. এ. রহিম, বাংলার সমাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, আসাদুজ্জামানের বংগানুবাদ, ২য় খন্ড, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ ১৯৫-৯৬।

১২২। এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬।

১২৩। চিত্রগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১২৪। তায়েশ বলেন, তবুও সেখানে (তাঁর আমলে) ঈদের জামাত ও ঈদের মেলা হতো। তায়েশ, *তওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ২০১।

১২৫ও১২৭। খাজা হালিম এবং নওয়াব পরিবারের অন্যান্য প্রবীন সদস্যদের মৌখিক ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য (১৯৯৬)

১২৬। শামসুজ্জামান খান,ঈদোৎসব ও তার রূপান্তর, ঈদ উৎসব, হাবিবউল আলম সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪ পৃঃ ৫৩।

১২৮। নূর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭-৬৮, উক্ত টুপি সাধারণ বেতের ধামা তৈরীর মত মোটা সুতাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটির সাথে আরেকটি সুতাদ্বারা গেঁথে দিয়ে তৈরী করা হয়। বুননের সময়ই এতে ফুল পাতা কিংবা জ্যামিতিক নকশা তৈরী করা হয়। এপদ্ধতিকে তারা ক্লা-বতুনের নকশা বলে থকে। এ ধরণের টুপি নওয়াব পরিবারে এ লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন।

১২৯। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭।

১৩০। ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫।

১৩১। নওয়াব পরিবারের কয়েকজন প্রবীন সদস্য এবং খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য(১৯৯৬) থেকে প্রাপ্ত ।

১৩২। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত পুরাতন দলিলের মধ্যে এরূপ রমজানে নিযুক্ত ইমামদের ভাতা দানের তালিকা রয়েছে।

১৩৩। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২।

১৩৪। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫। পাকিস্তান আমলে লায়ন সিনেমার মালিক কাদের সর্দার বিভিন্ন মহল্লার দলের মধ্যে আলবেদা ও সেহেরী গানের পাল্লা জমিয়ে পুরস্কার দিতেন। খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য। (১৯৯৭)

১৩৬। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩।

১৩৭। ১৯০৫ সালে রমজান মাসে এরূপ রোজাদারদের ইফতারী করানোর সময় নিজে উপস্থিত থাকতে হবে বলে নওয়াব সলিমুল্লাহ ২ এপ্রিল তাং জগন্নাথ কলেজে একটি সভায় যোগদান করতে পারেননি। তিনি একটি পত্র লিখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ৯ এপ্রিল ১৯০৫ পৃঃ ৩।

১৩৮। এতথ্যটি খাজা হালিম এবং নওয়াব পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত। (১৯৯৭) হাকিম হাঃ রহমানকে অনুকরণ করে আবুয যোহা নূর আহমদ (পৃঃ ৬৯) এবং মুনতাসীর মামুন (ঈদ উৎসব পৃঃ ২৬) এ মহল্লার লোকেরা অনেক আগেই আহসান মঞ্জিলের ছাদে গিয়ে ভিড় করতো বলে যে তথ্য দিয়েছেন, তা পুরোপুরি সত্য নয় কারণ, উক্ত প্রাসাদের ছাদে সাধারণ লোকের পক্ষে গমন সহজ ছিল না। তবে তারা গোল পুকুর পাড়ে যেতে পারতেন এবং পুকুরের পশ্চিম দিকটা তখন ফাঁকা ছিল। অবশ্য বড় কাটরা এবং হোসেনী দালান প্রভৃতি পাবলিক ভবনের ছাদে অনুরূপ জনতার ভিড় অসম্ভব ছিল না।

১৩৯। নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্যদের মৌখিক ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য (১৯৯৭ খ্রী)।

১৪০। *পুরাতন নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৬।

১৪১। এতে মোরগ পোলাও, শামী কাবাব, বোরহানী জর্দা/ ফিরনীর ব্যবস্থা থাকতো, খাজা হালিমের দেয়া তথ্য (১৯৯৭)

১৪২। ১৯৩৪ সালে এরূপ এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নওয়াব হাবিবুল্লাহর অনুপস্থিতিতে খাজা শাহাবুদ্দিন নাকি খাজাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য দামী সিগারেট এবং অন্যান্য অতিথিদের জন্য কমদামী সিগারেটের ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য মনোক্ষুন্ন হয়ে বুর্জুয়া মুসমানেরা ঐ ধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ করেছিল। কামরুদ্দিন আহমদ, (স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন, তদানিন্তন সমাজ ও রাজনীতি, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুঃ ১৯৯২ পৃঃ ১১৭

১৪৩। মুনতাসীর মামুন, *ঈদ উৎসব,* ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৪, পৃঃ ২৮।

১৪৪। মামুন, ঐ পৃঃ ৩০।

১৪৫। ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে...প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ৪৫-৪৮। উল্লেখ্য, ঢাকা মাদ্রাসা, ঢাকা কলেজসহ ঢাকার স্কুল কলেজের মুসলিম ছাত্র শিক্ষকরা মৌলভী নঈমুদ্দিনের পক্ষে সভা করে মামলা খরচের যে চাঁদা তোলেন, তাতে ঢাকার নওয়াবেরও সমর্থন ছিল।

১৪৬। খাজা মোঃ হালিম এবং নওয়াব পরিবারের কয়েকজন প্রবীন সদস্যদের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৭) থেকে প্রাপ্ত।

১৪৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জানুঃ ১৯০৯ পৃঃ ৫।

১৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৯জুলাই ১৯১৪। বংগের শিক্ষা কাউন্সিলের মেম্বার মিঃ হারকাট বাটলারের কাছে নভেম্বর ১৯১৩ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর লেখা অনুরূপ একটি পত্রের কপি এখনো নওয়াব এস্টেট অফিসে পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে। উল্লেখ্য, কানপুরের ব্যাপারে কুমিল্লা নওয়াব বাড়ীতেও প্রতিবাদ সভা হয়, ঢাকা প্রকাশ, ২৪ আগস্ট ১৯১৩ পৃঃ ৪। উক্ত হাংগামায় ভেংগে ফেলা কানপুর মসজিদ শেষ পর্যন্ত সরকার মেরামত করে দেয়। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুলাই ১৯১৪।

১৪৯। কাজী কাইউমের ডাইরী, ২৮ ফেব্রুঃ ১৯০৪ খ্রীঃ ডাইরীটি নওয়াব বাড়ীর খাজা হালিমের কাছে রয়েছে- যা থেকে তথ্যটি প্রকাশ করেছেন, অনুপম হায়াত, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা,* ৩১ জানুঃ ১৯৯১ পৃঃ ৫২।

১৫০। *পুরানো নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত পৃঃ ডি-৬ এবং যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ৪২১।

১৫১। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেম্বর ১৯১২ পৃঃ ৪।

১৫২। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ অক্টোঃ ১৮৮৬ পৃঃ ৭।

১৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ৮ মার্চ ১৯০৮ পৃঃ ৩। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে একবার মহররম মিছিলের জনৈক ব্যক্তি আগুনের মশাল ঘুরানো খেলা দেখাতে গিয়ে হঠাৎ তা আরেক জনের কাপড়ে লাগে এবং সে গুরতর আহত হয়। পর বছর পুলিশ মিছিল কারীদেরকে ঐ আগুন নিয়ে খেলা দেখাতে নিষেধ করে। এমতাবস্থায় মিছিলকারীরা ইসলামপুর রোড দিয়ে যাওয়ার সময় গেট দিয়ে নওয়াব বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহকে বিষয়টি জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলে। নওয়াব হাবিবুল্লাহ বহুদিনের চলে আসা এ ঐতিহ্যে কোনরূপ বাধা দান করতে পুলিশদের সাবধান করে দেন। তখন মিছিলকারীরা ঐ আগুনের খেলা দেখাতে আবার শুরু করে। পুলিশও কিছু বলেনি। (নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্য খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (জানুঃ ১৯৯৮) থেকে প্রাপ্ত।)

১৫৪। ঐ মিছিলটি এখনো যায়। তবে তাতে তেমন জৌলুস নেই। জানা গেছে বিবিকা রওজার তাজিয়া মিছিলটি পরবর্তীকালে বেশীর ভাগ সুন্নী মুসলমানরাই পরিচালিত করতে থাকেন।

১৫৫। আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬।

১৫৬। অত্র গ্রন্থের পৃঃ নং -এবং দি বেংগলস টাইমস ৫ মার্চ ১৯০২ খ্রীঃ

১৫৭। নূর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১।

১৫৮। *বেংগলস টাইমস,* ২৩ এপ্রিল ১৯০২ খ্রীঃ

১৫৯। নূর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬ ও ৬০।

১৬০। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরীতে বহুবার মিলাদ শরীফ আয়োজনের কথা আছে। রেজাউল করিম, শাহীনের দিনলিপি, ঐতিহ্য (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অফিসার সমিতির পত্রিকা) ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ পৃ ২৩।

১৬১। নূর আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮

১৬২। এস. এম. ইকরাম, *মডার্ন মুসলিম ইন্ডিয়া এন্ড দি বার্থ অব পাকিস্তান, ২য় সংস্করণ ১৯৬৫, পৃঃ ১০৬।*

১৬৩। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৬, এবং নওয়াবদের অর্থাদনের তালিকা ক্রমিক নং-১২১ ও ১৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩(ক) ব্যক্তিগত ডাইরী ঐ, ২ এপ্রিল ১৮৭৪ দ্রঃ।
১৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জানুয়ারী ১৯১৬।
১৬৫। একবার তিনি ঢাকা নগরীতে তার হিন্দু কর্মচারীদের দ্বারা মহা সমারোহে কালীপূজার আয়োজন করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬।
১৬৫(ক) নওয়াব আহসানুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজীতে অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত তাঃ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪।
১৬৬। ঐ, ২৫ আগস্ট ১৮৯৫।
১৬৭। ঐ, ২২ আগস্ট ১৮৯৭ এবং ৩ সেপ্টেঃ ১৮৯৯।
১৬৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঢাকার স্মৃতি, আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (স্মরণিকা) সম্পাদক, আশুতোষ ভট্টাঃ কলকাতা ১৯৭৪ পৃঃ২৫।
১৬৯। বহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, প্রেমানন্দ প্রেম কথা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৫ বাং পৃঃ ১৭৬-৭৭।
১৭০। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃ-৭৭। হোলি উৎসব পালানার্থে ঢাকার নওয়াববাড়ীতে রঙ ছিটানো এবং ফ্যাগ ছিটানো খেলাও হতো। নওয়াব বাড়ীর লোকেরা কুসুম (শিউলী) ফুলের হলুদ রঙ দিয়ে হোলির দিনে পিচকারী খেলতেন। নওয়াব হাবিবুল্লাহ এ খেলায় অংশ নিয়ে রঙে রঞ্জিত হয়ে নওয়াব বাড়ীর গোল পুকুরে গোসল করেছেন, এমন দৃশ্য দেখা লোক এখনো অনেকেই বেঁচে আছেন। (খাজা মোঃ হালিম এবং নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্যদের মৌখিকভাষ্য (১৯৯৮) থেকে প্রাপ্ত) ঢাকার নওয়াব পরিবারে অনৈসলামিক ও এদেশীয় আরেকটি সংস্কার ছিল চৈত্র সংক্রান্তিতে বাসী খাবার খাওয়ার প্রথা। এজন্য চৈত্র মাসের শেষ দিনে শাকসবজি, তরি তরকারী রান্না করে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে সকালে সেটা খাওয়া হতো। তাঁদের মুরব্বীরা বলতেন, যে চৈত্র মাসে রান্না করে তা বৈশাখ মাসে খায়, সে খোদার কাছে যা চায় তাই পায়। সূত্র ঃ ঐ, ঐ মৌখিক ভাষ্য।
১৭১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেম্বর ১৮৬৪ পৃঃ ৪২৬ এবং যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৩।
১৭২। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেম্বর ১৮৬৪ পৃঃ ৪৫৯ ও ৪৭২।
১৭৩। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১ এং ঢাকা ডিঃ গেজেটিয়ার ১৯৬৯ পৃঃ ১০৪।
১৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ও ২৩ নভেম্বর ১৮৭৮ পৃঃ ৩৭৪ ও ৩৮৮।
১৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ও ২৩ নভেম্বর ১৮৭৮ পৃঃ ৩৭৪, ৩৮৬,৩৮৮ বিজ্ঞাপন দ্রঃ
১৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ নভেম্বর ১৮৭৮, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮১ পৃঃ ৪৩৬ এবং ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮ পৃঃ ১ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫।
১৭৭। *ঢাকা ডিঃ গেজেটিয়ার* ১৯৬৯ পৃঃ ১০৪ এবং হাকিম, *পাঁচাস বরস,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৮২
১৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জানুয়ারী ১৯০৪ পৃঃ ৪।
১৭৯। ঢাকা প্রকাশ, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ এবং ২৫ আগস্ট ১৯১৯ দ্রঃ।
১৮০। ঢাকা প্রকাশ, ৪ ও ২৫ আগস্ট ১৯১২।
১৮১। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০২।
১৮২। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১।
১৮৩। প্রফেসর হবিবুল্লাহকে অনুসরণ করে ডঃ ফিরোজ মাহমুদ উক্ত আলোচনার তাং ২৫ জুলাই উল্লেখ করেছেন। দেখুন-*এ জেনারেল গাইড টু দি ঢাকা মিউজিয়াম* ১৯৬৪ পৃঃ ১ এবং *এ শর্ট হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম,* বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ৮৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন, স্মরণিকা ৭ আগস্ট, ১৯৯৮ পৃঃ ৫ ও ৮ এবং ডঃ ফিরোজ মাহমুদ ও হাবিবুর রহমান, *দি মিউজিয়ামস ইন বাংলাদেশ,* ঢাকা ১৯৮৭।
১৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জুলাই ১৯২২ পৃঃ ৩।
১৮৫। হবিবুল্লাহ, *জেনারেল গাইড,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১ এবং ফিরোজ মাহমুদ, প্রাগুক্ত স্মরণিকা, পৃঃ ৫-৬। উল্লেখ্য, ঢাকা প্রকাশে ২৯ জনের নাম পাওয়া যায়।
১৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ৯ মার্চ ১৯১৩ পৃঃ ৪।
১৮৭। প্রফেসর হবিবুল্লাহ, *জেনারেল গাইড,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২।
১৮৮+৮৯। ফিরোজ মাহমুদ, প্রাগুক্ত স্মরণিকা পৃঃ ৬-৭, এবং প্রফেসর হবিবুল্লাহ, *জেনারেল গাইড,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২।
১৯০। ফিরোজ মাহমুদ, প্রাগুক্ত স্মরণিকা পৃঃ ১০। উল্লেখ্য, ফিরোজ মাহমুদ সচিবালয়ের তিনটি কক্ষেই প্রদর্শনী ছিল বলে যে তথ্য দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বড় বড় দুটি কক্ষে প্রদর্শনী এবং একটি কক্ষে অফিস ছিল। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেম্বর ১৯১৪ পৃঃ ৫।
১৯১। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেম্বর ১৯১৪ পৃঃ ৫।
১৯২। আওলাদ হাসান, *এন্টিকুইটিজ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬২ এবং *এ জেনারেল গাইড টু ঢাকা মিউজিয়াম,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭।
১৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ৯ ও ৩০ জুলাই এবং ২০ ও ২৭ আগস্ট ১৯১৬।
১৯৪। ঢাকা প্রকাশ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ পৃঃ ৪।
১৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুন ১৯১৮ পৃঃ ৩।
১৯৬। হবিবুল্লাহ, *জেনারেল গাইড,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩ এবং ফিরোজ মাহমুদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।
১৯৭। নিদর্শনগুলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। সেগুলোর সংগ্রহ নং হলো-শীতলপাটি, জ-৭০.৫৪৯ আহঃ মঞ্জিলের মডেল -১৮৮৮ পূর্ববর্তী জ-৭০.৫৫০ ঐ ১৮৮৮ পরবর্তী জ-৭০.৫৫১, হোসেনী দালানের মডেল-জ-৭০.৫৫২, গ্রান্ড পিয়ানো জ-৭৯.১৫০৯
১৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫।
১৯৯। কেদার নাথ রায়, *ঢাকার বিবরণ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২০০। ডেমরা এলাকায় জোলারাই বিপুলভাবে সাদা জামাদানী তৈরী করে বিক্রি করতো। আবু যোহা নূর আহমদ, উনিশশতকে ঢাকার সমাজ জীবন, ঢাকা ১৯৭৫, পৃঃ ৬৪ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৩-৭৪।

২০১-২০২। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* হাশেম সুফীর বংগানুবাদ, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৫ পৃঃ ২৮।

২০৩। আজিমুশ্যান, *ঢাকা রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬।

২০৪। ঢাকার ধাতব শিল্পকর্মের সাথে বিলাতের শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারতো না বলে ইংরেজ সরকার সেগুলো বিলেতে রপ্তানীর উপর ১৮৯০ সালে অধিক পরিমাণে (৪১%) করারোপ করে। এর বিপক্ষে অনেক আন্দোলন হলে করভার লাঘব করা হয়। (ঢাকা প্রকাশ, ১৮ মে, ১৮৯০ পৃঃ ৭) এবং ইন্ডিয়ান জুয়েলারী, থমাস হলবেইন হেন্ডলে ভল-২ পুনঃ মুদ্রন, দিল্লী ১৯৮৪ পৃঃ ১৩০ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫।

২০৫। সেই সাথে তিনি কিছু হাতির দাঁতের শিল্পকর্মও পাঠান; থমাস হলবেইন হেন্ডলে, *ইন্ডিয়ান জুয়েলারী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৯।

২০৬। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১১৩ ও ১৮৩।

২০৭। ঢাকার পুলিশ ইনসপেকটর বাবু ভগবৎচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সরকার উক্ত চুরির তদন্ত অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ নভেম্বর ১৮৬৯, সম্বদাবলী দ্রঃ।

২০৮। নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট তালিকার ক্রমিক নং-১১২, ৪৬৬, ৪৭১, ৪৯২-৯৬, ৫৮২-৮৬, ৬৮৯-৯২ দ্রঃ। প্রফেসর দানী ১৯৫৫ সালের দিকে আহসান মঞ্জিল প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন, সেখানে ঐ সময় পেইন্টিং, আলোকচিত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সৈনিকদের বর্ম, কারুকাজযুক্ত ড্রেসিং টেবিল, ইটালিয়ান গোলটেবিল, হোসেনী দালানসহ বিভিন্ন ইমারতের ফিলিগ্রী মডেল, হাতির দাঁতের পাটি, জীবজন্তুর স্টাফ করা কঙ্কাল, ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত এবং সেটা জাদুঘরের ন্যায় দর্শনীয় ছিল। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৯।

২০৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ জুলাই ১৮৯৮ পৃঃ ৪।

২১০। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৯।

২১১। জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ নং-জ -৭০.৫২২, জ-৭০.৫৫১।

২১১(ক)। নিদর্শনটির সংগ্রহ নং- জ-৭০.৫৫০ ওজন-৩৭৮৬ গ্রাম (৩২৬ তোলা)

২১২। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃ-৭৪-৭৫।

২১৩। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ নং- জ ঃ ৭০-৫৪৯।

২১৩(ক)। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৯০৩ এবং মাহজাবিন চৌধুরী, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১২ জুলাই ১৯৯৯ পৃঃ ৭।

২১৪। নিদর্শনগুলো বর্তমানে আহসান, মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

২১৫। সংশ্লিষ্ট *পুরাতন নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, তালিকার ক্রমিক ৫০৪ থেকে ৫২২ দ্রঃ।

২১৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই ১৯০৮ পৃঃ ৩।

২১৭। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নওয়াব আলী চৌঃ, আনন্দ চন্দ্র রায়, মহারাজ গিরিজানাথ রায়, মৌঃ মকবুল হোসেন, বি.এ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সমিতির সদস্যদের টি.এ. ডি.এ. দেয়া হতো। (ঢাকা প্রকাশ, ২৪ জুন, ১৯০৯ পৃঃ ৩)।

২১৮। ঢাকা প্রকাশ, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ পৃঃ ৩-৪ এবং ২৫ আগস্ট ১৯১৯ পৃঃ ৪। আগেই বলা হয়েছে, নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে নিশাত মঞ্জিল নামক একটি দ্বিতল গৃহে আজব ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হতো। তন্মধ্যে ঢাকার শিল্পজাত বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি হয়ত নিশ্চয়ই ছিল।

২১৯। ঢাকা প্রকাশ, ৪ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৪।

২২০। ঢাকা প্রকাশ, ৪ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৪ এবং আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৪। উল্লেখ্য, ৩০ জুলাই শাঁখারী বাজারে শিল্পকর্ম তৈরীর কারখানা পরিদর্শনকালে লর্ড কারমাইকেল জনৈক মনীন্দ্র চন্দ্রের দোকানে ৬ বছরের একটি বালককে কর্মরত দেখেন। তিনি বালক টির কাজ দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে নওয়াবের শাহবাগে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত মেলায় তার উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে হাজির থাকতে বলেছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ৪ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৪।

২২১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ আগস্ট ১৯০২ এবং তৈফুর, ঢাকা প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৮। উল্লেখ্য, ঈদ-মহররম মিছিলের উক্ত দৃশ্যগুলো নওয়াব নুসরত জংগের আমলে আলম মুসাব্বিরের অঙ্কিত। চিত্রগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ২৯৮ এবং নাজমা খান মজলিস, ঢাকায় ঈদ ও মহররম মিছিল চিত্রকলার রূপরেখা, ইতিহাস, ২৪ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা ১৩৯৭ পৃঃ ৭৫। লর্ড কারমাইকেলের সম্মাণার্থে ঢাকার কমিশনার মিঃ বোনহাম কার্টার ২০ আগসট ১৯১২ নর্থব্রুক হলে এতদাঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন নির্দশনের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এতে মূর্তি, মুদ্রা, পান্ডুলিপি, দলিল প্রদর্শিত হয়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৪।

২২২। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ আগস্ট ১৯১২ পৃঃ ৪।

২২৩। যতীন্দ্রমেহান, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ভূমিকা ২৮। উল্লেখ্য ঐ আমলে সোনারগাঁয়ের জনৈকা অক্ষয় কুমারীর তৈরী কাগজের বিভিন্ন শিল্পকর্ম খুবই সুন্দর হতো। তাঁর নির্মিত কয়েকটি শিল্পকর্ম শিকাগোর প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে প্রশংসা পাওয়া গিয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন, পৃঃ ২৮।

২২৩(ক) দেওয়ান শফিউল আলম, *নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর,* ১ম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৬৪ পৃঃ ২৭।

২২৪। ঢাকা প্রকাশ, ৯ ফেব্রুঃ ১৯৯৩ পৃঃ ৩। ঢাকার নওয়াবের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে টাংগাইলেও ১৯১৩ খ্রীঃ জানুঃ ফেব্রুঃ মাসে কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়। এতে করোটিয়ার জমিদার পরিবারের অনেক দুর্লভ দ্রব্যাদি প্রদর্শীত হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৯ ফেব্রুঃ ১৯১৩ পৃঃ ৩। ৭ ফাল্গুন ১৩১৯ লেডী কারমাইকেল ঢাকার চিত্রশিল্পীদের চিত্রকলা পরিদর্শন করেন। সেখানে শিল্পী হরেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায় নিজের আঁকা লেডীর একটি প্রতিকৃতি তাঁকে উপহার দেন। লেডী সেটা নিয়ে ইডেন স্কুলে রাখতে বলেন। ঢাকা প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩১৯ পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪ আগস্ট ১৯১৫ ঢাকায় গভঃ প্রাসাদে সুচী শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনী হয়। লেডী কারমাইকেল উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন। ঢাকা প্রকাশ, ৮ আগস্ট ১৯১৫ পৃঃ ৪।

২২৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই ১৯১৩ পৃঃ ৪।

২২৬। আবুয যোহা নূর আহমদ, পৃঃ ৬৬-৬৮। ঢাকার টুপিতে শেষ পর্যন্ত সোনা-চান্দীর লেচও ব্যবহার হতে থাকে। নওয়াবদের উক্ত জুয়েলারী এ্যালবামে টুপির ছবি দ্রঃ।

২২৭। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ডিসেঃ ১৯১৪ পৃঃ ৩।

২২৮। যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ভূমিকা-২৯।

২২৯। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬।

২৩০-৩১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ পৃঃ ৪৩৬।

২৩২। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই ১৯১৩ পৃঃ ৪।

২৩৩। তৈফুর, ঢাকা প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪,ও ৩২৬ এবং মোহতারাম, *হোলিডে,* ৩১ জানুঃ ১৯৮২।

২৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ নভেঃ ১৮৮৮ এবং ৬ ডিসেঃ ১৮৯১ এবং ৫ মার্চ ১৮৯৯।

২৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ফেব্রুঃ ১৮৯১।

২৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুঃ ১৮৭৬ পৃঃ ৪৬১-৬৩।

২৩৭। লুসাই অভিযানকালে নওঃ আহসানুল্লাহ ৬টি হাতি ও ৩০০ নৌকা দিয়ে ইংরেজদের সহায়তা করেন।

২৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ও ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮।

২৩৯। জাদুঘরে বেড়াটির সংগ্রহ নং-আ-৯২.১৯, মোঃ আলমগীর, রূপকথার স্বপ্নপুরী আহসান মঞ্জিল, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ বর্ষ ১৩-১৪ সংখ্যা, ৩০ জুন ১৯৯৫ পৃঃ ৯।

২৪০। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজীতে লেখা, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত তাং ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪। নিদর্শনগুলোর সংগ্রহ নং-ক্রিস্টাল চেয়ার- আঃ ৮৮.১; এবং আঃ ৮৮.২; ধাতব চেয়ার-আঃ ৮৮.৭ ক্রিস্টাল টেবিল-আঃ ৮৮.৩ এবং ৮৮.৪

২৪১। আদালতে সুট নং-৯৬, সন ১৮৯৫ ইং, *পুরাতন দলিলপত্র ঐ* পৃঃ এ-২৩ এবং ৭৮-৯১

২৪২। *পুরাতন নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

২৪৩। ফিরোজ জং নামে শিকারী হাতিটা নওয়াব আব্দুল গণির খুবই প্রিয় ছিল। একবার শিকারে গিয়ে বড় একটি রয়েল বেংগলের তাড়া খেয়ে অন্য শিকারী হাতিগুলো পালাতে থাকে। কিন্তু নওয়াবকে বহনকারী নির্ভিক ফিরোজ জং শূঁড় দিয়ে আঘাত করে বাঘকে ফেলে দেয় এবং নওয়াব সেটাকে গুলি করে মারেন বলে নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্য খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে জানা যায়।

২৪৪। ইটালীতে সংঘটিত ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে একবার নওয়াব আহসানুল্লাহ বিপুল অংকের অর্থ দান করেন। ইটালী সরকার নওয়াবকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অষ্টকোন টেবিলটা পাঠিয়েছিলেন বলে নওয়াব পরিবারের প্রবীন সদস্য রহমান কাদর ও নাজমা কাদর জানিয়েছেন (জানুঃ ১৯৯৪)।

২৪৫। নওয়াব আহসানুল্লাহর পৌত্র খাজা লতিফুল্লাহর লেখা থেকে জানা যায়, একবার ময়মনসিংহের মহারাজা নওয়াব আহসানুল্লাহর কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার চাইলে তিনি তৎক্ষনাৎ উক্ত আলমারী থেকে নগদ টাকা দিতে পেরেছিলেন। ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচী, ১ ডিসেঃ ১৯৯৩ পৃঃ ১৫ ঢাকায় বিজলী বাতি দানকালে নওয়াবের নিকট থেকে ২ লক্ষ টাকা নেয়ার সময় কমিশনারও অনুরূপভাবে নগদ টাকা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। নির্মল কুমার গুপ্ত, *ঢাকার কথা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৫।

২৪৬। সিরাজুল ইসলাম, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ১৮ আগস্ট ১৯৭৮।

২৪৭। অলংকারটি সম্ভবত নওয়াবের জুয়েলারী এ্যালবামের ৫ম ক্রমিকে বর্ণিত পান্নার তৈরী বাজুবন্দের সাথে অভিন্ন হবে। তৈফুর পান্নাটির নাম দরিয়া-ই-নূর বলেছেন. যা সঠিক নয়। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০৭।

২৪৭(ক) নির্মলকুমার গুপ্ত, *ঢাকার কথা,* ১৩৬৬ বাং পৃঃ ৬৪।

২৪৮। খাজা পরিবারের প্রবীন সদস্য খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে প্রাপ্ত। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, খাজিরুন্নেছা কুমিল্লার এক বিখ্যাত জমিদারের কন্যা ছিলেন। মাশরিকী-পাকিস্তানকে উদূ আদিব, সম্পদান-হাফিজ, হুশিয়ারপুরী। রেডিও পাকিস্তান হেডকোয়াঃ করাচী, ১৯৫১ পৃঃ ১৯।

২৪৯। *ইলাস্ট্রেটেড এ্যালবাম অব ওরিয়েন্টাল জুয়েলারী ফ্রম ঢাকা নওয়াবস্ কালেকশন, বাই হ্যালিটন এন্ড কোং কলকাতা এন্ড সিমলা। এবং থমাস হলবেইন হেন্ডলে. ইন্ডিয়ান জুয়েলারী. ভল-২. রিপ্রিন্ট, দিল্লী ১৯৮৪ পৃঃ ১৩০।*

২৫০। ১৮৯২ সালে কলকাতায় অবস্থানকালে ৭ জানুয়ারী নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রাচ্য দরবারী পোষাক পরে এক নৈশ ভোজসভায় যোগদান করেন। সে সময় তাঁর কোমরে ছিল তরবারী, বাহুতে দরিয়া-ই-নুর, গলায় মোতির মালা এবং ফ্রেঞ্চ স্টার। এছাড়া রুমী টুপিতে হীরের তারা লাগানো ছিল বলে তাঁর ডাইরী থেকে জানা যায়। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু) আহসান মঞ্জিলে সংরক্ষিত, তারিখ-৭ জানুঃ ১৮৯২।

২৫১। ডাফেরিন এন্ড আভা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৬।

২৫২। মোহতারাম, *হোলিডে,* ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।

২৫৩। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি অংশসমূহ পৃথক করে নেয়ার জন্য তিনি উক্ত মামলা দায়ের করেন (ঢাকা জজকোর্ট মামলা নং-৯৬/১৯৯৫। *পুরাতন দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৮-৯১।

২৫৪। এরূপ উড়িষ্যা রাজার জারীকৃত দুটি স্মারক স্বর্ণমেডেলের বিষয়ে হ্যামিল্টন এন্ড কোং কর্তৃক পাঠোদ্ধার করে নওয়াবকে দেয়া পত্রটি নওয়াব এস্টেট অফিসে এখনো আছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৫৫। পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ছিল ৩৩১৫ টাকা এবং অর্ধস্বর্ণমুদ্রা ছিল ৩৭ টাকা মুল্যের, *পুরানো নথিপত্র,* প্রাগুক্ত।

২৫৬। ১৯০৮ সালে ৬ আগস্ট সরকার ও নওয়াব সলিমুল্লাহর মধ্যে ঋণ নেয়ার ব্যাপারে সম্পাদিত দলিল। নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

২৫৭। মোহতারাম, সাপ্তাহিক হোলিডে, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ এবং পুরানো নথিপত্র, নওয়াব এস্টেট অফিসে সংরক্ষিত, সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী দ্রঃ।

২৫৮। জনাব কামরুদ্দিন বলেন, বাক্সটি নওয়াব আহসানুল্লাহ কখনো হাতছাড়া করতেন না এবং বলতেন সেটা ছিল তাঁর জমিদারীর চেয়েও বেশী মূল্যবান। কামরুদ্দিন আহমদ, স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬। তথ্যটি সম্ভবত সঠিক নয়। কারণ মোতওয়াল্লী হিসেবে তালিকা বর্হিভূত এরূপ কোন জুয়েলারী রাখা নওয়াবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভবত ১৯২৩ সালে খাজা আতিকুল্লাহর দিলখুশা গৃহ থেকে একবাক্স অলংকার চুরির ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করতে গিয়ে তিনি উক্ত গল্প ফেঁদেছেন।

২৫৯। মোহতারাম, *হোলিডে,* ৭ ফেব্রুঃ ১৯৮২।

২৬০। ঢাকা প্রকাশ, ৩ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ ৩ এবং ৩১ মার্চ ১৯০৭ পৃঃ ৪।

২৬১। ঢাকা প্রকাশ, ৫ এপ্রিল ১৯১৪ পৃঃ ৩

২৬২। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ পৃঃ ৩ । এখানে উল্লেখ্য যে, নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলে একজন তস্কর তাঁর ঘরে চুরি করতে চেয়ে পত্র দেয়। ঢাকা প্রকাশ, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ পৃঃ ৩০৮। কিন্তু নওয়াবের বাড়ীর নিরাপত্তা সতর্কতার কারণে সে তা করতে পারেনি। কিন্তু নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলের শেষ দিকে এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহর আমলে আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এবং নিরাপত্তার অব্যবস্থার কারণে উক্ত চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলা যায়।

২৬৩। তালিকাটি ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিস, এডওয়ার্ড হাউস থেকে পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে উদ্ধারকৃত।

২৬৪। *পুরানো নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

২৬৫। সম্ভবত তাঁরা অলংকারগুলো ক্রয় করেছিলেন।

২৬৬। *পুরাতন নথিপত্র,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

২৬৭। প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে যেসব রাজা, বাদশাহ ছিলেন তাঁদের সংগ্রহে অনুরূপ মণি-মানিক্য ছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে প্রায় দু'শ বছর আগে বিক্রমপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মাটিতে চাষাবাদকালে বল্লাল সেনের আমলের বড় একটি হীরক পাওয়া যায়। সেটার তৎকালীন মূল্য ছিল আশি হাজার টাকা। এখন সেটার কোন হদিস নেই। ব্রেডলি বার্ট, *রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুলাই ১৮৬৪।

২৬৮। *ইলাস্ট্রেটেড জুয়েলারী এ্যালবাম অব অরিয়েন্টাল জুয়েলারী ফ্রম ঢাকা নওয়াবস্ কালেকশন, বাই হ্যামিলটন এন্ড কোং ক্যালকাটা* এন্ড সিমলা দ্রঃ এবং মোঃ আলমগীর, সাতরাজার ধন দরিয়া-ই-নূর, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *'নিবন্ধমালা'* ৭ খন্ড, জুন ১৯৯২ পৃঃ ৩২।

২৬৯। খাজা লতিফুল্লাহ, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজলেটার,করাচী ১লা মার্চ ১৯৯২।* ১৯৮৫ সালে ঢাকা নওয়াব এস্টেট 'বিই' প্রপার্টির মালিকগণ কর্তৃক উটাহ *জেমোলজিক্যাল সার্ভিসেস, হাউজ-৮০ ই, রোড ১৭-এ* , বনানী, ঢাকা-এর বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষার রিপোর্ট *(দি এপ্রেইজাল রিপোর্ট অব দরিয়া-ই-নূর ডায়মন্ড)* দ্রঃ। উক্ত রিপোর্ট থেকে তথ্য ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য লেখক মরহুম খাজা লতিফুল্লাহর নিকট কতৃজ্ঞ। উল্লেখ্য, ইঞ্চির মাপে মূল হীরকটির দৈর্ঘ্য - সোয়া এক ইঞ্চি এবং প্রস্থ-এক ইঞ্চি, দেখুন-ডঃ ভিঃ বল, পরে উক্ত পৃঃ ৩৯৩। এছাড়া মেট্রিক পদ্ধতির পরিমাপে মুল হীরকটির পরিমাপ হলো ৩.৫ সেঃ মিঃ X ৩.০০ সেঃ মিঃ এবং চর্তুদিকে সংযুক্ত হীরকগুলোসহ এর পরিমাপ দাঁড়িয়েছে-৬.০ সেঃ মিঃ X ৫.৫সেঃ মিঃ। দেখুন মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২।

২৭০। কাবুল থেকে পলাতক শাহ সুজার কাছ থেকে কোহিনুর অধিগ্রহণকালে রণজিৎ সিংহের এক প্রশ্নের জবাবে শাহ সুজাও অনুরূপ উত্তর দেন। এছাড়া রনজিৎ সিংহের হাতে থাকাকালে জনৈক ইংরেজের প্রশ্নের উত্তরেও রণজিৎ সিংহ অনুরূপ কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ জানুঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৮ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২২ নভেঃ ১৮৯১ পৃঃ ৩-৪। *স্টীফেন হওয়ার্থ, দি কোহিনুর ডায়মন্ড, দি হিস্টরী এন্ড দি লিজেন্ড, লন্ডন* ১৯৮০ পৃঃ ১১০-১১ এবং রতন লাল চক্রবর্তী, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯ জানুয়ারী ১৯৭৯ পৃঃ ২১-২৪ এবং বাংলা বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮, ৪র্থ ভাগ দ্রঃ।

১৭১। পৃথিবীর অন্যসব কঠিন পদার্থে হীরক দ্বারা দাগ বসানো যায় কিন্তু হীরকের গায়ে দাগ বসে না। মোঃ আলমগীর, সাতরাজার ধন দরিয়া-ই-নূর, নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ খন্ড, জুন ১৯৯২ পৃঃ ৩২-৩৩।

২৭২। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪।

২৭৩। হ্যামিলটন এন্ড কোম্পানীর দেয়া উক্ত তথ্য নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত পুরানো নথির মধ্যেও পাওয়া যায়। এছাড়া তথ্যটি উদ্ধৃত করেছেন, *ভাই নাহারসিং ও কিরপালসিং, হিস্টরী অব কোহিনুর দরিয়া-ই-নূর এন্ড টিমুরস রুবী, নিউ দিল্লী-১৯৮৫ পৃঃ ১০৫।* হীরকটি কোন কারণে মোগল বাদশাহের কোষাগারে আসে এবং ১৭৩৯ খ্রীঃ নাদির শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। তাই উক্ত ক্রয় বিক্রয় নিশ্চয়ই আরো ২/৪ যুগ আগের ঘটনা ছিল।

২৭৪। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫। এছাড়া সোনা-রূপার বর্তমান বাজার মূল্যমানের সাহায্যেও মনিটার মূল্য ধার্য করা যেতে পারে। যেমন ঃ তখনকার দিনে এক টাকা বলতে সাধারণত এক ভরি ওজনের রৌপ্য দিনারকে বুঝাতো। বর্তমানে এক ভরি রূপার দাম প্রায় ২০০ টাকা। অর্থাৎ রূপার মুল্যমানে তখনকার ১ টাকার সমান হয় এখনকার ২০০ টাকা। অতএব, সে অনুযায়ী দরিয়া-ই-নুরের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,৩০,০০০/- X ২০০ = ২,৬০,০০,০০০/- (দুই কোটি ষাট লাখ টাকা) অবশ্য রূপার চেয়ে সোনার ধাতবমূল্য আনুপাতিক হারে অনেক বেশী বেড়েছে। তখন ১ ভরি রৌপ্য মুদ্রা ছিল ১ ভরি স্বর্ণমুদ্রার ১০ ভাগের ১ ভাগ। কিন্তু এখন ১ ভরি রূপার দাম ১ ভরি সোনার দামের প্রায় ৩০ ভাগের ১ ভাগ। অতএব সোনার মূল্যমানে দরিয়া-ই-নূরের মূল্য রূপার তুলনায় এখন

Dhaka University Institutional Repository

তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে তার পরিমাণ হবে (২,৬০,০০,০০০ X ৩) = আনুমানিক ৭,৮০,০০,০০০/- (সাত কোটি আশি লক্ষ টাকা)।

২৭৫। লেঃ কর্ণেল স্যার জেমস ডানলপ স্মিথ, *পলিটিক্যাল এডিক্যাম্প* কর্তৃক ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সচিবের কাছে লেখা নোট থেকে উদ্ধৃত করেছেন, *ভাই নাহার সিং ও কিরপালসিং,হিস্টরী অব কোহিনুর দরিয়া-ই-নূর এন্ড টিসুরস রুবী. নিউ দিল্লী-১৯৮৫ পৃঃ ১১২।*

২৭৬। কলকাতার হ্যামিলটন এন্ড কোম্পানী তখন উক্ত মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রদানের জন্য সম্পাদিত দলিলের কপি, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

২৭৭। ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মেমো নং ৪ সি, ডব্লিউ-৩০/৭৩/৪৬৫(৪) তাং ২৩-১০-৭৩ এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট নথি দ্রঃ। উল্লেখ্য, দ্যুতিছড়ায় না বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে দরিয়া-ই-নূর তেমন নজর আকৃষ্ট করে না। এসব কারণে ১৯১১ সালে ঋণ পরিশোধের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ এটাকে বিক্রয় করে দেয়ার জন্য ইংল্যান্ড পাঠালেও সেখানে এর মূল্য ১৫০০ পাউন্ডের বেশী ওঠেনি। ভাইনাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০১। এছাড়া ১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতায় হ্যামিলটন কোম্পানীর হেফাজতে থাকাকালেও তাঁরা এর উপযুক্ত মূল্য দেয়ার মত ক্রেতা খুঁজে পায়নি। *পুরানো নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, হ্যামিলটন কোম্পানীর দেয়া ৪ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখের পত্র দ্রঃ।১৯৩৬ সালে খাজা সদরুদ্দিন এক জুয়েলারী ব্যবসায়ীকে বিক্রয়ের জন্য হীরকটি দেখান। কিন্তু তিনি এর দাম ৫/৭ হাজারের বেশী হবে না বলেন। এমতাবস্থায় হীরকটা হ্যামিলটন এন্ড কোম্পনীর হেফাজতে রাখার জন্য প্রতি বছর বড় অংকের চার্জ না দিয়ে সেটাকে অন্যূন ৭ হাজার টাকায় প্রপ্রাইটরদের কারো কাছে বিক্রি করে দেয়ার জন্য নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালের ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঢাকা নওয়াব পরিবারের সদস্যদের একসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেটা কার্যকরী হয়নি, হয়তো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আপত্তির কারণে। পুরাতন নথিপত্র, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত। সংশ্লিষ্ট 'বিই' প্রপার্টি সভার কার্য বিবরণী দ্রঃ।

২৭৮। স্টীফেন হাওয়ার্থ, প্রাগুক্ত, পৃঃ প্রিফেস এবং ৫৮-৬২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২২ নভেম্বর ১৮৯১ পৃঃ ৩-৪।

২৭৯। *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকা, ভল* ৩,১৯৮৬। উক্ত দরিয়া-ই-নূর থেকে কর্তিত ৬০ ক্যারেটের ডিম্বাকার আরেকটি খন্ড এখন নূর-আল-আয়ন নামে পরিচিত। ঐ বিট্রেনিকা, ভল-৩। ডঃ বল অনুমান করেন, এই হীরকখন্ডটি হচ্ছে বাদশা বাবুদের বর্ণিত সেই বিখ্যাত হীরকখন্ড। (উল্লেখ্য, হুমায়ুন ১৫২৬ খ্রীঃ আগ্রাদুর্গ দখলকালে সেখানে আশ্রিত গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের পরিবারের নিকট থেকে ১৮৬ ক্যারেট ওজনের মনিটি লাভ করেন। সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মনিটি সারা পৃথিবীর অর্ধদিবসের খোরাকের সমান মূল্যবান) শেরশাহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রীঃ পারস্যে আশ্রয় গ্রহণকালে হয়তো মনিটি তথায় রেখে আসতে বাধ্য হন। ডঃ ভিঃ বল, *এ ডেসক্রিপশন অব টু লার্জ স্পাইনেল রুবীস ...* জানুঃ ১৮৯৪ পৃঃ ৩৯৩ এবং স্টিফেন হওয়ার্থ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬২-৬৪।

২৮০। ছবিটি ইরান সরকারের প্রকাশিত ভিউকার্ড থেকে সংগৃহীত। উক্ত কার্ডে এর পরিচিতি সম্পর্কে লেখা আছে। The Daria-i-Noor (Sea of light) Diamond. From the collection of the Crown Jewels at the Bank, Makrazi, Iran, Tehran. A -182-Carate Table Diamond, Pink in Colour, Lately identified with Tavernier's 'Great Table.'

২৮০। হ্যামিলটন এন্ড কোম্পানীর বর্ণনাটি নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত পুরানো নথি থেকে প্রাপ্ত। এছাড়াও তথ্যটি উদ্ধৃত করেছেন-নাহার সিং এবং কিরপাল সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৫ এবং সিরাজুল ইসলাম বিচিত্রা ১৮ আগস্ট ১৯৭৮ পৃঃ ২৪।

২৮২। ইলাস্ট্রেটেড জুয়েলারী এ্যালবাম, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, প্রাগুক্ত ক্রমিক নং-১।

২৮৩। স্টিফেন হাওয়ার্থ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৭ এবং ১০৮-১১ এবং বাংলা বিশ্বকোষ, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৪ খন্ড, মুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮ খ্রীঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২২ নভেঃ ১৮৯১।

২৮৪। ডঃ ভিঃ বল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৩।

২৮৫। মোঃ আলমগীর, *নিমন্ত্রমালা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬।

২৮৬। ছবি দুটো স্টীফেন হাওয়ার্থ-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ লেকে সংগৃহীত পৃঃ ৮৮-৮৯। তবে পারস্যের রাজকোষে থাকাকালে এ হীরকটির ওজন ১৮৬ ক্যারেট ছিল বলে উক্ত ছবির বর্ণনায় স্টীফেন হাওরার্থ যে তথ্য দিয়েছেন তা সঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে ঐ ওজনের দরিয়া-ই-নুর নামে আরেকটি হীরক পারস্যের রাজকোষে (মাকরিজী ব্যাঙ্কে) রয়েছে, যার সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২৮৭। স্টীফেন হাওয়ার্থ, প্রাগুক্ত পৃঃ প্রিফেস এবং ১০৮-১১, ১৩৩-৩৬ এবং বাংলা বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, প্রাগুক্ত ৪ খন্ড।

২৮৮। *স্যার ডানলপ স্মিথ, এ পলিটিক্যাল এডিকাম্প, ইন্ডিয়া অফিস লন্ডন,* কর্তৃক ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সচিবকে ১৯১২ সালে লেখা নোট থেকে উদ্ধৃত করেছেন, *নাহার সিংহ ও কিরপাল সিং,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১০-১১।

২৮৯। নাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১২।

২৯০। নাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৯, এবং ১১২-১৩।

২৯১। স্টীফেন হাওয়ার্থ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৭ এবং ১০৮-১১ এবং বাংলা বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত ৪র্থ খন্ড।

২৯২-২৯৩। নাহার সিং এবং কিরপাল সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৪।

২৯৪। নাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

২৯৫। স্যার ডানলপ স্মিথের পত্র নোট থেকে উদ্ধৃত- নাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৫। অন্য একটি সূত্রে জানা যায়- এ সময় নওয়াব আব্দুল গণির পিতা খাজা আলীমুল্লাহ হীরকটি ৬০ হাজার রুপীতে ক্রয় করেন। কিছু দিনের মধ্যেই এর মূল্য বেড়ে দাড়ায় বস্তুত কয়েক লক্ষ টাকায়। (ব্রেডলী বার্ট, *ট্রুয়েলভমেন*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫) এখানে উল্লেখ্য যে, খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাই তাঁর জীবিত অবস্থায়ই হীরকটি ক্রয় করা হয়। তবে যেহেতু পুত্র আব্দুল গণির বৈষয়িক যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পিতা আলীমুল্লাহ ১৮৪৬খ্রীঃ ওয়াকফনামা তৈরী করে জমিদারী তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেন। তাই আইনত আঃ গণিই তখন পরিবারের প্রধান ছিলেন এবং তাঁর নামেই হয়তো হীরকটি ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী হয়েছিল। মোঃ আলমগীর, *নিবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২।

২৯৬। লেডী ডাফরিন আরো লিখেছেন, নওয়াবের কাছে আরো কিছু সুন্দর হীরক এবং হীরক খচিত তরবারী রয়েছে। তবে দরিয়া ই নুর হীরকটি সমতল (ফ্লাট) হওয়ায় আমাদের চোখে তেমন বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়নি। ডাফরিন এন্ড আভা, আওয়ার ভাইসরিগাল লাইফ ... প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৬।

২৯৭। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু) আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, তারিখ ৭ জানুঃ ১৮৯২ খ্রীঃ ।

২৯৮। উক্ত জুয়েলারী এ্যালবামের কয়েকটি কপি এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

২৯৯। উক্ত ঋণ গ্রহনের জন্য সরকারের সাথে নওয়াবের সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট মুলদলিলের কপি দ্রঃ, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

৩০০। ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সচিব কর্তৃক সেক্রেটারী অব স্টেট এর পলিটিক্যাল এডিক্যাম্প-কে ৭ জানুঃ ১৯১২ তারিখ লেখা, প্রাগুক্ত নোট পত্র, উদ্ধৃত করেছেন-ভাই নাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০১ এবং ১১৫।

৩০১। ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সচিব এবং ব্রিটিশ সরকারের *পলিটিক্যাল এডিক্যাম্প টু দি সেক্রেটারী অব স্টেটস* এর মধ্যে বিনিময়কৃত পত্র, তারিখ ৬ ও ৭ জানুঃ ১৯১২ উদ্ধৃত করেছেন- ভাই নাহার সিং, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২-৪। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ রাজা কর্তৃক পরিদর্শনের আগে উক্ত সচিব ৬ জানুঃ উক্ত এডিক্যাম্পকে লেখা উক্ত পত্রে দরিয়া-ই-নূর সম্পর্কে আরেকটি বিশেষ তথ্য অবগত করেন। তাহলো-ইতোপূর্বে যে দরিয়া-ই-নূর হীরক নিয়ে মহামান্য আমীর এবং আমিন-উদ-দৌলার পরিবারের মধ্যে মোকদ্দমা হয়েছিল, এটা তা থেকে ভিন্ন একটি মণি পাথর। ১৮৩৯ খ্রীঃ শাহ সুজার নিকট থেকে গ্রহণের পর সেটা আমিন-উদ-দৌলার পরিবারের সাথেই আছে। কিন্তু হ্যামিল্টন কোম্পানীর নিকট থাকা দরিয়া-ই-নূরটি লাহোর দরবার থেকে লর্ড ডালহৌসির সময় অধিকৃত এবং ১৮৫০ খ্রীঃ কোহিনুরের সাথে এটাকে লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল। ঐ পত্র, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩। উল্লেখ্য, উক্ত তথ্যের আলোকে দরিয়া-ই-নুর নামে তৃতীয় আরেকটি হীরক খন্ডের অস্তিত্বের কথা এসে যায় বলে মনে হয়।

৩০২। পূর্বোক্ত ঋণ গ্রহণ কালে নওয়াবদের এ জাতীয় দ্রব্যাদি সব সরকারের নিকট বন্ধক রাখার কারনে মুলত ঐ সবকিছুই নওয়াব পরিবারের লোকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সরকারের পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের চীফ ম্যানেজারের দায়িত্বে সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ হতে থাকে এবং নওয়াব পরিবারের অংশীদারগণ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট থেকে ভাতা পেতে থাকে। এসময় কোন কিছু ক্রয় বিক্রয় করতে হলেও সরকারের রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন লাগতো।

৩০৩। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ফি বাবদ ১১ হাজার টাকা হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীকে দেয়া হয়েছিল। পুরাতন নথিপত্র, ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত। (নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার কর্তৃক ঢাকার কমিশনারকে দেয়া পত্র নং-১০৪ জি. তাং ৬ মে'৪৭ ইং দ্রঃ)

৩০৪। সংশ্লিষ্ট মিটিং-এর প্রসিডিংস দ্রঃ নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

৩০৫। উক্ত পত্রে হ্যামিল্টন কোম্পানী নওয়াব এস্টেটের অনুরোধমত হীরকটি বিক্রি করে দেয়ার জন্য খোঁজ করে উপযুক্ত কোন ক্রেতাও তখন পাননি বলে জানান। এছাড়া নওয়াব এস্টেটের মালিকানাধীন বলে কথিত এক বাক্স পুরাতন মুদ্রা বহুদিন যাবৎ তাঁদের হেফাজতে রয়েছে বলেও তাঁরা উক্ত পত্রে চীফ ম্যানেজারকে অবহিত করেছিলেন যা আগেই বর্ণিত হয়েছে। হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানী কর্তৃক চীফ ম্যানেজারকে ১৫ এপ্রিল '৪৭ ইং তারিখে এবং ১২ ও ২২ মে ১৯৪৭ তারিখে দেয় পত্র। নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত দ্রঃ।

৩০৬। *পুরানো নথি*, ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত। অনুমোদনের জন্য রাজস্ববোর্ডের পত্র নং-৪/ডব্লিউ, তাং ৩ জানুঃ ১৯৪৮ ইং এবং হ্যামিল্টন কোম্পানীর ২৯-৫-৪৮ তারিখের হস্তান্তর পত্র এবং ঢাকাস্থ ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার রিসিট নং -১৮৫৪৭ তারিখ ১৫/৯/৪৯ ইং দ্রঃ।

৩০৭। ঢাকার নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত এতদসংক্রান্ত নথি ও রেজিস্টার দ্রঃ

৩০৮। ১৪ মার্চ ১৯৫৯ দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান অবজারভার এবং দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। পুরানো নথি দ্রঃ।

৩০৯। খাজা নাজিমুদ্দিনের লেখা ১১মে ১৯৫৯ তারিখের সংশ্লিষ্ট পত্র দ্রঃ । নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত দ্রঃ

৩১০। নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট পত্র নং- বিসিডি ১৯০ (এ-১৫) ৬৬/৩৩৭৮ তাং ১৪ জুলাই' ৬৬ ইং ।

৩১১। *পুরানো নথিপত্র*, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

৩১২। *পুরানো নথিপত্র*, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

৩১৩। ভূমি প্রশাসন মন্ত্রনালয়ের মেমো নং -৪ সি, ডব্লিউ-৩০/৭৩/৫৫৫ (৪) তাং ৪-১২-৭৩ এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ঢাকা জাদুঘর) পত্র নং- ১ই ২ /৭৪-৭৫/ ৬ তাং ৩-৭-৭৪ দ্রঃ। উল্লেখ্য, উক্ত কমিটির সুপারিশ জাতীয় জাদুঘরের প্রযত্ন সংসদ কর্তৃক অনুমোদিতও হয়েছিল, জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট নথির পৃঃ ২০৫ এবং ১৭ দ্রঃ

৩১৪। বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রনালয়ের শাখা-৩ এর স্মারক সংখ্যা ভূঃ মঃ ৩-১২০/৮৭-৩৭ তাং ১৯ জুলাই ১৯৮৮ ভূমি মন্ত্রনালয়ের সচিব কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

চিত্তবিনোদন ও ক্রীড়া চর্চায় নওয়াব পরিবার

৯(১)ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজন ঃ

প্রাচীনকালে এদেশে ঘোড়দৌড় রাজা-বাদশাহদের খেলা বলে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ সাহেবদের প্রচেষ্টায় খেলাটি এদেশের উচ্চবিত্তের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এ খেলায় পুরস্কার প্রদান প্রথা চালু হয়।[১] এর ফলে সাধারণ মানুষেরা দর্শক হিসেবে এবং রেসের ঘোড়াগুলোর পক্ষে পছন্দমত টিকিট কেটে খেলায় অংশ নিয়ে এটাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। উনিশ শতকের আশির দশকের দিকে ভারতের যোধপুর, দারভংগ, কোচবিহার, পাটিয়ালা প্রভৃতি অঞ্চলের রাজা-মহারাজারা খেলাটি শুরু করেন। কিন্তু ঢাকার নওয়াব পরিবারের বদৌলতে এর বহু আগেই তথা ত্রিশ চল্লিশের দশকেই খেলাটি ঢাকায় বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[২]

আগেই উল্লেখিত হয়েছে খাজা আলীমুল্লাহ ঢাকায় যেসব সম্পত্তি খরিদ করেছিলেন তন্মধ্যে রমনার বাগানটি ছিল অন্যতম। ঢাকা শহরের পতনকালে অযত্ন অবহেলায় তখন রমনা এলাকাটি ছিল জংগলাকীর্ণ। ১৮২৫ সালে ঢাকা শহর উন্নয়নের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি রমনার জংগল পরিস্কারের ব্যবস্থা করেন। উক্ত এলাকার মালিক ও কমিটির সদস্য হিসেবে খাজা আলীমুল্লাহ একাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন।[৩] একাজে জেলখানার কয়েদীদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনমাস কাজ করার পর ডিম্বাকৃতির একটি বিরাট অংশ উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়। উক্ত স্থানটি কাঠের রেলিং দ্বারা ঘিরে তৈরী করা হয়েছিল ঢাকা রেসকোর্স ময়দান।[৪] (পরিশিষ্টে চিত্র নং ৫৪এ ঢাকার নওয়াবদের আমলের রেসকোর্স প্যাভিলিয়নের দৃশ্য দ্রঃ) রমনার ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে খাজা আলীমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রথম থেকেই তিনি ইংরেজ সাহেবদের সাথে পাল্লা দিয়ে রেসখেলা শুরু করেন। এজন্য তিনি বেশ কিছু উন্নত জাতের ঘোড়া সংগ্রহ করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ শীতকালে খাজা আলীমুল্লাহ লাহোরের প্রসিদ্ধ ঘোড়া ব্যবসায়ী জবরদস্ত খানের নিকট থেকে ১২টি ভাল জাতের আরবী ঘোড়া কেনেন এবং পরের বছরের জন্য আরো ১২টি ঘোড়া কেনার বায়না করেন।[৫] ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় খাজা আলীমুল্লাহর ঘোড়াগুলো প্রায়ই জিততে পারতো না। কিন্তু দেশী-বিদেশী প্রতিযোগিরা যাতে উৎসাহী হয়ে ঢাকার প্রতিযোগিতায় আসেন সেজন্য তিনি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে খেলাটিতে যোগ দিতেন।[৬] আগেই বর্ণিত হয়েছে, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে খাজা আলীমুল্লাহ মূল্যবান ট্রফিকাপ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া এতে অংশ গ্রহণকারীদের সম্মানে তিনি নৈশভোজের আয়োজন করতেন। তাতে শরাব এবং বল নাচেরও ব্যবস্থা থাকতো।[৭]

আগেই বর্ণিত হয়েছে, ১৮৪৫ খ্রীঃ ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণকারী জকি ও ইংরেজ সাহেবদের সাথে খাজা আলীমুল্লাহ ও তাঁর পুত্র আব্দুল গণির একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। জলরঙে আঁকা চিত্রটিতে শিল্পী ফিগার ও পরিপ্রেক্ষিত অঙ্কনে কুশলতার পরিচয় দিতে পারেননি। চিত্রে দেখা যায়, খাজা আলীমুল্লাহ ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যে জকির ন্যায় পোশাক পরছেন। কিন্তু আঃ গণি প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যের পোশাকই পরেছেন। পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৮-এ চিত্রটির অনুকৃতি দেয়া হলো। চিত্রটিতে আরো যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন- মিঃ কুপার, ক্যাপটেন ন্যাশন, মিঃ হিউম, মিঃ হার্সিং, ক্যাপ্টেন ফনিক্স, মিঃ বেকার, মিঃ ডানবার রবিন হুড, কর্ণেল বার্গোনী, জেমস ওয়াইজ প্রমুখ।[৮] চিত্রটি ইংরেজ সাহেবদের সাথে ঢাকায়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোড়দৌড় আয়োজনে খাজা আলীমুল্লাহর বিশিষ্ট ভূমিকার পরিচয় বহন করে। ঘোড়দৌড়ের আনন্দ উপভোগ এবং আনুসাংগিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের জন্যে খাজা আলীমুল্লাহ উক্ত রেসকোর্স ময়দানটির পশ্চিমে অবস্থিত ইংরেজ জজ মিঃ গ্রিফিথ এবং আর্মেনীয় ভূস্বামী আরাটুনের নিকট থেকে ১৮৪৪-৪৫ সালে দুটো বাগানবাড়ী ক্রয় করেন।[৯] এ বাগানবাড়ী দুটোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারিত রূপদান করতে গিয়েই নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহর আমলে ঢাকার নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ী গড়ে উঠেছিল। নওয়াব আব্দুল গণির আমলে খাজা পরিবারের ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত বিষয়টি খ্যাতির সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে। তিনি রমনা রেসকোর্স ময়দানকে সুন্দরভাবে সংস্কার করেন এবং ঢাকায় পেশাদারী ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেন। তাঁর সময়ে ঘোড়দৌড় ঢাকায় অন্যতম বিনোদনে পরিণত হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এতে অংশ গ্রহণ করতো। দূর দূরান্ত থেকে লোকজনের আনা গোনা, ভোজ বাজী এবং খানা পিনার ধুম পড়ে যেতো। এমনকি এ উপলক্ষে অনেক সময় অফিস আদালত, দোকান-পাট পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতো।[১০]

নওয়াব আব্দুল গণি আরব ও ইরাক থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া আনিয়েছিলেন। ঢাকার রেসকোর্সকে কেন্দ্র করে এতদাঞ্চলে আরো অনেকেই রেসের ঘোড়া পালতে শুরু করেন। তাঁর সময় ঢাকার রেসে প্রতিযোগিতা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক উৎসাহী ক্রীড়াবিদ তাঁদের ঘোড়া নিয়ে আসতেন।[১১] শাহবাগ বাগান বাড়ীতে নওয়াব আব্দুল গণি ঐসব ঘোড়া রাখার জন্য একটি বড় ধরনের আস্তাবল তৈরী করেছিলেন। বর্তমান কাঁটাবন মসজিদের দক্ষিণে বৃত্তাকারে নির্মিত উক্ত আস্তাবলটি কয়েক বছর আগে ভেংগে ফেলা হয়েছে।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আব্দুল গণি ১৮৪৮ খ্রীঃ থেকেই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শুরু করেন। রেসের জন্য তাঁর প্রথম ঘোড়া ছিল হালকা বাদামী একটি আরবী ঘোড়া 'স্যার হেনরী'। আব্দুল গণি নিজে সেটায় চড়ে সর্বপ্রথম ফেলিক্স সাহেবের চালিত টেলিসম্যান ঘোড়ার সাথে পাল্লাদেন এবং অল্পের জন্য হেরে যান। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহিত হননি। পরবর্তী বছর আরো উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া সংগ্রহ করেন এবং রুস্তম নামক প্রখ্যাত একজন অশ্বারোহীকে তিনি জকি হিসেবে নিযুক্ত করেন।[১২] এরপর তিনি চারবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন। এরমধ্যে বিখ্যাত 'ওয়েল্টার্স কভেটেড ট্রফি' জয় করা ছিল তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। ১৮৪৮ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি আরব, ইংলিশ, অষ্ট্রেলিয়ান, কেপস, ওয়েলার প্রভৃতি জাতের অনেকগুলো উৎকৃষ্ট ঘোড়া সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রেসের ঘোড়াগুলোর প্রশিক্ষণদানকারী প্রথম জকি ছিলেন পূর্বোক্ত 'রুস্তম' এবং শেষ জকি ছিলেন মিঃ পেরেট। যিনি পরে কলকাতায় রেস শিক্ষা দিতেন।[১৩] এছাড়া রামশা এবং রবিনসন নামে ঢাকার নওয়াবের আরো দু'জন খ্যাতনামা জকি ছিলেন।[১৪] নওয়াব আব্দুল গণি নিজেও একজন নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। খুব ভোরে তিনি ঘোড়দৌড় অনুশীলন করতেন। ৮৩ বছর বয়সেও তিনি ঘোড়ায় চড়ে নওয়াববাড়ী থেকে সকালে পল্টন ময়দানে যাতায়াত করতেন।[১৫] নওয়াব আব্দুল গণির রেসের ঘোড়াগুলোর রঙ ছিল বেগুনী ও লাল। ১৮৭৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ওয়েলসের যুবরাজের সম্মানার্থে কলকাতায় যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ঢাকার নওয়াবের 'শাহেনশাহ' নামক ঘোড়াটি ভাইসরয়ের প্রদত্ত কাপ জিতে নেয়।[১৬] আব্দুল গণি ওয়েলসের যুবরাজের নিকট থেকে কাপটি গ্রহণ করেন।[১৭] এর আগে উক্ত ডিসেম্বর মাসেই কলকাতার মাঠে আরেকটি প্রতিযোগিতায় ঢাকার নওয়াবের 'রিজেন্ট' নামক ঘোড়াটি জয়লাভ করে।[১৮] এছাড়া দরিয়াবাজ নামক তাঁদের আরেকটি ঘোড়া কলকাতার মাঠে আরেকবার ভাইসরয় কাপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল।[১৯] নওয়াব আব্দুল গণি কলকাতার বিখ্যাত ডার্বি কাপও লাভ করেছিলেন।[২০]

ঢাকার নওয়াবদের জয়করা ঐসব ট্রফি কাপগুলোর বেশী ভাগেরই কোন হদিস এখন পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যবশত নওয়াব এস্টেটের পুরানো অফিস এডওয়ার্ড হাউজ থেকে মাত্র কয়েকটি কাপ সংগ্রহ করে এখন আহসান মঞ্জিল যাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে ১৮৬৭-৬৮ সালে কলকাতার মাঠের প্রতিযোগিতায় নওয়াব আব্দুল গণির প্রদত্ত কাপটি অন্যতম। কাপটি 'শাহেনশাহ' নামক নওয়াবেরই একটি ঘোড়া জিতে এনেছিল।[২১] (পরিশিষ্টে চিত্র নং-

Dhaka University Institutional Repository

৫৫-এ দেয়া চিত্র দ্রঃ) অনুরূপ আরেকটি কাপ হচ্ছে ১৮৮৪ সালে ঢাকার রেসে ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সুন্দর কাপ, যা নওয়াবের আরেকটি ঘোড়া জিতে এনেছিল।[২২] (পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৫৬-এ দেয়া চিত্র দ্রঃ)।

ঢাকার নওয়াবদের ইংরেজ ম্যানেজার জি.এল.গার্থ সাহেবও ঘোড়দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ১৮৯০ এর দশকে তিনি বহুবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের সৌজন্যে ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন।[২৩] ১৮৯১ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে জানা যায় যে, সেবার ঢাকায় ঘোড়দৌড় উপলক্ষে স্থানীয় কয়েকজন ইংরেজ সাহেব, বাবু মধুসূদন দাস এবং নওয়াব আব্দুল গণি ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে রেসের ঘোড়া প্রস্তুত করেন। ঐ গুলোর মধ্যে নওয়াব সাহেবের ঘোড়াগুলিই ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঐ বছর কলকাতা থেকে আগত কাপ্তান ওয়ার্লোর ঘোড়া দুটো আরো বেশী উত্তম হওয়ায় তারাই বেশীরভাগ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে।[২৪] আব্দুল গণির আমলেও ঘোড়দৌড়ে বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার প্রদান এবং এতদুপলক্ষে ঢাকায় আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রেসে অংশগ্রহণকারীদের সম্মানার্থে ভোজসভা ও বল-নাচের আয়োজন করা হতো।[২৫] এমনকি ১৮৮৮ সালে ভয়াবহ টর্নেডোর আঘাতে আহসান মঞ্জিল ক্ষতিগ্রস্থ হলেও নওয়াববাড়ীর আংগিনায় তাঁবু খাটিয়ে এ উপলক্ষে ভোজ ও বল নাচের আয়োজন করা হয়েছিল।[২৬] মোসলেম ক্রনিকেল পত্রিকায় বলা হয়েছে, সার্বিক বিচারে নওয়াব আব্দুল গণির ন্যায় ক্রীড়া রসিক এদেশে আর জন্মে নাই। তিনি দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে ঘোড়দৌড় ও অনুরূপ পুরুষোচিত খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সময় ও অর্থের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করেছেন।[২৭] নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলেও তাঁদের ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ পুরোপুরি অব্যাহত থাকে। পিতার ন্যায় তিনিও জকিদের নিয়ে ঘোড়দৌড় অনুশীলন করতেন। তাঁর লেখা ব্যক্তিগত ডাইরী পাঠে জানা যায়, তিনি ঘোড়দৌড়ের প্রাক্কালে নিয়মিত রেসকোর্সে গিয়ে জকিদের প্রশিক্ষণ কাজ তদারক করতেন। ঘোড়দৌড়ের সময় ঢাকায় আগত ও রেসে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি এবং ঘোড়া গুলোর নাম অনেক সময় তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখে রাখতেন।[২৮] এছাড়া ঘোড়দৌড়ের সময় তিনি ঢাকায় আগত ইংরেজ সাহেব ও মেমদের সম্মানে নৈশভোজ ও বল-নাচের আয়োজন করতেন। ঐসব আসরে তিনি একাধিক মেমদের সাথে নাচতেন বলেও জানা যায়।[২৯]

পিতা নওয়াব আব্দুল গণির বার্ধক্য এবং সহায় সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক কোন্দলের কারণে নওয়াব আহসানুল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাঁদের রেসের ঘোড়াগুলো অটুট রাখতে পারেননি। ১৮৮৬-৮৭ সেশনের খেলায় অংশগ্রহণের পর তিনি ঘোড়দৌড় উপলক্ষে কলকাতায় যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দেন। এর পরে ঢাকার মাঠেই তাঁদের খেলা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে তিনি প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ মেসার্স গটকিন উইলিয়াম এবং চার্লিমুরকে তাঁর রেসের ঘোড়াগুলো বিনামূল্যে দান করে দেন।[৩০] তবে এর পরেও তিনি ঘোড়দৌড়ের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকা রেসকোর্স ময়দান পুনঃসংস্কার করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে একটি নতুন রেস ষ্ট্যান্ড তৈরী করে দেন এবং এখানের প্রতিযোগিদের জন্য নিজের নামে একটি মূল্যবান কাপ প্রচলন করেন।[৩১] পুরস্কারটি নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবনকাল পর্যন্ত চালু ছিল। প্রতি বছর 'নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহ কাপ' এর জন্য নওয়াব এস্টেট থেকে ১৫০০/- টাকা ব্যয় করা হতো। ১৯০০ সালে ঢাকা রেসকোর্স মাঠ উন্নয়নের জন্য নওয়াব সাহেব ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। এছাড়া নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে আরো জানা যায়, তাঁরা বরিশালে ঘোড়দৌড় উপলক্ষে ২০০ টাকা এবং দিল্লীতে ইম্পেরিয়াল ঘোড়দৌড় উপলক্ষে দুই হাজার টাকা দান করেছিলেন।[৩২]

নওয়াব সলিমুল্লাহর আমলে অর্থাভাবে নওয়াব এস্টেটের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে রেসের ঘোড়া পালন সম্ভব হতো না। তবে তখন এই পরিবারের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে রেসের ঘোড়া পালতেন। ঐ সময় নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ এবং খাজা আফজাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ঘোড়দৌড় মওসুমে ২/১টি ঘোড়া সংগ্রহ করে ঢাকার রেসে অংশ নিতেন। পরবর্তীকালে জনৈক আরব দেশীয় আমীর নওয়াব সলিমুল্লাহর জন্য ২টি ঘোড়া ও একজন জকি পাঠিয়েছিলেন বলে নওয়াব পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের নিকট থেকে জানা যায়। ঘোড়া দুটোর নাম ছিল (১) শাহেনশাহ, (২) দুলদুল এবং

Dhaka University Institutional Repository

জকির নাম ছিল বাদ্দু মিয়া। তিনি উক্ত ঘোড়া নিয়ে ঢাকার রেসে কয়েকবার অংশ নিয়েছিলেন।[৩৪] নওয়াব সলিমুল্লাহও পিতার ন্যায় ঢাকায় ঘোড়দৌড় আয়োজনে যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ইংরেজ সাহেব ও মেমদের সাথে আলাপরত অবস্থায় তোলা নওয়াব সলিমুল্লাহর একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৫৭-এ সংযোজিত হলো।[৩৫] তাঁর আমলে নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার মিঃ জি.এল.গার্থ ঢাকা রেস কমিটির অনারারি সেক্রেটারী হিসেবে রেসের যাবতীয় আয়োজন করতেন।[৩৬]

নওয়াব হাবিবুল্লাহও মাঝে মধ্যে রেসের ঘোড়া সংগ্রহ করে জকিদের মাধ্যমে ঢাকার রেসে অংশ নিতেন। উল্লেখ্য, নওয়াব সলিমুল্লাহর সময়ই এস্টেটের সব হাতী ঘোড়া বিক্রি করে দেয়া হয়। তিনি ১৯০৪ সালে মোটরগাড়ী কিনে ঘোড়ার বদলে তাতে চড়েই চলাফেরা শুরু করেন। নওয়াব হাবিবুল্লাহও তদানুরূপ মোটর গাড়ীতেই বেশীরভাগ সময় চলাফেরা করতেন। নওয়াব হাবিবুল্লাহর আমলে নওয়াব পরিবারের অনেকেই পৃথকভাবে রেসের ঘোড়া পালন করতেন বলে জানা যায়। ঢাকার রেসে প্রতিবারই খাজা পরিবারের কারো না কারো ঘোড়া অংশ নিত। এদের মধ্যে খাজা শাহাবুদ্দিন এবং খাজা সাহেবে আলম (কালুমিয়া) নিজেরাই তাঁদের ঘোড়া নিয়ে ঢাকার রেসে অংশ নিতেন এবং মাঝে মধ্যে জয়লাভও করতেন। এছাড়া নওয়াবজাদা খাজা হাফিজুল্লাহ যিনি বহুদিন লন্ডনে থেকে লেখাপড়া করেছিলেন, তিনিও ভাল জাতের রেসের ঘোড়া পালতেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের পুত্র খাজা মহিউদ্দিনও নিজের ঘোড়া নিয়ে ঢাকার রেসে অংশ নিতেন বলে জানা যায়।[৩৭] ১৯২৬ সালে ঢাকার অদূরে কালীগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দারা ঘোড়দৌড়সহ এক ব্যাপক খেলাধূলার আয়োজন করেন। আধুনিক ক্রীড়াপ্রীতির কারণে তাঁরা ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহকে তথায় প্রধান অতিথিরূপে নিয়ে যান। নওয়াব সাহেব সেখানে বক্তৃতা করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।[৩৮]

ঢাকার নওয়াব পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রায় সবাই ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে যেতেন। নওয়াব হাবিবুল্লাহর সময় এই পরিবারের অনেক মহিলারাও বোরখা পরে ঘোড়দৌড় দেখতে যেতেন। সেখানে টিকিট কেটে রেস দেখা হতো এবং মহিলাদের জন্য পৃথক গ্যালারী ছিল। নওয়াব হাবিবুল্লাহর আমলে ঢাকা ক্লাবের তত্ত্বাবধানকারী ইংরেজ সাহেবরাই ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করতেন। তাঁদের পক্ষ থেকে নওয়াব পরিবারের সদস্যদের জন্য ১০/১২টি দর্শকের পাশ দেয়া হতো বলে জানা যায়।[৩৯] পাকিস্তান আমলের প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উক্ত প্রতিযোগিতা হতো। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খান এই ঘোড়দৌড় খেলাটি নিষিদ্ধ করে দেন।

৯(২) মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

এতদাঞ্চলে আধুনিক ক্রীড়া চর্চায় ঢাকার নওয়াব পরিবার অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। এই পরিবারে কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়ও জন্মেছিলেন। নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ একজন উৎসাহী খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীর চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ১৮৯১ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর বদান্যতায় ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য একটি স্পোর্টিং ক্লাব চালু করা হয়। ক্লাবটির মাধ্যমে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস প্রভৃতি খেলা হতো।[৪০] বাংলার ছোট লাট চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট ঢাকায় এলে ক্লাবের সদস্যরা তাঁর কাছে খেলার মাঠের জন্য লিখিত আবেদন করে।[৪১] ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে উক্ত ঢাকা মাদ্রাসা স্পোর্টিং ক্লাবকে প্রায়ই অর্থ সাহায্য দেয়া হতো। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে এরূপ বহুবার অর্থদানের কথা জানা যায়।[৪২] ঢাকা মাদ্রাসা ছাড়া এতদাঞ্চলে অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্রদের শরীর চর্চার ব্যাপারেও নওয়াব আহসানুল্লাহ পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। ১৯০০ সালের ২২ জানুয়ারী ঢাকার নওয়াবদের রমনার মাঠে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের ক্রীড়া

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতার এক ব্যাপক আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ ২৫ টাকা দান করেন।[৪৩] এছাড়া নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকা কলেজের ছাত্রদের ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯০৩ সালে ১২৫ টাকা এবং ১৯০৪ সালে ১৫০ টাকা দান করেছিলেন।[৪৪]

বাংলার মুসলমানদের ক্রীড়া বিষয়ক প্রথম সফল প্রতিষ্ঠান মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৮৯৪ সালের ১৯ জানুয়ারী কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৫] দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ ক্লাবের সাথে জড়িত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নওয়াব এবং ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ উক্ত ক্লাবে এককালীন অর্থ সাহায্য দেন। ১৮৯৫ সালের ১৯ জানুঃ সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে কলকাতা মাদ্রাসা হলে ক্লাবের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৬] ১৮৯৬ সালের মে মাসে ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয়। ঐ সময় নওয়াব আহসানুল্লাহ ক্লাবে ৩৫০ টাকা দান করেন এবং পরবর্তীতে আরো অর্থ দেবেন বলে জানান। এছাড়া এ সময় ব্যারিস্টার এরাদুতুল্লাহ ক্লাবে ১০ টাকা দান করেন।[৪৭] ঢাকার নওয়াবদের অর্থদানের তালিকায় কলকাতা মোহাঃ স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য বহুবার অর্থদানের হিসাব পাওয়া যায়।[৪৮] অল্পদিনের মধ্যেই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলাধুলায় সুনাম অর্জন করে। ১৮৯৬-৯৭ সালে ক্লাবটি 'পলস কাপ' প্রতিযোগিতায় পরপর দুইবার হিন্দুদের পরিচালিত ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাবকে ফুটবল খেলায় পরাজিত করে কলকাতায় বেশ নাম করে।[৪৯] ফুটবলের পাশাপাশি ক্লাবটি ক্রিকেট এবং হকি খেলায়ও বেশ সুনাম অর্জন করে। নওয়াব আহসানুল্লাহর দানে অল্পদিনের মধ্যেই ক্লাবটি ক্রিকেটে নওয়াব আহসানুল্লাহ টুর্ণামেন্ট শুরু করে।[৫০] নওয়াব আহসানুল্লাহ আজীবন ক্লাবটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৮৯৯ সালে খান বাহাদুর ডি.এইচ.আহমদ ও মীর্জা সুজাত আলী বেগের নেতৃত্বে কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং ইন্ডিয়ান সাইক্লিষ্ট এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল নওয়াব আহসানুল্লাহর সাথে দেখা করেন। নওয়াব সাহেব তাঁদেরকে ক্রীড়া অনুশীলনের সাথে সাথে বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেও নৈপুণ্য অর্জন করতে উপদেশ দেন।[৫১]

উল্লেখ্য যে, মুসলিম যুবকদের নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে শৃংখলাবদ্ধ ও বলশালী করে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গঠিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বড় বড় শহরগুলোতে মুসলমান নেতারা এ ক্লাবের অনুকরণে ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হন। উক্ত ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় খান বাহাদুর আব্দুস সালাম মুসলমান যুবকদের শরীরচর্চা শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৫২] উক্ত প্রবন্ধে তিনি উত্তর ভারতের মুসলমানদের তুলনায় বাঙালীদের দৈহিক শক্তি কিছুটা কম বলে মন্তব্য করেন।[৫৩] তাঁর উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ঢাকার মুসলমান ছাত্ররা ১৮৯৫ সালে মোহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব নামে একটি শরীর চর্চা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৪]

কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুসরণে ১৮৯৯ সালে ঢাকায় 'মোহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ ছিলেন এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নওয়াবের ভগ্নিপতি খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ জান এবং সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রহমান মাহমুদ। খেলাধুলার পাশাপাশি মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে ক্লাবটিকে গড়ে তোলাও উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল। নওয়াব আহসানুল্লাহও উক্ত অভিপ্রায় নিয়েই ক্লাবটির উন্নয়নের পক্ষপাতি ছিলেন।[৫৫] ঢাকায় ক্লাবটি প্রতিষ্ঠার পর এর সভাপতি খাজা মোহাঃ ইউসুফ জান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহকে ৪ সেপ্টেম্বর একটি আনুষ্ঠানিক পত্র দেন। উক্ত পত্রের উত্তরে নওয়াব সাহেব ক্লাবটির জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এর সভাপতিকে একটি পত্র দেন। নওয়াবের পত্রটি ক্লাবের উদ্যোক্তাদের এতই উৎসাহ যুগিয়েছিল যে, এর সেক্রেটারী জনাব এ.আর.মাহমুদ সেটা সমকালীন সাপ্তাহিকী কলকাতার মোসলেম ক্রনিকেল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। যথারীতি পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৬] পরিশিষ্ট নং-২৬ পৃঃ৪৪৯এ নওয়াব আহসানুল্লাহর পত্রসহ ক্লাবের সেক্রেটারীর দেয়া পত্রটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো। মোহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবটি এতদাঞ্চলে আধুনিক ক্রীড়া অনুশীলন, প্রদর্শন ও প্রচলনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। খাজা মওদুদের ডাইরী থেকে জানা যায়, ১৯১৫ সালে ১৫ এপ্রিল নিমতলীর মাঠে ঢাকার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং ময়মনসিংহ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

আগত অপর একটি নামকরা দলের মধ্যে হকি প্রতিযোগিতা হয়। খেলায় মোহামেডান জয়লাভ করে।[৫৭] বর্তমান কালেও ক্লাবটি বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতে অন্যতম সেরা সংগঠন। তবে এ ক্লাবের নামের সাথে এখন ইউনিয়ন শব্দটি আর নেই। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে দিলখুশা বাড়ীতে বসবাসরত ঢাকা নওয়াব পরিবারের সদস্যরা ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নেতৃত্বের কাতারে ছিলেন। তখন দলটি হকি খেলায় খুবই সুনাম অর্জন করেছিল।[৫৮]

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সাফল্যের সাথে সমকালীন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগে প্রতিযোগিতা করে সুনাম অক্ষুন্ন রাখে। এর পর থেকে ক্লাবটির অবনতি হয় এবং সেটা কোন রকমে টিকে থাকে। ১৯৩০ এর দশকে এসে ক্লাবটির গৌরবজনক অধ্যায় শুরু হয়।[৫৯] এই সময়ে ঢাকা নওয়াব পরিবারের সদস্যরা কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবেরও সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ খাজা নাজিমুদ্দিন উক্ত ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।[৬০] তাঁর সাথে এই ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন খাজা নুরুদ্দিন।

১৯৩৪ সালে কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে এবং ঐ বছরই তাঁরা কলকাতার ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হন। কোন ভারতীয় দল সেবারই প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব লাভ করে।[৬১] পর বছর ১৯৩৫ সালে মোহামেডান কর্তৃক ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নের পর খাজা নাজিমুদ্দিন এবং বাংলার গভর্নরের সাথে খেলোয়াড়দের তোলা একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পরিশিষ্ট চিত্র নং- ৫৮-এ দেয়া হলো।

১৯৩৫ সালের ৫ মার্চ ক্লাবের ৪৫তম সাধারণ সভা কলকাতার কায়সার স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খাজা নাজিমুদ্দিনকে আজীবনের জন্য ক্লাবের একজন ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া খাজা নাজিমুদ্দিনকে সভাপতি এবং খাজা নুরুদ্দিনকে সম্পাদক নিযুক্ত করে নতুনভাবে ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন হয়।[৬২] মূলত সম্পাদক খাজা নুরুদ্দিনই অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্লাবটিকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দলে উন্নীত করেছিলেন।[৬৩] তাঁদের সফল নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পর পর সাত বছর কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়।[৬৪] ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত ক্লাবের সাধারণ সভায় পুনরায় খাজা নাজিমুদ্দিনকে সভাপতি ও খাজা নুরুদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৬৫]

ঐ আমলে কলকাতার অন্যসব ক্লাবের নিজস্ব খেলার মাঠ থাকলেও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তা ছিল না। ফলে ক্লাবের খেলোয়াড়েরা খুব অসুবিধায় পড়তেন। এমতাবস্থায় ঢাকার নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ মোহামেডানের নিজস্ব মাঠের জন্য বাংলার পুলিশ প্রধান মিঃ জি. পি. হুগের সাথে আলোচনা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এবং অন্যরা বাঙলার গভর্নর স্যার জন এন্ডারসনের সাথে দেখা করে মাঠের জন্য অনুরোধ করেন।[৬৬] সরকার গভর্নর হাউসের পশ্চিমদিকে মোহামেডানের জন্য মাঠ নির্মাণের অনুমতি দেয়। উক্ত মাঠ তৈরীর কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য ক্লাবের ট্রাস্টিবোর্ড খাজা নুরুদ্দিনকে চেয়ারম্যান এবং মিঃ জি. আর. জাফরকে সেক্রেটারী করে একটি কমিটি গঠন করে দেয়।[৬৭] ১৯৩৮ সালে মোহামেডানের মাঠ তৈরীর কাজ শেষ হয়। ঐ বছরই ৬ মে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উক্ত মাঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ক্লাবের সভাপতি ও তৎকালীন বাঙলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসেন।[৬৮] ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খাজা নাজিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ৪৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেবার ভূপালের নওয়াব সাহেব ক্লাবটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হন এবং এরজন্য ১০ হাজার টাকা দান করেন।[৬৯] খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বের গুণে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ঐ আমলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলরূপে কলকাতা, বোম্বে, সিমলা, আজমীর, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি এলাকায় প্রতিযোগিতা করে অনেকগুলো শীল্ড ও কাপ জয় করে। তাঁর আমলে মোহামেডানের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ১৯৩৬ সালে আই.এফ.এ. (ইন্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন) শীল্ড জয় করা। ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র মোহনবাগান ১৯১১ সালে একবার ঐ শীল্ড জয় করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় বৃটিশ সেনাবাহিনীর ২০-২৫টি নামকরা দলের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় মাত্র ২/৪টি দল খেলার যোগ্যতা অর্জন করতো। এটা ছিল সর্বভারতীয় ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক শীল্ড। উক্ত শীল্ড প্রতিযোগিতায় ঢাকার নওয়াবজাদী পরীবানুর নাতি-জামাই ছোট রশিদ[৭০] প্রতিটি খেলায় খুবই নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

মোহামেডানের খেলোয়াড়েরা সাধারণত ধর্মতলা স্ট্রীটে সুবেদ আলী ম্যানসনে থেকে খেলায় অংশ নিতেন। কিন্তু উক্ত আই.এফ.এ.শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলাকে দলের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন এতই গুরুত্ব দেন যে, তিনি খেলোয়াড়দের বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজনে তাঁদের সবাইকে কলকাতার বালিগঞ্জে তাঁর নিজের বাসায় নিয়ে রাখেন। সেখান থেকে খেলোয়াড়দের বাইরে যাতায়াত নিষেধ ছিল।[৭১] ১৯৩৬ সালের ২ আগস্ট ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে উক্ত ক্লাবের মাঠেই মোহামেডান শীল্ড জয়ের চূড়ান্ত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পর পর দুদিন গোল শূন্যভাবে খেলা শেষ হয়। মোহামেডানের জয়ের জন্য মুসলমানেরা দোয়া-দরুদ পড়া শুরু করেন। এমনকি বহু মুসলমান নারী-পুরুষ নামাজ রোজা এবং শিরনী মানত করেন।[৭২] ৫ আগষ্টে তৃতীয় দিনের খেলায় মোহামেডান ২-১ গোলে জয়লাভ করে। উক্ত খেলায় প্রথম জয়সূচক গোলটিও করেন পূর্বোক্ত ছোট রশিদ।[৭৩] উক্ত শীল্ড জয় করার পরদিন পুরো দলটি নওয়াবজাদি পরীবানুর সাথে তাঁর ৩৬ নম্বর থিয়েটার রোডে অবস্থিত 'পরী মঞ্জিলে' গিয়ে দেখা করেন। সেখানে নওয়াবজাদির পুত্র খাজা সদরুদ্দিন সারাদিন ধরে তাঁদের আপ্যায়ন ও ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন।[৭৪] এরূপ একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৫৯ এ দেয়া হলো। খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে কোন একটি ফুটবল খেলা উপলক্ষে খেলোয়াড়দের তোলা আরেকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত ছবিতে খাজা নাজিমুদ্দিনের বামে খাজা নুরুদ্দিন এবং ডানে হাবিবুল্লাহ বাহার (বসা) এবং পিছনে খাজা আজমল (দাঁড়ানো) রয়েছেন। পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৬০-এ ছবিটি দেয়া হলো।[৭৫]

আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ের পর মোহামেডান সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। জয়ের নেশায় তাঁরা সারা ভারতে পর্যটন করে। ১৯৪০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বোম্বেতে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলায় মোহামেডান ১-০ গোলে বাংগালোর মুসলিম দলকে পরাজিত করে রোভার্স কাপ জয় করে। বাংলা থেকে ইতোপূর্বে কোন দলই উক্ত কাপ অর্জন করতে পারেনি।[৭৬] বোম্বেতে উক্ত খেলার সময় মোহামেডান দলটি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন খাজা নুরুদ্দিন।[৭৭] কলকাতায় খেলা চলার সময় মোহামেডানের সাফল্য অর্জনের জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবারের সদস্যরা যথাসাধ্য এর সহায়তা করেন। ১৯৩৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়নের কয়েকটি খেলায় অংশ নিয়ে জেতার পর ছোট রশিদ কার্যোপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং নানা কাজে সেখানেই থেকে যান। ফাইনাল খেলার ২ দিন আগে মোহামেডানের সেক্রেটারী খাজা নুরুদ্দিনের জরুরী ফোন পেয়ে নওয়াব পরিবারের খাজা আজমল ছোট রশিদকে তাৎক্ষণিক ভাবে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি খেলার দিনই কলকাতায় উপস্থিত হন এবং তাতে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন।[৭৮] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, খাজা আজমল বেংগল হকি এসোসিয়েশন এবং সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক একজন প্রথম শ্রেণীর রেফারী বলে স্বীকৃত ছিলেন এবং তিনি ঢাকা ও কলকাতার মাঠে বহুবার খেলা পরিচালনা করেছেন।[৭৯]

১৯৩৬ এর পরে ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে আরো দুইবার মোহামেডান আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করে।[৮০] মোহামেডানের এরূপ উপর্যুপরি সাফল্য দেখে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন অনেকেই দলটিকে নাজেহাল করার অপচেষ্টা চালায়। ১৯৩৭ সালে লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ নির্ধারণ খেলায় রেফারীদের পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং কর্তৃপক্ষের একচোখা নীতির প্রতিবাদে মোহামেডান ঐ খেলা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। এমতাবস্থায় আই.এফ.এ.-এর সভাপতি সন্তোষের মহারাজা, মোহামেডানের সেক্রেটারী খাজা নুরুদ্দিনের সাথে একটি আপোষ রফা করেন। পুনরায় গোটা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর মোহামেডান খেলায় ফিরে আসে।[৮১] মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই অভূতপূর্ব বিজয়ের মূলে ছিল তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ। ক্যাপ্টেন ও রেফারীর প্রতিটি নির্দেশ তাঁরা অবনত মস্তকে মেনে চলতেন। মোহামেডান দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মনোবল ছিল অতুলনীয়। তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

জয়ের মাধ্যমে সারা ভারতের অগণিত মুসলমানদের হৃদয়ে যে কিরূপ আনন্দ ধারা বয়ে যেতো সে বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। খেলার সময় তাঁরা ভাবতেন তাঁদের জয় মানে মুসলমান জাতির জয়।

উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিশেষ অবদান রয়েছে। মোহামেডানের নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রার প্রভাব মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনেও বিজয় অভিযানের আকাংখায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ এতে অনুপ্রাণিত হতেন। কবি নজরুল ও গোলাম মোস্তফাসহ অনেক কবিই মোহামেডানের জয়ে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে কবিতা রচনা করতেন।[৮২] খেলায় অংশ গ্রহণ কালে কিংবা বিজয় অর্জন করে মোহামেডানের খেলোয়াড়েরা তাঁদের দলের মুসলমান সমর্থকদের সাথে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে মুসলমান জাতীর গৌরব প্রকাশ করতেন। এই প্রেক্ষিতে মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে অনেকেই স্বপ্ন বিভোর হয়ে যেতেন। এভাবে মোহামেডান গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় নব চেতনার উন্মেষ ঘটায়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৎকালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবটি মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ফলে মুসলমানরা কালক্রমে ভারতে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় না ভেবে পৃথক কৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাস সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র জাতি বলে দাবী করতে পেরেছিল।

৯(৩) হকি খেলা চর্চায় নওয়াব পরিবার ঃ

বাংলাদেশে হকি খেলা প্রচলন ও জনপ্রিয় করতে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। আজকাল এই খেলাটি এতদাঞ্চলে তেমন বেশী গুরুত্বপূর্ণ না হলেও দু'যুগ আগেও সেটা ছিল খুবই জনপ্রিয় খেলা। কার্যত নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহই প্রথম এতদাঞ্চলের লোকদের মধ্যে হকি খেলা জনপ্রিয় করার প্রয়াস পান। তবে নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহও হকি খেলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বলে তাঁর ডাইরী পাঠে জানা যায়।[৮২(ক)] নওয়াব সলিমুল্লাহ খাজা পরিবারের ক্রীড়ামোদি সদস্যদের নিয়ে ১৯০৭ সালে 'নওয়াব ইউনিয়ন ক্লাব' নামে একটি হকি দল গঠন করেন।[৮৩] নওয়াব বাহাদুর নিজেই ছিলেন উক্ত ক্রীড়া দলের সভাপতি। মিঃ ওয়াটসন নামে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জনৈক সার্জেন্ট দলের কোচ ছিলেন। এছাড়া নওয়াবের ছোট ভাই খাজা আতিকুল্লাহ ক্লাবটির সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। সৌভাগ্যবশত নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর সাথে তোলা উক্ত হকি দলের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।[৮৪] উক্ত ছবিতে যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন ঃ (১) খাজা মোঃ মুসা মিয়া, (২) খাজা পিয়ারু মিয়া, (৩) খাজা ইমামুদ্দিন, (৪) খাজা আব্দুর রাজ্জাক (দাল্লু মিয়া), (৫) খাজা আঃ রাজ্জাক (হিংগু মিয়া), (৬) খাজা আঃ করিম, (৭) খাজা আঃ রহিম, (৮) খাজা আঃ কাইউম, (৯) খাজা বদরুদ্দিন, (১০) খাজা মোঃ ইসমাইল, (১১) খাজা ইকরামুদ্দিন। এছাড়াও উক্ত ছবিতে কোচ মিঃ ওয়াটসন এবং নওয়াবের ছোট ভাই খাজা আতিকুল্লাহও রয়েছেন। পরিশিষ্টে চিত্র নং-৬১-তে ছবিটি দেয়া হলো। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উক্ত অফিসার একজন নিপুন খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি নওয়াব ইউনিয়ন ক্লাবকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি নামকরা প্রথম শ্রেণীর দলে পরিণত করেছিলেন।[৮৫] আহসান মঞ্জিলের উত্তর প্রাঙ্গণে হকি খেলার একটি কোর্টও তৈরী করা হয়। উক্ত হকি দলের সাফল্য পরবর্তীকালে ঢাকার অনেককেই হকি দল গঠন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিশেষ করে খাজা পরিবারের নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ, খান বাহাদুর খাজা মোঃ ইসমাইল, খাজা সুলেমান কাদর, খাজা মোঃ ইব্রাহিম ঢাকায় হকি খেলা সংগঠন ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নওয়াব পরিবারের মধ্যে হকি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে এই পরিবার থেকেই অন্তত চারটি হকি দল গঠিত হয়েছিল। তবে এসব দলে খাজা পরিবারের বাইরে থেকেও যে ২/১ জন খেলোয়াড় থাকতেন না এমন নয়। দলগুলোর নাম ছিল (১) নওয়াব ইউনিয়ন ক্লাব, (২) ব্যাচেলর্স ইউনিয়ন, (৩) আতিকুল্লাহ একাদশ, (৪) ঢাকা একাদশ।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

ঐ আমলে ঢাকার পল্টন ময়দান প্রায়ই নওয়াব বাড়ীর হকি খেলোয়াড়দের পদচারণায় মুখরিত হয়ে থাকতো। পরবর্তীকালে ঢাকার অন্যান্য ক্রীড়ামোদীদের দ্বারা বেশ কয়েকটি নামকরা হকি দল গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে ওয়ারী ক্লাব, ভিকটোরিয়া ক্লাব, ওয়ান্ডার্স ক্লাব, ঢাকা কলেজ ক্লাব প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। খাজা মওদুদের ডাইরী পাঠে জানা যায়, ১৯১৩ সালের ২৩ মার্চে নওয়াব বাড়ীর হকি দল ঢাকাস্থ গুর্খা সেনাবাহিনীর হকি দলকে ৬-০ গোলে পরাজিত করে। কিন্তু গুর্খাদল মাতাল অবস্থায় থাকায় নওয়াব বাড়ীর জনৈক খেলোয়াড় গুরুতর আহত হয়।[৮৭]

উল্লেখ্য, বিগত বিশ ও ত্রিশের দশকে ময়মনসিংহ শহরেও হকি খেলার কয়েকটি ভাল দল গড়ে উঠেছিল। এতদাঞ্চলের যেখানেই হকি খেলার প্রতিযোগিতা হতো, নওয়াব বাড়ীর দলগুলো সেখানে অংশ নিতো এবং প্রায়ই তাঁরা খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। এমনকি প্রায়ই তাঁরা ময়মনসিংহে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করতেন।[৮৮] নওয়াব পরিবারের হকি দলগুলোর মধ্যে 'ব্যাচেলর্স ইউনিয়ন' নামক দলটি বহুদিন যাবৎ পূর্ববাঙলায় সর্বাপেক্ষা নামকরা হকিদল হিসেবে পরিচিত ছিল। দলটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা সুলেমান কাদর। তিনি সাধারণতঃ ঐ দলে গোলরক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন।[৮৯] অল্পদিনের মধ্যেই দলটি প্রভূত সাফল্য অর্জন করে। ১৯১৬ সালে দলটি কলকাতায় তৎকালীন ভারতের সর্বাপেক্ষা নামকরা টুর্ণামেন্ট 'ব্যাটন কাপ' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছিল। পর বছর 'ব্যাচেলর্স ইউনিয়ন' কলকাতায় অন্যতম সেরা দল কলকাতা কাষ্টমস্- এর বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলে রানার্স আপ হয়। ব্যাটন কাপের ইতিহাসে ব্যাচেলর্স ইউনিয়নই একমাত্র দল যাঁরা ঢাকা থেকে কলকাতায় হকি খেলতে গিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। সমকালীন পত্রিকা দি স্টেটম্যান তাঁদের ক্রীড়া বিষয়ক কলামে লিখেছিল, 'ব্যাচেলর্সই ভালো খেলেছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে কাষ্টমস্ জয়ী হয়। ব্যাচেলর্সের কে. এম. আলীম তো চীনের অজেয় প্রাচীরের সাথে তুলনীয়।" ঐ আমলে নওয়াব পরিবারের খাজা আঃ কাইউম, খাজা কেনু মিয়া, খাজা নুরুদ্দিন, খাজা মোঃ আলীম প্রমুখ হকি খেলায় খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন।[৯০] উল্লেখ্য, খাজা মোঃ আলীম ছিলেন সর্বভারতীয় হকি দলের একজন নামকরা খেলোয়াড়। খাজা মওদুদের ডাইরী পাঠে জানা যায়, ১৯১৯ সালের ১৪ এপ্রিল খাজা সুলেমান কাদরের নেতৃত্বে নওয়াব বাড়ীর হকি দল খেলায় অংশ নিতে আবার কলকাতায় গমণ করে। কিন্তু খেলায় পরাজিত হয়ে ২৩ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসে। নওয়াব বাড়ীর বিজয়ী খেলোয়াড়দের আরেকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৬২ তে দেয়া হলো।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নওয়াব পরিবারের খাজা মোঃ আদেল ও খাজা মোঃ আজমল নামক দুইভাই বেংগল হকি এসোসিয়েশন এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর রেফারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা ঢাকা ও কলকাতায় বহুবার এসব খেলা পরিচালনা করেছিলেন।[৯১]

বিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ঢাকার পূর্বোক্ত ক্লাব গুলোর সাথে নওয়াব পরিবারের দলগুলোর তুমুল হকি প্রতিযোগিতা হতো। বর্তমান গুলিস্তান সিনেমা হল এলাকায় তখন ঢাকা স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশনের খেলার মাঠ ছিল। টিন দিয়ে ঘেরা এবং কাঠের গ্যালারী বিশিষ্ট উক্ত মাঠে প্রায়ই টিকিট কেটে খেলা অনুষ্ঠিত হতো। ঐ আমলে নাথান'স কাপ নামে একটি টুর্ণামেন্টে প্রায়ই ওয়ারী ক্লাব জয়ী হতো। উনিশ'শ চল্লিশের দশকে নওয়াব বাড়ীর ব্যাচেলর্স ইউনিয়নই শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়।[৯২] ঢাকার টুর্ণামেন্টগুলোর মধ্যে 'আতিকুল্লাহ কাপ' নামে একটি নামকরা খেলা হতো। কাপটি ১৯১২ সাল থেকে শুরু করে পুরো পাকিস্তান আমল ধরে চালু ছিল। নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ কাপটি দান করেছিলেন।[৯৩] তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এ টুর্ণামেন্ট আয়োজনে প্রায়ই অর্থ দেয়া হতো। এতে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হকি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক দল ও পুলিশের দলগুলো এতে অংশ নিতে আসতো। ১৯৪৭ সালে খাজা আতিকুল্লাহ মারা যাবার পর ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন ঐ টুর্ণামেন্টটির ব্যবস্থা করতো। তখনো একাধিক পশ্চিম পাকিস্তানী দলকে এতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যেতো।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোক্ত খাজা সুলেমান কাদর এক সময় ঢাকা স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারীও ছিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নওয়াবজাদা খাজা হাফিজুল্লাহ নওয়াব পরিবারের হকি খেলার হাল ধরেন। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে বেশী দায়িত্ব নিতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে এসময় খাজা সুলেমান কাদরের পুত্র খাজা রহমান কাদরই হকি খেলা সংগঠনের কাজ-কাম করতেন। শেষ পর্যন্ত নওয়াব পরিবারের খাজা মোঃ ইব্রাহিম সফলতার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে খাজা ইব্রাহিমই ব্যাচেলর্স ইউনিয়নের মাধ্যমে নওয়াব পরিবারের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও খেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত দলকে পুনরায় কলকাতায় ব্যাটন কাপ খেলায় অংশ গ্রহণের উপযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালে ব্যাচেলর্স ইউনিয়ন শেষবারের মত কলকাতায় ব্যাটন কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কিন্তু প্রথম রাউন্ডের খেলাতেই তাঁরা বেংগল আসাম-রেলওয়ের নিকট ২-১ গোলে পরাজিত হয়। দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন খাজা আতাহার। এই আমলে যাঁরা ব্যাচেলর্স ক্লাবে খেলে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তন্মধ্যে খাজা মঈনুদ্দিন, খাজা তানীম, খাজা ফজলুল হক, খাজা রহমান কাদর, খাজা মহিউদ্দিন, খাজা ইউসুফ রেজা, খাজা জহির, খাজা আতাহার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উক্ত ব্যাটন কাপ প্রতিযোগিতার সময় পুরো দলটি নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহর অতিথিরূপে কলকাতায় তাঁর ম্যাকলয়ড রোডের বাড়ীতে অবস্থান করেছিল।[৯৪] উক্ত ব্যাচেলর্স ইউনিয়নের জার্সি ছিল সবুজ রঙের গেঞ্জি এবং কালো রঙের প্যান্ট, বুকের উপর সোনালী রঙের 'ভি' চিহ্নযুক্ত বর্ডার। পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে এতদাঞ্চলে হকি খেলায় ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মত ছিল। এমনকি বাংলাদেশ আমলেও এ খেলায় তাঁদের বেশ কিছুটা সম্পৃক্ততা রয়েছে। দিলখুশার বাড়ীতে বসবাসকারী নওয়াব পরিবারের লোকদের দ্বারা পাকিস্তান আমলে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালিত হতো। তাঁরাও ঢাকা ওয়ান্ডার্স এবং অন্যান্য দলের সাথে তুমুল প্রতিযোগিতা করে হকি খেলতেন। উল্লেখ্য, এক সময় খাজা ইব্রাহিমের সংগঠিত দলের অনেকেই ঢাকা ওয়ান্ডার্সের পক্ষে খেলতেন এবং ঐ সময় তাঁরা পর পর তিন বার ঢাকা হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।[৯৫]

নওয়াব পরিবারের খাজা ইউসুফ রেজা বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের কোচ ছিলেন। তিনি হকি জগতে প্রবেশের শুরুতেই তাঁর দক্ষতা প্রমাণের প্রয়াস পান। ১৯৩৯ থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে সুদক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ঢাকার মলমল নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। ১৯৫২ সালে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নশীপে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হকি দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের হকি খেলায় তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য এবং এই খেলার মান উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর এই অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৭৯ সালে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেন।[৯৬] খাজা ইব্রাহিমও ১৯৫২ সালে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় পূর্ব পাকিস্তান দলের পক্ষে খেলার সম্মান পেয়েছিলেন।[৯৭] এছাড়াও খাজা পরিবারের কে. নূরুল, কে. মোদাচ্ছের, কে. হাবিবুল্লাহ, কে. জাফর, কে. শফিক প্রমুখ বিভিন্ন সময় পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলতেন।[৯৮]

বাংলাদেশ আমলেও খাজা পরিবারের লোকেরা হকি দল গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। বিগত আশির দশকের শুরুতে খাজা লতিফুল্লাহকে সভাপতি ও খাজা রুকুনুদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে 'ইউনাইটেড বয়েজ ক্লাব' নামে একটি হকি দল গঠন করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই দলটি প্রথম বিভাগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেও অর্থাভাবে এবং উদ্যোক্তাদের ব্যর্থতার কারণে সেটা বিফল হয়ে যায়। ঐ সময় খেলায় যাঁরা পরিচিতি লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন- কে. মানজের নাদিম, কে. জিয়াউদ্দিন, কে. দানিয়েল, কে. আওরঙ্গজেব, কে. সিকান্দার, কে. বাদল, কে. রেজোয়ান, কে. শাহাবুদ্দিন, কে. সামিউদ্দিন প্রমুখ।[৯৯] ঢাকায় বর্তমানে হকি খেলার দুর্দিন চলছে বলা যায়। তবুও ব্যাচেলর্স স্পোর্টিং ক্লাব নামে একটি হকি দল এখনো ঢাকা নওয়াব পরিবারের পূর্বোক্ত হকি দলের ধারা কোন রকমে বহন করে চলছে। খাজা

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদ এবং কে.এহসানুল হক (ভোলা মিয়া) দলটি পরিচালনা করে থাকেন। খাজা নাদের, খাজা রেজোয়ান, খাজা ফাইয়াজ, খাজা ওয়ায়েস, বাবু, লতিফ প্রমুখ যুবকগণ ঐ দলে খেলে থাকেন।[১০০] খাজা ফরিদও এক সময় কৃতি হকি খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে দিল্লীতে এশিয়াড হকি খেলায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৯(৪) বিলিয়ার্ড ও টেনিস খেলায় পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

বিলিয়ার্ড খেলার প্রতি ঢাকার নওয়াবগণ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায় তিনি প্রায়ই ইংরেজ সাহেবদের সাথে বিলিয়ার্ড খেলায় যোগ দিতেন। বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্ক এলাকায় অবস্থিত বিলিয়ার্ড ক্লাবটি (আন্টাঘর) ঢাকার নওয়াবদের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো। এমনকি বরিশাল শহরেও বিলিয়ার্ড খেলার জন্য ঢাকার নওয়াব অর্থদান করেছেন।[১০১] আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবনের নীচতলার একটি কক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ একটি বৃহদাকার বিলিয়ার্ড টেবিল স্থাপন করেছিলেন। এতসুন্দর বিলিয়ার্ড টেবিল এতদাঞ্চলে দেখা যায়না। টেবিলটার উপরে আলোকায়নের জন্য নির্মিত ঝুলন্ত বাতির ব্যবস্থাটি খুবই চমৎকার। নওয়াব পরিবারের সদস্যগণ ছাড়াও এই প্রাসাদে আগত সম্মানিত অতিথিরা এই টেবিলে বিলিয়ার্ড খেলতেন। ১৯০৪ সালে মিঃ ফ্রিৎজকাপের তোলা উক্ত বিলিয়ার্ড টেবিলের একটি দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৬৩-এ দেয়া হলো। পরবর্তী কালে এই টেবিলকে কেন্দ্র করে নওয়াব পরিবারে একটি বিলিয়ার্ড খেলার ক্লাব গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। ক্লাবের সদস্যগণ খেলাটির ব্যাপক চর্চা করতেন। খাজা শামসুল হকের ডাইরী থেকে উক্ত ক্লাবের ক্রীড়া চর্চা নিয়ে অনেক তথ্য জানা যায়।

টেনিস খেলার প্রতি অনুরাগ বশত নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর শাহবাগ বাগানবাড়ীতে উক্ত খেলার জন্য একটি সুন্দর মাঠ প্রস্তুত করেছিলেন। ঢাকাস্থ ইংরেজ সাহেব ও মেমদেরকে প্রায়ই তিনি নিমন্ত্রণ করে এনে উক্ত স্থানে ক্রীড়ানুষ্ঠান করতেন।[১০২] নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় পর্যন্ত উক্ত টেনিস খেলার মাঠটির যত্ন নেয়া হতো এবং পরিবারের অনেকেই সেখানে খেলতেন। ঢাকার নওয়াবদের দিলখুশা বাগানবাড়ীতেও টেনিস খেলার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে বসবাসকৃত খান বাহাদুর খাজা মোঃ আজম টেনিস খেলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি প্রায়ই এ খেলা অনুষ্ঠানের জন্য দামী কাপ পুরস্কার দিতেন। খাজা মওদুদের ডাইরী পাঠে জানা যায়, ১৭ ফেব্রুঃ ১৯১৫ তারিখে উক্ত কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় নওয়াব পরিবারের খাজা দাল্লু মিয়া ও খাজা মোঃ সেলিম জুটির সাথে খাজা ওহিউদ্দিন ও খাজা মোঃ আলীম জুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথম পক্ষ কাপটি জিতে নেয়। এছাড়া ১৯১৮ সালের ১৩ মার্চ খাজা মোঃ আজমের দেয়া অনুরূপ আরেকটি কাপের চূড়ান্ত খেলায় উপরোক্ত একই জুটির মধ্যে দিলখুশার মাঠে প্রতিযোগিতা হয়েছিল।[১০৩] উক্ত ডাইরী পাঠে আরো জানা যায় ১৯১৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পল্টনের মাঠে একটি কাপ জয় উপলক্ষে টেনিস খেলা হয়। উক্ত খেলায় নওয়াব বাড়ীর খাজা সুলেমান কাদর ও হুমায়ুন কাদর জুটির সাথে খাজা মোঃ আলীম ও খাজা ওহিউদ্দিন প্রতিযোগিতা করেন। কিন্তু সেবার খেলাটি ড্র হয়।

৯(৫) তাস ও দাবা খেলা ঃ

নওয়াব পরিবারের লোকেরা তাস ও দাবা খেলা খুবই পছন্দ করতেন। মোতাওয়াল্লী কিংবা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে জমিদারি পরিচালিত হবার কারণে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদেরই তেমন কোন কাজ ছিল না। বেশীর ভাগ সময় তাঁরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বসে বসে তাস পাশা খেলতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেও তাস খেলতেন। নওয়াব বাড়ীতে আগত বিশিষ্ট অতিথিদের তাস খেলার জন্য তিনি আহসান মঞ্জিলের দোতলার একটি কক্ষকে নির্ধারিত

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তাস খেলার জন্য নির্মিত বিশেষ ধরণের টেবিল ও চেয়ার দ্বারা কক্ষটি সাজানো হয়েছিল। এছাড়া আনুসাংগিক তৈজসপত্র, পানপাত্র ও ফুলদানী দিয়ে কক্ষটিতে রাখা শোকেসগুলো সজ্জিত ছিল। ১৯০৪ সালে তোলা মিঃ ফ্রিৎজকাপের তোলা উক্ত কার্ড রুমের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পরিশিষ্টে চিত্র নং-৬৪ তে দেয়া হলো। নওয়াবদের ব্যবহৃত রূপার তৈরী একটি সুন্দর নকশালংকৃত তাস বাক্স এখনো আহসান মঞ্জিলে রয়েছে।[১০৪] ব্রীজ খেলার অনুরূপ মন্দিলা নামে একটি তাসের খেলা নওয়াব পরিবারে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাস খেলায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রায়ই প্রতিযোগিতা হতো। ঘরোয়া পরিবেশে নওয়াব পরিবারের মহিলারাও তাস খেলতেন বলে জানা যায়।

নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রায়ই দাবা খেলার আসর জমাতেন বলে জানা যায়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ৫ জানুয়ারী ইংরেজ সাহেব ও মেমদের এক অভিনব পদ্ধতিতে দাবা খেলার কথা তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন। ঐদিন কলকাতায় টাউন হলে সাদা ও লাল রঙের পোষাক পড়ে তারা নিজেরাই দাবার ঘুঁটি সেজে ছকে দাড়িয়ে খেলা করেন। পুত্র খাজা সলিমুল্লাকে সাথে নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ রাত নয়টা থেকে এগারটা পর্যন্ত ঐ খেলা উপভোগ করেন। নওয়াব হাবিবুল্লাহর দাবা খেলার খুব শখ ছিল। তাঁর সাথে খাজা মৌলভী মিয়া, খাজা ওলি মিয়া, খাজা কামরুদ্দিন প্রমুখগণ দাবা খেলতেন। তাঁর ব্যবহৃত দাবার ঘুঁটিগুলো ছিল কাঠের তৈরী বড় বড় আকৃতির এবং খুবই মসৃণভাবে পলিশ করা।[১০৫] ঢাকা নওয়াব পরিবারে ব্যাডমিন্টন খেলাও বেশ জনপ্রিয় ছিল। নওয়াব আহসানুল্লাহ প্রায়ই ব্যাডমিন্টন খেলায় অংশ নিতেন। ব্যাডমিন্টনে তাঁর দলের সাফল্যের কথাও তিনি তাঁর ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন।[১০৬]

৯(৬) ক্রিকেট খেলা চর্চা ঃ

নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায়, তিনি ক্রিকেট খেলা খুবই পছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই পরিবারের উৎসাহী খেলোয়াড় এবং ইংরেজ সাহেবদের নিয়ে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করতেন এবং নিজেও উক্ত খেলায় যোগ দিতেন।[১০৭] তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় একটি ক্রিকেট দলও গড়ে উঠেছিল। ১৮৭৪ সালে ১৩মে তিনি দিলখুশা বাগানবাড়ীর মাঠে ক্রিকেট খেলার একটি বড় আয়োজন করেন। খেলা শেষে বল নাচেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।[১০৮] ১৮৭৪ সালের ২০ মে এবং ৩ জুন নওয়াবের দলটি ক্রিকেট খেলায় বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল বলে তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন।[১০৯] তাঁর আমলে ক্রিকেট ঢাকায় এমনই সফলতা অর্জন করেছিল যে, একবার তুমুল প্রতিযোগিতায় ঢাকার ছাত্রগণ কৃষ্ণনগর কলেজকে ঐ খেলায় পরাজিত করেছিল।[১১০] নওয়াব আহসানুল্লাহর অর্থ সাহায্যে কলকাতায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ক্রিকেটে 'নওয়াব আহসানুল্লাহ টুর্ণামেন্ট' নামে একটি নামকরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন একথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা থেকে জানা যায় ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের ক্রিকেট খেলার জন্য তাঁরা বহুবার অর্থদান করেছেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ হকিতে বেশী মনোযোগ দেয়ায় তাঁর আমলে খাজা পরিবারের ক্রিকেটে সাফল্যের কথা তেমন জানা যায় না। নওয়াব হাবিবুল্লাহ ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করতেন এবং নিজেও একসময় খেলতেন। আহসান মঞ্জিলের উত্তর আঙিনায় নওয়াব পরিবারের যুবকদেরকে তিনি অনেক সময় ক্রিকেট খেলা শেখাতেন বলে জানা যায়।[১১১] মোট কথা এতদাঞ্চলে বর্তমান কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটের প্রতিপালনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯(৭) ঢাকায় ঘুড়ি উড়ানো ঃ

বহুকাল ধরে ঘুড়ি উড়ানো ঢাকায় একটি জনপ্রিয় খেলা হিসেবে পরিচিত। চারকোনা বিশিষ্ট এক খন্ড কাগজের সাথে দুটি চিকন শলা যোগ করে তৈরী বিশেষ ধরণের ঘুড়িটাই ঢাকায় এযাবৎ জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। তবে নানা রকম রঙ ও নক্‌শা যোগ করে এই ঘুড়ির বিভিন্ন নাম দেয়া হয়।[১১২] নওয়াবদের আমলে ঢাকার লোকেরা এই ঘুড়ি খেলার প্রতিযোগিতার জন্য বহু টাকা ব্যয় করতো।[১১৩] এমনকি জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র ঘুড়ির সাথে তৎকালীন ৫ টাকার নোট বেঁধে বেঁধে উড়িয়ে বহু টাকা নষ্ট করেছিল।[১১৪] বর্তমান কালের মত সেযুগে ঢাকায় এত উঁচু উঁচু ভবন এবং ঘনবসতি ছিল না। তাই ঘুড়ি উড়ানোর মত অনুকূল পরিবেশও তখন ছিল। উক্ত কারণে এখন ঢাকায় ঘুড়ি উড়ানো খেলা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে পুরানো ঢাকায় এখনো কিছু ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়।

কাশ্মীর থেকে আগত ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরা স্থানীয় সংস্কৃতির এই খেলাটি খুবই সহজভাবে গ্রহণ এবং সফলভাবে চর্চা করেছিলেন। ঘুড়ির খেলায় তাঁরা খুবই নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সেযুগে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতাকে বলা হতো 'হারিফী'। সাধারণত এক মহল্লার সাথে অন্য মহল্লার লোকদের প্রতিযোগিতা হতো। কামরাংগীর চর, রমনার মাঠ, আরমানিটোলার মাঠ, পল্টন ময়দান, নওয়াব বাড়ীর প্রাঙ্গণ কিংবা দিলখুশার মাঠ প্রভৃতি স্থানে হারিফী অনুষ্ঠিত হতো। প্রত্যেক দলে ৪/৫ জন করে সদস্য থাকতো। একদল অন্যদলের উড়ানো ঘুড়িকে ছিঁড়ে, ফেঁড়ে কিংবা সূতা কেটে দেয়ার চেষ্টা করতো। খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ এ খেলায় পরাজিত দল উভয় পক্ষের লোকদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করতেন।[১১৫] নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী পাঠে জানা যায়, তিনি প্রায়ই ঘুড়ি উড়াতেন এবং বহুবার ঘটা করে বড় ধরণের হারিফীর আয়োজন করেছেন।[১১৫(ক)]

ঢাকা নওয়াব পরিবারের যেসব লোক হারিফীতে পারদর্শী ছিলেন তাঁরা হলেন- খাজা আঃ ছামাদ, খাজা হাশেম, খাজা মহিউদ্দিন, খাজা মুখতার, খাজা মঈনুদ্দিন প্রমুখ। এদের মধ্যে আবার খাজা মঈনুদ্দিন ছিলেন সবার সেরা এমনকি অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হারিফীতে অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করতেন। খাজা পরিবারের লোকেরা প্রায়ই নওয়াব বাড়ীর বৃহৎ প্রাংগণে কিংবা দিলখুশা বাগানবাড়ীর মাঠে 'হারিফী' আয়োজন করতেন। এতে অন্যান্য মহল্লার লোকেরাও যোগ দিতেন।[১১৬] ঘুড়ি উড়ানোতে নওয়াব বাড়ীর লোকদের এমনই সুনাম ছড়িয়েছিল যে, একবার আগরতলার মহারাজা তাঁদেরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা এ খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আসেন।[১১৭] ১৯৪৮ সালে নওয়াব হাবিবুল্লার উদ্যোগে নওয়াব বাড়ীর লোকেরা রেসকোর্স ময়দানে একটি বড় ধরণের হারিফীতে অংশ নেয়। তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিলেন জনাব আঃ সোবহান নামে জনৈক সিভিল সার্ভেন্ট। ঐ প্রতিযোগিতায় প্রতি দলে ৫০ জন করে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে উভয় পক্ষ মিলে ঘটা করে ভোজের আয়োজন করে।[১১৭(ক)]

শীতকালে প্রায় প্রতিদিনই নওয়াব বাড়ীর লোকেরা যার যার মত ঘুড়ি উড়াতেন এবং সুযোগ পেলে একে অন্যের ঘুড়ি কেটে দিতেন। এতে কারো কিছু বলার থাকতো না। এখনো নওয়াব বাড়ীর পুকুরপাড়ে বসবাসকারী কেউ কেউ বাড়ীর ছাদে চড়ে এরূপ ঘুড়ি উড়িয়ে থাকেন। কাটাকাটির প্রয়োজনে ঘুড়ির সূতা ধারালো করার জন্য ঢাকার লোকেরা শিরিশ আঠার সাথে মিহি কাঁচের গুড়া মিশিয়ে সূতায় মাঞ্জা দিত। নওয়াব বাড়ীর গোলপুকুর পাড়ে প্রায়ই এরূপ মাঞ্জা দেয়া সূতা শুকাতে দেখা যেতো।[১১৮] ঢাকার ঘুড়ি উড়ানোর একটা বিশেষ দিক ছিল সুন্দর সুন্দর নাটাইয়ের ব্যবহার। কাঠ কিংবা বাঁশ কেটে নক্‌শা করে এগুলো তৈরী হতো। নওয়াব পরিবারের লোকদের কাছে এখনো দু'একটি এরূপ সুন্দর নাটাই দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। বাংলা বিশ্বকোষ, আঃ হাকিম সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৮৯ দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ৪০১ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ২ এপ্রিল ১৮৯৩।

২। *মোসলেম ক্রনিকেল,* ২৮ ফেব্রুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

৩। ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬ এবং দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৬

৪। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৪।

৫। সিরাজুল ইসলাম, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৮ আগস্ট ১৯৭৮।

৬। ঢাকা প্রকাশ ৯ ডিসেঃ ১৮৯৫ পৃঃ ৫।

৭। লোকনাথ ঘোষ, *ইন্ডিয়ান চীফস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯ এবং সি. ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬।

৮। চিত্রটি বর্তমানে, খাজা পরিবারের প্রবীণ সদস্য খাজা মোঃ হালিমের নিকট (ঢাকায়) রয়েছে।

৯। তৈফুর, ঢাকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪১ এবং তায়েশ, তাওয়ারিখ, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৫৮ এবং শরিফুদ্দিন, ঢাকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১।

১০। ঢাকা প্রকাশ, ১২ জানুঃ ১৮৯৬, ১৭ ডিসেঃ ১৮৮২ পৃঃ ৪৭২; ৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৯; ২ ও ৯ ফেব্রুঃ ১৮৯০; ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯২।

১১। ১৯৮২ সালে রাজকুমার ইন্দ্র সিং ঘোড়া নিয়ে ঢাকা আসেন। ঢাকা পৃঃ ১০ ডিসেম্বর ১৮৮২; ১৮৯১ খ্রীঃ কলকাতার ক্যাপ্টেন ওয়ার্লো অনুরূপ ঢাকায় আসেন। ঢাকা প্রঃ ডিসেঃ ১৮৯১।

১২-১৩। *মোসলেম ক্রনিকেল,* ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

১৪। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫।

১৫। একদিন জনৈক ব্যক্তির কেটে ফেলা একটি বড় গাছের শব্দে নওয়াবের ঘোড়াটি ভয় পেয়ে ছুটে পালালে তিনি কোমরে চোট পান। তখন থেকে চিকিৎসক তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে নিষেধ করেন। নওঃ আহসানুল্লাহ, *তারিখে খান্দান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৭-৩৮।

১৬। ঢাকা প্রকাশ, ২ জানুঃ ১৮৭৬ পৃঃ ৪৫৯, ৪৬১-৬৩ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫।

১৭। *মোসলেম ক্রনিকেল,* ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

১৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ডিসেঃ ১৮৭৫।

১৯। তৈফুর *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫।

২০। *মোসলেম ক্রনিকেল,* ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

২১। কাপটির গায়ে খোদিত লিপি থেকে উক্ত তথ্য জানা যায়। নিদর্শণটির সংগ্রহ নং-আঃ ৯০.১৫১০-১-২।

২২। মাদ্রাজের ও. আর. আর. এন্ড সন্স কর্তৃক তৈরী উক্ত কাপটির গায়ে হিন্দু দেব দেবীর প্রচুর নকশালংকরণ রয়েছে। জাদুঘরে সেটার সংগ্রহ নং- আঃ ৯০.১৫১৮-১-৩।

২৩। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২ ও ৯ ফেব্রুঃ ১৮৯০।

২৪। ঢাকা প্রকাশ , ডিসেঃ ১৮৯১ এবং ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯২ পৃঃ ৮।

২৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯২ পৃঃ ৮ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, প্রাগুক্ত ৯-১১ জানুঃ ১৮৮৩।

২৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৯।

২৭। মোসলেম ক্রনিকেল, ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

২৮। ১৯৯৩ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি ডাইরীতে রেসে অংশ নেয়া যে ঘোড়াগুলোর নাম লিখেছিলেন তাহলো- এ্যাসটারিয়ড, স্পেনডল, জুলেখা, জেল, ইস্পাহান, লেডী এ্যান- ইত্যাদি।

২৯। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত তাং-৯, ১১, ১৩ জানুঃ ১৮৯৩ এবং ইংরেজীতে লেখা ডাইরী, অপ্রকাশিত, তাং ৯ জানুঃ ১৮৭৪।

৩০। মোসলেম ক্রনিকেল, ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

৩১। মোসলেম ক্রনিকেল, ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫৫।

৩২। অর্থ দানের তালিকা, ১৯০০-১৯০৩ সাল দ্রঃ।

৩৩। নওয়াবদের অর্থদানের তালিকা, ক্রমিক ৩৪, ১৬ এবং ১৯০৩ সাল দ্রঃ।

৩৪। তথ্যগুলো খাজা মোঃ হালিম ও খাজা লতিফুল্লাহর মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে সংগৃহীত। ১৯০৪ সালের ২৬ অক্টোবর কলকাতার জাম বাজার স্ট্রীট থেকে জনৈক ব্যক্তি নওয়াবের রেসের ঘোড়াগুলো ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহকে যে পত্র দিয়েছিলেন, সেটা এখনো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রয়েছে। পুরানো দলিলপত্র দ্রঃ।

৩৫। আলোকচিত্রটি খাজা নাজিমুদ্দিনের বোন আলমাসী বানুর পুত্র শেখ মোহাঃ আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩৬। দি বেংগল টাইমস, ৩ ডিসেম্বর ১৯০২ ।

৩৬।(ক) লর্ড কার্জনের ঢাকা সফরকালে প্রথম ঢাকায় মটর গাড়ী আসে। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ডিসেঃ ১৯০৭।

৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ১১ জুলাই ১৯২৬।

৩৭-৩৯। তথ্যগুলো খাজা লতিফুল্লাহ, খাজা আব্দুল হালিম (অবসরপ্রাপ্ত উপ-সচিব) এবং খাজা মোঃ হালিম (প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার) এবং পরিবাগের মরহুমা বেগম সাহেন শাহ জামান-এর মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৬) থেকে সংগৃহীত।

৪০। *হিস্টরী অব ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ,* প্যারা ২৮ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মোঃ আব্দুল্লাহ,আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন দিশারী (অপ্রকাশিত, পান্ডুলিপি) পৃঃ ৭৮। ওয়াকিল আহমদ ক্লাবটি প্রতিষ্ঠার সাল ১৮৯২ বলেছেন। দেখুনঃ উনিশ শতকে- প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড পৃঃ ১৯৪।

৪১। মোসলেম ক্রনিকেল, ১১ জুলাই ১৮৯৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী,...* প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ১৯৪।

৪২। অর্থ দানের তালিকার ক্রমিক ৪১,২২৫,২৪৪,২৬৫,২,১৯০, এবং ১৯০২-৪ সাল দ্রঃ।

৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ জানুঃ ১৯০০ পৃঃ ৪ এবং অর্থ দানের তালিকার ক্রমিক ২৬৫। ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসেও অনুরূপ রমনার মাঠে আন্ত হাইস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়, যাতে ঢাকা স্পোর্টিং এসোঃ কর্তৃক দেয়া কাপটি কলেজিয়েট স্কুল জিতে নেয়। ঢাকা প্রকাশ, ৫ নভেঃ ১৯১১ পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। অর্থ দানের তালিকা, ১৯০৩-৪ সাল দ্রঃ।
৪৫। সাপ্তাহিক মোসলেম ক্রনিকেল, ২০ সেপ্টেঃ ১৯০২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯২। তবে জনাব বদিউজ্জামান ক্লাবটির গঠনকাল ১৮৯১ বলেছেন পৃঃ ২।
৪৬। মোসলেম ক্রনিকেল, ১৭ জানুঃ ১৮৯৫ পৃঃ ১৬।
৪৭। ঐ সময় ক্লাবের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল এবং মাসে প্রায় ৫৯ টাকা আয় হতো। মোসলেম ক্রনিকেল, ২ মে ১৮৯৬
৪৮। অর্থ দানের তালিকা ক্রমিক নং- ২৫০, ২৭৪, ১১৫।
৪৯। মোসলেম ক্রনিকেল, ১৮ সেপ্টেঃ ১৮৯৭ এবং ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড পৃঃ ১৯৩।
৫০। এছাড়া নওয়াব আমীর হোসেনের দানে শুরু হয় আমীর হোসেন হকি টুর্নামেন্ট। দেখুন-বদিউজ্জামান, মুসলিম জাগরনে মোহামেডান স্পোর্টিং, দ্বিতায় প্রকাশ, নভেঃ ১৯৮৯ পৃঃ ৪।
৫১। মোসলেম ক্রনিকেল, ১৮ মার্চ ১৮৯৯ পৃঃ ১৪৯।
৫২। মোসলেম ক্রনিকেল, ১৭ জানুঃ ১৮৯৫ পৃঃ ১৬।
৫৩। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে* --- , প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড পৃঃ ১৯৪।
৫৪। মোসলেম ক্রনিকেল, ১১ জুলাই ১৮৯৫ পৃঃ ২৮০ এবং ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৪।
৫৫। মোসলেম ক্রনিকেল, ১২ আগস্ট ১৮৯৯ পৃঃ ৪৫৬ এবং ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ২০৭।
৫৬। মোসলেম ক্রনিকেল, ১২ আগস্ট ১৮৯৯ পৃঃ ৪৫৬ থেকে সংকলিত।
৫৭। খাজা মওদুদের ব্যক্তিগত ডাইরী, (উর্দু-অপ্রকাশিত) খাজা হালিমে নিকট রক্ষিত।
৫৮। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬-৭।
৫৯। ঐ, খাজা জহির, ইউসুফ রেজা, প্রমুখ মোহামেডান দলে হকি খেলতেন, দেখুন খাজা ইব্রাহিম, *হকি-ইন-ঢাকা, ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* ১ জানুঃ ১৯৯৪ পৃঃ ১১।
৬০। মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব (স্মরণিকা-রিপোর্ট) কলাকাতা ১৯৪০ পৃঃ ১৫ এবং দৈনিক আজাদ ৬ কার্তিক ১৩৭১ এবং মাহে নও ডিসেম্বর ১৯৬৪ পৃঃ ৫১।
৬১। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০ এবং ভারত বর্ষ, ২৪ বর্ষ, ১ম খন্ড ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৩ বাংলা, পৃঃ ১৬২-৬৭।
৬২। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯-২০।
৬৩। খাজা সাইদ শাহাবুদ্দিন, *দি মোহামেডানস, ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচী ১ এপ্রিল ১৯৯৪ পৃঃ ১২।*
৬৪। দৈনিক আজাদ, ৯ জুলাই ও ১৭ আগস্ট, ১৯৪১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬১, ৬৩ ও ৭৭।
৬৫। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০।
৬৬। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০।
৬৭। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭।
৬৮। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১।
৬৯। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫২।
৭০। রশিদ আহমদ (জুনিয়র বা ছোট রশিদ) ১৯১৬ সালে কুমিল্লায় জন্ম নেন। ঢাকা নওয়াব বাড়ীর পাশে বাদামতলীতে তাঁর নানা বাড়ী ছিল। তিনি নওয়াবজাদী পরীবানুর পুত্র খাজা সদরুদ্দিনের কন্যা লায়লা (লাল)-কে বিয়ে করেন। তিনি প্রথমে কলকাতায় কালিঘাটের দলে খেলতেন। ১৯৩৬ সালে তিনি মোহামেডানে যোগ দেন এবং সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পান। তৎকালে মোহামেডানের অধিনায়ক আব্বাস মীর্জা এবং ছোট রশিদ ছাড়া এ দলের খোলোয়াড়রা কেউ গ্রাজুয়েট ছিলেন না। মোহামেডানের খ্যাতনামা সেন্টার ফরোয়ার্ড হাফেজ রশিদের সাথে পার্থক্য বুঝতে তাঁকে ছোট রশিদ বলা হতো। ১৯৩৯ সালে প্রথম বাঙালী মুসলমান হিসেবে জুট টেকনোলজী পড়তে ডান্ডি গমন করায় তাঁর ফুটবল খেলার সমাপ্তি ঘটে। খেলাধুলায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাস্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। কে. এস. শাহাবুদ্দিন, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* ১ এপ্রিল ১৯৯৪ এবং বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২, ৫৪, ৯৭-৯৮।
৭১-৭২। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫-৩৬ এবং কে.এস. শাহবুদ্দিন, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* ১ এপ্রিল ১৯৯৪
৭৩। ভারত বর্ষ, ২৪ বর্ষ, ১ম খন্ড ৩ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৩ (১৯৩৬) পৃঃ ৪৮১ এবং কে. এস. শাহবুদ্দিন, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* ১ এপ্রিল ১৯৯৪ এবং বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬-৩৭।
৭৪। কে. এস শাহবুদ্দিন, *নিউজ লেটার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২-১৩।
৭৫। ছবিটিতে জার্সি পরে বসে আছেন ক্রিকেটার জব্বার। এছাড়া ডান দিক থেকে দাঁড়ানো দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন খাজা মঈনুদ্দিন। বাকীদের নাম উদ্ধার সম্ভব হয়নি। ছবিটি আংশিক নষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে। ছবিটি উদ্ধার করে দেয়ার জন্য লেখক মরহুম শেখ মোঃ আলী, পিতা- শেখ মোস্তফা আলী-এর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।
৭৬। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮।
৭৭। কে. এস. শাহবুদ্দিন বলেন, মোহামেডান ১৯৪১ খ্রীঃ বোম্বের মাঠে ব্রিটিশদের শক্তিশালী ওয়েলস রেজিমেন্ট দলকে পরাজিত করে রোভার্স কাপ জয় করেন। পূর্বোক্ত *নিউজ লেটার,* ১ এপ্রিল ১৯৯৪ পৃঃ ১২।
৭৮। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২।
৭৯। এস. কে. রুকনুদ্দিন, *হকি ইন ঢাকা, ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, ১ সেপ্টেঃ ১৯৯৩ পৃঃ ১১।*
৮০। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫-৭৭ এবং ৮৭।
৮১। বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪।
৮২। কবি নজরুলের মোবারকবাদ, গোলাম মোস্তফার-লীগ বিজয়, আজিজুর রহমানের অগ্রপথিক, মকসেদ আলীর- সালাম লহ ভাই বেরাদর ইত্যাদি কবিতা দ্রঃ।
৮২ (ক) নওয়াব আহসুল্লাহর স্বহস্তে লেখা ডাইরী ইংরেজি ভাষায়, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, সংগ্রহ নং আঃ ৯৩.২৭৪ তাং ৮ জুন ১৮৭৪ খ্রীঃ।
৮৩। খাজা রুকনুদ্দিন উক্ত হকি দলের নাম 'নওয়াব একাদশ' বলেছেন। এস. কে. রুকনুদ্দিন, *হকি ইন ঢাকা, ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* ১ সেপ্টেঃ ১৯৯৩ পৃঃ ১১। কিন্তু খাজা হালিমের কাছে রক্ষিত উক্ত দলের একটি দুস্প্রাপ্য ছবি (পরিশিষ্ট চিত্রঃ ৫৪ দ্রঃ)-এ সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

খেলোয়াড়দের পরিহিত জার্সিতে এন. ইউ. সি. লেখা থাকায় দলটির নাম নওয়াব ইউনিয়ন ক্লাব হওয়াই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। উল্লেখ্য, শারদীয় খেলার আসর নামক একটি বাংলা সমায়িকীর ৬২ পৃষ্ঠায় দেয়া তথ্যে সেটাকে নওয়াব ইউনিয়ন ক্লাবই বলা হয়েছে।

৮৪। ছবিটি নওয়াব পরিবারের প্রবিন সদস্য খাজা হালিমের কাছে সংরক্ষিত।

৮৫। এস. কে. রুকনুদ্দিন, *হকি ইন ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১-১২।

৮৬। এস. কে. রুকনুদ্দিন, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, ১ সেপ্টেঃ ১৯৯৩।*

৮৭। খাজা মওদুদের ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু-অপ্রকাশিত) খাজা হালিমের নিকট রক্ষিত।

৮৮। খাজা রহমান কাদর এবং খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪ খ্রীঃ)

৮৯। খাজা সুলেমান কাদর ঢাকায় খেলাফত আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি এজন্য কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ঢাকা সদর খেলাফত কমিটির সভাপতি হন। তিনি এক সময় ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের অনারারি সেক্রেটারী ছিলেন। উল্লেখ্য, ব্যাচেলর্স ইউনিয়ন নাম দেয়া হলেও দলের বেশীর ভাগ খেলোয়াড় ছিলেন বিবাহিত। এছাড়া কলকাতায় ব্যাটন কাপ প্রতিযোগিতায় ব্যাচেলর্স ইউনিয়ন দলটিকে খেলতে নেয়ার সময় খাজা সুলেমান কাদর ঢাকার অন্যান্য দলগুলো থেকে সেরা খেলোয়াড়দের সংগ্রহ করে দলটি শক্তিশালী করেছিলেন। খাজা রহমান কাদর, নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার, করাচী-মার্চ- এপ্রিল, ১৯৯৩ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২২ অক্টোবর ১৯২২ এবং ঢাকা খিলাফত কমিটির ট্রেজারার, খাজা মওদুদের ডাইরী, অপ্রকশিত তাং-১০-১১-১৯২৭দ্রঃ।

৯০-৯১। খাজা রহমান কাদর, *নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* মার্চ- এপ্রিল, ১৯৯৩ এবং এস. কে. রুকনুদ্দিন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১। পূর্বোক্ত শারদীয় খেলার আসর নামক পত্রিকায় বলা হয়েছে- পর পর তিন দিন চূড়ান্ত খেলা অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়। ৪র্থ দিনে কলকাতা রেঞ্জার্স ক্লাবের সাথে খেলে ব্যাচেলর্স রানার্স আপ হয়।

৯২। খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪)

৯৩। এস. কে. রুকনুদ্দিন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

৯৪। খাজা ইব্রাহীম এবং কে. এম. শাহেদ, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলিজ কন্ট্রিবিউশন টু হকি ইন ঢাকা. ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার.* ১ জানু ১৯৯৪ পৃঃ ১১।

৯৫। খাজা ইব্রাহীম এবং কে. এম. শাহেদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১।

৯৬। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৯ সালে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত সুধীবৃন্দের পরিচিতিমূলক পুস্তিকার দ্বিতীয় পাতা দ্রঃ এবং খাজা রুকনুদ্দিন, প্রাগুক্ত দ্রঃ।

৯৭। খাজা ইব্রাহীম এবং কে. এম. শাহেদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১।

৯৮। এস. কে. রুকনুদ্দিন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

৯৯। এস. কে. রুকনুদ্দিন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

১০০। উক্ত দলের খেলোয়াড় খাজা নাদেরের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৮) থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১০১। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজীতে লেখা ১৮৭৪ সালের অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত। তাং জানু-২,১১,২০,৩০, মার্চ-৫, জুলাই-৭ এবং নওয়াবদের অর্থদানের তালিকার ক্রমিক নং- ১৮৬ দ্রঃ।

১০২। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ মার্চ ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

১০৩। খাজা মওদুদের ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু-অপ্রকাশিত) খাজা হালিমের নিকট রক্ষিত।

১০৪। নিদর্শনটির সংগ্রহ নং-আঃ ৯০.১৪৭৫, পরিমাপ-১৯.৫ x১০ সেঃ মিঃ, সেটি এখন ফ্রিৎজকাপের উক্ত ছবির অনুকরণে সজ্জিত আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের কার্ডরুম শীর্ষক গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১০৫। খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য। (১৯৯৫)

১০৬। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজীতে, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত, তাং জানুঃ ৩১, ফেব্রুঃ-১০, মার্চ-৭ ও ২১, ১৮৭৪ খ্রীঃ

১০৭। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজীতে লেখা ১৮৭৪ সালের অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত (সংগ্রহ নং আঃ ৯৩.২৭৪) তাং জানুঃ ২ এবং ফেব্রুঃ ২৮, সন ১৮৭৪ খ্রীঃ দ্রঃ।

১০৮। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী, ঐ, তাং ১৩ মে ১৮৭৪।

১০৯। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ঐ, তাং ২০ মে এবং ৩ জুন ১৮৭৪ খ্রী।

১১০। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮২ পৃঃ ৪৭৬।

১১১। নওয়াব পরিবারের খাজা হালিম ও খাজা লতিফুল্লাহর মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

১১২। ঢাকার ঘুড়ি নকশা ও রঙ ভেদে ৫০ প্রকার ছিল বলে জানা যায়। হাসেম সুফী, ঢাকার ঘুড্ডি, দৈনিক ইনকিলাব, ৮ মার্চ ১৯৯২ পৃঃ ১২।

১১৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ ডিসেঃ ১৮৬৬ পৃঃ ৪৯৯ এবং ৬ নভেঃ ১৮৭০ পৃঃ ৪৪০।

১১৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ডিসেঃ ১৯০৯। ১১৫। হাসেম সুফী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

১১৫(ক)। নওয়াব আহসানুল্লার সুটিং জার্নাল, (অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি, ইংরেজীতে) আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, পৃঃ ৫-১০।

১১৬। নাজির হোসেন, কিংবদন্তী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২।

১১৬(খ)। সাঈদ আহমদ, ঢাকার ঘুড়ি উড়ানোর কিস্‌সা, ঢাকা মহানগর সমিতি ত্রিবার্ষিক সম্মেলন স্মরণিকা, ১৯৯৯ পৃঃ ৪০-৪১।

১১৭। নওয়াব পরিবারের খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য থেকে প্রাপ্ত (১৯৯৮)

১১৮। কাঁচের মাঞ্জা দেয়া সূতা এতই ধারালো হতো যে, তার ঘর্ষণে অনেক সময় নওয়াবের দানে ঢাকায় স্থাপিত বৈদ্যুতিক তারের ক্ষতি হতো। এজন্য ছোট লাটের নির্দেশে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত তারের ১০০ গজের মধ্যে ঘুড়ি উড়ানোর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ঢাকা প্রকাশ, ৩ এপ্রিল ১৯০৪ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য ১৯১১ সালে কাগজীটোলায় ছাদের উপর ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ৭/৮ বছরের একটি ছেলে নীচে পড়ে মারা যায়। ঢাকা প্রকাশ, ৮ মে, ১৩১৭ (১৯১১) পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

আহসান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠা, সংস্কার এবং সেখানে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

১০(১) আহসান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠা ঃ

ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণাংশে বুড়িগংগা নদীর তীরে আহসান মঞ্জিলের অবস্থান। এই স্থানটি ইসলামপুরের কুমারটুলি মহল্লা নামে পরিচিত। সাধারণত নওয়াব বাড়ীর রঙমহল তথা গম্বুজ বিশিষ্ট দ্বিতল প্রাসাদ ভবনকেই আহসান মঞ্জিল বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর পশ্চিমে নির্মিত দ্বিতল অন্দর মহলটিও এই প্রাসাদেরই অংশ হিসেবে বিবেচ্য। এদুটো প্রাসাদ ভবন ছাড়া নওয়াববাড়ী এলাকায় এর সহযোগী হিসেবে আরো বেশ কিছু স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে নওয়াবদের আস্তাবল, জামে মসজিদ, কাঁচারীবাড়ী, ম্যানেজার হাউস, চা-খানা, বাবুর্চি খানা, গার্ড হাউস, গ্যাস প্লান্ট হাউস, নহবত খানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ছিল উত্তর-পশ্চিমদিকে গোলপুকুর এবং এর পাড়ে খাজা পরিবারের অন্যান্য শরীকদের আবাসিক ভবনাদি। এসব ভবনাদি, লন ও ফুলের বাগান মিলিয়ে নওয়াব বাড়ীর আঙিনা প্রায় দেড় বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল।[১] উল্লেখ্য, মোগল বাদশাহী আমলের ঢাকাস্থ নওয়াবদের আবাসবাটির চেয়েও ঢাকার উক্ত নওয়াববাড়ীর এলাকা বেশী বিস্তৃত ছিল।[২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে জালালপুর পরগনার (বর্তমান ফরিদপুর-বরিশাল) জমিদার শেখ ইনায়েত উল্লাহর রঙমহল ছিল।[৩] দেশ-বিদেশ থেকে সুন্দরীদের যোগাড় করে ফূর্তিবাজ ইনায়েতউল্লাহ এখানে আমোদ প্রমোদ করতেন। কিন্তু লোলুপ দৃষ্টি সম্পন্ন মোগল ফৌজদারের ঈর্ষানলে পড়ে তিনি প্রাণ হারান।[৪] তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ নওয়াব আলীবর্দী খাঁর সময় রঙমহলটি ফরাসী বণিকদের নিকট বিক্রি করে দেন।[৫] পূর্ব থেকেই এব পাশে ফরাসীদের একটি বাণিজ্যকুঠি ছিল। রঙমহলটি পাওয়ায় তাঁদের কুঠি আরো সমৃদ্ধ হয়।

ঢাকায় ফরাসীরা প্রথমে তেজগাঁও এলাকায় তাঁদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছিল। পরবর্তীতে তাঁরা শহরের কেন্দ্রস্থলে কুমারটুলিতে কুঠি নির্মাণ করে। ঐ আমলে বাংলাদেশে ফরাসী বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী ছিল।[৬] কুমারটুলির কুঠিতে তাঁরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং মিঠাপানির পুকুর তৈরী করেন। আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোনায় অবস্থিত গোলপুকুরটি ফরাসী বণিকদের আমলে 'ল্যুস জাল্লা' নামে পরিচিত ছিল।[৭]

ঢাকায় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে কুমারটুলির এ কুঠিতে ফরাসী বণিকদের ভাগ্য উত্থান পতনের ঘটনাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৭৫৬ সালে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদেরকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ঢাকাস্থ ইংরেজদেরকে হত্যা এবং তাঁদের মালামাল জব্দ করার জন্য নায়েবে নাজিম জসরত খানকে নির্দেশ দেন। উক্ত সংবাদে হতভম্ব হয়ে ইংরেজরা ঢাকাস্থ ফরাসীদের শরণাপন্ন হন। ফরাসীদের সাথে তখন নওয়াবের সুসম্পর্ক ছিল। ঢাকাস্থ ফরাসী কুঠির প্রধান মিঃ এম. কোর্টিন সেসময় কুমারটুলির এ কুঠিতে ইংরেজদের আশ্রয় দেন এবং তাঁদের জিম্মাদার হয়ে জসরত খানকে নিবৃত করেন।

দুই মাসাধিক কাল ধরে ইংরেজরা এখানে অবস্থান করে শেষে জাহাজে করে কলকাতার দিকে চলে যান। এরপর ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হলে ঢাকায় ফরাসীদের দুর্দিন শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা কলকাতা পুনরুদ্ধার করে এবং ফরাসীদের চন্দন নগর দখল করে নেয়। তাঁরা ঢাকাস্থ এজেন্টকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মিঃ কোর্টিন

Dhaka University Institutional Repository

তখন উপায়ন্তর না দেখে ২২ জুন ১৭৫৭ খ্রীঃ নৌপথে কুমারটুলি কুঠি পরিত্যাগ করে চলে যান। এভাবে কুমারটুলি সহ ঢাকাস্থ ফরাসী কুঠিগুলোর মালামাল প্রথম বারের মত ইংরেজদের হস্তগত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কুমারটুলির ফরাসী কুঠি পুরোপুরি দখলে নেয়। ১৮৮৩ সালে তাঁরা এখানে বেশ কিছু সংস্কার কাজও করে। ১৮০১-২ সালে কুঠিটা ইংরেজ কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ১৮২৪ সালে ইংরেজদের সামরিক রসদাদি এখানে রাখা হতো বলে জানা যায়।[৮] শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-ফরাসী শান্তি চুক্তির ফলে অনেক প্রচেষ্টার পর ১৮২৭ সালে ফরাসীরা তাঁদের কুমারটুলির কুঠি ফিরে পায়।[৯] ১৮৩০ খ্রীঃ ফরাসীরা কুমারটুলীর কুঠি ও তৎসংলগ্ন এলাকা খাজা আলীমুল্লাহর নিকট বিক্রি করে দেয়।[১০]

আগেই বর্ণিত হয়েছে, বেগম বাজার এলাকায় পৈত্রিক নিবাসে খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর চাচা খাজা হাফিজুল্লাহর সাথে বসবাস করতেন। কিন্তু পুরাতন বাড়ীটার প্রতি মন উঠে যাওয়ায় খাজা হাফিজুল্লাহ সোয়ারীঘাটে গিয়ে নতুন বাড়ী তৈরী করেন।[১১] খাজা আলীমুল্লাহ তখন তাঁর চাচার সাথে সোয়ারীঘাটে যাননি। তিনি বুড়ীগংগার তীরে স্বতন্ত্রভাবে নিজের মনেরমত একটি বাড়ী তৈরীর কথা ভাবছিলেন।[১২] ফরাসী কুঠিটি ক্রয়ের মাধ্যমে তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়।

ফরাসী কুঠিটি ক্রয় করে খাজা আলীমুল্লাহ সেটাকে তাঁর বাসভবনোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। প্যানোরামা অব ঢাকার দৃশ্যে খাজা আলীমুল্লাহর বাড়ী বলে যে দ্বিতল ভবনটি দেখা যায় সেটা নদীতীরে অবস্থিত অন্যান্য ইমারতের মত ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যেই তৈরীকৃত। তবে সেটি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ভবনগুলোর চেয়ে বেশ জাঁকালো প্রকৃতির। খাজা আলীমুল্লাহ আশে পাশের সব ছোট খাটো ঝুপড়ি অপসারণ করে তাঁর বাসভবনটিকে বেশ দৃষ্টি নন্দন করে তোলেন। খাজা আলীমুল্লাহর ক্রয়কৃত উক্ত কুঠি বাড়ীটিই কালক্রমে নানা পরিবর্ধনের মাধ্যমে ঢাকার নওয়াবদের বিখ্যাত আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে রূপান্তরিত হয়েছে। আহসান মঞ্জিলের বর্তমান অন্দর মহলের স্থানেই ছিল ফরাসীদের কুঠিবাড়ী বা খাজা আলীমুল্লাহর বাড়ী।[১৩] বর্তমান কালের আহসান মঞ্জিলের ন্যায় তৎকালে উক্ত ভবনশীর্ষে কোন গম্বুজ ছিল না। এর দক্ষিণে নদীর দিকে ভবনগাত্রে কোন খোলা সিঁড়িও তখন ছিল না। (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং-৬৫ দ্রঃ) তবে তৎকালীন দৃশ্যে বাড়ীটার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে এক গম্বুজ বিশিষ্ট যে ছোট্ট ইমারতটি দেখা যায় সেটা ছিল শেখ ইনায়েতউল্লাহর সমাধিসৌধ। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সৌধটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ শতকের প্রারম্ভে ধ্বংসস্তূপটি অপসারিত হয়।[১৪]

১০(২) পুনর্নির্মাণ ঃ

ফরাসী আমলের কুঠিকে পরিবর্ধন করে আহসান মঞ্জিলের ন্যায় একটি বৃহৎ ও অনুপম প্রাসাদের রূপ দেয়ার সার্বিক কৃতিত্ব খাজা আব্দুল গণির। তাঁর সময় খাজা পরিবারের আর্থিক উন্নতি প্রায় চারগুণ বেড়ে যায়। সেই সাথে বৃদ্ধি পায় শান-সৌকত ও বিলাস ব্যসন। পূর্ববংগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ধনী জমিদার হিসেবে স্বভাবতই তিনি তাঁর প্রধান বাসভবনটিকে এমন করে তৈরী ও সজ্জিত করবেন যা তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্য্যের মহিমা প্রকাশ করতে পারে। আহসান মঞ্জিলের পূর্বদিকে অবস্থিত মীর্জা গোলামপীরের বাড়ীটি তাঁর পুত্র মোহাম্মদ মীর্জার নিকট থেকে ১৮৬০ সালে খাজা আব্দুল গণি ক্রয় করে নিজ বাড়ীর সীমানা বৃদ্ধি করেন।[১৫]

ঢাকা নওয়াব এস্টেটের পুরানো অফিস থেকে আহসান মঞ্জিল ভবনের বেশ কিছু প্রাচীন আলোক চিত্র উদ্ধার করা গেছে। চিত্রগুলো ভালভাবে নিরীক্ষা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, খাজা আলীমুল্লাহ ফরাসী আমলের যে দ্বিতল কুঠিটাকে সংস্কার করে তাঁর বাসভবনে পরিণত করেছিলেন। আব্দুল গণি সেটারই পূর্বপার্শ্বে কিছুটা ভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্য দিয়ে একটি দ্বিতল রঙমহল নির্মাণ করেন। তিনি পূর্বোক্ত ফরাসী কুঠিটারও ব্যাপক পুনসংস্কার করেন।[১৬] এরপর সংস্কারকৃত ফরাসী কুঠিটি অন্দরমহল এবং নবনির্মিত ভবনটি রঙমহল নামে পরিচিতি লাভ করে। উক্ত রঙমহলের উপর পরবর্তীতে গম্বুজ সংযোজিত হয়ে তা সুদৃশ্য আহসান মঞ্জিলের রূপ পরিগ্রহ করে। আব্দুল গণি তাঁর প্রিয় পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামে উক্ত প্রাসাদ ভবনটির নাম করণ করেন 'আহসান মঞ্জিল'।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

১০(৩) নির্মাণ তারিখ ঃ

নওয়াব আব্দুলগণি কবে তাঁর এই বাস ভবনটির পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু বা শেষ করেন তা নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বি.সি.এ্যালেন- কে অনুসরণ করে প্রফেসর দানী বলেছেন, নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৭২ খ্রীঃ তাঁর বাসভবনটি পুনর্নির্মাণ করে তাঁর প্রিয় পুত্রের নামে এর নামকরণ করেন।[১৮] তৈফুর সাহেব ভবনটির মূল নির্মাণ তারিখের কথায় না গিয়ে বলেছেন, ১৮৭২ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণি প্রাসাদটিকে নবরূপে পুনর্নির্মাণ করেন।[১৯] অপরদিকে, ক্লাউড ক্যাম্পবেল বলেছেন, আহসান মঞ্জিল প্রাসাদটি ১৮৬০ খ্রীঃ নির্মিত হয়েছিল।[২০] তায়েশ, আওলাদ হাসান, যতীন্দ্র মোহন, কেদারনাথ, বাকল্যান্ড, হাকিম হাবিবুর রহমান প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই প্রাসাদ ভবনের নানা গুণকীর্তন করলেও তাঁরা এর নির্মাণ তারিখ নিয়ে কোন কথা বলেননি।

ইমারতের গাত্রোপরি আস্তরে লেখা সালকে যদি এর নির্মাণ তারিখ বলে ধরা যায়, তাহলে আহসান মঞ্জিলের নির্মাণ তারিখ যে ১৮৫৯ খ্রীঃ এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। উল্লেখ্য, উক্ত প্রাসাদ ভবনের উত্তর পোর্চের উপর স্থাপিত ত্রিকোণ পেডিমেন্টের গায়ে স্টাকো রিলিফে ইংরেজী সংখ্যায় ১৮৫৯ সালটি লেখা ছিল। অতএব ভবনের গাত্রে উৎকীর্ণ উক্ত সালটিই যে এই প্রাসাদের নির্মাণ তারিখ তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২১] ১৮৫৪ খ্রীঃ খাজা আলীমুল্লাহ মারা গেলে পরিবারের সার্বিক কর্তৃত্ব আব্দুল গণির একক হাতে আসে। এরপর তিনি স্বাধীনভাবে সবকিছু করার অধিকার পেয়ে তাঁর বসতবাড়িটি পরিবর্ধন করে নির্মাণ করার সার্বিক প্রস্তুতি নেন। তাই বলা যায়, ১৮৫৯ খ্রীঃ খাজা আব্দুল গণি এই প্রাসাদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তবে তা পুরোপুরি শেষ করতে বেশ ক'বছর সময় লেগে গিয়েছিল। কারণ ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর মিঃ ক্লে ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৩ মে তাঁর ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন যে, খাজা আব্দুল গণির প্রাসাদ ভবনের নির্মাণ ও সাজানোর কাজটি তখনো চলছিল।[২২] একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ইংরেজদের বিখ্যাত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মার্টিন এন্ড কোং এই প্রাসাদ ভবনের নির্মাণ কাজ করেছিল।[২৩] স্থানীয়ভাবে তৈরী পোড়া ইটের সাথে চুন সুঁড়কির মর্টার ব্যবহার করে ইমারতের পুরু দেয়াল গাঁথা হয়েছিল এবং শালকাঠের মজবুত কড়িবর্গা ব্যবহার করে ব্রিটিশ স্থপতির তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যে ভবনটি তৈরী হয়েছিল। উল্লেখ্য, সোনার তৈরী একটি কর্ণিদ্বারা খাজা আব্দুল গণি তাঁর এই বাসভবনটির নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেছিলেন। উক্ত কর্ণিটির একটি ছবি নাজির হোসেন তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।[২৪]

১০(৪) তৎকালীন ভবনের বৈশিষ্ট্য ঃ

সৌভাগ্যবশত নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত নওয়াবদের প্রাচীন এ্যালবাম থেকে নওয়াব আব্দুল গণির পুনর্নির্মিত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবনের কিছু দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র উদ্ধার করা গেছে। ঐ চিত্রগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দ্বিতল প্রাসাদ ভবনটির উপর কেবলমাত্র গম্বুজটিই তখন ছিল না। কিন্তু এর অন্যান্য অংশের বৈশিষ্ট্য প্রায় বর্তমান আমলের ন্যায়ই তৈরী হয়েছিল। প্রাসাদ ভবনের দক্ষিণ দিকে বর্তমান বড় খোলা সিঁড়িটি তখনই তৈরী করা হয়েছিল। তবে এর উপর থেকে দোতালায় খোলা বারান্দায় প্রবেশ কালে এখন যেখানে ত্রয়ী খিলানী পথ রয়েছে, তখন সেখানে ত্রিকোণ পেডিমেন্টের নীচে লিন্টেল সহযোগে নির্মিত ত্রয়ী প্রবেশ দরজা ছিল। উক্ত প্রাসাদ ভবনের উত্তর ফাসাদের কেন্দ্র স্থলে অনুরূপ ধরনের বৈশিষ্ট্যটি এখনো বর্তমান আছে। দ্বিতল রঙমহলটি এতই উচ্চ করে নির্মিত হয়েছিল যে, এর পশ্চিম পার্শ্বে অন্দর মহলরূপী ফরাসী কুঠিটাকে রঙমহলের তুলনায় অনেক নীচু দেখাতো। উক্ত ছবিতে রঙমহলের পাশে সেটাকে একতলা ভবন বলেই মনে হয়। (পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং- ৬৬ পৃঃ নং৩৭৩দ্রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

ঐ আমলে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল অন্দরমহল ও রঙমহলের মাঝখানে উত্তোলিত একটি গম্বুজযুক্ত কুঠরির ব্যবস্থাপনা। সার্বিকভাবে এই প্রাসাদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনা করলে উক্ত গম্বজযুক্ত কোঠাটি ওখানে বেমানান বলেই মনে হয়। তাই ওটা যে কেন ওখানে তৈরী করা হয়েছিল তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের টর্নেডোয় গম্বুজটি ভেংগে পড়লে সেটা পুনর্নির্মাণ না করে পরিত্যক্ত হয়।[২৫]

১০(৫) টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিল ঃ

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় ঢাকার উপর দিয়ে ভয়াবহ টর্নেডো বয়ে যায়। উক্ত টর্নেডোর আঘাতে আহসান মঞ্জিলসহ ঢাকা শহরের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাত্র তিন মিনিট স্থায়ী ঐ টর্নেডোর শক্তি এতই ব্যাপক ছিল যে, মূল প্রবাহের সামনে পড়া দালান-কোঠা, ইট-পাটকেল এমনকি লোহার সরঞ্জামাদিও তৃণখন্ডের ন্যায় উড়ে গিয়েছিল।[২৬] টর্নেডোর পূর্বে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির সাথে বায়ুকোণে একটি ঝড়ো মেঘ দেখা যায়। এই সময়ে অনেকে নওয়াব বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি জলস্তম্ভ বা হাতিশুঁড় নামতে দেখেছিলেন। মুহূর্তে জলস্তম্ভটি দ্বিখন্ডিত হয়ে একভাগ পশ্চিমদিকে অন্যভাগ নওয়াববাড়ীর দিকে ধাবিত হয়।[২৭] টর্নেডোর সময় নওয়াব বাড়ীটি বজ্রপাতের বিদ্যুতে বিদ্যুতায়িত এবং প্রজ্জ্বলিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে নবনির্মিত শক্ত সামর্থ আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পূর্বোক্ত গম্বুজটি ভেংগে পড়ে। ভবনের পাকাছাদ, প্যারাপেট অনেক স্থানেই উড়ে যায়। এমনকি কয়েক স্থানে এর পুরুদেয়াল পর্যন্ত ভেংগে পড়ে। খোলা সিঁড়ির লোহার রেলিং-এ বাতাস খুবই কম বাধে, কিন্তু টর্নেডো সেগুলোকেও দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ভেংগে উড়িয়ে নেয়।[২৮] কাঠের জানালা-দরজার সাথে সদ্য বিলাত থেকে আনা নওয়াবের লক্ষাধিক টাকার আসবাবপত্র ভেংগে চুরে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ঝড়ের আঘাতে বড় বড় মাছসহ বুড়িগংগার পানি নওয়াববাড়ীর আঙিনায় উঠে আসে। গাছপালাতো দূরের কথা উক্ত আঙিনায় একটি ঘাসও অবশিষ্ট ছিল না। এমনকি একটি বড় নৌকাও ঝড়ের তোড়ে নওয়াব বাড়ীর আঙিনায় উঠে এসেছিল।[২৯] টর্নেডোয় নওয়াবের বরফের কল, গ্যাসালোকের কারখানা এবং আলীমুল্লাহর আমলের ঘড়িটিও নষ্ট হয়ে যায়। টর্নেডোয় নওয়াবের প্রায় ১০ লক্ষ টাকার অস্থাবর সম্পদই নষ্ট হয়। এছাড়া নওয়াববাড়ীর স্থাবর দালানকোঠার যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা।[৩০] নওয়াবের অন্দর মহলটি ফরাসী আমলের পুরাতন গাঁথুনির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় ঝড়ের বেগ সইতে না পেরে তা ভেংগে একেবারে গুঁড়িয়ে যায়।[৩১] পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৬৭ পৃঃ৩৭৩-এ উক্ত ভগ্নদৃশ্য দেয়া হলো। টর্নেডোর সময় নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ অন্দর মহলে ছিলেন। মহলটি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলে তাঁরা ঘর থেকে কোন রকমে দৌড়ে বেরিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।[৩২] নওয়াবের আপন আত্মীয় কেউ না মরলেও তাঁর তিনজন কর্মচারী, একজন দাসী ও জয়চন্দ্র পাল নামক একজন আগন্তুক সহ ৫ জন মারা যান।[৩৩] এছাড়া নওয়াববাড়ীতে ঐ সময় অবস্থানরত জলের কলের ম্যানেজার এবং মিঃ ক্যাসেল নামক একজন ইংরেজ সাহেব অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।[৩৪] তৈফুর সাহেব লিখেছেন, শহরের অন্যান্যদের সাথে তাঁর দাদাও টর্নেডোর পর নওয়াববাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবিতদের উদ্ধার কাজে অংশ নেন এবং উক্ত পরিবারের জনৈক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে অজ্ঞানাবস্থায় উদ্ধার করেন।[৩৫]

নিজে সমধিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও নওয়াব আব্দুল গণি উক্ত ঘূর্ণিঝড়ের পরেই শহরের ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্রের সাহায্যে ১০ হাজার টাকা দান করেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় তাঁর যেসব কর্মচারী মারা যান তাঁদের ওয়ারিশকে তদস্থলে চাকুরীতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। যদি কারো তেমন ওয়ারিশ না থাকে তবে মৃতের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি বৃত্তি নির্ধারণের ঘোষণা দেন।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

টর্নেডোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় ১৩ এপ্রিল তারিখ নওয়াব আব্দুল গণি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা শহরের প্রায় দুই হাজার লোক সহকারে পুরানো পল্টনের মাঠে খোদার শোকরানা নামাজ আদায় করেন।[৩৭] আহসান মঞ্জিল টর্নেডোর ফলে বসবাসের অযোগ্য হওয়ায় নওয়াব সাহেব সপরিবারে দিলখুশা বাগানবাড়ীতে গিয়ে উঠেন। আহসান মঞ্জিল পুনর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হয়েছিল।[৩৮]

১০(৬) পুনসংস্কার ঃ

টর্ণেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণে নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন। মনের মত করে পুনর্নির্মাণ করার জন্য তাঁরা নানা স্থানের বড় বড় সাহেব ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট তাঁর প্রাসাদের জন্য একটি উপযুক্ত নক্সা তৈরী করার ফরমায়েশ দেন।[৩৯] কলকাতা থেকে এক ইংরেজ সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এসে ভালভাবে পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করেন যে, রঙমহল ছাড়া নওয়াব বাড়ীর আর সকল অংশই পুরোপুরি নতুন করে তৈরী করতে হবে। রঙমহলের কেবল ছাদ ও পূর্বাংশের ভিত নতুন করে তৈরী করলেই চলবে।[৪০] জমিদারীর গণসংযোগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে অন্যান্য সবকিছুর আগে রঙমহলটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতদুপলক্ষ্যে কলকাতার মার্টিন এন্ড কোম্পানীর যে সাহেব ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা রঙমহলটি প্রথম নির্মিত হয়েছিল, তাঁর সাথেই এটার পুনঃসংস্কার করা নিয়ে পরামর্শ করা হয়। রঙমহলের শুধু ছাদ, কার্ণিশ, গরাদ, সার্সী প্রভৃতি পুনর্নির্মাণের জন্য ঐ আমলের ৯৬ হাজার টাকার চুক্তি হয়েছিল।[৪১] আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ পুনর্নির্মাণকালে নওয়াব আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ স্থানীয়ভাবে তৈরী ইটের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাই নওয়াব সাহেব ৫/৭ গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করে রানীগঞ্জ বার্ণ কোম্পানীর কারখানা হতে একলক্ষ কেমিকেল ইট আনার ব্যবস্থা করেন।[৪২] রানীগঞ্জ থেকে রেলগাড়ীতে কলকাতা এবং সেখান থেকে বজরায় করে ঢাকায় ইট আনতে নৌকা ভাড়াই হাজার ইট প্রতি ১১ টাকা ব্যয় হয়েছিল। অথচ তখন ঢাকায় ৭ টাকা হাজার, ইট কিনতে পাওয়া যেত।[৪৩]

নওয়াব সাহেব শুধু স্থানীয় ইটের উপরই আস্থা হারাননি। তিনি যাঁরা ইতোপূর্বে এই রঙমহলটি নির্মাণ করেছিলেন, সেই মার্টিন এন্ড কোম্পানির ইংরেজ সাহেব ইঞ্জিনিয়ারদের উপর থেকেও আস্থা হারিয়ে ফেলেন। কারণ তিনি জানতে পারেন তাঁদের তৈরী অনেক ইমারতেরই নাকি ছাদ ফেটে পানি পড়ে।[৪৪] তাই টর্নেডোয় বিধ্বস্ত আহসান মঞ্জিল পুনর্নির্মাণের সময় নওয়াব সাহেব শেষ পর্যন্ত উক্ত সাহেব ইঞ্জিনিয়ারদের বাদ দেন এবং দেশীয় খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায়কে ঐ কাজে নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ইতোপূর্বে কুচ বিহারের রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৪৫]

১৮৮৮ খ্রীঃ ঘূর্ণিঝড়ের পরে ইঞ্জিনিয়ার বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় কর্তৃক যে বৈশিষ্ট্যে আহসান মঞ্জিল সংস্কার ও পুনর্নির্মিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার পুনঃসংস্কার করা হলেও আজো আমরা মূলত সেই রূপটিই পেয়ে থাকি। ফরাসী আমলের পুরাতন গাঁথুনি ভেংগে দিয়ে নতুন করে নির্মিত অন্দর মহলটিকে রঙমহলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতল রূপ দেয়া হয়। ইতোপূর্বে রঙমহল ও অন্দরমহলের মাঝখানে স্থাপিত গম্বুজযুক্ত কুঠরিটি অপসারণ করে তথায় একটি খোলা প্যাসেজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও সেখানে লোহার বীমের উপর কাঠের তৈরী একটি গ্যাঙওয়ে বা ঝুলন্ত সংযোগ সেতু নির্মাণ করে উভয় ভবনের দোতলাকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। তবে এই পুনর্নির্মাণকালে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যে বৈশিষ্ট্যটি এই প্রাসাদ ভবনে সংযোজিত হয় তাহলো এর রঙমহলের শীর্ষে সুউচ্চ গম্বুজের ব্যবস্থাপনা। ইমারতের সাথে সুষমভাবে এই গম্বুজের সংযোগটিই মূলত আহসান মঞ্জিলকে এত আকর্ষণীয় স্থাপত্যের রূপ দিতে পেরেছিল। গম্বুজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সময়েই দক্ষিণের খোলা সিঁড়ির উপর থেকে দোতলার বারান্দায় প্রবেশ পথের উপরে পূর্বে নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

পেডিমেন্টটি অপসারণ করা হয় এবং সেখানে সার্লিয়ানা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ত্রয়ী খিলানী প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়। পরিশিষ্টে চিত্র নং- ৬৮ পৃঃ নং৩৭৪ দ্রঃ। এছাড়া এর উভয়পার্শ্বে রঙমহলের কোনায় প্যারাপেটগুলোর উপরে বক্রকার্নিশযুক্ত কিয়স্কের ন্যায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে অলংকরণ করা হয়। প্রাসাদ ভবনাদি ছাড়াও নওয়াব বাড়ী এলাকায় টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আনুষঙ্গিক স্থাপত্য যেমন- আস্তাবল, মসজিদ প্রভৃতি ঐ সময় মেরামত করা হয় এবং ইসলামপুর রোডের ধারে স্থাপিত নহবত খানাটিকে নতুন ও আকর্ষণীয় করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। নওয়াব বাড়ীর এলাকায় অবস্থিত খাজা মনসুর, খাজা আমীরুল্লা প্রমুখ পরিবারের অন্যান্য শরীকদের ঘরবাড়ীর যাবতীয় মেরামতের কাজ ঐ সময় এস্টেটের মোতাওয়াল্লী হিসেবে নওয়াবের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাই স্বভাবতই ঐ সময় তাঁদের সেসব ভবনাদির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজও করা হয়েছিল।

১০(৭) ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি ও সংস্কার ঃ

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন শনিবার বিকেল ৫.০০টা ১৫ মিনিটের সময় সারা বাংলায় একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়। এতে নওয়াববাড়ীসহ ঢাকা শহরের বহু দালান কোঠার ব্যাপক ক্ষতি হয়।[৪৬] ভূমিকম্পে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের দক্ষিণ বারান্দার একাংশ ভেংগে পড়ে এবং ইসলামপুর রোডের ধারে নির্মিত নওয়াববাড়ীর দ্বিতল নহবত খানাটি ভেংগে গুঁড়িয়ে যায়।[৪৭] ঐ প্রবল ভূমিকম্পটি প্রায় ৪ মিনিটকাল স্থায়ী ছিল এবং তাতে ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য ইমারতের মধ্যে আহসান মঞ্জিল, আর্মেনীয় গীর্জা, ডাকবাঙলা, ইডেন স্কুল, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ব্রাহ্ম সমাজ ভবন, নাজিরের মঠ প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।[৪৮] উক্ত ভূমিকম্পের ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ সেদিন তাঁর ব্যক্তিগত ডাইরীতে লিখেছিলেন,...একটু পরেই ভূমিকম্প শুরু হলো। আমি বাড়ীর দিকে আসছিলাম, রবার গাছের কাছে পৌঁছলে দালানের কার্নিশ ভেংগে পড়তে লাগলো। আমি সেখানেই সেজদায় পড়ে গেলাম এবং স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের আগমন পর্যন্ত ওখানে সেজদায়ই রলাম। আল্লাহর দয়ার সীমা নেই ... এরূপ ভূমিকম্প আজ পর্যন্ত আর হয়নি।"[৪৯]

নওয়াবপুত্র খাজা সলিমুল্লাহর 'শাহীন মেডিকেল হল' নামক ঔষধালয়টি ভূমিকম্পের ফলে একেবারেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে এবং উক্ত ভবনের দোতলায় বসবাসকারী এক আর্মেনীয় পরিবারের ৬ জনের মধ্যে তিনজনই মারা যায়।[৫০] সারা ভারত ব্যাপী ঐ ভূকম্পন কমবেশী অনুভূত হলেও ভূকম্পনের মূল কেন্দ্রস্থল হিসেবে সিলেটকে চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে চেরাপুঞ্জিতে কয়েকদিন ধরে আগ্নেয়গিরির মত অগ্নিশিখা উঠেছিল।[৫১] ঢাকায় ৮/১০ দিন ধরে প্রত্যহ ২/৩ বার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভয়ে ব্যাকুল সবাই অনাহার অনিদ্রায় দিন কাটায়।[৫২] ভূকম্পনের ভয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ রমনার মাঠে খড়ের আটচালা ঘর বানিয়ে বসবাসের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫৩] ২৭ জুন নওয়াব আহসানুল্লাহ ১০ হাজার মুসলমানসহ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরির পুত্র মওলানা আব্দুল আউয়ালের ইমামতিতে রমনার মাঠে শোকরানা নামাজ আদায় করেন।[৫৪] নওয়াব বাড়ীর কাঁচারীভবন ভেংগে পড়ায় সাময়িকভাবে আব্দুল গণি স্কুলে নওয়াবের কাঁচারী বসতে বাধ্য হয়।[৫৫]

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হবার পর নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবনের যথোপযুক্ত মেরামত করা হয়। বিশেষ করে নহবত খানাটি মজবুত করে পূর্বানুরূপ বৈশিষ্ট্যে মেরামত করা হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহসান মঞ্জিল ক্ষতিগ্রস্থ হবার আর তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাই নওয়াবদের উত্তরাধিকারীদের দ্বারা এর আর তেমন উল্লেখযোগ্য সংস্কার কাজও হয়নি। আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের ভিতরে এবং বাইরে উচ্চমানের ও ব্যতিক্রমধর্মী নির্মাণশৈলী একে সমসাময়িককালের বাংলার স্থাপত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এতদাঞ্চলে নির্মিত বহু ইমারতের বৈশিষ্ট্যের উপর এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে এ স্থাপত্যে ব্যবহৃত কেন্দ্রীয় গম্বুজ এবং পার্শ্বগাত্র থেকে নেমে যাওয়া বৃহৎ খোলা সিঁড়ি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে এতদাঞ্চলে বহু স্থাপত্যেই অনুকরণ করা হয়।[৫৫(ক)]

১০ (৮) আহসান মঞ্জিলে জাদুঘর স্থাপন ঃ

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বিভিন্ন কারণে ঢাকার নওয়াবদের প্রভাব প্রতিপত্তি যেমন দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে, তেমনি অযত্ন ও অবহেলায় তাঁদের আবাস ভবন আহসান মঞ্জিল প্রাসাদও জৌলুস হারাতে থাকে। জমিদারি উচ্ছেদ আইনের আওতায় সরকার ১৯৫২ খ্রীঃ ১৪ মার্চ ঢাকা নওয়াব এস্টেট অধিগ্রহণ করে। ফলে অর্থাভাবে নওয়াবের উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এই প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে নওয়াব হাবিবুল্লাহ এই প্রাসাদ ছেড়ে তাঁর পরীবাগ গ্রীণ হাউসে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সংস্কারের অভাবে ক্রমান্বয়ে প্রাসাদটি জরাজীর্ণ হতে থাকে। ইতোমধ্যে বেঁচে থাকার তাগিদে ও কর্মসংস্থানের জন্য খাজা পরিবারের সদস্যগণ যে যেদিকে পারেন দেশে বিদেশে পাড়ি জমান। প্রাসাদের অংশীদারগণ বাছ-বিচার না করে নানাজনের নিকট এর কক্ষসমূহ ভাড়া দেয়ায় ভবনটি ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে। কালক্রমে সেখানে অবৈধ দখলদারীতে পূর্ণ হয়ে যায়। চারদিকে ভাসমান বস্তি গজিয়ে এককালের নয়নাভিরাম প্রাসাদ চত্বরে দুর্গন্ধময় নোংরা ও অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বাংলার জাতীয় ইতিহাসের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ঐতিহাসিক ভবন এবং পুরাকীর্তির অনুপম শৈল্পিক স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে পরিচিত আহসান মঞ্জিলকে সংরক্ষণ করে এখানে একটি স্মৃতি জাদুঘর স্থাপনের জন্য পাকিস্তান আমলের শেষ দিক থেকেই সরকারীভাবে প্রচেষ্টা চলে আসছিল। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু আহসান মঞ্জিল সংরক্ষণ করে সেখানে জাদুঘর ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণের আদেশ দেন। তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরের পক্ষ থেকে ঐ সময় একটি স্কীমও প্রণীত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলেও কাজটির কিছুটা অগ্রগতি হয়। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল সামরিক আইন বিধি নং- ৪/১৯৮৫ জারীর মাধ্যমে সরকার আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবন ও তৎসংলগ্ন কিছু চত্বর অধিগ্রহণ করেন। যথাযথ সংস্কার পূর্বক জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে এখানে একটি স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[৫৬] ১৯৮৬ সালে এর মূল কাঠামো অবিকৃত রেখে এবং আদি পরিবেশকে যতদূর সম্ভব পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নির্দেশিত কাজ শুরু হয়। সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাদুঘর প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্বাহী সংস্থা ছিল বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ঢাকার জেলা প্রশাসক আহসান মঞ্জিলের ভবনাদি ও জমি অধিগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ভবনের সংস্কার ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের দায়িত্ব অর্পিত হয় সরকারের গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের উপর। জাতীয় জাদুঘর এটাকে জাদুঘরে রূপান্তর ও তা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত প্রকল্পের প্রধান কাজ সমূহ এবং সেগুলোর খাতওয়ারী ব্যয় ছিল নিম্নরূপ ঃ ভবনাদিসহ জমি অধিগ্রহণ (৪.৯৬ একর) বাবদ জেলা প্রশাসন কর্তৃক ব্যয় ৫৯৩.৪৪ লক্ষ টাকা। সংস্কার, সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধন বাবদ গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যয় ৫১১.৬২ লক্ষ টাকা। নওয়াবদের আমলের নিদর্শনসহ সমসাময়িক কালের সাদৃশ্যপূর্ণ নিদর্শনাদি ক্রয়, উপস্থাপন, কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক ব্যয় ২৫২.৮৮ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ব্যয় = ১৩৫৭.৯৪ লক্ষ টাকা।[৫৭] ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (সরকার প্রধান) কর্তৃক আহসান মঞ্জিল জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা জাদুঘর হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

রঙমহলের ২৩টি কক্ষে এখন ঢাকার নওয়াবদের নানা দ্রব্য ও তথ্য দিয়ে প্রদর্শনী উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৯টি কক্ষ ১৯০৪ সালে মিঃ ফ্রিৎজকাপের তোলা আলোকচিত্রের অনুকরণে সজ্জিত। অন্দর মহলটির দক্ষিণাংশই কেবল জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে আছে। সেখানেও প্রদর্শনী উপস্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। মাথাপিছু মাত্র দুই টাকা দর্শনীর বিনিময়ে প্রতিদিন প্রায় হাজার খানেক দর্শক উক্ত জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন।

১০(৯) আহসান মঞ্জিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড ঃ

আহসান মঞ্জিল এমন একটি অট্টালিকা যার সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের বেশ কিছুটা অধ্যায় জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পাকিস্তান আমলের প্রথমকাল পর্যন্ত প্রায় একশত বছরের ইতিহাসে বাংলার মুসলমানদেরকে যেসব খ্যাতনামা মনীষী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত ছয়জন অবিসংবাদিত নেতা এই প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা হলেন (১) নওয়াব খাজা আব্দুল গণি (২) নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ (৩) নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ (৪) নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ (৫) নওয়াব খাজা মোঃ ইউসুফজান এবং (৬) স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উপমহাদেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এই প্রাসাদ ভবনে এমন কতকগুলো গঠনমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, যার সূত্র ধরে উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ উপ্ত হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের সেই বীজ একদিন ভারতবর্ষে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধের ধারণাকে পুষ্ট করে এবং ক্রমে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে পরিপূর্ণতা দিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের পূর্বাংশই বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ।

ঢাকার নওয়াবদের পূর্বপুরুষ এবং এই প্রাসাদের আদি প্রতিষ্ঠাতা খাজা আলীমুল্লাহর সাথে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে এই প্রাসাদে আসতেন এবং খাজা আলীমুল্লাহ তাঁদেরকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আপ্যায়ন করতেন। ঢাকায় প্রতি বছর ঘোড়দৌড় শুরুর প্রাক্কালে দেশ-বিদেশ থেকে আগত প্রতিযোগিরা এই প্রাসাদে খাজা আলীমুল্লাহর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ খাজা আলীমুল্লাহ হোসেনী দালানের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হবার পর এই প্রাসাদটি ঢাকার মহররম উৎসব আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৪৬ খ্রীঃ ৮ মে এই প্রাসাদে বসেই খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর পরিবারের জ্ঞাতিগনের সম্মতিতে খাজা পরিবারের বিখ্যাত ওয়াকফ নামাটি সম্পাদন করেন। উক্ত ওয়াকফনামায় তাঁর সুযোগ্যপুত্র খাজা আব্দুল গণিকে পূর্ব পুরুষদের সব এ্যজমালী সম্পত্তি পরিচালনার জন্য মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয় এবং পরিবারের অন্যান্যদের জন্য ভাতা ধার্য করে দেয়া হয়। ১২৫৩ বাংলা সনের ওয়াকফ বলে খ্যাত এই কাজটি খাজা পরিবারের উন্নতির চাবিকাঠি বলে গন্য করা হয়। কারণ এর ফলে ঢাকাস্থ কাশ্মিরী খাজাদের সব সম্পত্তির ঐক্যতা লাভ করে এবং এর ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

১৮৫৭ সালে সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এই প্রাসাদে এক সভায় মিলিত হন। তিনি তাঁর অনুগত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সর্বপ্রকার অরাজকতা, লুটতরাজ ও সহিংসতা থেকে ঢাকা শহরকে রক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫৮]

দেশীয়দের নানা সমস্যা মেটানোর জন্য বাদশাহী আমল থেকে ঢাকায় পঞ্চায়েত প্রথা চলে আসছিল। আব্দুল গণি এই পঞ্চায়েত প্রথার ব্যাপক উন্নয়ন করেন। উল্লেখ্য, ঢাকার নওয়াবগণ পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে এই প্রাসাদের দরবার কক্ষে বিচার সভা বসাতেন। এছাড়া ঢাকার নওয়াবদের জমিদারিতে এই মর্মে কড়া নির্দেশ জারী ছিল যে, নওয়াবের শালিশী শেষ না করে যেন কেউ সরকারের আলাদতে না যায়।[৫৯] এজন্য প্রায় প্রতিদিন এই প্রাসাদে বিচার কাজ চলতো। ১৮৬১ খ্রীঃ সরকার কর্তৃক খাজা আব্দুল গণি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় বিচারকার্য পরিচালনা তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।[৬০] পরবর্তীকালে খাজা পরিবারের প্রায় ডজন খানেক ব্যক্তিত্ব এই অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পেয়েছিল এবং স্থানীয় জনতার নানাবিধ বিবাদ মীমাংসার কাজ করে তাঁরা সমাজ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

১৮৬৯ খ্রীঃ ঢাকায় মারাত্মক শিয়া-সুন্নী দাংগা দেখা দিলে নওয়াব আব্দুল গণির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে তা মোটানো সম্ভব হয়। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে আব্দুল গণি তাঁর দরবারে চারদিন ধরে আলোচনা করে এর সুষ্ঠু মীমাংসা করেন। ঐ উপলক্ষে নওয়াবকে চারদিন ধরে বিশ হাজার লোককে ভোজ দিতে হয়েছিল।[৬১]

১৮৬৮ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণি জমিদারির কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল আহসান মঞ্জিলে নওয়াব পরিবার ও ঢাকাবাসী জনগণের পক্ষ থেকে নওয়াব আব্দুল গণিকে অভিনন্দন পত্র দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সারা ঢাকা শহর ও দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক নিমন্ত্রিত হয়ে দু'দিন ধরে নওয়াব বাড়ীতে উৎসব করে।[৬২]

ঢাকার নওয়াবগণ বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ সরকার প্রদত্ত উচ্চ উপাধি সমূহে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণির সি.এস.আই. উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে আহসান মঞ্জিলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকার কমিশনার মিঃ সিম্পসন ইংরেজ সরকারের পক্ষে আব্দুল গণিকে উক্ত উপাধিতে বরণ করেন।[৬৩]

ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়গণের মধ্যে ১৮৭৪ সালে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক সর্ব প্রথম ঢাকায় আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৬ জুলাই ঢাকাস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আহসান মঞ্জিলে একসভা করেন। উক্ত সভায় বড়লাটের সম্বর্ধনার জন্য নানাবিধ কর্তব্য ও করণীয় স্থির করা হয়। এছাড়া বড়লাটের ঢাকা সফরের স্মরণে ঢাকায় নর্থব্রুক হল ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত সভায় ৮ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করা হয়।[৬৪] লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় এসে ১৮৭৪ খ্রীঃ ৬ আগষ্ট নওয়াব আব্দুল গণির দানে স্থাপনীয় পানির কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি নওয়াবের অতিথি রূপে আহসান মঞ্জিলে কিছু সময় অবস্থান করেন ও তাঁর দেয়া সান্ধ্য সম্মেলনে যোগদান করেন।[৬৫] অতপর ব্রিটিশ ভারতের যতজন ভাইসরয় ও গভর্ণর ঢাকায় এসেছেন তাঁদের প্রায় সবাই আহসান মঞ্জিলে আগমন করেছেন। অফিসিয়াল ভিজিট ছাড়াও নওয়াবজাদা নসরুল্লার বিয়েতে যোগদানের জন্য বংগের গভর্নর লর্ড লিটন ১৯২৪ খ্রীঃ ২২ জুলাই মংগলবার এখানে এসেছিলেন। তাঁর সাথে আগত লেডী লিটন অন্দরমহলে নওয়াব বেগমদের সাথে মিশেছিলেন।[৬৬]

ঢাকার নওয়াবদের গৌরবময় দিনগুলোতে এই প্রাসাদের প্রধান সিঁড়িকক্ষে স্বর্ণমন্ডিত বাঁধাইযুক্ত একটি ভিজিটর বুক রাখা থাকতো। ইউরোপীয়গণসহ দেশের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ এতে তাঁদের মন্তব্য ও স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করতেন।[৬৭] প্রতিবছর ঈদ, মিলাদুন্নবী প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে রকমারি সামগ্রী ও আলোকমালা দ্বারা এই প্রাসাদ অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হতো।[৬৮]

তৎকালে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ঢাকার অধিবাসীগণ প্রতি বছর বসন্তোৎসব পালন করতেন। এ উপলক্ষে ঢাকা শহর এবং জিঞ্জিরায় মেলা ও হোলি গানের অনুষ্ঠান হতো। নওয়াব আব্দুল গণির উদ্যোগে ঐ অনুষ্ঠান এবং মেলা স্থানান্তর করে এনে কয়েকবার আহসান মঞ্জিল চত্বরে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৯]

১৮৬৩ খ্রীঃ এই প্রাসাদ সংলগ্ন কুমারটুলির একটি কোঠায় খাজা আব্দুল গণি একটি অবৈতনিক ইংরেজী-বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে নওয়াব সলিমুল্লাহ গণশিক্ষার জন্য সেটার সাথে নৈশ বিদ্যালয়ও চালু করেছিলেন।[৭০]

দিল্লীর মোগল সম্রাটের বংশধর মীর্জা সোরাইয়াজাহ ব্রিটিশ সরকারের একজন বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি ঢাকা সফরে এসে আহসান মঞ্জিলে নওয়াব আব্দুল গণির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে বংগের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল, খাজা আব্দুল গণিকে নওয়াব এবং খাজা আহসানুল্লাহকে খান বাহাদুর উপাধি ও খেলাত পরানোর জন্য ঢাকায় এসে আহসান মঞ্জিল পরিদর্শন করেন।[৭২]

নওয়াব আঃ গণি ও আহসানুল্লাহর খেতাব প্রাপ্তি এবং আহসানুল্লাহর পুত্রের সুন্নতে খাতনা উপলক্ষে ১৮৭৬ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে ১৬ দিন ব্যাপী আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। এ উপলক্ষে নাচ-গান এবং থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার সব গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ এতে যোগ দেন। এতে নওয়াবের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।[৭৩]

নওয়াব আব্দুল গণি নিজ পরিবারের সদস্য ও শহরের গণ্যমান্য লোকদের নাট্যাভিনয় প্রদর্শনের জন্য আহসান মঞ্জিল এলাকায় একটি নাট্যমঞ্চ তৈরী করেছিলেন। তিনি ১৮৮১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে পার্সী থিয়েটার কোম্পানীকে এনে সেখানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।[৭৪]

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে বঙ্গের লেঃ গভর্নর ঢাকা পরিদর্শনে এলে তাঁর সম্মানার্থে আহসান মঞ্জিলে বল নাচ ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৫]

জমিদার ও প্রজাদের স্বত্ব নির্ধারণ এবং কর ধার্যের বিষয়ে ১৮৮৪ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের প্রতিকূলে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। প্রস্তাবিত উক্ত আইনের প্রতিবাদার্থে পূর্ববংগের সর্ব শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদেরকে নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ ৩১ আগস্ট ১৮৮৪ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে একটি সভা করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড়লাট ডাফরিনের নিকট একটি স্মারক লিপি পাঠানো হয়।[৭৬] উল্লেখ্য, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে প্রথম টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়েছিল।[৭৭]

বঙ্গের ছোট লাট ঢাকা পরিদর্শনে এসে ১৮৮৫ খ্রীঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী রাত্রে নওয়াব বাড়ীতে এক নাচ, গান ও ভোজ সভায় যোগদান করেন। তিনি পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারী বিকেলে ভিক্টোরিয়া পার্কে নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃতপুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর স্মরণে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করেন।[৭৮]

৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ খ্রীঃ মংগলবার সকালে আহসান মঞ্জিলে পূর্ববংগ জমিদার সভার এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জুবিলী উপলক্ষে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে সোনার আধারে করে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি অভিনন্দনপত্র পাঠানো হবে। এছাড়াও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে দেয়া সরকারের প্রতিজ্ঞা ও ভারতের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণকালে দেয়া মহারানীর প্রতিজ্ঞা ও আশ্বাসবাণী প্রভৃতি একসেট পোষাকে রিপু করে ঐ অভিনন্দনপত্রের সাথে প্রেরিত হবে।[৭৯]

১৮৮৮ খ্রীঃ ২০ আগষ্ট বঙ্গের ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলী ঢাকা সফরে এসে টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিলের ভগ্ন প্রাসাদ পরিদর্শন করেন। নওয়াব সাহেব তাঁর সম্মানে পরদিন শাহবাগ বাগান বাড়ীতে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন।[৮০]

১৮৮৮ খ্রীঃ নভেম্বরে বড় লাট লর্ড ডাফরিন নওয়াব আব্দুল গণিকে কে.সি.এস.আই. খেতাব প্রদানের জন্য ঢাকায় এসে নওয়াব বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে নওয়াব বাড়ীতে ২৬টি হাতী ও বহুসংখ্যক ঘোড়সওয়ার আনা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ বড়লাটকে আপ্যায়ন করার জন্য কলকাতার উইলসন হোটেল থেকে ৭ হাজার টাকার খাদ্য কিনে আনেন।[৮১] এছাড়া লেডী ডাফরিনের লেখা থেকে জানা যায়, ঐদিন ১২,০০০ মোমবাতি জ্বালিয়ে আহসান মঞ্জিল ও এর প্রাংগণস্থ বাগান আলোকসজ্জিত করা হয়েছিল। ঐ সময় অসংখ্য মোমবাতি শোভিত এই প্রাসাদ চত্বরের বাগানকে লেডী ডাফরিন ধরাপৃষ্ঠে আলোর বাগান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[৮২]

১৮৮৬ সালে আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালে ঢাকার নওয়াবগণ তা সমর্থন করেন। ওদিকে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৮৮৮ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যাণার্জী ঢাকায় আসেন। এমতাবস্থায় খাজা মোঃ ইউসুফজান, কংগ্রেস বিরোধী এ্যাসোসিয়েশনের ঢাকাস্থ সাব

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সভাপতিরূপে ১১ নভেম্বর ১৮৮৮, আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের এক সভা আহ্বান করেন। সভায় তিন সহস্রাধিক গণ্যমান্য মুসলমান উপস্থিত হয়েছিলেন। উক্ত সভায় মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান না করার জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮৩]

ঢাকায় বাৎসরিক ঘোড়দৌড় উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্মানার্থে ১৮৮৯ খ্রীঃ ৪ ফেব্রুয়ারী এবং ১৮৯২ খ্রীঃ ২০ ফেব্রুয়ারী আহসান মঞ্জিলে বলনাচ ও ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল।[৮৪]

১৮৯৫ খ্রীঃ মার্চ মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ ঢাকাবাসী এবং নিজ পরিবারের লোকদের জন্য কলকাতা থেকে ষ্টার থিয়েটার কোম্পানীকে বহু অর্থ দিয়ে ঢাকা আনেন। আহসান মঞ্জিলের প্রাঙ্গণস্থ মঞ্চে তাঁদেরকে দিয়ে তিনি সপ্তাহধিককাল ধরে অভিনয় করান। ঢাকার কমিশনার থেকে শুরু করে শহরের প্রায় সব ভদ্রলোকই উক্ত অভিনয় উপভোগ করেছিলেন।[৮৫]

ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জী ৩০ জুলাই ১৮৯৬ খ্রীঃ ঢাকা সফরে এসে আহসান মঞ্জিলে নওয়াবের অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন। পরদিন তিনি নওয়াবের দানে স্থাপিত জলের কল পরিদর্শন করেন।[৮৬]

১৮৯৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে আগত সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানীকে দিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে নিজ পরিবার ও শহরের গণ্যমান্য লোকদের জন্য সিনেমা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।[৮৭]

১৮৯৯ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর চারজন ভাগ্নের (নওয়াব ইউসুফজানের পুত্র) একত্রে বিয়ে হয়। এই উপলক্ষে নওয়াব বাড়ীতে ব্যাপক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। নওয়াব বাহাদুর কলকাতা থেকে চারজন বিখ্যাত বাইজী এনে আহসান মঞ্জিলে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ খ্রীঃ এক নাচগানের আয়োজন করেছিলেন। এতে ঢাকা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[৮৮]

১৮৯৬ খ্রীঃ ২৪ আগস্ট সকালে নওয়াব আব্দুল গণি আহসান মঞ্জিলে পরলোকগমন করেন। তাঁর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে ঐদিন নওয়াব বাড়ীতে প্রায় লাখো জনতার ভীড় হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৬ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খ্রীঃ ঢাকা শহরের সর্বস্তরের মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও মহল্লা সর্দারদের আহসান মঞ্জিলে ডেকে এক পরামর্শ সভা করেন। তিনি তাঁর মরহুম পিতার স্মরণে দুর্গত জনগণের সাহায্যের জন্য বার্ষিক অন্যূন ৫ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। 'আব্দুল গণি রিলিফ ফান্ড' নামে পরিচিত উক্ত ফান্ড পরিচালনার ভার তিনি একটি স্থায়ী ট্রাষ্টি বোর্ডের উপর অর্পণ করেন।[৮৯]

১৮৯৯ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াব ইউসুফজান, এদেশের উৎসাহী ক্রীড়ামোদীদের নিয়ে কলকাতার অনুকরণে এখানে 'ঢাকা মোহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন।[৯০]

নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ১৯০১ সালে সাড়ে চার লাখ টাকা ব্যয়ে ঢাকায় বিজলি বাতির ব্যবস্থা করেন। উক্ত তড়িতালোক ব্যবস্থা উদ্বোধনের জন্য ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ সন্ধ্যায় আহসান মঞ্জিলের দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বংগের ছোটলাটের অসুস্থতার কারণে তাঁর স্থলে কলকাতা থেকে রেভেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী সি.বোল্টন সাহেব এসে এটি উদ্বোধন করেন।[৯১]

১৯০১ খ্রীঃ ১৬ ডিসেম্বর নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। এমতাবস্থায় নওয়াব এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নির্বাচনের জন্য পরিবারের সবাই মিলে ১৭ ডিসেম্বর ১৯০১ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে একটি সভা করেন। উক্ত সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহকে এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নির্বাচিত করা হয়।[৯২] নওয়াবী পদে আসীন হয়ে নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ ১ মার্চ ১৯০২ খ্রীঃ ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে আহসান মঞ্জিলে নিমন্ত্রণ করে এনে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।[৯৩]

১৯০২ খ্রীঃ ২১ জুলাই সোমবার বেলা ১.০০ টায় বঙ্গের ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ও লেডী উডবার্ণ অমাত্যবর্গসহ ঢাকা এসে নওয়াবের অতিথি হিসেবে আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। তাঁর সম্মানে এখানে এক সান্ধ্য সম্মেলনের

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন করা হয়। পরদিন ২২ জুলাই মংগলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ছোটলাট নওয়াবের দানে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং সকালে মিটফোর্ড হাসপাতালের আউটডোর গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[৯৪]

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ১লা জানুঃ ১৯০৩ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক দিল্লীতে আয়োজিত রাজকীয় দরবারে নওয়াব সলিমুল্লাহ যোগদান করেন। উক্ত দরবারে যোগদান শেষে তিনি ১৯ জানুয়ারী ১৯০৩ খ্রীঃ ঢাকায় ফিরে আসেন। তাঁর সম্বর্ধনার্থে ঢাকার সর্বস্তরের অধিবাসীগণ নিজ নিজ গৃহ সজ্জিত করেন। ঐদিন আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ বিচিত্র পতাকারাজি, পুস্পমাল্য শোভিত বৃক্ষ ও অসংখ্য আলোকরাজি দ্বারা মনোহররূপে সজ্জিত করা হয়েছিল। বিকেল ৫টায় নওয়াব বাহাদুর রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হন। শহরের সর্বস্তরের গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলিমগণ সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করে মিছিল সহকারে আহসান মঞ্জিলে নিয়ে আসেন।[৯৫]

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১লা জানুয়ারী ১৯০৩ খ্রীঃ ঢাকায় ব্যাপক কাঙালী ভোজের আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত পরিপাটিরূপে সেদিন আহসান মঞ্জিলের বহির্বাটীতে নওয়াবের অন্নছত্রে ৫ সহস্রাধিক দরিদ্রকে উপাদেয় খাদ্য ভোজন করানো হয়। ২ জানুঃ একই স্থানে প্রায় পাঁচ হাজার সাধারণ মুসলমানকেও পোলাও মাংস পরিবেশন করা হয়েছিল।[৯৬]

১৯০৩ খ্রীঃ ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার বঙ্গের ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার সস্ত্রীক ঢাকা এসে আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। তাঁর সাথে চীফ সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকফারসন ও তাঁর স্ত্রী, প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ স্টিভেনসন প্রমুখ অমাত্য উপস্থিত ছিলেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় ছোটলাট নর্থব্রুক হলে আয়োজিত এক সভায় যোগদান করেন। পরদিন শনিবার তিনি পানীয় জলের কল পরিদর্শন করেন এবং নওয়াবের দানে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থাপিত আসমাতুন্নেছা মহিলা ওয়ার্ড উদ্বোধন করেন।[৯৭]

১৯০৩ খ্রীঃ ইংরেজ সরকার বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা করে। এই প্রেক্ষিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৪ খ্রীঃ ১১ জানুয়ারী পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এই প্রাসাদে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা করেন। উক্ত সভায় সরকার ঘোষিত বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ হয়। এমতাবস্থায় নওয়াব সলিমুল্লাহ এতদাঞ্চলের মানুষের স্বার্থানুকূলে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন।[৯৮] নওয়াবের দেয়া ঐ প্রস্তাবানুসারেই প্রায় পরবর্তীতে বঙ্গবিভাগ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার প্রতি জনসমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন। ঢাকায় বড়লাটের আগমন উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহ হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে রাজপথ ও নওয়াব বাড়ী সুসজ্জিত করেন। লর্ড কার্জন ঐ সময় নওয়াবের অতিথি হিসেবে ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী দুদিন আহসান মঞ্জিলেই অবস্থান করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে সামিয়ানাতলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বড়লাটকে চারটি মানপত্র দেয়া হয়।[৯৯] নওয়াব সলিমুল্লার সাথে ঐ সময় আলোচনার ফলেই লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের সীমারেখা বৃদ্ধি পায়। ফলে তা পূর্বাঞ্চলের মুসলিম ও সাধারণ মানুষের স্বার্থানুকূল হয়ে ওঠে।[১০০] লর্ড কার্জনের ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর সাথে বসা অবস্থায় তোলা নওয়াব সলিমুল্লাহর একটি আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ৬৯ পৃঃ৩৭৪ তে দেয়া হলো।[১০১]

নওয়াব এস্টেটের খ্যাতনামা ইংরেজ চীফ ম্যানেজার মিঃ জি.এল. গার্থ ১৯০৪ সালে দুর্ঘটনায় হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে নওয়াব এস্টেটের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ১৯০৪ খ্রীঃ ১১ জুলাই বঙ্গের ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার ঢাকায় আগমন করেন। পরদিন ১২ জুলাই আহসান মঞ্জিলে তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে নওয়াব এস্টেটের নানা বিষয় নিয়ে সলাপরামর্শ করেন।[১০২]

১৯০৪ খ্রীঃ খাজা মোঃ ইউসুফজান খান বাহাদুর উপাধি পান। এই উপলক্ষে ১৯০৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে নওয়াব পরিবারের পক্ষ থেকে আহসান মঞ্জিলে খাজা মোঃ ইউসুফজানের সম্মানে এক সম্বর্ধনা ও ভোজ সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়ে এই সভায় যোগদান করেন।[১০৩] ১৯০৫ খ্রীঃ ৬ জুন মঙ্গলবার নওয়াব সলিমুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর এক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে ৮০ মণ চাউলের পোলাও-কালিয়া তৈরী করেন এবং ঢোল পিটিয়ে সারা ঢাকার গরীব মিসকিনদের নওয়াব বাড়ীতে এনে ভোজনের ব্যবস্থা করেন।[১০৪]

১৯০৫ খ্রীঃ ৯ নভেম্বর সকালে নতুন পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নিমন্ত্রিত হয়ে আহসান মঞ্জিলে আসেন। আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে ছোটলাটের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ ছোটলাটকে পরিচয় করিয়ে দেন। ঐসময় মিঃ ফ্রিৎজকাপের তোলা একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পরিশিষ্টে চিত্র নং ৭০ পৃঃ৬৫৫তে দেয়া হলো। ঐ সফরকালে ছোটলাট পানীয় জলের কল এবং বিজলীবাতির ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেন।[১০৫]

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর শাহবাগে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতি'র ২০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ যোগ দেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর সেখানেই নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবনায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।[১০৬] এই সভায় আগত অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকেই আহসান মঞ্জিলে স্বাগত জানানো হয়। নওয়াবদের সহযোগিতায় ও উদ্যোগে ঢাকায় বহু সংখ্যক রাজনৈতিক ও সামাজিক সভা সমিতি হয়েছিল। এসব কাজের জন্য আহসান মঞ্জিলে প্রাথমিক আয়োজন ও বৈঠক বসতো। আহসান মঞ্জিলের দক্ষিণে খোলা সিঁড়ির উপরে দন্ডায়মান সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি দুস্পাপ্য ছবি নাজির হোসেন তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।[১০৭]

১৯০৬ খ্রীঃ 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতি'র সভা উপলক্ষে বঙ্গের রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল, খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ ঢাকায় আসেন। তাঁর সন্মানার্থে নওয়াব সলিমুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে ১৯০৭ খ্রীঃ ১০ জানুয়ারী হিন্দু- মুসলিম নির্বিশেষে শহরের গণ্যমান্যদের নিয়ে এক সম্বর্ধনা সভা করেন।[১০৮]

বংগ বিভাগের ফলে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গোলযোগ দূর করার লক্ষ্যে ১৯০৭ সালের মে মাসে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হাজী নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া ঢাকায় আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে আহসান মঞ্জিলে এক সভা করেন। উক্ত সভায় উভয় সম্প্রদায়ের ৪০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে শীঘ্রই বড় ধরণের একটি সভা করে বিবাদ মেটানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০৯]

১৯০৮ খ্রীঃ মার্চে নওয়াব বাড়ীর লোকদের সহায়তায় পরিচালিত মহররম মিছিলের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এই প্রেক্ষিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের নিয়ে আহসান মঞ্জিলে এক সভা করে পূর্ববংগ গভর্নমেন্টকে ঘটনার তদন্ত করতে অনুরোধ করেন। ফলে ইংরেজ পুলিশ ইনসপেক্টর মিঃ হাউই সহ চারজন পুলিশকে সাসপেন্ড করা হয়।[১১০]

ভারতের টিটাগড়, শ্রীরামপুর, প্রভৃতি স্থানে কোরবানীর ঈদের সময় হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৯০৯ খ্রীঃ ৮ জানুয়ারী শনিবার সকালে আহসান মঞ্জিলে ঢাকার মুসলমান সমাজের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণ্যমান্যদের সাথে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।[১১০(ক)]

ঢাকার কৃতি সন্তান বঙ্গের রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল ও বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক নওয়াব সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ ২৪ মার্চ ১৯০৯ খ্রীঃ ঢাকায় আসেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির সভ্যগণ তাঁকে আহসান মঞ্জিলের ঘাটে অভ্যর্থনা করেন। তাঁকে একটি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করা হয়।[১১১]

খাজা মোহাম্মদ আজম ১৯০৯ খ্রীঃ খান সাহেব খেতাব পান। এই উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহ ২৬ মার্চ ১৯০৯ খ্রীঃ শুক্রবার শহরের গন্যমান্য লোকদেরকে আহসান মঞ্জিলে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।[১১২]

১৯ এপ্রিল ১৯০৯ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ প্রাঙ্গনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় মুসলমানদের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়ে ভারত সরকারের দেয়া প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবী জানান হয়। এছাড়া বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে সরকার যে কোন প্রকার সাড়া দিলে তার ফলাফল ভয়াবহ হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। উক্ত সভায় মোট চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১১ খ্রীঃ খাজা মোঃ ইউসুফজান নওয়াব উপাধি পান। তাঁর সম্বর্ধনার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে ১৬ মার্চ ১৯১১ তারিখে এক অনুষ্ঠান করেন। শহরের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে নিমন্ত্রিত হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে ম্যাজিক ও বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর ২২ মার্চ ১৯১১ তারিখে নওয়াবজাদী আমিনাবানুও নওয়াব ইউসুফজানের সম্মানে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানীকে দিয়ে আহসান মঞ্জিলে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এর দু'দিন পর ২৪ মার্চ ১৯১১ তারিখে খাজা আব্দুল আলীম তাঁর নিজ বাড়ীতে উক্ত কোম্পানীকে দিয়ে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এতে নওয়াব পরিবারের ধনী গরীব সবাই আমন্ত্রিত হয়েছিল।[১১৪]

১৯১১ খ্রীঃ ১৫ ও ১৭ মার্চ নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে আহসান মঞ্জিলে পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক অধিবেশন হয়। সভায় ইতোপূর্বে প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির যে ৩২টি শাখাকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অংগীভূত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহকে সভাপতি ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রদেশের গণ্যমান্য ১০ জনকে সহ-সভাপতি করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবানুসারে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐ সভায় ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে একটি অর্থ সংগ্রহ কমিটিও গঠন করা হয়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মৌলভী আজিজ মীর্জা, ঐ সভায় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন।[১১৫]

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার-এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে ১৫ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ রাত্রিবেলা আহসান মঞ্জিলে এতদাঞ্চলের জমিদারগণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত ছোট লাটের একটি প্রতিকৃতি নর্থব্রুক হলে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। ১৭ জুন ১৯১১ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে উক্ত কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে ২১ আগস্ট ১৯১১ নর্থব্রুক হলে এক জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উপলক্ষে চাঁদা দাতা জমিদারগণের অবগতি ও মতামতের জন্য ২৩ জুলাই ১৯১১ নওয়াব সলিমুল্লাহ নিজের স্বাক্ষরে একটি পত্র জারী করেন। ইংরেজীতে ছাপানো উক্ত পত্রের কয়েকটি কপি এখনো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। পরিশিষ্ট নং ২৭ পৃঃ৪৫৫এ উক্ত পত্রের অনুলিপি দেয়া হলো। উল্লেখ্য, ২১ আগষ্ট যথারীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।[১১৬]

১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট ৫ম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী ভারত সফরে আসেন। তাঁদের কলকাতা ভ্রমন কালে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জন্মাষ্টমী মিছিল এবং পূর্বাঞ্চলের খাসিয়া নাচ দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ২৪ আগস্ট ১৯১১ আহসান মঞ্জিলে নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকার জমিদার, মহাজন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন জমিদার মহাজনের ব্যয়ে প্রয়োজনীয় লোক ও দ্রব্যাদি কলকাতা পাঠিয়ে কাজটি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১১৭]

১৯১২ খ্রীঃ ১৯ মে তারিখ বিকেলে নওয়াব সলিমুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে এক সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ঢাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদেরকে যথাযত অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।[১১৮]

ঢাকার নওয়াবদের ধর্মানুরাগ ও স্বজাতি বাৎসল্য ইতিহাস খ্যাত। ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধাহত তুর্কী মুজাহিদদের সাহায্যার্থে ২২ নভেম্বর ১৯১২ খ্রীঃ শুক্রবার আহসান মঞ্জিলে নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে শহরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের এক সভা হয়। সভায় এক হাজার টাকা তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ হয় এবং তিন হাজার টাকা সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এর পূর্বদিন নওয়াব আহসানুল্লাহর কন্যা নওয়াবজাদী আমিনা বানুর আহবানে ও তাঁর সভানেত্রীত্বে নওয়াব বাড়ীতে প্রায় একশত পুর নারীদের অনুরূপ এক সভা হয়। উক্ত সভাস্থলে প্রায় ১২০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হয়েছিল।[১১৯] তুরস্কের সুলতানের মংগল কামনায় ২৪ নভেম্বর ১৯১২ খ্রীঃ শহরের সর্বস্তরের মুসলমানেরা দলে দলে আহসান মঞ্জিলে সমবেত হয়। তাঁরা মিছিল সহকারে চকবাজার মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করে। নওয়াব সলিমুল্লাহ তথায় বক্তৃতা দিয়ে চাঁদা প্রদানের আবেদন জানালে, সভাস্থলেই ৫০০ টাকা চাঁদা ওঠে। ২৯ নভেম্বর শুক্রবার নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর নেতৃত্বে আহসান মঞ্জিল থেকে অনুরূপ একটি বিরাট মিছিল চাঁদা আদায় করতে করতে পুরানো পল্টনের

 Dhaka University Institutional Repository

মাঠে যায়। তথায় তাঁরা প্রায় ২০ হাজার লোক নিয়ে সভা করেন। সেখানে আসরের নামাজান্তে দোয়া প্রার্থনা করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ তথায় বক্তৃতা করে তিন হাজার টাকা চাঁদা তুলতে সক্ষম হন।[১২০]

নওয়াব পরিবারের মহিলাদের সমন্বয়ে একটি মহিলা সমিতি ছিল। সেখানে পুরনারীদের সূচী শিল্পকর্ম প্রভৃতি হস্তশিল্পকলা শিক্ষা দেয়া হতো। খাজা মুসার গৃহে উক্ত সমিতির কর্মস্থল ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহর বোনঝি আলমাসী বানু(১৮৯৭-১৯১৭) সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। (পরিশিষ্টে চিত্র নং-৭১ পৃঃ৩৯৫এ আলমাসি বানুর ছবি দ্রঃ) ২২ জুলাই ১৯১৩ খ্রীঃ লেডী কারমাইকেল আহসান মঞ্জিলে এসে উক্ত সমিতির গৃহ পরিদর্শন করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। সমিতির পক্ষ থেকে লেডী কারমাইকেলকে একটি সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উক্ত ক্লাবের সেক্রেটারী আলমাসী বানু লেডীকে দেয়া অভিনন্দন পত্র পাঠ করে শোনান।[১২১]

খাজা মোহাঃ ইসমাইলের মেয়ের সাথে কাজী আলাউদ্দিনের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে ১ আগস্ট ১৯১৩ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। নওয়াব শামসুল হুদা, মাননীয় এ. কে. গজনবী, মিঃ বি. এন. দাস, মিঃ আর. কে. দাস, মিঃ অন্নদা চরণ গুপ্ত, বংগীয় সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ কামিং, বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বেটসন বেল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লি এবং সিভিল সার্জন ডাঃ এন্ডারসন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুর নিজে তাঁদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।[১২২]

১৯১৪ খ্রীঃ ১১ ও১২ এপ্রিল নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকার রমনা প্রেস ভবনে যুক্ত বংগের 'মুসলিম শিক্ষা সমিতির' সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আগত প্রতিনিধিদের অনেককেই আহসান মঞ্জিলে স্বাগত জানানো হয়।[১২৩]

১৩ এপ্রিল ১৯১৪ খ্রীঃ ঢাকায় বেংগল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। তাতে নওয়াব সলিমুল্লাহর আদেশে তাঁর রাজনৈতিক মানসপুত্র এ. কে. ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন।[১২৪] ২৯ জুন ১৯১৪ খ্রীঃ শনিবার আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে পূর্ববংগ জমিদার সভার এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজা শশীকান্ত আচার্যকে জমিদার সভার সভাপতি এবং বাবু আনন্দ চন্দ্র রায় ও বাবু শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তীকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[১২৫]

১৯১৫ খ্রীঃ ১৬ জানুয়ারী নওয়াব সলিমুল্লাহ কলকাতায় পরলোক গমন করেন। ১৭ জানুয়ারী বিকেলে ৪টায় তাঁর শবাধার রেলওয়ে স্টীমার যোগে ঢাকায় আনা হলে নদীতীর ও নওয়াব বাড়ীতে লাখো জনতার ঢল নামে। আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গনে তাঁর মরদেহের প্রতি ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে সামরিক কায়দায় সম্মান জানানো হয়। সেখানে জানাজা শেষ করে সন্ধ্যায় সামরিক সম্মান সহকারে তাঁর শবাধার বেগম বাজারে নিয়ে সমাধিস্থ করা হয়।[১২৬]

চক বাজার মসজিদের সামনে প্রতি বছর ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম উপলক্ষে মিলাদ মহাফিল করা হতো। চক মসজিদের মোতাওয়াল্লী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারী করে ১৯১৬ সালের ১৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য উক্ত মাহফিল বন্ধ করে রাখে। নওয়াব হাবিবুল্লাহ এ অবস্থা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট গণ্যমান্যদের নিয়ে আহসান মঞ্জিলে এক সভা করেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রভাবিত করে ১৯ জানুয়ারী উক্ত মাহফিল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।[১২৭]

সম্রাটের জন্ম দিন উপলক্ষে নওয়াব বাড়ীর খাজা আজিজুল্লাহ (অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট)-এর গৃহে ৩ জুন ১৯১৬ খ্রীঃ এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়ে উক্ত সভায় যোগদান করেন।[১২৮] বংগীয় শাসন পরিষদের সদস্য নওয়াব শামসুল হুদা চৌধুরী ১৯১৫ খ্রীঃ কে. সি. আই. ই. উপাধি পান। নওয়াব হাবিবুল্লাহ তাঁর সম্মানার্থে ৭ আগস্ট ১৯১৬ সোমবার বিকেলে আহসান মঞ্জিলে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন।[১২৯]

১৯১৬ খ্রীঃ ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে আহসান মঞ্জিলে পূর্ববংগ জমিদার সভা, বিভাগীয় মুসলিম লীগ, ঢাকা জনসাধারণ সভা ও উকিল সভার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বংগীয় শিক্ষা সচিব স্যার শঙ্কর নারায়নকে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যৌথভাবে সম্বর্ধনা দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯ আগস্ট বুধবার বিকেলে নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে উক্ত অনুষ্ঠান করা হবে বলে স্থির হয়।[১৩০] মিঃ লায়ন ঢাকা এলে ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রীঃ শনিবার বিকেলে নওয়াব হাবিবুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে তাঁর সম্মানার্থে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। পরদিন নর্থব্রুক হলে ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।[১৩১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মেসোপটোমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। ২৬ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রীঃ সেখান থেকে তিনি ঢাকা ফিরে আসেন। পূর্ববঙ্গ জমিদার সভার উদ্যোগে পাঁচ হাজারেরও অধিক লোক নিয়ে মিছিল করে নওয়াবকে রেল স্টেশন থেকে আহসান মঞ্জিলে এনে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। ঐদিন মুসলমান যুবকেরা নওয়াবের গাড়ীর ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই তাঁকে স্টেশন থেকে আহসান মঞ্জিল পর্যন্ত বহন করেছিল।[১৩২]

২০ ডিসেম্বর ১৯১৯ খ্রীঃ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় নওয়াব হাবিবুল্লাহর উদ্যোগে আহসান মঞ্জিলে ঢাকা খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নওয়াব হাবিবুল্লাহকে সভাপতি এবং চৌধুরী গোলাম কুদ্দুসকে সম্পাদক নির্বাচিত করে স্থায়ী ঢাকা খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া অমৃতসর খিলাফত কনফারেন্সে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়।[১৩৩]

১৯২০ খ্রীঃ ২ মার্চ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির নেতা মৌলানা শওকত আলী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঢাকায় আসেন। রেল ষ্টেশন থেকে তাঁদেরকে দুটো হাতির পিঠে করে বিরাট মিছিল সহকারে বিকেলে আহসান মঞ্জিলে আনা হয়। ঢাকা খিলাফত কমিটির সভাপতি নওয়াব হাবিবুল্লাহ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করেন। পরদিন বুধবার দুপুর একটার মধ্যেই হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের ভীড়ে আহসান মঞ্জিলের বিশাল প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বেলা তিনটায় নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে উক্ত নেতাদের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা উক্ত নেতাদের স্বধর্ম ও দেশপ্রীতি এবং হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যকে প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন।[১৩৪]

নওয়াব হাবিবুল্লাহ খিলাফত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে মিরাট গমন করেন। তিনি উক্ত সভা শেষে ১৯২০ সালের ৩০ মার্চ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলে ঢাকা খিলাফত কমিটি রেল ষ্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ঢাকার বিপুল সংখ্যক লোকেরা শোভাযাত্রা করে নওয়াব সাহেবকে ষ্টেশন থেকে আহসান মঞ্জিলে নিয়ে যান।[১৩৫]

১৯২০ খ্রীঃ মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নওয়াব হাবিবুল্লাহর উদ্যোগে আহসান মঞ্জিলে খেলাফত কমিটির আরেকটি বিরাট সভা হয়। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহার্থে উক্ত সভায় জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।[১৩৬] ১৯২০ খ্রীঃ মার্চ মাসে পঞ্চম দোলের দিনে আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে হোলি গানের পালা হয়। এতে তাঁতী বাজার ও শাঁখারী বাজার দলের সাথে শহরের পশ্চিম অঞ্চলের উর্দু দল গানের পাল্লা করে। তাতে তাঁতী বাজার দল জয় লাভ করে।[১৩৭]

ঢাকা জেলা জজ মিঃ গ্রেহাম পদন্নোতি পেয়ে হাই কোর্টের জজ হন। ৩ মার্চ ১৯২৪ খ্রীঃ সোমবার বিকেলে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এতে ইউরোপীয় ও দেশীয় গণ্যমান্যরা যোগ দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ম্যাজিক শো, দেশী গান-বাজনা এবং দেশী বিদেশী প্রথানুযায়ী আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।[১৩৮] ১৩ জুন ১৯২৪ খ্রীঃ বিকেলে আহসান মঞ্জিলে সৈয়দ আব্দুল হাফিজের সভাপতিত্বে ঢাকা আঞ্জুমানে ইসলামিয়া সমিতির এক অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সরকারের সমালোচনা করে মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[১৩৯]

১৯২৪ খ্রীঃ ৪ আগস্ট বিকেলে মহারাজ শশীকান্ত আচার্যের সভাপতিত্বে আহসান মঞ্জিলে 'পূর্ববঙ্গ জমিদার সভা'-এর বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৪০] ১৯২৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে আহসান মঞ্জিলে খাজা নাজিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার এক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে এ জেলার সব মহকুমার প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন। এতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ থাকার জন্য আহবান জানানো হয়।[১৪১] ১৯২৪ খ্রীঃ ২৫সেপ্টেম্বর বিকেলে আহসান মঞ্জিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ডঃ নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্তের বিদায় উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মিঃ সেন গুপ্তের বন্ধুবর্গসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[১৪২]

১৯২৬ সালে কলকাতায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছিল। কিন্তু তার প্রভাবে ঢাকা শহরে যাতে কোনরূপ অশান্তি না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে ২৮ এপ্রিল ১৯২৬ খ্রীঃ বুধবার শহরের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ আহসান মঞ্জিলে এক বৈঠকে মিলিত হন। সভায় উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য সৃষ্টি হবেনা বলে আশা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পরদিন ২৯ এপ্রিল ১৯২৬ খ্রীঃ মধ্যরাতে ঢাকায় আমলীগোলা প্রাচীন মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্য

 Dhaka University Institutional Repository

বাজিয়ে জনৈক হিন্দুর বিয়ে যাওয়ার সময় মুসলমানরা তাতে বাধা দেয়। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে ৩০ এপ্রিল শুক্রবার আহসান মঞ্জিলে পুলিশ সুপারসহ ঢাকা শহরের গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমানের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাজনা বাজিয়ে মিছিলকারী হিন্দুরা সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানায় ২৫ টাকা জরিমানা দেয়। এছাড়া হিন্দু সমাজের নেতারা মুসলিমদের কাছে ক্ষমা চাইলে পর বিবাদটি মিটমাট করা সম্ভব হয়।[১৪৩]

পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ডাঃ কিসলু, মৌলভী আব্দুল করিম ও মৌলভী শাহ সৈয়দ ইমদাদুল হককে সাথে নিয়ে চট্রগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসেন। ১৯২৬ খ্রীঃ ১০ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আহসান মঞ্জিলে তাঁদের উপলক্ষে এক সভা ডাকা হয়। উক্ত সভায় ডাঃ কিসলু মুসলমানদের সহিষ্ণুতা দেখাতে এবং হিন্দ-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য উদাত্ত আহবান জানান।[১৪৪]

১৯২৬ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে আহসান মঞ্জিলে ঢাকা জেলার আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খাজা নাজিমুদ্দিন আঞ্জুমানের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং তদস্থলে নওয়াব হাবিবুল্লাহকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত করা হয়।[১৪৫] বরিশালের পোনাবালিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বিক্ষোভকারী মুসলমানদের উপর গুলি বর্ষণ করা হলে বহুলোক হতাহত হয়। ১৯২৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ঢাকা আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সদস্যগণ নওয়াব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে আহসান মঞ্জিলে এক সভা করে পোনাবালিয়ার ঐ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানায়। তাঁরা নিহতদের জন্য দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।[১৪৬]

নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগে ঢাকার খাজা পরিবারের লোকেরা এতদাঞ্চলের উচ্চবিত্ত সদস্যদের মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিলেন। ১৯৪০ এর দশকে এসে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী আবুল হাশিমের পরামর্শে পূর্ববাংলার লীগ নেতাদের কেউ কেউ উচ্চবিত্ত তথা খাজাদের প্রভাবমুক্ত করে দলের কর্তৃত্ব মধ্যবিত্তের হাতে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এমতাবস্থায় ২৪সেপ্টেবর ১৯৪৪ খ্রীঃ বেলা ২ ঘটিকায় আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে পূর্ববংগ জেলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলারদের সমন্বয়ে কর্মকর্তা নির্বাচন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে খাজা শাহাবুদ্দিনের সমর্থনপুষ্ট প্যানেলটি কাউন্সিলারদের ভোটে হেরে যায় এবং বিরুদ্ধবাদী তরুন নেতাদের প্যানেলটি জয়ী হয়। এঘটনার পর থেকে পূর্ববাংলার মুসলিমদের নেতৃত্ব প্রদানে আহসান মঞ্জিল তথা ঢাকা নওয়াব পরিবারের অবিসংবাদিত ও প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রমাগত খর্ব হওয়া শুরু করে।[১৪৭]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে নওয়াব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববংগের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। নওয়াব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ খাজা নাজিমুদ্দিনকে ঢাকায় সম্বর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[১৪৮] এই উপলক্ষ্যে ১৪ আগস্ট ১৯৪৮ খ্রীঃ আহসান মঞ্জিলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও খাজা পরিবারের গন্যমান্য সবাই অংশ গ্রহণ করেন। খাজা পরিবারের পক্ষ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনকে একটি মানপত্র দেয়া হয়। ঐসময় আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের বিভিন্ন স্থান থেকে নওয়াব পরিবারের সদস্যদের সাথে তাঁর অনেকগুলো ছবি তোলা হয়। পরিশিষ্টে চিত্র নং-৭২ পৃঃ৩৭৬এ এরূপ একটি আলোকচিত্র দেয়া হলো।

১৯৪৯ সালে নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার কয়েকজন সদস্যকে আহসান মঞ্জিলে এক মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করেন। তখন এ প্রাসাদের গৌরব ছিল অস্তগামী। তথাপিও আগুন্তুকেরা বিশেষ করে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের গভঃ জেনাঃ) এর প্রধান কাঠের সিঁড়ি এবং উপর তলার নাচঘর ও ড্রইংরুমের ভল্টেড সিলিং-এর চমৎকারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৫০] উল্লেখ্য, উনিশ শতকে এতদাঞ্চলে নির্মিত ধ্রুপদী স্থাপত্যে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কাঠের সিঁড়ি খুবই বিরল। পরিশিষ্টে চিত্র নং-৭৩ পৃঃ৩৭৬এ ১৯০৪ সালে তোলা উক্ত কাঠের সিঁড়ির একটি ছবি দেয়া হলো।

আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত ঘটনাবলী এতদাঞ্চলের মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে ব্যাপক অবদান রেখেছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। সমকালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরাই যে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন উল্লিখিত কার্যকলাপ থেকে তাও পরিস্কার বুঝা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। নওয়াব বাড়ীর চৌসীমানা বলতে দক্ষিণে বুড়িগংগা, উত্তরে ইসলামপুর রোড, পূর্বদিকে ওয়াইজঘাট এবং পশ্চিম দিকে শাহ সাহেব লেন বুঝাতো। মোহতারাম, *গ্লোরী দ্যাট ওয়াজ আহসান মঞ্জিল, সাপ্তাহিক হোলিডে, ৩১ জানুঃ ১৯৮২ পৃঃ৫*। পরবর্তীকালে নীলকর ওয়াইজের বাড়ীটি লীজ নেয়া হলে নওয়াব বাড়ীর সীমানা আরো বেড়ে যায়। *পুরাতন নথি*, প্রাগুক্ত,ওয়াইজ হাউস দ্রঃ।

২। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেঃ ১৮৭০ পৃঃ ৪৩৬।

৩। শেখ এনায়েত উল্লাহর বসতবাড়ী ছিল বৈরাগী টোলায়, হাকিম, *আসুদগান*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৪ এবং আজিমুশ্বান, *ঢাকা, রোমান্স*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯ । প্রতি বছর তাঁর জমিদারীর খাজনা আদায় হতো ৯,৯৯,৯০৯ টাকা; তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৮।

৪। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৯-৪০ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩।

৫। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ২৬, ৩৬, ১৩৯ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩ এবং বি. সি. এ্যালেন, *ডিঃ গেজেটিয়ার*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬,১৭৬ এবং ১০৫।

৬। দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২ এবং আঃ করিম, *ঢাকা দি মোগল ক্যাপিটাল*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৩ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ২৬ এবং সুশীল চৌধুরী, আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোং ও বাংলার রপ্তানী বাণিজ্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) ২য় খন্ড পৃঃ ১৭৫-৭৭।

৭। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬। সম্ভবত মাটির পাত্র তৈরীর মানসে মাটি খুঁড়তে গিয়ে স্থানীয় কুমারদের দ্বারাই আদিতে গর্তটির সৃষ্টি হয়েছিল। এনায়েত উল্লাহর সময় সেটার সংস্কার হয় এবং ফরাসীদের সময় উক্ত 'লুই' নামক তাঁদের কোন কর্তা ব্যক্তির নামে সেটার নামকরণ করা হয়। স্থানীয় ভাষায় বড় গর্তকে জাল্লাও বলে।

৮। বি. সি. এ্যালেন, প্রাগুক্ত ডিঃ গেজেটিয়ার, পৃঃ ১০৫, ৪৫ এবং টেইলর, *টপোগ্রাফী*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৫২-৫৩ এবং বার্ট, *রোমান্স*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬০-৬৭, ২২১।

৯। এ্যালেন, প্রাগুক্ত *ডিঃ গেজেটিয়ার*, পৃঃ ৪৫ এবং সউদ হোসেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২।

১০। যতীন্দ্র মোহন রায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩ এবং বি.সি. এ্যালেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৫ । ঢাকার ফরাশগঞ্জে ফরাসীদের ভবনাদি ১৮৩০ সালে কয়েকজন হিন্দু মহাজন ক্রয় করে। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬। উল্লেখ্য, খাজা আলীমুল্লাহ কর্তৃক ফরাসীকুঠি ক্রয়ের সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বি. সি. এ্যালেন ও যতীন্দ্রমোহন ১৮৩০ সালের কথা বলেছেন যা গ্রহণযোগ্য। তায়েশ ও টেইলর ক্রয়ের তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে টেইলর ১৮৩০ এর দশকে তাঁর গ্রন্থ লেখার সময় ফরাসীকুঠিতে জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক বাস করছেন বলেছেন। (টেইলর, *টপোগ্রাফী*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ , ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ৬১) তৈফুর বলেন, আলীমুল্লাহ ১৮৩৫ এর দিকে ফরাসী কুঠি কেনেন (তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ৩২৩) একই সাথে তিনি তাদের ফরাশগঞ্জের ভবনাদি ১৮৩০ সালে বিক্রির কথাও বলেছেন। একই মালিকের অধীনস্থ দুটো সম্পত্তির বিক্রয়কাল এরূপ ক্ষেত্রে অভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। দানী, ১৮৩৮ সালে সেটা ক্রয়ের যে তথ্য দিয়েছেন (দানী, ঢাকা পৃঃ ২২৭, ১১৮) তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্যানোরামা অব ঢাকাতে সেটাকে আলীমুল্লাহর বাড়ী বলা হয়েছে। প্যানোরামা, প্রাগুক্ত চিত্র নং-২৫। আরো উল্লেখ্য যে, ফরাসীরা তাদের কুঠি ও ভবনাদি বিক্রয় করে ফেললেও ঢাকাতে তাদের স্থায়ী রাজকীয় অধিকার ত্যাগ করেননি। (যতীন্দ্র মোহন পৃঃ ১৮৩) ১৯০৫ সালে ফরাসী সরকারের লোকেরা এসে ফরাশগঞ্জ পল্লী জরিপ করে পওনী দিতে চাইলে নওয়াব সলিমুল্লাহ তা নিতে আগ্রহী হন। (ঢাকা প্রকাশ, ২১ মে ১৯০৫ এবং ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯১১)

১১। প্যানেরামা অব ঢাকা, প্রাগুক্ত চিত্র নং-৩৯ তে খাজা হাফিজুল্লাহর উক্ত বাড়ীটা দেখা যায়। প্রফেঃ মামুন ভুলক্রমে সেটাকে মৌঃ হুসেনুল্লাহর বাড়ী বলেছেন। মামুন, *পুরানো ঢাকা উৎসব ও ঘরবাড়ী*, ঢাকা ১৯৮৯, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।

১২। সাবা, *তারিখ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০-৪০।

১৩। সউদ হোসেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২ এবং বি. সি. এ্যালেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৬ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, পৃঃ ৩২৩।

১৪। তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৪০ এবং তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৩।

১৫। বিলাসী মোহাম্মদ মীর্জার দেনার দায়ে বাড়ীটি হিন্দু মহাজনের হাতে চলে যায়। (তায়েশ, *তাওয়ারিখ*, বংগানুবাদ, পৃঃ ১৪৯ তৈফুর, *ঢাকা* পৃঃ ৩৪৫) মোঃ মীর্জাকে আঃ গণি ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেন এবং তাঁর বাড়ীটা কিনে নেন। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৪০৩।

১৬। সউদ হোসেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২ এবং বি. সি. এলেন পৃঃ ১৭৬। নওয়াবদের প্রাচীন এ্যালবামে প্রাপ্ত টর্নেডোয় বিধ্বস্ত আহসান মঞ্জিলের চিত্র থেকে ফরাসী কুঠিটাই যে নওয়াবদের অন্দর মহলে পরিনত করা হয়েছিল এবং রঙ মহলটি তার পাশে নতুন করে নির্মিত হয়েছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়। (পরিশিষ্ট চিত্র নং ৫৯ দ্রঃ) তৈফুর বলেছেন, অন্দর মহলটি (ফরাসীদের আমলের) পুরাতন ভিত্তি ও গাঁথুনির উপর ছিল বিধায় ১৮৮৮ খ্রীঃ টর্নেডোর সময় তা ভেংগে গুড়িয়ে পড়ে। (তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৩)

১৭। তৈফুর, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪ এবং দানী, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮, ২২৭। তবে ইকবাল আজিমের মতে, খাজা আলীমুল্লাহ তাঁর পিতা পীর আহসানুল্লাহর নামে এই ভবনটির নামকরণ করেছিলেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর নামের সাথে এর নামকরণের কোন সম্পর্ক নেই। (ইকবাল আজিম, *মাশারিকী-বাঙাল মে উর্দু*, পৃঃ ৬১ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *ফার্সী সাহিত্য*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। বি. সি. এ্যালেন, *ডিঃ গেজেটিয়ার, ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১-৮২। উল্লেখ্য, বি. সি. এ্যালেনকে ২৪ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ দেয়া নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজারের একটি পত্র থেকে তিনি ১৮৭২ খ্রীঃ নির্মাণ তারিখটি পেয়েছিলেন। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত দ্রঃ এবং দানী, ঢাকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৭।

১৯। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪।

২০। ক্যাম্পবেল, *গ্লীম্পসেস,* প্রাগুক্ত, ভল্যুম-২, পৃঃ ২০২।

২১। খাজা লতিফুল্লাহ, *ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি নিউজ লেটার,* ১ জানুঃ ১৯৯২ পৃঃ ৮। উল্লেখ্য, মোহতারামই প্রথম প্রাসাদ ভবন গাত্রে উৎকীর্ণ উক্ত ১৮৫৯ সালের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ঐতিহাসিক ও গবেষকদের সেটা লক্ষ্য না করার জন্য সমালোচনা করেন। তবে তিনি সালটি তথায় আরবী হরফে লেখা আছে বলে যে তথ্য দিয়েছিলেন-তা ঠিক নয়। আসলে লেখাটি ছিল ইংরেজিতে। (মোহতারাম, হলিডে, ৩১ জানুঃ ১৯৮২ পৃঃ৫) ১৯৮৬-৮৭ সালে সংস্কার কালে গণপূর্ত বিভাগের লোকেরা অসাবধান বশত উক্ত তারিখ লেখাটি ধ্বংস করে ফেলে, যা আজো পুনস্থাপন করা হয়নি। তবে সংস্কারকালে তোলা ভবনটির আলোকচিত্রে উক্ত তারিখ দেখা যায়।

২২। আর্থার লয়েডক্রে-এর গ্রন্থের বংগানুবাদ, ফওজুল করিম, *ক্রে'র ডাইরী,* ঢাকা ১৯৯০ পৃঃ ২০।

২৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৬। উক্ত মার্টিন এন্ড কোং ঢাকাতে আরো যে সব জাঁকালো ইমারত নির্মাণ করেছিল, তন্মধ্যে আর্মেনী খাজা আরাটুন সাহেবের বাড়ী (বর্তমানে রূপলাল হাউস) উল্লেখযোগ্য। শরীফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১২।

২৪। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

২৫। বর্তমানের সুদৃশ্য গম্বুজটি রঙমহলের কেন্দ্রস্থলের শীর্ষে অবস্থিত, যা হাওয়াখানা রূপেই ব্যবহৃত হতো। সেই আমলে হাওয়াখানা রূপে ব্যবহারের জন্য গম্বুজটি ওরূপ বেমানান স্থানে তৈরী হয়েছিল কি-না তাও বলা যায় না। তবে একটি সূত্র থেকে জানা যায়, আলীমুল্লাহ ও আব্দুল গণি এরা দুজনেই অধ্যাত্মিক সাধনা করতেন। বিশেষ করে আব্দুল গণি মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে এবং মাগরেবের পর নিভৃতে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতেন। উক্ত কাজে এরূপ একটি স্বতন্ত্র কোঠা নির্মিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

২৬-২৭। ঢাকা প্রকাশ, ৮ এপ্রিল ১৮৮৮ খ্রীঃ পৃঃ ৫ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৭ এবং হৃদয় নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৩।

২৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৭ এবং হৃদয় নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯২।

২৯। ঢাকা প্রকাশ, ৮, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫ এবং হৃদয় নাথ, *রিমিনিসেন্স,* পৃঃ ৯৩।

৩০। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫।

৩১। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৩।

৩২ও ৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৭। উক্ত টর্নেডোয় ক্ষয়ক্ষতির আরো তথ্যের জন্য যতীন্দ্রমোহন,প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭৩ এবং কেদার নাথ পৃঃ ১৮৬ দ্রঃ।

৩৩ ও ৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ৮ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫; তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪ এবং হৃদয়নাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯২।

৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫, তৈফুর লিখেছেন, ঐ সময় নওয়াব কর্তৃক ২৫ হাজার টাকা দান করা হয়েছিল। (তৈফুর, ঢাকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪) যা হয়তো সঠিক নয়।

৩৭ ও ৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৮৮ পৃঃ ৫ এবং ২০ মে ১৮৮৮ পৃঃ ৬ এবং নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু) প্রাগুক্ত ১৮৯০ সালের ২৪ নভেঃ দ্রঃ।

৩৯-৪০। ঢাকা প্রকাশ, ২০ মে ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৪১। ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করে যে, পুরো বাড়ীটি পুনর্নির্মাণে যে কত লক্ষ টাকা লাগবে তার ঠিক নাই, ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৪২-৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৭।

৪৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জুন, ১৮৯৭ পৃঃ ৫।

৪৭। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪-৩২৬।

৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জুন ১৮৯৭ পৃঃ ৫।

৪৯। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, আঃ মঃ জাদুঘরে রক্ষিত, পৃঃ তাং ১২ জুন ১৮৯৭ খ্রীঃ।

৫০। ঢাকা প্রকাশ, ১৩, ২০ জুন ১৮৯৭ খ্রীঃ এবং পুরানো দলিল, *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩। শাহীন মেডিকেল হলের পক্ষ থেকে প্রতি বছর ওয়াল ক্যালেন্ডার বের করা হতো। এরূপ চিত্রিত একটি বালিকার ছবির সাথে ১৮৯৫ খ্রীঃ প্রকাশিত একটি ক্যালেন্ডার উপহার পেয়ে ঢাকা প্রকাশ-এর অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে খবর প্রকাশ করে। (ঢাকা প্রকাশ, ২০ জানুঃ ১৮৯৫ পৃঃ ৪) পরবর্তী বছর এরা প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বার্ন হার্ট-এর পুষ্পসজ্জিত চিত্রসহ ক্যালেন্ডার বের করে। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ ফেব্রুঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৮।

৫১,৫২ ও ৫৩। ঢাকা প্রকাশ, ২০ জুন, ১৮৯৭ পৃঃ ৬-৭।

৫৪-৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুলাই, ১৮৯৭ পৃঃ ৬-৭। উল্লেখ্য, ঢাকার উক্ত ভূমিকম্পের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী মওলানা আঃ আউয়াল জৌনপুরী তাঁর 'আল যালাযিল' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি বর্ণনা করেছেন। দেখুন মোঃ আব্দুল্লাহ, মওঃ আঃ আউয়াল জৌনপুরী, ১ম প্রকাশ-ঢাকা, ১৯৯৫ পৃঃ ৭৭-৭৮।

৫৫(ক)। ফারুক আই. ইউ. খান, *এ টিপিক্যাল কলোনিয়াল জমিদার হাউস,* নিবন্ধমালা, উচ্চতর, মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ সংখ্যা জুন ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। বাংলাদেশ সরকার গেজেট, *এক্সট্রাঅডিনারী পাবলিশড বাই অথোরিটি, মানডে, নভেঃ* ৪, ১৯৮৫ ইং পৃঃ নং ৭৯৭৯-৭৯৮১ দ্রঃ।

৫৭। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংশ্লিষ্ট নথি নং-১-ই-২/৭০-৭১-৯০-৯১ এবং আহসান মঞ্জিল জাদঘরের উদ্বোধনী স্মরণিকা, ঢাকা ২০ সেপ্টেঃ ১৯৯২ দ্রঃ।

৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট ১৮৯৬ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত, ভল-২ পৃঃ ১০২৯ এবং বার্ট, *ট্রয়েলভমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৮।

৫৯। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৫ পৃঃ ৫৩৪ এবং মুনতাসীর মামুন, ঢাকার প্রথম, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৫ (অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট) পৃঃ ৫১।

৬০। বার্ট, *ট্রয়েভমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮০। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯। ১৮৬১ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড পাশ করে। এ বিলের বিধান ছিল শহরাঞ্চলে-ছোটখাট অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় অনারারী স্টাইপেন্ডারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা যাবে। ঢাকায় এরূপ প্রথম দুজনকে অনারারী ম্যজিঃ নিয়োগ করা হয়। (১) আঃ গণি (২) নিকি পগোজ। মামুন, ঢাকার প্রথম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫ পৃঃ ৫১।

৬১। লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯-৯০ এবং ক্যাম্পবেল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৯ এবং বার্ট, *ট্রয়েভমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুলাই ১৮৬৯ খ্রীঃ।

৬২। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল, ১৮৭০ খ্রীঃ।

৬৩। বার্ট, *ট্রয়েভমেন,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত ভল্যুম-২ পৃঃ ১০২৮ এবং লোকনাথ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯।

৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ও ২৬ জুলাই, ১৮৭৪ পৃঃ ২২১ ও ২৩৪।

৬৫। ঢাকা প্রকাশ ৩ আগস্ট ১৮৭৪ পৃঃ ২৪৭।

৬৬। মোহতারাম, *বাংলাদেশ টাইমস,* ১৮ জানুঃ ১৯৮০ এবং ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই, ১৯২৪ পৃঃ৩।

৬৭। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৭।

৬৮। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৮।

৬৯। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাশ বরস,* হাসেম সুফীর বংগানুবাদ, ঢাকা ১৯৯৫ পৃঃ ১১৫ এবং রেজাউল করিমের বংগানুবাদ পৃঃ ৭৭।

৭০। লোকনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯০ এবং আজিমুশ্বান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ১৭ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৩২৮ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুলাই ১৮৬৩ খ্রীঃ

৭১। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ফেব্রুঃ ১৮৭৫ খ্রীঃ।

৭২। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ জুলাই ১৮৭৫ খ্রীঃ পৃঃ ২৩৩।

৭৩। ঢাকা প্রকাশ, ১ মে ১৮৭৬ পৃঃ ৮৬-৮৭ এবং আব্দুল গফুর নাসসাখের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মোঃ আব্দুল্লাহ, আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ পৃঃ ৫০ এবং ১০০।

৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুঃ ১৮৮১ পৃঃ ৪৮৭।

৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ২০ আগস্ট ১৮৮২ পৃঃ ২৬৭-৭০।

৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ আগস্ট ১৮৮৪ পৃঃ ২৮৪ এবং পৃঃ ৫২৪।

৭৭। উল্লেখ্য, ঐ একই দিনে নওয়াবের দিলখুশা বাগান বাড়ীতেও টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়। দেখুন, নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, উদ্ধৃত-রেজাউল করিম, ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অফিসার সমিতি পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৯৯৬ পৃঃ ২৬।

৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ও ২১ ফেব্রুঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৫২২ এবং ৫৪২।

৭৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৭ পৃঃ ৭ এবং মোঃ আলমগীর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের এক স্মারক, ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অফিসার সমিতির পত্রিকা, ১৬ ডিসেঃ ১৯৯৫ পৃঃ ৬৩।

৮০। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ আগস্ট, ১৮৮৮ পৃঃ ৫।

৮১। ঢাকা প্রকাশ, ১১, ১৮, ২৫ নভেঃ ১৮৮৮ এবং মোহতারাম, *সাপ্তাহিক হলিডে,* ২৪, ৩১ জানুঃ এবং ৭ ফেব্রুঃ ১৯৮২ খ্রীঃ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* পৃঃ ১১৫।

৮২। *মারছিওনেস অব ডাফেরিন এন্ড আভা, লন্ডন ১৮৯০ পৃঃ ২৬৬ ও ৪০১।*

৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৪-৫ এবং হুসাইনুর রহমান, *হিন্দু মুসলিম রিলেশন ইন বেংগল, বোম্বে-*১৯৭৪ পৃঃ ১১৭ ও ১৮ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-প্রফেঃ ওয়াকিল আহমদ, মুসলিম *অরগানাইজেশন অব ঢাকা, ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৪ এবং ওয়াকিল আহমদ, *উনিশশতকে,* -- প্রাগুক্ত -২ খন্ড পৃঃ ২৪৮- ৪৯।

৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৭ এবং ২৩ ফেঃ ১৮৯২ পৃঃ ৮।

৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জানুঃ ১০ মার্চ এবং ৭ এপ্রিল ১৮৯৫ পৃঃ ৬, ৭।

৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই এবং ২ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭।

৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল ১৮৯৮ পৃঃ ৬।

৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ ও ২৬ ফেব্রু ১৮৯৯ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৩, ২০ সেপ্টেঃ ও ১১ অক্টোঃ ১৮৯৬, ২০ আগস্ট ১৮৯৯, ২৬ ফেব্রুঃ ১৯০৫ এবং ১ এপ্রিল ১৯০৬ খ্রী ঃ

৯০। মোসলেম ক্রনিকেল, ১৭ জানুঃ ১৮৯৫ এবং ১২ আগস্ট ১৮৯৯ পৃঃ ৪৫৬।

৯১। ঢাকা প্রকাশ, ১ ও ৮ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৪, ৫।

৯২। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ডিসেঃ ১৯০১ পৃঃ ৪, *ইনডেক্স অব পেপার্স-১* পৃঃ ১১৪, ১১৬, ১২১।

৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ২ মার্চ ১৯০২ পৃঃ ৫।

৯৪। *দি বেংগল টাইমস,* ২৩ জুলাই, ১৯০২ খ্রীঃ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩, ২৭ জুলাই ১৯০২ খ্রীঃ। সম্ভবত উক্ত আউটডোর গৃহটি ভাগ্যকুলের জমিদার হরেন্দ্র লাল রায় কর্তৃক ম্যাজিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিনের নামে তৈরীকৃত আউটডোর ওয়ার্ড হবে। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুন, ১৯০৩ এবং ৬ ডিসেঃ ১৯০৩।

৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ জানুঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩।

৯৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯০২ এবং ৪ জানুঃ ১৯০৩ পৃঃ ৩।

৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ৬, ১৩ ডিসেঃ ১৯০৩ খ্রীঃ।

৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জানুঃ ১৯০৪ খ্রীঃ এবং ২০ ও ২৭ ডিসেঃ ১৯০৩।

৯৯। ঢাকা প্রকাশ, ৭, ১৪, ২১ ফেব্রুঃ ১৯০৪ খ্রীঃ এবং বদরউদ্দিন আহমদ, *জাগরণ,* ১ম বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবন ১৩৩৫ বাং পৃঃ ১৬৯।

১০০। সুফিয়া আহমেদ, *নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ভল-২১,* ১৯৭৬ পৃঃ ১৫৩ এবং শিরিন আখতার, *অন দি সিলেকশন অব ঢাকা ...* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯০ এবং আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* পৃঃ ৫৩ এবং *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪ এবং প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি, ১ম খন্ড দ্রঃ ঢাকা-১৯৭০।

১০১। চিত্রটি খাজা রাজী হায়দার কর্তৃক সম্পাদিত এবং গোল্ডেন জুবিলি অব পাকিস্তান রেজুলেশন উপলক্ষে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস কর্তৃক প্রকাশিত ডাইরী, করাচী ১৯৯০ থেকে সংগৃহীত।

১০২। ঢাকা প্রকাশ, ১০ জুলাই ১৯০৪ খ্রীঃ।

১০৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩ এবং ১০ জুলাই ১৯০৪ পৃঃ ৫।

১০৪। ঢাকা প্রকাশ, ১১ জুন ১৯০৫ পৃঃ ৩।

১০৫। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেম্বর ১৯০৫ খ্রীঃ

১০৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ পৃঃ ৩, এবং ৬ জানুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩ এবং এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৮৯, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯১।

১০৭। চিত্রটির জন্য নাজির হোসেন-এর কিংবদন্তীর ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৪১ দ্রঃ

১০৮। ঢাকা প্রকাশ ১৩ জানুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩ এবং দি ইস্ট (ঢাকা) ১৭ জানুঃ ১৯০৭ এবং দি ইংলিশম্যান ১৪ জানুঃ ১৯০৭ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মোঃ আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৫।

১০৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মে ১৯০৭ পৃঃ ৮।

১১০। ঢাকা প্রকাশ, ৮ মার্চ ১৯০৮ পৃঃ ৩।

১১০(ক)। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জানুঃ ১৯০৯ পৃঃ ৫।

১১১। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ মার্চ ১৯০৯ পৃঃ ৩। ঢাকার বিখ্যাত জমিদার মীর আশরাফ আলীর পৌত্র আসাদউদ্দিন হায়দার ছিলেন সৈয়দ মুহাঃ আজাদের পিতা। অন্যদিকে নওয়াব আব্দুল লতিফ ছিলেন তাঁর শ্বশুর এবং হাসসান সুহরাওয়ার্দি ও এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন তাঁর জামাতা (আবদুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ২৩ ও ১৯৯)

১১২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জানু এবং ২৮ মার্চ ১৯০৯ পৃঃ ৩। উল্লেখ্য, খাজা মোঃ আজম ১৯১৭ খ্রীঃ খান বাহাদুর খেতাব পান। জ্যোতিষচন্দ্র প্রাগুক্ত পৃঃ ১২ থেকে উদ্ধৃত করেছেন- মোঃ আব্দুল্লাহ, *মুসঃ সুধী,* পৃঃ ১৫১।

১১৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ এপ্রিল ১৯০৯ পৃঃ ৩।

১১৪। খাজা শামসুল হকের ডাইরী (উর্দু -অপ্রকাশিত) খাজা হালিমের কাছে রক্ষিত তাং ১৬,২২, ২৪ মার্চ ১৯১১ দ্রঃ

১১৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ১৯১১ পৃঃ ৫।

১১৬। *পুরানো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৯ মার্চ ২৭ আগস্ট ১৯১১ খ্রীঃ ।

১১৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ আগস্ট, ২৬ মে, ৩০ ডিসেঃ ১৯১১ পৃঃ ৩।

১১৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মে ১৯১২ পৃঃ ৩।

১১৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ নেভেঃ ১৯১২ পৃঃ ৩।

১২০। ঢাকা প্রকাশ, ১ ডিসেঃ ১৯১২ পৃঃ ৩ এবং বদর উদ্দিন আহমদ লিখেছেন, পল্টনে ঐদিন ২৫ হাজার লোক সমবেত হয়েছিলো। এর মধ্যে বহু হিন্দু ও স্থানীয় ইংরেজও ছিল, জাগরণ ১ম বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৩৩৫ বাং পৃঃ ১৬৯।

১২১। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই ১৯১৩ পৃঃ ৪। উল্লেখ্য, ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের পাটুয়াটুলিস্থ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী গৃহে অনুরূপ একটি অমুসলিম মহিলা সমিতিতে লেডী কারমাইকেল ঐ আগস্ট মাসের শেষের দিকে পরিদর্শন করেন। ঢাকা প্রকাশ, ১ ভদ্র ১৩২০ দ্রঃ। চিত্রটি আলমাসী বানুর পুত্র শেখ মোঃ আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১২২। ঢাকা প্রকাশ, ৩ আগস্ট ১৯১৩ পৃঃ ৩। কাজী আলাউদ্দিন ঢাকা শহরের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট ছিলেন, তাঁর বড় ছেলে জালালুদ্দিনের সাথে খাজা ইসমাইলের কন্যার উক্ত বিয়ে হয়েছিল। তাঁর দুই মেয়েকে নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর দুই ছেলে বিয়ে করেছিলেন। সত্যেন সেন, শহরের ইতিকথা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০।

১২৩। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল ১৯১৪।

১২৪। আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৯, ১৮৫-৮৬।

১২৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুলাই, ১৯১৪ পৃঃ ৩।

১২৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জানুঃ ১৯১৫ পৃঃ ৩ এবং *পুরানো দলিল, ইনডেক্স অব পেপার্স-১*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩২. ২৫০।

১২৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জানুঃ ১৯১৬ পৃঃ ৪।

১২৮। ঢাকা প্রকাশ, ১১ জানুঃ ১৯১৬ পৃঃ ৩।

১২৯। ঢাকা প্রকাশ, ৬ আগস্ট ১৯১৬ পৃঃ ৩ এবং ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান ... ২য় খন্ড পৃঃ ১২২।

১৩০। ঢাকা প্রকাশ, ৬ আগষ্ট ১৯১৬ পৃঃ ৩।

১৩১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ও ২৫ ফেব্রুঃ ১৯১৭ পৃঃ ৩।

১৩২। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ ডিসেঃ ১৯১৮ খ্রীঃ।

১৩৩। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ডিসেঃ ১৯১৯ পৃঃ ৩।

১৩৪। ঢাকা প্রকাশ, ৭ মার্চ ১৯২০ পৃঃ ৩ এবং ২৮ মার্চ ১৯২০ পৃঃ ৫।

১৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ এপ্রিল ১৯২০ পৃঃ ৩।

১৩৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ মার্চ ১৯২০ খ্রীঃ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬০।

১৩৭। ঢাকা প্রকাশ, ২১ মার্চ, ১৯২০ পৃঃ ৩।

১৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ২, ৯ মার্চ ১৯২৪ পৃঃ ৩।

১৩৯। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুন, ১৯২৪ পৃঃ ৩।

১৪০। ঢাকা প্রকাশ, ১০ আগস্ট ১৯২৪ পৃঃ ৩।

১৪১। ঢাকা প্রকাশ, ১০ সেপ্টে ঃ ১৯২৪ পৃঃ ৩।

১৪২। ঢাকা প্রকাশ, ২৮ সেপ্টেঃ ১৯২৪ পৃঃ ৩।

১৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ২, ৯ মে ১৯২৬ পৃঃ ৩।

১৪৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জুন ১৯২৬ পৃঃ ৩।

১৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ৫ সেপ্টেঃ ১৯২৬ পৃঃ ৩।

১৪৬। ঢাকা প্রকাশ, ৩ এপ্রিল ১৯২৬ পৃঃ ৩।

১৪৭। কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৮২ (১৯৭৪) পৃঃ ২০-৪০। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধবাদীদের নিয়ে নওয়াব হাবিবুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে একটি সভা করেছিলেন বলে জানা যায়। মোঃ আবুল কাশেম (সম্পাদিত) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ৩ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯।

১৪৮। কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, ২য় খন্ড, ঢাকা ১৯৭৪ পৃঃ ৯০।

১৪৯। চিত্রটি মরহুম খাজা লতিফুল্লাহর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৫০। মোহথারাম, *গ্লোরী দ্যাট ওয়াজ আহসান মঞ্জিল, হোলিডে, ২৪ জানুয়ারী ১৯৮২*।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

বিনোদনমূলক ইমারত, বাগান ও বাগানবাড়ী, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি নির্মাণ

১১(১) বাগান ও বাগানবাড়ীঃ

রঙমহল, হাওয়াখানা, পুকুর, লেক ও মনোরম বৃক্ষরাজি সম্বলিত বিস্তৃত বাগানবাড়ী তৈরী করা ছিল ঢাকার নওয়াবদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ঢাকা শহর এলাকা ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে নওয়াবদের জমিদারী এলাকায় সুবিধামত স্থানে তাঁরা বেশ কয়েকটি বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে সাদুল্লাপুরের (সাভার) বাইগুনবাড়ীস্থ শিকারগৃহ এবং নারায়নগঞ্জের হাজীগঞ্জ দুর্গের বাগানবাড়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১] এছাড়া তাঁদের বেশ কতকগুলো ফলের বাগান ছিল। ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের জমিদারীর প্রায় প্রতিটি কাচারীতেই দপ্তরের জন্য পাকা দালান কোঠা তৈরী করতেন। সেই সাথে উপাসনার জন্য মন্দির, মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা হতো। এছাড়া কাচারী এলাকায় পুকুর খনন ও রাস্তা ঘাট নির্মাণ তাঁদের উল্লোখযোগ্য অবদান ছিল।

ঢাকার নওয়াবদের যেসব বাগান ও বাগানবাড়ী ছিল তন্মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলো উল্লেখযোগ্যঃ

(১) শাহবাগ বাগানবাড়ী
(২) পরীবাগ বাগানবাড়ী
(৩) দিলখুশা বাগানবাড়ী
(৪) বাইগুনবাড়ী শিকারগৃহ
(৫) কোম্পানী বাগান
(৬) হাজী দূর্গ বাগানবাড়ী
(৭) জিন্‌জিরা ফলের বাগান
(৮) শ্যামপুর ফলের বাগান
(৯) হোসেনী দালানের বাগান
(১০) বেগম বাজার ফলের বাগান
(১১) গোলাম মোস্তফা লেনের বাগান
(১২) জুরাইনের আম বাগান
(১৩) মাতুয়াইলের ফলের বাগান
(১৪) শাহজাদা মিয়ার বাগান, আজিমপুর
(১৫) মীর্জা ফকির মোহাম্মদের বাগান (আগুসেগুল)
(১৬) নওয়াব ইউসুফজানের বাগান

সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে এবং জমিদারী প্রথা বিলোপ হবার কারণে এখন ঐসব বাগানবাড়ীর সব কিছুই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের অভাবে সেগুলোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী জানাও এখন দুস্কর। তবুও বিভিন্ন সূত্রে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তার প্রেক্ষিতে নিম্নে নওয়াবদের উল্লেখিত বাগান ও বাগানবাড়ীর বৈশিষ্ট্য এবং সেখানে সংগঠিত কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

১১(১) (ক) শাহবাগ বাগানবাড়ী ঃ

নওয়াবদের বাগান বাড়ীগুলোর মধ্যে ঢাকা শহরের শাহবাগ বাগানবাড়ীটাই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মোগলদের বিলাসবহুল বাগানবাড়ীর অনুকরণে তৎকালীন ঢাকা শহরের উত্তরাংশে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এটি তৈরী করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরণের বৈষয়িক অট্টালিকা এবং প্রমোদাগার , সরোবর, নহর ও সেতু, শান বাঁধানো লন, প্রশস্ত মল, চবুতরা, দেশ-বিদেশী মনোরম বৃক্ষরাজী, ফুল ও ফলের বাগান, দর্শনীয় ও বিরল প্রজাতির পশু-পাখি সম্বলিত চিড়িয়াখানা,

Dhaka University Institutional Repository

রঙ বেরঙের মৎস সম্বলিত চৌবাচ্চা, দুস্প্রাপ্য ও আজব বস্তু সামগ্রীর সমাবেশে স্থাপিত যাদুঘর প্রভৃতি নিয়ে শাহবাগ বাগান বাড়ীটি ছিল চিত্তবিনোদন ও বিলাস-ব্যসনের এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ লীলাভূমি।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ জুড়ে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে নওয়াবদের এই শাহবাগ বাগান বাড়ীটি ছিল ঢাকার যাবতীয় উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের প্রধান কেন্দ্র ভূমি। ঢাকার নওয়াবদের পারিবারিক বিলাস-ব্যসন, আমোদ-প্রমোদ ছাড়াও এখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় নাগরিক এবং ব্রিটিশ সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমন কিংবা বিদায় উপলক্ষে জৌলুস সহকারে সম্বর্ধনা দেয়াসহ আপ্যায়ন ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হতো।[২] নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে এখানে ১৯০৬ খ্রীঃ ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগের জন্ম হলে শাহবাগ বাগান বাড়ীটি ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শাহবাগ বাগান বাড়ীতে দর্শণীয় অনেককিছুই থাকলেও সর্বসাধারণের জন্য তা সব সময় উন্মুক্ত ছিল না। বাগানের চারিদিকে বাউন্ডারী দেয়াল এবং গেট সমূহে নিরাপত্তা প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত করা ছিল। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা ও পার্বন উপলক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে তা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হতো। এছাড়া ব্যক্তিবিশেষগণ অনুমতি সাপেক্ষে বাগানে প্রবেশ করতে পারতো।[৩] ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিকেল বেলায় কয়েকজন গুর্খা সৈন্য ঐ এলাকায় বেড়াতে গিয়ে নওয়াবের শাহবাগ গার্ডেনে জোর করে ঢুকতে চাইলে প্রহরীরা তাদের তাড়িয়ে দেন। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে ঐ দিনই রাত দুপুরে ২৫/৩০ জন গুর্খা সৈন্য সদলবলে গিয়ে বলপূর্বক বাগানে প্রবেশের চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় বাগান রক্ষক জমাদার বন্দুকের গুলি চালিয়ে গুর্খাদের কয়েকজনকে আহত করে তাদেরকে নিবৃত করতে বাধ্য হন।[৪] পরবর্তীকালে যত্নের অভাবে এ বাগান বাড়ীর সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে যায় এবং নওয়াবের শরিকদের মধ্যে তা ভাগাভাগি হতে থাকে। এসময় ১৯২১ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর বিধবা স্ত্রী খোদেজা বেগম এবং নওয়াবের কন্যা পরীবানু (চিত্র নং ৭৪ দ্রঃ) শহরের পর্দানশীল ভদ্র মহিলাগণের মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য শাহবাগ বাগানের দক্ষিনাংশ (যা তাঁদের মালিকানাধীন ছিল) প্রতি শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত খুলে রাখার ব্যবস্থা করেন।[৫]

শাহবাগ এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঢাকায় মোগল বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠাকালে অত্র অঞ্চলে মহল্লা সুজাতপুর ও মহল্লা চিশতিয়ান নামে দুটো আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। সুজাতপুর ছিল বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকা থেকে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত বিস্তৃত। তিন নেতার মাজার ও এর পশ্চিম-দক্ষিণ এলাকা জুড়ে ছিল মহল্লা চিশতিয়ানের অবস্থান। এই পুরো এলাকাটি সুজাতপুর মৌজার অন্তর্গত ছিল। সুবাদার ইসলাম খান চিশতির ভাই সুজাত খান চিশতির নামানুসারে সুজাতপুর মৌজার নামকরণ করা হয়েছিল।[৬] বর্তমান রমনা পার্কের দক্ষিনাংশ থেকে শিশু একাডেমী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মোগলরা তৈরী করেছিল এক সুদৃশ্য বাগান যা ' বাগ-ই-বাদশাহী' নামে পরিচিত ছিল।[৭] ১৯০৩ খ্রীঃ পর্যন্ত পুরানো হাইকোর্ট এলাকায় যে বিশাল গেটওয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, তৈফুর সাহেব সেটাকে ঐ বাগ-ই-বাদশাহীর ফটক বলেছেন। ১৯০৫ খ্রীঃ নতুন প্রদেশের রাজধানী নির্মাণে ঐ ফটকসহ অত্র এলাকার পুরানো অনেক ঘরবাড়ী, সমাধি ভেংগে ফেলা হয়েছিল।[৮]

মহল্লা চিশতিয়ান, সুজাতপুর ও বাগ-ই বাদশাহীর মাঝখানের জায়গাটুকু জুড়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত চত্বরের নাম হয়তো মোগলরা দিয়েছিল 'রমনা'। কারণ বিস্তৃত সবুজ চত্বর বা লন-কে ফার্সী ভাষায় 'রমনা ' বলা হয়।[৯] কালক্রমে এই রমনা নামেই পুরো এলাকাটি পরিচিত হয়ে উঠে। রমনা পেরিয়ে উত্তরে ছিল তখন জঙ্গল। রমনা এলাকার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছিল ২/৩ টি খাল। সুজাতপুর ও চিশতীয়ান মহল্লার অভিজাতরা হয়তো বিকেলে রমনা ও বাগ-ই বাদশাহীতে বেড়াতে বের হতেন।[১০] ঢাকা থেকে মোগল প্রাদেশিক রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হবার ফলে ঢাকা শহরের অন্যান্য এলাকার মত ক্রমে রমনাও হয়ে পড়েছিল জঙ্গলাকীর্ণ। মহল্লা সুজাতপুর ও মহল্লা চিশতিয়ানও ক্রমে জন বিরল এলাকায় পরিণত হয়ে পড়ে। আগেই বর্ণিত হয়েছে ব্রিটিশ আমলে রমনা পুনরুদ্ধারের কাজ প্রথম শুরু করেছিলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট

Dhaka University Institutional Repository

চালর্স ড'স। তার সময় ১৮২৩ খ্রীঃ গঠিত হয়েছিল 'কমিটি অব ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট'। ১৯২৯ খ্রীঃ পর্যন্ত চালু থেকে উক্ত কমিটি ঢাকার উন্নয়নে যেসব কাজ করেছিল তন্মধ্যে ১৮২৫ খ্রীঃ দিকে রমনার শ্বাপদ-সংকুল জঙ্গল পরিস্কার করে রেসকোর্স ময়দান স্থাপনের কাজটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১]

আর্মেনীয় ভূস্বামী সৌখিন আরাতুন সাহেব ছিলেন ময়মনসিংহের হোসেনশাহী পরগনার জমিদার এবং বর্তমান পুরানো ঢাকার রূপলাল হাউসের আদি প্রতিষ্ঠাতা। উনিশ শতকের প্রথমদিকে তিনি বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের দক্ষিণ এলাকায় তৈরী করেছিলেন এক বাগানবাড়ী।[১২] আরাতুন সাহেবের উত্তরাধিকারীরা তাঁর জমিদারী খাজা আলীমুল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবার সময় ঐ বাগানবাড়ীটি খাজা পরিবারের হাতে আসে।[১৩] আরাতুনের বাগানবাড়ীর কিছুটা উত্তরে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এলাকায় আরেকটি বড় ধরণের বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন ব্রিটিশ বিচারক, জন ফ্রান্সিস গ্রিফিথ কুক সাহেব। অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৮৪৪-৪৫ সালের দিকে খাজা আলীমুল্লাহর কাছে বাগানবাড়ীটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।[১৪] পরবর্তীকালে খাজা আব্দুল গণি ও তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ এসম্পত্তির আরো বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। ধরে নেয়া যায় বর্তমান বাংলা একাডেমী থেকে শুরু করে সমগ্র কলা ভবন এলাকা, কাঁটাবন, শাহবাগ হয়ে ঢাকা ক্লাব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছিল তাঁদের ঐসব সম্পত্তির অন্তর্গত। এছাড়া রেসকোর্সসহ রমনাপার্ক এলাকা খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকেই এ পরিবারের মালিকানাধীন ছিল একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

উনিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে আরাতুন সাহেব এবং জজ গ্রিফিথ সাহেবের বাগান বাড়ী ক্রয় করে খাজা আলীমুল্লাহ সেটা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু শাহবাগে ব্যাপকভাবে একটি বিলাসবহুল বাগানবাড়ী গড়ে তোলা হয়েছিল আরো অনেক পরে। ১৮৬৮ খ্রীঃ নওয়াব এস্টেট পরিচালনার দায়দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পুত্র খাজা আহসানুল্লার উপর অর্পণ করে পিতা খাজা আব্দুল গণি অবসর গ্রহণ করেন। অতপর তাঁরা পিতা ও পুত্র উভয়ে মিলে ঢাকায় একটি মনের মত প্রমোদকানন তৈরী করতে মনস্থ করেন। এতদুপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ বাংলা ১২৭৭-৭৮ সাল মোতাবেক ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ শাহবাগের দক্ষিনাংশ এবং ১২৮৩ থেকে ৮৫ বাংলা সনের মধ্যে এর উত্তরাঞ্চল খরিদ করেন।[১৬] হাকিম হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, শাহবাগে নূরুদ্দিন হুসাইনের অনেক জমি জমা ছিল। তিনি নায়েবে নাজিম নুসরত জংগের দরবারে মহররমের দিনগুলোতে কেতাব পড়তেন। তিনি নূরা শাহ্‌ নামে খ্যাত ছিলেন এবং শাহবাগে তার মহল্লাটিকে ঐ সময় নূরখান বাজার বলা হতো। তাঁর পুত্র এসব সম্পত্তি নওয়াব আব্দুল গণির নিকট এই শর্তে বিক্রি করেন যে, নওয়াব তাঁর পিতা নুরুদ্দিন হুসাইনের কবরের উপর একটি পাকা সমাধি সৌধ নির্মাণ করবেন। বলা বাহুল্য নওয়াব আব্দুল গণি সেটা করেছিলেন।[১৭] ১২৮০ বাংলা সাল মোতাবেক ১৮৭৩ খ্রীঃ শাহবাগ বাগানবাড়ীটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল।[১৮] দীর্ঘ নহর প্রচুর অট্টালিকা ও গাছ-গাছালী সমৃদ্ধ এতবড় বাগানবাড়ী তৈরী শেষ করতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়।

'শাহবাগ' নামকরণের বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য আজো পাওয়া যায়নি। প্রফেসর দানীকে অনুসরণ করে আজিমুশ্মান হায়দার বলেছেন, শাহবাগ নামটি মোগল আমলে নির্মিত বাগ-ই-বাদশাহীর স্মৃতি আজো ধরে রেখেছে।[১৯] সম্ভবত তাঁর বাগানবাড়ীটার নামকরণ করতে গিয়ে নওয়াব আব্দুল গণি যেমন বাগ-ই-বাদশাহীর কথা স্মরণ করেছিলেন, তেমনি বাঙালী ধাঁচে এতদাঞ্চলে অনুরূপ নামকরণকৃত স্থান যেমনঃ লালবাগ, ইসলামবাগ, গোপীবাগ, মালিবাগ, মধুবাগ ইত্যাদি মহল্লার কথা বিবেচনায় এনেছিলেন। সেজন্যই হয়তো তিনি সরল ভাষায় এর নাম দিয়েছিলেন 'শাহবাগ'। শাহবাগের এই বাগানবাড়ীর একটি দুস্প্রাপ্য ভুমি নক্‌শা ঢাকা নওয়াব এস্টেট পুরানো অফিস, এডওয়ার্ড হাউস থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এতে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে কোথায় কোন ইমারত ছিল, কোথায় কোন দিকে নহর, ফোয়ারা, যাতায়াত পথ ছিল এবং কোন দিকে প্রাচীর ও গেট দিয়ে বাগানটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল তার চিহ্ন আঁকা রয়েছে। পরিশিষ্ট নং ৩১, পৃঃ৪৫৫এ ভুমি নক্‌শাটি দেয়া হলো। কিন্তু নক্‌শাটির পরিচিতিমূলক পাতাটি উদ্ধার করতে না পারায়

Dhaka University Institutional Repository

তাতে নির্দেশিত সবগুলো পয়েন্টের সঠিক পরিচিতি জানা সম্ভব হয়নি, তবে বিভিন্ন লেখকের দেয়া তথ্য এবং অত্র এলাকায় নওয়াবদের আমলে তৈরী যেসব কীর্তি কলাপ আজো অবশিষ্ট রয়েছে, তাদ্বারা এর কিছুটা পরিচিতি পুনরুদ্ধার ও পরিবেশ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া যেতে পারে।

শাহবাগে নওয়াবদের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে 'ইশরাত মঞ্জিল' নামক দ্বিতল একটি প্রাসাদ ভবন ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষনীয়। ভবনটিতে দরবার হলসহ অতিথি আপ্যায়ন ও বসবাসের যাবতীয় বন্দোবস্ত ছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ শাহবাগের বাগানবাড়ীতে মুসলীম লীগ গঠনের মানসে আয়োজিত 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতি'র ঐতিহাসিক অধিবেশনকালে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ডেলিগেটদের এই ভবনেই স্বাগত জানানো হয়েছিল। উক্ত ভবনটির একটি দুস্প্রাপ্য আলোক চিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং-৭৫ পৃঃ৩৭৭এ দেয়া হলো।[২১] ভবনটি সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কলাভবনের উত্তরে অবস্থিত ছিল। বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে উক্ত কলাভবন তৈরী করার প্রয়োজনে সেটাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়। সুদৃশ্য এই ভবনের সম্মুখে ক্রমহ্রাসমান নক্শা বাটির সমন্বয়ে লোহার তৈরী একটি ফোয়ারা ছিল। হয়তো সেটাই এখন ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের ভিতর আংগিনায় নিয়ে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকায় বর্তমানে মধুর কেন্টিন নামে যে ভবনটি রয়েছে, তা ছিল এই বাগান বাড়ীর দরবারগৃহ। অনেক সময় জলসাঘর হিসেবেও এর ব্যবহার হতো।[২২] ভবনটির মেঝে থেকে শুরু করে এর চতুর্দিকের খোলা বারান্দা এবং প্রশস্ত অংগনসমূহ দামী মার্বেল পাথরে বাঁধানো ছিল। এখানে নওয়াব পরিবারের লোকেরা স্কেটিং প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা করতো বলে এই ভবনটাকে 'স্কেটিং প্যাভিলিয়ন' নামেও অভিহিত করা হতো।[২৩] এ ভবনটির দক্ষিণ দিকে বৃত্তাকার কক্ষ সম্বলিত সুদৃশ্য দু'টো গোলাকার কোঠা আজো জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কোঠা দুটো ওখানে কেন নির্মাণ করা হয়েছিল তা বোধগম্য নয়। তবে প্রমোদ কাননে পূর্বরাগের জন্য এরূপ কক্ষ সম্বলিত ছোট ছোট ঘর বা চন্দ্রাতপ নির্মাণ সেকালে প্রচলিত নিয়ম ছিল। তৎকালে এ কোঠা দুটোর চতুর্দিক দিয়েও মার্বেল পাথরে মোড়া ছিল এবং এর চারদিকে ঘুরে স্কেটিং খেলা চলতো। পরিশিষ্টে চিত্র নং ৭৬ পৃঃ৩৭৮এ নওয়াবদের আমলে তোলা উক্ত স্কেটিং প্যাভিলিয়নের একটি আলোকচিত্র দেয়া হলো। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবনের পূর্বদিকে রাস্তার ধারে নওয়াবদের তৈরী একটি দ্বিতল ইমারত ছিল। সেটার ধ্বংসাবশেষ গত সত্তর দশকের শেষ দিকে উক্ত জাদুঘর নির্মাণকালে অপসারণ করা হয়। পরবর্তীকালে নওয়াব পরিবারের মহিলারা ঐ ভবনের ব্যালকনি থেকে রেসকোর্স ময়দানের ঘৌড়দৌড় উপভোগ করতেন বলে খাজা পরিবারের মুরুব্বীদের নিকট থেকে জানা যায়।[২৪] ভবনটির পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার ওপারেই ছিল ঘৌড়দৌড়ের স্টার্টিং পয়েন্ট। তাই সেটার দোতালা থেকে ঘৌড়দৌড় উপভোগ করা নওয়াব বেগমদের পক্ষে সহজই ছিল বলা চলে। এ ভবনটি আর কোন কাজে ব্যবহৃত হতো কিনা তা আজো গবেষণার বিষয়।[২৫] তবে শাহবাগে নিশাত মঞ্জিল নামে একটি ভবনে জাদুঘরের ন্যায় দুস্প্রাপ্য ও আজব বস্তুসামগ্রী প্রদর্শিত হতো। বর্ণিত ভবনের সাথে তার কোন যোগসূত্র ছিল কিনা তা আজ বলা মুশকিল। কাঁটাবন জামে মসজিদের দক্ষিণে বৃত্তাকারে তৈরী বৃহদাকার একটি আস্তাবল ছিল। সেখানে ঢাকার নওয়াবদের ঘোড়া রাখা হতো। এছাড়া ঘোড়দৌড় প্রভৃতির সময় ঢাকায় আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঘোড়াও সেখানে রাখার সুব্যবস্থা ছিল। ক'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আস্তাবলটি ভেংগে ফেলেছে।

শাহবাগ বাগানবাড়ীর মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত প্রাকৃতিক খালগুলো ছাড়াও নওয়াবদের তৈরী বেশকিছু কৃত্রিম লেক ছিল। লেকগুলোর দৈর্ঘ্য যোগ করলে পরিমাপ হতো কয়েক কিলোমিটার।[২৬] ঐ সব লেকের দু'ধারে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রমোদ ভবন ছিল। স্থানে স্থানে লোহা ও কাঠের সেতু দিয়ে লেকগুলো পারাপারের সুব্যবস্থা ছিল। কোথাও আবার সরোবর বা লেকের মাঝে দ্বীপাকার স্থানে প্রমোদ ভবন তৈরী করা হয়েছিল। সেতু বা নৌকার সাহায্যে দ্বীপগুলোতে যাতায়াত করা যেত। নওয়াবদের আমলের একটি দুস্প্রাপ্য ছবিতে শাহবাগ বাগানের এরূপ একটি গোলাকার দ্বীপে তৈরী চন্দ্রাতপ এবং তার সাথে মূল ভূখন্ডের সংযোগ সেতুর চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭৭ পৃঃ৩৭৮এ দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রটি দ্রঃ।[২৭] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথেই আহসান মঞ্জিলের ন্যায় নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে এখানকার প্রধান প্রধান ভবন ও চত্বর আলোকিত করার জন্য সেখানে একটি পৃথক জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল।[২৮]

আগেই বর্ণিত হয়েছে খাজা আবদুল গণির নওয়াব উপাধি প্রাপ্তির সময় অর্থাৎ ১৮৭৫ সাল থেকে প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী খ্রীষ্টিয় নববর্ষ উপলক্ষে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে ঘটাকরে মেলা লাগানো হতো।[২৯] নওয়াবের উদ্যোগে ও ব্যয়ে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকারা উক্ত মেলায় নাচ-গান করে দর্শকের মনোরঞ্জন করতো।[৩০] উক্ত মেলায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা গবাদি পশুসহ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করতো। মেলায় প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ ও উন্নত জাতের পশু ও কৃষিজ দ্রব্যের জন্য নওয়াবের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেয়া হতো।[৩১]

শাহবাগ বাগানবাড়ী তৈরীর প্রথম থেকেই সেখানে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভালুক, হরিণ, বানর ও উটপাখীসহ নানা প্রকার দুর্লভ পশু-পাখী রাখা ছিল।[৩২] শাহবাগ বাগানবাড়ীর বৈশিষ্ট্য, ঐশ্বর্য্য এবং সেখানে অনুষ্ঠিত নানা কর্মকান্ডের বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় সমসাময়িক লেখকদের বিভিন্ন লেখা ও স্মৃতি কথায়। সমসাময়িক পত্র পত্রিকায়ও এখানে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া কলাপের খবর প্রকাশ করা হতো।

নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ীর একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় হাকিম হাবিবুর রহমানের লেখায়।[৩৩] তিনি লিখেছেন, শাহবাগ বাগানবাড়ীটি বেশ কয়েক একর জমি জুড়ে চারদিকে দেয়াল ঘিরে তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে মার্বেল পাথরের বাঁধানো বৈঠকখানা এবং অনেকগুলো চবুতরা ছিল। এঁকেবেঁকে নির্মিত এখানকার লেকগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক ফার্লং। লেকের দুপাশ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল ছোট ছোট বৃত্তাকার ভবন। এছাড়া ছিল অনেকগুলো কাঁচা পাকা সরোবর। কোন কোন সরোবরের মাঝে দ্বীপাকারে গোল চত্বর ও চন্দ্রাতপ নির্মিত হয়েছিল এবং সেগুলোতে যাতায়াতের জন্য লোহা বা কাঠের পুল নির্মাণ করা হয়েছিল। শাহবাগে দরবারগৃহ ও বারদুয়ারীসহ অনেকগুলো বড় বড় অট্টালিকা ছিল। তম্মধ্যে নিশাত মঞ্জিল নামক একটি দ্বিতল ভবনে জাদুঘরের ন্যায় দুর্লভ ও আজব দ্রব্যাদির প্রদর্শনী ছিল। এ বাগানবাড়ীতে রঙবেরঙয়ের বাহারী মাছে ভরা অনেকগুলো চৌবাচ্চা ছিল এবং নানা প্রকার ফোয়ারা তৈরী করা হয়েছিল। এখানে পৃথক বেস্টনীর মধ্যে ছিল একটি চিড়িয়াখানা । সেখানের বাঘ, ভালুক, উটপাখী, বানর, প্রভৃতি জীবজন্তু রাখা ছিল। নানা রঙয়ের গাছ-গাছালি ও দেশী-বিদেশী ফুলে ফলে পুরো বাগানটি সাজানো ছিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ থেকে প্রতিবছর ১ লা জানুয়ারী শাহাবাগে মেলা বসতো। হাকিম হাবিবুর রহমান আরো বলেন,[৩৪] মেলার সময় বাগানটি এমন সুন্দরভাবে সাজানো হতো যে সেটা বেহেশতের রূপ পরিগ্রহ করতো। নওয়াবের সৌজন্যে দিন ভর নাচ-গান, ক্রীড়া, কৌতুক চলতো। ঢাকার সর্বস্তরের লোকেরা এই মেলায় যোগ দিত। একবার সরোবরের মাঝে নির্মিত একটি দ্বীপে অনুষ্ঠিত বাইজীর নাচ দেখতে গিয়ে লোকের ভীড়ে একটি কাঠের পুল ভেংগে পড়ে। ১৮৯০ খ্রীঃ সংঘটিত উক্ত দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।[৩৫] হাকিম সাহেবের স্বচক্ষে দেখা ঘটনাটি তিনি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাবিবুর রহমান ছাড়াও মনোদা দেবীর স্মৃতিচারণ এবং অধ্যাপক অমূল্য কুমারের লেখায় তৎকালীন শাহবাগের কিছু কথা পাওয়া যায়।[৩৬]

মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে ঢাকায় এলে ক্যাব্যানুরাগী নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর কাব্যনৈপুন্যের কথা জেনে তাঁর কিছু কবিতা শুনতে চান। মওলানা উবায়দুল্লাহ নওয়াবদ্বয়ের প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। উক্ত কবিতায় নওয়াবের শাহবাগ ও দিলখুশা বাগানবাড়ী দুটোর সৌন্দর্য্য-চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। এথেকে প্রমাণিত হয় যে তৎকালে ঐ বাগানদ্বয় এমন চিত্তাকর্ষক ছিল যা কিনা একজন খ্যাতনামা কবির কাব্য রচনায় স্থান লাভ করেছিল।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালে শাহবাগের এই বাগানবাড়ীটি এমনই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও মোহনীয় করে তৈরী করা হয়েছিল যে আশে পাশের এলাকা থেকে এর গুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেড়ে যায়। ১৯০৯ খ্রীঃ একবার খবর প্রচলিত হয়েছিল যে, নওয়াব সলিমুল্লাহকে ঋণমুক্ত করতে সরকার নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ী ১২ লক্ষ টাকায় কিনে নেবেন। পরে অবশ্য খবরটি সত্য হয়নি।[৩৮] অব্যবস্থায় পতিত নওয়াব সলিমুল্লাহর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব ১৯০৭ খ্রীঃ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে চলে যায়। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি পরিচালনার দায় দায়িত্ব মোতাওয়াল্লী হিসেবে তখনো নওয়াবের উপরই থেকে যায়। তবে নওয়াব সাহেব সেটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করতেন। এরূপ সম্পত্তির মধ্যে ছিল আটিয়া পরগনা এবং তার সংশ্লিষ্ট শাহবাগ বাগানবাড়ী উল্লেখযোগ্য। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ১৯১৫ খ্রীঃ তাঁর পুত্র নওয়াব হাবিবুল্লাহ নওয়াব এস্টেটের মোতাওয়াল্লী হন। কিন্তু তিনি বৈষয়িক কাজকর্মে তাঁর পূর্ব পুরুষদের মতো বুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন না। তদুপরি তিনি ছিলেন বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। যার দরুণ প্রায়ই তিনি ঋণজালে জড়িয়ে পড়ে সহায় সম্পত্তি নষ্ট করতে থাকেন। এর ফলে নওয়াব পরিবারের অন্যান্য শরীকেরা তাঁদের সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পৃথক করে নেয়ার দাবী তোলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খ্রীঃ শাহাবাগ বাগানবাড়ী দক্ষিণাংশের ৬০ বিঘা সম্পত্তি নওয়াবজাদী পরীবানু ও খোদেজা বেগমের মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়।[৩৯] নওয়াব হাবিবুল্লাহ শাহবাগের উত্তরাংশের বাকী ১৪১ বিঘা সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী পদে বহাল থাকেন। এদিকে অর্থাভাবে ১৯২১ খ্রীঃ নওয়াব হাবিবুল্লাহ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সেলামীর বিনিময়ে এবং বার্ষিক মাত্র ১৪১ টাকা জমায় শাহবাগ বাগানবাড়ী জনৈক নগেন্দ্র কুমার রায়ের নিকট স্থায়ী ইজারা দেন বলে অভিযোগ উঠে। সেলামীর মোট টাকার মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা নগদ দেয়াও হয় এবং বাকী টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের কথা হয়। কিন্তু জেলা জজের পুর্বানুমতি ব্যতীত মোতাওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াকফকৃত উক্ত সম্পত্তি অনুরূপ স্থায়ী ইজারা দেয়ার কোন ক্ষমতা ছিল না। উক্ত যুক্তি দেখিয়ে নওয়াবজাদী পরীবানু এবং অন্যান্য শরীকেরা নওয়াবের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা জজ কোর্টে এক মামলা দায়ের করেন।[৪০]

এমনকি নওয়াব হাবিবুল্লাহ তখন তথাকথিত স্বার্থপরদের কানকথায় চলতেন এবং পুরানো সুহৃদদের কথার কোন পাত্তা দিতেন না বলেও অভিযোগ উঠে। এমতাবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে কলকাতা থেকে এ. কে ফজলুল হক ১৯২২ সনের ৪ ফেব্রুয়ারী নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার মিঃ মায়ারকে একটি পত্র দেন। উক্ত পত্রের উত্তরে 'সুহৃদদের চেনার মতো সচেতনা নওয়াবের নেই' বলে চীফ ম্যানেজার সাহেব জানিয়েছিলেন।[৪১] পরিশিষ্ট নং ২৮-২৯ পৃঃ নং৪৫৯ এ পত্র দুটোর অনুলিপি দেয়া হলো।

নওয়াব হাবিবুল্লাহর অযোগ্যতা এবং পারিবারিক কোন্দলের কারনে সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে শাহবাগের জৌলুস দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। ইতোমধ্যে ঢাকা ক্লাবের প্রয়োজনে রমনা রেসকোর্সসহ শাহবাগের কিছু জমি সরকার উক্ত ক্লাবকে দিয়ে দেয়।[৪২] শাহবাগ বাগানবাড়ীর দক্ষিণাংশের যে সম্পত্তি নওয়াবজাদী পরীবানু ও খোদেজা বেগমের কর্তৃত্বাধীনে চলে গিয়েছিল, উক্ত এলাকাতেই দরবার হলসহ গার্ডেন পার্টি দেয়ার ব্যবস্থাদি ছিল। বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত ঐ অংশটুকু মোটামুটি সংরক্ষণ করা হতো এবং সেখানে মাঝে মধ্যে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি হতো। কিন্তু পরবর্তীতে সংস্কারাভাবে ঐ অংশও জংগলে ভরে যেতে থাকে। ১৯৫২ সালে নওয়াবদের জমিদারি সরকারীভাবে অধিগ্রহণের পর শাহবাগ একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়।

১১(১)(খ) শাহবাগে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ঃ

আগেই বর্ণিত হয়েছে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ জুড়ে শাহবাগ বাগানবাড়ীটি ছিল ঢাকার উচ্চ পর্যায়ের সব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রভূমি। ঢাকার নওয়াবদের পারিবারিক আমোদ-প্রমোদ ও অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও দেশের শীর্ষ স্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ঢাকায় আগমণ ও বিদায়

Dhaka University Institutional Repository

উপলক্ষে ঘটা করে এখানে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করা হতো। এছাড়া ঢাকা শহরে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-কৌতুক, পালা-পার্বন ও উৎসব উপলক্ষে এই বাগানবাড়ীটাকে বিনোদনের সহায়ক হিসেবে কাজে লাগানো হতো।[৪৩] বিভিন্ন সময়ে এখানে যেসব কর্মকান্ড ঘটেছে তার কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা খুঁজে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক লেখকদের লেখা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত খবর, প্রতিবেদন ও প্রসিডিং প্রভৃতি থেকে যতদূর জানা সম্ভব হয়েছে, তার ভিত্তিতে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে সংঘটিত ঘটনাবলীর একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ	অনুষ্ঠানের বিষয়/বিবরণ
১৮৭৫ খ্রীঃ	১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে খাজা আবদুল গণিকে ব্রিটিশ সরকার 'নওয়াব' এবং তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দেয়। এতদুপলক্ষে তাঁরা শাহবাগ বাগান বাড়ীতে একটি ব্যাপক আনন্দ উৎসব করেন এবং প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের ১ তারিখে খ্রীস্টিয় নববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষে শাহবাগে মেলা লাগানো শুরু করেন। ঐ বছর নওয়াবের ব্যয়ে দেশের নামকরা সব নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকারা নাচ গান করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন।[৪৪]
১ জানুয়ারী ১৮৭৬ এবং ১৮৭৭	খ্রীস্টিয় নববর্ষ উপলক্ষে শাহবাগে মেলা বসে এবং নওয়াবের ব্যয়ে আনন্দ উৎসব করা হয়।[৪৫]
১ জানুঃ ১৮৭৮ খ্রীঃ	এবার ব্রিটিশ মহারানীর ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধিবরণ উপলক্ষে শাহবাগের মেলা আরো ঘটা করে উৎযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এ বছর থেকে মেলার সাথে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন এবং শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।[৪৬] এ বছর মেলায় মেষের লড়াইসহ বেশ কিছু পশুর যুদ্ধ দেখাবার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু কলকাতা থেকে পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ সভা পশুদের কষ্ট না দেয়ার আজ্ঞা প্রচার করে। ফলে নওয়াব উক্ত পশুর লড়াই বন্ধ করে দেন।[৪৭]
৩০ ডিসেম্বর ১৮৭৮ এবং ১ জানুঃ ১৮৭৯ খ্রীঃ	প্রতি বছরের ন্যায় শাহবাগে নববর্ষ উৎসব ও মেলা হয়। নওয়াবের অনুরোধে তাতে এ জেলার অন্যান্য জমিদারদের প্রজারাও কৃষি, শিল্পজাত দ্রব্য এবং গবাদি পশু প্রদর্শন করেন। শ্রেষ্ট জাতের প্রদর্শনীর জন্য নওয়াবের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেয়া হয়। সেই সাথে নৃত্য-গীতাদিরও ব্যবস্থা হয়েছিল।[৪৮]
১ জানুঃ ১৮৮০ এবং ৮১ খ্রীঃ	অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি ও মেলা হয়েছিল।
১ জানুঃ ১৮৮২খ্রীঃ	অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি ও মেলা হয়েছিল। এ বৎসর ফলমুল এবং সবজীও প্রচুর প্রদর্শিত হয় এবং অনেক পুরস্কার দেয়া হয়।[৪৯]
১ জানুঃ ১৮৮৩ এবং ৮৪ খ্রীঃ	অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি ও মেলা হয়েছিল।[৫০] নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী থেকে জানা যায়, উক্ত মেলার দিনে তিনি তাঁর পুত্র হাফিজুল্লাহ ও পিতা আব্দুল গণির সাথে শাহবাগের মেলায় এসে সর্বত্র ঘুরেছিলেন এবং বেশ কিছু খেলনা কিনেছিলেন। ঐ বছর ঘোড়দৌড় উপলক্ষে ঢাকায় আগত সাহেব মেমদের নিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৩ জানুঃ ১৮৮৪ শাহবাগ বাগানবাড়ীতে এক ভোজসভা ও বলনাচের আয়োজন করেন। রাত ১১টা পর্যন্ত বলনাচ চলেছিল। ঐদিন নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজে তিনজন লেডীর সাথে নেচেছিলেন।[৫১]
১ জানুঃ ১৮৮৫ খ্রীঃ (বৃহস্পতিবার)	প্রতিবছরের ন্যায় আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু এবার কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী তেমন হয়নি। ঢাকা প্রকাশে এ বিষয়ে নওয়াবের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

১ জানুঃ ১৮৮৬ খ্রীঃ ও

১ জানুঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ অনুরূপ মেলা ও নববর্ষের উৎসব পালিত হয়।[৫৩]

১৬ ফেব্রুঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ (বুধবার) মহারানীর ডায়মন্ড জুবিলী উপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহর আমন্ত্রণে শাহবাগ উদ্যানে ইংরেজ ও দেশীয় জনগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ক্রীড়া কৌতুক, গান বাজনা ও আনন্দ উৎসব হয়।[৫৪]

১ জানুঃ ১৮৮৮ ও '৮৯ খ্রীঃ অনুরূপ খ্রীস্টিয় নর্ববর্ষ উৎযাপন এবং কৃষি ও শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৫৫]

মার্চ ১৮৮৮ খ্রী ঃ (মংগল ও শুক্রবার) নওয়াব আহসানুল্লাহর আমন্ত্রনে শাহবাগে তাঁর লন টেনিস খেলার মাঠে বিকেল ৫ ঘটিকায় ঢাকার সব উচ্চ পদস্থ ইংরেজগণের মেম সাহেবদের টেনিস খেলার আয়োজন করা হয়।[৫৬]

২১ আগস্ট ১৮৮৮ খ্রীঃ লেঃ গভঃ স্যার স্টুয়ার্ট বেইলী ঢাকা সফরে এলে নওয়াব আহসানুল্লাহ শাহবাগে তাঁর অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানে বাবু চন্দ্র কান্ত রায় ও তাঁর কনসার্ট পার্টি বাংলা ও ইংরেজীতে দুটো গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।[৫৭]

২৬ নভেঃ ১৮৮৮ সোমবার (রাত)ঃ বড়লাট লর্ড ডাফরিন ঢাকা সফরে এলে তাঁর সম্মানার্থে নওয়াব আহসানুল্লাহ সদরঘাট থেকে শাহবাগ পর্যন্ত আলোক মালায় সজ্জিত করেন। শাহবাগে বড়লাটকে রাজভোজ ও নাচ-গানে আপ্যায়ন করা হয়। পরদিন বড়লাট পুরানো পল্টনের মাঠে নওয়াবের আয়োজিত মনিপুরী পোলো খেলা দেখেন।[৫৮]

৪,৬ ও৮ ফেব্রুঃ ১৮৮৯

সোম, বুধ ও শুক্রবার ঃ ঘোড়দৌড় উপলক্ষে আসাম ও কুচবিহার থেকে আগত ইংরেজ সাহেব ও মেমদের জন্য নওয়াবের খরচে শাহবাগে ভোজ দেয়া ও বল নাচের ব্যবস্থাদি করা হয়।[৫৯]

আগস্ট ১৮৮৯ খ্রীঃ লেঃ গভঃ স্যার স্টুয়ার্ট বেলী ঢাকা পরিদর্শনে এলে, নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁকে রমনায় নিয়ে বাগানবাড়ী সমূহ পরিদর্শন করান।[৬০]

১ জানুঃ ১৮৯০খ্রীঃ বুধবারঃ শাহবাগে অনুষ্ঠিত আনন্দ মেলাতে সরোবরের মধ্যে স্থাপিত একটি অংগনে যখন বাইজীর নাচ হচ্ছিল, তখন সেখানে যাওয়ার জন্য নির্মিত সেতুটি লোকের ভারে ভেংগে পড়ে। বহুলোক পানিতে ডুবে যায় এবং দু'টি বালক মারা যায়।[৬১]

১৪ ফাল্গুন ১২৯৭/১৮৯০ ঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর উদ্যোগে উচ্চ পদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তা স্যার চার্লস-এর সম্বর্ধনার জন্য বিকেলে শাহবাগে এক উদ্যান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[৬২]

২৪ ফেব্রুঃ ১৮৯১ মংগলবারঃ ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট-এর সম্বর্ধনার জন্য নওয়ার আহসানুল্লাহ শাহবাগে এক উদ্যান সম্মিলন করেন। এতে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[৬৩]

২০ জুলাই ১৮৯৪ খ্রীঃ শুক্রবারঃ ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট-এর ঢাকা ভ্রমনকালে নওয়ার আহসানুল্লাহর উদ্যোগে বিকেলে শাহবাগে এক উদ্যান সভার আয়োজন করা হয়েছিল।[৬৪]

২৪ ফেব্রুঃ ১৮৯৫ খ্রীঃ এবং মার্চ ১৮৯৫ঃ শাহবাগে নওয়াবের পোষা হরিণ, বনমোরগ, ময়ূর প্রভৃতি দুর্লভ প্রাণী কোন সময় সীমানা অতিক্রম করে গেলে কেউ যাতে মেরে না ফেলে সেজন্য নওয়াবের পক্ষ থেকে সাবধান করে পত্রিকায় ৪/৫ টি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।[৬৫]

সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ খ্রীঃ রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বার এবং ঢাকার এককালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি.আর. লায়াল ঢাকা পরিদর্শনে এলে, নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর সম্বর্ধনার জন্য শাহবাগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

২৫ জানুঃ ১৮৯৬ খ্রীঃ উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট এবং ইনসপেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন, মৌলভী দেলবর হোসেন খান বাহাদুর, ঢাকায় পরিদর্শনে আসেন। নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর সম্মানে শাহবাগে এক অনুষ্ঠান করেন, যাতে তিন প্রকার গান-বাজনা হয়। তন্মধ্যে নওয়াবের দশ বছরের পুত্র খাজা আতিকুল্লাহ তাঁর জার্মান শিক্ষকদের সাথে বেহালা বাজান। হিন্দু মুসলিমদের জন্য পৃথক জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজ হাতে উপস্থিত সব ভদ্রলোকদের ফটোগ্রাফ তুলেছিলেন। ঢাকার সাব রেজিষ্টার সৈয়দ আওলাদ হোসেনকে সবার সাথে পরিচয় করে দেয়া হয়।[৬৭]

২৭ ফেব্রু ১৮৯৬ বৃহস্পতিবারঃ ঢাকার উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সাহেব মিঃ ফওলারের বিদায় উপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ শাহবাগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ইংরেজগণসহ স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন।[৬৮]

আগস্ট ১৮৯৬ খ্রীঃ বংগের ছোট লাট ঢাকা ভ্রমনে এলে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁকে রোটাস নামক জাহাজ থেকে অভ্যর্থনা করে রমনা ও শাহবাগের বাগান বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যান। সেখানে ছোট লাটকে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করা হয়।[৬৯]

৫ এপ্রিল ১৯০২ শনিবারঃ ঢাকার কমিশনার মিঃ সেভেজ-এর বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহ শাহবাগে এক সান্ধ্য সম্মেলন করেন। অনুষ্ঠানে দড়িবাজি, কুস্তি প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। নওয়াবের ব্যান্ড বাদ্য পরিবেশন করে এবং আলোকচিত্র তোলা হয়।[৭০]

১৬ এপ্রিল ১৯০২ বুধবারঃ ঢাকার নবাগত কমিশনারকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ এক সান্ধ্য সভার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে শহরের গণ্যমান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আমোদ প্রমোদ ও আপ্যায়নের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়।[৭১]

২৬ জুন ১৯০২ খ্রীঃ বৃহস্পতিবারঃ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড-এর অভিষেক উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে শাহবাগে সকাল ৯.০০ টা থেকে ৫.০০ পর্যন্ত ব্যাপক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে শহরের সব লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। শত সহস্র লোকের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রত্যেকেই যাতে মিস্টান্ন ও ফলাদি বিনামূল্যে যতখুশী খেতে পারে, সে জন্য প্রায় তিন'শ দোকান বসানো হয়। যাত্রা, নাটক, বায়োস্কোপ ও পুতুল নাচের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের পূর্বদিন হঠাৎ সম্রাটের কঠিন পীড়ার খবরে সবকিছু স্থগিত হয়ে যায়। ইতোমধ্যেই তৈরী ৫০ হাজার লোকের যোগ্য মিস্টি সামগ্রী গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়।[৭২]

২১ জুলাই ১৯০২ সোমবারঃ ছোট লাট স্যার জন উডবার্ণ ঢাকা সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর সম্মানে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শাহবাগে এক গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকা জনসাধারণ সভা এবং নওয়াব পরিবারের পক্ষ থেকে ছোটলাটকে অভিনন্দন পত্র দেয়া হয়।[৭৩]

৬ নভেম্বর ১৯০২ বৃহস্পতিবারঃ পুলিশ বিভাগের সংস্কারের লক্ষ্যে বড় লাট কর্তৃক গঠিত কমিশনের সদস্যরা ঢাকায় কার্যোপলক্ষ্যে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁদের সম্বর্ধনার্থে শাহবাগে বিকেলে এক অনুষ্ঠান করেন। ইউরোপীয় এবং দেশীয় গণ্যমান্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন। গান বাজনাসহ পাহলোয়ানদের কুস্তি প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে শ্রেণীমত জলযোগাদির ব্যবস্থাও ছিল।[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৪ নভেম্বর ১৯০২ শুক্রবারঃ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কিস-কে বিদায় সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ বিকেলে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে এক অনুষ্ঠান করেন। এতে শহরের গণ্যমান্যরা যোগ দেন। সভা শেষে আপ্যায়ন করা হয়।[৭৫]

১ জানুঃ ১৯০৩ খ্রীঃ প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রতিবারের ন্যায় শাহবাগে খ্রীস্টিয় নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহ স্বয়ং মেলায় উপস্থিত ছিলেন। মেলায় আগত লোকদের মধ্যে অভিষেক উপলক্ষে সম্রাটের ১০ হাজার প্রতিকৃতি বিতরণ করা হয়েছিল।[৭৬] নওয়াব সলিমুল্লাহ পার্সী থিয়েটার কোম্পানীকে এনে শাহবাগে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এবার অন্তপুর বাসীনিদের জন্য পৃথকভাবে অভিনয় দেখনোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৭৭]

১৯ ফেব্রুঃ ১৯০৪ খ্রীঃ বংগ বিভাগের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯০৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে এসে ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী বড়লাট নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ী পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে বাগানবাড়ীটি মনোরমভাবে সাজানো হয়। লর্ড আগমনে সেখানে অনেক আতশবাজী পোড়ানো হয়েছিল।[৭৮]

২৭ অক্টোবর ১৯০৫ খ্রীঃ দেওয়ালীর দিন। মেহেরবানু পুত্র খাজা আজমলের জন্ম। নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে শাহবাগ সুন্দর করে সাজানো হয় এবং সেখানে সেদিন বিকেলে ২০ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল।[৭৯]

২১ মার্চ ১৯০৪ খ্রীঃ হাইকোর্টের মাননীয় জজ মিঃ র‍্যামপিনি ঢাকার আদলত সমূহ পরিদর্শনে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর সম্মানার্থে শাহবাগে এক উদ্যান সভার আয়োজন করেন। মিঃ র‍্যামপিনি এক সময় ঢাকায় জেলা জজ ছিলেন।[৮০]

১৪, ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল, ১৯০৬ খ্রীঃ শনি, রবি ও সোমবারঃ পূর্ববংগ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে, নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে এতদাঞ্চলের প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমানদের সমন্বয়ে শাহবাগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ এর প্রেসিডেন্ট এবং নওয়াব আলী চৌধুরী সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[৮১]

২৭-৩০ ডিসেঃ১৯০৬ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগ ও খরচে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' এর ইতিহাসখ্যাত বিশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারা ভারত থেকে প্রায় আড়াই হাজার নেতা ও ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন শেষে ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবনায় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।[৮২] উক্ত অনুষ্ঠানে নওয়াব সলিমুল্লাহর উত্থাপিত মুসলীম লীগ গঠনের প্রস্তাবটি তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে হাকিম আজমল খান সমর্থন করছেন, এরূপ একটি কল্পিত চিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং-৭৮ পৃঃ৩৭৯তে দেয়া হলো।[৮৩]

১২ মার্চ- ১৯০৭ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ কুমিল্লায় সভা করতে গেলে, তথায় হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলিমদের উপর হামলা করা হয়। উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিহত ও আহতদের প্রতি শোক ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য শাহবাগে এতদাঞ্চলের মুসলিমদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলিমদের সহিষ্ণুতা ও শিক্ষা অবলম্বন করতে বলেন। এছাড়াও তিনি এক এক পয়সার চাঁদা দিয়ে একটি ফান্ড গঠনের আহ্বান জানান।[৮৪]

২৩ জুলাই১৯০৮, বৃহস্পতিবার ঃ নতুন প্রদেশের নব নিযুক্ত ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলীকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য পূর্ববংগ জমিদার সভার পক্ষ থেকে শাহবাগে বিকেল ৪টায় এক সভা হয়। সভায় ছোটলাটকে একটি অভিনন্দন-পত্র দেয়া হয়।[৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

১ আগস্ট ১৯০৮, শনিবার ঃ	ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার মুসলিম সর্দারগণ ছোটলাটের অভ্যর্থনার জন্য বিকেল ৪টায় নওয়াবের শাহবাগে এক উদ্যান সভার আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ছোট লাটকে অভিনন্দনপত্র দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে জলযোগ এবং নৃত্য গীতের ব্যবস্থাও ছিল। অনুষ্ঠান শেষে মহল্লা সর্দারগণ ও নওয়াব সলিমুল্লাহর সংগে ছোটলাটের ফটো তোলার ব্যবস্থাও করা হয়।[৮৬]
২৯ জানুঃ১৯১০খ্রীঃ শনিবারঃ	ঢাকা মহেশ্বরদীর কৃতি সন্তান, ভারত-সচিবের সভার সদস্য মিঃ কে.জি.গুপ্ত সি.এস.আই. ঢাকায় এলে তাঁর সম্মানে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও ভাওয়ালের রাজকুমারের উদ্যোগে শাহবাগে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৮৭]
১৬ অক্টোবর ১৯১০	নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে এবং খাজা মোঃ ইউসুফ জানের সভাপতিত্বে শাহবাগে প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক যৌথ অধিবেশন হয়। এতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল মৌলভী আজিজ মীর্জা এবং সেইসাথে খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী, বি.এ. এবং নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঢাকায় একটি মোহামেডান হল এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলিমদের উপর কর ধার্যের সুপারিশ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া ঢাকা থেকে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ার কথাও আলোচিত হয়।[৮৮]
২২জুন- ১৯১১ খ্রীঃ	সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরীর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে শাহবাগে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্রাটের মংগলের জন্য প্রার্থনা এবং সমবেত জনতার মধ্যে সম্রাটের প্রতিকৃতি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত জনতাকে মিষ্টি ও দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য দেয়া হয়।[৮৯]
১৬ জুলাই,১৯১১ খ্রীঃ রবিবার ঃ	মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শাহবাগে নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকাবাসী মুসলমানদের এক সভা হয়। সভায় নওয়াব আলী চৌধুরী ও মিঃ সংগতালি বক্তৃতা করেন। এজন্য চাঁদা সংগ্রহের একটি কমিটি গঠিত হয়। এ ফান্ডে নওয়াব সলিমুল্লাহসহ অনেকেই অর্থ দান করেন।[৯০]
আগষ্ট, ১৯১১ খ্রীঃ	ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে আগত মহারাজ প্রদ্যুতকুমার ঠাকুর এবং নাটোরের মহারাজাকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির উদ্যোগে শাহবাগে এক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক শেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।[৯১]
৩১ জানু ১৯১২ খ্রীঃ	বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি শাহবাগে তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সর্ব শ্রেণীর মুসলমান অন্যূন ৫০ টাকা চাঁদা দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পায়। পল্টনের মাঠের রাস্তা থেকে শাহবাগের সমগ্র বাগান বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হয়। বাগানের স্থানে স্থানে ঢাকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যা পরিদর্শন করে বড় লাট খুবই খুশী হন। ঐদিন নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পৃথকভাবে বড়লাটের সাথে দেখা করেন। মুসলমান প্রতিনিধিদের দেয়া মানপত্রের জবাবে বড়লাট তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।[৯২]

 Dhaka University Institutional Repository

২১ মার্চ ১৯১২খ্রীঃ
বৃহস্পতিবারঃ
পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের সর্বশেষ ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলীর বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে পূর্ববংগ জমিদার সভা ও প্রাদেশিক মুসলিম সমিতির পক্ষ থেকে বিকেল ৫টায় শাহবাগে এক উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় দু'শ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এতে যোগ দেন। দিনাজপুরের মহারাজা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ, সপত্নীক ছোটলাটকে বাগানবাড়ীর দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করেন।[৯৩]

৩১ জানুঃ ১৯১৪ খ্রীঃ
শনিবারঃ
ঢাকার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ স্যার রবার্ট স্কালনের সম্মানে স্থানীয় ভূম্যধিকারী সভা ও প্রাদেশিক মুসলিম সভা শাহবাগে এক উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চ পদস্থ সেনা অফিসারগণ যোগদান করেন। পরদিন রবার্ট স্কালন নওয়াব সলিমুল্লাহকে এজন্য ধন্যবাদপত্র পাঠান।[৯৪]

১৪ ফেব্রুঃ, ১৯১৪ খ্রীঃ
শনিবারঃ
বংগের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল-কে সপত্নীক সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ শাহবাগে এক উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও উচ্চপদস্থ সেনানায়ক ও রাজকর্মচারীরা যোগদান করেন। অতিথিদের যথোপযুক্ত আপ্যায়ণ করা হয়।[৯৫]

১৪ ফেব্রুঃ, ১৯২২ খ্রীঃ
শুক্রবারঃ
নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজানের উদ্যোগে বংগের গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশ ও লেডী রোনাল্ডশ-কে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য বিকেলে শাহবাগে এক উদ্যান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ইমারসন ও তাঁর স্ত্রী এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিন্ডসে ও তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন বাগানবাড়ীটাকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়।[৯৬]

২০ ফেব্রুঃ, ১৯২৩ খ্রীঃ
মঙ্গলবারঃ
বালিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজকল্যাণ কাজে উপযোগী করে তোলার জন্য ঢাকায় একটি সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতি ঢাকার কিছু খ্রীষ্টান বালিকা ও ইডেন ফিমেল স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে কাজ শুরু করে। ঢাকা জেলা জজের স্ত্রীর উদ্যোগে উক্ত সমিতির বিস্তৃতি ও অর্থ সংস্থানের জন্য বিকেলে নওয়াবের শাহবাগ বাগান বাড়ীতে এক উদ্যান উৎসব-অধিবেশন হয়। এতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।[৯৭]

৪ ফেব্রুয়ারী- ১৯২৫
নওয়াবজাদা খাজা হাফিজুল্লাহ চার বছর বয়সে নওয়াব এস্টেটের প্রাক্তণ চীফ ম্যানেজার কর্ণেল জে. হডিং -এর সাথে বিলেতে যান। তিনি ১৪ বছর বিলেতে লেখাপড়া করার পর ঢাকায় ফেরত এলে, তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য নওয়াব পরিবারের বেগম রওশন আক্তার সাহেবা শাহবাগে এক উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৯৮]

৮ ও ৯ জুন, ১৯২৬খ্রীঃ
পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ডাঃ কিসলু পূর্ববংগ সফরকালে মৌলভী আব্দুল করিম ও মৌঃ সৈয়দ ইমদাদুল হককে সংগে নিয়ে ঢাকায় আসেন। তাঁরা তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খাজা নাজিমুদ্দিনের পরীবাগস্থ বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁরা তিনদিন ধরে ঢাকায় পল্টন ময়দান, আহসান মঞ্জিল ও নর্থব্রুক হলসহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য সভা-সমিতি করেন।[৯৯]

৮ অক্টোবর- ১৯৪০
১৯৩৯ সালে ঢাকা শহরে চান্দিনা বা বাস্তুভিটা ভূমির প্রজাসমিতি গঠিত হয়। পিয়ার বখশ সরদার সমিতির সভাপতি এবং মুহম্মদ সফিউল্লাহ সম্পাদক ছিলেন। জমিদারেরা নানা অজুহাতে জুলুম করে প্রজাদের যাতে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে না পারে, সেজন্য তাদেরকে আইনগত সহায়তা দান এবং সরকারের নিকট তদারক করে প্রজাদের অনুকূলে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করানোই ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য। ১৯৪০ খ্রীঃ জুলাই মাসে সমিতির প্রতিনিধিগণ নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুল্লাহ (তৎকালীন কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী)- এর নিকট তাদের সমস্যার কথা পেশ করেন। তিনি ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থাদি নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

৮ অক্টোবর ১৯৪০ খ্রীঃ নওয়াবের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে অনুষ্ঠিত জেলা মুসলিম লীগের এক সভায় উক্ত চান্দিনা প্রজাদের সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সভায় এজন্য অবিলম্বে অকৃষি প্রজাসত্ব আইন প্রণয়ন এবং প্রজা উৎখাত সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা ও ডিক্রি স্থগিত রাখার জন্য বাংলা সরকারকে দিয়ে অর্ডিন্যান্স জারীর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, জনমতের চাপে সরকারকে শেষ পর্যন্ত উক্ত অর্ডিন্যান্স জারী করতে হয়েছিল।[১০০]

১১(১)(গ)পরীবাগ বাগানবাড়ী ঃ

ঢাকার নওয়াবদের আরেকটি বাগানবাড়ী। শাহবাগের উত্তরে উক্ত বাগানবাড়ীর অবস্থান এলাকাটি আজো পরীবাগ নামে পরিচিত। শাহবাগের বর্ধিতাংশ হিসেবে নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ ১৯০২ সালে এটার নির্মাণ কাজ শুরু করেন।[১০১] নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর এক প্রিয় স্ত্রী পেয়ারী বেগমের নামে বাগানবাড়ীটার নামকরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১০২] আবার অনেকে নওয়াব আহসানুল্লাহর কন্যা পরীবানুর নামে এর নামকরণ হয়েছিল বলেও মনে করেন।[১০৩] পরীবাগের কিছু অংশ নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় ক্রয়কৃত গোবিন্দপুর পরগনার অর্ন্তভূক্ত সম্পত্তি ছিল। পরবর্তীতে নওয়াব সলিমুল্লাহ রোয়াইল বাবু নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের নিকট থেকে ১৪ বিঘারো অধিক জমি ক্রয় করে এর সাথে যোগ করেন।[১০৪] পরীবাগের একখন্ড জমির দখল নিয়ে ১৯০৩ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও জেলা জজ মিঃ কে. এন. রায়ের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ ফৌজদারী আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।[১০৫] খানাখন্দকে ভরা পরীবাগ এলাকাটি আগে বছরের বেশীর ভাগ সময়ই পতিত অবস্থায় পড়ে থাকতো। নওয়াব সলিমুল্লাহ এখানে একটি বড় দিঘীসহ কয়েকটি পুকুর খনন করেন এবং খানা-খন্দকগুলো ভরাট করে বাগ বাগিচায় উন্নীত করেন।[১০৬] শাহবাগ থেকে প্রবাহিত লেকটি পরীবাগের ভিতর দিয়ে গিয়ে পূর্বদিকে মোড় নিয়ে রমনা পার্কের দিকে চলে যেতো। পরীবাগের দক্ষিণ দিক দিয়ে নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ীর উত্তর সীমানা দেয়াল আগে থেকেই ছিল। এছাড়া এর পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে অনুরূপ পাকা দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছিল।[১০৭] ঢাকার নওয়াবদের ওয়াকফকৃত ' এফ' প্রপার্টি নামক সম্পত্তির আয় দ্বারা নওয়াব সলিমুল্লাহ পরীবাগের মধ্যস্থ দালান কোঠা তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়।[১০৮]

এ বাগানবাড়ীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইমারত হচ্ছে পরীবাগ হাউস নামে একটি বৃহদাকার একতলা ভবন। ভবনটির চারদিক দিয়ে উন্মুক্ত খিলান সহযোগে নির্মিত বৃহৎ বারান্দাগুলোর দৃশ্য খুবই সুন্দর। ভবনটি আজো বিদ্যমান। ভবনটির সম্মুখ বা দক্ষিণ দিকে খোলা চত্বরের মাঝখানে মার্বেল পাথরের তৈরী সুন্দর একটি অষ্টকোন চন্দ্রাতপ ছিল। ভবনটির পুর্বদিকে বড় দীঘির পাড়ে একটি গৃহাভ্যন্তরে ছিল হাম্মামখানা এবং এর অদূরে দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোনে ছিল একটি কৃত্রিম টিলা। এছাড়া এখানে ছিল ছোট ছোট আরো কয়েকটি ভবন এবং বারোদুয়ারী নামে একটি হাওয়াখানা। হরেক রকম ফুল ও ফলের গাছ গাছালি দ্বারা পরীবাগটিকে নয়নাভিরাম করে সাজানো হয়েছিল।[১০৯]

পরীবাগের পশ্চিম সীমানা দেয়ালের সাথে ১৯০৫ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ একটি এক তলা জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। বহুবার সংস্কারের ফলে মসজিদটার আদিরূপ বদলে গেছে। ঢাকার নওয়াবদের ওয়াকফ এস্টেটের আয় থেকে এখনো মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দেয়া হয়।[১১০]

পরীবাগে নওয়াব সলিমুল্লাহর একটি দুগ্ধবতী গাভীর খামারও ছিল।[১১১] উক্ত খামারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সৈয়দ আব্দুর রহিম নামে এক সাধক পুরুষ। তিনি পরীবাগের শাহ্ সাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইন্তেকাল

Dhaka University Institutional Repository

করলে তাঁর আসনের স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১১২] পরীবাগের উত্তর সীমানা দেয়ালের সাথে অবস্থিত তাঁর মাজারটি আজো তাঁর ভক্তদের ভীড়ে মুখরিত।

পরবর্তীকালে ঢাকার নওয়াবদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেলে এ বাগানবাড়ীর অধিকাংশ নওয়াবজাদী আমিনা বানু ও বিলকিস বানুর উত্তরাধীকারীদের অধীনে চলে যায়। ১৯৫২ সালে ঢাকার নওয়াবদের জমিদারি সরকার অধিগ্রহন করলে নওয়াব হাবিবুল্লাহ আহসান মঞ্জিল ছেড়ে পরীবাগে চলে আসেন। এখানে গ্রীন হাউস নামে একটি বাড়ী তৈরী করে তিনি শেষ জীবন কাটান। তাঁর নামে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পরীবাগের একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে ' নওয়াব হাবিবুল্লাহ রোড'। পাকিস্তান আমলে আহসান মঞ্জিলের চেয়ে পরীবাগেই ঢাকার নওয়াব পরিবারের নামকরা ব্যক্তিরা বেশী সংখ্যক বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আঃ সেলিম (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য) খাজা শাহাবুদ্দিন, খাজা হাসান আসকারী, সৈয়দ সাহেবে আলম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১১৩] পরবর্তীকালে পরীবাগের উত্তরেই খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা শাহাবুদ্দিন তাঁদের বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন। ঢাকার নওয়াবের বংশধরগণের মধ্যে এখনো কিছু লোক পরীবাগে বসবাস করেন।

১১(১)(ঘ) দিলখুশা বাগানবাড়ী ঃ

শাহবাগের ন্যায় দিলখুশাতেও ঢাকার নওয়াবদের একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাগানবাড়ী ছিল। বর্তমান বঙ্গভবনের পুরো এলাকা এবং এর সংলগ্ন উত্তরে রাজউক ও জীবনবীমা ভবন থেকে শুরু করে সোনালী ব্যাংক হেড অফিস পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। শাহবাগের ন্যায় আঁকাবাঁকা লেক, সরোবর, বিভিন্ন ধরণের ফোয়ারা, নানা জাতের বৃক্ষরাজি ফল ও ফুলের বাগান এবং রঙমহল ছাড়াও এখানে বসবাস করার মত প্রাসাদ ভবনাদি ছিল।[১১৪] ১৮৮৮ খ্রীঃ ৭ এপ্রিল ভয়াবহ টর্নেডোয় আহসান মঞ্জিল ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে নওয়াব আহসানুল্লাহ পরিবার পরিজনসহ দিলখুশা বাগানবাড়ীতে এসে ওঠেন।[১১৫] দীর্ঘ ২ বছর ৭ মাস পর আহসান মঞ্জিল পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ হলে তিনি ১৮৯০ সালে ২৪ নভেম্বর সেখানে ফিরে যান।[১১৬]

১৮৬৬ খীঃ নওয়াব আব্দুল গণি জনৈক ই. এফ. স্মিথ সাহেবের নিকট থেকে এই বাগানের পশ্চিমাংশের জায়গাটি ক্রয় করেন।[১১৭] তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা আহসানুল্লাহর ব্যবহারের জন্য এখানে একটি সুন্দর বাগানবাড়ী তৈরী করে সেটার নাম দেন 'দিলখুশা' অর্থাৎ মন প্রফুল্ল। ১৮৭৭ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ এই বাগানের পূর্বাংশের প্রায় ১৫ বিঘা জমি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট থেকে লীজ নিয়ে এর সীমানা বৃদ্ধি করেন।[১১৮] দিলখুশা বাগানের সহযোগী হিসেবে ১৮৭৪ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহ বংগের ছোট লাটের নিকট থেকে পল্টনের মাঠ থেকে ৮০ বিঘা জমি লীজ নিয়ে একটি পার্ক তৈরী করেন। পার্কটি কোম্পানীর বাগিচা নামে পরিচিত ছিল।[১১৯] দিলখুশা এলাকায় এক সময় মীর্জা মোহাম্মদের রঙমহল ছিল।[১২০] সেকালে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতো একটি বড় খাল।[১২১] খালটি পরবর্তীতে সংস্কারকৃত হয়ে লেকের আকার পায় এবং মতিঝিল নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে এই এলাকাটিও মতিঝিল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১২২] মীরজুমলার নৌবাহিনীর দারোগা মীর মুকিমের বাড়ী ছিল বর্তমান বঙ্গভবনের পশ্চিম এলাকায়। তাঁর আমলে নির্মিত একটি পুকুর এখনো রয়েছে বঙ্গভবনের পশ্চিমে মতিউর শিশুপার্কের মাঝে।[১২৩]

শাহবাগের ন্যায় দিলখুশা বাগান বাড়ীর চতুর্দিকেও মজবুত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। পশ্চিমদিকে ছিল এর প্রধান প্রবেশদ্বার। ১৮৭৩ খ্রীঃ দিলখুশা বাগানের অভ্যন্তরে নওয়াব আহসানুল্লাহ একটি বিশাল দিঘী খনন করেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনুরোধে তিনি উক্ত দিঘী থেকে উঠানো মাটি গাড়ীতে বয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী ব্রাক্ষণঘাটের নিম্নভূমি ভরাট করে দেন।[১২৪] দানা দিঘী নামে পরিচিত উক্ত জলাশয়টি এ বাগানবাড়ীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। উক্ত দিঘীতে পোষা মাছের আহার দেয়াসহ সেখানে সম্পাদিত নানা কর্মকান্ডের কথা নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী থেকে জানা যায়।[১২৫] উক্ত দিঘীর

Dhaka University Institutional Repository

শান বাঁধানো ঘাটের উপর একতলা আকারে নির্মিত হাওয়াখানা ছিল। উক্ত হাওয়াখানাসহ দিঘীটির একটি দুস্পাপ্য চিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ৭৯ পৃঃ৩৭৯ তে দেয়া হলো।[১২৬] উক্ত দিঘীর অদূরে মানুক হাউজ নামে একটি বৃহদাকার ও সুদৃশ্য প্রাসাদ ভবন ছিল। পরিশিষ্টে চিত্র নং ৮০ পৃঃ৩৮০তে উক্ত প্রাদাদের একটি দুস্প্রাপ্য চিত্র দেয়া হলো। উক্ত প্রাসাদ ও দানা দিঘী এখন বঙ্গভবন এলাকার মধ্যে পড়েছে। দিলখুশা বাগানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইমারত ছিল একটি দ্বিতল প্রাসাদ ভবন। নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ এই প্রাসাদে কাটিয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর কন্যা নওয়াবজাদি মেহেরবানু ও জামাতা খাজা মোঃ আজমকে বসবাসের জন্য প্রাসাদ ভবনটি দিয়েছিলেন।[১২৭] এবাড়ীতে বসেই নওয়াবজাদি মেহেরবানু ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন।[১২৮] ভবনটির একটি দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ৮১ পৃঃ৩৮০তে দেয়া হলো। এই প্রাসাদ ভবনের চত্বরে ফুলগাছের সারি সারি বৃত্তের মাঝখানে 'বুলবুলাইয়া' নামে একটি সুদৃশ্য টাওয়ার শোভা পেত। পরিশিষ্টে চিত্র নং ৮২ পৃঃ৩৮১ তে দেয়া চিত্র দ্রঃ। এ বাগান বাড়ীর উত্তরাংশে বারোদুয়ারী নামে চতুর্দিকে খিলান দ্বারা উন্মুক্ত এবং মেঝে মার্বেল পাথরে মোড়ানো একটি বৈঠকখানা ছিল। এর অদূরে ফুল বাগানের মাঝে সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরের তৈরী সুন্দর একটি অষ্টকোন চন্দ্রাতপ ছিল। চতুর্দিকে উন্মুক্ত খিলানগুলোর মাঝে স্থাপিত জাফরিযুক্ত মার্বেল পাথরের সুদৃশ্য রেলিং চন্দ্রাতপটিকে মোহনীয় রূপ দিয়েছিল। উক্ত চন্দ্রাতপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় তোলা কে. এম. আজাদের স্ত্রী ও মেহেরবানুর কন্যা হুরবানুর একটি দুর্লভ আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং-৮৩ পৃঃ৩৮১তে দেয়া হলো। এই বাগানবাড়ীর উত্তর সীমানা দেয়াল ঘেঁষে, পরবর্তীকালে কয়েকটি একতলা ভবন তৈরী করা হয়। সেগুলোতে নওয়াবজাদি পরীবানু, খাজা মোঃ আজমল, খাজা মোঃ আদেল, খাজা বাহাউদ্দিন প্রমুখেরা বসবাস করতেন।[১২৯]

দিলখুশা বাগান বাড়ীতে ঢুকার পথে একটি কৃত্রিম জলাশয়ে কয়েকটি কুমির পালন করা হতো। দূরদূরান্ত থেকে দর্শকেরা সেগুলো দেখতে আসতেন। এর পরেই ছিল একটি খোলা মাঠ। সেখানে পরিবারের সদস্যরা খেলাধুলা করতেন। এছাড়া বিভিন্ন মৌসুমে সেখানে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হতো।[১৩০] এ বাগানবাড়ীর এক স্থানে ১২০ ফুট উঁচু একটি মাটির প্রাকৃতিক পাহাড় বানিয়ে তার উপর নির্মাণ করা হয়েছিল একটি সুদৃশ্য বাঙলো। প্রাতঃ ভ্রমণ করে পরিবারের লোকেরা সেখানে গিয়ে বসতেন।[১৩১]

দিলখুশা এলাকাটি ইতিহাস খ্যাত দু'জন সুফী সাধককে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। এদের একজন হলেন-হযরত শাহজালাল দাখিনী এবং অপরজন হলেন, হযরত শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকিন। দিলখুশা বাগানবাড়ীর পশ্চিম প্রবেশদ্বারের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত দাখিনী সাহেবের মসজিদটি বর্তমানে 'রাজউক' ভবনের চত্বরে রয়েছে। উক্ত মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে শাহ্ নিয়ামতুল্লাহর মাজার। এছাড়া উক্ত মসজিদের আঙিনায় নওয়াব পরিবারের নওয়াবজাদি মেহেরবানু, শওকত আরা বানু, জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন প্রমুখের সমাধি রয়েছে। দিলখুশা বাগানের দক্ষিণাংশে (বর্তমান বঙ্গভবন এলাকায়) এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি সৌধের মাঝে শাহজালাল দাখিনী সমাহিত আছেন। তৎকালে ছোট একটি খাল উক্ত মাজারের সাথে সংযোগ রক্ষা করতো। ঐখাল দিয়ে জিয়ারত কারীরা ওখানে যেতেন।[১৩২]

নওয়াব আব্দুল গণির দানে স্থাপিত পানীয় জলের কল ১৮৮৪ সালে নওয়াব আহসানুল্লাহর দানে বর্ধিত করা হলে দিলখুশা বাগানবাড়ীতে এর সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়।[১৩৩] ১৮৮৩ সালে ঢাকায় প্রথম টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হবার সাথে সাথেই দিলখুশায় এর সংযোগ দেয়া হয়েছিল।[১৩৪] উক্ত এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ১৮৯৮ খ্রীঃ পল্টনের মাঠে নওয়াবের ব্যয়ে একটি থানা স্থাপন করা হয়।[১৩৫]

১৯০৫ সালে ঢাকায় পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে অফিসাদি তৈরীর প্রয়োজনে নওয়াবদের দিলখুশা বাগানের দক্ষিণাংশ সরকার লীজ নেয়।[১৩৬] উত্তরাংশের প্রায় অর্ধেক এলাকা নওয়াব এস্টেটের অধিকারে থাকে। মাঝখান দিয়ে নির্মিত একটি রাস্তা উভয় অংশকে পৃথক করে ফেলে। ১৯৫২ সালে নওয়াদের জমিদারী উচ্ছেদের পর

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারাভাবে দিলখুশা বাগানবাড়ী জরাজীর্ণ হতে থাকে। ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিস থেকে দিলখুশা বাগান বাড়ীর উক্ত উত্তরাংশের একটি দুস্প্রাপ্য ভূমি নকশা উদ্ধার করা গেছে, যা পরিশিষ্ট নং ৩২ পৃঃ৪৫৫ তে দেয়া হলো।

পাকিস্তান আমলে সরকার মতিঝিল এলাকায় বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং শহর উন্নয়ন কার্যালয় প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনে দিলখুশা বাগানবাড়ী অধিগ্রহনের উদ্যোগ নেয়। এমতাবস্থায় নওয়াব পরিবারের উত্তরাধিকারীগণ দিলখুশা মসজিদ ও সংলগ্ন চত্বরটুকু ব্যতীত সব সম্পত্তি সরকার এবং ডি. আই. টি. কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৫৭ সালে বিক্রি করে দেন।[১৩৭]

এতদাঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনাই দিলখুশা বাগানবাড়ীতে সংঘটিত হয়েছিল। নিম্নে অনুরূপ কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল।

(ক) ১৮৭৪ সালের ১৩ মে এবং ১১ অক্টোবর তারিখে নওয়াব আহসানুল্লাহর উদ্যোগে দিলখুশাতে খেলাধুলা এবং বল নাচ অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন করা হয়।[১৩৮]

(খ) ১৮৮৫ সালে জনৈক ইটালিয় পন্ডিত এদেশে সংস্কৃত ভাষা চর্চার মান ও অবস্থা পর্যালোচনা করতে আসেন। এতদুপলক্ষে নওয়াব আবদুল গণি ঐ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী এদেশীয় পন্ডিতদের সমন্বয়ে দিলখুশা বাগানবাড়ীতে একটি ব্যাপক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।[১৩৯]

(গ) লেঃ গভঃ স্যার স্টুয়ার্ট বেইলী ঢাকা সফরে এলে নওয়াব আহসানুল্লাহ ২১ আগস্ট ১৮৮৮ দিলখুশা বাগানে তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন।[১৪০]

(ঘ) আলীগড়ের নেতাদের মত ঢাকা নওয়াব পরিবারের লোকেরা তৎকালে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এমতাবস্থায় নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত মতামত জানার জন্য ঢাকার প্রায় ৫ শত মুসলামান নওয়াবের দিলখুশা ভবনে যান। তিনি তাঁদেরকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করেন।[১৪১]

(ঙ) খ্রীষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে শাহবাগের ন্যায় দিলখুশা বাগানবাড়ীতে ১৮৯১ সালে ১জানুয়ারী কৃষি ও শিল্পমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। মেলায় নাচ-গান, ম্যাজিক, যাত্রা ইত্যাদিও ছিল।[১৪২]

(চ) ১৯০২ সালে লেঃ গভঃ লর্ড উডবার্ণ সস্ত্রীক ঢাকা পরিদর্শনে এসে নিমন্ত্রিত হয়ে ২২ জুলাই দিলখুশা বাগানবাড়ীতে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।[১৪৩]

(ছ) ১৯০৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী, ঢাকার নওয়াবের উদ্যোগে দিলখুশা বাগানবাড়ীতে নাচ-গান, মুষ্ঠিযুদ্ধ, সাঁতার ইত্যাদির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।[১৪৪]

(জ) ১৯০৬ সালের ১৮ জানুয়ারী, পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের নব নিযুক্ত লেঃ গভর্নরের পত্নী লেডী ফুলার, নওয়াবের দিলখুশা বাগানবাড়ীতে এই প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানার্থে এক অভ্যর্থনা ও পরিচিতি সভার আয়োজন করেন।[১৪৫]

(ঝ) ১৯১৩ সালে সৈয়দ আওলাদ হোসেনের সভাপতিত্বে নওয়াবের দিলখুশা বাগানবাড়ীতে স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির এক সভা হয়। প্রতিষ্ঠানটি জনকল্যাণ কাজের জন্য এবং যুদ্ধে বিপন্ন তুর্কী মুসলিমদের জন্য তখন প্রায় ২৪ হাজার টাকা তুলেছিল। উক্ত সভায় তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা মোহাঃ আলীর নিকট উক্ত অর্থ থেকে ৫ হাজার টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৪৬]

(ঞ) ১৯১৪ সালের ২০জুলাই, খাজা মোহাঃ আজমের নিমন্ত্রণে গভর্নর লর্ড কারমাইকেল সপত্নীক দিলখুশা বাগানবাড়ীতে আসেন। যথাযথ আপ্যায়নসহ তাঁদের আলোকচিত্র তোলার ব্যবস্থা করা হয়।[১৪৭]

(ট) ১৯২৪ সালের ১৩ ফেব্রুঃ খাজা মোঃ আজম (চিত্র নং ৭৪ দ্রঃ) বংগীয় ব্যবস্থাপন সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট মেজর সুহরাওয়ার্দীকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য দিলখুশায় এক উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেন।[১৪৮]

(ঠ) ১৯৪৮ সালে হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানী দিলখুশায় অবস্থিত খাজা নসরুল্লাহর বাড়ীতে এক রাজনৈতিক আলোচনায় মিলিত হন।[১৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

১১(১)(ঙ) বাইগুনবাড়ী শিকারগৃহ ঃ

ঢাকা শহর হতে কিছুটা দূরে সাভারের সাদুল্লাপুর এলাকায় ছিল বাইগুন বাড়ীর অবস্থান। প্রমোদ কাননের সাথে সাথে বাইগুনবাড়ী ঢাকার নওয়াবদের শিকারগৃহ রূপেও ব্যবহৃত হতো।[১৫০] সাভারের উচুঁ নীচু পাহাড়ী পরিবেশের জলা-জঙ্গলে শিকারের জন্য পশুপাখী পালন বিশেষভাবে সহায়ক ছিল। ঢাকার নওয়াবগন সেখানে বিস্তৃত এক বনভূমি পশুপাখিদের জন্য অভয়ারণ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। উক্ত এলাকায় নওয়াবের লোকেরা ব্যতীত কেউ শিকার করতে পারতো না। ১৮৯৫খ্রী: পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর বাইগুনবাড়ী এলাকায় সংরক্ষিত বনের পশুপাখী যারা অন্যায়ভাবে শিকার করে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে কেউ এরূপ করলে তাকে হানি, চুরি অথবা দন্ডবিধি আইনের অন্য কোন ধারামুলে ফৌজদারিতে সোপর্দ করাসহ ক্ষতি পুরনে দায়ী করা হবে।[১৫১] দেশ বিদেশ থেকে উন্নত জাতের হরিণ, ময়ূর, বন মোরগ, তিতির প্রভৃতি এনে নওয়াবরা উক্ত সংরক্ষিত বনে ছেড়ে দিয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন সময়ে উচ্চ-পদস্থ সরকারী আমলাদেরকে ঢাকার নওয়াবরা এই সংরক্ষিত বনে নিয়ে এসে শিকারের আনন্দ উপভোগ করাতেন। বাকল্যান্ড সাহেব লিখেছেন, "ঢাকার অদূরে শিকারের জন্য নওয়াবদের একটি বিশেষ মাচানের সুব্যবস্থা ছিল। সেখানে তাদের ইংরেজ বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হয়ে শিকারে যেতেন"।[১৫২] ১ জানুয়ারী ১৮৮৩ নওয়াব আহসানুল্লাহ তার ব্যক্তিগত ডায়রীতে লিখেছেন যে, ঐদিন ক'জন বন্ধু ইংরেজ সাহেব নওয়াবের বাইগুনবাড়ী সংরক্ষিত বনে শিকারে গিয়েছিলেন। তারা নওয়াবের জন্য শিকারকৃত ১টি স্ত্রী ও একটি পুরুষ হরিণ পাঠিয়েছিলেন। নওয়াব সাহেব দু'টো হরিণই আবার জজ সাহেবের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[১৫৩] নওয়াবের সংরক্ষিত বনে বাইরের কেউ শিকার করতে পারতো না বিধায় সেখানে অনেক সময় বাঘের উপদ্রব ভীষণভাবে বেড়ে যেতো। ১৮৯০ খ্রীঃ সেখানে এরূপ বাঘের হামলায় অল্পদিনের মধ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকার ৫/৬ জন নিহত ও অনেকে আহত হয় বলে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।[১৫৪]

বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পরিবার পরিজন ও পাইক পেয়াদা সমভিব্যহারে ঢাকার নওয়াবগণ শিকারের আনন্দ ভ্রমনে বাইগুনবাড়ীতে গিয়ে অবস্থান করতেন। সেখানে তাঁদের থাকা খাওয়া, আমোদ-প্রমোদের জন্য উপযুক্ত প্রাসাদাদি নির্মাণ করা হয়েছিল।[১৫৫] পুরুষদের জন্য ছিল সদর কোঠা, রঙমহল, আবাসগৃহ এবং বেগমদের জন্য ছিল উপযুক্ত অন্দর মহল। (<u>পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং- ৮৪ পৃঃ নং৩৮২ দ্রঃ</u>) এছাড়া জমিদারী পরিচালনার জন্য কাচারীসহ পাইক-পেয়াদা, দাস-দাসীদের জন্যও প্রয়োজনীয় বাসগৃহ তৈরী করা হয়েছিল। বাইগুনবাড়ীতে নওয়াব আহসানুল্লাহ সুন্দর একটি জামে মসজিদ নির্মাণ ও ২টি দিঘী খনন করেছিলেন।কালের প্রবাহে অন্য সব কিছু প্রায় বিলীন হয়ে গেলেও ঐ মসজিদ ও সংলগ্ন দিঘীটি (<u>পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং- ৮৫ দ্রঃ</u>) আজো সেখানে ঢাকার নওয়াবদের গৌরবময় স্মৃতি বহন করছে। <u>পরিশিষ্টে চিত্র নং-২২ পৃঃ নং৩৫২-তে দেয়া</u> নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলে তোলা উক্ত মসজিদের একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া <u>পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং-২৩ পৃঃ ৩৫২তে সাম্প্রতিককালে</u> তোলা উক্ত মসজিদের একটি আলোকচিত্র দেয়া হলো। উক্ত জামে মসজিদ ছাড়াও নওয়াব আহসানুল্লাহর আমলে তোলা বাইগুনবাড়ীর কয়েকটি দালান কোঠার দুস্প্রাপ্য আলোকচিত্র এডওয়ার্ড হাউস থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলো হলো অন্দরমহল, দ্বিতল প্রাসাদ ভবন ইত্যাদি। উক্ত ছবিগুলো থেকে সেখানকার বাগানবাড়ীর ঐশ্বর্যের বেশ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। <u>পরিশিষ্টে দেয়া চিত্র নং-৮৬-৮৭ তে দেয়া আলোকচিত্র দ্রঃ</u>।[১৫৬] ঢাকার নওয়াবরা সাধারণতঃ লঞ্চ বা বজরায় করে বুড়িগংগা ও তুরাগ নদীপথে ঢাকা থেকে বাইগুন বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তুরাগ নদী থেকে একটি খাল বেরিয়ে বাইগুনবাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেছে। উক্ত খালের ধারে অবস্থিত বাইগুনবাড়ীর ঘাটটি শান বাঁধানো ছিল। ১৮৯৬ খ্রীঃ বাইগুনবাড়ীতে যাওয়ার পথে তুরাগ নদীতে পলি জমে নৌযান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। নওয়াব আহসানুল্লাহ তখন হাজার হাজার টাকা খরচ করে নদীর তলদেশ খনন করে নৌচলাচলের সুব্যবস্থা করে দেন।[১৫৭] শহর থেকে দূরে কোলাহলমুক্ত ছায়াঘন নির্মল পরিবেশের দরুন

Dhaka University Institutional Repository

বাইগুনবাড়ী আবহাওয়া পরিবর্তনেরও একটি উপযুক্ত স্থান ছিল। মনপ্রাণ হালকা ও প্রফুল্ল করার জন্য নওয়াব পরিবারের লোকেরা প্রায়ই দল বেঁধে সেখানে বেড়াতে যেতেন।[১৫৮] ঢাকার নওয়াবদের অনেকেই একত্রে অনেকগুলো স্ত্রী রাখতেন। বসবাসের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকায় তাঁদের কাউকে অনেক সময় বাইগুনবাড়ীতেও রাখা হতো। কাজী কাইউমের ডাইরী থেকে জানা যায়, ১৯০৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর এক বেগমকে বাইগুনবাড়ীতে রেখেছিলেন। ৫ মার্চ ১৯০৪ খ্রীঃ নওয়াব সাহেব উক্ত বেগমের সাহচর্যে বাইগুনবাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন।[১৫৯] নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী থেকে জানা যায়, ৪ মার্চ ১৮৮৫ ঢাকার সাথে নওয়াবের বাইগুনবাড়ীর টেলিফোন লাইন প্রথম চালু করা হয়।[১৬০]

১৮৮৭ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণির কে. সি. এস. আই. উপাধির খেলাত প্রাপ্তির দিনে তাঁর স্ত্রীর বার্ধক্যজনিত পীড়া বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর উক্ত বৃদ্ধা মাতাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইগুনবাড়ীতে নিয়ে যান। ৭ এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রীঃ (২৫ চৈত্র ১২৯৬ বাংলা) সেখানে নওয়াবের মাতা ইন্তেকাল করেন। মরহুমার মরদেহ ঢাকাস্থ বেগমবাজার কবরস্থানে সমাধিস্থ করার জন্য পঠিয়ে দেয়া হয়। তবে নওয়াব আহসানুল্লাহ ও তাঁর বৃদ্ধ পিতা শোকাভিভূত হয়ে বাইগুনবাড়ীতেই কিছুদিন অবস্থান করতে থাকেন।[১৬১] এদিকে মাতার মৃত্যুর দিনই ঢাকার নর্থব্রুক হলে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের উপাধির খেলাত প্রদান অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নওয়াব সাহেব নিজে আসতে না পারায় এস্টেটের চীফ ম্যানেজার উইদ্রল সাহেবকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়।[১৬২] ১৯০১ খ্রীঃ মার্চ মাসে নওয়াব আহসানুল্লাহ বাইগুনবাড়ী অবস্থানকালে তাঁর পাইক-পেয়াদাগনের সাথে কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকদের এক ভীষন মারামারি হয়। এতে নওয়াবের দুইজন সিপাহীর মাথা ফেটে যায়। এ ঘটনার পর নওয়াব সাহেব তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে আসেন।[১৬৩] নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৬০ এর দশকে বাইগুনবাড়ীতে ত্রিশ বিঘা জমি পরিস্কার করে সেখানে চা বাগান তৈরী করেন। তিনি সেখানে ব্যবহার করেছিলেন 'কাছার বীজ' এবং ১৮৬৭ সালে সেখান থেকে পেয়েছিলেন আড়াই মন চা।[১৬৪] নওয়াব আহসানুল্লাহ চা বাগানটি আরো উন্নত করেন। ১৮৯২ এবং ৯৩ সালে ঢাকা থেকে যথাক্রমে ৪৭০৯ মন এবং ১৩৮৫ মন চা -পাতা কলকাতায় রপ্তানী হয়েছিল। রপ্তানীকৃত এই চায়ের একটা বড় পরিমাণ নওয়াবের উক্ত চা-বাগানে উৎপন্ন হয়েছিল।[১৬৫] ঢাকার নওয়াবদের পতনকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাইগুন বাড়ী শিকারগৃহের পরিবেশ নষ্ট হতে থাকে। ১৯৫২ সালে জমিদারি উচ্ছেদের পরও শিকারগৃহটি নওয়াব ওয়াকফ এস্টেটের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু যথাযথ নজর না দেয়ায় তা ক্রমান্বয়ে বেহাত হয়ে যায়। তবে এখনো সেখানকার কিছু জমিজমার উপর ঢাকা নওয়াব ওয়াকফ এস্টেটের নামমাত্র নিয়ন্ত্রন রয়েছে।

১১(১)(চ) কোম্পানী বাগান ঃ

বঙ্গভবন ও দিলখুশা বাগানের পশ্চিম-উত্তর দিকে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল কোম্পানী বাগানের অবস্থান।[১৬৬] নগরবাসী জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও মুক্তবাতাস সেবনে এ বাগানটি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করতো। পুরানো পল্টন সহ অত্র এলাকায় ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনানিবাস। কিন্তু খানা খন্দক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দরুন ১৮৪০ সালের দিকে এখান থেকে সেনানিবাস স্থানান্তর করা হয়। এরপর এলাকাটির পরিচর্যার ভার পড়েছিল ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির উপর।[১৬৭]

দিলখুশা বাগান বিস্তারের জন্য ১৮৭৪ খ্রীঃ বংগের ছোট লাটের নিকট থেকে নওয়াব আহসানুল্লাহ পল্টন এলাকার ৮০ বিঘা সম্পত্তি পত্তনী গ্রহণের অনুমতি আদায় করেন।[১৬৮] উক্ত অনুমোদন মূলে ১৮৭৬ খ্রীঃ আর. আর. নং-৩৭২ দলিলমুলে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট থেকে তিনি বার্ষিক ২৪ টাকা ৭ আনা জমায় প্রায় ৯৭ বিঘা এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ বার্ষিক ৫৭ টাকা জমায় ৯৯ বিঘা সম্পত্তি স্থায়ীভাবে লীজ গ্রহণ করেন।[১৬৯] অতপর স্থানটির ঝোঁপ জংগল পরিস্কার করে এবং গাছ-গাছালী লাগিয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ সেখানে একটি সুন্দর পার্ক তৈরী করেন। সরকারের নিকট থেকে জমি

Dhaka University Institutional Repository

লীজ গ্রহণকালের শর্তানুযায়ী জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সপ্তাহে দুদিন উক্ত পার্ক উণ্মুক্ত রাখতে হতো। ১৮৯৯ খ্রীঃ এই সুযোগ আরো বাড়িয়ে সপ্তাহে তিনদিন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যে ৭ টা পর্যন্ত করা হয়।[১৭০] বাগানের পাশ দিয়ে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাত নির্মাণের জন্য ১৮৮০ খ্রীঃ সেক্রেটারী অব স্টেটস-এর পক্ষ থেকে নওয়াব আহসানুল্লাহ-কে আরো কিছু জমি দেয়া হয়।[১৭১] পল্টনের এলাকায় নওয়াবের নির্মিত এই পার্কটি 'কোম্পানী বাগান' নামে পরিচিত হয়েছিল।[১৭২] সম্ভবত এখানে আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পূর্বোক্ত সেনানিবাস থাকায় পার্কটি কোম্পানী বাগান নামেই সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেছিল। তাই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নিজেই পল্টনের একাংশকে বাগানে পরিণত করে, যাকে কোম্পানী বাগিচা বলা হতো বলে প্রফেসর শরিফুদ্দিন যে তথ্য দিয়েছেন, তা পুরোপুরি সত্য নয়।[১৭৩] প্রকৃত পক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ মিউনিসিপ্যালিটির নিকট থেকে জমি লীজ নিয়ে তা তৈরী করেছিলেন। পুরানো পল্টনের বাকী বিরাট এলাকা কালক্রমে ঝোঁপ ঝাড়ে ভরে যেতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের এক পরিকল্পনা দিয়ে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে এক পত্র প্রেরণ করেন। মিউনিসিপ্যালিটির ১৮৮৮ সনের ১৪ জুলাই এর সভায় নওয়াবের পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়। এর ফলে ঐ স্থানের ঝোঁপ-জঙ্গল পরিস্কার এবং খানা-খন্দক ভরাট করে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানে পরিণত করা হয়।[১৭৪] ফলে কোম্পানী বাগানের পরিবেশ উন্নয়নসহ এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পল্টনের এই ময়দানের একাংশ সাহেব সুবাদের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মাঠটি ঢাকা কলেজের ছাত্ররাও ব্যবহার করতো। এখানে ছোট লাট এবং বড়লাট সৈন্যদের কুচকাওয়াচ পরিদর্শন করতেন।[১৭৫] সপ্তাহে কয়েকদিন লালবাগ কেল্লার সেপাইরা এখানে এসে মার্চ করতো। হৃদয়নাথ লিখেছেন, স্কুল থেকে মাঝে মাঝেই তাঁরা পুরানো পল্টনের মাঠে সেপাইদের প্যারেড দেখতে যেতেন। সেখানে সেপাইদের গুলিচালনা প্রশিক্ষণের জন্য সিকি মাইল দীর্ঘ এবং বিশ হাত উঁচু মাটির ঢিবি ছিল।[১৭৬] আগেই বর্ণিত হয়েছে, দিলখুশা বাগানবাড়ীসহ অত্র এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ১৮৯৮ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যয়ে পল্টন ময়দানে পুলিশের একটি থানা স্থাপন করা হয়।[১৭৭] কোম্পানী বাগান ছিল ফুল ও ফলের গাছে পরিপূর্ণ। ১৮৯৮ খ্রীঃ হাটখোলা নিবাসী জনৈক আবদুল ইব্রাহিম নওয়াবের কোম্পানী বাগিচা ইজারা নিয়েছিলেন। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে নওয়াবপুর সেকশনের তিনজন পশ্চিম দেশীয় কনস্টবল ঐ বাগানের আম চুরি করে। উক্ত আবদুল ইব্রাহীম লোকজনের সহায়তায় তাদের ধরে কোতয়ালী থানায় সোদর্প করলে কোতয়ালী তাদেরকে ফৌজদারীতে চালান দেয়।[১৭৮] নওয়াবদের ঘরবাড়ীর তালিকা থেকে জানা যায়, কোম্পানী বাগিচার মধ্যে চা-খানা নামে ঢাকার নওয়াবদের একটা একতলা ভবন ছিল। সেখানে সম্ভবত এ বাগানে সকাল বিকেলে বেড়াতে আসা বিশেষ অতিথিদের নওয়াবের পক্ষ থেকে চা-দ্বারা আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল।[১৭৯]

১৯০৫-৬ খ্রীঃ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের লেঃ গভর্নরের অফিস ও বাসভবন নির্মাণার্থে দিলখুশার মত কোম্পানী বাগানের দক্ষিণাংশের বেশ কিছু জায়গা সরকার স্থায়ীভাবে লীজ গ্রহণ করে। বাজার দরের তুলনায় খুবই কম মূল্যে এই সব জমি লীজ নেয়া হয়েছিল। এজন্য পরবর্তীতে বিষয়টি নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ খ্রীঃ সরকার কর্তৃক রেন্ট জমার পরিমাণ বাড়িয়ে বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা পুনঃধার্য করা হয়।[১৮০] এদিকে নওয়াব এস্টেটের পতনের যুগে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোম্পানী বাগানও শ্রীহীন হতে থাকে। ক্রমে এ বাগানের প্রায় সবটাই নওয়াব এস্টেটের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণাংশের গোলপুকুরের চারিদিকের পার্কটি কোন রকমে টিকে থাকে। ষাটের দশকে সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নামে পার্কটির নামকরণ করা হয়। এখন সেটা মতিউর জাতীয় শিশু পার্ক নামে পরিচিত।[১৮১]

কোম্পানী বাগান ও পুরানো পল্টন ময়দানের সাথে ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রচুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ইতিহাস জড়িত আছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য এরূপ কয়েকটির বিবরণ দেয়া হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ১৮৮৮ খ্রীঃ ৭ এপ্রিল সংঘটিত ভয়াবহ টর্নেডোর আঘাতে নওয়াবের আহসান মঞ্জিলসহ ঢাকা শহরের এক ব্যাপক এলাকা ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বহু লোক হতাহত হয়েছিল। উক্ত টর্নেডোর হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পাওয়ায় নওয়াব আব্দুল গণি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা শহরের দুই সহস্রাধিক লোক সহকারে কোম্পানী বাগানের সাথেই পুরানো পল্টন ময়দানে ১৩ এপ্রিল বিকেলে খোদার শোকরানা নামাজ আদায় করেন।[১৮২]
(খ) মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক পালনার্থে ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ খ্রীঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরানো পল্টনের মাঠে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় নওয়াবের বৃহৎ সামিয়ানাগুলো এবং চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহসহ গণ্যমান্য ইংরেজ সাহেবগণ ও দেশীয় ব্যক্তিবর্গ মিলে প্রায় এক হাজার সম্মানিত লোক এতে যোগদান করেছিলেন। সভায় মহারানীর মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিক শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর স্মরণে ঢাকায় একটি উপযুক্ত স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।[১৮৩]
(গ) ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধাহত তুর্কী মুজাহিদদের সাহায্যার্থে ২৯ নভেম্বর ১৯১২ খ্রীঃ নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহর নেতৃত্বে আহসান মঞ্জিল থেকে একটি বিরাট মিছিল বের করা হয়। নেতারা চাঁদা আদায় করতে করতে পুরানো পল্টন মাঠে গিয়ে তথায় প্রায় বিশ হাজার লোক নিয়ে একটি সভা করে। সেখানে তাঁরা আরব দেশীয় জনৈক সৈয়দের ইমামতিতে আসরের নামাজ আদায় পূর্বক দোয়া প্রার্থনা করেন। নামাজ শেষে নওয়াব সলিমুল্লাহ সভাপতিরূপে দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে তুরস্কের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে সাহায্য দানের আবেদন জানান। ঢাকার মহল্লা সরদারগণ তখন নিজ নিজ এলাকা থেকে সংগৃহীত প্রচুর অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী স্তুপাকারে হাজির করে। সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে নওয়াব সাহেব ঐগুলো তুর্কীদের সাহায্যে পাঠানোর ব্যবস্থা নেন।[১৮৪]

১১(১)(ছ) হাজীগঞ্জ দুর্গ বাগানবাড়ী ঃ

নারায়ণগঞ্জে মোগল সুবাদার মীর জুমলার নির্মিত ঐতিহাসিক হাজীগঞ্জ দুর্গটি ঢাকার নওয়াবদের মালিকানাধীন ছিল। তাঁরা সেখানে একটি সুন্দর বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। শহর থেকে দূরে আবহাওয়া পরিবর্তন, গ্রামের শান্ত পরিবেশ উপভোগ ও শিকার করার কাজে [১৮৫] তাঁরা এ বাগানবাড়ীতে যাতায়াত করতেন। বাইগুনবাড়ীর মত এখানেও নওয়াব এবং পাইক পেয়াদাদের থাকার উপযুক্ত হর্ম্যরাজি নির্মিত হয়েছিল। এ বাগানবাড়ীতে 'হাফেজ মঞ্জিল' নামে একটি প্রকান্ড ও সুদৃশ্য দ্বিতল প্রাসাদ ভবন ছিল।[১৮৬] নওয়াব আহসানুল্লাহর জেষ্ঠ্যপুত্র খাজা হাফিজুল্লাহর নামানুসারে ভবনটির ঐরূপ নামকরণ করা হয়েছিল।[১৮৭] দুর্ভাগ্যবশত খাজা হাফিজুল্লাহ ১৮৮৪ খ্রীঃ মাত্র ১৬ বছর বয়সে মারা যান।[১৮৮] উক্ত ভবনটির দু'টি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ৮৮ ও ৮৯ পৃঃ৩৮৬তে দেয়া হলো।[১৮৯] নওয়াবদের অর্থ দানের তালিকা থেকে জানা যায়, হাজীগঞ্জে জুবিলী রোড নামে একটি রাস্তা নির্মাণে নওয়াব এস্টেট থেকে ১ হাজার টাকা দান করা হয়েছিল।[১৯০] ১৯০৪ সালে অসুস্থ্যতার জন্য ভাওয়ালের ছোট রাজকুমার রবীন্দ্র নারায়নের আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এজন্য তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বড় রাজকুমার রনেন্দ্র নারায়ণ রায় ৩০ অক্টোবর ১৯০৪ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর নিকট একটি পত্র দ্বারা উক্ত বাগানবাড়ী ব্যবহার করতে দেয়ার অনুরোধ জানান। নওয়াব সাহেব সেটা মঞ্জুর করেছিলেন। উক্ত পত্রটি এখনো আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পরিশিষ্ট নং ৩০ পৃঃ৪৫৩তে সেটার কপি দেয়া হলো। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরীতে বহুবার সেখানে শিকার উপলক্ষে যাতায়াতের বিবরণ রয়েছে। বাগানবাড়ীটি উক্ত অঞ্চলের জন্য নওয়াব এস্টেটের সদর কাচারীরূপেও ব্যবহৃত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১১(১)(জ) জিঞ্জিরা ফলের বাগান ঃ

বুড়িগংগা নদীর দক্ষিণ পাড়ে কেরানীগঞ্জ থানাধিন চুনকুঠিয়া মৌজাতে ঢাকার নওয়াবদের একটি সুন্দর বাগান ছিল। পুরানো নথিপত্র ও দলিল থেকে বাগানটির চৌহদ্দী সীমানার যে বর্ণনা পওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ-পশ্চিম দিকে পশ্চিম জিঞ্জিরার দোসীমানার বটগাছ। পূর্ব-উত্তরে একটি মজে-শুকিয়ে যাওয়া খাল এবং উত্তরে বুড়ীগঙ্গা।[১৯১] আয়তাকারে তৈরী প্রায় ২৫ বিঘা (৫.২১ একর) আয়তন বিশিষ্ট বাগানটি তৎকালীন তৌজি নং-২১২৩ খতিয়ান নং-১৩৪ (নতুন-৪) দাগ নং-১, মৌজা জে. এল. নং-৪৩২ চুনকুঠিয়া -তে অবস্থিত ছিল।[১৯২] এডওয়ার্ড হাউস থেকে নওয়াবদের উক্ত জিঞ্জিরা গার্ডেনের একটি দুস্প্রাপ্য ভূমি নক্শা উদ্ধার করা গেছে যা পরিশিষ্ট নং ৩৩ পৃঃ   তে দেয়া হলো।[১৯৩] জিঞ্জিরা গার্ডেনটি ছিল মূলত নওয়াবদের একটি ফলের বাগান। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জাম্বুরা, পিয়ারা, ছফেদা প্রভৃতি দেশীয় সব প্রকার ফলের গাছই এখানে ছিল। সেই সাথে সুবিধামত স্থানে নানা জাতের স্থায়ী ফুলের গাছও এখানে ছিল। বাগানটি এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করে রাখা হতো যে, এতদাঞ্চলের লোকদের ছায়া ঢাকা ও মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য সেটা একটি সুন্দর স্থান ছিল।

১১(১)(ঝ) শ্যামপুর ফলের বাগান ঃ

কোরানীগঞ্জ থানাধীন শ্যামপুর বাগিচা নামে ঢাকায় নওয়াবদের আরেকটি ফলের বাগান ছিল। মৌজা কদমতলী নং ৩৩৪ খতিয়ান নং-৬৯৬ তে নিস্কর জমির উপর বাগানটি তৈরী করা হয়েছিল।[১৯৪] বাগানটির চৌহদ্দি সীমানা ছিল নিম্নরূপ ঃ উত্তরে বুড়িগংগা, দক্ষিণে সড়ক, পূর্বে মোহঃ আকমল প্রজার বসতবাড়ী, পশ্চিমে ইটাখোলা।[১৯৫]

১১(১)(ঞ) হোসেনী দালানের বাগান ঃ

ঢাকা শহরে হোসেনী দালানের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে প্রায় ২০ বিঘা এলাকা জুড়ে ঢাকার নওয়াবদের একটি সুন্দর বাগান ছিল ফুল ও ফলের গাছে ভর্তি। পুরানো দলিল থেকে এ বাগানের চৌহদ্দী সীমানার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহলো ঃ- পুর্বদিকে হোসেনী দালান, দক্ষিণ দিকে গণ পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন, পশ্চিম দিকে একিটি জাল্লা বা জলাশয় এবং উত্তর দিকে জনৈক আব্দুল আলীর বসতবাড়ী। বাগানটির জন্য তৎকালে মিউনিসিপ্যালিটির হোল্ডিং নম্বর ছিল -২৬, হোসেনী দালান রোড।[১৯৬] এ বাগানে বিশ্রাম নেয়া ও অবকাশ যাপন করার জন্য দালান কোঠাও নির্মাণ করা হয়েছিল।[১৯৭] হোসেনী দালানের নহবত খানার উত্তরে খাজা মোহাঃ করিমের আরেকটি সুন্দর বাগান ছিল। এ বাগানটি পূর্বে মোগল নওয়াব শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁর বাগান নামে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়।[১৯৮]

১১(১)(ট) বেমগবাজার ফলের বাগান ঃ

বেগম বাজারে ঢাকার নওয়াবদের পারিবারিক গোরস্তানের উত্তর-পশ্চিমে তাঁদের একটি ফলের বাগান ছিল। বাগানটি পাশাপাশি দু'টি প্লট নিয়ে গঠিত ছিল। প্রায় দুই বিঘা বিস্তৃত এই বাগানটির তৎকালিন হোল্ডিং নং ২০, আজম লেন।[১৯৯]

Dhaka University Institutional Repository

১১(১)(ঠ) গোলাম মোস্তফা লেনের বাগান ঃ

লালবাগ থানাধীন গোলাম মোস্তফা লেনেও ঢাকার নওয়াবদের একটি বাগান ছিল। উক্ত বাগানে একটি বড় পকুরও ছিল। পুকুরটি স্থানীয় জনসাধারণের পানির অভাব পুরণ করতো। এ বাগানটি লাখেরাজ সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর তৎকালিন মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং ছিল ৬, প্লট নং-ছিল-১৭,শীট নং ছিল-৩৫ এবং ওয়ার্ড নং ছিল-৫।[২০০]

১১(১)(ড) জুরাইনের আমবাগান ঃ

ঢাকার পূর্বাংশে জুরাইনে নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ একটি বড় আম বাগান তৈরী করেছিলেন।বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নত জাতের আমগাছ এনে তিনি উক্ত বাগানে রোপন করেছিলেন। মিরাশ মালিকানায় ক্রয়কৃত উক্ত আমবাগানের তৎকালিন মৌজা নং ছিল কিসমাত জুরাইন-৩৩৭, এবং খতিয়ান নং ছিল- ৪৪২।[২০১]

১১(১)(ঢ) মাতুয়াইল ফলের বাগান ঃ

জুরাইনের অনুরূপ মাতুয়াইলেও ঢাকার নওয়াবদের একটি বড় ধরনের ফলের বাগান ছিল। গোবিন্দপুর এস্টেট ও দাণ্ড পরামানিকের তালুকের অন্তর্গত উক্ত বাগানটির মৌজা নং-ছিল, মাতুয়াইল-৩৩২ এবং খতিয়ান নং-৭। তৎকালে ঐ এলাকা তেজঁগাও থানাধীন ছিল।[২০২]

ঢাকার নওয়াবগণ ছাড়াও খাজা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বিভিন্ন স্থানে পৃথক ভাবে বাগান ও বাগানবাড়ী নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলিও তৎকালিন ঢাকার লোকেরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে উপকৃত হতেন। নিম্নে এরুপ কয়েকটি বাগানের কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

১১(১)(ণ) আজিমপুরে শাহজাদা মিয়ার বাগানঃ

বর্তমান আজিমপুর কলোনীর পূর্ব পাশে রাস্তার অপর পাড়ে ঢাকার নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা শাহজাদা মিয়ার বিরাট একটা বাগান ছিল। নানা জাতের ফলের গাছে পরিপূর্ণ বাগানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হতো। বাগানটির চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। তৎকালিন ঢাকা শহরের লোকেরা জনবিরল এই এলাকায় উক্ত বাগানে বনভোজন করতে আসতো।[২০৩]

১১(১)(ত) মীর্জা ফকির মোহাম্মদের বাগান বাড়ীঃ

নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রাইভেট সেক্রেটারী মীর্জা ফকির মোহাম্মদ, নওয়াব বাড়ীর গোল তালাবের উত্তর পাড়ে একটি ছোট্ট অথচ সুন্দর বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। তিনি শখ করে এর নাম দিয়েছিলেন "আগুসে-গুল" (ফুলের কোলে)। উক্ত বাগানের মাঝে তিনি একটি পাকা বৈঠকখানাও তৈরী করেছিলেন।[২০৪] বুড়ীগঙ্গা থেকে ঝিরি ঝিরি বাতাস নওয়াবদের গোল পুকুর পেরিয়ে মীর্জা সাহেবের আগুসেগুলে মনোরম পরশ ছুঁইয়ে দিত। পরবর্তীকালে নওয়াব পরিবারের মুশায়রার আসরগুলো প্রায়ই এখানে বসতো। ঢাকার নওয়াবদের সেই পতনের যুগে যখন শাহবাগ-দিলখুশার মত ব্যয়বহুল বাগানবাড়ীর সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে এসেছিল,তখন নওয়াববাড়ীর সীমানায় নির্মিত মীর্জা সাহেবের এ বাগানটি খাজা পরিবারের লোকদের চিত্তবিনোদনের অন্যতম সহায়ক ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১১(১)(থ) নওয়াব ইউসুফজানের বাগানবাড়ী ঃ

নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজান দীর্ঘদিন ঢাকা পৌরসভা ও ডি: বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থেকে এর প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। আগাসাদেক ময়দানের উত্তর পার্শ্বে কায়েতটুলীতে[২০৫] তিনি একটি সুন্দর বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। এই বাগানে তিনি বড় একটি পুকুর খনন করে তাতে মাছের চাষ করতেন। পুকুরটি আগাসাদেক ময়দানের উত্তরে বর্তমান আব্দুল হাদীলেনের দক্ষিন মাথায় অবস্থিত ছিল।[২০৬] উক্ত বাগানের লিচু ও আম বিখ্যাত ছিল। খাজা সাহেব সেগুলো আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করতেন। ১৯০২ সালে ঐ বাগানের ফলের প্রশংসা করে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।[২০৭]

ঢাকা শহরের ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় নওয়াব পরিবারের লোকদের তৈরী ঐ সব বাগ-বাগিচা শহরের পরিবেশ ও আবহাওয়াকে নির্মল করতে যথেষ্ট সহায়তা করতো। চিত্তবিনোদন ছাড়াও মিঠাপানি ও ফুল-ফল প্রভৃতি ব্যবহার করে লোকেরা এগুলো থেকে উপকৃত হতেন।

১১(২) ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্ক উন্নয়ন ঃ

পুরানো ঢাকায় অবস্থিত বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্কটি ১৯৫৭ সালের আগ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে পরিচিত ছিল। এ পার্কটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে আর্মেনীয়দের একটি ক্লাবঘর ছিল, যেখানে তাঁরা বিলিয়ার্ড খেলতো। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ও স্থানীয় লোকেরা বিলিয়ার্ড বলকে আন্টা বলতো। সে কারণে ঐ ক্লাব সংলগ্ন স্থানটি আন্টাঘর ময়দান নামে পরিচিত ছিল।[২০৮] উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজরা এ স্থানটি আর্মেনীয়দের নিকট থেকে কিনে নেয়। কিছুদিনের মধ্যে ক্লাবঘরগুলো জীর্ণ হয়ে পড়লে সেগুলো ভেংগে স্থানটিকে একটি ছোটখাট পার্কের রূপ দেয়া হয়। ডিম্বাকারে তৈরী পার্কটি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। ইংরেজরা এর চারদিকে চারটি বৃটিশ কামান স্থাপন করে প্রাক্তন ক্লাবের সীমা নির্দেশ করেছিল। পরবর্তীতে কামানগুলো উঠিয়ে পার্কের মাঝখানে স্থাপন করা হয়।[২০৯]

১৮৪০ খ্রীঃ টেইলর সাহেব এ পার্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ঢাকার রাস্তাগুলোর সংযোগস্থলে আছে এক টুকরো বর্গাকৃতির উন্মুক্ত জায়গা। এর মাঝখানে রয়েছে একটি বৃত্তাকার বাগান। নদীতীর থেকে আধ মাইল দূরে ঐ স্থানের কাছে ইংরেজ কুঠি, সেন্ট থমাস গীর্জা, গভঃ স্কুল, দেশীয় হাসপাতাল এবং বেশীরভাগ ইউরোপীয়দের বাড়ীঘর অবস্থিত।[২১০] এক সময় ভিক্টোরিয়া পার্কের দক্ষিণে রাস্তার অপর পাশে ঢাকার ইংরেজ সাহেবরা পুনরায় একটি ক্লাবঘর তৈরী করেন। ক্লাবটি প্রধানত ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতো।[২১১] আন্টাঘর ময়দানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও করুণ ঘটনা ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়। ২২ নভেম্বর ১৮৫৭- এর যুদ্ধে লালবাগের সিপাইরা পরাস্ত হলে আহত ও পলাতক সেপাইদের ধরে এনে ইংরেজরা প্রহসনমূলক বিচার করে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল। এই আন্টাঘর ময়দানেই উক্ত সেপাইদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া এবং তাঁদের লাশগুলো এখানকার গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[২১২] সেপাইদের লাশগুলো বহুদিন যাবৎ গাছে ঝুলে থাকায় পঁচাগন্ধে এ এলাকা দিয়ে মানুষের যাতায়াত ও বসবাস কঠিন হয়ে পড়ে।[২১৩] এর পর আন্টাঘর ময়দান নিয়ে অনেক ভৌতিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন ভয়ে সন্ধ্যার পরে এর ধারে কাছে ঘেঁষতো না।[২১৪] লোকেরা বলতো সেপাইদের অতৃপ্ত আত্মা এখানে ঘোরাফেরা করতো এবং অনেক রাতে ভাইরে ভাইরে ... ইত্যাদি আর্ত চীৎকার শোনা যেতো।[২১৫] সিপাহী বিদ্রোহ দমনে তাঁদের নিহত সৈন্যদের স্মরণে ইংরেজরা আন্টাঘর ময়দানে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন। এই নির্মাণ কাজে ঢাকার নওয়াববাড়ীর কিছু যুবক সহযোগিতা করেছিল বলে জানা যায়।[২১৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে কোম্পানীর নিকট থেকে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এই আন্টাঘর ময়দানেই ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সম্রাজ্ঞীর সেই ঘোষণাপত্র (ইংরেজী ও বাংলায়) পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। তখন থেকে এ ময়দানটির নামকরণ হয়েছিল 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'।[২১৭] এরপর ঢাকার নওয়াব আব্দুল গণির ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সাহায্য-সহযোগিতায় এই পার্কের উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।[২১৮] ১৮৮৪ খ্রীঃ নওয়াব আহসানুল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা হাফিজুল্লাহ মাত্র ১৬ বছর বয়সে হঠাৎ মারা গেলে নওয়াব বাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে আসে।[২১৯] নওয়াবের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে খাজা হাফিজুল্লাহর স্মরণে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীঃ মংগলবার বিকেল সাড়ে চারটায় বংগের ছোটলাট সাহেব এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্মৃতি স্তম্ভটি উদ্বোধন করেন।[২২০] উক্ত পার্কের দক্ষিণাংশে গ্রানাইট পাথরের তৈরী উক্ত স্মৃতি স্তম্ভটি আজো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগাত্রের মাঝখানে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ইংরেজীতে নিম্নোক্ত তথ্য লেখা আছে ঃ

পূর্বদিকে ঃ- "In token of sympathy with the Nawabs Abdul Ghunny and Ahsunullah this obelisk has been erected by their European friends in affectionate rememberance of Khajeh Hafiz Ullah. July 8th 1884."

পশ্চিম দিকে ঃ- "To Khajeh Hafiz Ullah son of Nawab Ahsunullah Khan Bahadur and grandson of Nawab Abdul Ghunny C.S.I. Born 28th January, 1868, died 8th July, 1884."[২২১]

ঢাকার নওয়াবদের পুরানো এ্যালবামে শিকারীর বেশে তরুণ খাজা হাফিজুল্লাহর একটি সুন্দর আলোকচিত্র পাওয়া গেছে। পরিশিষ্টে চিত্র নং ৯০ ও ৯১ পৃঃ৭৮৫ তে খাজা হাফিজুল্লাহর ছবি এবং উক্ত স্মৃতিস্তম্ভের পুরানো ছবি দেয়া হলো। উক্ত খাজা হাফিজুল্লাহর নামে মাদারীপুরে মসজিদ ও মাদ্রাসা এবং হাজিগঞ্জ দূর্গে অট্টালিকা তৈরী করা হয়েছিল একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে নওয়াব আহসানুল্লাহ ভিক্টোরিয়া পার্ক উন্নয়নে ১২ হাজার টাকা দান করেন।[২২২] ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ইংলিশ[২২৩] ভিক্টোরিয়া পার্কের উন্নয়নের জন্য ১৫২২ টাকা দান করেন। যাদ্বারা লোহার রেলিং বেষ্টিত স্থানে নানাবিধ বৃক্ষলতাদি রোপিত হয় এবং একটি কৃত্রিম ঝর্ণাও নির্মাণ করা হয়।[২২৪] ১৬ মার্চ ১৯০৬ খ্রীঃ নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ জানের উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ইংলিশের বিদায় উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া পার্কে একটি উদ্যান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। এতদুপলক্ষে পার্কের চতুর্দিকে রংগিন কাগজ ও কাপড়ের আবরণ দিয়ে অনুষ্ঠানটি বাইরের লোকের দৃষ্টির আড়াল করা হয়েছিল। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।[২২৫]

২১ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ বিকেল ৪টায় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নওয়াব খাজা মোহাঃ ইউসুফজান মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের সম্বর্ধনার জন্য ভিক্টোরিয়া পার্কে এক উদ্যান সম্মিলনীর আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে পার্কটি নানা রংগে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ইউরোপীয় এবং দেশীয় বহু ভদ্র মহিলাসহ উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পার্কের নানা স্থানে বসার আসন সজ্জিত করা হয়। সমাগত অতিথিদের চিত্ত বিনোদনের জন্য ম্যাজিক, বাদ্য ও নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[২২৬] তৎকালে ঢাকার গণ্যমান্য লোকেরা এই পার্কে প্রায়ই অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতেন। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের শত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে উক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশীয় শহীদদের স্মরণে এখানে একটি বৃহৎ স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন। উক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের নামানুসারে পার্কটির নতুন নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'।[২২৭] পার্কটি আজো পুরানো ঢাকার অধিবাসীদের চিত্তবিনোদন ও মুক্তবায়ু সেবন কেন্দ্র গুলোর অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

১১(৩) পশুপাখী পালন ও চিড়িয়াখানা তৈরী ঃ

এদেশের আরসব ধনী ব্যক্তিদের মত ঢাকার নওয়াবগণও শখ করে নানা জাতের পশুপাখী পালন করতেন। তবে অন্যদের থেকে তাঁদের এ কাজে বেশ পার্থক্য ছিল। কেবলমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত সাধ মেটাবার জন্যই তাঁরা একাজ করতেন না বরং দেশবাসী জনসাধারণকেও সেগুলো উপভোগ করানোর সুব্যবস্থা করতেন। পূর্ববাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারি পরিচালনা করা এবং নওয়াবী ঠাঁটবাট বজায় রাখার জন্য খাজা আব্দুল গণিকে প্রচুর হাতী-ঘোড়া সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ঢাকার নওয়াবগণ হাতী ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করতেন এবং শিকারে যেতেন। তাঁদের মোট কতগুলো হাতী ছিল তা জানা যায়নি। ১৮৮৩ খ্রীঃ ১১ নভেম্বর নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন, সেদিন আশুরার রাতে তাঁর বাড়ীতে ৬৬টি হাতীর সমাগম হয়েছিল।[২২৮] ঝড়, ঝঞ্জা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দুর্যোগকালে ঢাকার নওয়াবরা তাঁদের হাতীঘোড়া জনকল্যাণে খাদ্য দ্রব্য ও রসদাদি পরিবহনের কাজে লাগাতেন। অনেক সময় সরকারী কাজেও এগুলোকে দেয়া হতো। আগেই বর্ণিত হয়েছে নাগা বিদ্রোহ দমন যুদ্ধের সময় নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর সবচেয়ে ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৫টি শিকারী হাতী সরকারকে ব্যবহার করতে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুভার্গ্যবশত হাতীগুলো পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।[২২৯]

হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য এক সময় সরকারী হাতী পাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার একাজে হাতী দেয়া বন্ধ করলে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ভাওয়াল রাজ ও ঢাকার নওয়াবের ১০টি হাতী জন্মাষ্টমীর মিছিলে ব্যবহার করা হয়েছিল।[২৩০] ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেও অনুরূপ জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য নওয়াব ও রাজার ১৪টি হাতি সাজানো হয়েছিল। ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় নওয়াব এস্টেটের বড় বড় কাচারী এলাকায় নওয়াবের হাতী রাখার সুব্যবস্থা ছিল। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিমে নওয়াবদের হাতীর খাদ্য গুদাম ছিল। বর্তমান আজাদ পত্রিকা অফিসসহ পার্শ্ববর্তী আরো কিছু এলাকায় ঐসব হাতী রাখা হতো।[২৩১] নরসিংহ মুন্সী নামক একজন প্রবীণ ব্যক্তি নওয়াবদের উক্ত পিলখানার দারোগা ছিলেন।[২৩২] তাঁদের হাতির মাহুতদের মধ্যে মান্নান মাহুত ও মগা মাহুতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৩৩] ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা বড় জলাশয় ছিল যাতে নওয়াবের হাতীগুলোকে স্নান করানো হতো। ঐ জলাশয়ের এক কোনায় হাতীর মলমূত্র ও বর্জ্য ফেলা হতো।[২৩৪]

১৯০৫ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত জলাশয়টি পুনর্খনন করে একটি বড় দিঘীতে পরিণত করেন।[২৩৫] এতে স্থানীয় লোকজনের দীর্ঘদিনের পানির অভাব দূর হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কারাভাবে ভরাট হয়ে সেটা পুনরায় মজাপুকুরে পরিণত হতে থাকে। বিগত আশির দশকে ঢাকা পৌরসভা পুকুরটিতে আবর্জনা ও মাটি ফেলে ভরাট করে স্থানটিকে একটি খেলার মাঠে পরিণত করেছে। ঢাকার নওয়াবদের প্রচুর সংখ্যক ঘোড়া ছিল। সেকালে উন্নতমানের রাস্তাঘাট না থাকায় স্থলপথে দ্রুত গমনাগমনের জন্য ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক বাহন। এছাড়া জমিদারির ঠাঁট-বাঁট ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্যও হাতী-ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল। ইতোপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নওয়াব আব্দুল গণির পিতা খাজা আলীমুল্লাহ পশ্চিমা ঘোড়া ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে অনেকগুলো উন্নত মানের আরবী ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন।[২৩৬] নওয়াব আঃ গণি রেসের জন্য আরব, ইংলিশ, অষ্ট্রেলিয়ান, কেপস, ওয়েলার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতের অনেকগুলো ঘোড়া সংগ্রহ করেছিলেন।[২৩৭] আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ভবনের উত্তর আংগিনায় একটি আস্তাবল ছিল। সেখানে কমপক্ষে ত্রিশটি ঘোড়া রাখা যেত।[২৩৮] এছাড়া শাহবাগের কাঁটাবন এলাকায় নওয়াবদের একটি বড় ধরণের আস্তাবল ছিল।

১৮৭৫ খ্রীঃ নওয়াব উপাধি পাওয়ার পর ইংরেজ সরকার খাজা আব্দুল গণিকে ঘোড় সওয়ার সেপাই পরিবেষ্টিত অবস্থায় চলাচলের অধিকার দেয়। এজন্য সরকার তাঁকে ৭ জন পশ্চিমা তুরুক-সওয়ারও দিয়েছিলেন।[২৩৯] ঘোড়দৌড়ের জন্য তাঁরা রেংগুন ও কলকাতা থেকেও ভাল জাতের ঘোড়া আনতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় আর্থিক টানা পোড়েনের কারণে এস্টেটের ঐসব সৌখিন ও ব্যয়বহুল হাতী, ঘোড়া প্রায় সবই বিক্রি করে দেয়া হয়। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাই নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ তাঁকে এস্টেটের সব গাড়ী-ঘোড়া বিক্রি করে দিতে নোটিশ দেন। নতুবা তাঁর সম্পত্তির অংশ থেকে তিনি ঐগুলোর ব্যয় বহনে দায়ী থাকবেন না বলে জানিয়ে দেন।[২৪০]

হাতী ঘোড়া ছাড়াও ঢাকার নওয়াবগণ হরিণ, কুকুর, খরগোশ, বনমোরগ, তিতির ও নানাজাতের পশু-পাখী পালন করতেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর অনেকগুলো পোষা ও শিকারী কুকুর ছিল। তিনি এদের আদর করতেন এবং বাড়ীর ছাদে ও রমনার মাঠে তাদের চরাতেন।[২৪১] কুকুরগুলো বিভিন্ন খেলায় ও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতো। ১৮৮৩ খ্রীঃ জুনমাসে নওয়াব আহসানুল্লাহর চারটি কুকুর কলকাতায় এক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে। এদের মধ্যে জ্যাক নামক কুকুরটি পেয়েছিল প্রথম পুরস্কার। এছাড়া ড্যাস, হিলদা ও স্মোকার পেয়েছিল দ্বিতীয় পুরস্কার।[২৪২] শাহবাগ, দিলখুশা ও বাইগুনবাড়ীতে তাঁদের ময়ুর খরগোশ ও মোরগের খোঁয়াড় ছিল। নওয়াব আহসানুল্লাহর ডাইরী থেকে জানা যায়, তিনি ময়ুরের নাচ দেখতেন, আবার বাইগুনবাড়ী গিয়ে শিকার করে তিনি ময়ুরের কাবাবও খেতেন।[২৪৩] উক্ত ডাইরী থেকে আরো জানা যায় যে, ১৮৮৩ সালে শাহবাগে চিড়িয়াখানার জন্য একটি নতুন ঘরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।[২৪৪]

১২৮০ বাংলা সন মোতাবেক ১৮৭৩ খ্রীঃ নওয়াব আব্দুল গণি শাহবাগে বাগানবাড়ী তৈরীর পর পরই সেখানে একটি চিড়িয়াখানা তৈরী শুরু করেন।[২৪৫] বহু অর্থ ব্যয় করে দেশ-বিদেশ থেকে তিনি নানা জাতের পশু-পাখী সংগ্রহ করেন। এগুলোর জন্য পৃথক পৃথক খাঁচা ও পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শখ মেটানো নয় বরং প্রাণিজগৎ সম্পর্কে সর্ব সাধারণের জ্ঞানদান ও আনন্দ উপভোগ করানোর জন্যও তাঁরা চিড়িয়াখানাটি তৈরী করেছিলেন। সমসাময়িক বিভিন্ন লেখকদের লেখা এবং পত্র-পত্রিকা থেকে শাহবাগে ঢাকার নওয়াবদের উক্ত চিড়িয়াখানা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন, "শাহবাগ বাগানবাড়ীতে স্বতন্ত্র বেষ্টনীর মধ্যে একটি চিড়িয়াখানা ছিল। তাতে পোষা হতো নানা প্রকার পশু পাখী। এদের জন্য ছিল লোহার শলাকা ও জালযুক্ত কুঠরী সমূহ। ১৮৮৮ খ্রীঃ আমি সেখানে বাঘ, ভালুক, উটপাখী এবং বিভিন্ন জাতের বানর দেখেছিলাম।"[২৪৬] ঢাকার এককালের নামকরা চিকিৎসক বাবু কৈলাস চন্দ্র সেনের কন্যা মনোদাদেবী ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "আর মনে পড়ে রমনার মাঠে নওয়াবের চিড়িয়াখানা। যখন সবাই মিলে দেখতে যেতাম, কত জীবজন্তুর সমাবেশ কত রকম পাখী, বানর, বাঘ, সিংহ। বিশেষ করে সেই চিড়িয়াখানার মাঠ জুড়ে যখন বিরাট বিরাট উটপাখীগুলো দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করে বেড়াতো, তখন খুবই আনন্দ পেতাম। তারপরে বাঁধানো বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে দেখতাম কত লাল, সাদা, কালো, রঙ-বেরঙয়ের মাছের খেলা। আমরা সেই চৌবাচ্চার জলে খই ছিটিয়ে দিতাম। তৎক্ষণাৎ দেখতাম মাছগুলো জলের মধ্যে থেকেই যেন আমাদের অতি নিকটে এসে পড়তো। আমরা ঐ তামাশা দেখার জন্য আরো খই ছিটিয়ে দিতাম। বানরদের আমরা প্রচুর কলা দিতাম এবং ওদের নানারূপ অংগভংগি দেখে আনন্দ পেতাম।"[২৪৭]

উক্ত লেখকদের লেখা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, নওয়াবদের উক্ত চিড়িয়াখানাটি সাধারণ লোকের দেখার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং নিশ্চয়ই তা ছিল বিনামূল্যে। সরকারীভাবে চিড়িয়াখানা তৈরী করে জনগণের চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে প্রাণিবিদ্যার প্রসার ঘটানো তখনো এতদাঞ্চলে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ বিষয়ে লোকদের জানার উৎসাহ নিশ্চয়ই কম ছিল না। তাই এভাবে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে দেশবাসীর এতটুকু জ্ঞানার্জনের সুযোগ করে দেয়াটা ঢাকার নওয়াবদের জন্য ছিল একটি বড় কৃতিত্ব। নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর উক্ত চিড়িয়াখানার জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে বাড়ীতে পোষার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে পশু-পাখী আমদানী করতেন। ১৯০০ খ্রীঃ তিনি তাঁর এস্টেটের নবনিযুক্ত চীফ সেক্রেটারী মিঃ ডি. আর. লায়ালের মাধ্যমে বিলাত থেকে বিলাতী কুকুর আনার জন্য ৮ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন।[২৪৮] এর আগেও তিনি অন্যূন ৫০ হাজার টাকা খরচ করে সিংহ, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি পশু আনিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[২৪৯]

ঢাকার নওয়াবগণ কেবলমাত্র খাঁচার বদ্ধ পরিবেশেই পশু-পাখী পালন করতেন না। দেশ বিদেশ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের হরিণ, মোরগ, মুরগী, তিতির ইত্যাদি এনে তাঁরা শাহবাগসহ তাঁদের সংরক্ষিত বন এলাকায় ছেড়ে দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য ছিল ভালজাতের পশু-পাখীর বংশ বৃদ্ধি করে শিকারের উপযোগী করা। এই প্রেক্ষিতে নওয়াব আহসানুল্লাহ তাঁর ঐসব পশু-পাখী শিকার নিষিদ্ধ করে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন।[২৫০] এছাড়া সেগুলো নির্বিঘ্নে বংশ বিস্তার করতে পারলে নওয়াবের সাথে অন্যরাও শিকার করতে পারবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন।[২৫১]

নওয়াব সলিমুল্লাহর সময়ে ১৯০৪ খ্রীঃ তোলা একটি পুরানো ছবিতে দেখা যায় শাহবাগ বাগানবাড়ীর মাঠে নওয়াবের পোষা একপাল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে।[২৫২] নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর থেকেই নওয়াব এস্টেটের অবনতির সাথে সাথে শাহবাগের চিড়িয়াখানাও অর্থাভাবে শ্রীহীন হতে থাকে। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

শাহবাগের তুলনায় বাইগুনবাড়ীতে বন্য-প্রাণী পালনের মত পরিবেশ বেশী উপযুক্ত ছিল। সেখানে ঢাকার নওয়াবরা এক বিস্তীর্ণ বনভূমি বন্য পশু-পাখীদের জন্য অভয়ারণ্য বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আগেই বর্ণিত হয়েছে ঢাকার নওয়াবগণ তাঁদের বন্ধু ও উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদের বাইগুনবাড়ীতে তাঁদের সংরক্ষিত বন এলাকায় নিয়ে শিকারের আনন্দ উপভোগ করাতেন।[২৫৩] দিলখুশা বাগানবাড়ীতে থাকাকালে নওয়াব আহসানুল্লাহ সেখানকার দানা দিঘীতে পোষা মাছের জন্য প্রতিদিন খাবার দিতেন। এছাড়া দিলখুশায় প্রাসাদ এলাকায় একটি বড় চৌবাচ্চায় কয়েকটি কুমীর পালন করা হতো। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই সেগুলো দেখতে আসতো।[২৫৪] ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের নিকট থেকে জানা যায়, আহসান মঞ্জিল মূল প্রাসাদ এলাকায় বেশ কয়েকটি চিত্রা হরিণ ও ময়ূর ছেড়ে দেয়া থাকতো। ঐগুলো প্রাসাদ ভবনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পানির ফোয়ারার আশে-পাশে ধীরপদে চলাচল করতো। কখনো আবার ছুটাছুটি করে বাগানের শোভা বর্ধন করতো।[২৫৫] এছাড়া নওয়াব বাড়ীর গোল তালাবের উত্তর পশ্চিম পাড়ে এস্টেটের ব্যয়ে বেশ কয়েকটি কুঠরী সম্বলিত একটি কুকুরশালা তৈরী করা হয়েছিল। যেখানে নওয়াববাড়ীর বিভিন্ন শরীকদের পোষা কুকুর রাখা হতো।

শুধুমাত্র দেশেই নয় বিদেশেও প্রাণিবিদ্যা প্রসারের জন্য ঢাকার নওয়াবগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। কলকাতার আলীপুর চিড়িয়াখানার উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবগণ অনেক অর্থদান করেছিলেন। তাঁদের দানের তালিকা থেকে জানা যায়, নওয়াব আব্দুল গণি এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ কলকাতার জুলজিক্যাল গার্ডেনের জন্য ১১,৩০০ টাকা দান করেছিলেন। এছাড়া তাঁরা কলকাতার আলীপুর চিড়িয়াখানায় একটি সর্পনিবাস তৈরীর জন্য ২,০০০ টাকা দান করেছিলেন।[২৫৬]

১৯০২ খ্রীঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ কলকাতার আলীপুর চিড়িয়াখানার ভল্লুক নিবাসের উন্নতির জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করেন।[২৫৭] পরের বছরেই নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর দাদা মরহুম নওয়াব আব্দুল গণির নামে আলীপুর চিড়িয়াখানায় একটি পৃথক পশুশালা নির্মাণের জন্য ২০ হাজার টাকা দান করে।[২৫৮]

গৃহপালিত পশুপাখী ছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ঢাকার নওয়াবদের গৃহীত ব্যবস্থাদি এদেশে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। তাঁরা অপ্রয়োজনে পশু পাখী বধ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। সেযুগে চিড়িয়াখানা তৈরী করে তাঁরা জনসাধারণের প্রাণিজগৎ সম্পর্কে যে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন সেটা খুবই যুগোপযোগী ছিল। এছাড়া অত্র অধ্যায়ে আলোচিত ঢাকার নওয়াবদের নির্মিত বাগান ও বাগানবাড়ীগুলো বাংলার মুসলমানদের সমাজ জীবন ব্যবস্থায় নানাভাবে সহায়তা করেছিল। বিশেষ করে দিলখুশা ও শাহবাগ বাগানবাড়ী দুটোতে তৎকালে এতদাঞ্চলের প্রায় যাবতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হতো। ঢাকার নওয়াবদের প্রত্যক্ষ তদারকিতে অনুষ্ঠিত ঐসব অনুষ্ঠানাদি থেকে এতদাঞ্চলের মুসলমানেরা জীবনচলার পথের নানা দিক নির্দেশনা পেত। নওয়াবদের নির্মিত অন্যান্য বাগান ও পার্কগুলোতে স্থানীয় লোকেরা অবসর সময় কাটিয়ে পরিমল আনন্দ লাভ করতো। ঐসব বাগান ও পার্কে থাকা পুকুরগুলো লোকদের মিঠাপানির চাহিদা মেটাতো। সার্বিক বিচারে তাই ঐসব বাগান ও বাগানবাড়ীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬ এবং *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ৮৭ ক্রমিক ২১৮ এবং ১৯০।

২। আজিমুশ্শান, *ঢাকা-রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১।

৩। মুনতাসীর মামুন তাঁর বর্ণনায় শাহবাগ বাগানবাড়ীর দ্বার নওয়াব আহসানুল্লাহর সময় থেকেই সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল বলে তথ্য দিয়েছেন তা সত্য নয়। কারণ তিনি তাঁর গ্রন্থে পরক্ষণেই শাহবাগ সম্পর্কে অধ্যাপক অমূল্য কুমার দত্তগুপ্তের লেখার যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতেই বলা হয়েছে ... জনসাধারণের ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই। (মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৯)।

৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জানুঃ ১৯০৮

৫। তবে তখনো আবার ঐ সব ভ্রমণকারীদের পর্দার খাতিরে সাধারণ লোক সেখানে ঢুকতে পারতো না। ঢাকা প্রঃ ১ ডিসেঃ, ১৯২১ পৃঃ ৩

৬। সুজাত খান ঢাকায় মারা যান, তাঁর মাজারও এই চিশতিয়ান মহল্লায় আছে। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৬ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪২ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩১ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগানে ঢাকা,* বংগানুবাদ- মওলানা আকরাম ফারুক ও রুহুল আমীন চৌ; *ঢাকা,* আগস্ট ১৯৯০ পৃঃ ৫৫ এবং দানী, *ঢাকা,* ২য় সংস্করণ ১৯৬২ পৃঃ ৩৫ ও ৭৬ এবং ১৭২।

৭। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত ২৪৩ এবং তৈফুর, *ঢাকা-* ৩৩৫। আজিমুশ্শানের মতে, বর্তমান হাইকোর্ট এলাকার সাথে রমনাগ্রীন, রেসকোর্স ময়দান হয়ে নিমতলি কুঠি পর্যন্ত বাগ-ই-বাদশাহির বিস্তৃতি ছিল। আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৬।

৮। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৫ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৭।

৯+১০। আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৭ এবং মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ২৪৩, শাহবাগের এসব ক্যানেল রমনা গ্রীণ হয়ে সেগুনবাগিচা ও পুরানো পল্টনের মধ্য দিয়ে শেষে মতিঝিল চলে গিয়েছিল (দানী, *ঢাকা* ২য় সংস্করণ পৃঃ ৫) অবসরকালে মোগলরা এসব বাগানে এসে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে সময় কাটাতেন। দানী, *ঢাকা,* ঐ পৃঃ ৭৬-৭৭ এং ১৭২।

১১। দানী, *ঢাকা,* ২য় সংস্করণ পৃঃ ৭৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০। তৈফুর সাহেব বলেন, ১৮২৫ খ্রীঃ রমনা রেসকোর্স স্থাপনকালে ডস সাহেব চিশতিয়ান মহল্লাস্থ মসজিদ ও-পাকা ভবনাদি নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিলেন। (তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৬) আজিমুশ্শান, *সিভিক বডি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯২ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮।

১২। হাকিম, হা, রহমান, *পাঁচাস বরস,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ৩ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫১, ৩৪১ এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫ ও ২৪৬ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১।

১৩। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪১ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৫৮।

১৪। প্রফেঃ শরিফুদ্দিন ও প্রফেঃ মামুন উক্ত বাগানবাড়ী খাজা আব্দুল গণি কিনেছিলেন বলে যে তথ্য দিয়েছেন (মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ২৪৬ ও ২৮৮ এবং শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৩১) তা হয়তো সঠিক নয়। কারণ ১৮৪৪-৪৫ সালে আঃ গণি খাজা পরিবারের কর্তৃত্ব না পাওয়ায় তাঁর পক্ষে নিজের নামে জমি কেনা সহজ ছিল না। তাই পরিবারের কর্তা হিসেবে খাজা আলীমুল্লাহই হয়তো উক্ত সম্পত্তি কিনে থাকবেন।

১৫। সাবা, *তারিখ,* প্রাগুক্ত ১৩০ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *নওঃ আঃ গণি ও আহঃ,* পৃঃ ২৩। অতএব নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির হিসাবের মধ্যে রেসকোর্সের অন্তর্ভূক্তি দেখে সেটা তাঁরা হয়তো সরকারের কাছ থেকে কোন সময়ে লীজ নিয়েছিলেন বলে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ও মামুন যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৮। উল্লেখ্য, ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূমিকম্পে আহসান মঞ্জিলের বেশ ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের ভয়ে নওয়াব আহসানুল্লাহ রমনার খোলা মাঠে খড়ের আটচালা বানিয়ে বসবাসের সংকল্প করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২০ জুন, ১৮৯৭ পৃঃ ৭। রমনার মাঠ নিজের মালিকানায় না থাকলে নওয়াব সাহেব নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনা করতেন না।

১৬। এজন্য শাহবাগে মোট ৯টি দলিলের মাধ্যমে ২০১ বিঘা জমি কেনা হয়। দলিলগুলোর আর.আর. নং ছিল ১০৬, ১১০, ১১৬, ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮ এবং ৩৭৫। ঐ আমলে এস্টেটের মোতাওয়াল্লী হিসেবে একক হাতে একরূপ বিনা কৈফিয়তে এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি পরিচালিত হতো বিধায় এবং পারিবারিক এ্যাজমালি ফান্ডগুলোর মধ্যে তীব্র পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র না থাকায় কোন্ ফান্ড থেকে উক্ত জমিগুলো কেনা হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। তবে এর এক তৃতীয়াংশ গোবিন্দপুর পরগনার ৪৯ নম্বর তৌজির অন্তর্গত ছিল যা (ই) ফান্ড প্রপার্টি বা নওয়াব আহসানুল্লাহর নিজ সম্পত্তি থেকে কেনা হয়েছিল। (*পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৩৯) আরেকটি সূত্র থেকে জানা যায়- আটিয়ার ৭ আনা সম্পত্তি যা খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৫৪ খ্রীঃ ১ জুন আল্লাহর নামে ওয়াকফ করেছিলেন, আব্দুল গণি ও আহসানুল্লাহ ঐ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী থাকাকালে এর লভ্যাংশ থেকে শাহবাগ বাগানবাড়ীর সম্পত্তি ও তন্মধ্যস্থিত ইমারত পুকুর ক্রয় করা হয়। (*পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত সি-পৃঃ ৬-৯ দ্রঃ)।

১৭। উক্ত সমাধি সৌধটি শাহবাগ বাগানবাড়ীর গোল পুকুরের পূর্বদিকে বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকেও অটুট ছিল। হাকিম হাবিবুর রহমান, *আসুদগানে ঢাকা,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ৭৫।

১৮। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত, ডি-পৃঃ ৩৯। আব্দুর গফুর নাসসাখের লেখা উদ্ধৃত করে প্রফেসর আব্দুল্লাহ শাহবাগের নির্মাণকাল ১৮৭৪ খ্রীঃ বলেছেন (আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১)।

১৯। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

২০। ঢাকার সাব জজ কোর্টে ১৮৯৫ খ্রীঃ দায়েরকৃত নওয়াবদের এক পারিবারিক মোকদ্দমার প্রয়োজনে (স্যুট নং- ৯৬/১৮৯৫) তৈরীকৃত একটি পুরানো দলিলে শাহবাগ বাগানবাড়ীর সীমানা চিহ্নিত করতে গিয়ে এর চৌহদ্দির যে বর্ণনা ও মূল্যমান দেয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ "ঢাকার শহরিস্থ সদর থানার মোতালক শাহবাগ বাগানবাড়ী, তাহার চৌহদ্দি ঃ- সড়কের লাগ পশ্চিম, গল্পি সড়কের লাগ উত্তর, কাওরানের জমি লাগ দক্ষিণ, কুচা সড়কের ও পতিত জমির লাগ পূর্ব- এই চৌহদ্দিস্থিত দোতলা- একতলা দালান, প্রাচীর, পুস্করিনী, ঘাটলা ইত্যাদি সর্বপ্রকার হকিয়ত হায়। ১,০০,০০০/- টাকা। দেখুন- *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ৮৭ (ক্রমিক নং- ২১৭)।

২১। এ রংগিন চিত্রটি নওয়াবদের পুরানো এ্যালবাম থেকে সংগৃহীত মূল সাদাকালো আলোকচিত্র থেকে তৈরী অনুকৃতি, যা এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

২২। ১৯০৬ খ্রীঃ এ দরবার কক্ষেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মুনতাসীর মামুন যে তথ্য দিয়েছেন (মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১) তা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ ডেলিগেট ও অতিথিসহ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় দুই হাজার লোক নিয়ে এই কক্ষে সভা করা সম্ভব ছিল না বিধায় তাঁদের জন্য এই কক্ষের বাইরের প্রাংগনে সামিয়ানা টাঙিয়ে মঞ্চ তৈরী করতে হয়েছিল। তবে ঐ সময় এ দরবার কক্ষটি সহযোগী সভাকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। সামিয়ানাতলে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবিত মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাবটি হাকিম আজমল খা সমর্থন করছে এরূপ একটি কল্পিত চিত্র পরিশিষ্টে চিত্র নং ৭৮ - এ দেয়া হলো।

২৩। ঢাকা নওয়াব এস্টেটের পুরানো অফিস, এডওয়ার্ড হাউস থেকে উদ্ধারকৃত উক্ত ভবনের একটি দুষ্প্রাপ্য সাদাকালো আলোকচিত্র এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। উক্ত আলোকচিত্রের ক্যাপশনে ভবনটিকে স্কেটিং প্যাভিলিয়ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২৪। তথ্যটি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর পুত্র খাজা মাসুদ নসরুল্লাহর মুখ থেকে শ্রুত (১৯৯৪)

২৫। হাকিম হাবিবুর রহমানের বর্ণনা থেকে জানা যায় শাহবাগ বাগানবাড়ীতে নিশাত মঞ্জিল নামে একটি জাঁকালো দ্বিতল ভবন ছিল। সেখানে জাদুঘরের ন্যায় বহু আজব নিদর্শন সংগৃহীত ছিল। (*পাচাঁস বরস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১) আলোচ্য দ্বিতল ভবনটিই নিশাত মঞ্জিল ছিল কিনা তা সন্দেহাতীত ভাবে বলা না গেলেও ঐ ভবনটির পাশেই এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশ-বিদেশের ঐতিহ্য ও আজব সব নিদর্শনের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর'।

২৬। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস পাহলে,*প্রাগুক্ত রেজাউল করিমের বংগানুবাদ,পৃঃ ৮১ এবং ঐ,হাসেম সুফীর বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২১।

২৭। ছবিটি নওয়াব এস্টেট অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে উদ্ধারকৃত। অবশ্য অনুরূপ ছবি প্রফেসর মুনতাসীর মামুন তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন (মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৮) হাকিম হাঃ রহমানের ঢাকা, পাঁচাস বরস পাহলে বইটির আরেকজন বংগানুবাদক জনাব হাসেম সুফী তাঁর গ্রন্থে ছবিটি প্রকাশ করে সেটাকে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইনস্টিটিউটের পিছনে বর্তমানে পানিশূন্য পুকুরটির সাথে অভিন্ন বলে যে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ছবিতে প্রদত্ত স্থাপত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত দেখে তা সঠিক বলে মনে হয়না। তবে ১৮৯০ খ্রীঃ ১ জানুঃ শাহবাগে অনুষ্ঠিত মেলার সময় যে দ্বীপকার চত্বরে বাইজী ইলহিজানের নাচ দেখতে গিয়ে লোকের ভীড়ে যে পুলটি ভেংগে পড়েছিল, সেটার সাথে এটি অভিন্ন হতে পারে। সেটি পরবর্তীতে মজবুত করে সংস্কারের পর তা ছবির দৃশ্য পেয়েছিল হয়তো। এছাড়া ছবিতে তালাবের অপর পাড়ে যে এক তলা তিন খিলানী ভবনটি দেখা যাচ্ছে সেটা হাকিম হাবিবুর রহমানের বর্ণিত নুরুদ্দিন হুসাইনের মাজার হতে পারে।

২৮। আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত পুরানো কাগজ পত্রের মধ্যে শাহবাগের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের জন্য কয়লা ক্রয় এবং খরচের হিসাব নিকাশের বিষয়ে চীফ ম্যানেজারের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহর বিনিময়কৃত পত্রের কপিও রয়েছে।

২৯। হাকিম হাঃ রহমান, *ঢাকা পাঁচাস বরস,* প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ৮১ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫। তৈফুর সাহেব ১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী থেকে মেলা শুরুর কথা লিখেছেন। যতীন্দ্র মোহনও ১৮৭৭ খ্রীঃ থেকে শাহবাগ মেলা শুরু হওয়ার কথা বলেছেন (যতীন্দ্রমোহন প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩)।

৩০। ঢাকা- *ডিঃ গেজেটিয়ার,* ১৯৬৯ পৃঃ ১০৪ এবং আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সুধী,* পৃঃ ৩৭।

৩১। ঢাকা প্রকাশ, ২২ নভেঃ ১৮৭৯ এবং ১৮ ডিসেঃ ১৮৮১, ৯ ডিসেঃ ১৮৮৮ এবং ১৭ ও ২৩ নভেঃ ১৮৭৮ দ্রঃ

৩২। *ঢাকা ডিঃ গেজেঃ,* ১৯৬৯ পৃঃ ৩১৭ এবং হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেঃ করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১।

৩৩। হাকিম হাঃ রহমান, *ঢাকা পাঁচাস বরস,* রেঃ করিমের প্রাগুক্ত বংগানুবাদ, পৃঃ ৮১, এবং হাসেম সুফীর বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

৩৪। হাকিম হা, রহমান, *পাঁচাস বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, বাংলা একাডেমী, ডিসেঃ ১৯৯৫ পৃঃ ৮১-৮২।

৩৫। হাকিম হা. রহমান, *পাঁচাস বরস পাহলে,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২। ঢাকা প্রকাশ ঐ দুর্ঘটনার বিবরণ প্রায় অনুরূপই প্রকাশ করে। তাঁরা আরো লেখেন যে, পরদিন দুটো বালকের মৃতদেহ ভেসে উঠে। কিন্তু আর কার কি সর্বনাশ হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি (ঢা, প্রকাশ, ৫ জানু, ১৮৯০) হাকিম সাহেব লিখেছেন, উক্ত প্রাণহানির পর বাস্তব ক্ষেত্রে মেলাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। এটা সম্ভবত ঐ বারের মেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ এর পরেও বহুবার পয়লা জানুয়ারীতে শাহবাগের মেলার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঢা, প্রঃ ৪ জানুঃ ১৯০৩ পৃঃ ৪ দ্রঃ। তবে দুর্ঘটনার পরের বছর মেলাটি দিলখুশাতে লাগানো হয়েছিল। ঢা, প্রঃ, ৪ জানুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৬

৩৬। মনোদা দেবী, জনৈকা গৃহবধুর ডাইরী, ১৩৮৯, থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১-৯২। এই স্মৃতিচারণ খুব সম্ভব ১৮৮৫-৮৬ সালের হবে।

৩৭। উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর আত্মজীবনী (দাস্তান-ই-ইবরাতবার) বংগানুবাদ করেছেন, মোঃ আব্দুল্লাহ, *উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী,* ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৪ পৃঃ ১৪, ২৪ ও ১৪৯। কবিতাটি উবায়দীর ফার্সী কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়। দীওয়ানই উবায়দী (ফার্সী) পৃঃ ১৩৭, উদ্ধৃত - আব্দুল্লাহ, ঐ দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ফেব্রুঃ ১৯০৯ পৃঃ ৩। ১৯০৭ খ্রীঃ এক হিসেবে দেখা যায় শাহবাগ বাগানবাড়ীর জন্য সেবার আনুসাংগিক খরচের পরিমাণ ছিল ১৮২২ টাকা ১০ আনা ৩ পাই। *পুরানো দলিল,* আহসান মঞ্জিলে সংরক্ষিত দ্রঃ।

৩৯। ১৯৩০ সালে খোদেজা বেগম তাঁর অংশ পরীবানুর পুত্র-কন্যা খাজা সদরুদ্দিন ও জুলেখা বানুকে দিয়ে দেয়। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ সি- ২৪, এবং ডি- ৪৫। শাহবাগে মোট জমির পরিমাণ ছিল ২০১ বিঘা।

৪০। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ সি- ১৩ ও ডি- ৪০, এবং ঢাকা প্রকাশ, ৬ ও ১৩ সেপ্টেঃ ১৯২৫ পৃঃ৩।

৪১। *পুরানো নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত, চিঠিপত্র নথি দ্রঃ

৪২। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৩ এবং *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৪১।

৪৩। আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৬।

৪৪-৪৫। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাস বরস,* পৃঃ ১৫৬-৫৭, রেজাউল করিমের বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১ এবং *ঢাকা ডিঃ গেজেটিয়ার,* ১৯৬৯ পৃঃ ১০৪ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৫।

৪৬। ঢাকা প্রঃ ১৭ নভেঃ ১৮৭৮ পৃঃ ৩৭৪ এবং ২২ নভেঃ ১৮৭৮ পৃঃ ৩৮৬ ও ৩৮৮

৫৭। সোম প্রকাশ, ১৪ জানুঃ ১৮৭৮ পৃঃ ৫ (১৩৮)

৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ও ২৩ নভেঃ ১৮৭৮ পৃঃ ৩৭৪, ৩৮৬ ও ৩৮৮ বিজ্ঞাপন দ্রঃ

৪৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮১ পৃঃ ৪৩৬

৫০। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ডিসেম্বর এবং ২২ ডিসেম্বর ১৮৮২ পৃঃ ৪০৯ ও ৪২১।

৫১। নওয়াব আহ্সানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ৯ জানুয়ারী ১৮৮৩ খ্রীঃ (উর্দু-অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত)

৫২। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জানুঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৪৬৪।

৫৩। ঐ, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৭ পৃঃ ৬।

৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ও ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ পৃঃ ১ ও ৬।

৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ৯ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ১ মেলার বিজ্ঞাপন দ্রঃ।

৫৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ মার্চ, ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ আগস্ট ১৮৮৮ পৃঃ ৪ ও ৯-১০।

৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ১১ ও ১৮ নভেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৫ এবং ২ ডিসেঃ ১৮৮৮ পৃঃ ৩ এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত, বংগানুবাদ পৃঃ ১১৫।

৫৯। ঢাকা প্রকাশ, ১০ ফেব্রুঃ ১৮৮৯ পৃঃ ৭।

৬০। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ আগস্ট ১৮৮৯ পৃঃ ৫।

৬১। হাকিম হাঃ রহমান, *পাঁচাশ বরস,* রেজাউল করিমের বংগানুবাদ পৃঃ ৮২ এবং ঢাকা প্রকাশ, -৫ জানুঃ ১৮৯০ পৃঃ ৭।

৬২। ঢাকা প্রকাশ, ১১ ফাল্গুন ১২৯৭/১৮৯০ খ্রীঃ

৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ফেব্রুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৭।

৬৪। উল্লেখ্য, নওয়াবের ৮/৯ বছরের একটি ছেলে মারা যাওয়ায় অনুষ্ঠানটি হয়নি। শেষ পর্যন্ত জাহাজেই ছোটলাটের জন্য পার্টি দেয়া হয় এবং তাতে নওয়াব আহসানুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ও ২২ জুলাই ১৮৯৪ পৃঃ ৪-৬।

৬৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুঃ ৩, ১৭ ও ২৪ মার্চ ১৮৯৫ খ্রীঃ

৬৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ সেপ্টেঃ ১৮৯৫ পৃঃ ৫

৬৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জানুঃ ১৮৯৬ পৃঃ ৬।

৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ১ মার্চ ১৮৯৬ পৃঃ ৬।

৬৯। ঢাকা প্রকাশ, ২ আগস্ট ১৮৯৬ পৃঃ ৫-৭।

৭০। *দি বেংগল টাইমস,* ৯ এপ্রিল ১৯০২

৭১। ঢাকা প্রকাশ, ২০ এপ্রিল, ১৯০২ পৃঃ ৫।

৭২। ঢাকা প্রকাশ, ২২ ও ২৯ জুন ১৯০২ পৃঃ ৩-৪।

৭৩। *দি বেংগল টাইমস,* ২৩ জুলাই ১৯০২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৩ ও ২৭ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৩।

৭৪। *দি বেংগল টাইমস,* ৮ নভেঃ ১৯০২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৯ নভেঃ ১৯০২ পৃঃ ৩-৪।

৭৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ নভেঃ ১৯০২ পৃঃ ৪।

৭৬। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জানুঃ ১৯০৩ পৃঃ ৪।

৭৭। *দি বেংগল টাইমস,* ৩১ জানুঃ ১৯০৩।

৭৮। *দি বেংগল টাইমস,* ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ এবং কাজী কাইউমের ব্যক্তিগত ডাইরী ইংরেজী, অপ্রকাশিত তাং ১৯ ফেব্রুঃ ১৯০৪ এবং অনুপম হায়াত, ঢাকার নওয়াব পরিবারের ডাইরী, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা,* ৩১ জুলাই ১৯৯১ পৃঃ ৫২।

৭৯। খাজা শামসুল হকের ডাইরী (অপ্রকাশিত) তাং ২৭ আক্টোঃ ১৯০৫ দ্রঃ

৮০। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ মার্চ, ১৯০৪ পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮১। *ইস্টবেংগল এন্ড আসাম এরা ১৮ এপ্রিল ১৯০৬ এবং প্রসিডিংস অব দ্য ফার্স্ট প্রভিন্সিয়াল মোহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অব ইস্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম,* ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত মোহাঃ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৫-১৬ এবং ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৯০৬ পৃঃ ৩ এবং ওয়াকিল আহমদ, *মুসলিম অর্গানাইজেশন অব ঢাকা। ঢাকা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬।*

৮১। ঐ প্রসিডিংস এবং পীরজাদা শরীফুদ্দিন, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড পৃঃ ১৫ এবং আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিঃ ঐ* পৃঃ ২৬৬-২৬৭ এবং ১৭২ এবং ঢাকা প্রকাশ, ৩০ ডিসেঃ ১৯০৬ পৃঃ ৩ এবং ৬ জানুঃ ১৯০৭ পৃঃ ৩। *ইস্টার্ন বেংগল এন্ড আসাম এরা,* ২৯ ডিসেঃ ১৯০৬।

৮৩। চিত্রটি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স কর্তৃক ২৩ মার্চ গোল্ডেন জুবিলী, পাকিস্তান রেজুলেশন উপলক্ষে প্রকাশিত ডাইরী (করাচী ১৯৯০) থেকে সংগৃহীত।

৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ১৯০৭ খ্রীঃ।

৮৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই, ১৯০৮ পৃঃ ৩।

৮৬। ঢাকা প্রকাশ, ২ আগস্ট ১৯০৮ খ্রীঃ।

৮৭। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জানুঃ ১৯১০ পৃঃ ৪, মিঃ কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত নারায়নগঞ্জের ভাটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ভারতে একজন সিভিলিয়ান হিসেবে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জেলা প্রশাসক, আবগারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার প্রভৃতি উচ্চ পদে চাকুরী করেন, তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯-৭০।

৮৮। ঢাকা প্রকাশ, ৬ ডিসেঃ ১৯১০ পৃঃ ৫ এবং *রিপোর্ট অব দা প্রসিডিংস অব দ্যা থার্ড প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল কনফারেন্স* ১৯১০ পৃঃ ১১৪ থেকে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ, *নওঃ সলিঃ*, পৃঃ ১৮২।

৮৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ জুন, ১৯১১ পৃঃ ৩।

৯০। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জুলাই, ১৯১১ পৃঃ ৩।

৯১। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ আগস্ট, ১৯১১ পৃঃ ৩।

৯২। ঢাকা প্রকাশ, ২১ জানুঃ ও ৪ ফেব্রুঃ ১৯১২ পৃঃ ৩ এবং দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৭।

৯৩। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ মার্চ, ১৯১২ পৃঃ ৩।

৯৪। ঢাকা প্রকাশ, ৮ ফেব্রুঃ, ১৯১৪ পৃঃ ৩।

৯৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুঃ ১৯১৪ পৃঃ ৩।

৯৬। এ অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশ করতে গিয়ে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেন- এই শাহবাগে ইতোপূর্বে অনেক রাজ প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছে। তাই এই অভ্যর্থনা উদ্যানের পূর্ব গৌরব আরো বৃদ্ধি করলো। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ ফেব্রুঃ ১৯২২ পৃঃ ৩

৯৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ফেব্রুঃ ১৯২৩ পৃঃ ৪।

৯৮। ঢাকা প্রকাশ, ১ ফেব্রুঃ ১৯২৫ পৃঃ ৩।

৯৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জুন ১৯২৬ পৃঃ ৩।

১০০। সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা,* ১ম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৪ পৃঃ ৫৬-৫৭।

১০১। পেয়ারীবাগ সংক্রান্ত *পুরানো নথি,* নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, পৃঃ ডি- ৪৩ দ্রঃ

১০২। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪। নওয়াব এস্টেট অফিসে প্রাপ্ত পুরানো কাগজপত্রে বাগানটির নাম পেয়ারীবাগ লেখা আছে। তাই বর্ণিত নওয়াব বেগমের ডাক নাম পেয়ারী বিবি হতেও পারে।

১০৩। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬০।

১০৪, ১০৬, ১০৭ ও ১০৮। পেয়ারীবাগ সংক্রান্ত পুরানো নথি, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, পৃঃ ডি-৪৩ এবং ৩৯।

১০৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ এপ্রিল ১৯০৩ পৃঃ ৩।

১০৯-১১০। নওয়াব পরিবারের প্রবীণ সদস্যা এবং পরীবাগে প্রায় ৬০ বছর বসবাসরত বেগম কামর বানু (বয়স আনুঃ৭২)-এর মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে সংগৃহীত তথ্য। উল্লেখ্য, নাজির হোসেন জানিয়েছেন, মসজিদটি ছাড়াও এর অদুরে হাতিরপুল সড়কের কাছে অধুনালুপ্ত পাওয়ার হাউসটি স্থাপনে ঢাকার নওয়াবদের বিরাট অবদান ছিল। দেখুন-নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪।

১১১। পরীবাগের জনৈক কর্মচারী জনাব মোঃ আলী ২৫ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ এক তালিকায় নওয়াব সলিমুল্লাহকে জানিয়েছেন যে, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সেখান থেকে দুধ বিক্রি করে ১৫ টাকা ১৪ আনা ৬ পয়সা এবং সবজি বিক্রি করে ৫০+৫৭ টাকা পাওয়া গেছে। (প্রাগুক্ত *পুরানো দলিল,* শাহবাগ দ্রঃ আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত)

১১২। আজিমুশ্শান, *ঢাকা রোমান্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৮।

১১৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪।

১১৪। *পুরনো দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, নওয়াবদের ঘরবাড়ীর তালিকা দ্রঃ পৃঃ এ-৯০ ক্রমিক ২৮৭ ও ২৯৮ এবং পৃঃ ১০৫, ক্রমিক ২৫৯-৬০।

১১৫। ঢাকা প্রকাশ, ২০ মে, ১৮৮৮ পৃঃ ৬।

১১৬। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু) , আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, তারিখ ২৪ নভেঃ ১৮৯০ দ্রঃ ।

১১৭। *পুরানো নথি,* ঢাকা নওয়াব ওয়াকফ এস্টেট অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৪৩।

১১৮। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৪৩। দিলখুশায় মানুক হাউস নামে একটি ভবন থাকায় (বর্তমানে বংগভবনের এলাকায় পড়েছে।) প্রফেঃ মামুন অনুমান করেন- আর্মেনীয় জমিদার মানুকের নিকট থেকে আঃ গণি স্থানটি কিনেছিলেন। (মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩) কিন্তু প্যানোরামা অব ঢাকার দৃশ্যে দেখা যায়- মানুকের বাড়ী ছিল বুড়ীগংগার তীরে। তায়েশ ও তৈফুর লিখেছেন, মানুকের বাড়ী ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সদরঘাট রোডে, (তৈফুর, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫১ এবং তায়েশ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯ এবং প্যানোরামা, প্রাগুক্ত ক্রমিক নং-২৭ দ্রঃ) তবে দিলখুশার ঐ ভবনটি কেন মানুকের নামে হয়েছিল তা জানা যায়নি।

১১৯। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৪০৩ এবং ২৪ এপ্রিল ১৮৯৮ পৃঃ ৬ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৬ ও ৪৯ এবং *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৪৩-৪৪। কোম্পানী বাগান সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২০। হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৩২।

১২১। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫ ও ২৪৭ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ২৪৭।

১২২। হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৩২, দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫ এবং আজিমুশ্শান, হায়দার, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩০-৩৬।

১২৩। আজিমুশ্শান হায়দার, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩০-৩৬ , এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৭, প্রফেসর মামুন মনে করেন, মুকিমের মেয়ে উম্মাদ হয়ে অন্দর মহলের পুকুরে মূল্যবান অলংকার ফেলতো বলে পুকুরটির নাম হয়েছিল মতিঝিল। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩ এবং ২০৪।

১২৪। উক্ত নিম্নভূমির জমিদার আপত্তি তোলায় নওয়াবের ঐ মহৎ কাজটি বাধাগ্রস্থ হয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৩ মার্চ ১৮৭৩ , পৃঃ ১৭।

১২৫। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজীতে, অপ্রকাশিত, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত, তাং মে ১৩, জুন ৭, অক্টোবর ১১, ১৭, ১৮৭৪ খ্রীঃ। মীর্জা মহম্মদের মহলের অভ্যন্তরে সুকাক মহলের দিঘী নামে একটি বড় জলাশয় ছিল। হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২। এছাড়া মীর মুকিমের অন্দর মহলেও একটি বড় দিঘী ছিল। তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৭-৩৮। তাই সম্ভবত নওয়াব আহসানুল্লাহ পূর্বের জলাশয়টি পুনর্খনন করে দানা দিঘীতে পরিণত করেন।

১২৬। ছবিটি আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত ঢাকার নওয়াবদের পুরানো এ্যালবাম থেকে প্রাপ্ত । উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে সরকারী ভাবে লীজ নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের অফিসাদি উক্ত দিঘীর পাড়ে তৈরী করা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৫ পৃঃ ৪।

১২৭। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭১।

১২৭। নওয়াবজাদির আঁকা ঝড় তুফানে পতিত নৌকা থেকেই কবি নজরুল তাঁর বিখ্যাত খেয়াপারের তরণী কবিতাটি লিখেছিলেন। ১৯২৫ সালে মেহেরবানু মারা যান। উল্লেখ্য, নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে মতোবিরোধের কারণে তাঁর ছোট ভাই, খাজা আতিকুল্লাহও আহসান মঞ্জিল ছেড়ে দিলখুশায় চলে এসে উক্ত ভবনের একাংশে বসবাস করতেন। ডি.আই.টি. কর্তৃক ক্রয় করার পর ভবনটি ভেংগেফেলা হয়

১২৯। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৪৮।

১৩০-৩১। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২।

১৩২। হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২৯-৩২।

১৩৩। আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩০-৩৬, এবং তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ১৩৭।

১৩৪। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু), প্রাগুক্ত, তারিখ ২৮ সেপ্টেঃ ১৮৮৩।

১৩৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ নভেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৬।

১৩৬। দানা, দিঘীর পাড়ের ময়দানেই প্রথম ছোটলাটের প্রাসাদ ও অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ঢাকা প্রকাশ, ৩১ ডিসেঃ ১৯০৫। উক্ত ভূমির লীজ থেকে প্রাপ্ত রেন্ট খুবই কম হওয়ায় ১৯২৯ সালে রেন্ট বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। (*পুরানো নথি,* ডি- ৪৫) ঢাকায় এক সময় ৪ জন বিচারক এসে হাইকোর্টের কাজ করবেন এবং দিলখুশা বাগানবাড়ীতে উক্ত কোর্টের অফিস বসবে বলেও কথা হয়েছিল। হৃদয় নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৯।

১৩৭। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত, ডি- ৫৩ ও ৭১।

১৩৮। নওয়াব আহস্যানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, ইংরেজিতে, অপ্রকাশিত, তারিখ-১৩ মে এবং ১১ অক্টোবর ১৮৭৪ দ্রঃ

১৩৯। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ফেব্রুঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৫৫১।

১৪০। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ আগস্ট, ১৮৮৮ পৃঃ ৫।

১৪১। ঢাকা প্রকাশ, ১১ নভেম্বর ১৮৮৮।

১৪২। ঢাকা প্রকাশ, ৪ জানুঃ ১৮৯১ পৃঃ ৬ সম্ভবত এর আগের বছর শাহবাগের পুল ভেংগে দুর্ঘটনা ঘটায় মেলাটি সেবার দিলখুশায় লাগানো হয়েছিল।

১৪৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ৫।

১৪৪। কাজী কাইউমের ব্যক্তিগত ডাইরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অনুপম হায়াত, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা,* ৩১ জুলাই ১৯৯১ পৃঃ ৫২।

১৪৫। *ইস্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম এরা,* ২০ জানুঃ ১৯০৬।

১৪৬। ঢাকা প্রকাশ, ৯ মার্চ ১৯১৩ পৃঃ ৪।

১৪৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুলাই, ১৯১৪ পৃঃ ৩।

১৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুঃ ১৯২৪ পৃঃ ৩।

১৪৯। কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, ২য় খন্ড, ঢাকা-১৩৮২ বাং পৃঃ ১১৯।

১৫০। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৬। ঢাকা চিড়িয়াখানা ও মীরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পশ্চিম-উত্তর দিকে তুরাগ নদীসহ নিম্নভূমি তথা বিলের পশ্চিমপাড়ে বাইগুনবাড়ীর অবস্থান। স্থানটি এখন বিরলিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত সাদুল্লাপুর মৌজা নামে পরিচিত। গত ২৪ ফেব্রুঃ '৯৮ তারিখে এ গ্রন্থাকার নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা মোঃ হালিমের সাথে স্থানটি পরিদর্শন করেন। এখন সেখানে কেবল

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ও দিঘীটি মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে। এছাড়া সরকারের কাচারীবাড়ী নামে পরিচিত একটি ভগ্নদালান (দালানটি সম্ভবত পরিশিষ্ট চিত্র নং ৮৪ তে দেয়া আলোকচিত্রে বর্ণিত ভবনের অংশ) ছাড়া নওয়াবদের আমলে তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। সেখানে এখন একটি বাজার নির্মিত হয়েছে এবং তাতে কিছু দোকানপাটও আছে। নওয়াবদের আমলের খালটি ভরাট হয়ে গেলেও জোয়ারের সময় তা দিয়ে নৌকায় করে উক্ত বাজারের ঘাটে পৌছা যায়। বাজার ছাড়াও সেখানে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি সাইন বোর্ডও দেখা যায়। এমনকি জনৈক পীরের দরগায়ের নামেও কিছু জমি দখল করা হয়েছে। তবে নওয়াব হাবিবুল্লাহর আমলে ১৮৪০ সালে এখানে স্থাপিত একটি প্রাইমারী স্কুল বর্তমানে হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। পুরো স্থানটি ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেটের অধীন থাকলেও এর প্রতি তাদের তেমন নজর নেই।

১৫১। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫।

১৫২। বাকল্যান্ড, সি.টি. *স্কেসেস অব সোশাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন* ১৮৮৪ থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭।

১৫৩। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, অপ্রকাশিত তাং - ১ জানুঃ ১৮৮৩, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত,

১৫৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ মে, ১৮৯০ পৃঃ ৬

১৫৫। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ৮৭, ক্রমিক নং- ১৯০ এবং পৃঃ ১০৭ ক্রমিক নং- ২৯২।

১৫৬। ছবিগুলো এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ফেব্রুঃ, ১৮৯৬ পৃঃ ৬। আরেকবার বাইগুনবাড়ী খাল খননেই নওয়াব আহসানুল্লাহ ৮ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন, দানের তালিকা ক্রমিক নং- ২৮৯ দ্রঃ

১৫৮। রংগিন পানি ছিটিয়ে হোলি খেলার একটি ব্যাপক আয়োজন সেখানে ছিল যাতে নওয়াবরা অংশ নিতেন। (নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা মোঃ ইসমাইলের কন্যা নাজমা কাদেরের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে সংগৃহীত। ফেব্রুঃ '৯৮ মাসে বাইগুনবাড়ীর উক্ত স্থান পরিদর্শনে গিয়ে গ্রন্থাকার স্থানীয়দের নিকট থেকে উক্ত হোলি খেলার চৌবাচ্চা গুলোর স্থান প্রত্যক্ষ করেন, যা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং প্রায় অদৃশ্য।

১৫৯। নওয়াব পরিবারের ডাইরী (অনুবাদ) অনুপম হায়াৎ, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা,* ৩১ জুলাই ১৯৯১ পৃঃ ৫১।

১৬০। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, তাং ৪ মার্চ ১৮৮৫, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

১৬১। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৮৮৭ পৃঃ ৪-৬।

১৬২। ঢাকা প্রকাশ, ১০ এপ্রিল ১৮৮৭ পৃঃ ৬-৭।

১৬৩। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ মার্চ ১৯০১ পৃঃ ৫।

১৬৪। মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ৮, উদ্ধৃত- আর্থার ক্রে, প্রাগুক্ত থেকে

১৬৫। ঢাকা প্রকাশ, ২৭মে ১৮৯৪ পৃঃ ৫। একই সময়ে ভাওয়ালের রাজা কালী নারায়ণ রায়ও চা-চাষের উদ্যোগ নেন। কিন্তু কোথাও এটা ফলপ্রসূ হয়নি বিধায় ক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়। যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৯।

১৬৬। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৪৪ এবং *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ৯০ ক্রমিক- ২৮৭ এবং ২৯৮।

১৬৭। আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৪৯, এবং মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯ এবং নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ১৩৬।

১৬৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৭৪, পৃঃ ৪০৩।

১৬৯। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৪৪।

১৭০। ঢাকা প্রকাশ, ২৯ নভেঃ ১৮৭৪ পৃঃ ৪০৩ এবং *পুরানো নথি,* পৃঃ ডি- ৪৪-৪৫।

১৭১। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি-৪৪।

১৭২। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল ১৮৯৮ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৬ ও ৪৯। এ বাগানের দক্ষিণ পূর্বকোণে নওয়াবদের বিখ্যাত দানা দিঘী অবস্থিত ছিল বলে এর দক্ষিণাংশকে দানা দিঘীর গার্ডেন বলেও সম্বোধন করা হতো। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ১০৯ ক্রমিক ৩০৫।

১৭৩। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩২।

১৭৪। ঢাকা প্রকাশ, ২২ জুলাই ১৮৮৮ পৃঃ ৬। পুরানো পল্টনে বর্তমান হাউস বিল্ডিং করপোরেশন ভবনের স্থানে সেকালে এক বিরাট দিঘী ছিল। যেখানে প্রতি বছর একজোড়া ছেলেমেয়ে ডুবে মারা যেত বলে এর নাম ছিল জোড় ভোগ পুকুর। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ১৩৭।

১৭৫। শরিফুদ্দিন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩২ এবং মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৫৯।

১৭৬। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪।

১৭৭। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ নভেঃ ১৮৯৮ পৃঃ ৬।

১৭৮। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ পৃঃ ৬।

১৭৯। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ এ- ১০৫ ক্রমিক ২৬১।

১৮০। *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৪৫।

১৮১। *পুরানো নথি,* পৃঃ ডি- ৪৫-৪৬ এবং আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স,* পৃঃ ৩৬ ও ৪৯।

১৮২। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল, ১৮৮৮ খ্রীঃ পৃঃ ৭।

১৮৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩, ১০ ও ১৭ ফেব্রুঃ ১৯০১ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪। ঢাকা প্রকাশ, ১ ডিসেম্বর ১৯১২ খ্রীঃ পৃঃ ৩। এছাড়া ১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসেও অনুরূপ ঢাকার নওয়াবদের উদ্যোগে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুর্কী সুলতানের বিজয়ের জন্য অত্রাঞ্চলের মুসলিমরা পুরানো পল্টনের মাঠে জামাতে নামাজ পড়েছিল। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল ১৮৯৭ পৃঃ ৭।

১৮৫। তৈফুর, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৬

১৮৬+১৯৭।তায়েশ, *তাওয়ারিখ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০ ও ২১৭-১৮ এবং যতীন্দ্র মোহন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬০ এবং বাংলায় ভ্রমণ,২য় খন্ড প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪

১৮৮। সম্ভবত হাফিজুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির স্মরণে ভবনটির নামকরণ করা হয়। বাহাদুর শাহ পার্কে তাঁর স্মরণে নওয়াবের ইংরেজ বন্ধুরা ১৮৮৪ খ্রীঃ একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করেছিল, যা আজো বর্তমান।

১৮৯। আলোকচিত্রের মধ্যে একটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হক কর্তৃক কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত এবং অন্যটি এডওয়ার্ড হাউসে প্রাপ্ত নওয়াবদের এ্যালবাম থেকে সংগৃহীত। যা এখন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। অবশ্য মুনতাসীর মামুন তাঁর ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী গ্রন্থে উক্ত ভবনটির একটি ছবি প্রকাশ করে এর অবস্থানও নামকরণের কোন তথ্য না দিতে পেরে শুধুমাত্র নওয়াবদের কান্ট্রি ভিলা- হাফিজ মঞ্জিল ১৮৯০' এ বর্ণনাটি লিখেছেন। মামুন, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৫

১৯০। অর্থদানের তালিকা, প্রাগুক্ত ক্রমিক- ১৪২ দ্রঃ।

১৯১+১৯২ *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৮৭, ক্রমিক ১৯৪ এবং পৃঃ ডি- ১০৮ ক্রমিক নং- ২৯৯ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স নং-১* পৃঃ ৬৬।

১৯৩। মূল নক্সাটি ঢাকা নওয়াব এস্টেট পুরানো অফিসে রক্ষিত।

১৯৪-১৯৫। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৯০,ক্রমিক- ৩০১ এবং পৃঃ ডি- ১০৯ ক্রমিক ৩০৬ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স-১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬।

১৯৬। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৮৭, ক্রমিক ১৯৩, এবং ডি- ১০৮ ক্রমিক- ২৯৮ *ইনডেক্স অব পেপার্স- ১,* পৃঃ ৬৬।

১৯৭। *ইনডেক্স অব পেপার্স- ১,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬।

১৯৮। *আসুদগানে ঢাকা,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৫৭। খাজা আব্দুল করিম নওয়াববাড়ীর এলাকা ত্যাগ করে হোসেনী দালান এলাকায় গিয়ে বসবাস করতেন। তিনি এক সময় আইন সভার সদস্যও ছিলেন। সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২।

১৯৯। *পুরানো দলিল,* প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ১০৮ ক্রমিক নং ৩০০ এবং *ইনডেক্স অব পেপার্স- ১,* পৃঃ ৬৬।

২০০। *পুরানো দলিল,* পৃঃ ডি- ১০৯ ক্রমিক নং- ৩০৩।

২০১। *পুরানো দলিল, ঐ,* পৃঃ ডি- ১০৯ ক্রমিক ৩০১।

২০২। *পুরানো দলিল, ঐ,* পৃঃ ডি- ১০৯, ক্রমিক ৩০২।

২০৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৪৫৬।

২০৪। হাকিম হাঃ রহমান, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ২০। এবং খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৮) থেকে এই বাগানের তথ্য প্রাপ্ত

২০৫। উক্ত বাগানের ধারে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ খ্রীঃ একটি সদ্যজাত সুন্দরী বালিকা পাওয়া যায়, যার প্রসবকারিনীকে সনাক্ত করা যায়নি। ঢাকা প্রকাশ, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ পৃঃ ৬।

২০৬। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৭। আজিমুশ্যান বলেন, ছোট বেলায় আমরা ঐ বাগানের পুকুরে গিয়ে রঙিন মাছের খেলা দেখতাম। আজিমুশ্যান, *সিভিক বডি,* পৃঃ ৮২।

২০৭। *বেংগল টাইমস,* ৭ জুন ১৯০২।

২০৮। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৯ এবং মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৮৯, নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৩০।

২০৯। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৯।

২১০। টেইলর, *টপোগ্রাফী,* বংগানুবাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪ এবং দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ২৩০।

২১১। ঢাকা প্রকাশ, ১২ আশ্বিন ১৩১৪ পৃঃ ৩ এবং মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১০৩। ঐ ক্লাবের রিডিং রুমের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ একবার ৪,০০০/- টাকা দান করেন। পূর্বোক্ত দানের তালিকার ক্রমিক নং- ৮২।

২১২। দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ১১৫ এবং হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* পৃঃ ২৩।

২১৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ২৭।

২১৪। হৃদয়নাথ, *রিমিনিসেন্স,* পৃঃ ২৩।

২১৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুলাই ১৯০৩ পৃঃ ৫-৬।

২১৬। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ২৭।

২১৭। দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ১১৫ এবং তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ২২ এবং ঢাকা, ক্লে'র ডাইরী, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ এর পরিশিষ্ট পৃঃ ৬৩ দ্রঃ

২১৮। দানী, *ঢাকা,* পৃঃ ২৩০ এবং মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৯১।

২১৯। খাজা হাফিজুল্লাহ নওয়াব আহসানুল্লাহর প্রথমা স্ত্রী ওয়াহিদুন্নেসার গর্ভজাত পুত্র এবং নওয়াব সলিমুল্লাহর সহোদর বড় ভাই ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হওয়ায় জীবিতদের মধ্যে সলিমুল্লাহ জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে নওয়াবী পদের অধিকারী হয়েছিলেন। খাজা হাফিজুল্লাহর স্মরণে নির্মিত মার্বেল পাথরের সাড়ে চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আরেকটি ক্ষুদ্রাকার স্মৃতিস্তম্ভ আহসান মঞ্জিল প্রাসাদের দোতালায় দক্ষিণ বারান্দায় ছিল বলে জানা যায়। মোহতারাম, *হলিডে,* প্রাগুক্ত, ২৪ জানুঃ ১৯৮২।

২২০। ঢাকা প্রকাশ, ২১ ফেব্রুঃ ১৮৮৫ পৃঃ ৫৪২-৪৩। উল্লেখ্য, ঐ বছর খাজা মোঃ ইউসুফজান নওয়াব খেতাব পান এজন্য তিনি উক্ত সম্বর্ধনার মাধ্যমে অতিথি সৎকারও করেন। খাজা শামসুল হকের ব্যক্তিগত ডাইরী উর্দূ অপ্রকাশিত ২২ মার্চ ১৯১১ দ্রঃ

২২১। দানী, *ঢাকা,* প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

২২২। ঢাকা প্রকাশ, ২ ও ৯ মে ১৮৯৭ পৃঃ ৬। জুবিলি উপলক্ষে ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রের দানকৃত ১০ হাজার টাকায় রাণী ভিক্টোরিয়ার মার্বেল ভাস্কর্য নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০০ খ্রীঃ ঢাকা প্রকাশের এক খবরে বলা হয় যে, নওয়াবের টাকায় ভিক্টোরিয়া পার্কের উন্নয়ন না করে তা থেকে ৮ হাজার ইংরেজদের ক্লাব ঘরের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন, ১৯০০ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

২২৩। তাঁর নামে ঢাকায় ইংলিশ রোডটির নামকরণ হয়েছে। আজিমুশ্শান, *ঢাকা, রোমান্স*, পৃঃ ৩৯।

২২৪। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মার্চ ১৯০৬ পৃঃ ৩।

২২৫। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ মার্চ ১৯০৬ পৃঃ ৩।

২২৬। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ মার্চ ১৯১১ খ্রীঃ

২২৭। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ২৯-৩০ এবং মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ১৯১; তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ২২।

২২৮। নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী ১৮৮৩ উর্দু, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত। হাতীগুলোর সবই নওয়াবের নিজস্ব কিনা বুঝা দায়। সম্ভবত মোহররম মিছিলের জন্য হাতীগুলো জড়ো করা হয়েছিল।

২২৯। নওয়াবদের অর্থ দানের তালিকা এবং আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৬।

২৩০। ঢাকা প্রকাশ, ২৫ আগস্ট, ১৮৯৫ পৃঃ ৫।

২৩১। ঢাকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৫।

২৩২। তিনি হাতীর দারোগা নামে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। হাকিম, *আসুদগান,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৬।

২৩৩। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* পৃঃ ৩৩১।

২৩৪। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫৪ এবং ৩৩১।

২৩৫। ঐ সময়ে এখানে একপাশে কতিপয় মাজার পুজারীরা রাতারাতি একটা ভূয়া মাজার তৈরী করে এবং তার উপর সামিয়ানা টাংগিয়ে দিয়ে ও আগরবাতি জ্বালিয়ে স্থানটি দখলের পাঁয়তারা করে। কিন্তু নওয়াব সলিমুল্লাহ ভূয়া মাজারটি ভেংগে দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করেন। (আসুদগান, প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৫৬)

২৩৬। সিরাজুল ইসলাম, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ১৮ আগস্ট, ১৯৭৮ পৃঃ ২০।

২৩৭। *মোসলেম ক্রনিকেল,* ২৮ জানুঃ ১৮৯৯ পৃঃ ৪৫।

২৩৮। নওয়াব পরিবারের প্রবীণ সদস্য খাজা হালিমের মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৮) থেকে প্রাপ্ত।

২৩৯। এদের বেতন নওয়াব এস্টেট থেকে দেয়া হতো। ঢাকা প্রকাশ, ৫ মার্চ ১৮৭৬ এবং ৬ এপ্রিল ১৮৯৪ পৃঃ ৭

২৪০। ঢাকা প্রকাশ, ৩ মার্চ, ১৯০৭ পৃঃ ৩।

২৪১। আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু, ৩ মার্চ ১৮৮৩ থেকে উদ্ধৃত- আব্দুল্লাহ, *আঃ গণি ও আহসানুল্লাহ,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭

২৪২। ঐ ডাইরী, ২ জানুঃ ১৮৮৩ থেকে উদ্ধৃত- ঐ পৃঃ ১০৩।

২৪৩। ঐ ডাইরী, জানুঃ ১৭-১৮, ১৮৯৭ খ্রীঃ থেকে উদ্ধৃত- ঐ পৃঃ ১০৪।

২৪৪। ঐ ব্যক্তিগত ডাইরী, ১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে উদ্ধৃত- রেজাউল করিম, *ঐতিহ্য,* ২য় খন্ড প্রাগুক্ত ১৯৯৭ পৃঃ ২৫।

২৪৫। *পুরানো নথি,* ঢাকা নওয়াব এস্টেট পুরানো অফিসে রক্ষিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ডি- ৩৯।

২৪৬। হাকিম হাঃ রহমান, *পার্চাস বরস,* প্রাগুক্ত বংগানুবাদ পৃঃ ৮১।

২৪৭। মনোদাদেবী, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ২৯০-৯১।

২৪৮। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন, ১৯০০ খ্রীঃ পৃঃ ৬।

২৪৯। ঢাকা প্রকাশ উক্ত খবর প্রকাশ করে লিখেছিল, 'কিন্তু তত্ত্বাবধানের অভাবে ঐগুলোর প্রায় সবই মরে গেছে।' ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুন, ১৯০০ খ্রীঃ এবং ১৭ মার্চ ১৯০১ পৃঃ ৬।

২৫০। ঢাকা প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুঃ ৩ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৪ মার্চ, ১৮৯৫; মোট ৪টি সংখ্যায় চারবার ঐ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

২৫১। ঢাকা প্রকাশ, ৭ এপ্রিল ১৮৯৫ পৃঃ ৬।

২৫২। ছবিটি ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে উদ্ধারকৃত এবং বর্তমানে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত এ্যালবামে রয়েছে। অবশ্য প্রফেঃ মামুনের গ্রন্থেও অনুরূপ ছবি আছে।

২৫৩। তৈফুর, *ঢাকা,* পৃঃ ৩২৫ এবং বাকল্যান্ড, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত- মামুন, *ঢাকা,* পৃঃ ৭।

২৫৪। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২।

২৫৫। নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা হালিম এবং নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাতিজা (খাজা আতিকুল্লাহর পুত্র) মরহুম খাজা লতিফুল্লাহর মৌখিক ভাষ্য (১৯৯৪) থেকে প্রাপ্ত।

২৫৬। অর্থ দানের তালিকার ক্রমিক নং- ২৮-২৯ দ্রঃ।

২৫৭। ঢাকা প্রকাশ, ৮ জুন, ১৯০২ পৃঃ ৩।

২৫৮। ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুন ১৯০৩ এবং *পুরানো নথি,* প্রাগুক্ত, অর্থ দানের তালিকায় ১৩১০ বাংলা সালের দান দ্রঃ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলার মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। যদিও এতদাঞ্চলের মুসলানদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিত্তি বহু প্রাচীন, কিন্তু এক'শ বছর আগেও এর স্বরূপ পুরোপুরি বর্তমানের ন্যায় ছিল না। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রায় এক'শ বছর ধরে এতদাঞ্চলের মুসলমানেরা ছিল সবচেয়ে অনুন্নত জাতি। অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাদেরকে গ্রাস করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা পশ্চাৎপদতার শেষ স্তরে চলে যায় । প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সমাজ-সংস্কৃতির নামে অনেক মনগড়া রীতি-নীতি স্বার্থপর ধর্মগুরুদের ছত্রছায়ায় জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়। অনুসরণযোগ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে অনেক আঞ্চলিক-বৈশিষ্ট্য ও রীতি-নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বাছ-বিচার না করে ঐসব অনুকরণ করতে গিয়ে সাধারণ মুসলমানেরা অনেক অনৈসলামিক রীতি-নীতি চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এতদাঞ্চলের অমুসলিম জনগণ ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তায় শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসা বাণিজ্যে, চাকুরী-বাকুরীতে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে সার্বিকভাবে সমাজ সংস্কৃতিতেও তাঁদের অনুসৃত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রভাব বিস্তার করে।

আঠারো শতকের প্রথম ভাগে কাশ্মীর থেকে এদেশে আগত ঢাকার নওয়াব পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ধর্মগুরুর কাজ করতেন। প্রথম দিকে তাঁরা পীর মুরিদী প্রথায় এদেশের মুসলমানদের সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেয়া শুরু করেন। তাঁদের অনুসৃত অনেকটা বিশুদ্ধ ইসলামী রীতিনীতি এদেশের মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধভাবে ধর্ম চর্চা ও তদানুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে খাজা পরিবারের লোকেরা ব্যবসা- বাণিজ্য ও জমিদারী করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। অর্থ-সামর্থ ও বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাঁরা ক্রমে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের জনকল্যাণমুখী ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী এখানকার মুসলমানদের সমাজ উন্নয়নে ও সংস্কৃতি পরিমার্জনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উল্লেখ্য, ঢাকা নওয়াব পরিবারের পূর্বপুরুষ মৌলভী আব্দুল্লাহ ১৭৩০ সালের দিকে তাঁর বড়ভাই খাজা আব্দুল ওহাবের সাথে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। আব্দুল ওহাব এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেও মৌলভী আব্দুল্লাহ ইসলাম ধর্মচর্চা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ধর্মানুরাগ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যে তৎকালীন ঢাকার বিখ্যাত পীর শাহ্নূরী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা আহসানুল্লাহও একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। মৌলভী আব্দুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহ যেমন একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন তেমনি বৈষয়িক কারবারেও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি পীর মুরিদী কাজের পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হন এবং ১৮১২ খ্রীঃ প্রথম জমিদারি ক্রয় করেন। খাজা আহসানুল্লাহর পুত্র খাজা আলীমুল্লাহই ছিলেন ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চামড়া ও লবনের ব্যবসা এবং মহাজনী কারবার করে বিপুল অর্থ ও বিত্ত অর্জন করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল এলাকায় তিনি বহু সংখ্যক পরগনা ক্রয় করে একজন বিত্তশালী জমিদার রূপে খ্যাতি লাভ করেন। খাজা পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তির ঐক্যতা ও স্থায়ীত্ব প্রদানকল্পে তিনি ওয়াকফনামা করে সেগুলো একজন মোতাওয়াল্লীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। জনকল্যাণমূলক কাজেও তাঁর যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে। আটিয়া পরগনার জমিদারি তিনি দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

খাজা আলীমুল্লাহর পুত্র খাজা আব্দুল গণি ছিলেন ঢাকা নওয়াব পরিবারের সর্বাপেক্ষা সফলকাম পুরুষ। আব্দুল গণি ছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববাংলার অদ্বিতীয় ধনী, সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও রাজানুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কয়েকটি উচ্চ সম্মানবাহী খেতাব প্রদান করেন। খেতাবগুলোর মধ্যে ১৮৭৫ সালে দেয়া নওয়াব উপাধিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

উপাধিটি তিনি বংশানুক্রমে ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন। এর ফলে ঢাকার খাজা পরিবারটি নওয়াব পরিবার বলে খ্যাতি অর্জন করে।

পূর্ব বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবার হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উত্থান। তাঁদের উত্থানের সাথে সাথে এতদাঞ্চলের অবহেলিত মুসলিম সমাজের উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। এই অঞ্চলের সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঢাকার নওয়াব পরিবার। এই নেতৃত্বের সাথে তাই মুসলিম সমাজের মর্যাদা ও গৌরব জড়িত ছিল। তাঁদের বলিষ্ঠ ও সঠিক নেতৃত্বে এ অঞ্চলের মুসলমানেরা একটি জাতি গোষ্ঠি হিসেবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান অভিসন্দর্ভে এই অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা নওয়াব পরিবার কর্তৃক সমাজ উন্নয়নে সার্বিক অবদানের কথা যথাসাধ্য সম্ভব মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে প্রাষঙ্গিক দিকগুলো যেমনঃ পৌর উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় আচার, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের কথা এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের ঐসব কার্যাবলী এতদাঞ্চলের মুসলিমদের সমাজ সংগঠন ও উন্নয়নে কতটা সহায়ক হয়েছিল তা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার আপামর জনসাধারণ ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদানের ফলভোগ করলেও ইতোপূর্বে তাঁদের কার্যাবলী সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা পায়নি। এমনকি এদেশের বুদ্ধিজীবি মহলে এবং কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদের মধ্যেও ঢাকা নওয়াব পরিবারের ইতিহাস ও বিভিন্ন কার্যকলাপের মূল্যায়ন নিয়ে মতোবিরোধ দেখা যায়। অনেক লেখকের রচনায় তাঁদের সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত ঐসব বিভ্রান্তি দূর করা এবং দ্বিতীয়ত নওয়াবদের ইতিহাস ও কার্যকলাপের একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা। আমি নওয়াব পরিবার সম্পর্কে যেখানে যা প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত তথ্যের সন্ধান পেয়েছি, সংগ্রহ করার চেষ্ট করেছি। এ ছাড়া এই পরিবারের বংশধরদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমি পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। ঐ সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি নওয়াব পরিবারের অবদানের একটি সামগ্রিক ও সঠিক ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট হয়েছি। কতটুকু সফল হয়েছি সেটা বিশেষজ্ঞগণের বিচার্য।

ঢাকা নওয়াব পরিবারের লোকেরা সব সময় ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছে এবং সাধারণভাবে মনে করা হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁরা সহায়ক ও দোষর ছিল। কিন্তু এটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ধারণা। কারণ তৎকালীন সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানদের জন্য দু'টো পথ খোলা ছিল। প্রথমটি হচ্ছে, ইংরেজ শাসকদের সাথে সরাসরি অসহযোগিতা এবং তাদের কোপানলে পতিত হওয়া। এর পরিনতি অনিবার্যভাবে মুসলমানদের জন্য ছিল ধ্বংসাত্মক। আর দ্বিতীয় পথটি ছিল তাদের সাথে সমঝোতা, যার ভিত্তিতে মুসলমানদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিলাভ এবং সহাবস্থানের মাধ্যমে যতটা সম্ভব নিজেদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আদায় করা। ঢাকার নওয়াব পরিবার দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয়। আমি এই অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করেছি, ইংরেজদের সংগে বিরোধিতা না করে তাঁরা বৃটিশদের সাথে সমপর্যায়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে অধঃপতিত , দূর্দশাগ্রস্থ মুসলিম সমাজের জন্য অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে দর কষাকষি করে অধিকার আদায়ের যুগ শুরু হয়। ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরা তখন রাজনৈতিক দল গঠন এবং পরিচালনায়ও অগ্রণীর ভুমিকা পালন করেছিলেন।

আরো অভিযোগ করা হয় যে, ঢাকার নওয়াবগণ ছিলেন বহিরাগত। এদেশে তাঁরা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়েছেন। সমাজের উচ্চ স্তরে থেকে তাঁরা শাসকগোষ্ঠির সহযোগিতায় আরাম আয়াশ ও বিলাসে কালাতিপাত করেছেন। বাংলাদেশকে তাঁরা আপন ভাবেননি। এমনকি তাঁদের গৃহে প্রচলিত ভাষাও বাংলা ছিল না। আচার অনুষ্ঠান, খাদ্য ইত্যাদিও বাঙালী সুলভ ছিল না। তাঁদের সাথে বাংলার আপামর জনসাধারনের যে সম্পর্ক ছিল সেটাও অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগি দিয়ে ঐসব ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এদেশে তৎকালে যত জমিদার ছিল তাঁদের প্রায় সকলেরই বাসস্থান ছিল কলকাতায়। এদেশের রসদ এবং জমিদারির আয় তাঁরা ব্যয় করতেন কলকাতায়। তাঁদেরকে বলা হত প্রবাসী জমিদার। ঢাকার নওয়াবরা ছিলেন তৎকালিন পুর্ববংগের সর্বশ্রেষ্ট জমিদার। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা কলকাতার মুখাপেক্ষী হননি। তাঁরা যা কিছু করেছেন পুর্ববংগ তথা ঢাকাকে কেন্দ্র করেই করেছেন। এতে ঢাকাসহ সারা পুর্ব বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়েছিল।

নওয়াব পরিবারকে বাদ দিলে তৎকালে ঢাকা নগরীকে কল্পনা করা যায় না। ঢাকায় যা কিছু উন্নয়ন উৎকর্ষ সব কিছুই এই পরিবারকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। তৎকালে ঢাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিক নওয়াবদের অবদানের সুফল প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করতেন। এমন কি বৃটিশদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও ঢাকায় এসে নওয়াবের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর সহযোগিতায় সরকারের পরিকল্পিত বংগ বিভাগ বাস্তবায়িত হয়ে ১৯০৫ সালে ঢাকা পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। ঢাকার উন্নয়নের কথা ভেবে নওয়াব সাহেব তখন তাঁর দিলখুশা বাগানবাড়ীটি নতুন প্রদেশের লেঃ গভর্নরের অফিসের জন্য ছেড়ে দেন। মাত্র ছয় বছর ঐ রাজধানী থাকাকালে ঢাকায় উন্নয়নের যে জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তার পিছনে সরকারের পাশাপাশি ঢাকার নওয়াবেরও ব্যাপক ভূমিকা ছিল । বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের কারণে নবগঠিত ঐপ্রদেশে নওয়াব সলিমুল্লাহ কার্যত সরকারের একজন বেসরকারী উপদেষ্টার মর্যাদা পেয়েছিলেন। তৎকালে তাঁর পরামর্শ ও সুপারিশ ছাড়া এতদাঞ্চলের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই হতো না।

খাজা আলীমুল্লাহর সময় থেকেই জনকল্যাণ কাজের জন্য এই পরিবারটি এতদাঞ্চলে সুনাম অর্জন করে। খাজা আব্দুল গণির সময় ঢাকা নওয়াব পরিবারের জনকল্যাণ কাজ ও বদান্যতার কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি বহির্বিশ্বেও সেটা প্রচারিত হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নওয়াব আব্দুল গণি শালিশীর মাধ্যমে দেশবাসীর অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করে দিতেন। এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহর আমল পর্যন্ত লোকেরা ন্যায় বিচারের আশায় নওয়াব বাড়ীতে এসে ভীড় করতো। নওয়াব আব্দুল গণির চেষ্টায় ঢাকায় পঞ্চায়েত প্রথা পূর্ণাঙ্গরূপ পেয়েছিল। পঞ্চায়েত প্রধানরূপে ঢাকার নওয়াবগণ প্রতিটি মহল্লা সরদারকে স্বীকৃতি পাগড়ী দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। স্থানীয় লোকদের সামাজিক সমস্যা সমাধান ও শৃংখলা বিধানে অনেক সময় সরকারী ব্যবস্থার চেয়ে ঢাকার নওয়াবের গৃহীত ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী হতো।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার যেমন ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করার দিকে মনোযোগ দেয়, তেমনি নেতৃস্থানীয় কিছু ভারতীয় মুসলমান নিজেদের সমস্যা মোকাবেলায় ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। এসব মনীষীদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার জন্য তাঁদের আধুনিক শিক্ষা বিমুখতা, কুসংস্কার আঁকড়ে থাকার মানসিকতা, তৎকালীন শাসকদের বৈরীমনোভাব ইত্যাদি কারণগুলো চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো দূরীকরণের প্রয়াস পান। ঢাকার নওয়াবগণ ঐসব নেতাদের প্রগতিশীল কার্যকলাপ সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। এছাড়াও তাঁরা উক্ত নেতাদের গৃহীত নীতিমালা এদেশে প্রচার ও প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা সভা সমিতি করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও কল্যাণমুখী সংগঠন তৈরী করে মুসলমানদের সচেতন করার চেষ্টা করেন।

তৎকালীন মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও কুসংস্কারমুক্ত করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করার উপযোগী করতে ঢাকার নওয়াবগণ চেষ্টা করতেন। এজন্যে তাঁরা নওয়াব আব্দুল লতিফের তৈরী মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির একটি শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সৈয়দ আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনেরও ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। এ দেশীয় সমাজের কুপ্রথাগুলো দূরীকরণের জন্য তাঁরা সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়ন, দেশীয় মদ তৈরীর কারখানা নিয়ন্ত্রণ এবং বারবনিতা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে সরকারকে বিশেষভাবে সমর্থন করেন। ঢাকার পৌর উন্নয়নে নওয়াব পরিবারের গৃহীত ব্যবস্থাদি এ শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। মুসলমানদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য নির্ধারিত গোরস্তান নির্মাণ থেকে শুরু করে ঢাকা শহরের রাস্তা ঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকার নওয়াবদের একটি বড় অবদান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আব্দুল গণি ঢাকায় পানীয় জলের কল স্থাপন করে ঢাকাবাসীর সবচেয়ে বড় অভাবটি পূরণ করেন। এর ফলে শহরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব এমনকি সাধারণ রোগ ব্যাধিও কমে যায়। অনুরূপ ভাবে নওয়াব আহসানুল্লাহ বিজলী বাতির ব্যবস্থা করে ঢাকার আধুনিকায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করেন। এছাড়া খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজান কর্তৃক পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন ঢাকাকে স্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী শহরে পরিণত করে। নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক মুসলিম এতিমখানা নির্মাণও একটি উল্লোখযোগ্য কাজ। এর ফলে ভাগ্যাহত এতিম ছেলেমেয়েরা কেবল নিরাপদ আশ্রয়ই পায়নি, অনেকে লেখাপড়া শিখে সমাজে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আজো সগৌরবে বিদ্যমান।

বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়নে ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে অর্থদান করেছেন। ঢাকার নওয়াবগণ বিপুল অংকের অর্থ দিয়ে কয়েকটি কল্যাণমুখী ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। এ সব ফান্ড থেকে দুঃস্থ দুরিদ্র ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে প্রপীড়িতদের সহায়তা দেয়া হতো। জনস্বার্থে হাসপাতালও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ ঢাকার নওয়াবদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বিশেষ করে এতদাঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে মৃতলোক কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগে মৃত লোকদের দাফন কাফনের তাঁরা সুব্যবস্থা করতেন। মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁরা অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন।

এতদাঞ্চলের মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে ঢাকার নওয়াবগণ অর্থসাহায্য এবং নেতৃত্ব দিতেন। এজন্য তাঁরা বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন-মসজিদ, দরগাহ, খানকাহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা ঢাকার নওয়াব পরিবারের সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হতো। ফলে তাদের মধ্যে নওয়াব পরিবারের রীতি নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। তাই এতাদঞ্চলের মুসলিমদের ধর্মাচরণের নানা লৌকিকতায় ঢাকার নওয়াবদের অনুসৃত রীতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মুসলমানদের শবেবরাত, ঈদ এবং মিলাদুন্নবী উৎসব উপলক্ষে ঢাকার নওয়াবগণ ব্যাপক আয়োজনের সাথে সাথে আলেমগণের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের এসব ধর্মাচরণে নির্দেশনা দিতেন। রমজানে মসজিদগুলোতে তারাবীহ ও ইফতারীর সুবন্দোবস্ত করে তাঁরা মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতেন। ঈদ পুনর্মিলনের কোন সরকারী ব্যবস্থা না থাকায় তৎকালে ঢাকা শহরের মুসলমানেরা ঈদ উপলক্ষে নওয়াববাড়ীতে এসে কুশল বিনিময় করতেন। শিয়াদের মহররম পর্ব এবং মিছিলটিও তৎকালে ঢাকার নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় জৌলুস সহকারে পালিত হতো।

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দেশবাসী মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ঢাকার নওয়াবগণ চেষ্টা করতেন। এজন্য তাঁরা অনেকগুলো হাই স্কুল এবং এ্যাংলো এরাবিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। দেশে বিদেশে প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা অর্থদান করেছেন। গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে ঢাকার নওয়াবরা কারিগরি শিক্ষা বেশী পছন্দ করতেন। এজন্য তাঁরা ঢাকা সার্ভে স্কুলটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে উন্নীত করার জন্য সরকারকে বিপুল পরিমানে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

মুসলমান ছাত্রদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষিত করে তোলার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রভাবে সরকার মুসলমান ছাত্রদের জন্য শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগের প্রথা প্রচলন করেন। তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য অধিক হারে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব পরিবারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম লগ্ন থেকে সেখানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখার ব্যাপারে নওয়াব সলিমুল্লাহর ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থাটি এদেশে মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

তৎকালীন উচ্চস্তরের বাঙালী মুসলমান পরিবারের ন্যায় ঢাকা নওয়াব পরিবারেও উর্দু-ফার্সী চর্চা হতো। সমকালীন রাজভাষা ইংরেজী চর্চা করলেও তাঁরা বাংলা চর্চা তেমন করেননি। তবে সঙ্গীত, নাটক ও সিনেমা চর্চায় ঢাকা নওয়াব পরিবারের লোকেরা এদেশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় অভিনয় জগতে নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করে তাঁরা উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের এই উদার মানসিকতা এ অঞ্চলের মুসলমানদেরকে প্রগতিমনা করতে এবং উদারভাবে সংস্কৃতি পরিমার্জনায় বেশ প্রভাবিত করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আজকাল নববর্ষ বরণ উৎসবটি এতদাঞ্চলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়। সমাজের সব শ্রেণীর লোকের অংশগ্রহণে সেটা ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে সোয়া'শ বছর আগেই ঢাকার নওয়াব এটা ঘটা করে পালন শুরু করেছিলেন। তবে তখন সেটা ছিল খ্রীস্টিয় নববর্ষ উৎযাপন। এ উপলক্ষে মহাসমারোহে নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ীতে মেলার আয়োজন করা হতো। মেলায় নানা ধরনের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের পাশাপাশি নাচ-গান, ম্যাজিক, যাত্রা, পুতুল নাচ ইত্যাদি বাঙালী সংস্কৃতির যাবতীয় আয়োজন থাকতো। এমনকি লোকেরা তাদের উৎকৃষ্ট জাতের কৃষিপণ্য এবং গবাদি পশুও মেলায় প্রদর্শন করতেন। নওয়াবের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীগুলোর জন্য পুরস্কার দেয়া হতো। ঢাকার নওয়াবের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালে বর্ষবরণকে একটি নির্ভেজাল বাঙালী ধাঁচের সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করা এবং তাতে সর্বস্তরের মুসলমানদের নিঃসংকোচে যোগদান সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক বাহক ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় নওয়াব পরিবারের লোকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা চারু ও কারুশিল্পের বিকাশেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ঢাকায় ধাতব ও কাঠের শিল্পকর্মের উন্নয়নে নওয়াব আহসানুল্লাহ এবং সলিমুল্লাহ যথেষ্ট চেষ্টা করেন। জামদানী শিল্পের উন্নয়নে নওয়াব সলিমুল্লাহর গৃহীত বাস্তবধর্মী ব্যবস্থাদির কারনেই তৎকালীন রুগ্নপ্রায় এই শিল্পটি পুনর্জীবন পেয়েছিল এবং সেটা মসলিনের ন্যায় হারিয়ে না গিয়ে আজো জনপ্রিয় রয়েছে।

ঢাকার নওয়াবদের প্রাসাদ ভবন আহসান মঞ্জিলকে কেন্দ্র করে বহুদিন এতদাঞ্চলের মুসলমানদের ভাগ্যের চাকা আবর্তিত হয়েছে। এখানে সংঘটিত কার্যকলাপ এবং অনুসৃত নীতিমালা মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে এই প্রসাদে এমন কিছু নীতি নির্ধারিত হয়েছিল যার দরুন ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের বংগবিভাগ কাজটি সহজ হয়েছিল। এর ফলে ঢাকা পূর্ববাংলার রাজধানীরূপে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে এবং আধুনিক বিশ্বের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে পরিচিত হয়। আহসান মঞ্জিলের সহযোগী হিসেবে ছিল নওয়াবদের শাহবাগ এবং দিলখুশা বাগানবাড়ী। তৎকালে এতদাঞ্চলের উচ্চ পর্যায়ের যাবতীয় সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানাদি এগুলোতে অনুষ্ঠিত হতো। ঐসব অনুষ্ঠানাদি তৎকালীন বিভেদপূর্ণ মুসলমান সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করতে সহায়তা করতো এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের দিক নির্দেশনা দিত।

১৯০৬ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে শাহবাগ বাগানবাড়ীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ঐ রাজনৈতিক দলটি একদিন আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল। উক্ত রাষ্ট্রের পূর্বাংশই আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের আন্দোলন তথা পাকিস্তান আন্দোলনে ঢাকা নওয়াব পরিবারের যে ভূমিকা ছিল, নানা কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেটা পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ প্রতিটি বংশের উত্থান পতন আছে। স্বাভাবিক কারণেই কোন বংশের গৌরবময় কাল সাধারণত এক'শ বছরের বেশী দীর্ঘ হয় না। এসব কারণে বাংলাদেশ আমলে দেশবাসীর নেতৃত্ব দেয়ার মত তেমন কোন নামকরা ব্যক্তিত্ব খাজা পরিবারে দেখা যায় না। জমিদারি উচ্ছেদের পর জীবিকার তাগিদে খাজা পরিবারের উত্তরাধিকারীরা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। নওয়াবদের নির্মিত কীর্তি-কলাপও প্রায় সবই বিলীন হয়ে গেছে। এসব নানা কারণে উক্ত পরিবারের অবদানের ইতিহাস অনালোচিত ও উপেক্ষিত থেকে ক্রমে তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। অত্র অভিসন্দর্ভে সেসব কীর্তিকলাপ ও কার্যাবলীর পরিচিতি, বিবরণ তুলে ধরে সেগুলোর মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সীমিত কলেবর, তথ্যের দুস্প্রাপ্যতা ও বস্তুনিষ্টতা যাচাই প্রভৃতি কারণে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ন্যায় একটি বৃহৎ পরিবারের অবদানের সার্বিক দিক পূর্ণাংগভাবে তুলে ধরে মূল্যায়ন করা খুবই দূরহ কাজ। এই কঠিন কাজটি সম্পাদনে এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সন্নিবেসিত তথ্যাবলী ঢাকার নওয়াবদের অবদানগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এ কাজটি ভবিষ্যত গবেষকদের আরো ব্যাপক ও গভীর কাজের পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করি।

 Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (১)

চিত্র নং (৩)

চিত্র নং (২)

(১) প্রতিকৃতি - খাজা আলীমুল্লাহ (মৃত্যু- ১৮৫৪)

(২) প্রতিকৃতি - নওয়াব আব্দুল গণি (১৮১৩-১৮৯৬)

(৩) অলংকৃত চেয়ার, রৌপ্য

চিত্র নং (৫)

চিত্র নং (৪)

(৪) প্রতিকৃতি - নওয়াব আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১)
(৫) প্রতিকৃতি - নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)
(৬) প্রতিকৃতি - নওয়াব হাবিবুল্লাহ (১৮৯৫-১৯৫৮)

চিত্র নং (৬)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৮) প্রতিকৃতি - রেসকোর্স ময়দানে খাজা আলীমুল্লাহ ও আব্দুল গণি

চিত্র নং (৭) প্রতিকৃতি -

- নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ

চিত্র নং (৯) প্রতিকৃতি -

- নওয়াব খাজা মোহাঃ ইউসুফজান (১৮৫০-১৯২৩)

Dhaka University Institutional Repository

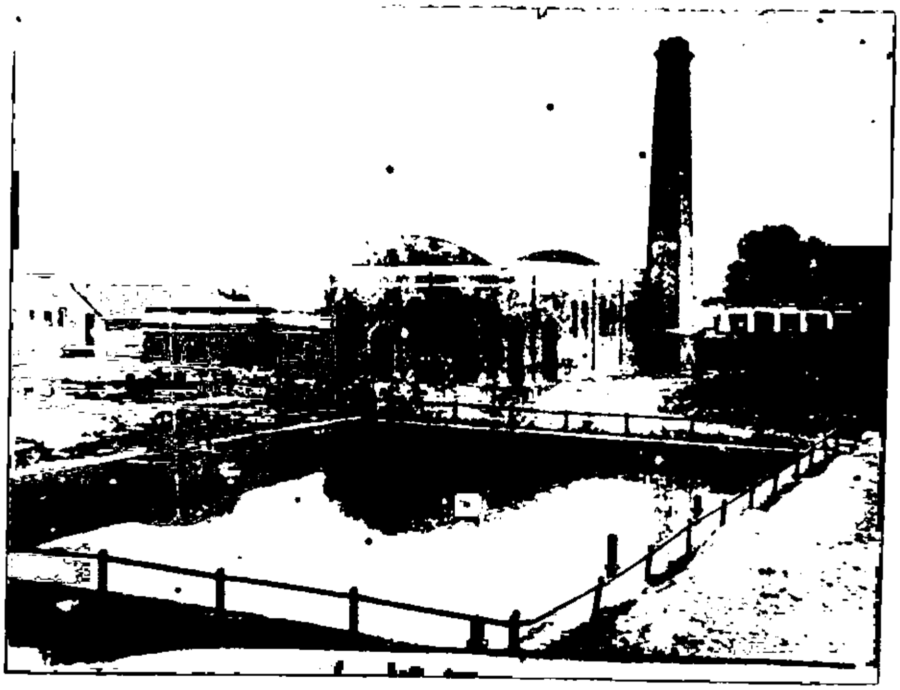

চিত্র নং (১০) ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্ক্স

চিত্র নং (১১) ঢাকায় বিজলী বাতির উদ্বোধন দৃশ্য (কল্পিত)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (১২) নওয়াবজাদি মেহেরবানু ও এতিম শিশুরা

চিত্র নং (১৩) বাকল্যান্ড বাঁধের ধারে নর্থব্রুক হল

Dhaka University Institutional Repository

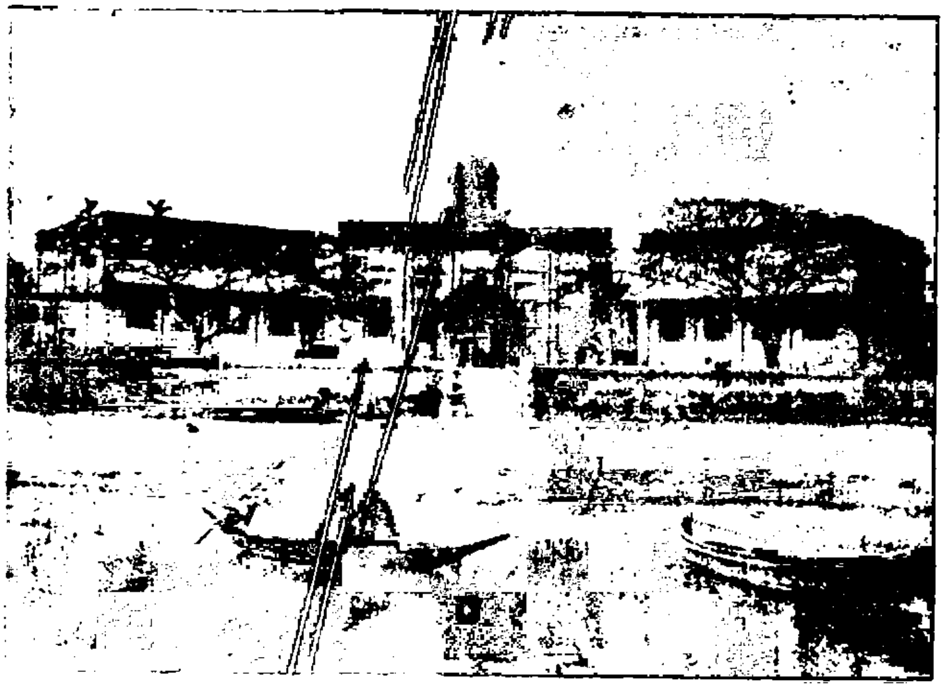

চিত্র নং (১৪) মিটফোর্ড হাসাপাতাল, নদীর দিক থেকে

চিত্র নং (১৫) মিটফোর্ড হাসপাতাল, সম্মুখ (উত্তর) দিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

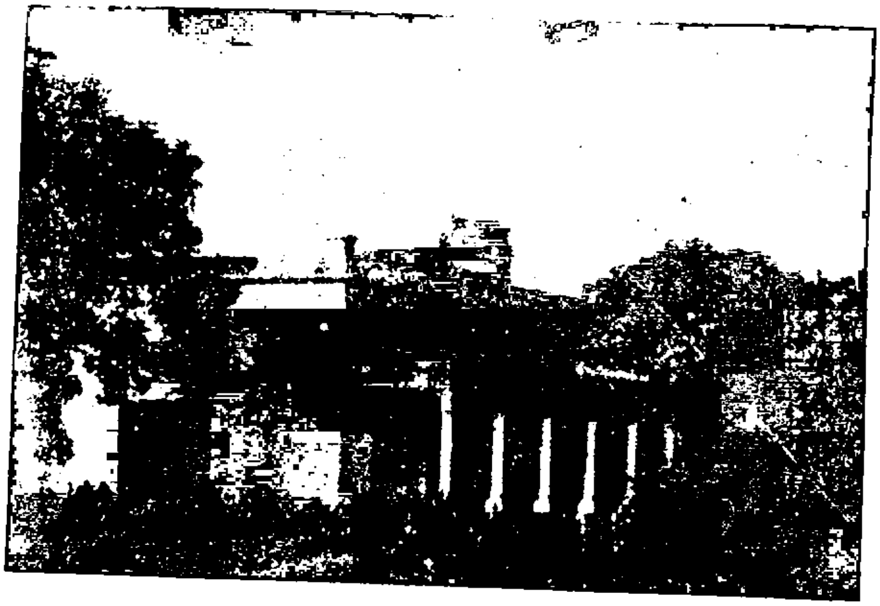

চিত্র নং (১৬) আহসানুল্লাহ জুবিলি মেমোরিয়াল হাসপাতাল ।

চিত্র নং (১৭) ঐ হাসপাতালে ব্যবহৃত সার্জিকেল যন্ত্রপাতি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (১৮) হোসেনী দালান, দক্ষিণ দিক

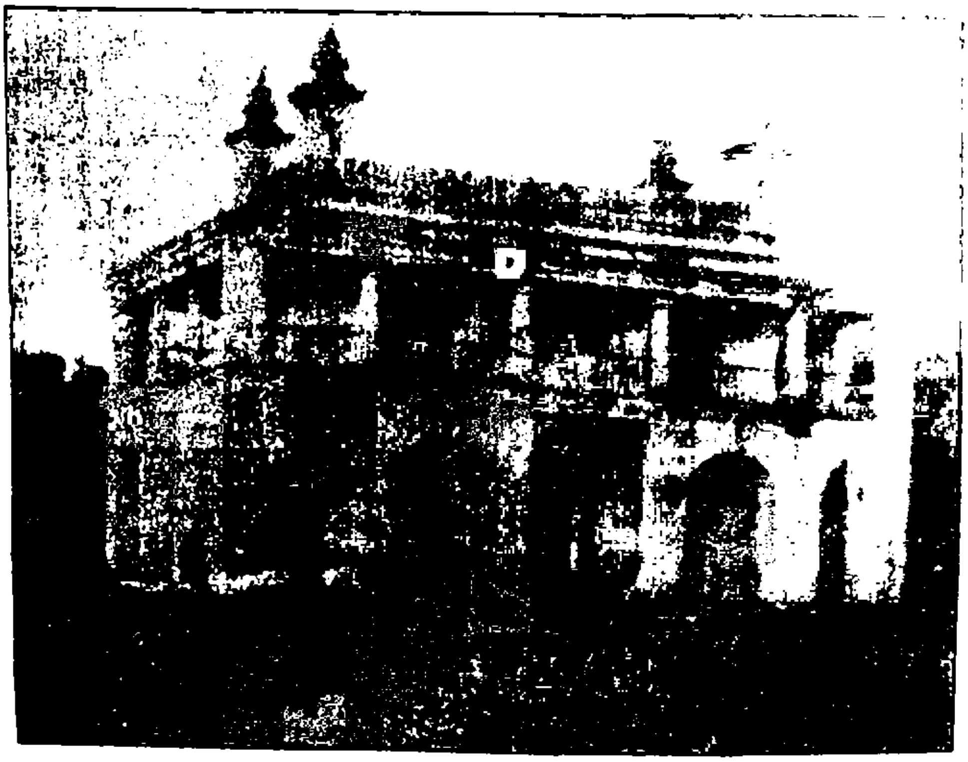

চিত্র নং (১৯) হোসেনী দালনের নক্করখানা (গেটওয়ে)

Dhaka University Institutional Repository

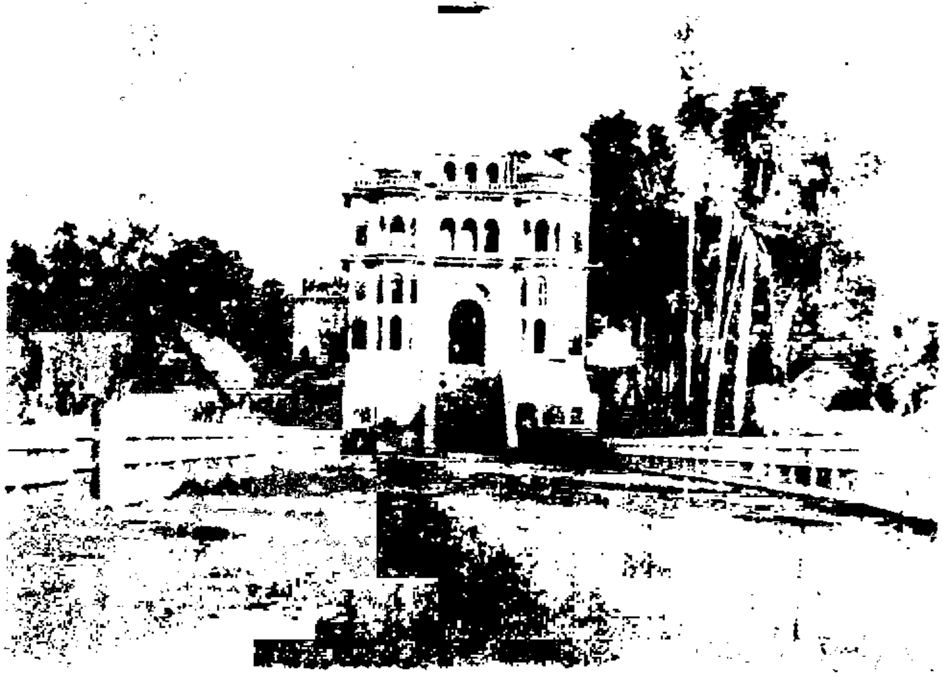

চিত্র নং (২০) কদম রসুলের নহবত খানা

চিত্র নং (২১) লালবাগ শাহী মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

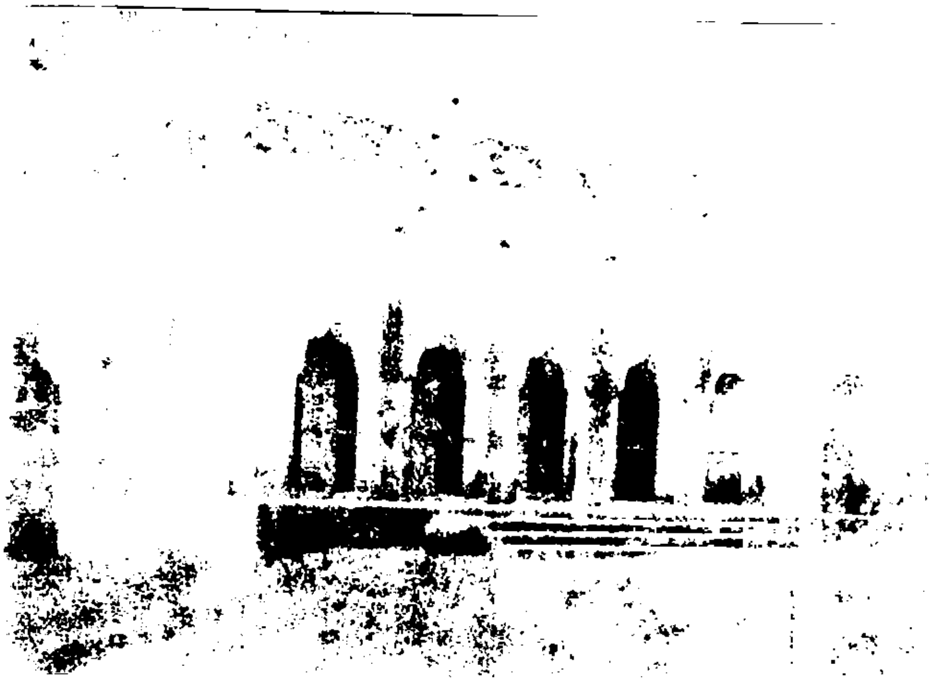

চিত্র নং (২২) বাইগুনবাড়ী মসজিদ (আদিরূপ)

চিত্র নং (২৩) বাইগুনবাড়ী মসজিদ (বর্তমান রূপ)

Dhaka University Institutional Repository

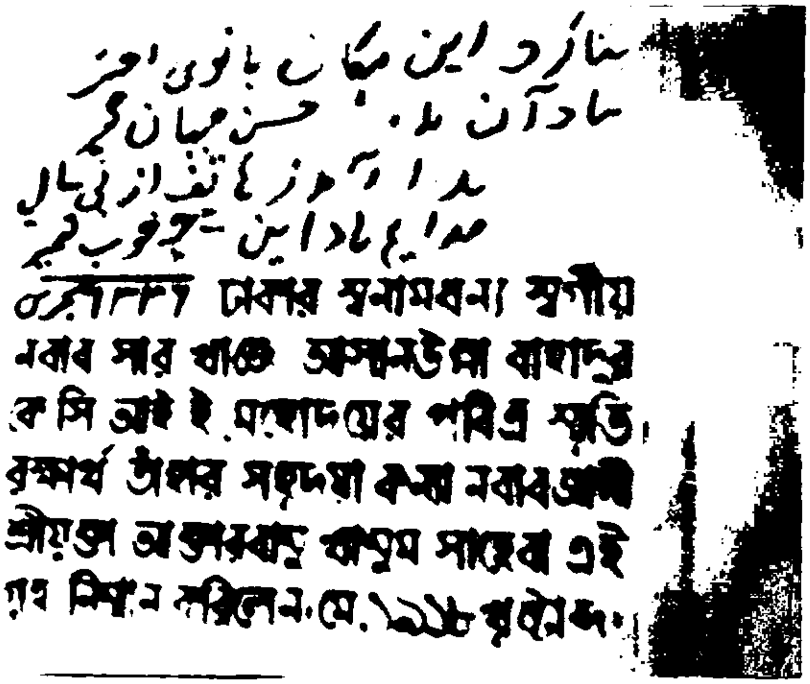

চিত্র নং (২৪) শিলালিপি,

রামকৃষ্ণ মিশনের ভবন গাত্রে স্থাপিত

চিত্র নং (২৫) প্রতিকৃতি, জুলেখাবানু (১৯০৪-১৯৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (২৬) প্রাসাদ লাইব্রেরী কক্ষ, ১৯০৪ সাল

চিত্র নং (২৭) মুসলিম লীগের সভায় ভাষণদানরত নওয়াব সলিমুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (২৮) নওয়াবজাদা খাজা মোহাম্মদ আফজাল (১৮৭৫-১৯৪০)

চিত্র নং- (২৯) ঢাকা মাদ্রাসা ভবন (১৮৮০ সালে নির্মিত)

Dhaka University Institutional Repository

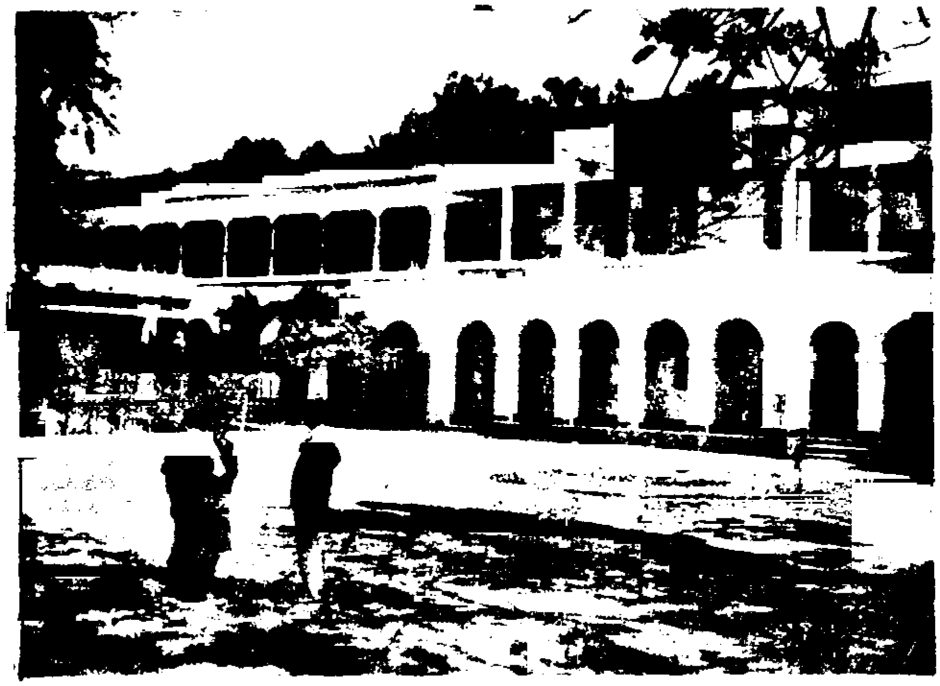

চিত্র নং (৩০) কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল

চিত্র নং (৩১) হিন্দুস্থানী কক্ষ, ১৯০৪ সাল

 Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৩২) নওয়াবজাদী মেহের বানু, ছবি অঙ্কনরত

চিত্র নং (৩৩) নওয়াবজাদি মেহের বানু, স্বামী ও সন্তানদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

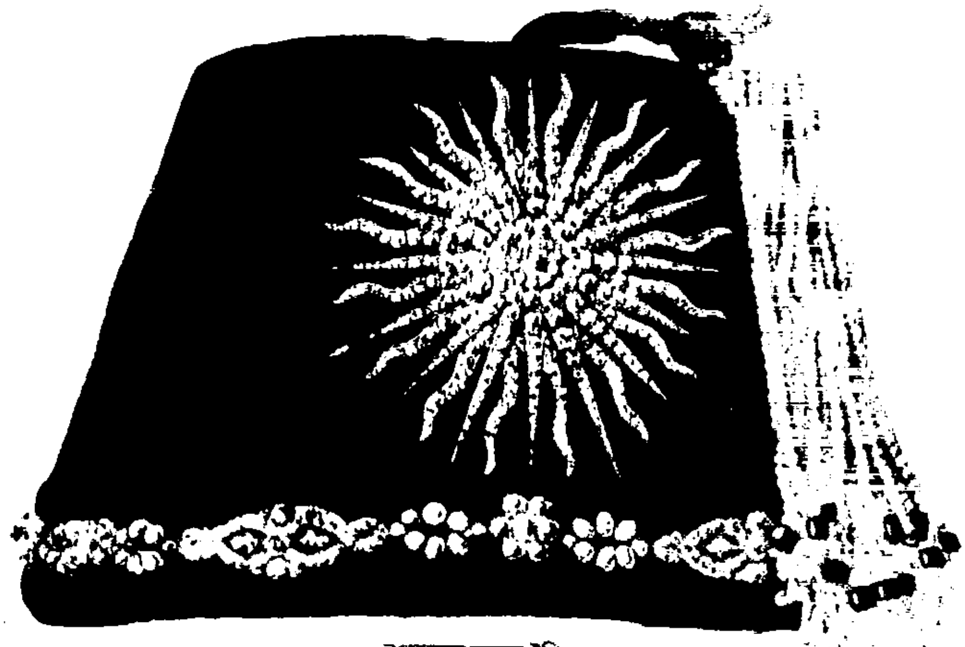

নওয়াবদের ব্যবহৃত টুপি

চিত্র নং (৩৪) নওয়াবদের ব্যবহৃত ফেজ টুপি

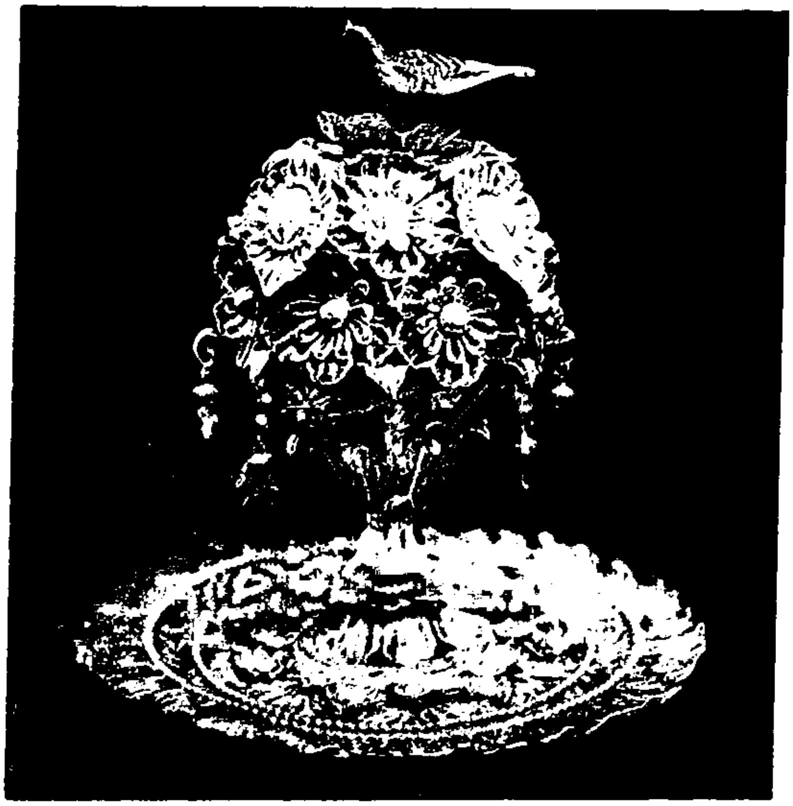

চিত্র নং (৩৫) আতরদান, রৌপ্য, তারজালি কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

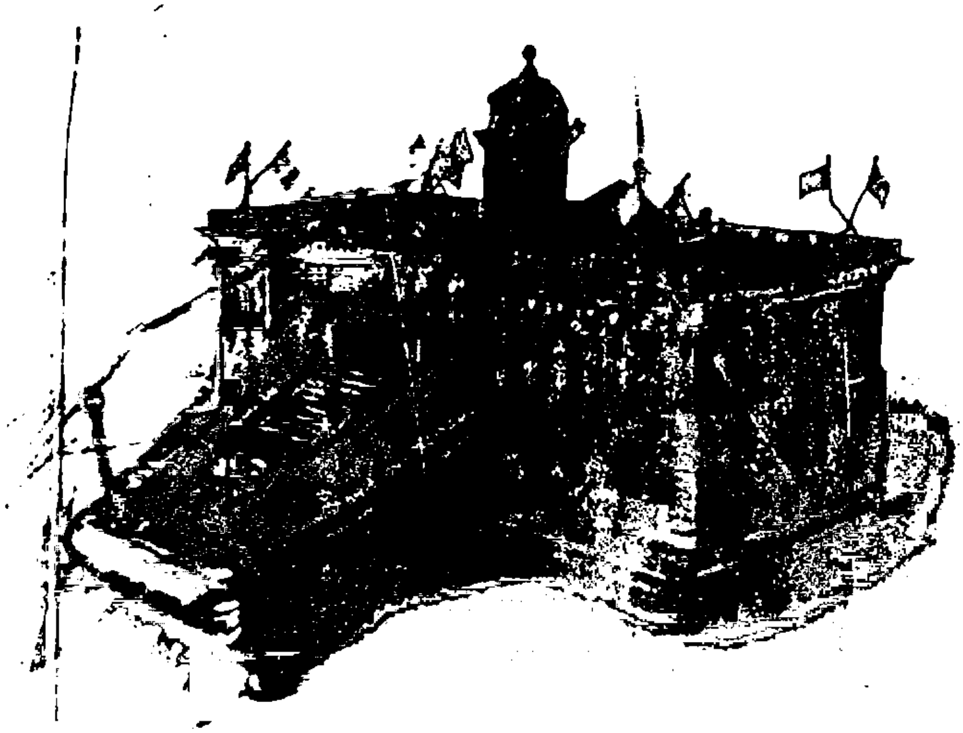

চিত্র নং (৩৬) আহসান মঞ্জিলের মডেল, তারজালি কাজ (১৮৮৮ খ্রীঃ পূর্ববর্তীরূপ)

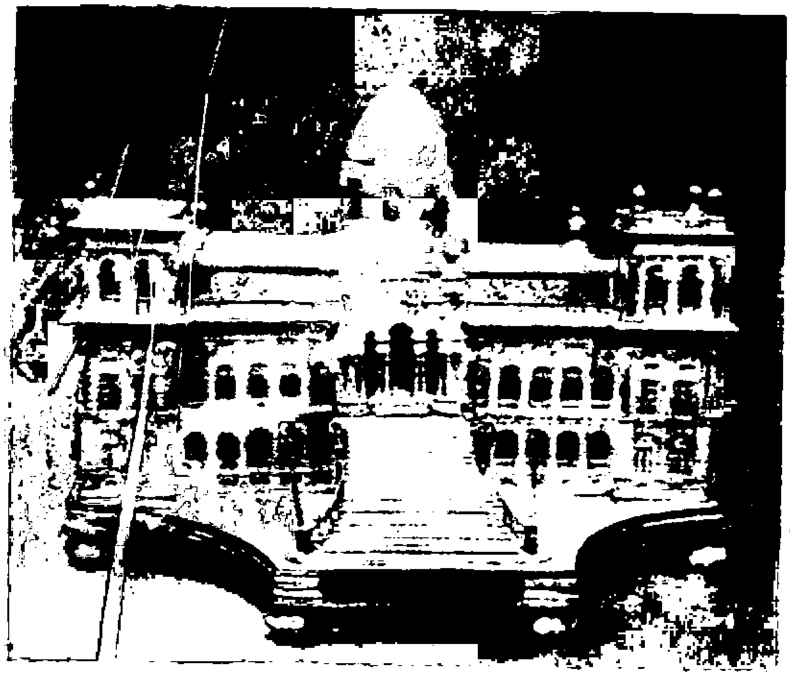

চিত্র নং (৩৭) আহসান মঞ্জিলের মডেল, তারজালি কাজ (১৮৮৮ খ্রীঃ পরবর্তীরূপ)

Dhaka University Institutional Repository

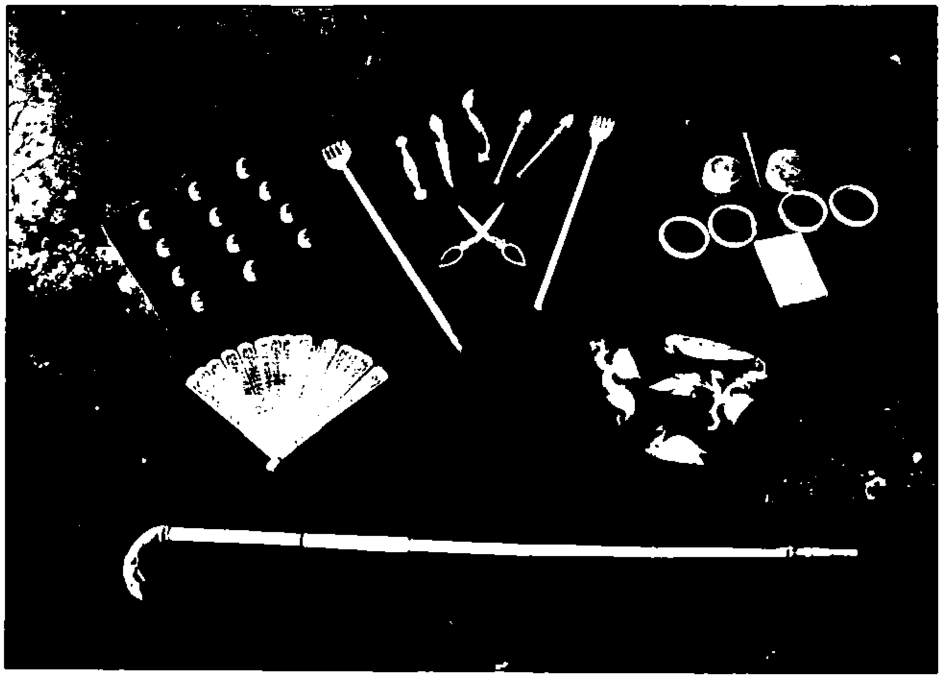

চিত্র নং (৩৮) হাতির দাঁতের কয়েকটি শিল্পকর্ম

চিত্র নং- (৩৯) গাছপাত্র, ধাতব, শিকার দৃশ্যের অলংকরণযুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৪০) কাঠের দরমা- বেড়া, ছিদ্র অলংকরণযুক্ত

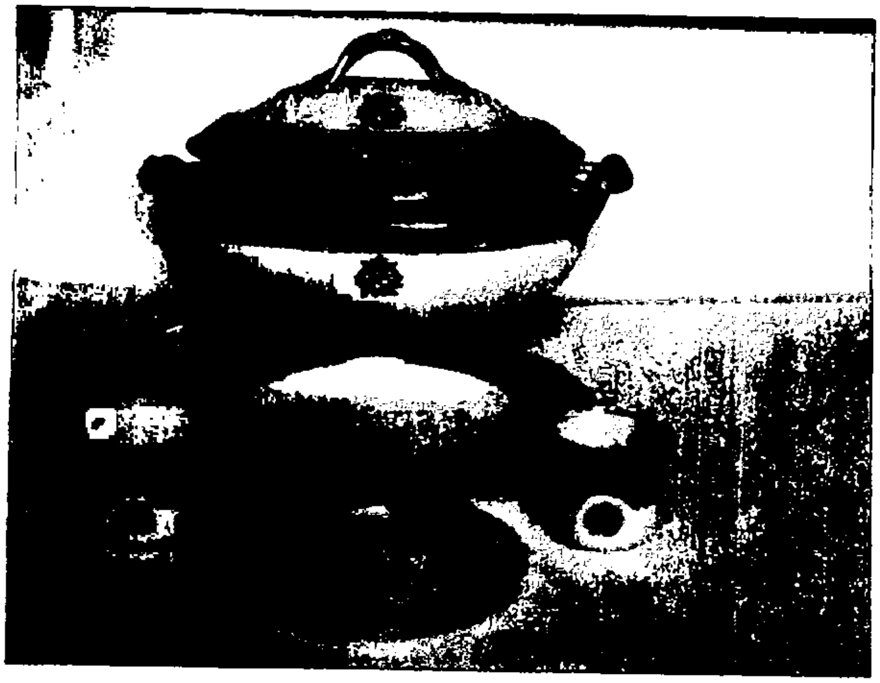

চিত্র নং (৪১) চীনামাটির তৈজসপত্র, নওয়াবদের মনোগ্রামযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৪২)

প্রাসাদে ড্রইং রুম,

১৯০৪ সাল

চিত্র নং (৪৩)

প্রসাদে ষ্টেট বেড রুম,

১৯০৪ সাল

চিত্র নং (৪৪)

প্রাসাদে ডাইনিং রুম,

১৯০৪ সাল

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৪৫)

প্রাসাদে বল রুম, ১৯০৪ সাল

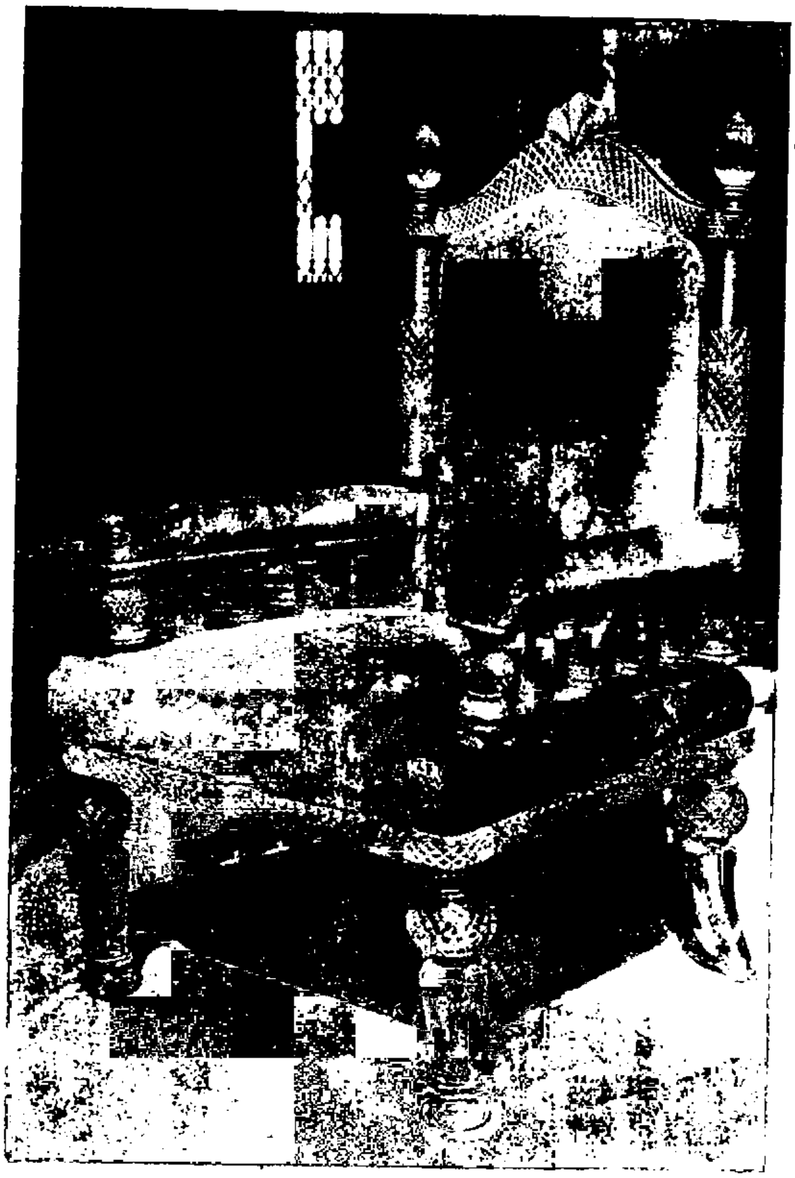

চিত্র নং (৪৬) ক্রিস্টাল চেয়ার, নওয়াবদের ব্যবহৃত

 Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং - ৪৮

চিত্র নং (৪৭) ক্রিস্টাল টেবিল, নওয়াবদের ব্যবহৃত

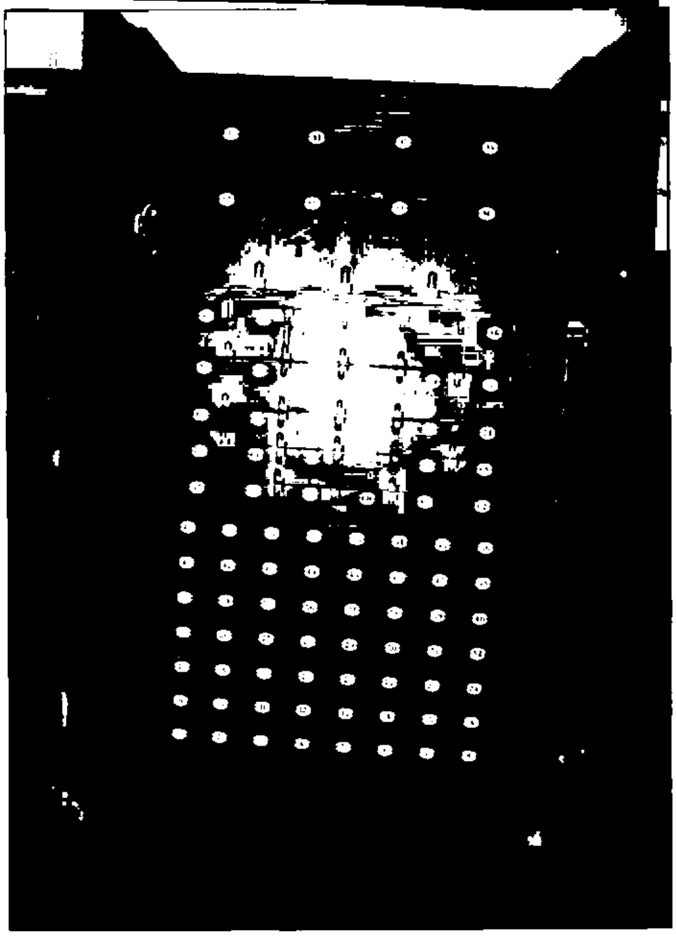

চিত্র নং (৪৮)

হাতির মাথার কংকাল, আহসান মঞ্জিল প্রদর্শিত

চিত্র নং (৪৯) বৃহদাকার লোহার সিন্দুক,

আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

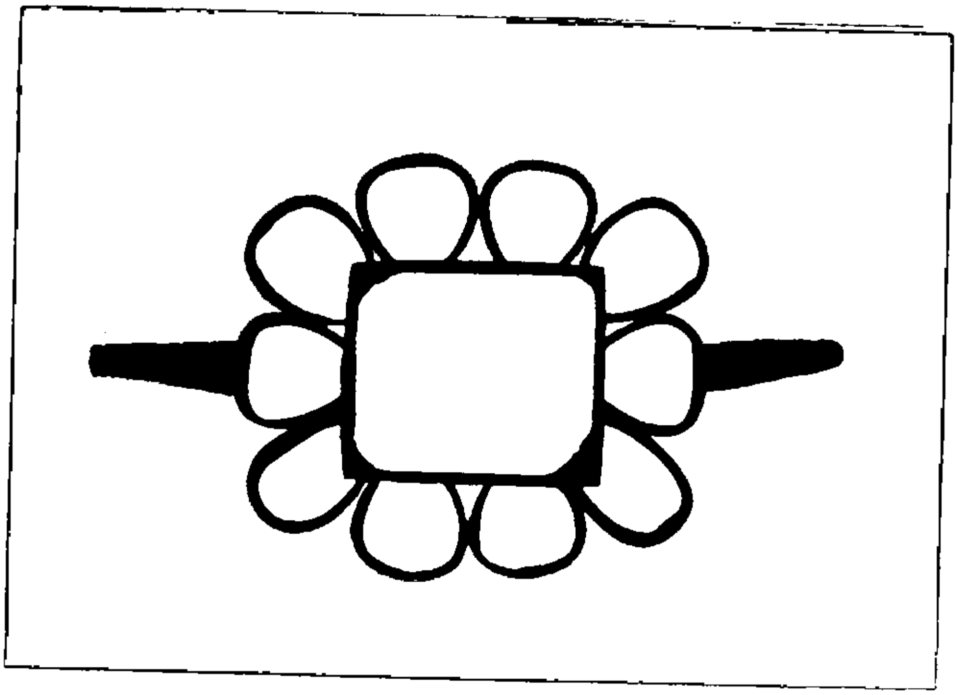

চিত্র নং (৫০) দরিয়া-ই-নূর (বাস্তব পরিমাপে), ঢাকার নওয়াবদের

চিত্র নং (৫১) দরিয়া-ই-নূর, ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

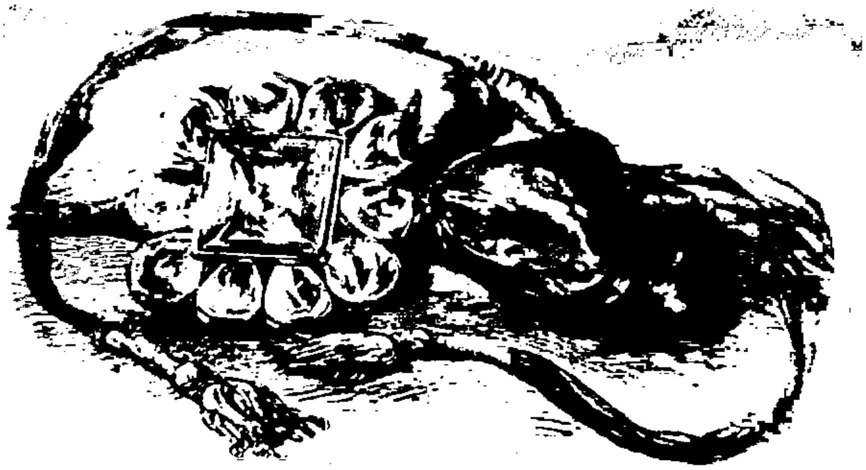

চিত্র নং (৫২) পারস্যে অবস্থানকালে ঢাকার দরিয়া-ই-নূর

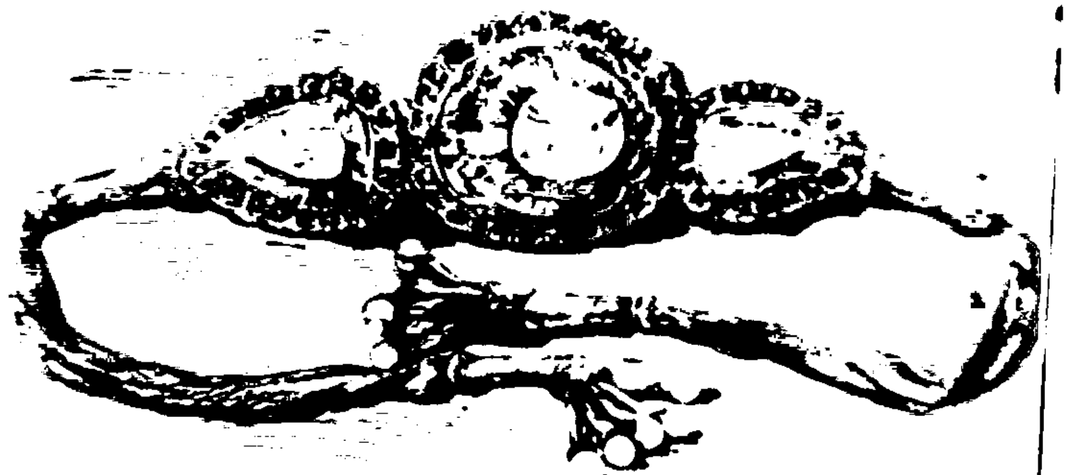

he diamond in its 'original setting', designed by Ranjit S

চিত্র নং (৫৩) বাজুবন্দরূপে কোহিনুর ঃ রণজিৎ সিংহের কাছে থাকাকালে

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৫৪) ঢাকা রেসকোর্স প্যাভিলিয়ন

চিত্র নং (৫৫) ট্রফিকাপ, নওয়াবের ঘোড়া শাহানশাহ কর্তৃক জয়কৃত।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৫৬) ট্রফি কাপ, ভাওয়াল রাজ প্রদত্ত

চিত্র নং (৫৭) রেসকোর্স ময়দানে নওয়াব সলিমুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার গবর্ণর এইচ. ই. স্যার জন এন্ডারসন, স্যার খাজা নাজিমউদ্দীন সহ ১৯৩৫ সালের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

চিত্র নং (৫৮) মোহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলোয়াড়দের সাথে

লর্ড এন্ডারসন ও খাজা নাজিমুদ্দিন (১৯৩৫)

১৯৩৬ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং লীগ ও আই. এফ. এ শীল্ড জয় করে। ছবিতে আই. এফ. এ শীল্ড ও লীগ ট্রফিসহ দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বাম দিক থেকে মাটিতে বসা: শফি ও জুম্মা খাঁ। চেয়ারে বসা: আজমত আলী (ফুটবল সেক্রেটারী), অধিনায়ক আব্বাস মীর্জা, সভাপতি স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, জেনারেল সেক্রেটারী খাজা নুরুদ্দীন, নুর মোহাম্মদ ও শফি ইস্পাহানী। দাঁড়ানো: বাচ্চি খাঁ, রশিদ জুনিয়র, রহিম, ওসমান, জাব্বর, সাবু, মাসুম ও আকিল আহমদ

চিত্র নং (৫৯) মোহামেডান স্পোর্টিং- এর খেলোয়াড়দের সাথে

খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা নুরুদ্দিন (১৯৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৬০) মোহামেডানের খেলোয়াড়দের সাথে

খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা নুরুদ্দিন

চিত্র নং (৬১) হকি খেলোয়াড়দের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৬২) নওয়াব বাড়ীর হকি খেলোয়াড়গণ ও বিজয়ী কাপ

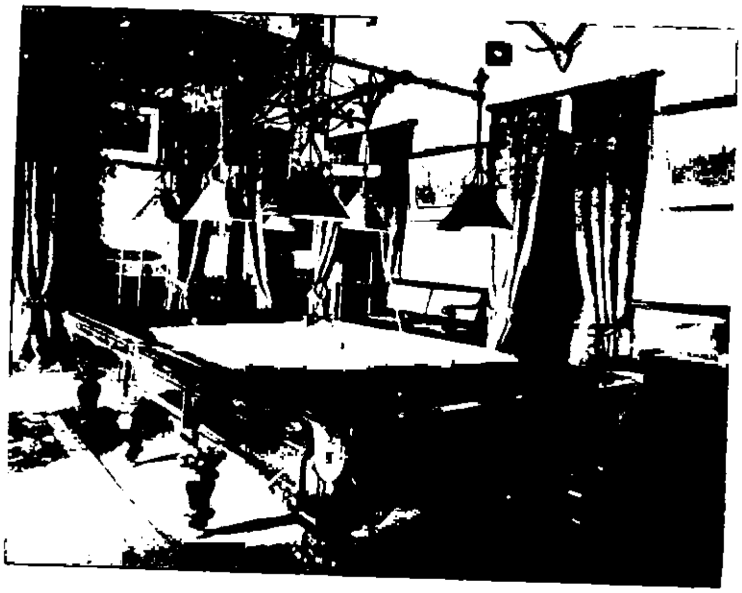

চিত্র নং (৬৩) প্রাসাদে বিলিয়ার্ড কক্ষ, ১৯০৪ সাল

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৬৪) প্রাসাদে কার্ডরুম, ১৯০৪ সাল

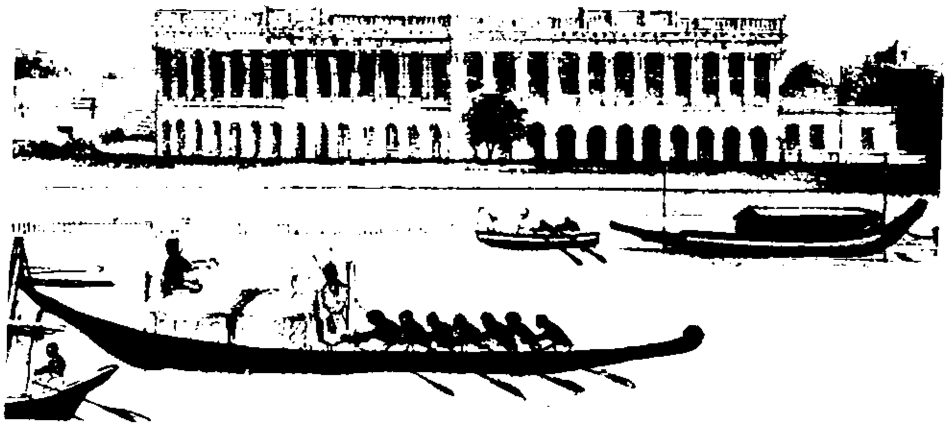

চিত্র নং (৬৫) খাজা আলীমুল্লাহর বাড়ী (১৮৩৫ আনুঃ)

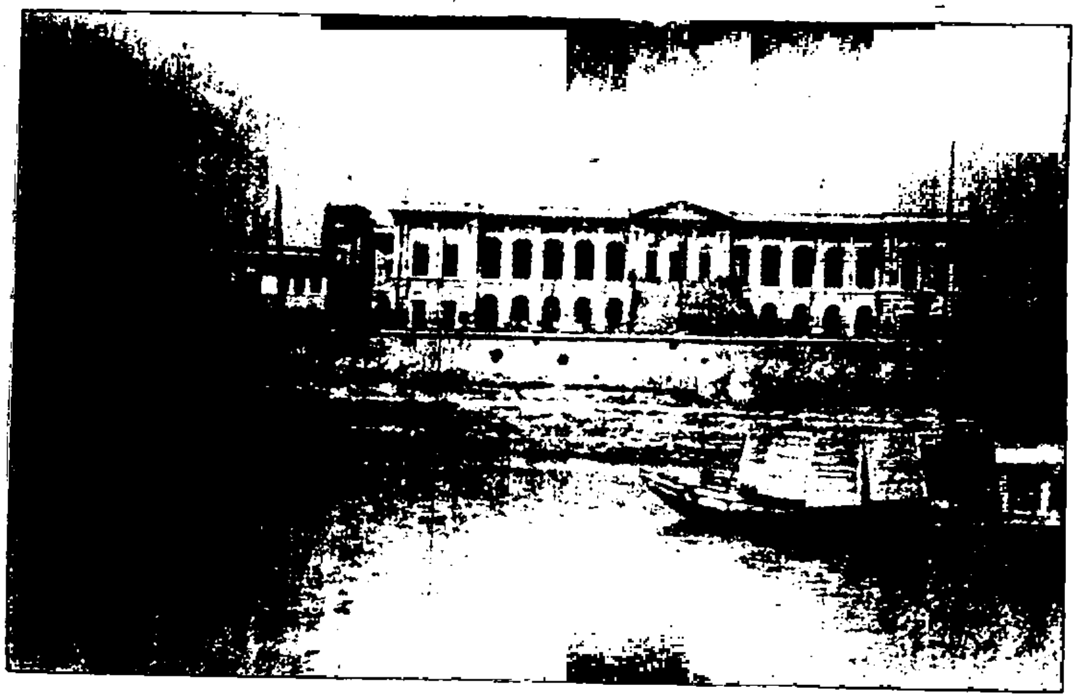

চিত্র নং (৬৬) আহসান মঞ্জিল, রঙমহল ও অন্দরমহল (১৮৮০ আনুঃ)

চিত্র নং (৬৭) টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিল (১৮৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

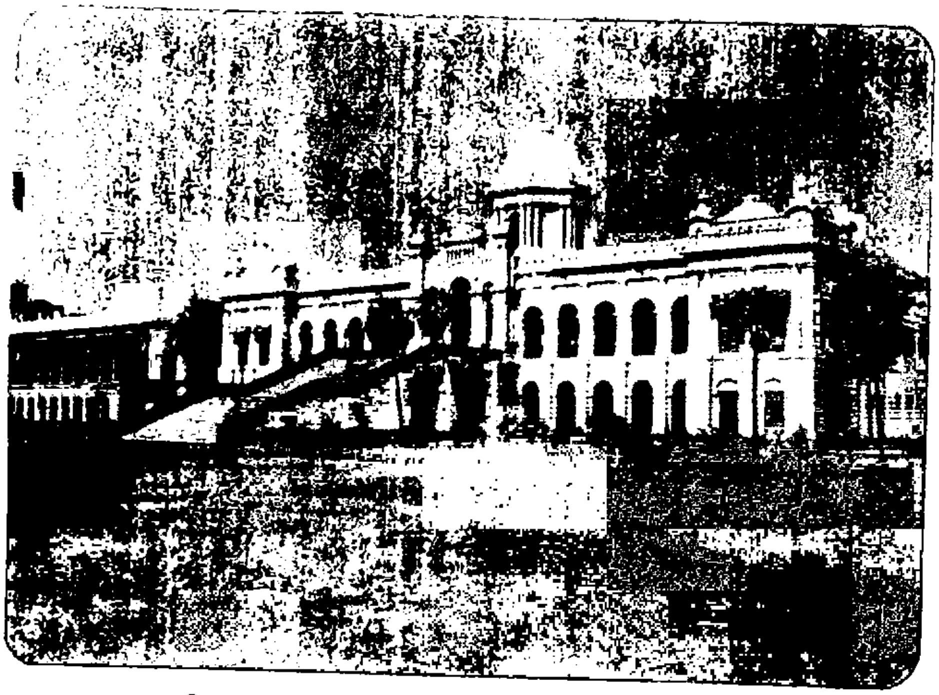

চিত্র নং (৬৮) আহসান মঞ্জিল, টর্নেডোর পর পুনঃনির্মাণ বৈশিষ্ট্যে

যা এখনো বর্তমান

চিত্র নং (৬৯) লর্ড কার্জনের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ, ১৯০৪ সাল

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৭০) আহসান মঞ্জিলে আগত লেঃ গভঃ ফুলারকে স্বাগত জানাচ্ছেন নওয়াব সলিমুল্লাহ

চিত্র নং (৭১) প্রতিকৃতি, আলমাসী বানু (১৮৯৭-১৯১৭)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৭২) আহসান মঞ্জিলে খাজা নাজিমুদ্দিনের সম্বর্ধনা (১৯৪৮)

চিত্র নং (৭৩) আহসান মঞ্জিলের প্রধান সিঁড়িকক্ষ (১৯০৪)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৭৪) খাজা মোঃ ইসমাইল, খাজা মোঃ আজম ও পরীবানু

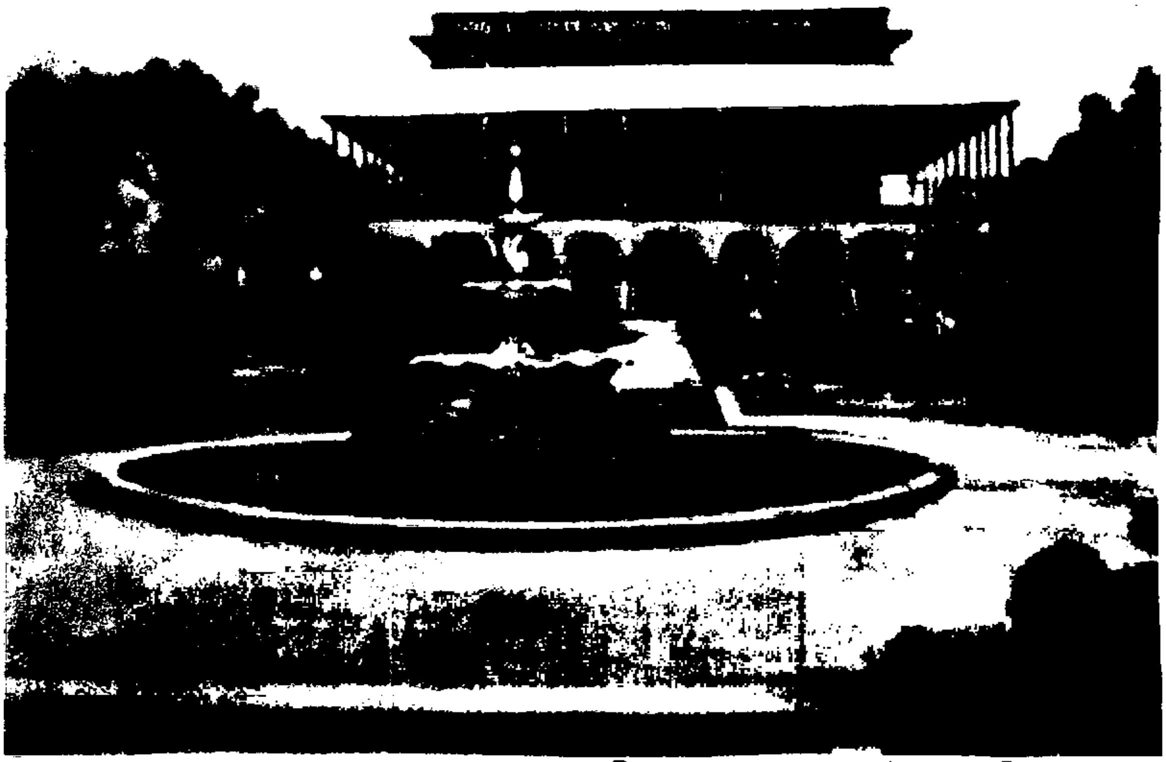

চিত্র নং (৭৫) শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিল

 Dhaka University Institutional Repository

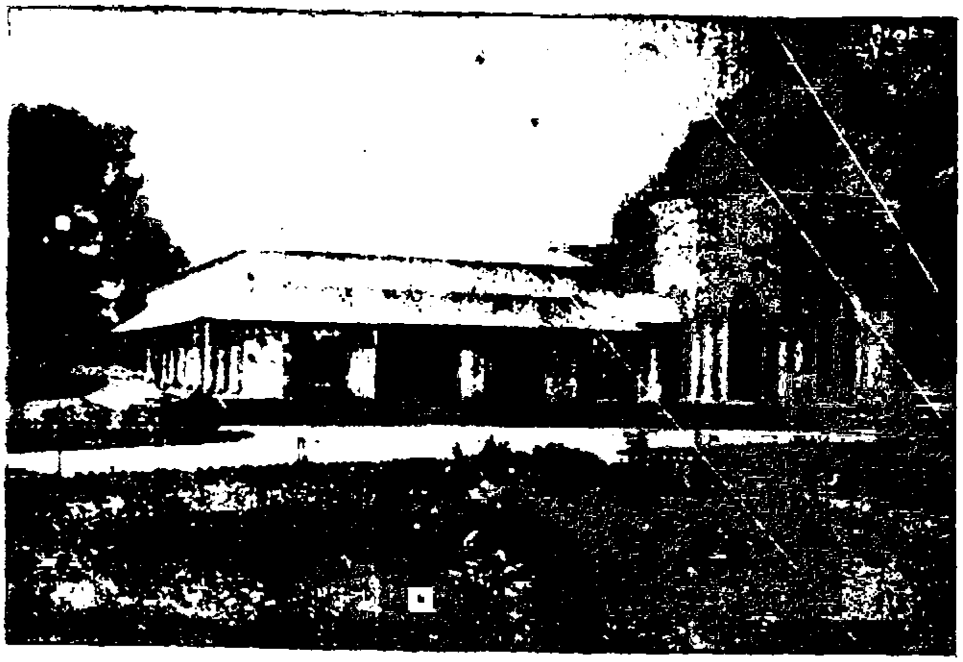

চিত্র নং (৭৬) শাহবাগে স্কেটিং প্যাভিলিয়ন (মধুর কেন্টিন)

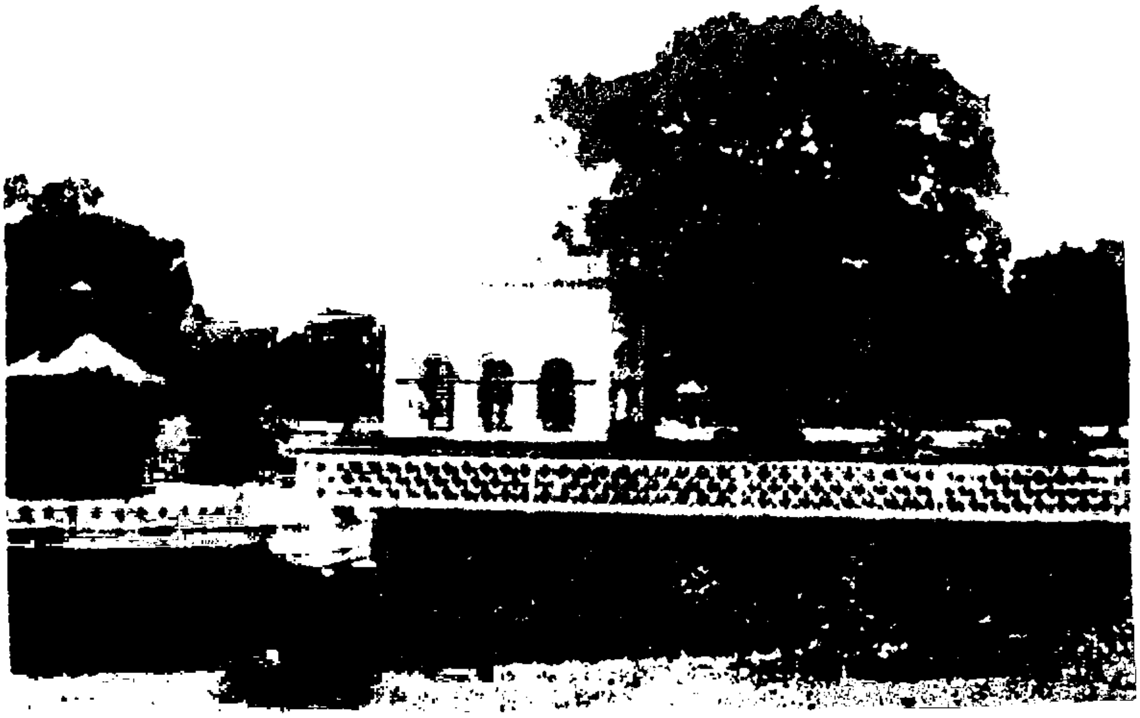

চিত্র নং (৭৭) সরোবরের মধ্যস্থিত দ্বীপের সাথে সংযোগ সেতু

 Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৭৮) নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন সভা

চিত্র নং (৭৯) দানা দিঘীর ঘাটে নির্মিত হাওয়াখানা

Dhaka University Institutional Repository

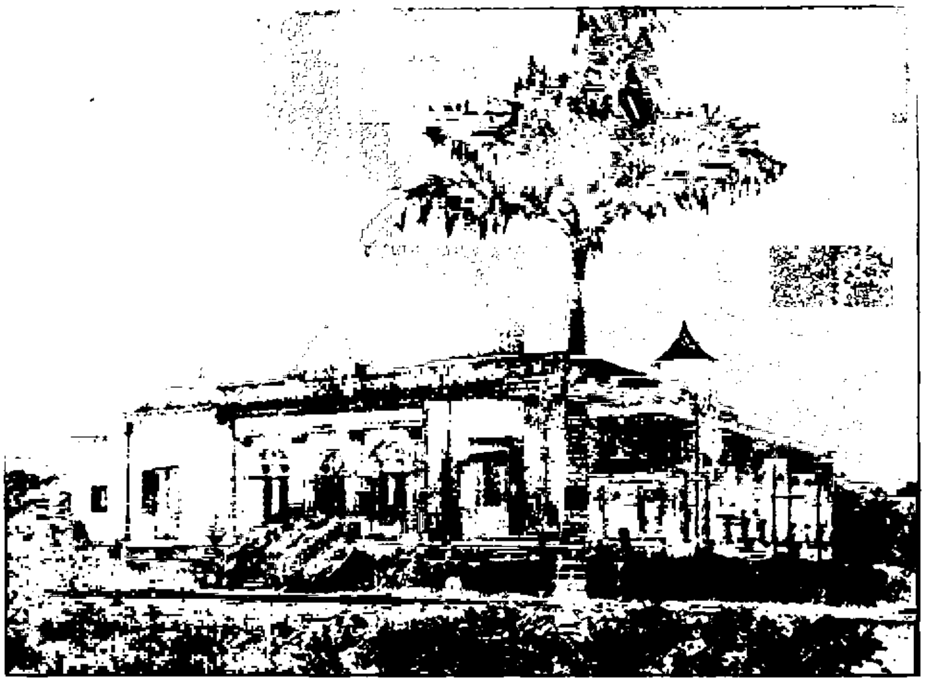

চিত্র নং (৮০) মানুক হাউস, দিলখুশা

চিত্র নং (৮১) দিলখুশার প্রধান ভবন

Dhaka University Institutional Repository

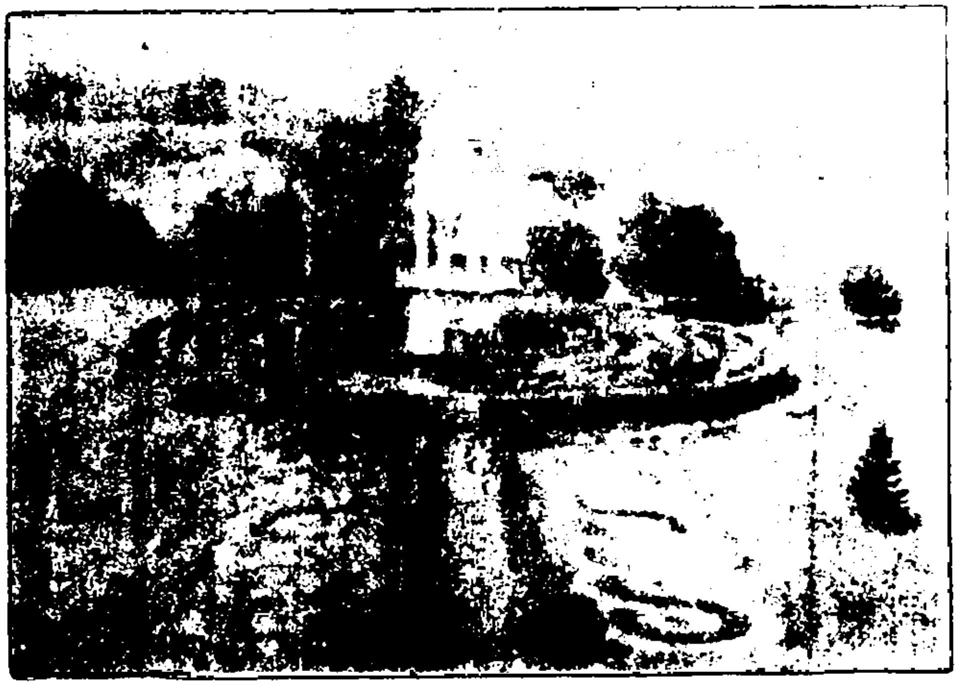

চিত্র নং (৮২) বুলবুলাইয়া টাওয়ার, দিলখুশা

চিত্র নং (৮৩) দিলখুশায় মার্বেল চন্দ্রাতপে হুরবানু

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৮৪) বাইগুনবাড়ীতে অন্দরমহল

চিত্র নং (৮৫) বাইগুনবাড়ীর দিঘী ও মসজিদ (১৯৯৮ সাল)

Dhaka University Institutional Repository

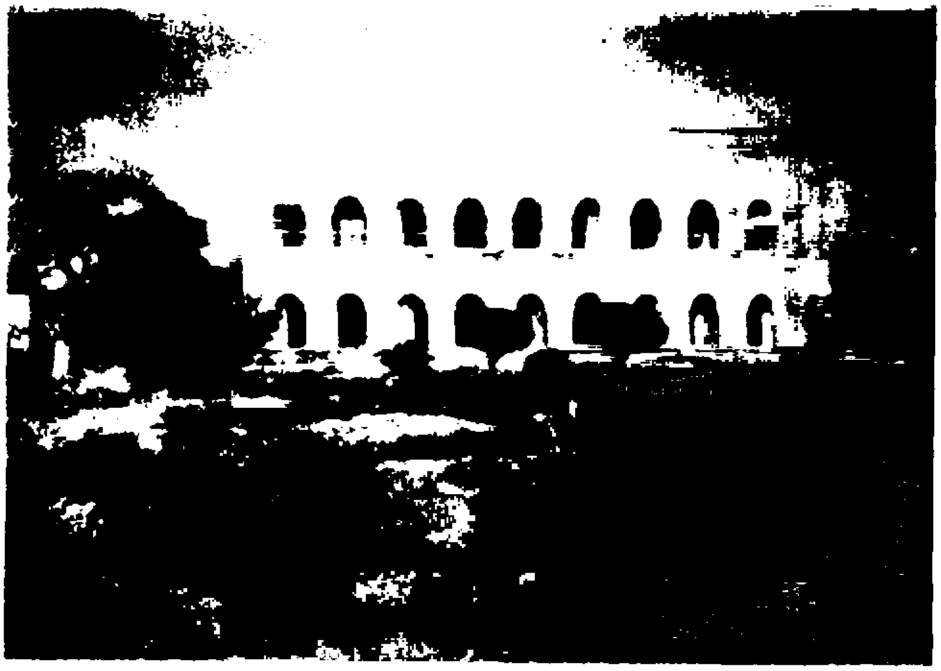

চিত্র নং (৮৬) বাইগুনবাড়ীর সদর কোঠা

চিত্র নং (৮৭) বাইগুনবাড়ীর আরেকটি ভবন

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং (৮৮) হাজীগঞ্জ দূর্গে হাফিজ মঞ্জিল

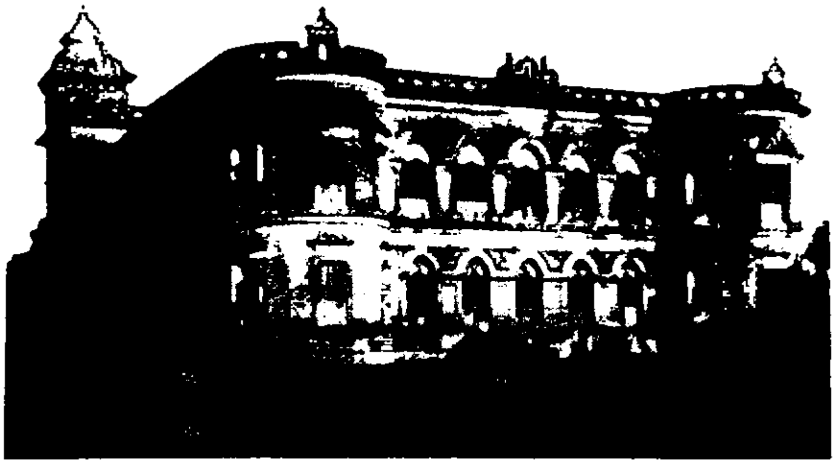

চিত্র নং (৮৯) হাফিজ মঞ্জিল, সম্মুখভাগ

চিত্র নং (৯০) নওয়াবজাদা খাজা হাফিজুল্লাহ

(১৮৬৮-১৮৮৪)

চিত্র নং (৯১) খাজা হাফিজুল্লাহ স্মৃতি স্তম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-১

English Translation of the Wakfnama, dated 27th. Bysakh 1253 B.S. (8th May 1846 A.D.)

1st Wakfnama.

From ancient times the custom of our family has been this, that any one who in our family be clever, wise, and intelligent, the entire works, great or small, of trade, & c., are entrusted to his responsibility, and he becomes the Headman (Rais), and others who belong to our family remain under his obedience and command, and the Headman, according to his opinion and requirements of the others, gives them allowances, and not one of them can dispute or quarrel about it and dare not disobey the Headman's orders, and he who acts against his opinion and orders, the Headman of the family excludes him form his clan, and according to the customs of the family , he can entertain no claim or right upon the inherited property. According to this, the late Moulvi Hafezullah, who in his time in our family was clever and wise, was the Mukhtar and Manager of all the works of the family, from the herditary money in which the rights of every member were included made different business of trade and money lending, and from the hereditary money which was invested in trade, etc. purchased the following properties (here the property is described), and treated the members according to the customs of the family, and the members also every one of them were under his obedience and commands. After his death K. Abdul Guffoor his son, who was intelligent and wise, with the consent of the members, sat in his fatehr's place, and entered the properties which were in his father's name in that of his own, and became the Headman, and form the money of the inhereited property made the following pruchase (description of the property), and with the members of the family behaved according to the custom of his predecessors. When K. Abdul Gafur died, most of the members were minors ; none were fit to discharge the duties of the Head of the family, although K. Alimoollah, who is clever and intelligent, was present at the time, and according to the rules of the family, the post of the head of the family belonged to him. But as he had, by his personal exertions, acquired property, and heaps of personal works were pressing upon him, he had no leisure to attend to the duties of the Head of the family ; therfore he did not wish to accept it. At last, when he saw that if he altogether refused it, the family may be ruined, so with this condition, that till such period that we select another after they arrive at majority and appoint him as the Headman, he consented to look after the management, and carried out the works through the Estate servants under his orders. As it is incumbent upon us to keep up the old family customs which are calculated to improve our property and circumstances, and to act contrary to which may, cause our disgrace and ruin, not withstanding that, owing to the piety, good faith, and wisdom, which existed in former times, the custom of having and documents was not required for this purpose, and the descendants acted according to the customs of their ancestors without any documents for these purposes, yet, as the present time, which is an age of disturbances and mischief, foresight requires that such a way be found out which may not disturb the family customs, and the course on which depends the improvements of our circumstances and property must either willingly or unwillingly be adopted, and that no one may, either according to the laws or sara,

Dhaka University Institutional Repository

go against it ; therefore we in soundness of mind, etc., make the abovementioned properties , which belong to us and are in our possession, Wakf for ever (eternity), and to enjoy the proceeds of the same we first appoint ourselves, then our descendants and children, generation after generation, then our relatives, and then the poor and destitute, and all of us make K. Abdul Gunny, who is one of our family, and is clever and intelligent, Matwali of the above properties. The Matwali is required, first, to pay the Government revenue attached to the properties ; afterwards, as it is written below, spend the income and profits of it, i.e. pay allowances to the members of the family ; after giving the allowances, whatever remains keep in deposit ; and in rejoicings and mournings of the members pay them, according to the circumstances, as much as he considers necessary; and in the increase or decrease of the same we shall have no objection, and he should pay off the debts, which now exist upon the family. Before the liquidation of the debts, we shall draw allowances according to the first list given at foot ; and after a period of six years, after paying off the debts, according to the second list given at foot, (he) shall pay us allowances. The Matwali has powers, whenever he considers it advantageous and desirable, to sell some of the Wakf property, and, in place of the same, purchase other properties, and that purchased property also, as mentioned above, will become Wakf. We have no power to dismiss the Matwali, and the Matwali has powers, that at the time of descending of the signs of the necessary mandate (means when he perceives sings of approaching dissolution), to appoint another in his place, whom he may know to be clever and intelligent, and who may also belong to our family to the post of Towliat, and the Powers of Matwali appointed by the present Matwali will be like the powers vested in the present Matwali. If by any chance the Matwali does not appoint any one during his existence, then we and our representatives will have power to unanimously appoint one who may belong to our family, and also be clever and a man of business, and if some wish to appoint one and some another, then he who may be selected by the majority shall get the post.

As we know by experience that to carry matters into the Courts of the present age on various grounds is the cause of the ruin of the family, and as we, who have made these properties Wakf and withdrawn form ourselves the authority we possessed only with this view, that the family customs may not be disturbed and properties which are the source of our existence and livelihood may be preserved form ruin and to take matters into Court is directly against this object; therefore we shall have no power to go to Court in accusation of the Matwali on any grounds whatever. But if the Matwali stops our allowances, then we, after obtaining permission form three such members of the family who may be fit persons to give an opinion, shall have power to go to Court for the settlement of this special matter.

It should not be hidden that neither ourselves nor our heirs shall have power to sell or give away the allowances which are fixed for us from the proceeds of the Wakf properties, because, since we have appointed our descendants, children, and the poor and destitute to enjoy the proceeds of the Wakf properties, selling or giving away the same to another will frustrate that object, although by the wording and object of this writing that is clearly understood, yet we see no harm in repeating the same in this place for still better understanding. If for any of the Wakf property it may be necessary to go to Court, the Matwali shall be able to do so, or, if any one brings any complaint or suit, the responsibility of it will remain with the Matwali. The Matwali shall also be able to make the settlement of the estate properties. Dated 27th Baisakh 1253 B.S.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

ধনবিবি ওয়াকফ প্রপার্টি (পুর্বপুরুষের সম্পত্তি চতুষ্টয়) -এর তালিকাঃ

১। জিলা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিভূক্ত ১৪১৩ নং পরগনা বোজরগ ওমেদপুর (১৩ আনা হিস্যা) খারিজা তালুক মৌজে ফুলঝুরী ও আয়লা তিয়রখালী ষ্টেশন ও সব রেজিষ্টর গুলীসাখালী ইত্যাদি সদর জমা মঃ ৩০২টা. ৭ আনা পৌনে ৭ কড়া ও তদধীন সর্ব্বপ্রকারের হকিয়ত হায়- ৩০২৫/-

২। জিলা ময়মনসিংহের কালেক্টরীর তৌজিভূক্ত ৫০৩১ নং পরগনা আটীয়া হিস্যা ২ আনা ৫ গন্ডা ষ্টেশন ও সব রেজিষ্টর সেরাজগঞ্জ সাহাজাদপুর মানিকগঞ্জ টাঙ্গাইল ও ষ্টেশন গোপালপুর গয়রহ সদর জমা মং ৬০৫৬/- ৪ আনা তদধীন সর্ব্ব প্রকারের হকিয়ত হায়- ৬০৫৬২টা. ৮ আনা

৩। পরগনা বরদাখাত হিস্যা ৮ গ ২ কড়া ৪ ধুর ত্রিপুরার কালেক্টরীর তৌজিভূক্ত ২০২ নং ষ্টেশন মুরাদনগর দাউদকান্দী গৌরপুরা ও সব রেজিষ্টর মুরাদনগর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর জমা মং ৪৩১৭ টা. ৭ আনা ৬ কড়া ১ ক্রান্ত তদধীনস্থ সর্ব্ব প্রকারের হকিয়ত হায়- ৪৩১৭৫/-

৪। পরগনা বরদাখাত হিস্যা ১০গ. জিলা ত্রিপুরার কালেক্টরীর তৌজিভূক্ত ২০৪ নং ষ্টেশন ও সব রেজিষ্টর তথা সদরজমা মং ৯৯৯৯ টা. ১০ গ. ৪ আ ১ ক্রান্ত ও তদধীনস্থ সর্ব্বপ্রকারের হকিয়ত হায়- ৯৯৯৯ টা. ৪ আ.

৫। ঢাকা শহরের মধ্যস্থ দেবী দাসের ঘাট প্রকাশ্য সুভাগঞ্জস্থিত নিষ্কর ভূমির চৌহদ্দি বুড়িগঙ্গা নদীর লাগ রহমতগঞ্জের লাগ পূর্ব্ব, সোয়ারী ঘাটের জমির লাগ দক্ষিণ ইমামগঞ্জের জমির পশ্চিম এই চৌহদ্দিস্থিত বসত প্রজা ও হাট ও তদধীনস্থ সর্ব্বপ্রকারের হকিয়ত হায় মূল্য অনুমান ১০০০০/-

৬। ঢাকা লালবাগ ষ্টেশন ও সব রেজিষ্টরের অধীনে ব্যাগম বাজারস্থিত বাগিচা তাহার চৌহদ্দি পূর্বে কুচা গলির রাস্তার উত্তর সরক দক্ষিণে মৃজা কাজিমের বাড়ী পশ্চিমে মৃজা ফতেআলীর ইমামবরা দ্বিতীয় কিত্তার উত্তরে সরক দক্ষিণে ও পশ্চিমে কুচা গলীর পূর্ব্ব কবরস্থান ও জুমনের বাড়ী এই চৌহদ্দিস্থিত বাগিচা- ৫০০/-

৭। একই মহল্যাস্থিত মৃজা কাজিমের বাড়ীর লাগ উত্তর গলির পশ্চিম ও দক্ষিণ ইন্দারার ও মগবরার লাগ পূর্ব্ব বাগিচা ময় চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরময় তহতি (মধ্যস্থিত) জমি- ৫০০/-

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৩

খাজা আলীমুল্লাহকে দেয়া লাদাবীপত্র (ফোরখাতনামা) ২৭ বৈশাখ ১২৫৩ বাংলা

APPENDIX B.

Signed by me ... ... Abdool Summud.
" " " ... ... Abdool Ally.
" " " ... ... Abdool Shokoor.
" " " ... ... Abdool Guffar.
" " " ... ... Abdool Raheem.
" " " ... ... Abdool Kadir.
" " " ... ... Abdool Hamid.

...bee.	Ashmutonnissa Khanum.	Abdool Rezak.
...anny Khanum.	Nobee Khanum.	Jhubhoo Khanum.
Sonawar Bibee.	Zeenub Khanum.	Hyutounissa Khanum.
Raby Khanum.	Kamurulnissa.	Nuzmonuissa Khanum.
Roopee Bibee.	Ezutonnissa Khanum.	Baderronnissa Khanum.
Futma Khanum.	Zuhoran Bibee.	Zenut Khanum.
	Ameena Khanum.	

To the worthy of remembrance Khajeh Alimollah Saheb, son of Moulvi Khajeh Ashin.ollah Saheb, deceased, of Kumartoole, of good behaviour.

(We Dhan Bibee, mother; Khajeh Abdool Guffar; son; Ashmutannissa Khanum, Nobee Khanum, daughter, Bunnee Bibee, Sonawar Bibee and Roopee Bibee named widows, Rabya Khanum sister's daughter, Khajeh Abdool Rezak, sister's daughter's son, Zeenub Khanum and Bodrunnissa Khanum, sister's daughter's daughters heirs of Khajeh Abdool Guffoor, deceased, son of Khajeh Hafizollah, deceased, and Khajeh Abdool Kadir, son, Kamuralnissa Khanum, Nuzmonnissa Khanum and Ezutonnissa Khanum daughters, Khajeh Abdool Rezak grandson by son Zeenub Khanum, Fatma Khanum and Baderunnissa Khanum grand daughter by son, heirs of Moulvi Khajeh Abdool Azim Saheb, deceased, brother of Khajeh Hafizollah, deceased, and Khajeh Abdool Shookur son and heirs of Khajeh Kaseem Saheb, deceased, brother of Khajeh Hafizollah, deceased, and Khajeh Abdool Summud, Khajeh Abdool Wazid, Khajeh Abdool Rahim and Khajeh Abdool Hamid, sons, and Zeenub Bebee and Ameena Khanum, daughters, and Zoohurun Bibee named widow and heirs of Khajeh Solimollah Saheb, deceased, brother's son of Khajeh Hafizollah, deceased, inhabitants of Kumartoole Ghaut. Deby Dass and Begum Bazar, and Bankshall Thannah Sudder, in the city of Dacca,

Dhaka University Institutional Repository

do hereby execute a Ladanee. Farkhatty petition or instrument of relinquishment of claim (and) release to the effect and purport following :—

It has been the usage and practice of our family from the time of my forefather that, any one member of the family who is the best qualified of all, and most competent to manage the affairs, and to. preserve the estate, is entrusted with the management of the entire affairs, and performs all and every affair accordingly. Our ancestor, K. Hafizollah Saheb, who was well qualified and competent in every way was entrusted with the management of all the affairs. He carried on trading, &c., business with ancestral funds and purchased in his own name, 8 gundahs 2 cowries 1 krant 3 dhools share of Pergunnah Burdakhat, of which the Government Revenue Rs. 4,317 7 annas 6 gundahs 1 cowrie 1 kran... payable into the Collectorate of Tipperah, and also purchased in the na... Moulvi Khajeh Abdool Azeez, deceased, another 10 gundahs zemindar... of the said Pergunnah of which the Government Revenue is Rs. 4,999 1... 9 gundahs 1 cowrie 1 krant and likewise purchased in his own name the (...) or dependant Talooki of mouzah Aila Teewarkhali, and ... Phooljhooree within the fiscal jurisdiction of Zillah Backergunje, of wh... Sudder jummas Rs. 372 4 annas 3 gundahs 2 cowrie and after deductio... anna share with jumma of Rs. 69 12 annas 9 gundahs 3 cowries, the ... 13 annas with a jumma of Rs. 302 7 annas 5 gundahs 3 cowries. In re... bringing into cultivation these properties became indebted to cre... large amount and then departed this life. On his death his son K... Guffoor who was similarly qualified became the representative of his ... was appointed Surburakur or manager, managed all the said business, ... purchased in his own name 2 annas 5 gundahs share of Pergunnah ... of which the Sudder jumma Rs. 6,056 3 annas 6 pies is payable into the Collectorate of the district of Mymensingh, and breathed his last in 1238. As some of us were then minors, and we were incompetent to look after and manage the said business, &c. You being the best qualified in every respect, undertook, agreeably to the usage of our family and with the consent of the guardians of the minors and of ourselves, the management and collection of the said properties and business, and the realization and payment of the assets and liabilities thereof as a trust, and have paid off with the profits of the said properties and sums of money realized in part from the debtors to the tahbeel of the said business large debts due to mahazans of the time of the management of our ancestors Khajeh Hafizollah and Khajeh Abdool Guffoor. Now we all have attained our majority and have made necessary and careful enquiries into the papers of the past and present time, and have come to know, that in point of truth you have actually paid off our ancestral debts, *i.e.*, debts due to mahazans, and the expenses of our maintenance, &c., with collections and realizations made by you from our aforesaid properties real and personal during the period of your management up to this date, that there is no money whatever in the tahbeel and you have misappropriated no sum of money, rather the sum of Rs. 12,440 is still due to you, the sum of Rs. 16,660 out of Rs. 21,000 principal after payment of Rs. 4,340 due to Ahmeed Hossen and Mozuffer Hossen, the sum of Rs. 9,000 out of Rs. 11,000 after payment of Rs. 2,000 due to Nakesa Khatoon, widow of Moulvi Mahomed, the sum of Rs. 10,000 6 annas out of Rs. 15,525 6 annas after payment of Rs. 5,525 due to Moulvi Mahomed Said, and the sum of Rs. 2,900 out of Rs. 3,873, after payment of Rs. 973 due to Assadollah, in all Rs. 51,000 4 annas principal are still justly due by us. Now, we have, *of our own free will and accord, while in the enjoyment of good health, voluntarily, endowed the abovementioned property by a second deed, appoint Kahjeh Abdool Gunny Saheb, Motawallee, and entrust him with the management of all affairs, he will make settlement, &c.*, of, and do all and everything in connection with the abovementioned property, and if any action will have to be brought in respect of anything, in the Civil Criminal, Revenue or any other Court, he will bring the same, and if any action is brought by any body in respect of anything he will defend the same. We entrust him with the charge of paying off the said debt. He will gradually pay

 Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৪

খাজা আহসানুল্লাহর অনুকূলে সম্পাদিত তৌলিয়তনামা, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ

APPENDIX C.

11th September 1868. Towliatnamah in favor of Khajeh Alv... the ...

Towliatnamah dated the 11th September 1868, corresponding with the 27th Bhadra 1275 B.S. corresponding with the 23rd day of the month of Jamadiala-wal 1285 Heejree.

I Khajeh Abdool Gunny, am son of the Most respected Khajeh Alimollah, of Kumartoolee in the city of Dacca.

While in the enjoyment of good health and sound sense and in the exe- --, of the legal and ordinary rights and privileges, I do hereby of my own free w- --- accord, without compulsion or aversion, declare and give in writing as follo-- -- That 8 gundahs 2 cowries 1 krant 3 dunts 4 dhools share of *zemindary P- -- nah Buldakhal* of which the jumma (Revenne) Rs. 4,317 7 annas 8 g- - 1 krant is payable into the Collectorate of Zillah Tipperah was p- - *in the name of Moulvi Hafizollah, deceased, and Aila Turkhati and Ph- - - Khasya, Pergunnah Burorgomedpore* of which the Sudder jumma is Rs. 37- -- 3 pies 10 cowries and after deduction of 3 annas share bearing a jumm- - - - 12 annas 9 pies 10 cowries, the remaining jummahs is Rs. 302 7 annas - - - - 7 cowries, in the district of Backergunge were *acquired under and b- - - Kaimee Pattah or permanent lease in favor of the aforesaid Moulvie, deceas- - - one-half*(1½) *anna share* of the above named Pergunnah Buldakhal of which - - - mah Rs. 4,499 14 annas 2 gundahs 1 krant, in the District of Tipperah aforesai- -s *purchased in the name of Moulvie Abdool Azim, deceased,* and 2 annas 5 gundahs share of *Pergunnahs Attya of which* the jumma Rs. 6,056 3 annas 6 pies is payable into the Collectorate of Zillah Mymensingh,*was purchased* in the name of the Khajeh Abdool Guffoor, deceased, *under the terms and the contents of the Towliatnamah dated the 27th Bysack 1253 B. S. sealed and signed by the heirs of Khajeh Abdool Guffoor, deceased, son of the* aforesaid Moulvie Hafeezollah, deceased, and the heirs of the said Abdool Azim, deceased, *I as Motawallee hold the abovementioned shares under my management, control and authority* and in my possession now under the directions embodied *in and under the authority vested in me by the said Towliatnamah,* I do hereby appoint in my place and stead and with all the said authorities and powers my son Khajeh Ashunollah, who is an able and intelligent person and belongs to the family of the parties who have sealed and signed the said Towliatnamah to the Office of the Motawallee, and deliver and make over the properties in the said Towliatnamah mentioned and the papers Sudder and Mofussil, connected therewith, from my custody and control unto his possession, control and management. The said Motawallee should by expunction of my name as Motawallee, have his own name recorded and published as Motawallee in the Sudder and Mofussil papers, and also in the papers of the Collectorate and of the Civil Court in all and every case in all and every Court connected with the properties specified above, being all the said properties under his own possession, management and control in his capacity of Motawallee and perform and discharge the duties of the Towliat (Trust). To this purport I give these few words in writing in the shape of a Towliatnamah, announcing the appointment of a new Motawallee so that the same may serve as a document in time of need.

Writer,

Abdool Guffar, son of Khajeh Abdool Guffoor, deceased.

*The dotted blank portion are not available on the original document due to the damaged by the insects.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৫

আটিয়া পরগনার ওয়াকফকৃত সম্পত্তির জন্য আব্দুল গনির অনুকূলে সম্পাদিত
তৌলিয়তনামা (ফার্সী) ৮ জুন ১৮৫৪ খ্রীঃ

Dacca No. 23. A true copy Registered the 8th.
of June 1854 at 3 P.M. in Book I. Pages 120 to 123.
Sd/- J. F. Middleton
Registrar of Deeds.

[illegible]

الواقف بمصدق الیه خواجه علیم الله ابن خواجه احسن الله مرحوم ساکن کمار تولی
من محلات بلدهٔ ڈھاکہ چنین اقرار می کند و نوشته می دهم که از پرگنهٔ اٹیه
وغیره رقم حصه پنج آنه پنج کوری یک کرانت که صدر جمع آن بجمله ہزار
دو صد و ہشتاد و نه روپیه پنج آنه دو پائی شامل کلکٹری ضلع میمنسنگھ
مقرر است رقم مذکور را شانزده آنه نوده حصه ہفت آنه جمعی ہشت
ہزار یک روپیه نه آنه ۳ پائی و دو و نیم کرانت و از تعلقه قسمت بھاٹکوره
وغیره نمبر ۳۲۸ تابعه پرگنه پٹیه باز و جمعی مبلغ دو صد و چهل و ۳ روپیه دو آنه
مشموله کلکٹری ضلع مذکور حصه ہفت آنه جمعی یکصد و شش روپیه پنج آنه ده پائی
ده کرانت و از تعلقه قسمت دیلی بیره و بھالی نمبر ۱۵۹۰ تابعهٔ پرگنه کاگماری
حصه بست و ۳ روپیه یک آنه دوازده گنده یک کوری مشمولهٔ ہمان کلکٹری
حصه ہفت آنه جمعی ده روپیه یک آنه چهارده گنده و از تعلقه تکمی موضع

Dhaka University Institutional Repository

کمار پاره مشمولهٔ پرگنه چاند پرتاب متعلق ضلع ڈھاکہ حصه هفت آنه و حصه
هفت آنه حویلی پخته و اراضی تحتی و لواحق آن واقع موضع کٹرا متعلقهٔ
پرگنهٔ ایضاً مشمولهٔ تهانه پاکر که حویلی مذکور معروف و مشهور است از آن حق خاص
من مقرات و مالک و ~~ملک~~ متصرف اینهمه حصص هفت هفت آنه مذکوره بلا شرکت
احدے از روی ڈگری عدالت اعلی صدر امینے ضلع میمنگه نمبری ۹۹ سنه ۱۸۴۸ع که
ڈگری مذکوره بصدر عالیه کلکته یکم جون سنه ۱۸۰۳ع از نمبر ۹۷ سنه ۱۸۵۳ع بحال و برقرار ماندست
من واقف هستم و نیز مبالغ سنگینی بوده واصلات حصص مذکوره از روی ڈگری
ضلع و فیصلهٔ صدر عالیه واجب یافتنی من واقف بذمهٔ سخاوت علی خان مولوی است
اکنون من واقف در حالت صحت ذات و ثبات عقل به رضاء و رغبت اینهمه حصص
هفت هفت آنه مذکوره و توابع و لواحق و مرافق و ماحصل و توابع آن را صدقه موقوفه
مؤبده بوجه خیر و بر بر مساکینی و فقراء و محتاجی و برائے خرچ ضروری مسجد والانی
واقع کمارتولی و اطعام صائمین و محتاجین شهر رمضان و برائے انجام هر قسم امورات
خیر نمودم واقف موبد بوجه الله کردم وقفاً صحیحاً شرعیاً و ظاهر است که من واقف
بعلت کبر سنی بوجه احسن انجام امورات وقف کردن نخواهم توانست لاجرم
من انجملهٔ اولاد خودم جناب عبد الغنی صاحب را که مردم صالح و امینی و ذی مقدور

Dhaka University Institutional Repository

و بے طمع اند بجہۂ تولیت وقف مذکور برائے انجام امورات آن مقرر کردم

و متولی وقف مذکور از طرف خود گردانیدم وحقیت و تصرف خود از املاک موقوفہ

ترک گفتہ برائے انجام امورات خیر مذکورۂ بالا املاک موقوفہ را بدست متولی موصوف

سپرد و تفویض کردم باید کہ متولی موصوف است بمقدمات متعلقۂ املاک موصوفہ

بہ عدالتیکہ دائر باشد یا آیندہ رجوع گردد بجائے من واقف بحقیت تولیت

قائم گردیدہ ہر گونہ تدابیر و تلاش برائے حفظ املاک موقوفہ نمائید دخول بصورت

مصالحہ با سعادت علی خان مدیون ہر مقدار کہ باشد ماحصل و منافع املاک

موقوفہ کہ بذمہ خان مذکور است بدست خود آرند یا بذریعہ عدالت وصول کند

اختیار من دارند و متولی موصوف را اختیار نیست کہ املاک موقوفہ را

بیک نوع انتقال و ضایع کند الا اینکہ اگر مناسب داند پس آن را بیع نمودہ

از ثمن آن دیگر املاک خرید آن را بمنزلہ املاک موقوفہ مذکورہ آرند یا از املاک

موقوفہ املاک دیگر را بدل سازند و منافع آن بعجہ اللہ و بعجہ خیر ... مرقومۂ

بالا صرف نمایند و متولی موصوف را اختیار است کہ یک یا دو یا سہ کس را خواہ

از جانب یا از اقارب شان و من واقف باشند از طرف خود بودہ مشروع

 Dhaka University Institutional Repository

متولی نمایند و اختیار خود یا اختیار آنها دہند و اگر متولی نکرده باشند پس بعد
متولی موصوف از اولاد ذکور شان کسیکه اہل شعور و درک خواہد بودند متولی
وقف مذکور خواہد شد و این عہدۂ تولیت بمتولی موصوف برائے نسلاً
بعد نسل تفویض کرده شد و واضح باد که تفویض اختیار و تبدیل املاک موقوفه
که بدست متولی داده شد مشروط برین شرط خواہد بود که برائے حفظ و
صیانت نفس املاک موقوفه وغیره و از آن متولی را بکار و بار آن ضرورت دائر
گردد ورنہ در صورت فقدان شرط مذکور متولی را ہرگز اختیار انتقال نخواہد
بود بناءً این چند کلمه بطریق وقف نامه نوشته داده شد که عندالحاجت
حجت باشد۔ محررۂ چہارم شہر رمضان مبارک سنه ۱۲۷۰ ہجری نبوی صلعم۔ مطابق
یکم جون سنه ۱۸۵۴ موافق بستم جیٹھ سنه ۱۲۶۱ بنگله یوم پنجشنبه۔ راقم الوثیقه
امیر الدین محمد ساکن ڈیوری بیچارام من محلات بلدۂ ڈہاکہ۔

بشیر علی۔ وکیل محمد ناظم۔ نعیم الدین محمد۔ غلام مخدوم ولد منشی کاظم علی ساکن الی آل
... شہد بافیه الجید سید عبد مجید۔ محمد برکت ... گولکر غلام عباس ساکن

Dhaka University Institutional Repository

(۵)

پل چاند خان - گواه شد میر قربان علی ساکن ڈیوری بجالیم - گواه شد گوکل کیشن

گواه شد مرتضی دت - گواه شد عبدالرحیم - محمد مهدی +++

ইসাদি শ্রী ভৈরব চন্দ্র সর্মা
সাং ওমেদপুর

ইসাদি শ্রী অর্জুন দেও -
ওং মৃত বদন দেও সাং ব্রাহ্মনকান্দা
থানা - নাশিরাবাদ

ইসাদি শ্রী নবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
সাং ওমেদপুর

ইসাদি শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দাস
সাং কোটালীপাড়া

ইসাদি শ্রী নাজিমুদ্দিন ওং কদরত বক্স
সাং তাওয়ান - থানে - সদর

ইসাদি শ্রী ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যেহেতুক দস্তাবিজ দেহেন্দা নাথে শ্রী নবকিশোর বসু মোক্তার মোক্তারনামা দ্বারায় হাজির আসিয়া এই দস্তাবিজের লিখিত সত্ত স্বীকার করিলেক অতএব হুকুম হইল যে দস্তাবিজ রেজেষ্টরি করা যায় এবং এই দস্তাবিজের লিখিত বিত্ত জেলা ময়মনসিংহের সাবিন নেযাতে সন ১৮৪৫ সালের চতুর্থ আইন অনুসারে এই দস্তাবিজ এক কিতা রেজেষ্টরি বহিতে নকল রেজেষ্টরি হওয়ার বাবতে উক্ত জেলা ময়মনসিংহের শ্রীযুত রেজেষ্টর সাহেবের সমীপে পাঠান যায় ইতি
সন ১৮৫৪ সাল ৮ জুন

মহকুম শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী
নকল মোহরের

তা ৫ জুন সন ১৮৫৪ সন
দুই প্রহর ৩ ঘণ্টার সময়
ইতি - শ্রী ... মোহরের

Copied & Read by
Mir Delawar ali
20/2/04
Compared by
Abdul ali
E.C.
20/2/04

True Copy
(Sd) S. A. Hossain
For Registrar
20. 2. 04.

Copied by
A... Ahmed Ali
28/2/20

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৬

আটিয়া পরগনার ওয়াকফকৃত সম্পত্তির জন্য খাজা আহসানুল্লাহর অনুকূলে সম্পাদিত তৌলিয়তনামা (ফার্সী) ১২ আগস্ট ১৮৯৩ খ্রীঃ

المعتصم بحبل الله القوی - بنده نواب سر عبدالغنی بهادر کے-سی-ایس-آئی

ساکن کمار ٹولی من محلات شهر ڈھاکہ - بحالت صحت ذات و ثبات عقل چنین اقرار صحیح

و اعتراف معتبر می کند که بذریعهٔ وقف نامه نوشته تاریخ چهاردهم ماه مبارک

رمضان سنه ۱۲۷۰ هجری نبوی مطابق یکم ماه جون سنه ۱۸۵۴ع والد بزرگوارم حصص مقرره

وقف نامهٔ مذکوره را وقف نموده بنده را متولی اوقاف مذکوره مقرر کرده بودند

چنانچه الی الآن به منشائے وقف نامه مذکور بحیثیت متولی خدمات متعلقهٔ تولیت را

بحسن و خوبی انجام و انصرام نموده و می نمایم - الحال بوجه کبرسنی و ضعف پیری سالی

باحسن وجوه انجام امورات وقف کرده نمی توانم - لاجرم لابدیست که از برائے انجام

خدمات شخصی لایق و صالح و متدین را بجائے خود بکار متولی برگمارم و اختیار خود

باو تفویض نمایم - ازانجا که برخوردار سعادت اطوار قرة العینی نواب

Dhaka University Institutional Repository

(۲)

احسن اللہ بہادر - سی - آئی - ای - جوانی صالح و امین و ذی مقدور و بے طمع و

متصف بجمیع اوصاف حمیدہ و فضائل پسندیدہ اند و کارہائے تولیت را

بعنوانِ احسن انجام کردن می توانند - لہذا حسب اختیار مندرجہ وقف نامہ

مذکورہ و منشائے واقف برخوردارم ممدوح را بجائے خود متولی اوقاف

مصرحہ و متعلقہ مفصلۂ وقف نامہ مذکورۃ الصدر نمودہ اختیارات و

تصرفات خودم بہ برخوردار موصوف تفویض نمودم و تحویل آمدن املاک موقوفہ

الی الیوم کہ نقد مبلغ ۲۰۱۷۱ روپیہ ۱۳ آنہ ۹ پائی - و کمپنی کاغذ مبلغ ۳۴۶۰۰ روپیہ

و جمیع یافتنی نزد قرضداران املاک مذکور مطابق حساب بدست برخوردارم

موصوف سپردم - اکنون لازم است کہ برخوردارم موصوف بجائے من بحیثیت

متولی انجام خدمات تولیت و انصرام امورات وقف بشروط دفعات مفصلہ

و مصرحۂ ذیل باحسن وجوہ نمایند -

نمبر۱ باید کہ برخوردارم موصوف بانجام دہی کارہائے تولیت بشروط

مصرحہ و مندرجۂ وقف نامہ مذکورۃ الصدر را ہموارہ پیش نظر دارند و خود را

Dhaka University Institutional Repository

پابند شروط مذکورۃ الصدر تصور نمایند +

نمبر۲ تحمیلِ اغراض و منشائے واقف للابدی و ضروری است باید کہ
برخوردارم موصوف کارے بعمل نیارند کہ خلاف منشائے واقف گردد +

نمبر۳ برخوردارم موصوف را لازم است کہ محاصل و آمدنی املاک موصوفہ را
بمصارف خیر و بر بر مساکین و فقرا و محتاجین و برائے خرچ ضروری مسجد واقع
واقع کمارٹولی و اطعام صائمین و محتاجین شہر رمضان و انجام ہر قسم
امورات خیر صرف نمایند +

نمبر۴ برخوردارم موصوف را اختیار است کہ از برائے حفاظت و نگہداشت
املاک موصوفہ ہرگونہ تدابیر و تلافی کہ مناسب دانند بعمل آرند +

نمبر۵ برائے انتظام و بندوبست املاک موصوفہ اختیارات تامہ کہ منیجر و
ٹرسٹی را حاصل است برخوردارم موصوف را حاصل خواہد شد +

نمبر۶ نسبت مقدمات متعلقہ املاک وقف بہر عدالتیکہ دائر باشد

 Dhaka University Institutional Repository

برخوردارم موصوف را اختیار حاصل است که قائم مقام منقر گردیده
تدابیر مناسب و چیزگیری شروع نمایند +

یا آینده دائر گردد برخوردارم موصوف را اختیار نخواهد بود که املاک

موقوفه را بیک نوع انتقال یا ضایع کنند الا آنکه اگر ضروری و مناسب

دانند پس آن را بیع نموده از ثمن آن دیگر املاک خریده آن را تحت املاک

موقوفه آرند و یا از املاک موقوفه املاک دیگر بدل سازند و منافع آن

مطابق شرط مرقومهٔ بالا صرف نمایند +

نمبر ۸ برخوردارم موصوف را اختیار است که یک کس یا دو کس

لایق را خواه از جانب خود و یا از اقارب خود شان و منتقر باشند

از طرف خود بطور مشروع متولی نمایند و اختیار خود باختیار آنها

دهند و اگر متولی نکرده باشند پس بعد متولی موصوف از اولاد

مذکور شان کسیکه بزرگ و قابل خواهد بود او متولی وقف مذکور خواهد شد

و این چنین عهدهٔ تولیت متولی موصوف نسلاً بعد نسل تفویض کرده شد

محررهٔ ۲۸ محرم الحرام سنه ۱۳۱۱ هجری قدسی مطابق ۱۲ اگست سنه ۱۸۹۳ ع

Dhaka University Institutional Repository

(৫)

مرقومہ

ظہور الحق ساکن ڈھاکہ

رحیم اللہ عرف پیارے صاحب - محمد منصور - وزیر علی - فخر الدین -

حبیب اللہ - گواہ شد خواجہ محمد یوسف ولد خواجہ محمد مہدی مرحوم احسن منزل ڈھاکہ

عبد الرزاق - محمد اصغر نقشبندی - عبد الواحد عرف منا - خواجہ کریم اللہ

Witness:-

R. Cobb. H. Loftus Weatherall. Geo. Garth.
Rajani Kanta Bose, Vakil. Hari Charan Chakrabarty, Vakil.
Prasanna Kumar Sen. Gobinda Chandra Das, Vakil.
Ananda Behari Guha, Bangla Bazar, Dacca.
Braja Behari Raya, Pleader, Judge's Court, Dacca.
Jogesh Chandra Ghosh, Kabirajes Lane, Dacca.

শ্রী দ্বারকা নাথ দত্ত - সাং আবিদা
থেশন - কোতোয়ালী - জিলা - ঢাকা
নয়াবাজার -

শ্রী সারদা চরণ বন্দোপাধ্যায়
জিং সাং ঢাকা লক্ষ্মীবাজার

শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ দাস
সাং জিং ঢাকা

শ্রী চন্দ্র নাথ সাধুখাঁ
সাং জিলা ঢাকা নলগোলা

শ্রী হরি মোহন বন্দোপাধ্যায়
সাং বড় জুলিনী - থেশন - সূত্রাপুর
জিলা - সাং ঢাকা - নলগোলা

শ্রী নীল চন্দ্র সেন - সাং জিলা - কোতোয়ালী ঢাকা

শ্রী পার্বতী নাথ দাস - সাং জিং মোগলটুলি
থেশন - সদর

Copied by
Aga Mohammad Ali
07.7/20

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৭

পারিবারিক সমুদয় সম্পত্তির জন্য খাজা আহসানুল্লাহকে মোতাওয়াল্লী করে সম্পাদিত ওয়াকফনামা, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ

APPENDIX D.

... ajeh Abdool Gunny am son of Janab Khajeh Alimollah, deceased, of ... ee in the City of Dacca.

... to the preservation and continuance of the name and dignity of my ... d forefathers, and to protection and maintenance of the properties and ... following the example of the great deceased of my family, depend ... ace of God, and praying for His assistance and aid do hereby make an ... nt for ever and in perpetuity *of all the shares and rights, and interests in ... movable properties to wit Pergunnahs, Zemindaries,* Talooks independant ar... dependant (Kharijah and Shikmee rent free lands and all and every description of land, houses and gardens, together with all rights and interests in, and appurtenances to the same, situate in the districts of Dacca, Burrisal, Comillah, Mymensingh, Rajshye, Pubna and Furreedpore, and in the city of Calcutta, *obtained by right of inheritance, and in gift from my said father deceased, and purchased by me at private and auction* sales in my own name directly or in those of others ostensibly, *which have been and are up to the moment of execution of this instrument in the possession and enjoyment of me the declarant, all the aforesaid properties agreeably to the* law of the followers of the Islam, and while in the enjoyment of good health and sound sense, and in the possession of all legal rights and privileges and of my own free will and accord without compulsion or aversion *in favor of all my sons and offsprings, and of all the members and relatives descended from the common ancestor (literally paternal grandfather)* of the family, seed after seed, and womb after womb, *and after satisfaction of their wants in favor of the Faqueers and the poor and indigent of Dacca on good and valid conditions,* and on true and correct statements,*—and I do hereby appoint my son Khajeh Ahsunollah,* may God keep him in peace—who is wise and intelligent, educated and qualified for business self-denying and modest, faithful and honest, kind hearted and right minded, *to the Office of Towliat of the said Wakf or Endowment and constitute him Motawallee of the same and divesting myself of the proprietary right in and possession of* the endowed properties, I do hereby *make over and place them under the possession and control* and surveillance of the said Motawallee. In order to the ascertaiment of, and acquaintance with, and to the determination and identification of the properties of the said Wakf or endowment, I make over and place the deeds and the papers relating thereto, namely deeds of sale, sale certificates, deeds of gift, agreements, (Ekrarnamahs) books or registers, bundles of papers, decisions, and all and every description of Collectory and Mofussil papers which are, and exist in the record office in my dwelling-house situate in Kumartoolee ;. and all which deeds and papers aforesaid fully and clearly shew and exhibit the amounts of revenue payable into the Collectorates and into the zemindary sheristahs of the zemindars and the members of the Pergunnahs, the Talooks, and all the particulars, details, descriptions, names and traces, and the extents of the endowed properties aforesaid in the custody of the said Mo... lee. He the said Motawallee too being present at the assembly of creation of the Wakf and constitution of the Towliat, has accepted the office of Motawallee, received all the aforesaid deeds and papers extant in the record rooms to his satisfaction, brought them under his own custody and

entered upon possession of the endowed properties. The said Motawallee should expunge my name as proprietor, and get his own recorded in relation to the properties endowed and in the papers relating thereto, whether Huzoory, (Sudder) or Mofussil, or in the papers filed in the Collectorates and Civil Courts under the designation and description and appellation of Motawallee, and publish his own name He shall take and receive *Nicash* or accounts adjusted and accounts of all the properties from the Naibs, Thesildars and Agents, in the Sudder and Mofussil, collect rents and profits of all and every description of lands and houses, and after discharging the revenues payable into the Collectorates and paying the r nts payable into the sheristahs of the zemindars and other expenses of Collection, shall apply whatever profits may remain in the mode prescribed below ... in respect any lands and profits, &c., &c., in connection with this W... endowment, it be necessary to institute or to defend any suit or suits, o... intervention and claim either in regular suits or in miscellaneous and su... cases in any Civil, Revenue and Criminal Courts in the Thakbust ... the Abkaree Department, in the Office of the Commissioner, in Courts of ... in the district and the city aforesaid, and in the High Court, in the Sud... and in the Council at Calcutta, and in the Privy Council; or should it be n... obtain any sort of certificate, the Motawallee shall do all and every... things in accordance with the provisions of the laws and the rule... enacted and published by the Government for the time being, and ... the expenses thereof, out of the profits of the endowed propertie... *Motawallee shall make expenses suitably to his Reasat* (*position*) *and* ... *deem fit and proper for the time being for the preservation and continuance* ... *name and dignity of the family, according to exigency of the time, and acco*...*ng to his own opinion and discretion he shall fix moshaharas or monthly allowances for the maintenance* of the parties in whose favor the endowment is made, and pay them the same month after month, and also the expenses of joyous and mournful ceremonies when required, out of the profits of the Wakf Estate. The said Motawallee shall have authority to *increase or to reduce according to his own discretion the allowances fixed for the parties in whose favor this endowment* is made, with reference to the profits of the Wakf Estate, and to the circumstances of the time according to his own discretion. The said Motawallee, is also authorized, as may be deemed advisable for the time being, to sell off some of the properties endowed or to grant Merash Howlah and Dur Howlah Putnee, and Dur Putnee Ijarah and Dur Ijarah in perpetuity, or for limited terms, and with the consideration or salamee (bonus) for the same to purchase other properties, or to exchange any land of the Wakffer, with some other land included in the same in the Wakf Estate, and apply the profits thereof in the expenses of the Wakf, and *keep the surplus in the Tahbeel or Treasury of the Wakf.* He should always be *bent upon augmenting the Wakf Estate and increasing the Cash Balance.* In other words whatever properties may be acquired through the efforts of the Motawallee subsequent to the execution of this instrument shall be treated as forming a part and parcel of the *Wakf* Estate. The said *Motawallee* shall have no authority whatever to convey any property by gift to any relative or stranger. The said *Motawallee* shall have authority to appoint any member of my family whom he may consider qualified and competent to manage the affairs of the *Towliat* (endowment) to the office of *Motawallee* of the endowed estate, and the *Motawallee* so appointed by him and also every successive *Motawallee* shall also have such power. If perchance, the said *Motawallee,* shall not appoint another person in his own place, then the members of my family shall have the same authority unanimously to appoint any person descended from their common ancestor (literally grandfather), who may be qualified and competent to manage business and faithful and honest to the office of the Motawallee of the said *Wakf.* Should certain members of my family desire to appoint one person, and others another to the office of Motawallee, then the opinion of the majority shall prevail, and the person selected by them shall be the Motawallee for the time being, as long as any member, male or female, of family may exist, so long no stranger shall be appointed to the office of Motawallee of the said endowment. Should any one of the parties in whose favor the endowment is made act con-

 Dhaka University Institutional Repository

trary to the wishes of the Motawallee, and in opposition to the practice and usage of my family, the said Motawallee *shall have authority to resume the allowance fixed for him and deposit it in the tahbeel* for the time being, but in case his good conduct is proved and established before the Motawallee by the members of the family his allowance shall be continued—God forbid—If at the dictates of his inherent badness or at the instigation of any evil-minded and designing person, *any one of the parties in whose favor the endowment is made, is not* sufficiently warned by the forfeiture of his allowance and does not improve his conduct, the said Motawallee is *at liberty to exclude him from the pale of the family*, should any other member of the family assist, abet and aid him in his evil doings, he too shall be treated by him, and the Motawallee shall exercise the same power and authority over him. No one of the persons in whose favor the Wakf is made shall have authority or claim to enter upon possession of any one of the properties endowed; to ...te his allowance by sale or gift, or to mortgage it for his debt, neither for ...t of any one of the persons in whose favor the Wakf is made, such al- ...shall be attached and sold in execution of Decree of any Court, because, ... is created for the maintenance of the members of my family, genera- ...generation, and none of the persons for whose benefit this Wakf is ...l be competent to receive Nicash and accounts regarding the pro- ...e Wakf from the said Motawallee. None of the persons for whose ... Wakf is created shall have *authority to bring any suit in any Court* ...aid Motawallee for augmentation of his allowance, or for possession ...ny one of the endowed properties, and for adjustment of accounts, and for ac...nts, and should he bring any such suit, shall not be entertained by a C...t of Justice. But he is at liberty to apply to the said Motawallee for augmentation of his allowance or for disposal of any other matter. If it be proved and established before the Motawallee that anybody *is in pecuniary difficulty and under necessity he shall augment his allowance and remove his necessity.* The object of endowment of the properties is, that they be protected from injury and ruin, and that the name and dignity of the family be preserved and maintained, and that the profits of the estate be agreeably to the practice and usage of the family, spent for improvement of the position and dignity of the family, for the comfort and benefit of the persons in whose favor the *wakf* is made, and for performance of religious acts and ceremonies, and duties to God, and of charitable and pious acts. Therefore should any Motawallee at any time act in such a way as may be calculated to waste the estate, *i e.*, should he neglect to lay by money..................and to discharge the public revenue, &c., in that case the members of the family should politely remonstrate with the *Motawallee* and restrain him from committing neglect or default. God forbid, should he through ignorance be not by any means restrained from doing the same, they should unanimously appoint some other person from among the members of the family, who may be faithful and honest and competent to manage business in his place, and constituting him the representative of the said Motawallee have his name recorded. Be it noted, I have not been at any time indebted to any person up to the date of execution of this instrument, I do not keep in my proprietary right and under my control, any one of the immoveable properties owned and held by me and endow all the aforesaid properties in perpetuity, and deliver and make over, to the said Motawallee all deeds and documents and papers relating thereto, which are sufficient to afford him a full knowledge, and to remove all ignorance regarding the Wakf Estate, as stated above, and he too acquainting himself with all the particulars and details of the properties endowed has brought under his control all the deeds and documents, and dufters of (bundles of papers) and papers which exist in the said Record Office. That being so, there *is no necessity to give at the foot of this instrument a schedule of the properties endowed one* by one which would became very lengthy and prolix. To this purport .. . . I give this instrument in writing in the shape of a Wakf-namah consisting of a Towliat, so that it may come to use in time of need. Dated the 11th Septe... ...orresponding with the 27th Bhadra 1275 B. S. corresponding with ... of the month of Jamadial awal 1285 Hijree.

The writer of this instrument,

Habeebollah, son of Khajeh Assadollah, deceased.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

True copy of the Memorandum of Agreement for the Settlement of <u>Suit No. 189 of 1880, dated 26th August 1881.</u>

Abdool Shafi and others, Plaintiffs, *versus* Nawab Abdool Gunni and others, Defendants, now pending in the Court of the Subordinate Judge of Dacca, and of other family disputes.

1. All the persons entitled to receive allowances from the property appropriated as Wakf in the deed of 1253 B.E. and all the defendants to the Suit No. 189 of 1880, who signed his memorandum of agreement except the Nawabs Abdool Guni and Ahsanullah shall be made plaintiffs to the said suit.
2. The plaintiffs withdraw all charges of fraud against Khajah Alimullah and the Nawbs Abdool Guni and Ahsanulla.
3. The persons singing this memorandum of agreement admit that save as hereinafter provided, neither they nor any of them have or has any claim to, or interest in, any of the properties in the possession of Nawabs Abdool Gunni and Ahsanullah, or either of them or belonging to them or either of them, and registered whether in their or either of their names or in the names of others.
4. The persons singing this memorandum of agreement admit that the two deeds of 1253 B.E., and 1275 B.E, are valid and binding deeds of Wakf.
5. The persons signing this memorandum of agreement admit that the properties held as Wakf by the Nawab Ahsanullah under the deed of 1253 B.E., now consist of the properties entered in Schedule "A" appended to this memorandum of agreement, and of no other properties, and that the properties held as Wakf by the Nawab Ahsanullah under the deed of 1275 B.E., now consist of the properties entered in schedule "B" appended to this memorandum of agreement, and of no other properties.
6. The Nawab Ahsanulla consents by virtue of the power vested in him as Matwali by the said two deeds to increase the allowances of the various members of the family whose names are entered in the schedule "C" and "D", appended to this memorandum of agreement, to an aggregate or total amount of rupees one lakh thirty-three thousand and eighty-four and eleven annas only per annum. And it is declared that the persons whose names are entered in the schedule "C" appended to this memorandum of agreement, are the persons entitled to allowances payable out of the income of the proprieties held as Wakf under the deed of 1275 B.E and the persons whose names are entered in schedule "D" appended to this memorandum of agreement, are the persons entitled to allowances payable out of the income of the properties held as Wakf under the deed of 1253 B.E. And it is agreed that the particular amount to be paid to each individual person shall be fixed hereafter by a committee consisting of four male members of the family, who shall be lineal descendants of the original proprietors of the estates entered in the said schedules "A" and "B" two of the said four male members being nominated by the Nawab Ahsanulla and two by the plaintiffs of the suit No. 189, of 1880; and the said four members having power to select an umpire with a casting vote from amongst their member or to select one other member of the family to be an additional member of their committee, but who shall have one vote only.

Dhaka University Institutional Repository

7. On the amounts of the allowances to be paid to each individual member of the family being fixed by the said committee, the Nawab Ahsanullah shall, within two week's time, execute an agreement on stamped paper, agreeing to pay to each individual member the amount of the allowances fixed for him or for her by the said committee, and stipulating that such allowances shall not be stopped except as hereinafter provided in this memorandum of agreement.

8. All debts due now or incurred hereafter by members of the family shall be paid by themselves from the allowances to be fixed as provided above. If, however, the Matwali consents for any reason to pay the debts due by any member, the amounts of such payment shall be deducted from his or her allowance by installments to be fixed by the family Panchait to be appointed as hereinafter provided.

9. None of the plaintiffs or person added as plaintiffs to the suit shall have any right for any cause whatever to claim any increase in the said allowances for the space of twenty years from and after the date of the institution of the suit viz., the 3rd. September 1880 A.D. from which date the said increased allowances shall be payable. On expiry of this period of twenty years, the allowances may be revised to meet increased necessities on account of increase of family for any other reason by a committee of four male members of the family then alive, being lineal descendants of the original proprietors of the estates mentioned in schedules "A" and "B" appended to this memorandum of agreement, two of the said members being nominated by the Matwali for the time being, and two by the other male and female members of the family who chose to vote, the said four members having power to select an umpire with a casting vote from amongst their number, or to select one other member of the family to be an additional member of their committee, but who shall have one vote only.

10. The members of the family shall be paid all arrears to allowances at the former rates at which they were paid to them from the date on which they were stopped up to the 3rd September 1880 A.D.

11. On the death of any member of the family on receipt of allowances, his or her allowance shall be distributed amongst his or her heirs and residuaries in proportions to be determined by the family Punchait to be appointed as hereinafter provided.

12. The Matwali shall provide for the celebration of rejoicings and mournings of members of the family as befits their position and standing, the amounts to be expended for such purposes being fixed by the family Punchait to be appointed as hereinafter provided.

13. All repairs to dwelling houses of members of the family and increased accommodation required owing to increase in their numbers held to be necessary by the family Punchait, shall be executed and provided by the Matwali in a manner befitting the position and standing of the member or members requiring the increased accommodation, always; provided that the said repairs and increased accommodation shall be executed by the said Matwali as most convenient to him, and that he shall not be bound to execute or provide the same, should be show good cause to the said family Punchait for not doing so.

Dhaka University Institutional Repository

14. The Matwali shall provide the members of the family entitled to allowances with such medical attendance and medicines as the family Punchait to be appointed as hereinafter provided may consider necessary.

15. The Nawab Ahsanulla as Mutwalli agrees that neither he nor any future Mutawali shall stop the allowances of the members of the family to be fixed as provided in clause 6 without just cause, such cause to be first declared just by the family Punchait to be appointed as hereinafter provided.

16. In case of the allowance of any member being stopped as provided for in the preceding clause, the member whose allowance is so stopped , shall receive such maintenance and assistance as the generosity and merciful disposition of the Matwali for the time being may prompt him to give to the said offending member, and after deduction of any compassionate allowance which the Matwali may make to the said offending member. The balance of the allowance so stopped shall be payable to his or her family or relations dependent on him or her.

17. On the family Punchait determining, on sufficient cause being shown to it, that the allowance so stopped should be restored to the offending member, the Matwali for the time being shall accordingly restore and continue it.

18. The family Punchait referred to in clauses eight, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen and seventeen, and which shall consider and determine all the aforesaid family arrangements, shall consist of the Matwali for the time being, if he chooses to sit, and four male members of the family being lineal descendants of the original proprietors of the estates mentioned in the said schedules "A" and "B" which four member shall be elected bi ennially by such adult male and female members of the family as choose to vote at the election after having received due notice.

19. As soon after the signing of this memorandum of agreement as possible, the plaintiffs and persons added as plaintiffs shall present a petition to the Subordinate Judge, in which they shall make the declarations required of them in clause two, three, four and five and in which they may embody such of the other clauses of this memorandum of agreements as they choose, and in which they shall pray that they may be permitted to withdraw the suit No. 189 of 1880 now pending in the Court of the Subordinate Judge of Dacca, without any power to them to bring any fresh suit for the same subject-matter.

20. The Nawab Ahsanulla shall, immediately after the presentation by the plaintiffs of the aforesaid petition for the withdrawal of the suit, and on the Plaintiff Babu Ramkishen executing a deed of release for all his claims against the defendants Nawab Abdool Gunni and Ahsanulla and against the plaintiffs and the parties added as plaintiffs to suit No. 189 of 1880, pay to the said Babu Ramkishen the sum of rupees one lakh and a half in full satisfaction of all demands.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

নওয়াব আবদুল গণি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য অর্থদানের তালিকা

দানের বিবরণ	দানের পরিমাণ	দানের বিবরণ	দানের পরিমাণ
জলের কলের জন্য ৩ বারে -	২,০০,০০০.০০	ইষ্ট উইক সাহেবকে দেয়া হয়	৫০০.০০
মক্কায় জোবায়দা নামক খাল মেরামতে-	৪০,০০০.০০	মিঃ মাণিকজির মারফত নানা বিষয়ে	৩৮,০০০.০০
১৮৬৭ সালের দূর্ভিক্ষে সাহায্য-	১০,০০০.০০	মসুরিস্থ সৈনিকদিগের গ্রীষ্মবাসের জন্য	৫০০.০০
১৮৮৫ সনের জল প্লাবনে সাহায্য-	১০,০০০.০০	মিশনারী বালিকাদিগের সাহায্যে	২৫০.০০
১৮৬৪ সনের ঝটিকা পীড়িতদের সাহায্য-	৫,০০০.০০	কলিকাতাস্থ দেশীয় হাসপাতালে	৫০০.০০
১৮৬৭ সনের ঝটিকা পীড়িতদের সাহায্য-	৫,০০০.০০	,, কৃষি মেলায়	৫০০.০০
ফরাসী ও জার্মান যুদ্ধে আহত ও		রিলিফ ফান্ডের কাপ্তানকে	১,০০০.০০
পীড়িত সৈন্যদের সাহায্যার্থে-	৫,০০০.০০	ল্যাঙ্কাশায়রে দূর্ভিক্ষে	৩'০০০.০০
ঢাকা মাদ্রাসার ভুমি ক্রয়ে-	৫,৫০০.০০	সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষক সমিতিতে	৫০০.০০
লেডী ডাফরিন ফান্ড-	১০,০০০.০০	সার্জন লরেন্স জাহাজ ডুবির সাহায্যে	৫০০.০০
ঢাকার বাকল্যান্ড বাঁধ ও ঘাটে-	৩৫,০০০.০০	বোম্বের মাদ্রাসায়	২০০.০০
লেডী ডাফরিণ হাসপাতালে-	১,০০০.০০	রাজমহেন্দ্রীর বিদ্যালয়ে	৫০.০০
ঐ বার্ষিক চাঁদা-	৫০০.০০	বালেশ্বরের টিউট মুসলিম শিক্ষাফান্ডে	৪০০.০০
১৮৮৫ সালে বর্দ্ধমানের দূর্ভিক্ষে-	১,০০০.০০	ডিষ্ট্রিক্ট চেরিট্যাবল সমিতিতে	৩,০০০.০০
১৮৭২ ঐ ঐ ঐ	২,৩০০.০০	ত্রিপুরার রাজবংশীয় নবদ্বীপচন্দ্রকে	৫০০.০০
ঐ মারফত লুইস সাহেব-	২,০০০.০০	সুসঙ্গের মহারাজকে	৫,০০০.০০
কলোনিয়াল মেলাতে	..	মিটফোর্ড হাসাপাতালে	৫০০.০০
মুসলমানদের পর্দার জন্য-	৩,০০০.০০	নর্থব্রুক ইন্ডিয়ান সমিতিতে	১,২০০.০০
ফ্রান্সের ওলাউঠা রোগীর সাহায্যে-	২,০০০.০০	সেজাগডীন বিভ্রাটে	১,০০০.০০
রুশ-তুর্ক যুদ্ধে পীড়িত ও আহত সৈন্যদের		প্রিন্সেস এলিসের স্মরণার্থে	২,০০০.০০
সাহায্যে (১৮৮৭)-	২০,০০০.০০	অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান ইনসষ্টিটিউটে	৫০০.০০
১৮৭৯ সালে তুরস্ক দূর্ভিক্ষে-	১,০০০.০০	কলিকাতার পশু নিবাসে	৫০০.০০
১৮৮৭ সালে বরিশাল শহরের উপকারার্থে-	৫,০০০.০০	ঐ বৃহদাকার ঝর্ণা নির্মাণে	১,০০০.০০
১৮৭১ সালে বরিশালে হাসপাতালের -জন্য	৪,০০০.০০	ঐ হোস্টেল ফান্ডে ও মুসলিম সিমিতিতে	৬০০.০০
১৮৭৪ সালে বরিশালে দূর্ভিক্ষে-	৫,০০০.০০	আয়র্লন্ডের দুর্ভিক্ষে, ডাচেস অব ম্যারেল বরোর	
১৮৭৬ ঐ ঐ ঐ ঝড়ে-	৫,০০০.০০	মারফতে	৩,০০০.০০
১৮৮০ ঐ ঐ ঐ স্কুলে-	২,০০০.০০	আয়র্লন্ডের দুর্ভিক্ষে ডাব্লিনের মেয়র হস্তে	৩,০৯০.০০
কাশ্মীরে ভূমিকম্পে পীড়িতদের ও দরগা		মাদারীপুর মসজিদ মেরামতে	১,৫০০.০০
মেরামতের সাহায্যে-	১৫,০০০.০০	ঐ মাসিক চাঁদা	২৫.০০
ডিউক অব এডিনবরার আগমনে-	১২,০০০.০০	রামচন্দ্রপুরের মসজিদ ও ঘাটে	১০,০০০.০০
কলিকাতার পশুশালায়-	১১,৩০০.০০	কুমিল্লা শহরে আলোকের জন্য	৫,০০০.০০
কলিকাতায় ঐ সাপের ঘরে-	২,০০০.০০	বীরভুম দাতব্য তহবিলে	১,০০০.০০
ময়মনসিংহ লাইব্রেরীতে-	৫০০.০০	নদীয়ায় ঐ ঐ	৫০০.০০
আটিয়া প্রজাদিগের সাহায্যে -	১০,০০০.০০	মিটফোর্ড হাসপাতালে রুগ্না স্ত্রীগৃহের জন্য	২৫,২৪৫.০০
ময়সনসিংহে দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের সাহায্যে-	৫০০.০০	ঢাকা ক্লাবের পাঠ গৃহে	৪,০০০.০০
ইটালিতে কলেরা উপলক্ষে	২,০০০.০০	আর্মেনিয়ার দুর্ভিক্ষ তহবিলে	৩০০.০০
সান্ডা প্রনালীতে ভূমিকম্পে	৩,০০০.০০	পারস্যের দুর্ভিক্ষে	৩,০০০.০০
দিল্লীর রাজকীয় ঘোড়দৌড় সমিতিতে	২,০০০.০০		
কলিকাতা হাসপাতালে ধাত্রী শিক্ষার সাহায্যে	৫০০.০০		
ইয়োরেসিয়ান পিতৃমাতৃহীনদিগের জন্য	৫০০.০০		
জেরুজালেমে পীড়িতদিগের জন্য	৩০০.০০	কুমিল্লার আকিকন্নেছাকে	৬,৪৪০.০০
বুলগেরিয়ার দুর্ভিক্ষে	৩,০০০.০০	ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে কর্জ্জ রেয়াত	১০,৯৪৪.০০
কুমিল্লা হাসপাতালে স্ত্রী প্রকোষ্ঠে	৩,০০০.০০	রামদয়াল রায়কে	১,০২০.০০

Dhaka University Institutional Repository

ইটালীর ভূমিকম্প পীড়িতদিগের জন্য	৪,১০০.০০
ইটালী কলেরা পীড়িতদিগের জন্য	২,০০০.০০
সুরাটের অগ্নিদাহের সাহায্য তহবিলে	৩০০.০০
আলীগড় কলেজে	২,০০০.০০
বেনারস কলেজে	২,০০০.০০
আলীঘর কলেজের সেন্ট্রাল হলে	৫০০.০০
ভাগলপুর হেদায়ৎ সভায়	২৫০.০০
ফসেট মেমোরিয়েল ফান্ডে	৫০০.০০
ষ্ট্যানলী বিলিয়ার্ড খেলায়	৫০০.০০
কালা ও বোবার শিক্ষাগারে	২৫০.০০
আহম্মদাবাদের দুর্ভিক্ষ সাহায্যে	১,০০০.০০
পুণার দুর্ভিক্ষ সাহায্যে	১,০০০.০০
মঘবাজারস্থ একটা গৃহের সংস্কারে	৩,০০০.০০
লালবাগের মসজিদ মেরামতে	১,০০০.০০
শাহ্আলী সহেবের দরগায়	২,০০০.০০
শ্রীহট্টের মসজিদ মেরামতে	১,৩০৭.০০
বালাক্লাব যুদ্ধ জয়ীদিগকে	১,০০০.০০
১ম বার ৪০ জন মক্কা যাত্রীর সাহায্যে	৯,০০০.০০
আজমিরের পবিত্র স্থলে	১,১০০.০০
ঢাকার সেন্ট লুইস চার্চ্চে	৩০০.০০
প্রিন্স আল বার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনা কমিটিতে	৫'০০০.০০
সাহা মল্লিকের দরগা মেরামতে	১,১০০.০০
বালিয়াটির মহিম বাবুকে	১,০০০.০০
কদম রসুলের দরগায়	১'১৯৭.০০
মিটফোর্ড হাসপাতালে	৫০০.০০
ঢাকার টর্নেডো সাহায্য সমিতিতে	১০,০০০.০০
২য় বার ৪০ জন মক্কা যাত্রীদের সাহায্যে	৯,০০০.০০
আজমীরের দরগায়	৫০০.০০
নারায়নগঞ্জ হাসাপাতালে	২,০০০.০০
৩য় বার মক্কা যাত্রী ৪০ জনকে	৯,০০০.০০
ডাফরিন হাসপাতালে	৩,৫০০.০০
ডাক্তার মেডোসের জিম্বায় দান	৪০০.০০
ডাঃ ক্রম্বির জিম্বায় দান	১,৩০০.০০
মিঃ উইদ্রল-এর জিম্বায় দান	৫০০.০০
মাদারিপুর মসজিদে আলো ও কার্পেট	১,০০০.০০
হাজীগঞ্জ জুবিলি রাস্তায়	১,০০০.০০
৪র্থ বার ৩৫ জন মক্কা যাত্রীকে	৬,৮০০.০০
সাত গম্বুজ মসজিদ মেরামতে	১,৬৯৯.০০
শাহ্ আলী সাহেবের দর্গার রাস্তায়	১০,০০০.০০

মৌলভী ওবায়দুল্লাহর বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে	১,৬৫৬.০০
কলিকাতার ফ্রি স্কুলে	১,০০০.০০
ডিস্ট্রিক্ট সাহায্য সমিতিতে	৪০০.০০
চক্ষু চিকিৎসাগারে	৫০০.০০
ডাক্তার ওয়াইজের মারফত	৫০০.০০
ডাঃ উইলসনের মারফত	১,৫০০.০০
মাদ্রাজ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে	২,০০০.০০
কদম রসুলের দরগা মেরামতে	৩,২৯৬.০০
মিঃ উইদ্রল মরফত দান	২,০০০.০০
রিপণ স্কলার সিপ	৩,০০০.০০
কৃষ্ণ দাস পালের স্মরণার্থে	৫০০.০০
জুবিলি মেমোরিয়েল ফান্ডে	৫,০০০.০০
ডাফরিন মেমোরিয়েল ফান্ডে	২,০০০.০০
কলিকাতা ইন্ডিয়া ক্লাবে	৫০০.০০
প্রতাপ রায়ের মহাভারতানুবাদে	২০০.০০
ইডেন শিক্ষাগারে	১,০০০.০০
স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলীর স্মরণার্থে	২,০০০.০০
জনসাধারণ সভায়	৮০০.০০
বোম্বের টেম্পল মেমোরিয়েল ফান্ডে	১,০০০.০০
কাবুল যুদ্ধে আহত সৈন্যদের জন্য	১,০০০.০০
রেভারেন্ড বেরিয়োর জিম্বায়	৩,০০০.০০
লালবাগ মসজিদে	১,৮৩০.০০
বেগম বাজার মসজিদে	৫০০.০০
মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে	২,৫০০.০০
খাজা আব্দুল হামিদের মসজিদে	৪,০০০.০০
লর্ড মেয়োর স্মরণার্থে	১,০০০.০০
নর্থব্রুক হলে	২,০০০.০০
প্রিন্স অব ওয়েলসকে দেশীয়দিগের অভ্যর্থনায়	৩,০০০.০০
দার্জ্জিলিঙে ক্রীড়া ভূমিতে	১,০০০.০০
দাজ্জিলিঙ্গের কলেজের জন্য	১,০০০.০০
ঢাকার ইমামবাড়া মেরামতে	২০,০০০.০০
দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের নিয়মিত বেতন ও পেনসন প্রভৃতিতে মাসিক অন্যূন	২,০০০.০০

❋

❋ বিঃ দ্রঃ ঢাকা প্রকাশে প্রকশিত উপরোক্ত তালিকায় পাঁচশত টাকার ন্যূন অধিকাংশ দানের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া দৈনিক ও বিভিন্ন পর্ব্বোপলক্ষে যে বহু টাকা দান করা হতো তাও এস্থলে উল্লেখ করা হয়নি। (ঢাকা প্রকাশ, ১৫ ভাদ্র ১৩০৩/ ৩০ আগস্ট ১৮৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর তৈরী তাঁর অধিকারে থাকা নোট ও নগদ অর্থাদির হিসাব।

Amount of G. P. Notes , G. C. Notes and Cash belonging to the personal Estate of Nawab Sir Ahsunollah Bahadur found after his death on 16th December 1901.

G. P. Notes				4,76,900	o	o
Fixed Deposit with Bank of Bengal, Dacca				1,00,000	o	o
Balance with Bank of Bengal, Dacca				2,93,373	12	8
Do ----- Do ------ Calcutta				2,002	8	4
G. C. Notes & Cash received through Chief Manager & credited in the Cash Book on 19th December 1901				1,44,974	5	o
Found in the late Nawab Bahadur's Cash box No.1 & credited in the Cash Book on 7th January 1902.						
1. G. C. Notes	1,195	o	o			
2. Sovereign	3,315	o	o			
3. ½ Sovereign	37	8	o			
4. Rupees	1,141	o	o			
5 Small coins	546	o	o	6,234	14	o
				10,23,485	8	o

Cont. ....

Dhaka University Institutional Repository

Statement of G. P. Notes Left by Nawab Sir Ahsunolla Bahadur at his death on 16th. December 1901.

		General a/c Par Value			F. a/c Par Value			Total Par Value		
In the name of Nawab Ahsunollah Bahadur		7,18,200	.	.	2,10,600	.	.			
,, ,, K. Attickollah		21,000								
,, ,, Peri Banoo Khanam	56,600/-	7,800								
,, ,, Mehar Banoo		7,700								
,, ,, Aktar Banoo		6,900								
,, ,, Kamrannessa		12,600								
		7,74,200	.	.	2,10,600	.	.	9,84,800	.	.
Sold to D.E.L.Trustees on 17th Septr. 1901	4,56,000	4,56,000	.	.	,,	.	.	4,56,000	.	.
Balance in hand		3,18,200	.	.	2,10,600	.	.	5,28,800	.	.
Repurchased from D.E.L. Trustees Per value 17th September 1901	68,000									
Do	90,700	1,58,700	.	.	.	.	.	1,58,700	.	.
Total left at the death of Nawab Sir Ahsunollah Bahadur		4,76,900	.	.	2,10,600	.	.	6,87,500	.	.

Prepared by the Chief Manager 28.5.06

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১

A letter From B.C. Allen to the Chief Manager Dhaka Nawab Estate.

EASTERN BENGAL & ASSAM
MONOGRAM
SECRETARIAT

Shillong, the 21st. March 1911.

My dear Hodding,

It was only today that I wired to you to enquire when you could let me have the note on the Nawab's family and by this evening's post it has arraived.

Could you very kindly give me a little more information with regard to the principal benefactions by the family? As far as I know, the most conspicuous charities were the water-works and the electric lights. Could you very kindly let me know the value of both of these in round figures and also mention any other notable gifts of that nature?

Could you also tell me when the Ahsan Manzil was built and it would be interesting to know the cost if the figures are readily available.

You say that no less than Rs. 20,511/- are spent on pensions pittances and doles. Are these given to people outside the family or do they also include the family members?

I am making enquiries about houses for the Begum and will send you a wire in a day or two.

Yours sincerely,

B.C. Allen

Colonel J. Hodding, C.I.E

Dhaka University Institutional Repository

A Letter From Chief Manager Mr. J. Hodding to Mr. B.C. Allen

Chief Manager's Office
Nawab's Estate
Dacca the 24th March, 1911.

My dear Allen,

I have your letter of the 21st March, and now give you as much of the additional information you ask for as is in my power.

The most conspicuous charities were as follows:-

1.	Dacca Electric Light Works	Rs. 4,50,000/-
2.	Dacca Water-Works	Rs. 2,50,000/-
3.	The Sir Abdul Gunny Dacca Relief Fund	Rs. 1,00,000/-
4.	The Sir Ahsunollah Dacca plague Fund	Rs. 1,00,000/-
5.	The Dacca Duffering Memorial	Rs. 50,000/-

The Ahsun Munzil was originally built in 1872. It was partially destroyed by the Tornado in 1888; and after being rebuilt was partly destroyed by the earthquake in 1897, after which it was again rebuit in its present from.

The sum of Rs. 20,511/- spent annually on pensions, pittances and doles is expended entirely on outsiders, and persons not connected with, or belonging to the family. The family members are paid from other sources and the payments made to them are not included in the charities mentioned in my note.

Yours sincerely.
J. Hodding

B.C. Allen Esqre. I.C.S.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১২

A LIST

of some of the charities and works of public utility of
Nawabs, Abdul Gunny & Ahsunollah.

SL. NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1.	The Dacca Water Works with the three subsequent extentions : the Connaugt, the extension made to commemorate the assumption of the title of Empress and the extension to the Shahbagh	Rs. 2,50,000.00
2.	For the repairs of the Zobeida canal, Mecca	40,000.00
3.	For the relief of the sufferers in the Famine in 1867	10,000.00
4.	do do in 1874	20,000.00
5.	do do in the Flood in 1885	10,000.00
6.	do do in the Cyclone in 1864	5,000.00
7.	do do do in 1867	5,000.00
8.	For the relief of sick and wounded soldiers in the Franco German War	5,000.00
9.	For the purchase of land for the Dacca Madrissa building	5,500.00
10.	Lady Dufferin Fund	10,000.00
11.	Buckland bund with ghat	35,000.00
12.	Lady Dufferin Hospital and an annual subscription of 500	1,000.00
13.	Burdwan relief 1885	1,000.00
14.	do for relief of sick people 1872	2,300.00
15.	do through Mr. Lowis	2,000.00
16.	Mahomedan screen for the Colonial Exhibition	3,000.00
17.	For the relief of the sufferers from cholera in France	2,000.00
18.	In 1887 for the sick and wounded soldiers in the Russo Turkish war	20,000.00
19.	In 1879 for Trukish Famine	1,000.00
20.	Burial for benefit of the twon 1887	5,000.00
21.	do for Hospital 1871	4,000.00
22.	do Famine relief 1874	5,000.00
23.	do Cyclone fund 1876	5,000.00
24.	do School 1880	2,000.00
25.	For the relief of the sufferers from earthquake and for repair of Dargahs & c. in Cashmere	15,000.00
26.	To commemorate H.R.H. the Duke of Edinburgh's visit, Calcutta	12,000.00
27.	Calcutta Zoological Gardens	11,300.00
28.	do for the Snake House	2,000.00
29.	Mymensingh Library	500.00
30.	For the benefit of the Attya tenants	10,000.00
31.	For the poor Mahomedan boys, Mymensingh	500.00
32.	Sent to Italy for the sufferers from cholera	2,000.00
33.	In 1883 for the sufferers in the earthquake, Strait of Sunda	3,000.00
34.	Delhi Imperial Race Meeting	2,000.00
35.	National Indian Association	200.00
36.	Calcutta School	100.00
37.	Hindu Hostel, Calcutta	400.00
38.	Calcutta Hospital Nurses, Institute	500.00
39.	Mount Road Library	50.00

Dhaka University Institutional Repository

40. Society St.Vincent de paul, House purchase fund	100.00
41. Students of Dacca Madrissa for cricket	50.00
42. Widow and orphans of Mr. Ellis	200.00
43. European Female Orphan Asylum Fund	500.00
44. E.B.Eastwick Esq.	500.00
45. Various charities through Mr.Manikjee	38,000.00
46. Madras Oriental Dramatic Company	100.00
47. Summer house for soldiers' children Mussooree	500.00
48. To the Little Sisters of the Poor	250.00
49. Commillah Agricultural Show 1870	300.00
50. Calcutta native Hospital	500.00
51. Calcutta Agricultural Exhibition	500.00
52. The "Captain" Relief Fund	1,000.00
53. Lancashire famine	3,000.00
54. Public Health Society	500.00
55. The "Sir John Lawrence" Relief Fund	500.00
56. Madrissa, Bombay	200.00
57. Rajahmundry Boy and Girl School	50.00
58. Tute Mahamedan Education Fund, Balasore	400.00
59. District Charitable Society from time to time	3,000.00
60. Prince Nabadwip Tripperah	500.00
61. The Maharajah of Susang	5,000.00
62. Mitford College Hospital	500.00
63. Northbrook Indian Society	1,200.00
64. Sezegdin disaster (Natural)	1,000.00
65. H.R.H. Princess Alice's Memorial	2,000.00
66. Oxford Indian Institute	500.00
67. For a cattle through Calcutta	500.00
68. For a drinking fountain do	1,000.00
69. Hostel Fund	400.00
70. National Mahomedan Association	300.00
71. Famine in Ireland through the Duchess of Marlborough	3,000.00
72. Famine through the Mayor of Dublin	3,090.00
73. Repairs of Madaripore Mosque and monthly subscription Rs.25	1,500.00
74. Mosque and Ghat Ramchandrapore	10,000.00
75. Comillah ryots for seed grain	200.00
76. For lighting the Town of Comillah	5,000.00
77. Putooakhally Dispensary monthly Rs. 5/-	5.00
78. Fire releif Khulna	100.00
79. Charitable relief Beerbhoom	1,000.00
80. do Nuddea	500.00
81. Female Ward Mitford Hospital	25,245.00
82. Reading Room Dacca Club	4,000.00
83. Armenian Famine Fund	300.00
84. Persian Famine Fund	3,000.00
85. For the relief of sufferers Jerusalem	300.00
86. Bulgarian Famine	3,000.00
87. Comillah Vernacular School Rs. 5 a month	5 – .00
88. Female Ward Comillah Hospital	3,000.00
89. Dacca College, two scholarships of Rs. 3 each	
90. Dacca Madrissa, 4 scholarships of Rs. 6 each	

Dhaka University Institutional Repository

91.	For the releif of sufferers from earthquake in Italy	4,100.00
92.	do of the sufferers from cholera	2,000.00
93.	Surat fire releif fund	300.00
94.	Aligurh College	2,000.00
95.	Benares College	2,000.00
96.	For the erection of the central hall Aligurh College	500.00
97.	Anjomun-e-Hedayetul Islam, Bhagulpore	250.00
98.	Madrisssa, Jamalpore	150.00
99.	Fawcett Memorial	50.00
100.	Stanly Billiard Champion	500.00
101.	Repairs of Hoojra Kultabazar	200.00
102.	Jubilee Mahomedan Association, Hoogly	100.00
103.	Deaf-Mute Institute	250.00
104.	Famine relief, Ahmedabad	1,000.00
105.	do Poona	1,000.00
106.	Repairs of houses at Mugbazar, Khankah	3,000.00
107.	Lalbagh Mosque repiars	3,000.00
108.	Pavilion at Shah Ali Saheb's Durgah	2,500.00
109.	Futtullah Mosque repairs	300.00
110.	Repairs of Mosque at Sylhet	1,307.00
111.	Mahomedan boys Missision School, Furrukabad	50.00
112.	Madaripore Mosque, 2nd donation	200.00
113.	Balaclava Heroes Fund	1,000.00
114.	Expenses of sending 40 pilgrims to Mecca	9,000.00
115.	Mahomedan Cricket Club, Patna	100.00
116.	Ajmere Shrine	1,100.00
117.	St.Lowis' Church, Dacca	300.00
118.	Prince Albert Victor Reception Committee	5,000.00
119.	Mosque at the Durga of Shah Mullik	1,100.00
120.	Mahim Babu, Baliaty	2,000.00
121.	Kuddum Russool expenses	1,197.00
122.	Mitford Hospital, for medical comforts	600.00
123.	Little Sisters of the Poor	100.00
124.	Tornado Relief Fund	10,000.00
125.	Sending 40 pilgrims to Mecca	9,000.00
126.	Boarding House, Rungpore	100.00
127.	For Ramzan expenses of the Madaripore Mosque	100.00
128.	Repairs of the Baboopara Durgah	166.00
129.	Repairs of the Shah Mullik's Durgah	244.00
130.	do of Kazeebag's Durgah	249.00
131.	For a mosque at Dhubri	200.00
132.	Ajmere Durgah	500.00
133.	Naraingunge Hospital	2,000.00
134.	Sending 40 pilgrims to Mecca	9,000.00
135.	Dufferin Hospital	3,500.00
136.	Charities through Dr. Meadows	400.00
137.	do Dr.Crombie	1,300.00
138.	do Mr.Weatherall	500.00
139.	Madaripore Mosque lights and carpets	1,000.00
140.	Repairs of Bee Bee ka Rouza	235.00
141.	Mahomedan Association, Rajshye	100.00

Dhaka University Institutional Repository

142. Hajigunge Jubilee Road	1,000.00
143. Cost of sending 35 pilgirms to Mecca	6,800.00
144. Repairs of Sat Gombaz Mosque	1,699.00
145. For constructing two roads to the durgah of Shah Ali Saheb	10,000.00
146. Midwifery School, Burrisal	200.00
147. Books for the students of Madaripore Madrissa	50.00
148. For distributing medicine amongst the sick ryots, Buldakhal	200.00
149. Charity to Akikonnessa, Comillah	6,440.00
150. To Tripurah Soonduree Debba, remission of loan	10,944.00
151. Ram Doyal Roy, Buldakhal, remission of mesne profit	1020.00
152. Charity through Sir Jamsetjee	300.00
153. Calcutta Hospital	500.00
154. Barasut School	50.00
155. Chandpur Mosque	100.00
156. St. Vincent's Church	300.00
157. Calcutta Leper Asylum	250.00
158. To the widow and children of Moulvi Obeidullah	1656.00
159. Fire Relief Fund, Pubna	300.00
160. Free School, Calcutta	1000.00
161. District Charitable Society	400.00
162. Eye Infirmary	500.00
163. Charity through Dr. Wise	500.00
164. Do. through Mr. Williams	1,500.00
165. Victoria Hospital, Madras	2000.00
166. Dacca New Dispensation Church	200.00
167. Orphan Fund Jubbulpore Church	100.00
168. Repairs of Shah Ali Saheb's Durgah	300.00
169. Loretto Priory Building, Darjeeling	50.00
170. Charitable Dispensary, Alipore	100.00
171. Reapair s of the Kuddum Russool	3,296.00
172. St. Isabella Ladies Association	100.00
173. Sacred Heart Convent, Dacca	100.00
174. Boundary wall of Northbroock Hall	200.00
175. Burrisal Bar-Library	300.00
176. Commillah Bar- Lirbrary	150.00
177. Charities distributed through Mr. Wealtherall	2000.00
178. Ripon Scholarship	3000.00
179. Keshub Chundra Sen's Memorial	200.00
180. Sailors Home, Chittagong	200.00
181. Hon'ble Krishto Dass Paul's Memorial	500.00
182. Teota Philanthropic Society	200.00
183. Jubilee Memorial Fund	5000.00
184. Dufferin Memorial	2000.00
185. Deaf Mute Institute, Bombay	200.00
186. Burrisaul Billiard Room	200.00
187. Burrisaul Jetty	100.00
188. Burrisaul Public Liibrary	200.00
189. Calcutta India Club	500.00
190. Protab Cundra Roy for translation of the Mahabharata	200.00
191. Eden Statue	1000.00
192. Sir Stewart Bayley Memorial	2000.00

Dhaka University Institutional Repository

193. Calcutta madrissa Scholarship Fund	200.00
194. People's Association, Dacca	800.00
195. Howrah Town Hall	300.00
196. Temple Memorial, Bombay	1000.00
197. For the relief of the wounded soldiers of the Cabul war	1000.00
198. Through Revd. Beriero	3000.00
199. Calcutta Brahmo Somaj Building	300.00
200. Mohamedan Literary Society	200.00
201. Dacca Music School	200.00
202. Lal-bagh Mosque	1830.00
203. Begum bazar Mosque	500.00
204. Madras Famine	2500.00
205. khajeh Abdul Hamid's Mosque	4000.00
206. Daudkandy Hospital	200.00
207. Furreedpore School	200.00
208. Serajgunge Hospital	50.00
209. Lord Mayo's Memorial	1000.00
210. Mooradnuggar School	200.00
211. North brook Hall	2000.00
212. Native gentlemen's Reception Fund for H.R.H. the Prince of Wales	3000.00
213. Darjeeling Recreation Ground	1000.00
214. For a College at Darjeeling	1000.00
215. For the repairs of the Dacca Imambara	1,00,000.00
216. Do. to meet the deficit of expenses, about	20,000.00
217. Dufferin Memorial, Dacca	50,000.00
218. For the sanitary improvements of Dacca	1,00,000.00
219. Shah Muksood's Dargah	200.00
220. To another Muhammedan gentleman	2,000.00
221. Anjuman Islamia , Sylhet	50.00
222. Moribund ward, Mymensingh	200.00
223.Sir Comar Petharam Memorial	200.00
224. Barisal Bengali School	100.00
225. Dacca Madrasah Sporting Club	100.00
226. Old Mission Church, Calcutta	25.00
227. Boarding House for Mohammedan students, Pabna	200.00
228. For a mosque in the Aligarh College	500.00
229. Mission School house of Ghoom	25.00
230.Seamens's Mission	25.00
231. Faridpur Mella	25.00
232. Famine Relief Fund	10,000.00
233. Moslem Girls School	1,000.00
234. Moulvi Abdul Khan	200.00
235. Mitford Hospital	300.00
236. Mission High School, Furrakabad	25.00
237. Victoria Square, Dacca	12,000.00
238. Barisal Recreation Club	3,900.00
239. K.M. Yousuff	999.00
240. Mosque at Manikganj	50.00
241. Repairs of the Mitford Hospital	2,000.00
242. Empress Commemoration Fund	1000.00
243. District Charitable Society, 1889	300.00

Dhaka University Institutional Repository

144. Dacca Madrasah Sporting Club	50.00
245. Chittagong Cyclone	1000.00
246. Barisal Vernacular School	50.00
247. Gordon High landers and Gurkha fund	500.00
248. Ajmere mosque	200.00
249. Toin District Nursing Association through Macheon	153.00
250. Calcutta M. S. club	100.00
251. Monmohan Ghose's Memorials	100.00
252. For Relief of the Sonthals	25.00
253. Victoria Zenanna School	10,000.00
254. Albert Victor Asyium	100.00
255. Little sisters of the poor	100.00
256. Society for the prevention of cruelty to animals	200.00
257. Hospital-Nurses Institute	100.00
258. District Charitable Society	500.00
259. Mohammedan Literary Society, Madras	50.00
260. Doulatpore School	50.00
261. Shillong Indian Club	100.00
262. indian Mission fund	5,000.00
263. Christian Library	320.00
264. Jagannath S. Club	50.00
265. Dacca College Sports	25.00
266. High English Shool, Chittagong	25.00
267. Madaripur Madrasah	20.00
268. Old Mission Church	25.00
269. Islamia Reading Room, Chittagong	20.00
270. School of Tehran through H.E. Koshef Sultana	2,000.00
271. Deaf and Dumb School	3,000.00
272. School of Barisal	100.00
273. Narayanganj Brahmo Samaj	25.00
274. Mohammedan S. Club	100.00
275. Martin Memorial Fund	200.00
276. Eden Female School	500.00
277. Dacca Volunteers Recreation Club	100.00
278. Sir Jamsetjee Jeejeehby Memorial	200.00
279. Charitable Dispensary, Patuakhali	400.00
280. Brahmanbaria Club	300.00
281. Roy Ram Sanker Sen's Memorial	50.00
282.Mitford Hospital	200.00
283. Maulvi Ashraf Saheb	200.00
284. Syed Hossain Ali	25.00
285. Narayangang High English School	200.00
286. Chandpur Mosque	5,000.00
287. Chandpur Town Hall to Commemorate Lord Elgin's visit	5,000.00
288. For the improvement of the Dacca River	15,000.00
289. For the deepening of the Bygunbari Khal	8,000.00
290. Transval sick and wouned, Lord Mayor's fund	1,000.00
291. Delhi Imperial Race Meet	2000.00

Grand Total Rs. 11,82,445.00

Dhaka University Institutional Repository

SL NO. **PARTICULARS & AMOUNT**

292. To commemorate the memory of his late father, Nawab Ahsanollah has purchased and made over an Estate yielding net profit of Rs. 5,000/- per annum in the hands of trustees to help and relieve the troubles of the poor people of the town of Dacca whenever they suffer from famine, fire, floods, and other visitation of God.

293. He has also spent over Rs. 40,000/- -in digging tanks, wells, khals, in all his zamindaries situated in the districts of Dacca, Barisal, Tipperah and Mymensingh.

In addition to which,

294. Over 2,000 is paid monthly as fixed stipends and pensions to the members of respectable Mohamedan and Hindoo families.

Special charities are paid to poor men almost daily and also in the months of Ramzan, Rubee-ul-awal, in the Mohurrum and on the two Eid days. (1)

[(১) উল্লেখ্য, উপরোক্ত দানের তালিকার ক্রমিক নং ২৯৪ সহ ক্রমিক নং ১-২১৬-তে বর্ণিত দানগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহর প্রকাশিত তালিকায় নেই। তবে এখানে প্রদত্ব ক্রমিক নং ২১৭-২০ এবং ২২১-২৯২- তে বর্ণিত দানগুলো প্রফেসর আবদুল্লাহ প্রকাশিত তালিকা থেকে সংগ্রহীত]।

Charities entered in the old printed list but omitted in the subsequent one.

PARTICULARS	AMOUNT	
1307 B.S (1900 AD)		
Paid to Narayanganj Hospital on the occasion of the fall of Pretoria	3000.00	
Anjuman Halayat Islam School,Lahore	1000.00	
Paid to the Magistrate of Dacca for the improvement of Race Course	10,000.00	
Patuakhali Begum Hospital	8000.00	
Jalpa Ispahan School	500.00	
Occasional Charities	17,565.00	
		40065.00
1308 B.S (1901 AD)		
Electric Light Dacca	4,50,000.00	
Elliot Madrasah, Calcutta	10,000.00	
Elgin Town Hall	5,000.00	
Dacca Eden Feamle School	1,000.00	
Curzon Hospital Aligagh	1,000.00	
Occasional Charities	4,200.00	
		4,21,200.00
1309 B.S. (1902 AD.)		
L.G.'s reception at Barisal	200.00	
Repr. to Pucca Ghat on the Kumar (Madaripore)	200.00	
Coronation Festivities, Comilla	500.00	
Do Faridpur	200.00	
Do Dacca	5000.00	
Do Mymensingh	600.00	
Do Barisal	600.00	
Do Pabna	500.00	
Erection of a mosque at Manickganj	1000.00	
Nawab Sir Ahsanollah's Cup	1500.00	
Sporting Club, Dacca Madrassah	50.00	

Dhaka University Institutional Repository

Asmutnessah Female Ward Fund	5000.00
Ahsunolla School of Engineering	25,272.11 *(1,12,000)*
E. B. S. Ry Vol. Prize Fund, Sealda	200.00
Cal. Vol Rifles	400.00
H. E. School building, Nabinagar	1000.00
Repairs to Netrokona Mosque and Erection of Boarding	3330.00
Faridpur Exhibition, (Agricultural)	30.00
Help towards Mohamedan Boys at Mission School, Farrackabad	25.00
Cotton Reception & Memorial Fund	500.00
Annual Subscription towards the Mitford Hospital Supdt's Fund & for special Medical Comforts	400.00
Calcutta Free School	100.00
Derjeelling Fine Art Society	100.00
Hafiz Abdur Rohim Prize Fund to Dacca Madrassah	100.00
Queen Memorial Fund Shillong	300.00 F
Maintenance of a student in pabna Technical School	50.00 F
Annual Donation to Calcutta Madrassah	200.00 F
Monthly Pittance and Pension and occasional charities paid during the year 1309 B.S.	40666 13 9
	5,72,687 8 9

<u>1310 B.S. (1903 AD.)</u>

Annual Donation to Calcutta Madrasah	200.00
Calcutta Hospital Nurse's Asscn.	100.00
Sir John Woodburn's Memorial Fund	5,000.00
E. B. Volunteer Rifles, Dacca	100.00
Patuakhali Begum Hospital	1,000.00
Bell Islam Boarding	500.00
Bell Sports	25.00
Barisal Jetty	1620.15
Barishal Races	200.00
Donation of Calcutta Zoo	20,000.00
Maintenance of a Student at Pabna Technical School	50.00
Sir Ahsunollah purse at Dacca Races	1500.00
Adi Brahmo Somaj, Calcutta	50.00
Bengal Punjab Rifle Association	100.00
Construction of 2nd Water Fillter at Faridpur	200.00
Moslem Hostel, Dacca	10,000.00
Victoria Memorial Fund	25000.00
L.G.'s Reception at Mymensingh	250.00
Dacca Rly Children Treat	100.00
Decorating Asmutennesa Ward, Dacca	500.00
Donation towards mahomedan Literary Society, Calcutta	200.00
Annual Donation to Mitford Hospital	400.00
Calcutta Free School	100.00
Help towards Mahomedan Boys at mission school at Farrackabad	25.00
Annual Subscription to Calcutta Vol.	400.00
Faridpur Agricultural Exhibition	100.00
Subscription to Calcutta Vol. Town Band	100.00
Hafez Abdur Rahim Prize to Dacca Madrassa for 2 years	200.00
Donation to Delhi Hekimi College	1200.00F & C
District Charitable Society, Calcutta	200.00F
Donation for completion of a Masjid at Narail (Jessore)	100.00C
C.O.	69,520.15 *5,72,687, 8, 9*

Dhaka University Institutional Repository

B.S. (1310) Cont.

1320 Donation for re-erection of a Mosque near Comilla Collectorate	200.00C.	
Donation to Self Denial Fund, Salvation Army, Madras	50.00,,	
Dacca College Sports	125.00,,	
St. Andrews Colonial Homes	100.00,,	
Donation for erection of a Mosque in the Punjub	500.00,,	
Y.M.C.A Calcutta	25.00,,	
Installation of E.L. in the Asmatenessa Ward	200.00,,	
Monthly Pittance & Pension & Occassional, charities paid during 1310	36487, 15, 3 ,,	
		1,07,208.14

1311 B.S. (1904 A.D.)

Reception Fund of Hon'ble K.G. Gupta		10.00	
Bdg. House for Students, Mymensingh		1000.00	
Barisal Jetty		814.00	
Perozpur Dispensary		500.00	
Mahomedan Boarding, Barisal		500.00	
Patuakhali Begum Hospital		4000.00	
Bengal Punjab Rifle Association		100.00	
Dufferin Moslem Hostel, Dacca		10,000.00	
Slavation Army, Madras		100.00	
Reception of H.H. the Gaekwar		20.00	
Faridpur Agricultural Exhibition		100.00	
Dacca Madrassa Sporting Club		50.00	
Dacca Vol. Rifles		200.00	
L.G's Reception at Barisal		200.00	
Old Church Blanket Fund		25.00	
Calcutta Free School		100.00	
Industrial Association, Calcutta		400.00	
Contribution towards the Sporting Club of the Raja Surja Kumar Institution at Rajbari		15.00	
Hafiz Abdur Rohim Prize, Dacca Madrasa		100.00	
Calcutta Madrasah		400.00 F.	
Darjeeling Fine Art Society		100.00 F.	
Help towards Mahomedan Boys at Mission School, Farrackabad		25.00	
	C.O.	18759.40	6,79,896.70

1311 B.S. Cont.

X-Mas Tree Donation	300.00	C.	
Mahomedan Orphanage, Calcutta	100.00	C.	
Contribution To Dacca College Sports	150.00	C.	
Help to the sufferers in Tornado at Mymensingh	1000.00		
Reception of Dr. & Mrs. Ross	100.00 C.		
Monthly Pittance, Pension & Occasional charities in 1311 B.S.	46094 13 0		
			66,504.10

Dhaka University Institutional Repository

<u>1312 B.S. (1905 A.D.)</u>		
Dacca Race Fund	750.00	
E.B. Vol.Rifles, Dacca	100.00	
Calcutta Races	1000.00	
Lord Curzon Memorial Fund	500.00	
Cal. Vol. Rifles	200.00	
K.A.O.Purse, Dacca Races	1500.00	
Calcutta Vol. Rifles Prize Fund	400.00	
E.B.S. Ry. Vol. Rifles	200.00	
Mohamedan Literary Society, Calcutta	200.00	
Prince of Wales' Reception Fund	5000.00	
L.G.'s Reception, Mymensingh	700.00	
Faridpur Agricultural Exhibition	100.00	
Erecting a tomb Stone to the late Mr. H.P. Henderson	100.00F.	
Benevolent Home, Calcutta	100.00F.	
Mohamedan Literary Society, Calcutta	140.00F.	
Saraswat Samity, Mymensingh	100.00F.	
Dacca Mitford Hospital, 2 years	800.00F.	
District Charitable Society, Calcutta	200.00F.	
Donation to Ranchi College	25000.00	
Fardipur Association	200.00C.	
Monthly Pittance, Pension and Occasional charities during 1312 B.S.	<u>47,991, 4-4</u>	<u>85,541 4 4</u>
	C.O.	8,31,94112 4
1313 B.S. (1906-7 A.D.) <u>upto tied of Janurary 1907.</u>		
X.Max Tree of Rly. Children	100.00	
Calcutta Free School	100.00	
Faridpur Agricultural Exhibition	100.00	
Hefez Abdur Rohim Prize to Dacca Madrassa	100.00	
L.G.'s Reception Fund, Dacca	100.00	
Monthly Pittance, Pension and occasional charities paid during 1313 B.S. up to end of January '07	<u>39903.49</u>	<u>40,403, 4 9</u>
	* Total Rs.	8,72,345, 1, 1

---

* ঢাকা নওয়াব এস্টেটের তৎকালীন চীফ ম্যানেজারের পূর্বোক্ত পত্র মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নওয়াবদের অর্থদানের এই তালিকাটি (পৃঃ নং ৪১৪) লেখক কর্তৃক "ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট অফিস, এডওয়ার্ড হাউস" থেকে উদ্ধারকৃত। প্রফেসর আবদুল্লাহর প্রকাশিত পূর্বোক্ত অসম্পূর্ণ তালিকায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পরে দানকৃত তথ্যগুলো নেই। ঋণের দায়ে জর্জরিত এবং অব্যবস্থায় পতিত ঢাকা নওয়াব এস্টেট ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে পরবর্তীকালে দানকাজে তাঁদের আর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব ছিল না।- লেখক।

Dhaka University Institutional Repository

Abstract of the Expenditure Incurred by the Dacca Nawab Estate
on Charities and Public Objects etc.

1. A detailed note together with lists showing the amounts spent on charities and public objects till 1907 is attached hereto, of which the following items require special mention :

(i)	Contribution towards electrification of the town of Dacca	Rs.	4,00,000/-
(ii)	Dacca water works with subsequent extension.	Rs.	2,50,000/-
(iii)	Buckland Bundh, Dacca	Rs.	35,000/-
(iv)	Dacca Mitford Hospital	Rs.	1,50,000/-
	Total* amount including former list	Rs.	20,14,788/-

(2) Other donations and charities (not included in the above list)

(a) Electirc Light Trust

The original Trust was for Rs. 4,56,000/- of which 4 lacs have been shown in the enclosed list. So the balance to be added — Rs. 56,000/-

Total amount paid as interest to the Electric Light Trust @ Rs. 792/- p.m. — Rs. 1,90,000/-

(b) Plague Fund Trust

Original Trust was for Rs. 1,00,000/- out of which the money actually lying with the Trustees. — Rs. 40,000/-

For the balance of Rs. 60,000/- a property was conveyed by the Estate to the Trustees who granted patta lease of the property to the Estate on an annual rental of Rs. 3,000/- in 1309 B.S. So total payment made upto date @ Rs. 3,000/- p.m. — Rs. 1,35,000/-

(c) Nawab Sir Abdul Ghani Relief Fund

With a view to relieve the distress of the people of Dacca town from famine, fire etc. a Trust was made in 1898 of certain properties yielding a net income of Rs. 5,000/- payable to the Trustees annually.

Total payments made up-to-date — Rs. 2,45,000/-

(d) Besides the above donation the Estate bears a recurring annual grant of — Rs. 22,000/- — for charities, schools, dispensaries etc. as detailed in last page of the enclosed list.

Total amount paid up till now	Rs.	8,80,000/-
Charities relating to wakf funds	Rs.	12,95,000/-
Grand Total :	Rs.	48,56,050/-

Dhaka University Institutional Repository

SOME OF THE CHARITIES AND PUBLIC SERVICES OF THE NAWABS OF DACCA (FROM 1275 B.S. TO 1306 B.S. CORRESPONDING TO 1868-1899 A.D.)

The Dacca Nawab House is noted for its charities through out the length and breadth of this country and even beyond its shores. The Names of Nawabs Sir Abdul Ghani and Sir Ahsanollah Bahadur of hallowed memory became a household word in Bengal. Nawab Sir Salimollah Bahadur, G.C.I.E., K.C.S.I., also followed in their footsteps. They were the fountain-head of charities which flew in all directions without distinction of castes or creeds, race or colour. Their liberalities were not confined to Bengal or India but were extended to people in distress far beyond the seas. The tales of woes from providential causes, such as famine, earthquake, epidemic etc. whether in this country or in foreign lands, used to move their hearts equal force and their purse were always open to give relief to the distressed people, as would appear from the following contributions :

Rs.	6,000/-	for	famine	in	Ireland
"	3,000/-	"	"	"	Lancashire (England)
"	3,000/-	"	"	"	Persia
"	3,000/-	"	"	"	Bulgaria
"	1,000/-	"	"	"	Turkey
"	4,100/-	"	earthquake	"	Italy
"	3,000/-	"	"	"	Strait of Sunda
"	4,000/-	cholera epidemic			Italy
"	2,000/-	"	"	"	France

They spent lakhs of rupees for relief of distressed people in such cases in this country. Their kind hearts used to be touched very quickly by people's distress and all appeals to them for help received a ready response. They spent large sums of money for advancement of education among people of different castes and creeds without any religious bias or prejudice, as would appear from their contribution the same amount to both the Muslim College at Aligarh and the Hindu College in Benares. They contributed liberally to various educational institutions all over India and even in foreign countries, as for instances :

Rs.	25,000/-	to the	Ranchi College
"	10,000/-	"	Elliot Madrasah, Hostel Calcutta.
"	10,000/-	"	Moslem Hostel, Dacca.
"	10,000/-	"	Victoria Zenana School
"	5,500/-	"	Dacca Madrasah
"	3,000/-	"	Deaf & Dumb School
"	2,000/-	"	Tehran College (Persia)

The Ahsanollah School of Engineering in Dacca owes its existence to the munificence of the Dacca Nawabs, who contributed more than Rs. 1,12,000/- to the Institution.

In religious matters their bounties knew no bound and in this respect also they were free from any bias or prejudice. They founded or contributed large amount towards the foundation of numerous mosques all over the country, while freely contributing to other religious institutions, viz. St. Vincent Church, Sacred Heart Convent, Dacca, Loretto Priory Building, Darjeeling, the Calcutta Brahmo Samaj etc. They helped many Mussalmans in going to Mecca to perform Haj and bore all their expenses which amounted to thousands of rupees.

They spent Rs. 1,00,000/- on repairs to the Dacca Imambara. Many Hindu temples were constructed and maintained at their cost for the Hindu Officers of the Estate and they are still being maintained at the Estate cost.

Objects of public utility also received due consideration at their hands. They spent Rs. 40,000/- for Zobeda Canal in Mecca and contributed a sum of Rs. 33,300/- to the Calcutta Zoo. They made a contribution of Rs. 10,000/- towards the cost of construction of the Hajiganj Jubilee Road. A sum of Rs. 40,000/- was spent for excavation of tanks, wells and khals in Dacca, Barisal, Tippera and Mymensingh districts. The people of Dacca owes a deep debt of gratitude to the Nawabs for the amenities of life they enjoy in the city, Viz. Water-works for which they contributed Rs. 2,50,000/- and Electric lighting for which Sir Ahsanollah made contribution of Rs. 4,56,000/- and placed the amount in the hands of Trustees to commemorate the marriage of Nawabzada Attickollah. In order to commemorate the memory

Dhaka University Institutional Repository

of his father Sir Ahsanollah made over a property, yielding a net annual imcome of Rs. 5,000/- for creation of a trust fund called after his father "Sir Abdul Ghani Relief Fund" to relieve the distress of the people in the town of Dacca from famine, fire, flood and other visitation of God. He made over to the Trustees a sum of Rs. 1,00,000/- for prevention of Plague in Dacca. He also contributed a sum of Rs. 35,000/- towards the cost of construction of the Buckland Bundh and Rs. 12,000/- for the Victoria Park square in Dacca. For sanitary improvement of the town he paid a lakh of rupees.

Suffering of the people from disease and other afflictions used to make a deep impression in the generous hearts of the Nawabs, who spent a lot of money to alleviate the miseries of the suffering humanity by freely contributing to public hospitals and founding and maintaining many charitable Dispensaries in several districts of Bengal. Sir Ahsanollah contributed Rs. 75,000/- to the local Mitford Hospital Rs. 50,000/- for the Dufferin wards and Rs. 25,000/- for the female wards. He did his best to mitigate the miseries of sick and wounded in the Russio-Turkish was and paid Rs. 5,000/- for the victims in the France-German war, besides many other minor contributions.

Big amounts were also spent by Nawabs on contributions to miscellaneous objects, such as Rs. 12,000/- for Commemorating Duke of Edinburgh's visit, Rs. 5,000/- for prince Albert Victoria's reception Rs. 25,000/- to Victorial Fund, Rs. 5,000/- for prince of Wales' Reception fund etc.

It is difficult to enumerate in detail the numerous items of charities of the Nawabs, but the attached statement may give a rough idea about the magnitude of their generosity. The Dacca Nawab Estate, though now split up into shares, is still striving to retail its old tradition and spends about Rs. 22,000/- on charities and objects of public utility every year besides private donations and contributions from individual proprietors.

Some of the valuable services rendered to Government by the Dacca Nawabs, who are always noted for their loyalty to the British Crown are noted below :

Sir Abdul Ghani presented 3 elephants to Government during the Great Mutiny.

On the nigh before the fight in Dacca, Nawab Sir Abdul Ghani placed his paddle-boat "Dolphin" at the disposal of the authorities to take a detachment of the naval brigade to Dawoodkandi in order to intercept a body of the mutineers from Chittagong who were supposed to be marching upon Dacca.

During the Lushye war, Sir Abdul Ghani lent his steamer 'Ada' to take some troops to Sylhet.

During the Cockie raid in Hill Tippera, Nawab Sir Ahsanollah placed his steamer 'The Star of Dacca' to take reinforcement to the front.

In the 2nd Lushye Campaign Sir Ahsanollah lent 6 elephants to carry baggage and stores and also supplied 300 country-boat for the purpose.

During the great Famine of 1874, he places his steamer the 'Star of Dacca' for service at Rajshahi where she was very usefully employed for some four months.

During the Naga War, Sir Ahsanollah sent 15 of his best Shikari elephants fully equipped for service in the Hills, where they all died.

He placed his barge 'Track' at the disposal of Mr. Preastage for the use of H.R.H., the Prince of Wales at Goalundo where a pig-sticking was organised for His Royal Highness.

He places his steamer the 'Star of Dacca' for famine relief-work at Barisal.

He placed his steamer 'Dacca' at the disposal of the Telegraph authorities to enable them to repair the cable at Boid's-Bazaar after the great earthquake of 1297 B.S.

He placed his steamer 'Barnagore' at the disposal of the authorities at Chittagong to carry grain to the sufferers after the big cyclone.

He placed his steamer the 'Star of Dacca' at the disposal of Mr. Pallow when he was Commissioner of Dacca for famine relief-work.

He lent his steam-launch 'Jamorky' to Mr. T. F. Brockshurst.

Lent his elephants to the Railway authorities to carry on...... * (incomplete)

---

* *Ref : Prof. Abdullah. Nawab Salimullah op.cit.p. 391-97.*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৩

নওয়াব আবদুল গণি রিলিফ ফান্ডের বার্ষিক আয় ব্যয়ের কয়েকটি হিসাব

১৯০৪ খ্রীঃ ফান্ডে মোট জমা = ১০,৬২৭ টাকা ১৫ আনা দেড় পাই।

১৯০৪ খ্রীঃ খরচ	= ঝড়-তুফানে গৃহহীনদের সাহায্যার্থে	= ৪২৭১ টাকা।
	অগ্নিকান্ডে ,, ,,	= ১১৩৭ টাকা।
	কর্মচারীদের বেতনাদি বাবদ	= ২৫২ টাকা।
	অফিসঘর ভাড়া বাবদ	= ৬০ টাকা।
	অন্যান্য খরচ বাবদ	= ৮ টাকা ৩ আনা ৬ পাই।
	অনুসন্ধান/পরিদর্শনে গাড়ী ভাড়া	= ৩৬ টাকা ৯ আনা ৬ পাই।
	মোট খরচ	= ৫৭৬৬ টাকা ১ আনা ৬ পাই।

অবশিষ্ট = ৪৮৬৪ টাকা ১৪ আনা দেড় পাই, যা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের তহবিলে জমা পড়ে।[১]

১৯০৫ খ্রীঃ ফান্ডে মোট জমা = ৪৮৬৪ টাকা ১৪ আনা দেড় পাই।

১৯০৫ খ্রীঃ খরচ	= ঝড়-তুফানে গৃহহীনদের সাহায্যার্থে	= ৪১১৪ টাকা ১ আনা ৩ পাই।
	অগ্নিকান্ডে ,, ,,	= ২৪৭ টাকা ০ আনা ০ পাই।
	কর্মচারীদের বেতনাদি বাবদ	= ২৫৪ টাকা ১১ আনা ৬ পাই।
	অফিসঘর ভাড়া বাবদ	= ৬০ টাকা ০ আনা ০ পাই।
	অন্যান্য খরচ বাবদ	= ৩ টাকা ১৫ আনা ৬ পাই।
	অনুসন্ধান/পরিদর্শনে গাড়ী ভাড়া	= ৩৯ টাকা ২ আনা ০ পাই।
	মোট খরচ	= ৪৭১৮ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই।

অবশিষ্ট = ২১৪৫ টাকা ১৫ আনা সাড়ে ৭ পাই, যা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের তহবিলে জমা পড়ে।[২]

১৯০৯ খ্রীঃ প্রথম দিকে জমা ছিল = ১০,৯৯২ টাকা ৭ আনা সাড়ে ৭ পাই এবং বার্ষিক আয় জমা হয়। ৫,০০০/- টাকা ০ আনা ০ পাই (নওয়াব প্রদত্ত)

১৯০৯ খ্রীঃ খরচ	= ঝড়-তুফানে গৃহহীনদের সাহায্যার্থে	= ৭২৬ টাকা।
	অগ্নিকান্ডে ,, ,,	= ২৮১ টাকা।
	কর্মচারীদের বেতনাদি বাবদ	= ৩২৩ টাকা।
	অফিসঘর ভাড়া বাবদ	= ৬০ টাকা।
	অন্যান্য খরচ বাবদ	= ১৫ টাকা ৮ আনা ০ পাই।
	অনুসন্ধান/পরিদর্শনে গাড়ী ভাড়া	= ৮ টাকা ০ আনা ৯ পাই।
	মোট খরচ	= ১,৪১৩ টাকা ৮ আনা ৯ পাই।

অবশিষ্ট = ১৪,৫৭৮ টাকা ২ আনা সাড়ে ১০ পাই, যা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের তহবিলে জমা পড়ে।[৩]

১৯১০ খ্রীঃ প্রথম দিকে জমা ছিল = ১৪,৫৭৮ টাকা ১৪ আনা সাড়ে ১০ পাই এবং বার্ষিক আয় জমা হয়। ৫,০০০/- টাকা ০ আনা ০ পাই

১৯১০ খ্রীঃ খরচ	= ঝড়-তুফানে গৃহহীনদের সাহায্যার্থে	= ৪০৫৫ টাকা ০ আনা ০ পাই।
	অগ্নিকান্ডে ,, ,,	= ৪০৩ টাকা ০ আনা ০ পাই।
	কর্মচারীদের বেতনাদি বাবদ	= ৩১৮ টাকা ১৫ আনা ০ পাই।
	অফিসঘর ভাড়া বাবদ	= ৬০ টাকা ০ আনা ০ পাই।
	অন্যান্য খরচ বাবদ	= ৮ টাকা ৬ আনা ৯ পাই।
	অনুসন্ধান/পরিদর্শনে গাড়ী ভাড়া	= ৩৩ টাকা ৪ আনা ৬ পাই।
	মোট খরচ	= ৪৮৬৫ টাকা ১২ আনা ৯ পাই।

অবশিষ্ট = ১৪,৭০৩ টাকা ০ আনা সাড়ে ৭ পাই, যা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের তহবিলে জমা পড়ে।[৪]

১৯১৩ খ্রীঃ আগের জমা ছিল = ১৫,৫২৭ টাকা ৪ আনা সাড়ে ৪ পাই এবং বার্ষিক আয় জমা হয় ৫,০০০/- মাত্র।

১৯১৩ খ্রীঃ খরচ	= ঝড়-তুফানে গৃহহীনদের সাহায্যার্থে	= ৫,৬৫১ টাকা।
	অগ্নিকান্ডে ,, ,,	= ৭৪ টাকা।
	কর্মচারীদের বেতনাদি বাবদ	= ৩২৭ টাকা।
	অফিসঘর ভাড়া বাবদ	= ৬০ টাকা।
	অন্যান্য খরচ বাবদ	= ৩৫ টাকা ৮ আনা ৬ পাই।
	অনুসন্ধান/পরিদর্শনে গাড়ী ভাড়া	= ৮ টাকা ৮ আনা ০ পাই।
	মোট খরচ	= ৫,৯৯৬ টাকা ৬ আনা ৬ পাই।

ঐ বছর অবশিষ্ট থাকে = ১৪,৫৩০ টাকা ১৫ আনা সাড়ে ১০ পাই।[৫]

তথ্যসূত্র ঃ
১। ঢাকা প্রকাশ, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ পৃঃ ৩।
২। ঢাকা প্রকাশ, ১ এপ্রিল ১৯০৬ পৃঃ ৩।
৩। ঢাকা প্রকাশ, ৩ জুলাই ১৯১০ পৃঃ ৩।
৪। ঢাকা প্রকাশ, ৩০ এপ্রিল ১৯১১ পৃঃ ৩।
৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৪

গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে নওয়াব আহসানুল্লাহর দেয়া ভাষণ ঃ

Abstract of the Proceedings of the Council of the Governor General of India, Assembled for the purpose of making Laws and Regulations under the provisions of the Act of Parliament 24 & 25 Vict., Cap. 67.

The Council met at Government House on Friday, the 23rd January, 1891.

PRESENT :

His Excellency the Viceroy and Governor General of India, G.C.M.G., G.M.S.I., G.M.I.E., presiding.
His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal, K.C.S.I.
His Excellency the Commander-in-Chief, Bart, V.C., G.C.B., G.C.I.E., R.A.
The Hon'ble Lieutenant-General Sir G.T.Chesney, K.C.B., C.S.I., C.I.E., R.E.
The Hon'ble Sir A.R.Scoble, Q.C., K.C.S.I.
The Hon'ble P.P. Hutchins, C.S.I.
The Hon'ble Sir D.M. Barbour, K.C.S.I.
The hon'ble Sir C.H.T. Crosthwaite, K.C.S.I.
The Hon'ble Khan Bahadur Muhammad Ali Khan.
The Hon'ble Sir Alexander Wilson,. Kt.
The hon'ble F.M. Halliday.
The Hon'ble Rao Bahadur Krishnaji Lakshman Nulkar, C.I.E.
The Hon'ble Nawab Ahsan-Ulla, Khan Bahadur.
The Hon'ble H.W. Bliss, C.I.E.
The Hon'ble Sir Romesh Chunder Mitter, Kt.
The Hon'ble G.H.P. Evans.
The hon'ble J. Nugent.

AMENDMENT OF INDIAN PENAL CODE AND CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1882.

[Sir Andrew Scoble ; Nawab Ahsan-Ulla.] 23rd January,

INDIAN PENAL CODE AND CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1882, AMENDMENT BILL.

The Hon'ble SIR ANDREW SCOBLE also moved that the Bill to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1882, be referred to a Select Committee consisting of the Hon'ble Mr. Hutchins, the Hon'ble Khan Bahadur Muhammad Ali Khan, the Hon'ble Rao Bahadur K.L. Nulkar, the Hon'ble Mr. Bliss, the Hon'ble Sir Romesh Chunder Mitter and the Mover, with instructions to report within five weeks.

The Hon'ble NAWAB AHSAN-ULLA said :- "I wish to say a few words in support of the proposed Bill to amend the Indial Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1882.

"From the enquiries which I have made both at Dacca and Calcutta from the leading and learned members of the Muhammadan community whom I have consulted, I believe that the majority of opinion is in favour of the proposed Bill; and that the greater portion of the Muhammadans in Eastern Bengal will regard it favourably.

"Without directly violating or interfering with our religious rights and customs the Bill affords protection and relief to child-wives, and this, I do not hesitate to say, is an extremely necessary and desirable measure. According to the doctrines of our religion we are forbidden cohabitation before the age of puberty, and as far as I have been able to enquire this age may generally be taken to be eleven or twelve. There may be of course a few instances where signs of puberty appear before that age, but they are of such rare occurrence that it is doubtful whether they should be considered.

"There are, I must admit, some few amongst us who regard the proposed amendment with some alarm, not so much, as I understand, on account of its interfering in itself with our religious rights and customs as from an apprehension that the change may be followed by further legislation in this direction which may effect more serious alterations in our religious doctrines; but I am glad to say that this fear has been very greatly allayed by your Excellency's speech at the last Council meeting; and under these circumstances I beg to support the Bill."

The Motion was put and agreed to.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৫

Letters From Sayed Nawabali Chowdhury to Nawab Salimullah Regarding the establishment of Dhaka University

Letter No,1

20,Weston Street,
Calcutta, the 7th February, 1912.

My dear Nawab Bahadur,

I have already telegraphed to you requesting you to wire All anjumans to support the proposed Dacca University. The Hindu Press is agitating its utmost against it and the Anglo- Indians are opposed to Lord Hardinge's scheme of the removal of the capital and they are also against the Dacca University to make him unsuccessful. It is high time now for the Muhammadans to agitate for the University in order to strengthen the hands of the Viceroy. I have since seen some of the very high officials and have (torn...) information which I will let you know when I come back but please instruct the Mofussil Anjumans with as little delay as possible to pass Resolutions, firstly, that Lord Hardinge be thanked most heartily for the Dacca University; secondly, that hopes be expressed that the University will be a teaching and residential one and not merely an examining body; and thirdly, that sincere hopes be also expressed that the new Bengal Govemment will carry through all the recommendations of the Education Commission of 1882.

The Bengal League will have a sitting of Friday next, the (torn...) instant and will support the Dacca University. I saw His Highness the Aga Khan. He is very favourable to the proposed University and educational facilities to Muhammadans of Eastem Bengal and through him... have succeeded in ....ing the Madras and Bombay Leagues to lend ... their support in the matter and he has besides promised me that he will also get the other Provincial Leagues to do the same.

The annual session of the All-India Muslim League will hold its sittings here on the 3rd and 4th March next and you have been elected the President. You should and ought to arrange to come to Calcutta for the occasion. In this year's sittings of the League much consideration will be devoted to our interests. This is way the League sittings will be held in early March and not during Easter.

(tom ....) attended a meeting of the Bengal League last evening at which H.H. the Aga Khan was present. I succeeded in Convincing the members present to take a favourable view of my mission. I called on Dr. Al-mamun Suhrawardy, Messrs Rasul, Sultan Ahmed, Huda and Mujibar Rahaman and Nawab Serajul Islam and some others and also many leaders at the close of last evening's meeting. I fully discussed with everybody about my mission. Another meeting of all the leaders of Calcutta will be held this evening when I hope to settle everything and let you know the result. On the whole, I may assure you that I am much hopeful.

With kind regards, I am,

Yours sincerly,
Syed Nawabali

The Hon'ble Nawab Bahadur Sir
Khwajah Salimulla, G.C.I.E., K.C.S.I.

Letter No. 2

Private & Confidential — Calcutta, the 8th Feb.'12

My dear Nawab Bahadur,

I attended yesterday's meeting where it was unanimously settled that the Provincial Muhammadan Association should continue as it is with head-quarters at Dacca and members from the two Bengals. It was also decided that there should be one League with head-quarters at Calcutta. It was further settled that the conference should be held on the 2nd March instead of the 17th and 18th Rebruary to enable us to have you to preside over the meeting as you are most likely coming to Calcutta to preside over the annual aession of the All- India Muslim League which will be held on the 3rd and 4th March next. I shall be there before the 13th and explain everything to you in person. Now there is no fear of a breach.

Dhaka University Institutional Repository

Overleaf you will find copy of a letter I received from the Aga Khan in which His Highness urges us to be up and doing and get up public Meetings (Muhammadans) immediately in all distrects throughout East Bengal and especially at Dacca. In my anxiety I have wired to you again and if we are tardy in our actions our interests will be jeepardised I sincerely hope you have since wired to All Anjumans on the subject.

With kind regards, I am

Yours Sincerely,
Syed Nawabali

The Hon'ble Nawab Bahadur Sir
Khwajah Salimullah, G. C.I. E, K.C. S. I.

COPY

PRIVATE.
Government House,
Calcutta,
7. 2. '12.

My dear Nawab Sahib,

Since I saw you yesterday I have come to the conclusion for good reasons that immediately throughout E. Bengal & in Dacca specially meetings shd. be held & thank the Viceroy for the University at Dacca & specially to pray him to make the Dacca University teaching & residential.

This matter is necessary & urgent otherwise there is danger to your interests.

Yrs. very truly,
Sd. Aga Khan.

Letter No. 3
Cofidential

20, Weston Street, Calcutta,
The 11th February, 1912.

My dear Nawab Bahadur,

In reply to your wire last night I telegraphed to you that Mr. Huda may have sent you the massage and I find it to be so on enquiry from Mr. Huda himself.

His Highness the Aga Khan is supporting the Dacca University heartily as you may see from the copy of letter sent you and he is also insisting that all Muslim Leagues-All India and Provincial should support the proposal. If we of East Bengal do not soon call a meeting and support the scheme, it will no doubt make the situation very akward. I was very anxious to know as to what action you have taken and I am a great deal relieved in mind to know that you are going to do the needful. I am however in the dark, as no telegram appears in the newspapers about any Anjuman or Association supporting the scheme. On the other hand I find reports of protest meetings of Hindus of various districts appearing in the papers. Some of the Provincial Leagues are awaiting to see what action we mean to take as we are directly concerned. I was to start today but in consultation with Mr. Huda I prolong my stay for a day or two, in spite of the urgent necessity to be at Dacca to see you with regard to our interests and also to attened the meeting of the Central Text-Book Committee on the 13the instant. However, I am trying to start as soon as I can. The principal object of my continuing to stay longer is to, see that none of the Calcutta Muhammadan Associations may go against the University. There will be a meeting to-day of the Central Muhammadan Association and I am going to attend it.

The last meeting of the Bengal Provincial League Committee was taking an unfavourable view and myself and Mr. Huda strongly defended the cause otherwise Bengal League was almost determined to oppose the University. We, however, gained by the casting vote of the Presedent. Such is the situation here but there is one consolation. There were only a few members of the League present of whom not more than four were against the University, and they made strong efforts to oppose the University.

We did not think it prudent to publish this result of the meeting as those who were against it could say that it, the resolution, was only carried by means of the casting vote. So, we decided to have a general meeting of the Bengal League when those few opposing elements may be won over. This general meeting too is awaiting to see what action our League means to take. So, kindly call a meeting of the League at an early date and send me a message and I will be there. I may add that I was astonished to find the name of one Abdul Wazid, Pleader, proposing the resolution of protest from the Dacca Bar Library. It is very disgraceful on our part to see a Muhammadan in Dacca itself joining the opposite camp and moving the resolution of protest. Kindly use your influence and get him to join our meeting. I am, yours Sincerely,

Syed Nawabali

Hon'ble Nawab Bahadur of Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-১৬

১৯১২ সালের ৩-৪ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে দেয়া সভাপতির ভাষণে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নওয়াব সলিমুল্লাহর বক্তব্য।

Proposed Dacca University

While on the subject of residential universities, I feel bound to say a few words as regards the proposed university at Dacca. The announcement made by His Excellency about this new university has given rise to endless discussions, and some of our countrymen are opposing it tooth and nail. One distinguished Bengali leader calls this university 'the apple of discord', and the opponents of the scheme pretend to see in its inauguration a clever linguistic partition of the Bengalis, quite as pernicious as the late administrative Partition. Now, I am very sorry that our Bengali friends should scent danger where none exists, and oppose the scheme in a way which is sure to see the two communities against each other. The Viceroy has distinctly assured the Bengali leaders that the University, would in no sense be a sectional university meant to benefit the Musalmans alone. It was the remarkable strides made by East Bengal in the matter of education in recent years that suggested to His Excellency the idea of creating a teaching and residential university at Dacca-the first of its kind in India-in order to prevent a setback in this remarkable progress. We, the Musalmans of East Bengal, welcome the University, not because it is meant for our exclusive benefit or to injure the interests of our Hindu brethren, but because we feel convinced that a teaching and residential university, in an area which has shown itself so susceptible of educational improvement, would give and impulse to the cause of education in the Eastern Bengal districts, which would easily place them in the van of educational progress in India. No doubt, any benefit to East Bengal necessarily means a benefit to that section of the population, numbering 20 millions, who happen to be Musalmans, but this is a contingency which cannot be avoided. We cannot cease to be a part and parcel of the population of that part of the country simply to please the fancy of a set of politicians who would eternally penalize the whole of Eastern Bengal for the sin of having harboured so large a Musalman majority. But while we welcome the scheme of the university and the appointment of a special officer, I am strongly of opinion that the Musalman community would not derive any appreciable benefits, unless sufficient funds are allotted for the exclusive advancement of Musalman education. Ours is a proverbially poor community, and the leaders of the Hindu Deputation, as well as the Viceroy, have admitted that it will be necessary to give some special facilities to Musalmans. With sufficient funds at our disposal, it will only remain to work out matters of details as to how our community in East Bengal can best be helped to take the fullest advantage of a residential and teaching university in their midst.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-১৭

স্বজাতিবৎসল পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব রবি

স্বনামখ্যাত নবাব ছলিম উল্যা সাহেব বাহাদুরের দান সম্বন্ধীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর স্থানটি প্রায়ই হিন্দু জাতিতে পরিপূর্ণ, অধুনা তাহারাই উন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন। যদিও সংখ্যায় মুসলমান ন্যূন নহে, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সুশিক্ষার অভাবে তাহারা হিন্দুগণ হইতে একেবারে অবনতির চরম সীমায় পড়িয়া রহিয়াছে। মুসলমানের গৌরব রবি অস্তমিত হইয়া ঘোর তমসাবৃত হইয়াছে। উৎসাহের লেশও নাই। উৎসাহে নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে দয়াময় খোদা তালার কৃপায় অবনতও উন্নত হইতে পারে, কেবল অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে বলিয়া নিরুৎসাহি হইয়া হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় ও হৃদয় সংযত করিয়া বসিয়া থাকিলে কখনও উন্নতির সোপানারোহণ করিতে পারেনা। হায় ! সুশিক্ষার অভাবে বিক্রমপুরের মুসলমানদের মধ্যে এসলাম ধর্ম্ম বিগর্হিত, হিন্দুর আচার নীতি কথক পরিমাণে অনুকরণ কল্পে অভ্রান্ত ও পবিত্র এবং সত্য সনাতন এসলাম ধর্ম্মেরও অনেক লাঘবতা করিতেছে। এসলাম ধর্ম সম্বন্ধিয় গ্রন্থই আরবি, পার্শি, উর্দ্ধু ভাষায় রচিত বিধায় ঐ সকল ভাষায় অধিকার না জন্মালে প্রোক্ত ধর্ম্মের সার গ্রহণ করা দুরহ, সুতরাং ঐ সকল ভাষা শিক্ষা ভিন্ন মুসলমান ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখা দায় এই সকল চিন্তা করিয়া আমি দয়াময় খোদা তালার উপর একমাত্র নির্ভর করিয়া অকূল সাহসাবলম্বনে ঐ সকল ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসা স্থাপনের কৃত সংকল্প করিয়া বিক্রমপুর দিঘির পার নিবাসী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বাছিরদ্দীন মোল্লা সাহেবের দানকৃত অর্থের দ্বারা ও উলানিয়ার প্রসিদ্ধ দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত এসলাম উদ্দীন চৌধুরী সাহেবের দানকৃত ভূমিতে এবং তাঁহার সাহার্য্যে দিঘির পার পুরাতন বাজারে এক টিনেরঘর নির্ম্মাণ করিয়া ১৩০৯ সনের প্রথম দিবসে গ্রামিক আরও কতিপয় মুসলমান ভ্রাতাদের যথাসাধ্য সাহার্য্যে প্রোক্ত ভাষা শিক্ষা দিয়া আসিতেছি। কিন্তু সমুচিত সাহার্য্যের অভাবে মাদ্রাসাটী আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেনাই।

এখন বড়ই সুখের বিষয় যে দয়াময় খোদা তালার কৃপায় মৃগয়া উপলক্ষে ঢাকার স্বনাম খ্যাত ধার্ম্মিক প্রবর স্বজাতি বৎসল দয়ালু ও দানশীল নবাব খাজে ছলিম উল্লা সাহেব বাহাদুর বিগত নভেম্বর মাসের ৮ই তারিখে এই মাদ্রাসায় পদার্পন করিয়া মাদ্রাসার অবস্থাদি অবগত হইয়া মাসিক মঃ ২০/- টাকা সাহার্য্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিয়ামত রূপে দিতেছেন তাহার শুভাগমন উপলক্ষে মাদ্রাসায় একটী সভা হইয়াছিল, সেই সভায় গণ্য মাণ্য উপাধি ধারী ও স্থানীয় বহুতর লোক উপস্থিত হইয়া নবাব বাহাদুর সাহেবকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক ছলিমিয়া মাদ্রাসা নামাকরণে মাদ্রাসার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য সকলেই একবাক্যে দয়াময় খোদা তালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। আমিন ২ প্রোক্ত বক্তৃতা সকল আগামি কোয়াটারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে যত্ন পরায়ণ হইলাম।

প্রোক্ত সভা ভঙ্গের সময় আমি ছাত্র দিগকে এইরূপ উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলাম-- হে নিরাশ্রয় ছাত্রগণ এইক্ষণ তোমরা এক প্রকার আশঙ্কা শুন্য হইলা, দয়াময় খোদা তালার কৃপায় পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরবান্বিত (তুবা) কল্প তরুর আশ্রয়ে তোমাদের তাপিত হৃদয় এবং অঙ্গ সুশীতল হইল, এই মহা তরুর আশ্রয় ভিন্ন যখন প্রচন্ড আতপ তাপ এবং মুষলধারা বৃষ্টিপাত হইতে শির রক্ষা করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই, এই অবস্থায় তোমরা সকলেই কায়মণে আমার সহিত একবাক্যে ন্যায় বান করুণাময় খোদা তালার স্থানে এই মহাতরুর দীর্ঘ জীবদান ও উন্নতির প্রার্থনা কর। যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি পূর্ণ প্রকান্ড ব্রহ্মান্ড স্থায়ী থাকে ততদিন পর্য্যন্ত যেন এই মহাতরু সুফল সুপুষ্প পরিশোভিত হইয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে তৎপর থাকে আমিন ২।

জগৎ প্রসিদ্ধ পারসিক মহাকবি হাজরত সাদি মহোদয় নিম্ন লিখিত পার্শী পদ্য দ্বারায় যেমন তদানিন্তন বাদশাহ আবু বকর সাআদকে প্রশংসা করিয়াছেন আমাদের নবাব বাহাদুর ও সেইরূপ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

মানবগণকে আপনার কৃপাকর দরুণ যে রূপ কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, স্বীয় পিতা ও পুত্রের প্রতি তৎপরিমাণে কৃপা বিতরণ করেণ নাই, মানব গণকে উদ্ধার করার ইচ্ছায়ই দয়াময় খোদা তালা আপনাকে দয়ালু করিয়া এই ধরাধামে সাম্রাজ্য প্রদানে প্রেরণ করিয়াছেন।

নিবেদক----

নোয়াখালি নিবাসী-শ্রী মহাম্মদ আবদুল হালিম
ছলিমিয়া মাদ্রাশার প্রধাণ শিক্ষক
পোঃ আঃ মুলচর (জিং ঢাকা)

---

* নওয়াবের পরিদর্শনের ঘটনাটা ১৯০৪ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে হয়েছিল, সূত্রঃ ঢাকা প্রকাশ ২৭ নভেঃ ১৯০৪ দ্রঃ - লেখক।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-১৮

নওয়াব আহসানুল্লাহর লেখা ব্যক্তিগত ডাইরীর পাতা

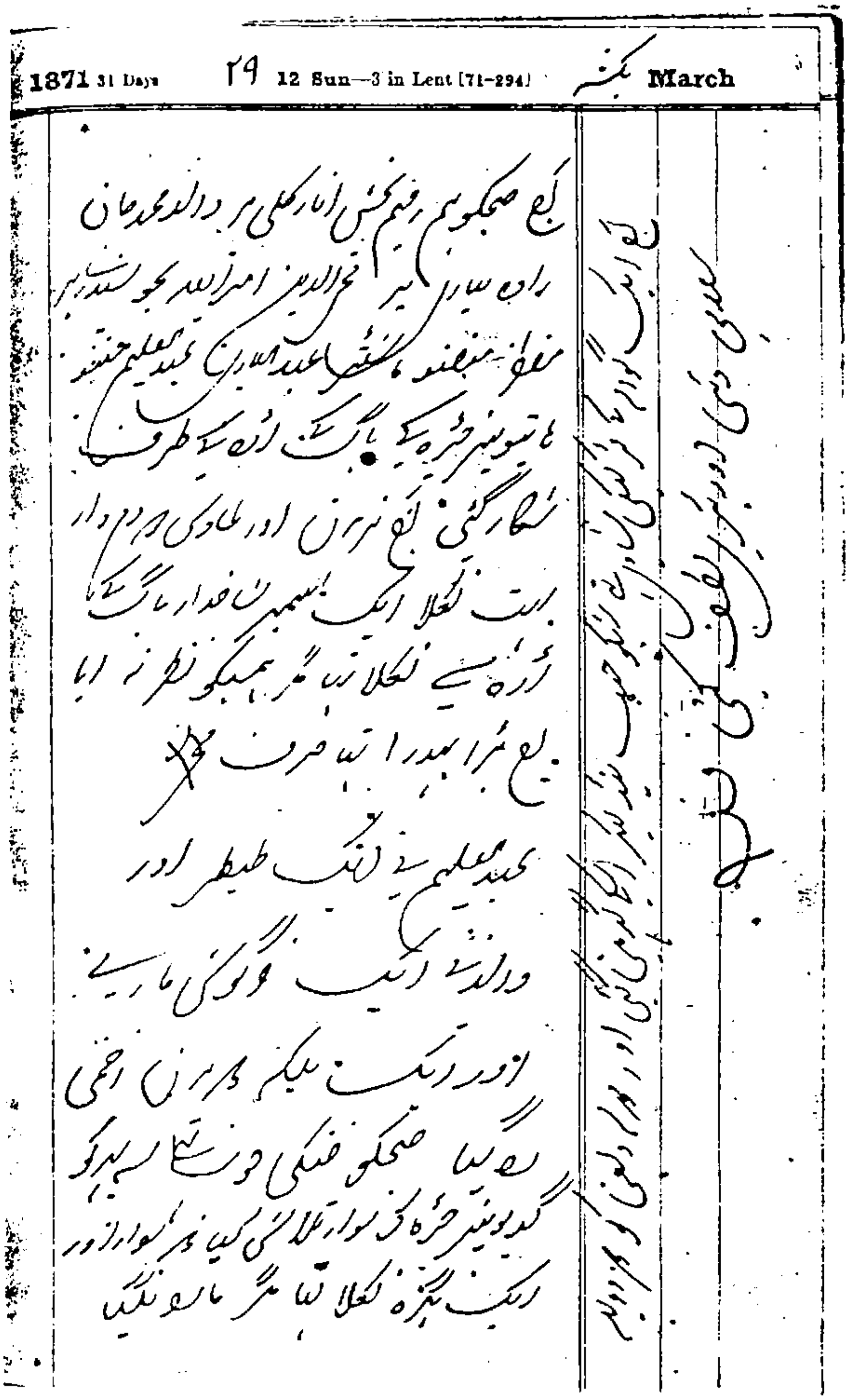

P.T.O.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-১৯

নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কবিতাছন্দে লেখা দাওয়াতপত্র (ফার্সী)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نشید حمد خدا کی خدائی ہے شیدا	سرود نعت نبی پر زمانہ جان سے فدا
ہوائے گلشن عشرت ہے آج مشک آمیز	نسیم صبح مسرت ہے آج عنبر سا
نوائے محفل شادی ہے جوش دل انگیز	نشاط و عیش و طرب کا ہے ہر طرف چرچا
زمان میمنت آگین و سعد مقرون ہے	خدا کے فضل کا کرتا ہون شکر دل سے ادا
ہے ازدواج ہمایون و فرخ و مسعود	مری بہار نظر لخت سعیدہ کا
جو تھی دین پسر چودھری کفیل الدین	ہین اسعد دو جہان طول عمرہ ابداً
انھین سے ٹھہری ہے یہ نسبت ہمایون فر	خدا کرے ہو مبارک یہ نسبت زیبا
ہے بست و ہشتم ماہ رجب کو یہ تقریب	ہے تیرھوین وہی آسن کی روز جمعہ کا
کرم سے منزل احسن مین ڈھاکہ کے آکر	بڑھائین رونق بزم نشاط عشرت زا
شریک محفل شادی ہون دو بجے دن کو	رہین منت بے حد ہو دل محبون کا
اب اور آگے کرے عرض کیا سلیم اللہ	ہو سازگار یہ شادی کرین ہر ایک دعا

احسن منزل - ڈھاکہ
مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۰۵ء

المکلف
سلیم اللہ

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিতাছন্দে লেখা দাওয়াতপত্র (ফার্সী)- এর বঙ্গানুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর প্রশংসা করছি, খোদার খোদায়িত্বে আমরা বিভোর;
নবীর প্রশংসার গানে বিশ্ব মন উৎসর্গীকৃত।
আনন্দভরা বাগানের বায়ু আজ মেশ্‌ক আম্বরে মুখরিত;
আনন্দে মাখা ভোরের বাতাস আজ আম্বরে পরিণত।
শাদীর মাহফিলের ডঙ্কা মনের জোশ বৃদ্ধি করছে;
আজ আনন্দ উৎসবের চর্চা হচ্ছে চারদিকে।
বিশ্ব আজ বরকত ও সৌভাগ্যে ভরপুর;
মনে প্রাণে আদায় করছি আল্লাহর দানের শুকরিয়া।
আমার বাসন্তী ও ভাগ্যবতী কন্যার পবিত্র ও শুভ বিবাহ
দু'জাহানের ভাগ্যবহ-চৌধুরী কমিরুদ্দিনের পুত্র মহিউদ্দিনের
সাথে নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহ তাঁকে চিরঞ্জীবি করুন ।।
খোদা করুন এই সুন্দর সম্পর্ক মোবারক হোক।
এই অনুষ্ঠান হবে (২৮) আঠাশে রজব তারিখে;
তথা আশ্বিন মাসের তের তারিখ শুক্রবার।
আশা করছি তাঁরা দয়া করে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে পদার্পন করে
এই আনন্দময় মাহফিলের ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করবেন;
শাদীর মাহফিলে শরীক হবেন বেলা দু'টোর সময়।
বন্ধু বান্ধবদের মন কৃতজ্ঞতা ভরে আবদ্ধ হোক;
সলিমুল্লাহ এর চেয়ে বেশী আর কি আরজ করতে পারে।
শুভ হোক এই শাদী এই দোয়া করুন সবাই।

আরজ গুজার
সলিমুল্লাহ

আহসান মঞ্জিল, ঢাকা
২৫ সেপ্টেম্বর-১৯০৫

---

* দাওয়াত পত্রটি অনুবাদে সহায়তা করার জন্য লেখক প্রফেসর মুহঃ আবদুল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২০

<u>নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া খাজা আফজালের লেখা কবিতাসহ পত্র</u>

Dacca
The 10th May/10

My dear Cousin,

Herewith enclosed send you a Copy of the Extempore Chronogrammatic Elegy composed by humble ~~my~~self in ~~the~~ Persian with its English translation for your kind perusal & suggestion.

I went to Ahsan-Manzil but told that you are not coming so took the liberty of sending you here at Shahbag.

Yours affly
Afzul

Dhaka University Institutional Repository

تاریخ ارتحال روان آفال اعلیحضرت شهنشاه معظم ادورد هفتم قیصر هند از افکار خواجه محمد افضل المتخلص به افضل متوطن ڈھاکہ

دریغا شد نهان آن قیصر هند	که از رخشنده بوده اختر هند
ز مشرق تا بمغرب زیر فرمان	کمینه داه شاه خاور هند
شفق گون اشک از دامان گردون	بارد دمبدم بر کشور هند
صیام ارتحال حسرت افزود	نموده چون دو پیکر پیکر هند

نوشته افضل محزون بدیه شد

کنون رحلت نموده قیصر هند

۱۳۲۸ھ

Dhaka University Institutional Repository

৪১৬

An extempore chronogrammatic elegy on the sad demise of H.M. the King Emperor, Kaisar-i Hind, composed by K. M. Afzul, the Persian Poet of Dacca.

Alas! the Kaisar-i-Hind is no more,
1. From whom the star of India was luminous.

On whose vast dominions never sets the Sun
2. The Lord of the Orient (Sun) was his slave

The Crimson tears from the Welkin's skirt
3. Are flowing fast in streams on India's Strand.

The doleful demise, as with a Scimitar,
4. Has cut in twain the body of India, which now looks like the sign Gemini.

Dawned in a moment on the mind of sad-hearted Afzul, the date of the sad event
5. "Just now departed the Kaisar-i-Hind"

1328. A. H.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২১

শাহবাগে নববর্ষের মেলা উপলক্ষে নওয়াবের বিজ্ঞাপন (তাং ২২ নভেঃ ১৮৭৯)

"নওয়াব আহসানুল্লাহ খাঁ বাহাদুর সর্বসাধারণকে অবগত করাচ্ছে যে, শ্রী ভারতেশ্বরীর 'ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে গত সন ১লা জানুয়ারী (১৮৭৮)-তারিখে তিনি যেরূপ মেলার আয়োজন করেছিলেন, তদ্রুপ এ বছরও গো, মেষ ইত্যাদি পশু ও কৃষকদের ভূমি-উৎপন্ন ফসল ও কৃষি সম্বন্ধীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য এক কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে মনস্থ করেছেন। অতএব তিনি সর্বসাধারণকে আহবান করছেন যে, তারা যেন তাদের ঐসকল দ্রব্যসহ মেলাতে উপস্থিত হয়ে নিম্ন বর্ণিত পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করে। তিনি আরো আশা করেন যে, এই জেলাস্থ রাজকর্মচারী এবং জমিদারগণ তাঁকে এই জনহিতকর কার্যে তাঁদের সৎপরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে তাঁর সহায়তা করবেন। এ জন্য তিনি তাদের নিকটি চির কৃতজ্ঞ থাকবেন।

"উক্ত প্রদর্শনী ৩০ শে ডিসেম্বর(১৮৭৯) আরম্ভ হয়ে ১লা জানুয়ারী (১৮৮০) পর্যন্ত সর্বসাধারণের দর্শণার্থে খোলা থাকবে। যারা ঐসব পুরস্কার পেতে চায়, তাদেরকে গো, মেষাদি ও কৃষিকার্যের অস্ত্র-শস্ত্রাদি ও ভূমি উৎপন্ন দ্রব্যাদি উক্ত প্রদর্শনীর স্থানে ২৯ ডিসেম্বর তারিখে পাঠাতে হবে। অতঃপর নিযুক্ত বিচারকগণ উত্তীর্ণ প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

"যারা প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি উপস্থিত করবেন, তাঁদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, তাঁরা যেসব দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করবেন, তাঁরাই সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যাঁরা নিম্ন প্রকারে লিখিত টিকিট লাগিয়ে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গো-মেষাদি প্রদর্শনীর স্থানে রাখবেন, তাঁদেরকেই তৎকালের আহার যোগাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

টিকিটের ফরম
শ্রেণী
প্রদর্শনকারীর নাম
বাসস্থান — পরগনা
বর্ণন

১ম বিভাগ

১ম শ্রেণী

এই জেলাতে জাত উত্তম ষাঁড় যাহা এই দেশের প্রয়োজনীয় বাক্যে উপযোগী হয়। তজ্জন্য পুরস্কার	২০/-
এই জেলাতে জাত উত্তম দুগ্ধবতী গাভী, তৎসংগে উত্তম বৎস	২০/-
এই জেলাতে জাত চাষের উত্তম জোড়া বলদ	২০/
	৬০/-

২য় শ্রেণী

এই জেলাতে জাত উত্তম সোয়ারি অথবা বাঝারু টাট্টু ঘোড়া তের হাত অথবা তাহার কম উচ্চ	২৫/-

৩য় শেণী

এই জেলাতে জাত উত্তম মেষ	৫/-
এই জেলাতে জাত উত্তম ৪টি ভেড়া	৮/-
	১৩/-

৪র্থ শেণী

এই দেশে জাত উত্তম পাঁঠা	৫/-
এই দেশে জাত উত্তম পাঁঠী	৫/-
	১০/-

৫ম শ্রেণী

এই জেলায় জাত উত্তম দুই মোরগ ও ৪টি মুরগী	৪/-
যে কোন জাতি হোক উত্তম এক মোরগ	৪/-
উত্তম খাশী মোরগ	৫/-
উত্তম এক রাজ হংস ও চার রাজহংসী	৫/-
উত্তম এক পাতি হংস ও চার পাতি হংসী	২/
	২০-

২য় বিভাগ

১ম শ্রেণী

দেশীয় গোয়ালের প্রস্তুতি দ্রব্য।

উত্তম টাটকা মাখন নমুনা ওজনে এক সেরের কম না হয়-	৩/-
উত্তম গাওয়া ঘৃত ওজনে ১০ সেরের কম না হয়।	১০/-
উত্তম মহিষা ঘৃত ১০ সের	১৫/-
	২৮/-

২য় শ্রেণী

শস্য যাহা প্রদর্শনকারীগণের আপন চাষের ভূমির উৎপন্ন হইবেক তাহার নমুনা ১০ সেরের কম হইবেক না।

উত্তম মেজের চাউল	১৬/-
ঐ সাধারণ চাউল	৮/-
ঐ দেশীয় মাখৈ	৪/-
	২৮/-

Dhaka University Institutional Repository

৩য় শ্রেনী
মটর কলাই ইত্যাদি ঐরূপ উৎপন্ন হইবেক-
উত্তম বুট ১০/-
ঐ মটর ৫/-
ঐ অরহর ৫/-
পাঁচ কিংবা অধিক প্রকারের ডালের সংগ্রহ প্রত্যেক প্রকারের নমুনা দুই সেরে কম না হয়।- ৮/-
২৮/

৪র্থ শ্রেণী
আলু ইত্যাদি যাহা পুর্ব্বের ন্যায় উৎপন্ন হইবে এবং ১ মণ করিয়া দেখাইতে হইবেক।
উত্তম আলু ৫/-
ঐ সকরকন্দ আলু ৫/-
ঐ হরিদ্রা ৪/-
ঐ আদা ৫/-
এরাকট ৪/-
ভিন্নস্থান হইতে আমদানি আলু ৫/-
২৮/-

৫ম শ্রেণী
শণপাট ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় উৎপন্ন এবং প্রত্যেক প্রকার ৫সের করিয়া দেখাইতে হইবেক।
উত্তম পাট ২০/-
শণ ,, ৫/-
মস্পদ্দরের আঁশ ৫/-
৩০/-

৬ষ্ঠ শ্রেণী
তুলা যাহা প্রদর্শনকারীগণের আপন চাষের ভূমির উৎপন্ন হইবেক এবং পশম যাহা তাহাদের নিজের গো-মেষ ইত্যাদির হইবেক। তাহার প্রত্যেক রকম ওজনে ১০ সেরের কম হইবেক না।
বিদেশী বীজ হতে এই জেলাতে
উৎপন্ন উত্তম তুলা ১৫/-
উত্তম দেশীয় তুলা ১০/-
২৫/-

৭ম শ্রেণী
রঙ্গ প্রত্যেক রকমের নমুনা ৫ সের উৎপন্ন কুসুম ফুল যে কোন জেলায় উৎপন্ন হোক। ৬/-
লাহার রঙ্গ ৮/-
১৪/-

৮ম শ্রেণী
তৈল উৎপন্নকারী বীজ যাহা প্রদর্শন কারিগণের নিজ চাষের ভূমিতে উৎপন্ন হইবেক নমুনা / ৫সেরে কম না হয়। উত্তম
তিশি ৪/-
সরিষা ৪/-
তিল ৪/-
ভেরেণের বিচি ৪/-
সিরগুজা ৬/-
২২/-

৯ম শ্রেণী
তামাক যাহা প্রদর্শনযোগ্য জমির উৎপন্ন নমুনা/৫ সের ১০/-
উত্তম তামাকের পাতা ১০/-
উত্তম দেশীয় চুরট ১০/-
৩০/-

১০ম শ্রেণী
সাধারণ দেশীয় ২ খানা উত্তম ইক্ষু ৫/-
গুড় ১০ সের ৫/-
১০/-

১১শ শ্রেণী
কৃষিকর্মের অস্ত্রাদি।
দেশীয় লৌহ নির্মিত গাছ কাটিবার উপযোগী
অন্যূন ৬ খান কুড়াল ১০/-
ঐ- ঐ- ৬ খান কোদালী ৫/-
এই জেলার প্রস্তুতি উত্তম লাঙ্গল ৫/-
ঐ- ঐ- বৈলের গাড়ী ৫/-
তুলা হইতে বিচি পৃথক করিবার জন্য এদেশীয় যন্ত্র ৫/-
দেশীয় কাঁচি অন্যূন ৬ খান ৫/-
৩৫/-

১২শ শ্রেণী
উত্তম শাক শবজী ১০/-
ঐ - ঐ- যে কোন রায়ত কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হোক প্রকৃত পন্তাবে তাহার নিজ ভূমির উৎপন্ন ৫/-
নানাবিধ উত্তম ফল ১০/-
নানবিধ উত্তম ফুল ১০/-
৩৫/-

কেবল নবাব সাহেবের জমিদারীর প্রজাগণের জন্য বিশেষ পুরস্কার।

১ম শ্রেণী
নবাব সাহেবের জমিদারীতে জাত উত্তম ষাঁড় যাহা নবাব সাহেবের রায়ত কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইবে ২৫/-
ঐ- ঐ - উত্তম দুগ্ধবতী গাভী বৎস সহিত ২৫/-
ঐ- ঐ- চাষের উত্তম ২ জোড়া বলদ ২০/-
৭০/-

২য় শ্রেণী
৩য় শ্রেণী
গোয়ালের প্রস্তুতি দ্রব্য
ঐ- ঐ- গাওয়া ঘৃত ১০ সেরের কম না হয়। ৮/-
ঐ- ঐ- মহিষা ঘৃত ১০ সেরের কম না হয়। ৮/-

৪র্থ শ্রেণী
ঐ- ঐ- উত্তম শস্য অন্যূন ১০ সের
উত্তম মেজের চাউল ১০/-
সাধারণ চাউল ৫/-

৫ম শ্রেণী
ঐ- ঐ-পাট ইত্যাতি অন্যূন ৫ সের
উত্তম পাট ১০/-

৬ষ্ঠ শ্রেণী
ঐ - ঐ- তৈল উৎপাদক বীজ অন্যূন ৫ সের
উত্তম তিশি ৩/-
সরিষা ৩/-
তিল ৩/-
ভেরেণের বিচি ৩/-
পোস্তার দানা ৩/-
শীরগুজা ৩/-

৭ম শ্রেণী
ঐ- ঐ - ইক্ষু এবং গুড়
২ খানা উত্তম ইক্ষু ৩/-
গুড় ১০ সের ৩/-

৮ম শ্রেণী
কৃষিকর্মের অস্ত্রাদি।
ঐ- ঐ- গাছ কাটিবার কুড়াল অন্যূন ৩ খান ৫/-
ঐ- ঐ- কোদালী ৬ খান ৩/-
ঐ - ঐ- উত্তম লাঙ্গল ৪/-
ঐ - ঐ- বৈলের গাড়ী ৩/-
ঐ - ঐ- তুলা হইতে বীজ পৃথক করার যন্ত্র ৩/-
ঐ- ঐ- কাঁচি অন্যূন ৬ খান ৩/-

৯ম শ্রেণী
রং নমুনা অন্যূন ৫ সের কুসুম ফুল (উপরে যেরূপ লেখা গিয়াছে। ৫/-

শ্রী চন্দ্রকান্ত গাঙ্গোপাধ্যায় দেওয়ান। ✱

✱ *সূত্র ঃ ঢাকা প্রকাশ,*
৮ অগ্রহায়ন ১২৮৬
২২ নভেম্বর ১৮৭৯ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২২

১৮৯৫ সালে তৈরী ঢাকার নওয়াবদের অস্থাবর সম্পত্তি ও অলংকারাদির মূল্য সম্বলিত একটি তালিকা

১। প্রমেশরী নোট-কোম্পানী কাগজ	৪,০০০০০/-
২। কুমারটুলী মহল্যার আছানমঞ্জিল নামাকরণে বাড়ীতে নগদ কোং	২৩,৬০,০০০/-
৩। বেঙ্গোল ব্যাঙ্কের শ্যার (অংশ)	১,০০,০০০/-
৪। কর্জ্জ লগ্নী তমসূক ইত্যাদি	৫,০০,০০০/-
৫। পাওনা টাকার ডিক্রী	১,৫০,০০০/-
৬। দরিয়া নুর	২,০০,০০০/-
৭। হিরা ইত্যাদি অঙ্গুরি ১ দফা	৫০,০০০/-
৮। হিরার জরাও চাম্পাকলী	৩,০০০/-
৯। হিরার লাঙ্গল ১ জোড়া	২,০০০/-
১০। হিরার দুগীদুগী	১,৫০০/-
১১। জহরতের বাজু	২৫,০০০/-
১২। হিরার ফ্রান্স স্টার	২৫,০০০/-
১৩। হিরা ছরপেচ মরচ্চা ৬ গোট	২৫,০০০/-
১৪। ইয়াকুতের আঙ্গুরি ১ গোট	১০,০০০/-
১৫। হিরার বাজুবন্দ	১০,০০০/-
১৬। মুতির মালা ৪ দফা	২,০০,০০০/-
১৭। চান্দির হুক্কা ময় লওয়াজিমা ও আতরদান, গোলাপবাশ ও ছাতি ও পান্দান ও পালং ইত্যাদি	১,০০,০০০/-
১৮। সোনার উপরে লিখিত জিনিষাত	৫০,০০০/-
১৯। ইংরেজি খানার চান্দির চাম্পা ছিণী বাকের ঝার ও ডোঙ্গা গং ...	৮,০০০/-
২০। ইংরেজি খানার ছুরি কাটা ও বাসুনের বিলাতি শেট	৩,০০০/-
২১। হিন্দুস্থানী খানার চিনা ও বিলাতি বর্ত্তণ ময় লওয়াজিমা	১০,০০০/-
২২। তামার ছোট বড় পাতিলা ১ দফা	৪,০০০/-
২৩। মছনদ তকিয়া ও সামিয়ানা ও জরির ঝুল ১দফা	১০,০০০/-
২৪। সতরঞ্চি গালিচা ময় লওয়াজিমা	৫০,০০০/-
২৫। হলব্বি আয়না ৭ গোট	৪,০০০/-
২৬। আলমারি মেজ হর কছমের ১ দফা	৪০,০০০/-
২৭। চান্দির ঝার ৪ গোট	৩২,০০০/-
২৮। সিনা আলা ঝার পানস	৩০,০০০/-
২৯। রেশমি পশমি শাল বনাত ও জামেয়ার কেমখাব, তাললপ্পা মোশাজ্জা জামদানী ও সোনাতি প্রভৃতি ১ দফা	৫,০০০/-
৩০। চৌকি কাষ্ঠের প্রভৃতি ২৫০ দফা	১,০০০/-
৩১। মাইচা কুরশী কার্ণার গং ১ দফা	১০,০০০/-
৩২। হর রকমের পরদা ময় লয়াজিমা	৫,০০০/-
৩৩। চান্দির রয়েল চ্যার ১ গোট	১,০০০/-

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। বেলয়ারী রয়েল চ্যার ৪ গোট	১০,০০০/-
৩৫। বেলয়ারী ত্রিপায়া মেজ ১ দফা	১,০০০/-
৩৬। চান্দির আশা সোটা ৫০ গোট	২,০০০/-
৩৭। চান্দির পাখা ২৫ গোট	৫০০/-
৩৮। ছোট বড় কাষ্ঠের হাত সিন্দুক ৫০ গোট	১,০০০/-
৩৯। কাষ্ঠের হাত বাক্স ২৫০ গোট	১,০০০/-
৪০। লোহার সিন্দুক আলমারি ছোট বড় ১ দফা	৫,০০০/-
৪১। কেশ বাক্স ১০ গোট	১০০/-
৪২। হাতি ১৪ গোট	৪০,০০০/-
৪৩। ঘোড়া ৬০ গোট	৩০,০০০/-
৪৪। জিন লাগাম গং ১ দফা	৫,০০০/-
৪৫। হর রকমের গাড়ী ৩৫ গোট	৫০,০০০/-
৪৬। গাড়ীর সাজ ১ দফা	১০,০০০/-
৪৭। হর রকমের ঘড়ি ১ দফা	২,৫০,০০০/-
৪৮। বন্দুক ১৪০ গোট	২০,০০০/-
৪৯। তরবারি, ঢাল, বল্লম, বরসি, বন্দুক ১ দফা	১০,০০০/-
৫০। তামার লয়াজিমা	১,০০০/-
৫১। পিতলের কলসী গং ১ দফা	৫,০০০/-
৫২। চান্দির চিনমতি আবতাবা গং ১ দফা	৫০০/-
৫৩। চান্দির চৌক্সা ৬ গোট	১,৫০০/-
৫৪। চান্দির চা দান, দুগ্ধ দান গং ৪ গোট	৫০০/-
৫৫। জরমন শিলবারে পেলেটের চান্দনি	৫০০/-
৫৬। সমাদান গং ১ দফা	১০০/-
৫৭। Green Boat ১০ গোট	১০,০০০/-
৫৮। জাহাজ ১ গোট	২০,০০০/-
৫৯। ফ্লেট ১ গোট	১০,০০০/-
৬০। কলের নৌকা ১ গোট	৫,০০০/-
৬১। পুরানা সোনার মোহর	৪৪,৮০০/-
"B" বি, চিহ্নিত তপছিলের মোট বাদীগণের অংশের দাবি-..................	১৪৫৩৯টা.৪আ. ৯ পাই
"C" "D" সি.ডি.তপছিলের সম্পত্তির বাদীগণের অংশের দাবি-............	৩৪৫৩৮৭০ট.১৪ আ. ৯ পাই
বাদীগণের অংশের আণুমানিক ওয়াশীলাত-................................	১৭১১৪৪৩ টা. ৯ আনা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৩

ঢাকার নওয়াবদের প্রকাশিত জুয়েলারী এ্যালবামে সংশ্লিষ্ট অলংকারগুলোর বর্ণনা ঃ

This Album illustrates a few pieces of Oriental Jewellery from the Dacca Collection, some of which are quite unique, while others are of historical interest.

It has been compiled at the suggestion of several friends interested in the subject, and of guests who wished to possess the record as a souvenir of their visit to Dacca.

NO. 1 :

A "DUST-BAND" or ARMLET. This ornament is composed of pure Indian Table-Diamonds. The centre stone is known as the "Duria-y-anoor" or "River of Light." It is one of the famous Diamonds of the world, and its history is closely associated with that of the "Koh-i-noor." It is absolutely perfect in lustre and water; it was originally in the possession of the Shahs of Persia, and ultimately passed into the possession of Runjeet Singh. After the Punjab War it came into the hands of the British Government, was purchased by the ancestors of the present Nawab, and has remained an heirloom in the family ever since.

The illustration is exact size. *(Pl. See Photograph No-49)*

NO. 2 :

This is an illustration of the CLASP of the STATE SWORD BELT worn by the Nawab. The entire centre is composed of a single Emerald of excellent shape and depth of colour. It is, for an Emerald, wonderfully free from flaws, and is of considerable antiquity. The border is composed of a single row of Brilliant Diamonds.

NO. 3 :

THIS BUCKLE is worn in change with that shown in the preceding illustration. It is remarkable for the very fine Lalrie which forms the centre. This stone is brilliant, free from flaws, and of the beautiful and delicate tint which is so much appreciated in the East. It is surrounded by a double row of fine Old Indian Diamonds.

NO. 4 :

A "SERPAITCH" or Head Ornament, composed of Rubies cut to form the petals of the flower, which radiate from the centre, unsupported by setting of any kind. The three centre stones are Emeralds, and six Emeralds divide the clusters. The ornament has been the property of the Nawabs of Dacca for a great number of years, and is an example of a class of jewellery now seldom seen.

NO. 5 :

A "BAZOO BAND" or Armlet of great antiquity, reputed to have once been in the possession of the Mogul Court. The centre stone is an Emarald of fine colour, beautifully engraved with verses from the Koran. The two sides are formed of engraved Emeralds, inlaid with two engraved Table Diamonds bearing the word "Allah." The three Emeralds are cut in the form of a hinge and require no setting to hold them together; they are, however, for additional

Dhaka University Institutional Repository

security set in a frame of Brilliant Diamonds. As an example of Engraved Gems this is an almost unsurpassed ornament.

NO. 6 :

A TURBAN ORNAMENT in the form of a natural Rose Spray, composed exclusively of very perfectly cut Diamonds of exceptional brilliancy; the centre stone is a large and perfect Burmah Ruby, well cut and of the true "Pigeon's blood" colour. Behind the centre flower is a receptacle in which reposes a miniature Koran, which is in itself a wonderful specimen of microscopic oreintal penmanship. This is known as "The Rose of Cashmere," whcih is a family emblem.

NO. 7 :

THE STAR illustrated is composed of rare old Diamonds of matchless brilliancy. The ornament was formerly the property of the Empress Eugenie. It is worn by the Nawab on State occasions attached to a fine string of 96 large Pearls.

NO. 8 :

A "SERPAITCH" composed of fine Emeralds and Brilliant Diamonds. Worn by the Nawab in his fez with the rest of his Emerald suite.

NOS. 9 and 10 :

Two very fine brilliant Diamond Stars, utilized in various ways by the Nawab and his son when in Durbar dress.

NO. 11 :

A JEWELLED FEZ. The band is composed of Brilliant Diamonds and lustrous Pearls. The tassel is formed of strings of Pearls with a large Emerald at the top. It illustrates the form of head-gear usually worn by the Nawab in full dress. (*Pl. See Photograph NO. 3.3)*

NO. 12 :

THE NAWAB'S STATE SWORD. The hilt is gold with chased decoration, and is ornamented with a fine Crescent and Star of Diamonds; a large Diamond adorns each end of the crosspeice, and a group of Diamonds ornament the hole to which the sword-knot is attached. The sheath is of pure silver tastefully chased, and the mounts, rings, &c., are of pure gold. The family coat-of-arms is chased in relief on the centre mount.

NO. 13 :

A MALLA or NECKLACE, illustrating one of several in the collection, and pictured about one third of actual size. It is composed of Pearls, six fine Lalrie Beads and sundry Emerald Beads. "The Dook-Dookee" or Pendant, is composed of splendid old Indian Diamonds of great purity, with Lalrie Drop attached.

NO. 14 :

A NECKLACE composed of three rows of fine round Pearls, with Diamond "Singhara" or end-pieces, and having a Diamond Pendant with Emerald Drop attached. A favourite form of Necklace.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৪

১৯০৮ সালে সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ কালে হ্যামিল্টন এন্ড কোম্পানীর তৈরীকৃত নওয়াবদের জুয়েলারীর তালিকা ঃ

The list taken from the Indenture executed on 6th August 1908 between court of wards and Nawab Salimullah.

Schedule of Mortgage properties q (a) (গ); list of Jewellary.

1. The Splendid Bajoo or arm Ornament containing the large and perfect table Diamond known as the Daria-Y-anoor.	Rs.	5,00,000/-
2. Emarald & diamond Clasp with gold belt.	Rs.	28,000/-
3. Lalris & diamond Clasp with gold belt.	Rs.	18,000/-
4. Ruby Serpaitch with Emerald leaves.	Rs.	6,000/-
5. Engraved Emerald & Diamond Bajoo Bund.	Rs.	50,000/-
6. Ruby & Diamond Head Ornament Rose of Cashmere	Rs.	48,000/-
7. The Maginficient Diamond Star formerly the Property of the Empress of the reveh and known as the Eugenie, star with pearl Necklace containing 96 pearls & Diamond Rondelles between each pearl.	Rs.	95,000/-
8. Diamond & Emerald serpaitch	Rs.	25,000/-
9. Diamond Star serpaitch	Rs.	4,000/-
10. Diamond Star serpaitch	Rs.	4,000/-
11. Jewelled Fez, pearls & Diamonds with pearls & Coral Tassel.	Rs.	10,000/-
12. A. Diamond Set State Sword	Rs.	14,000/-
13. A. Diamond Set State Sword	Rs.	17,000/-
14. A. Pearl Nacklace with Diamond pendant.	Rs.	15,000/-
15. A Three row pearl Necklace with Diamond dook Dookee	Rs.	14,000/-
16. Pearl Diamond Fez, with pearl Tassel with Emerald drops.	Rs.	34,000/-
17. Emerald & pearl Fez, with Tassel containing pearls & intaban Emeralds.	Rs.	14,000/-
18. A pearl & Coral Fez.	Rs.	3,000/-
19. A Fez, with Lace	Rs.	3,000/-
20. A Diamond & Engraved Lalrie Rose Necklace	Rs.	22,000/-
21. A Diamond Rosette Necklace	Rs.	3,000/-
22. A Diamond Star & wreath	Rs.	27,000/-
23. An Engraved Agate Bajoo Set Diamonds.	Rs.	2,250/-
24. Serpaitch with large Brilliant Diamond centre Rose Diamond flower	Rs.	12,000/-
25. A pendant Composed of light Ruby Beads & Diamonds	Rs.	1,600/-
26. A Butterfly Serpaitch Set Diamonds Emeralds & Rubies.	Rs.	4,000/-
27. A Diamond Star & wreath	Rs.	2,700/-
28. A Necklace Composed of 54 pearls with dook Dookee attached	Rs.	3,000/-
29. A pearl & Emerald Necklace	Rs.	180/-
30. A pearl & Emerald Necklace	Rs.	180/-
31. A pearl & Emerald Necklace	Rs.	225/-
32. A Ruby & Diamond Kulga	Rs.	250/-

Dhaka University Institutional Repository

33. A Ruby Kulga Emerald Drops	Rs.	275/-
34. An Emerald Kulga	Rs.	75/-
35. A Kulga with Emerald Drops	Rs.	80/-
36. An Emerald & Diamond Chick	Rs.	650/-
37. A pair Pokraj Panchees 120/-	Rs.	
38. Champacolly Nokraj	Rs.	170/-
39. A pendant of Diamond & Ruby & Emerald Beads	Rs.	1,650/-
40. A Pearl & Emerald Chain, 64 Pearls & 5 Emeralds.	Rs.	4,000/-
41. A pair Bracelets containing 26 Diamonds & numerous Emeralds.	Rs.	5,500/-
42. A pair pearl Diamond & Emerald Bracelets	Rs.	750/-
43. A pair Mackrees (Ear Ornaments) Containing 36 Pearls & 20 Emerald Drops	Rs.	1,200/-
44. A Duck Broach, A Parrot Broach & a gam Cock Broach	Rs.	500/-
45. A parrot Broach, & a Slipper Broach	Rs.	675/-
46. An Elephant Watch	Rs.	400/-
47. A small gold Geneva Watch with chain & bharnis	Rs.	300/-
48. A small gold Geneva watch with Platencu and Gold chain & Charms	Rs.	350/-
49. A small gold Geneva watch & chain	Rs.	225/-
50. Miniature Enametted of watch set, Diamonds with pearl Chain	Rs.	750/-
51. Gold Hemiting Geneva lever watch with Chain	Rs.	250/-
52. A gold Hemiting Calender watch Chain & five cborns	Rs.	375/-
53. A silver of Chronograph Watch with chain & charms	Rs.	200/-
54. A Silver of Lever watch with gold chain	Rs.	235/-
55. Two large Turquoise Rings	Rs.	500/-
56. An Opal & Diamond ring	Rs.	1,100/-
57. A Diamond & Emerald Monogram Ring	Rs.	1,000/-
58. A Single Stove Diamond ring	Rs.	4,500/-
59. A Turquoise & Diamond cluster Ring	Rs.	350/-
60. Three Single Raw Diamond Hoop rings	Rs.	350/-
61. An Engraved Cornelion Signet Ring	Rs.	70/-
62. An Engraved Signet Ring	Rs.	60/-
63. An Opel & Diamond Cluster Ring	Rs.	1,300/-
64. A Brown Diamond Cluster Ring	Rs.	600/-
65. A Rare Antique Blood Stove Intaglia Ring	Rs.	150/-
66. Three Engraved Signet Rings	Rs.	175/-
67. Three Geni Rings	Rs.	325/-
68. Two Diamond Ruby Cluster Rings	Rs.	325/-
69. Two Geni Cluster Rings	Rs.	250/-
70. Six Geni Rings	Rs.	150/-
71. Four Rings	Rs.	180/-
72. One tiger Charm	Rs.	75/-
73. A peace of very Minute Gold Chain	Rs.	70/-
74. An Opal & Diamond Broach	Rs.	130/-
75. A Diamond Bajoo containing a very Minute Koran	Rs.	3,000/-
76. A pair Diamond Bracelets	Rs.	7,500/-
77. A Koran in Silver Box	Rs.	
78. A gold Jubilee Meede Mion	Rs.	35/-
79. A pair Enamelled Bracelets	Rs.	100/-
80. A pair Enamelled Bracelets	Rs.	100/-
81. A set of Sight Emeraled & Diamond Bhorns	Rs.	1,600/-

Dhaka University Institutional Repository

82.	A pair gilt Enamelled bracelets	Rs.	15/-
83.	A Box of sandry Stones	Rs.	50/-
84.	A pair of Spring Bracelets	Rs.	375/-
85.	A belt with Jewelled Clasp	Rs.	2,750/-
86.	A belt with Jewelled Clasp	Rs.	1,500/-
87.	Tharteen Charms in a box	Rs.	950/-
88.	An Engraved Agate	Rs.	300/-
89.	A Goekey Broach & a gold Gem Broach	Rs.	175/-
90.	A Bird Broach	Rs.	225/-
91.	An Eleand & Diamond Broach	Rs.	100/-
92.	A Box containing one tiger claw bracelet, Three T.C. Broaches, four T.C. Charms, two T.C. piens & two T.C. whistles	Rs.	350/-
93.	A Box containing Sewandry pieces	Rs.	30/-
94.	A Bench of Eight Charms	Rs.	150/-
95.	A silver box containing 5 Agate	Rs.	60/-
96.	A box containing two silver Bracelets, two silver Broaches tow silver cue chalks, two pencils, one silver Teamaker and on brash were chorun.	Rs.	75/-
97.	A Miniature Mondoline	Rs.	5/-
98.	Two Broaches	Rs.	45/-
99.	Turquose Chatolim	Rs.	60/-
100.	A purse & a silver neck chain	Rs.	15/-
101.	A Ring	Rs.	15/-
102.	A miniature decoration C.S.I. one do C.I.E. & Delhi Assemblage	Rs.	130/-
103.	Two gold mounted Sword Belts	Rs.	600/-
104.	A Sword Belt with gold Clasp set, pearls & Turquoise	Rs.	200/-
105.	Sin puces of gold Mounted belt	Rs.	300/-
106.	A gold Mounted Ivory Handled Sword (Noblade)	Rs.	700/-
107.	A gold mounted Sword (noblade)	Rs.	900/-
108.	Small Gold mounted Sword	Rs.	350/-
109.	Gold hemiting repeating watch woth Enamel section	Rs.	750/-
110.	A gold hemiting Mocaba repeating watch with Diamond Button	Rs.	1,750/-
	Total	Rs.	10,09,835/-
	* Gold bains (Coins?)	Rs.	25,000/-

Sd/.
Hamilton & Co.

Nawabs Share	Rs.	1,76,721.2 "
Do (Coins) Do .... Do – 25,000 in	Rs.	4,375 "
Total	Rs.	1,81,0962 "

R. Nathan (commissioner)	H.L. Salkild Sq (Collector of Dacca)	K. Salimullah 9/8/08

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৫

Valuable belonging to the late Nawab-Bahadur of Dacca
(Listed on 26 January, 1915 by Haliton & Co.)

No.1.	16 pieces odds & ends all imitation in cardboard box	Rs.	5-0-0
,, 2.	1 Silver Delhi Durbar Medal	,,	4-0-0
,, 3.	1 Gold Lucky Star Locket	,,	30-0-0
,, 4.	1 Enamel Traingular box	,,	12-0-0
,, 5.	1 Gold Tie Ring	,,	10-0-0
,, 6.	1 Pair Gold Tie Clips	,,	12-0-0
,, 7.	1 Gold Tie Rings	,,	8-0-0
,, 8.	9 Silver folding pen racks	,,	9-0-0
,, 9.	1 Gold Safty Pin	,,	5-0-0
,, 10.	1 Large Gold Pencil Case	,,	35-0-0
,, 11.	1 Gold Pencil & 1 Gold Toothpick	,,	10-0-0
,, 12.	1 Small Silver Ash Tray	,,	0-8-0
,, 13.	1 Ivory Mallet Pencil Case	,,	10-0-0
,, 14.	1 Gold Bolt Ring	,,	2-0-0
,, 15.	1 Silver Propellar Pencil Case	,,	1-0-0
,, 16.	1 Peral Shelle	,,	75-0-0
,, 17.	1 Tuctee	,,	12-0-0
,, 18.	2 Coin Ash Trays & Cigar Cutter	,,	15-0-0
,, 19.	1 Enamel Timepiece	,,	12-0-0
,, 20.	1 Gold Bolt Ring	,,	7-0-0
,, 21.	1 Indian Chased Silver Cigarette Case in (Morocco case)	,,	25-0-0
,, 22.	1 Only Gold Choorie in (Valvet Case)	,,	36-0-0
,, 23.	1 Ruby & Diamond Scarf Pin in Velvet Case	,,	90-0-0
,, 24.	1 Ruby pearl Diamond & Emarald Scarf Pin in Case	,,	120-0-0
,, 25.	1 Turquoise Safety Pin ...	,,	0-8-0
,, 26.	1 Imitation pearl on Gold Safety Pin ...	,,	30-0-0
,, 27.	1 Pair Gold Sleeve Links in Velvet Case	,,	20-0-0
,, 28.	1 Pearl Collar Button in Veltvet Case	,,	60-0-0
,, 29.	1 Gilt Watch with Gold & Pearl Chain	,,	75-0-0
,, 30.	1 Enemal Box broken joint	,,	8-0-0
			Carried over Rs.738-8-0
No, 31.	1 Blue enamel card case, damaged	,,	5-0-0
,, 32.	1 Metal Sauff Box	,,	1-0-0
,, 32A.	1 Square Silver watch with fancy chain and five charms....	,,	80-0-0
,, 33.	1 Turquoise, Ruby & Pearl Star	,,	40-0-0
,, 34.	2 Strings Imitation Coral	,,	1-0-0
,, 35.	1 Electroplated Pan Box	,,	25-0-0
,, 36.	1 Almunium Tobaco Box	,,	0-8-0
,, 37.	1 Nikel Cigaarette Case	,,	1-0-0
,, 38.	1 Miniature C.S.i	,,	50-0-0
,, 39.	1 String Imitation Pearl	,,	5-0-0
,, 40.	1 Ruby & Diamond Serpaitch (feather patern)	,,	600-0-0
,, 41.	1 Diamond Star	,,	1500-0-0
,, 42.	1 Pearl and Gold Watch Chain	,,	250-0-0
,, 43.	1 Gold Star Pattern Guard	,,	260-0-0
,, 44.	1 Centre only of Revolving Serpaitch	,,	350-0-0
,, 45.	1 Nickel Wrist Watch	,,	10-0-0
,, 46.	1 Jewelled Butterfly & Crescent Serpaitch	,,	75-0-0
,, 47.	1 Gold Hunting Watch in (Wooden Case)		45-0-0
,, 48.	1 Enemel & Pearl Chain with Silver Knife & gold locket in (morocco case)		135-0-0
,, 49.	1 Large E.T. Silver-gilt Cigaarette Case	,,	65-0-0
,, 50.	1 Silver Ciggarette Case	,,	22-0-0
,, 51.	7 Imitation Brooches	,,	150-0-0
,, 52.	2 Imitation Corsaj Brooches	,,	120-0-0
,, 53.	1 Imitation Brooch	,,	3-0-0
			Total Rs. 4,532-8-0

Calcutta, 26th January,1915.
A.K.Das, 15.12.21.

Sd/- Hamilton & Co.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৬

ঢাকা মোহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত ক্লাবের সভাপতি,
খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজানকে লেখা নওয়াব আহসানুল্লাহর পত্র

Collected from The Moslem Chronicle, 12 August, 1899, page-456

Letters to the Editor, From Dacca Mussulmans.

Sir,
With due respect I request the favour of your publishing the following letter which the president of our club has recieved from our generous and kind hearted Nawab, the hon'ble Nawab Sir Ahsanullah Khan Bahadur K.C. I.E. of Dacca, in your esteemed Journal.It dose credit to his head and heart and promises a considerable patronage and encouragement for our infant club. May good enduse him long and allow the world to enjoy the blessings of his bounties. Sporting is not only the long and short of our Club. We have some higher aims. Viz. to open a Reading Room like that of our Mohamedan friends of Calcutta. The plan of managing the whole business of the Club without the assistance of the leadingmen of our town is indeed impracticable and we are therfore waiting for their co-operation and help. We offer our hreart-felt thanks to those gentlemen who have come forward up to date to help us with pecuniary aid and donation.

Subjoined is a true copy of our Nawab Bahadur's letter.

To, K. Mohammad Yousoff Sahib,
president, M.U.S. Club, Dacca.

Dear Sir,

In reply to your letter of the 4th instant I have to say that I am very glad to learn that the Mohammedan youths of this town have started a Club which has, for its objects healthy exercise and training of both mind and body. This is indeed a move in the right direction. And with you as its president, I have no doubt that it will meet with success, I shall of course be glad to give it every encouragement and support in my power. But I wish to watch and see how it progress and if by the end of the year I fined it still flourishing, I shall then have great pleasure in giving it my best suport.

In Conclusion, it I may be allowed to say so, I think great attention should be given to the moral training of the youngmen. Those who could not behave properly should be expelled and those who have blots against their character should never be allowed to join the club.

Your's faithfully,

K. Ahsanullah (1899)

Trusting you are one of the well wisher of our club.

I remain Sir
Your's very faithfully

A.R. Mahmood
Sec. M.U.S. Club, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৭

লেঃ গভঃ স্যার ল্যান্সলট হেয়ার-এর প্রতিকৃতি উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নওয়াব সলিমুল্লাহর জারীকৃতপত্র।

The Ahsun Munzil, Dacca
The 23rd July, 1911.

Sir Lancelot Portrait.

Mr. DEAR SIR,

Overleaf is a copy of the resolution passed at a meeting of the Sir Lancelot Portrait Fund Committee held on the 17th June,1911. I shall be much obliged by your kindly letting me know if you approve of the programme laid down therein.

I take this opportunity of thanking those of my brother Zemindars who have kindly contributed to this fund, and would request for the last time, those who have not, to remit their subscriptions (Minimum Rs. 25/-) to the Hon. Treasurer Babu Raghu Nath Das, Farashganj. Dacca.

The unveiling ceremony will take place on the 21st August next. The subscribers to the Fund will be the hosts of the evening and will be introduced to both Sir Lancelot Hare and Sir Charles Stuart Bayley. It is expected that all the Zemindars will lend their co-operation and will be present on the occasion to bid farewell to Sir Lancelot Hare and welcome Sir Charles Stuart bayley. I would personally request you to join us in the ceremony as a host, without fail.

The subscribers are requested to kindly let me know their Dacca address immediately on their arrival here.

I would mention here that the Landolders' Association will be pleased to arrange for accommodation during your sojourn here, should you give timely notice to the Secretary.

I remain
My dear Sir
Yours sincereley,

K. Salimollah
Nawab of Dacca.

Resolutions passed at a meeting of the committee of " Sir Lancelot Portrait Fund" held at Ahsun Munzil on the 17th June, 1911.

Resolved that a copy of the following programme be sent to the landholders who have been requested to subscribe to the portrait Fund, for apporval.

1. The Secretary will write to the private Secretary to His Honor and ascertain if the 21st August next will suit His Honor's covenience to attend the unveiling ceremony of the Portrait.
2. That the univeiling ceremony will take place at the Northbrook Hall.
3. That the Hall be tastefully and nicely decorated.
4. That the portrait which will be kept veiled be hung on the southern wall of the Hall facing the entrace to the Hall and that on his arrival His Honor be conducted to the Hall where he will take his stand at a convenient distance and facing the portrait.
5. The guests will take their stands on the left side of His Honor facing west while the subscribers or the hosts will stand on the right facing east.
6. The Hon'ble Maharaja Girija Nath Roy, the President of the Eastern Bengal Landholers Association will then, with the Permission of His Honor, make a short speech on behalf of the landholders, wishing His Honor Godspeed, and declare the Portrait open by unveinling it (By certain contrivance the veil will be removed).
7. The subscribers will then be introduced to both His Honor Sir Lancelot Hare and his successor Sir Charles Stuart Bayley.
8. Refreshments will be provided for and special arrangement on pure orthodox style will be made for the Hindus.
9. Band will play "God Save the King" closing the function.

 Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৮

এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক চীফ ম্যানেজারকে দেয়া পত্র

A. K. Fuzlul Huq, M. A., B. L.,
Vakil, High Court,
Member, Bengal Legislative Council,
AND
Commissioner, Calcutta Corporation.

6, TURNER STREET,
CALCUTTA.
The 4th February, *1922.*

Dear Mr. Meyer,

I was away from Calcutta, having been summoned by the Government of India to give evidence before the Racial Distinction Committee. I returned yesterday and got a sudden attack of fever from which I am still suffering.

I have heard everything that has taken place in connection with the affairs of the Nawab of Dacca. I did not write to you so long because I thought I would be able to go to Dacca and talk to you personally. Since there is no immediate prospect of my going to Dacca, I am writing these few lines to you.

From all that I have come to know, I believe that the Nawab is more deserving of pity than any thing else. He has ~~not~~ been under evil advice and has taken certain foolish steps. But he seems to be still amendable to reason and I believe that once I can meet you personally and discuss matters, I will be able to put every thing in a satisfactory condition. I am willing to do so for the sake of young Nawab himself as also in grateful recognition of many favours I received from his father. There is a possibility of my going to Dacca by the middle of February to attend a meeting of the University. Possibly I will then have a chance of talking with you in detail.

Dhaka University Institutional Repository

I am too weak to day to write a longer letter.

With best regards,

I am,

Yours sincerely,

A.K. Fazlul Huq

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-২৯

<u>চীফ ম্যানেজার কর্তৃক এ.কে. ফজলুল হক-কে দেয়া পত্রোত্তর(তাং ৬ফেব্রুঃ১৯২২)</u>

Chief Manager's Office,
Nawab's Estate,
Dacca, the 6th February, 1922.

My dear Mr. Fuzlul Huq,

Thanks for yours of the 4th received last evening.

I am sorry to see from it that you were suffering from an attack of fever when you wrote. I trust by the time you get this letter you will have fully recovered your usual health.

With regard to the Nawab, I have done my very best to help him, but he has not the sense to know his wellwishers from those who are sucking his life-blood.

I shall be glad to see you if you do come up to Dacca.

Yours Sincerely,

Sd/
H.C.F. Meyer

Maulvi A.K. Fazlul Huq, M.A., B.L.,
6, Turner Street, CALCUTTA.
S.G.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৩০

ভাওয়াল রাজ কর্তৃক নবাব সলিমুল্লাহকে লেখা পত্র

BHAWAL RAJ.

JOYDEBPUR RYL. STATION & P.O.
E.B.S.RY.

The 30th October/04.

File

My dear Brother

My youngest brother Robindra is suffering from repeated attacks of fever from a long time. The doctors are advising for a change. I tried to get a house at Naraengunj but could not get one

Can

Can you conveniently lend me your Naraingunj house for a few days & oblige

Hoping this will find you in good health

Yours affectionately
Ronendra Roy

asking for the use of Narayanganj house for a few days for his brother who is very ill.
S. 6/11/04

 Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৩১

শাহবাগ বাগানবাড়ীর ভূমি নকশা

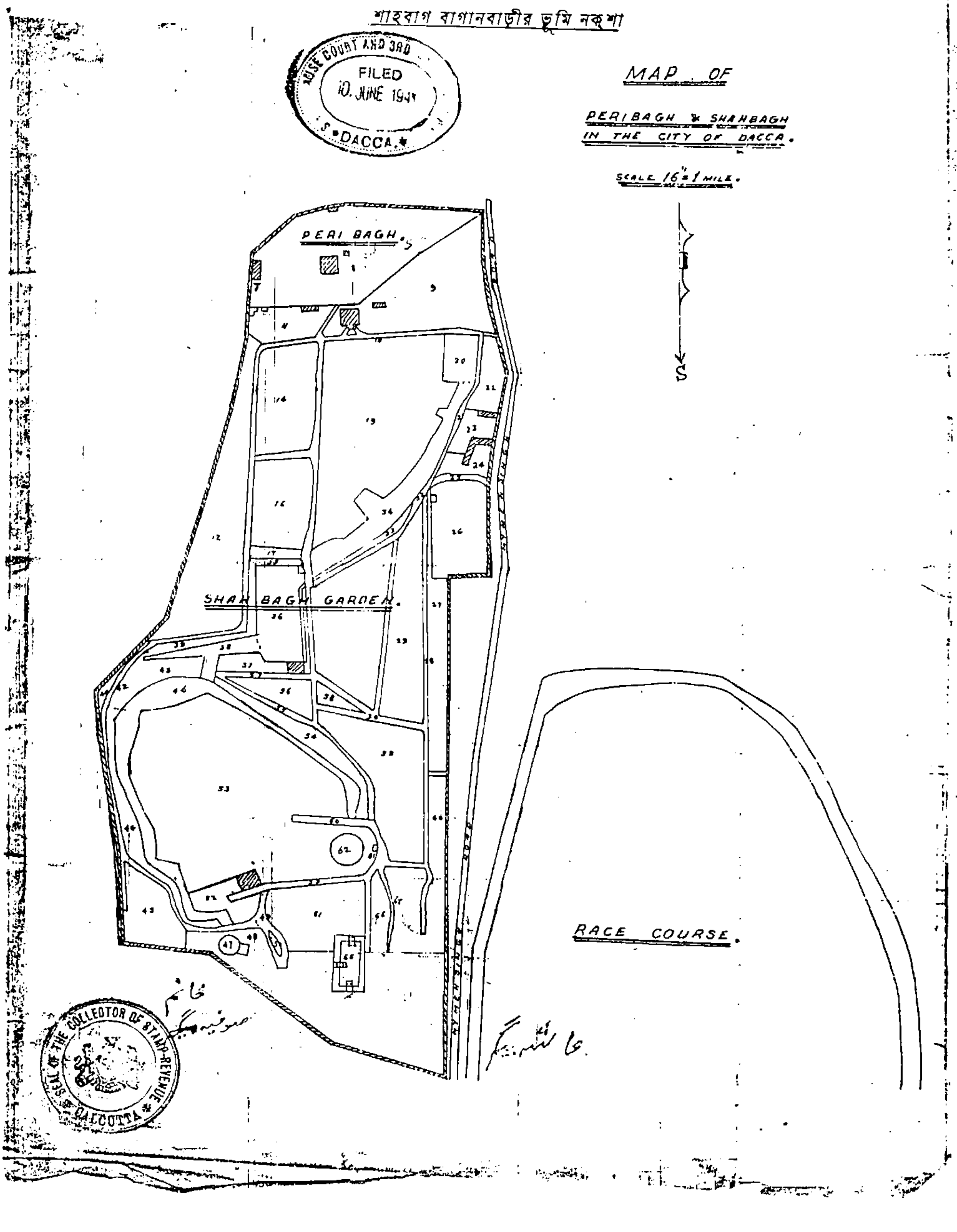

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৩২

দিলকুশা বাগানবাড়ির নকশা

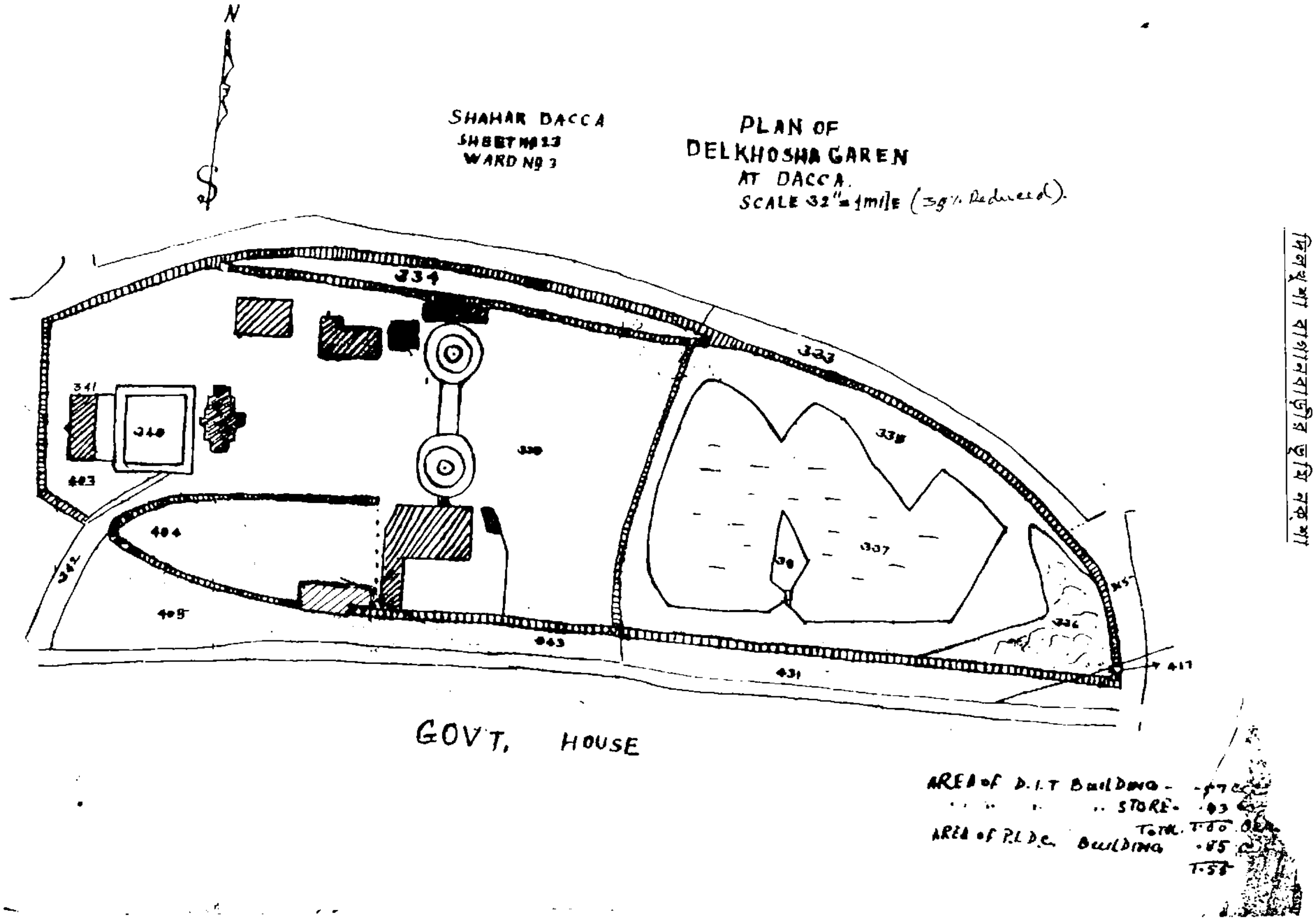

Dhaka University Institutional Repository

Dilkhusha Properties:

1. Total Area ... 21.68 acres as detailed below:

Sl. No.	Plot No.	Area	Class of Land	Remarks if any.
1.	334	1.03	Garden	
2.	335	3.06	"	
3.	336	0.68	High Land	
4.	337	3.95	Jhil area	
5.	338	0.14	Garden	
6.	339	10.50	Garden with Building.	
7.	340	0.44	Tank attached to the Mosque.	
8.	341	0.24	Mosque	
9.	342	0.20	Approach Road	
10.	403	0.39	Garden	
11.	404	0.94	Garden with Buildings	
12.	417	0.11	Garden	
	Total	21.68		

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট নং-৩৩

নওয়াবদের জিঞ্জিরা গার্ডেনের ভূমি নকশা

ZINZIRA GARDEN

MOUZA CHUNKUTIA . J. L. No. 432 .

PLOT No. 1. P.S. KERANIGANJ.

DACCA .

SCALE 16" = 1 MILE.

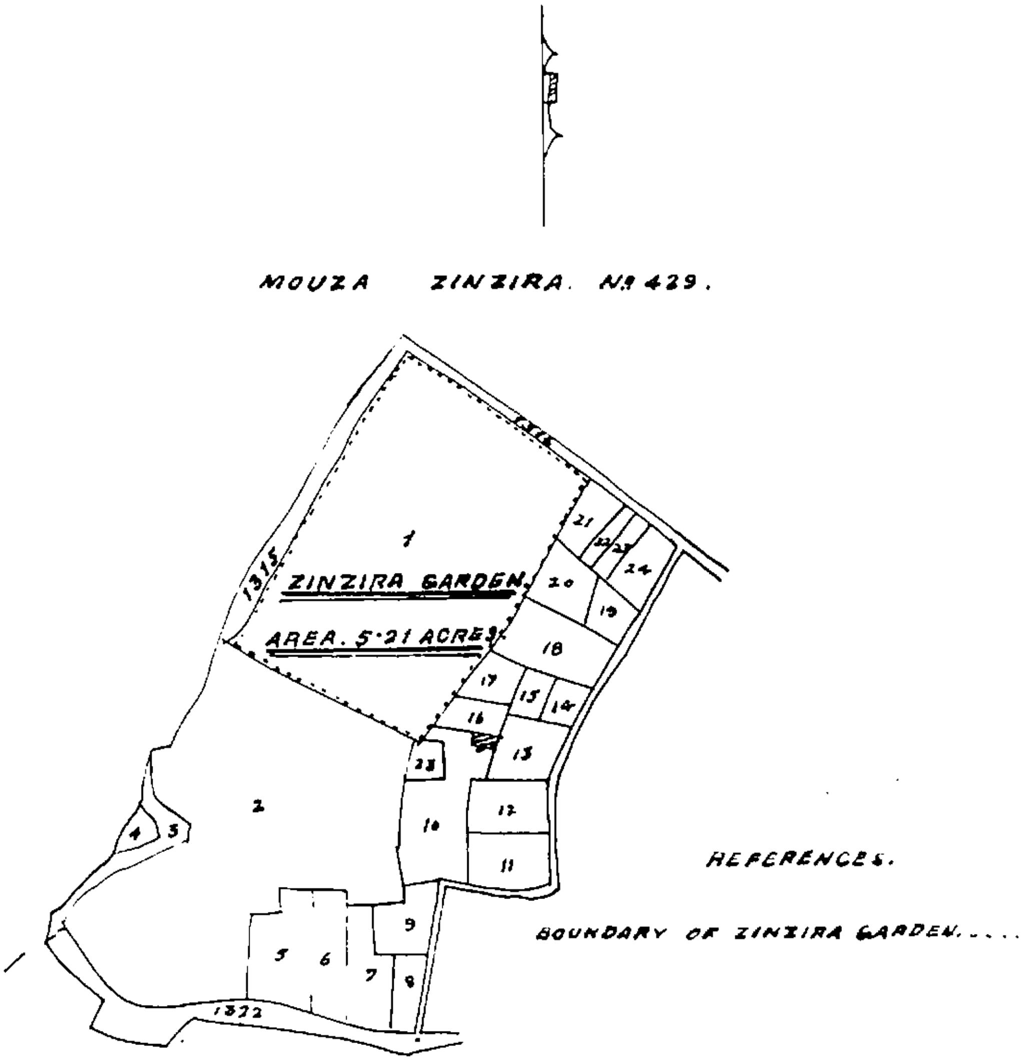

PREPARED BY

18.8.58

SURVEYOR.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থসমূহ

- অ -

অনুপম হায়াত : বাংলাদেশের চলচিত্রের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮৭।

অনুপম হায়াত : দোলন চাঁপার হিন্দোল, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৮।

ঐ : মেহেরবানু খানম, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৭।

অক্ষয় চৈতন্য, ব্রহ্মচারী : প্রেমানন্দ প্রেমকথা, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

- আ -

আব্দুর রহিম সাবা : তারিখ-এ-কাশ্মীরিয়ান-এ-ঢাকা, অপ্রকাশিত, ফার্সী পান্ডুলিপি।

আহসানুল্লাহ, নওয়াব : তাওয়ারিখে-খান্দান-এ কাশ্মিরিয়াহ, অপ্রকাশিত, উর্দু পান্ডুলিপি।

আহসানুল্লাহ শাহীন, নওয়াব : কুল্লিয়াতে শাহীন, কাব্যগ্রন্থ (উর্দু-ফার্সী) ১ম সংখ্যা, ১৫ ফেব্রু ১৮৮৪।

আদিনাথ সেন : দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববংগ (২) কলকাতা-১৯৪৮।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, (উনবিংশ শতাব্দী) প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৬।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : পশ্চিমবংগে ফার্সী সাহিত্য, ঢাকা ফেব্রুঃ-১৯৯৪।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৬।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯১।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৪।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : নওয়াব আলী চৌধুরী, জীবন ও কর্ম, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৭।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ) ঢাকা-১৯৯৫।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, প্রথম প্রকাশ; ঢাকা-১৯৮৬।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৭।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : বাঙলায় খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা- ১৯৯৬।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : নওয়াব আব্দুল গণি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ, জীবন ও কর্ম, ১ম প্রকাশের জন্য ইস. ফাউন্ডেশনে জমা দেয়া পান্ডুলিপি। (১৯৯৬)

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন দিশারী (অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি)

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : হাকিম হাবিবুর রহমান, ঢাকা -১৯৮৭।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : স্যার আব্দুর রহিম, জীবন ও কর্ম, প্রথম প্রকাশ, -১৯৯০।

আব্দুল হাকিম, খান বাহাদুর (প্রধান সম্পাদক) : বাংলা বিশ্বকোষ, ১-৪ খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৯।

আবুয যোহা নূর আহমদ : উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৫।

আব্দুল করিম : ঢাকাই মসলিন, ঢাকা-ডিসেম্বর-১৯৯০।

আবদুল করিম : মুর্শিদ কুলি খান ও তাঁর যুগ (মোকাদ্দেসুর রহমান কর্তৃক ইংরেজী থেকে বংগানুবাদ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৯।

আব্দুল আজিজ আল-আমান : নজরুল পরিক্রমা, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা-১৩৭৬।

আনিসুজ্জামান : মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৬৯।

আজিজুল হক : বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, (ডঃ মুস্তাফা নুর-উল- ইসলাম অনুদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৯।

আনোয়ারুল হক (অনুদিত) : বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ (মূল প্রেমেন আডডি, ইবনে আজাদ) প্রথম প্রকাশ-১৯৮৮।

আব্দুল হালিম, মোহাম্মদ : মুর্শিদাবাদ ও সিরাজ পরিবার।

আবুল কাশেম, মোহাম্মদ : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, মার্চ-১৯৬৯।

আহমদ ছফা : সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা জানুঃ ১৯৮৭।

আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ এবং মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা -১৯৮৬।

আব্দুল খালেক (সম্পাদিত) : শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, ঢাকা-১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

-ই-

ইসলামী বিশ্বকোষ (১-৯ খন্ড) : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা-১৯৯০।

ইনাম-উল-হক, মুহাম্মদ : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭) প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৩।

ইমরান হোসেন : বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবিঃ চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫- ১৯৪৭) বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৩।

ইলাহি বখশ : মুক্তিদূত (লাইফ স্কেচ অব খান বাহাদুর মৌলবী মোঃ আজহার (১৮৫৩-১৯২১) মূল - ইংরেজী মুদ্রণ ১৯১৮, বংগানুবাদ এবং সম্পাদনা, ইলাহী বখশ প্রথম মুদ্রণ, ঢাকা-১৯৮৮।

ইকবাল আজিম : মাশরিকী বাংগাল মে উর্দু। ঢাকা, মাশরিক কো-অপারেটিব পাবলিশার্স ১৯৫৪

- উ -

উবায়দুল্লাহ-আল-উবায়দী সুহরাওয়ার্দী : দাস্তান-ই--ইবরাতবার (আত্মজীবনী) বংগানুবাদ করেছেন-মোঃ আব্দুল্লাহ মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, ঢাকা-১৯৮৪ (পরিশিষ্ট-১ দ্রঃ)

উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় : চরিতাভিধান, কলকাতা-১৯১২।

-এ-

এনামুল হক, মহম্মদ : বংগে সুফী প্রভাব, কলকাতা-১৯৩৫।

-ও-

ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম ও ২য় খন্ড প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৩।

ওয়াকিল আহমদ : বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫।

ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত) : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, রজত জয়ন্তী-১৯৯৩, অভিভাষণ ও প্রবন্ধাবলী, ঢাকা-১৯৯৬।

-ক-

কেদারনাথ মজুমদার : ঢাকার বিবরণ, ময়মনসিংহ, মার্চ-১৯১০।

ক্লে, আর্থার লয়েড : লিভস ফ্রম এ ডাইরী ইন লোয়ার বেংগল, বাংলা অনুবাদ-ফওজুল করিম, সম্পাদনা-মুনতাসীর মামুন, ঢাকাঃ ক্লে'র ডাইরী (১৮৬৬-১৮৬৭) প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯০।

কামরুদ্দিন আহমদ : বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, ২য় খন্ড, ঢাকা-১৩৮২ বংগাব্দ (১৯৭৪ খ্রীঃ)

কাইউম, মোহাম্মদ আব্দুল : চকবাজারের কেতাবপট্টি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯০।

কুদ্দুস, মোঃ আব্দুল : আলোর দিশারী, ঢাকা-১৯৭৯।

-জ-

জেমস টেইলর : টপোগ্রাফী এন্ড স্টাটিসটিকস অব ঢাকা, মোঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক অনুদিত, কোম্পানী আমলে ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩।

জাকারিয়া, আ. কা. ম. : বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৪।

জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ (সংকলিত) : স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯২।

-ব-

বদি-উজ-জামান : মুসলিম জাগরণে মোহামেডান স্পোর্টিং, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৯।

বদরুদ্দিন উমর : পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা-১৯৭৯।

বদর উদ্দীন উমর : ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারী-১৯৯০।

বদর উদ্দীন উমর : বংঙ্গভংঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ঢাকা, জানুয়ারী-১৯৯১।

বদর উদ্দীন উমর : পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ ঢাকা-১৯৭৫

-ম-

মুনতাসীর মামুন : ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, প্রথম পুর্নমুদ্রণ, ঢাকা-১৯৯৪।

মুনতাসীর মামুন : পুরানো ঢাকাঃ উৎসব ও ঘরবাড়ী, ঢাকা-১৯৮৯।

মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সভা সমিতি, ঢাকা-১৯৮৪।

মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র, ১ম খন্ড, ঢাকা-১৯৮৫।

মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, ১ম প্রকাশ, ঢাকা জুন-১৯৭৯।

মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র, ২য় খন্ড, ঢাকা-১৯৮৭।

মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র,(১৮৪৭-১৯০৫) ৩য় খন্ড, ঢাকা-১৯৮৮ এবং ৪র্থ খন্ড, ঢাকা ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মামুন	ঃ	ঢাকাঃ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৭।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	কর্ণেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯০।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	ঢাকার প্রথম, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৫।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	হৃদয় নাথের ঢাকা শহর, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৫।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯১।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা- ১৯৯১।
মমতাজুর রহমান তরফদার	ঃ	বাংলার বর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অষ্টাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৮৩।
মুস্তাফা নূর উল ইসলাম	ঃ	সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০) প্রথম প্রকাশ, ঢাকা- ১৯৭৭।
মীর্জা নাথান	ঃ	বাহারিস্তান-ই গায়বী, খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত, ১ম ও ২য় খন্ড, ১ম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮৫ এবং ৩য় ও ৪র্থ খন্ড, ঢাকা-১৯৮৯।
মুর্তজা আলী, সৈয়দ	ঃ	মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসংঙ্গ, ঢাকা-১৯৭৬।
মুজাফ্‌ফর আহমদ	ঃ	কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৭৩।
মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান (সম্পাদিত)	ঃ	মুহাম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা- ১৯৮৫।
মুনিরুদ্দিন ইউসুফ	ঃ	উর্দূ সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৮।
মফিদুল হক	ঃ	আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) বাংলা একাডেমী. ঢাকা-১৯৯০।
		-ত-
তায়েশ, মুন্সী রহমান আলী	ঃ	তাওয়ারিখে ঢাকা, ডঃ আ. ম. ম. শরফুদ্দিন কর্তৃক অনুদিত, ১ম প্রকাশ,ঢাকা-১৯৮৫।
		-দ-
দীনেশ চন্দ্র সেন	ঃ	বৃহৎবংগ, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা- বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত-১৩৪২ বাংলা।
দেওয়ান শফি উল আলম	ঃ	নবাব বাহাদুর সলিমুল্লাহ, ১ম সংস্করণ ঢাকা-১৯৬৪।
		-ন-
নাজির হোসেন	ঃ	কিংবদন্তির ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৫।
নির্মল কুমার গুপ্ত	ঃ	ঢাকার কথা, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬৬ বাংলা।
নওয়াব আলী চৌধুরী, সৈয়দ	ঃ	পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১২) কলকাতা, এপ্রিল-১৯১৪।
নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত)	ঃ	বাংলা বিশ্বকোষ, পুর্নমুদ্রণ, ১৯৮৮ (৪র্থ ভাগ)।
		-য-
যতীন্দ্র মোহন রায়	ঃ	ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
		-র-
রহিম, এম. এ.	ঃ	*সোশাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেংগল*, মোহাঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক অনুদিত, বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-১৯৮৫।
রহিম এম. এ.	ঃ	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৯।
রফিকুল ইসলাম	ঃ	ঢাকার কথা (১৬১০-১৯১০) প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮২।
রতন লাল চক্রবর্তী	ঃ	সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৪।
রওশন আরা বেগম	ঃ	নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বংগের মুসলিম সমাজ, ঢাকা- ১৯৯৩।
রহিমউদ্দিন সিদ্দিকী (অনুদিত)	ঃ	প্রাচ্যের রহস্য নগরী (ব্রেডলী বার্টের, রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল-এর বংগানুবাদ) ২ মুদ্রণ, ঢাকা, আগস্ট-১৯৭৭।
রেজোয়ান সিদ্দিকী, ডঃ	ঃ	পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১) বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৬।
		-ল-
লিওনার্দ মোজলে	ঃ	ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিনগুলো, মূল ইংরেজী থেকে বংগানুবাদ করেছেন মোয়াজ্জেম হোসেন, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৮।
		-শ-
শামসুর রাহমান	ঃ	স্মৃতির শহর, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৭৯।
শতীশ চন্দ্র মিত্র	ঃ	যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুন-১৯৬৫।

-হ-

হাকিম হাবিবুর রহমান,আখুন্দজাদা ঃ আসুদগানে ঢাকা, মওলানা আকরাম ফারুখ এবং মওলানা আ.ন.ম. রুহুল আমিন চৌধুরীর বংগানুবাদ, প্রথম বাংলা সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯০।

হাকিম হাবিবুর রহমান,আখুন্দজাদা ঃ ঢাকা পাঁচাস বারস পাহলে, উর্দু থেকে বংগানুবাদ করেছেন- মোঃ রেজাউল করিম, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫। এবং একই গ্রন্থের আরেকটি বংগানুবাদ করেছেন, হাশেম সুফি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র-১৯৯৫।

হাকিম হাবিবুর রহমান, আখুন্দজাদা ঃ সালাসা গাসসালা, উর্দু- পাণ্ডুলিপি।

হাফিজ হুসিয়ারপুরী (সম্পাদিত) ঃ পাকিস্তানকে উর্দু আদিব, রেডিও পাকিস্তান, করাচী

হান্টার,উইলিয়াম উইলসন ঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, এম. আনিসুজ্জামান কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, নতুন সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯০।

হাবিব- উল- আলম (সম্পাদিত) ঃ ঈদ উৎসব, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৪।

হবিবুল্লাহ এ. বি. এম. ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪।

-স-

সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ ঃ পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি, ১-২ খন্ড, ঢাকা-১৯৭০।

সিরাজুল ইসলাম ঃ বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ১৭৫৭-১৮৫৭, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা-১৯৮৯।

সিরাজুল ইসলাম ঃ নবাব পরিবারের উত্থান ও পতন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৮ আগস্ট, ১৯৭৮।

সিরাজুল ইসলাম(সম্পাদিত) ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ১ম , ২য়, ৩য় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৩।

সত্যেন সেন ঃ মহা বিদ্রোহের কাহিনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯১।

সত্যেন সেন ঃ শহরের ইতিকথা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৭৪।

সুবোধচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) ঃ সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ, কলকাতা-১৯৮৮।

সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম(সম্পা)ঃ বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা, ফেব্রুঃ ১৯৯৭।

সালাহউদ্দিন আহমদ, এম. আর. তরফদার, ও অজয় রায় (সম্পাদিত) ঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯১।

সরকার, ডঃ অজয় চন্দ্র নাথ ঃ উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা-১৯৮২।

ENGLISH BOOKS

- A -

Adbul Karim : Dacca The Mughal Capital, 1st. published, Dacca-1964

Azimusshan Haider : Dacca: History and Romance in place Names, 1st. printed, Dacca-1967.

Azimusshan Haider (edited) : A city and its civic Body, 1st. printed Dacca-1966.

Allen, B.C. : Eastern Bengal District Cazetters: Dacca, Allahbad-1912

Azam, Khwaja Mohamed : The panchayat System of Dhaka (edited- with an introduction by Muntasir Mamoon) 1st. pub. Dhaka-1990.

Aulad Hassan, Sayid : Notes on the Antiquities of Dacca, Dhaka- 1904

- B -

Buckland, C.E. : Bengal under the Lieutenant Governors, Vol-II, Calcutta-1901.

Buckland, C.E. : Dictionary of Indian Biography, London-1906.

Biography : Biographical Encyclopedia of Pakistan, Lahore-1969-70.

Bhai Nahar Singh, Kirpal Singh (Campiled) : History of Koh-I-Noor, Darya-I-Noor and Taimur's Ruby, New Delhi-1985.

Britanica : The new Encyclopaedia of Britanica, Vol-3, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

V. Ball. C.B. : A description of Two Large Spinel Rubies, with Persian characters Engraved Upon them (Proceedings of the Royal Irish Academy) January 22, 1894.

Buckland, C.T. : Sketches of social life in India, London-1884.

Bradeley Birt, F.B. : Twelve men of Bengal in the Nineteenth century, 3rd. edition, Calcutta-1925.

Bradeley Birt, F.B. : The Romance of an Eastern Capital, London, 1906.

- C -

Claude Campbell, A. : Glimpsess of Bengal, Vol-I, Calcutta- 1907.

- D -

D' Oyly, Charles : Antiquities of Dacca, London, 1824.

Dani, Ahmad Hasan : Dacca A record of its Changing Frotunes, second edition-1962.

" " " : Muslim Architechture in Bengal, Dhaka-1961

Datta, Kalikinkar : Studies in the History of the Bengal Subah, 1740-70 Vol-1, Social and Economic, Calcutta-1936.

- E -

Enamul Haq(ed) : Nawab Bahadur Abdul Latif, His writings and Related Doccuments, Dhaka-1968.

- F -

Firoz Mahmud and Habibur Rahman : The Museums in Bangladesh, 1st edition, Dhaka-1987.

Fazlur Rahman, M. : The Bengali Muslims and English Education (1765-1835) Dhaka-1973.

- G -

Gupta, Nirmal Kumar : Dacca (Old and New) Dhaka-1940.

- H -

Habibullah, A.B.M. : Descriptive Catalogue of the persian, Urdu and Arabic Manuscripts in the Dacca University Library, Voi-I (1966) & Vol-II (1968).

Habibullah, A.B.M. : A General Guide to the Dacca Museum, Dhaka-1964.

Heber, Reginald : Narrative of a Journey through the upper Provinces of India from Calcutta to Bombay 1824-1825, Vol-1, London-1928.

Habibullah, Nawab, Khwaja : The political case of Moslem India in a Nutshell, Presidential Address by him, at All India Communal Award Conference held on the 24th. March, 1935 at Delhi.

Hussain, Syud : Echoes from old Dhaka, Calcutta, May-1909.

Hassan, Sayed Mahmudul : Dacca, the city of Mosques, Dhaka-1981.

Hussainur Rahman,Doctor : Hindu Muslim Relations in Bengal (1905-1947) Bombay-1974.

Henry Beveridge : The District of Bakergong, its History and statistics, Calcutta, 1876.

Hamilton & Co. : The Album, Illustrated a few pieces of Oriental Jewellery from the Dhaka Nawabs Collection.

Hunter, W.W. : Report of the Indian Eductaion Commission, 1883.

Hogarth Milne J. : Great Britain in the Coronation year (Leading Men of the Empire, British India) London, June-1914.

- I -

Ikram. S.M. : Modern Muslim India and the Birth of Pakistan (1858-1951) second edition-1965.

Dhaka University Institutional Repository

Imamuddin, A.H.(edited) : Architectural Conservation Bangladesh 1st. published, Dhaka-1993.

- J -

Jyotis chandra Das Gupta : National Biography for India, Vol-V, Dacca 1919.

James wise : Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London-1883.

- K -

Kamruddin Ahmed : A political History of Bengal, 4th. Edn., Dhaka-1975.

K.K. Aziz : Amir Ali, His life and works, Karachi, 1963.

Khwaja Razi Haider(edited) : An Illustrated Diary, published by P.I.A. on Golden Jubilee of Pakistan Resolution, Karachi 23rd March, 1990.

Kulkarni : British Statesmen in India, Calcutta-1936.

- L -

Loke Nath Ghose : The Modern History of the Indian Chiefs, Rsjas, Zaminders & C.Part-II, Calcutta, 1881.

- M -

Majumder, Hridaynath : The Reminicences of Dacca, Calcutta- 1926.

Marchiones of Dufferin and Ava : Our Viceregal life in India, London-1890.

Motiur Rahman : From cansultation to confrontation : A study of the Muslim League in British Indian polities (1906-1912) London, 1970.

Mallik, Azizur Rahman : British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), 2nd edition, Dhaka-1977.

Muinuddin Ahmad Khan : History of the Faraidi Movement, 2nd. edition, Dhaka-1984.

Mohsin, K.M. : A Bengal District in Transition, Murshidabad (1765-1793) Dhaka-1973.

- N -

Nuruzzaman, Mohammad : Who's Who Dacca, new edition.

Nawab Ali Chowdhury, Sayed : Vernacular Education in Bengal, Calcutta, 1900.

Nazimuddin Ahmed : Mughal Dacca and the Lalbagh Fort-Dhaka.

Nazimuddin Ahmed : Buildings of the British Raj in Bangladesh, Dhaka-1986.

- P -

Parmu R.K. : A History of Muslim Rule in Kashmir, 1320-1819, New Delhi-1969.

-------------- : Practical Dictionary, 11th edition, Allahbad,

Panorama of the City of Dacca : Lithographed and published by Messers Dickinson 114, New Bond street, London-1840.

Prizada Sharifuddin(ed) : Foundation of Pakistan (1906-1924) Vol, -I, Karachi-1969.

- R -

Rahim, M.A. : Muslim Society and politics in Bengal (1757-1947) Dhaka, Nov. 1978.

Rahim,M.A. : Social and cultural History of Bengal, 1963.

Rahim,M.A. : History of the University of Dhaka, 1st. edition, Dhaka-1981.

Rizvi S.N. (edited) : Bangladesh District-Gazetteers, Dacca, Dhaka-1975.

Rais Ahmed Jafri (Nadvi) Sayed (edited) : Some Rare Doccuments (D.U.L. 1040, RAS) Dhaka-1970.

Dhaka University Institutional Repository

- S -

Sharif Uddin Ahmed	:	Dacca A study in Urban History and Development, 1st. published, London-1986.
Sarif Uddin Ahmed (edited)	:	Dhaka past present Future, 1st. published, Dhaka-1991.
Sirajul Islam (ed)	:	Bangladesh District Records, Dhaka-1981.
Sarker J.N.	:	Bengal, Nawabs. New edition.
Sufi G.M.D. Dr.	:	Kashir- A history of Kashmir, Vol-1, Lahore-1948.
Sonia Nishat Amin	:	The world of Muslim women in Colonial Bengal (1876-1939) Brill, New York-1996.
Sufia Ahmed	:	Muslim Community in Bengal (1884-1912) Dhaka- 1974.
S.P.Sen (ed)	:	Dictionary of National Biography, Vol-II(E.L) Calcutta-1973.
Salahuddin Ahmed, A.F.	:	Social Ideas and social Change in Bengal, (1818-1835) 2nd. edt, Calcutta-1976.
Stephen Howarth	:	The Koh-I-Noor Diamond, The History and Legend, 1st. pub London-1980.
Shila Sen	:	Muslim politics in Bengal (1937-1947), New Delhi-1976.
Sekandar Ali Ibrahimi, Dr.M. (Compilation & Annotation)	:	Reports on Islamic and Madrasah, education in Bengal (1861-1977) Vol-5, 1st edition-1990
Siraj Uddin	:	Nawab Salimullah Bahadur, Dhaka 1991.

- T -

Taifoor, S.M.	:	Glimpsess of old Dhaka, 2nd. edition, Dhaka-1956.
Thomas Holbein Hendley	:	Indian Jewellery, Vol-2, Reprint-New Delhi-1984.

- Y -

Yousuf Hussain (ed)	:	Selected Doccuments from the Aligarh Archives, Aligarh Muslim University, Aligarh, 1967.

বাংলা প্রবন্ধ সমূহ

মমতাজুর রহমান তরফদার	ঃ	বাংলার বর্ণব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৮ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩।
ওয়াকিল আহমদ	ঃ	হেমায়েত উদ্দিন আহমদ, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ১০ সংখ্যা, ১৯৮১।
ওয়াকিল আহমদ	ঃ	ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	ঃ	পাক বাংলার ইসলামী বিপ্লব, মাহে নও, ২০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অকটোবর, ১৯৬৮।
প্রীতিকুমার মিত্র	ঃ	হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) তৃতীয় খন্ড, ঢাকা-১৯৯৩।
মোঃ আলমগীর	ঃ	ঢাকার নওয়াব, ঐতিহাসিক রূপরেখা; নিবন্ধমালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, ৬ খন্ড, জুন ১৯৯১।
মোঃ আলমগীর	ঃ	সাত রাজার ধন দরিয়া-ই-নূর; নিবন্ধমালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, ৭ম খন্ড, ঢাকা ১৯৯২।
মোঃ আলমগীর	ঃ	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের এক স্মারক; ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর অফিসার সমিতি পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা-১৯৯৫।
মোঃ আলমগীর	ঃ	ঢাকায় বিজলীবাতি দানে ঢাকার নওয়াব; ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর অফিসার সমিতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা-১৯৯৬।
মোঃ আলমগীর	ঃ	ঐতিহাসিক সাত মসজিদ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৪ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, ঢাকা-১৯৯১।
মোঃ আলমগীর	ঃ	বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে গম্বুজ, সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ৫ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।
মোঃ আলমগীর	ঃ	জাহাংগীর নগরে নবাব থেকে নায়েবে নাজিম, পাক্ষিক সচিত্র বাংলাদেশ, ১০ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৯।
মোঃ আলমগীর	ঃ	রূপ কথার স্বপন পুরী- আহসান মঞ্জিল, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা ৩০ জুন, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া আহমেদ	ঃ	ঢাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ভূমিকা, ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর আয়োজিত 'ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী বিবর্তন ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত)।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	ইতিহাসের খেরো খাতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৯৬
মুনতাসীর মামুন	ঃ	উনিশ শতকে পূর্ববংগের সভা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রিকা ১৮ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৩
আব্দুল আলীম, প্রফেসর	ঃ	মহানগরী ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যের ঐতিহ্য, দৈনিক জনতা, এবং দি নিউ নেশন, ২৮মে, ১৯৮৮।
শামসুল হক, মোহাম্মদ	ঃ	প্রাক মোগল ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২৯ সংখ্যা ১৯৮৭।
এ, কে, এম, ইদ্রিস আলী	ঃ	বংগভংগ ও তৎকালীন বংগীয় সমাজ ও রাজনীতি, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২৪ বর্ষ ১৩৯৭ বংগাব্দ।
শরিফা খাতুন	ঃ	আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকের বাংলার নারী সমাজ, মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত, ঢাকা-১৯৮৫।
সুশীল চৌধুরী	ঃ	আঠারো উনিশ শতকে ইউরোপীয় কোম্পানী ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা-১৯৯২।
সোনিয়া নিশাত আমিন	ঃ	নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) ৩য় খন্ড, ঢাকা-১৯৯২
তাজুল ইসলাম হাসমী	ঃ	ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ, সুকান্ত একাডেমী সম্পাদিত, মুক্তধারা, ঢাকা- ১৯৮৭।
তাজুল ইসলাম হাসমী	ঃ	কারামত আলী ও তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর-১৯৭৬।
জাহেদা আহমদ	ঃ	রাষ্ট্র ও শিক্ষা, বাংলাদেশের ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) ৩য় খন্ড, ঢাকা-১৯৯২।
অনুপম হায়াত	ঃ	ঢাকার নওয়াব পরিবারের ডাইরী (ধারাবাহিক) সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর'১৯৯১।
উম্মে সালমা	ঃ	সৈয়দ কারামত আলী জৌনপুরী (হুগলী) এর দর্শন (১৭৪৭-১৮৭৫) ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২২ বর্ষ ১৯৮৯।
কামরুদ্দিন আহমদ	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনঃ তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতি (স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ জাহাংগীর সংকলিত) প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯২।
কানিজ-ই-বাতুল	ঃ	ঢাকা শহরে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯৪৭) নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্বঃ পত্রিকা, জুন-১৯৮৯।
আ.সা.ও.কারণী, প্রফেসর	ঃ	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, অতীত ও বর্তমান, সমাবর্তন স্মরণিকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ২৯ ফেব্রুয়ারী-১৯৯২।
আহমদ কবীর, ডেঃ রেজিঃ	ঃ	বাংলাদেশ প্রকৌঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, ঐ সমাবর্তন স্মরণিকা, ঢাকা-১৯৯২।
আব্দুল সোবহান	ঃ	আরবী, ফার্সী, উর্দু সাহিত্য, বাংলাদেশের ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) ৩ খন্ড, ঢাকা-১৯৯২।
মোঃ রেজাউল করিম	ঃ	শাহীনের দিনলিপি 'ঐতিহ্য' বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর অফিসার সমিতি পত্রিকা, ২ সংখ্যা, ঢাকা-১৯৯৬।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	ঃ	ঢাকার টুটাফাটা কাগুজে নবাব, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা-১৯৭৮।
শামসুজ্জামান খান	ঃ	ঈদোৎসব ও তার রূপান্তর, ঈদ উৎসব (হাবিবুল আলম- সম্পাদিত) ঢাকা-১৯৯৪।
রমেশ চন্দ্র মজুমদার	ঃ	ঢাকার স্মৃতি, আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (স্মরণিকা) সম্পাদক-আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলকাতা-১৯৭৪।
হাশেম সূফী	ঃ	ঢাকার ঘুড্ডি, দৈনিক ইনকিলাব, ৮ মার্চ১৯৯২।
মুনতাসীর মামুন	ঃ	বিবাহ ও সম্মতি আইন ও পূর্ববংগে এর প্রতিক্রিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ডিসেম্বর-১৯৭৬।
গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া	ঃ	ইনডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি (১৯২৬), ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, জুন-১৯৯৬।
মোহাম্মদ শাহ	ঃ	বংগভংগ, একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, জুন-১৯৯৩।
নাজমা খান মজলিশ	ঃ	ঢাকার ঈদ ও মহররম মিছিল চিত্রকলার রূপরেখা, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২৪ বর্ষ, ঢাকা-১৯৯১।
কানাই লাল চট্টোপাধ্যায়	ঃ	প্রাদেশিক সম্মেলন (বরিশাল-১৯০৬) উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যের একটি পূর্ণ সমীক্ষা ও নতুন মূল্যায়ন; আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা- ১৯৯১।
আবুল কাশেম, মোঃ	ঃ	উনিশ শতকীয় বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চেতনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, ১১ খন্ড, কলা, জুন-১৯৯৫।
বদর উদ্দিন আহমদ	ঃ	নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, জাগরণ, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
রতন লাল চক্রবর্তী	ঃ	কোহিনুর, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯ জানুয়ারী ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ENGLISH ARTICLES

Wakil Ahmed : Muslim Organisation of Dhaka, C 1879-1947, Dhaka past present Future (Sharif Uddin Ahmed (ed) Dhaka-1991.

Sufia Ahmed : Nawab Khwaja Salimullah, Journal of the Asiatic society of Bangladesh, Vol-21, No., 1976.

Mohthram : Glory that was Ahsan Manzil, weekly Holiday, January & Feb. 1982.

Nazia Khanum : Provision of Civic Amenities in Dhaka (1921-1947) Dhaka past present future (Sharifuddin Ahmed(ed.) Dhaka-1991.

Asma Serajuddin : Mughal Tombs in Dhaka, Dhaka past present future (Sharifuddin Ahmed (ed) Dhaka-1991.

Nawabjada Ahsanullah : Nawab Salimullah, The Morning News, January 16, 1968.

Rankin J.T.I.C.S. : Dacca Diaries, Journal of the Asiatic society of Bengal (N.S.XVI) 1920.

Rankin J.T. : Antiquities of Dacca, Dacca Rview, Vol-ix-1920

Mallik A.R. : British Education policy, A History of the Freedom Movement, Vol-II, 1831-1905 part-1, Pakistan Historical Society Karachi-1960.

Shirin Akhtar : On the selection of Dhaka as the capital of Eastern Bengal and Assam (1905-1911) Dhaka past present future, (Sharifuddin Ahmed(ed) Dhaka-1991.

Ratanlal Chakraborty : Role of Dhaka after the Annulment of partition, Dhaka past present future, 1991.

Shabbir Ahmed : Mushaira in Dhaka, Dhaka past present future, Sharfuddin Ahmed (ed.) Dhaka-1991.

Firoz Mahmud : A short History of Bangladesh National Museum, Souvenir of 85, Foundation day of Bangladesh National Museum, Dhaka -7 August-1998.

S.K.Rukunuddin : Hockey in Dhaka, Dhaka Nawab Family Newsletter, Karachi 1, September 1993.

Khwaja Ibrahim & K.M. Shahed : Dhaka Nawab Family's contribution to Hockey in Dhaka, Dhaka Nawab Family Newsletter, 1 January 1994, Karachi.

Khwaja Latifullah : A Brief History of Dhaka Nawab Family, part- 1-3, Dhaka Nawab Family Newsletter, Karachi, January-April, 1992.

Khwaja Latifullah : All it Began in Dilkusha Garden, IBid, Newsletter, Karachi, 1992-93.

Khwaja Rahman Quader : His shoes were too big and too good for me to step into my father Khwaja Solaiman Quader, Dhaka Nawab Family Newsletter, Karachi, March-April, 1993.

M. Shafiqul Alam : Nawab Abdul Latif's contribution to the education of the Muslims of Bengal, Journal of the Asiatic society of Bangladesh, Vol-39, No.-1, June-1994.

Harun-or-Rashid : The Dhaka Nawab Family in Bengal politics, Dhaka past present future, Sharifuddin (ed), Dhaka-1991.

Sirajul Islam : Social life in Dhaka (1763-1800) Dhaka past present future, Sharifuddin (ed), 1991.

Sirajul Islam : The operation of the sun-set law and the changes of the landed society of the Dhaka District (1793-1817), Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol-19, No.-1, Dhaka-1976.

Sharif Uddin Ahmed : Municipal politics and the urban development in Dhaka (1885-1915) Dhaka past present future, Dhaka-1991.

Muhammad Matiur Rahman : Photography and Film of Dhaka, Dhaka past present future, (Sharifuddin (ed), Dhaka-1991.

Faruque A.U.Khan : Murapara House, A Typical colonial Zamindar House, *Nibandhamala* (collection of research Articles) Centre for advance Research in Humanities, Dhaka University, June-1991.

Bhattashali N.K. : The English Factory at Dacca, Bengal past present future Vol-33, 1927.

Dhaka University Institutional Repository

Published Reports, proceedings, Address & Records

- Laying of Foundation stone of the Salimullah Muslim Hall. Speech by the V.C., H. E. The Chancellors speech & provost speech. August 22, 1921.
- Opening of the Muslim Hall-Dhaka, Calcutta-1931,
- Abstract of the proceedings of the council of the Governor General of India, assembled for the purpose of making Laws and Regulations under provision of the Act of perliament 24 & 25 Vict. Cap. 67 (Amendment of Indian penal Code and code of Criminal procedure, 1882)
- Report on Mohamedan Sporting Club, (Souvenir) Calcutta, 1940.
- Proceedings of the first Session of the Provincial Mohammedan Educational Conference, 1906.
- Proceedings of the First Provincial Mohammedan Educational conference of Eastern Bengal and Assam, 1906.
- Proceedings of the Second Provincial Mohammedan Educational Conference, 1908.
- Presidential Address by Nawab Sir Salimullah (Urdu) in All Indian Mohammedan Educational Conference at Amritsar, 27 December 1908. (Translate into Bengali by Professor Md. Abdullah, Dhaka-1986.
- Report of the provincial Mohamedan Educational Conference- 1911.
- Report of the Moslem Education Advisory committee, 1934.
- Report of the Dhaka University Committee, Calcutta, 1912.
- Report and statement of Accounts the Sir Ahsanullah Jubilee Memorial Hospital, for the year ended 30th June, 1938. (Lying in the Ahsan Manzil Museum, Dhaka.)
- First Annual Report of the Dacca Museum, Dacca Review, Vol-5, No.-2, May, 1915.
- Presidential Address of Nawab Sir Salimullah during 5th. session of All India Muslim League, Held on 3-4 March, 1912 at Calcutta.
- Presidential Address by Nawab Sir Salimullah at Moslem Institute Hall, Calcutta on 14 June, 1906. Regarding Hajee Mohammad Mohsin Endowment.
- Proceedings of the Bengal Legislative Council, Vol-8, part-2, 27 Feb.-31 March, 1922.
- Proceedings of the Legislative Council of Eastern Bengal and Assam. April 6, 1908, Eastern Bengal and Assam Gazette, April-June, 1908. Part-VI
- Report of the proceedings of the 2nd provincial Mohammedan Educational conference, held at Mymensingh on 18-19 April, 1908.
- Report of the proceedings of the 3rd provincial Mohamedan Educational conference, held at Bogra on 26-27 March 1910.
- Address- By Mr. A.K. Fazlul Huq, Governor of East Pakistan at the Annual Convocation of the University of Dhaka, 19 February 1957.
- The Dacca Gazette, published by Authority, Thursday, November 13, 1958.
- Bangladesh Gazette, Extraordinary published by Authority, Monday, November 4, 1985, page-7979-7981.
- Dhaka University calender, 1921-24,
- Calcutta University Commission Report, Vol-4, part-II
- Khwaja Mohammad Azam presidential Address by him at the meeting of the Dhaka District Muslim Association, held on 11 April 1920.
- Nawab Salimullah's Scheme for a Muslim confederacy, which became the all India Muslim League Finally.

Unpublished papers from the old file- No. A (old papers & Records, Documents) Deposited in the Dhaka Nawab Court of wards & wakf Estate office, Edward House, Dhaka.

- From a note of Nawab Ahsanullah, A short history of Dhaka Nawab Family & Estate.
- The Appraisal report of Daria-I-Noor Diamond By Utah Gemological Services, Banani, Dhaka-1985. (unpublished)

Dhaka University Institutional Repository

- Proceedings of the 'BE' proprietors Meeting Held on the 15th April, 1936, with Nawab K. Habibullah Bahadur on the Chair (Lying in the Nawab Estate Office). (unpublished)
- History of Dhaka Nawab Estate, prepared by Abdur Rahim Sannayamat, The Chief Manager- 1960.
- List of House property of the Dhaka Nawab Estate.
- List,Amount of G.P. notes G.C. notes and cash belonging to the personal Estate of Nawab Sir Ahsanullah Bahadur, found after his death on 16th Dec. 1902.
- List of valables belonging to the late Nawab Salimulla Bahadur after his death listed by Hamilton & Co. dated 26 January 1915.
- List of Furniture and other articles belonging to the Dacca Nawab Court of wards Estate. listed in 1954.
- A short note relating to the 'BE' shares of the Nawab Estate taken charge of by the Court of Wards.
- Two Geneological tree of Dhaka Nawab Family, prepared by the Survey Instructor of Dhaka Nawab Estate, in 1947.
- Confidential Notes on some cutcharies of Dhaka Nawab Estate (1932), Lying in an old file of Nawab Estate office, Dhaka.
- The Confidential list of 'BE' fund proprietors of the Dhaka Nawab Estate and quantity of their shares (1932)

Unpublished papers from the old file No.-D. (Notes, Documents & Records) Deposited in the Dhaka Nawab court of wards & Wakf Estate Office, Dhaka.

- A list of some charities & works of public utility of Nawab Abdul Gunny and Ahsanullah (Lying in the Dhaka Nawab Estate office, old file No. D)
- A Short history of the plague Fund Trust of Dhaka Nawab Estate (Lying in the Nawab Estate office, old file No. D)
- A Short note of Abdul Ghani Relief Fund (Lying in Nawab Estate Office, old file No. D)
- A short note & history of the Electric Trust (Lying in Nawab Estate office, old file No. D)
- A short note on Shahbagh Garden, 201, Bighas Land Area (Lying in the Dhaka Nawab Estate old office) old file No. D)
- A short note about company Bagam, (Lying in the Nawab Estate Office, old file No. D.
- A detailed note regarding Dilkhusha properties of Dhaka Nawab Estate with ground plans & Drawing (Lying in the Nawab Estate office, Dhaka) prepared by chief manager in 1961 (File No.D).
- A short Note on the history of 'A' Fund of Dhaka Nawab Estate, upto Nov. 1929 (lying in the Nawab Estate office).
- Proceedings of the meeting of the ex. 'BE' proprietors held on 18 August, 1953 at 5 P.M. at Paribagh (Lying in the Dhaka Nawab Estate office.)
- Proceedings of a meeting of the proprietors of the Dacca Nawab Estate, held at Edward House (office of the chief manager, Dacca Nawab Estate) on the 9th April 1956 at 2-30 P.M. (Lying in the Nawab Estate Office.)
- Proceedings of a meetings held at Paribagh (residence of M.S.A. Salim) on 27th February 1956, at 2.30 P.M. of the proprietors of the Dacca Nawab Estate (Lying in the Nawab Estate office)
- A short note & silent facts on the Rankin House of Dhaka Nawab Estate, dt. 1960. (Lying in Nawab Estate Office).
- A Short note regarding premises No. 7 Wiseghat Road, Dacca, known as Wise House (Lying in the Nawab Estate Office, Dhaka.)

Unpublished old Document (File No. C) Preserved in the Ahsan Manzil Meuseum, Dhaka

1. A pleader notice about a case between Nawab Habibullah-Versus-Khodaiza Begum & Peribanoo, Regarding Atia waqf property.

Dhaka University Institutional Repository

2. A case opinion: In the court of the subordinate Judge of Dacca (1st.Court), Nawab Habibullah, Mutawalli Atia 7 anas wakf Estate (plaintif)
   -Versus-
   Khodeza Begum and gong dt. August-1920.
3. True copy of the Appeal from original Decree No. 74, 1918. Appeal against the Decree of Babu Sukumar Bhalla, Subordinate Judge court, 1st court of zilla Dacca, dated- the 31st of January, 1918.
4. A copy of case History & opinion Nawabzada Atikullah; khawja Rosul Box, K. Soliman Quader-plainifs; *versus*- Nawab Habibullah (Mutawalli) Defendant.
5. True copy of case for opinion: Exparte , Nawab of Dacca, Brief for: Sir Rash Behary Ghose, from the vakil-Babu Surendra Nath Guha, and also the copy of the sir Rash Behary Ghose, dt. Calcutta-29th August, 1919.
6. English Translation of 27th Bysack 1253, 1st Wakfnamah of Dhaka Nawab Estate,
7. English Translation of Ladabee or Farkatnama of 27 Baysakh, 1253 Bangla of Dhaka Nawab Estate,
8. English Translation of Towliatnamah, dated: the 11th. September, 1868 corresponding with 27th Bhadra 1275 B.S.
9. English Translation of Heba Belwaz in favour of Nawab Bahadur Ahsanullah C.I.E. date 5th Magh 1301 Bangla Era.
10. Persiam Copy of Towliatnamah executed by Nawab Abdul Ghanny in favour of Nawab Ahsanullah dt. 12 August 1893.
11. A persian Copy of Wakfnamah executed by Khwaja Alimollah in favour of Nawab Abdul Ghanny in 8th. June 1854 A. D. (Atia wakf.)
12. The Printed Doccuments of printed by Nawab's private press) the suit no 96 of 1895, In the court of the subordinate Judge of Dacca, first Court. *Plaintiffs*, Shahzadi Khanam, daughter of Khwaja Alimollah.
    Versus-
    Nawab Sir Abdul Ghanny & Nawab Ahsanullah C.I.E. including with a list of Movable Articles and List of House property of the Dhaka Nawab Estate.

Unpublished Records & others old Doccuments

* Index of papers-1 : Chronological List of Doccuments in Appeal From original Decree. No. 74 of 1918 (preserved in the Ahsan Manzil Museum, Dhaka)
* Index of papers-II: Respondents portion, Index of papers in Appeal From original Decree No. 74 of 1918 (Presered in the Ahsan Manzil Museum)
* Indenture, made on 6 August-1908, Between the court of words of Eastern Bengal and Assam and Nawab Khawaja Salimullah Bahadur G.C.I.E. K.C.S. I. (Copy preserved in the Nawab wakf estate office Dhaka.)
* Memorandum of Agreement for the setlement of suit No. 198. of 1880, Abdul Shafi and others, *Plaintiffs,* Vs. Nawab Abdul Ghanny and others, defendents. Dated 26 August-1981.

Unpublished Letters (Private)

* The invitation letter from Nawab Salimullah to attend at the unveiling ceremony of Sir Lancelot Here Portrait, along with the Resolution passed at a meeting of concem committee. dt. 23 July 1911 (preserved in the Ahsan Manzil Museum, Dhaka)
* A letter From Mr. J. Hoding , Chief Manager, Dhaka Nawab Estate, to Mr. Lemesurier, containing the list of monies spent by Dhaka Nawab Family, dt. 4 Feb. 1907. (Deposited in Dhaka Nawab court of wards & waqf Estate Office).
* A letter from Mr. J. Hoding, Chief Manager, to Mr. B.C. Allen. I.C.s. about the most conspicuous chairties by the Dhaka Nawab Family, dt. 24 March 1911.
* A latter From poet Khwaja Afzal to Nawab Salimullah enclosed with a copy of extempore

Dhaka University Institutional Repository

chronogrammatic Elogy in persian (Preserved in the Ahsan Manzil Musuem)
* Letters From Sayed Nawabali Chowdhury to Nawab Khwaja Salimullah Regarding the establishment of Dhaka University from Calcutta dt. 7, 8. & 11 February, 1912. (preserved in Nawab Estate Office, Dhaka).
* A latter From A. K. Fazlul Haq , to Mr. Meyer, Chief Manager, Dhaka Nawab Estate, Regarding Nawab Habibullas activities, dated : 4th February. 1922.(Preserved in Dhaka Nawab Waqf Estate office).
* A Letter from Nawab Khwaja Salimullah to Mr. Harcourt Butler, Education Member of council, Regarding the Cownpore affairs, Dt. November1913 (Preserved in Dhaka Nawab Waqf Estate office)
* Letter form Lieutenant Colonel Sir Jems Dunlop Smith K.C.S.I., C. I. E. Political Aide-de-camp, India office London, to the Hon'ble Lt. Col. Sir A.H. Mcmahon G. C. V. O., K. C.I. E., E. S. I. Secretary to the Govt. of India in the Foreign Deptt. (Published by BhaiNahar Singh, History of Koh-i-Noor Darya-i-Noor & Taimurs Ruby, New Delhi-1985)
* A private letter to Irshad Nensey from Tehran, with View Card Containing the picture of Daria-I-Noor, Diamond, deposited at Bank Makrazi, Iran.
* A few letters from the Director of Hamilton and Co. Calcutta, to the Chief Manager, Dhaka Nawab Estate in 1947-48 Regarding the preservation of Darya-I-Noor, Diamond (Preserved in Dhaka Nawab Waqf Estate office)
* A latter from Chief Manager, Dhaka Nawab Estate, to the Commissioner Dhaka Divission, on 6 May, 1947. Regarding the preservation of Diamond (Now preserved in the Dhaka Nawab Waqf Estate office, Dhaka)
* A letter from Hamilton & Co. Jewellers, Calcutta, to Nawab Sir Ahsanullah Khan Bahadur, Regarding the Identification of two Gold Mohars (Medals) dated. 1 December 1891 (Now preserved in the Dhaka Nawab Waqf Estate office, Dhaka)
* Two letters from Imperial Bank of India to Chief Manager, Dhaka Nawab Estate, regarding the depositary of Darya-I-Noor Diamond dt. June 1948 & Sept. 1949.
* A letter from Ra[illegible]ndra Narayan Roy, The Raja of Bhawal Estates, to Nawab Khwaja Salimullah Bahadur, Regarding the lend of Nawab's Narayangong House for Raja's Youngest Brother. (Now preserved in Ahsan Manzil Museum , Dhaka)
- A letter from Khwaja Nazimuddin & Shah Bano, to the Chief Manager, Dhaka Nawab Estate Regarding their childrens date of birth, dated 19 June, 1931
- Two letters from Mr. Betson Bell, Commissioner of Dhaka to Nawab Salimullah about a wicked sects (Josba party) started by one Amberali, of P.S. Raipur, Narayangong, dt. 14. 8.1913 & 6.9.1913 A.D. (Now preserved in the Dhaka Nawab waqf Estate office, Dhaka).

News Papers & Periodicals

The Bengal Times : 1876, 1889, 1901-6.
Eastern Bengal & Assam Era : January, February & April 1906 and 1915.
The Moslem Chronicle, Calcutta : 1896-1904 & 1926-27.
The Bengalee, Calcutta, December 14, 1906.
The Weekly Holiday-1981-83.
The Bangladesh Times, 18 January 1980.
The Englishman, 1896 & 1887.
The Journal of the Moslem Institute, 1906 & Vol.-2, March-1907, No. 3
The Comrade : 1912, 1913, 1914.
The Mussalman, October-1925.
The Habibul Matin. June-1915.
Dhaka Nawab Family News letter, K.S. Shahabuddin (ed.) Karachi 1992-1998
The national Geographic Magazine. Vol.-CVII, No. 3, Washington, March-1955.
(East Pakistan Drives Back the Jangle).
The Pakistan Observer, March-1959.
The Morning News, Karachi, August 14, 1991.
Dacca Revew-1911.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা পত্রপত্রিকা

ঢাকা প্রকাশ	ঃ ১৮৬৩ থেকে ১৯৩০ খ্রীঃ।
জাগরণ	ঃ ১ম বর্ষ-১-৪ সংখ্যা, ১৩৩৫ বংগাব্দ।
সাধনা	ঃ ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ ।
মাসিক মোহাম্মদী	ঃ ১৩৩৬ থেকে ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ।
ইসলাম প্রচারক	ঃ ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১২৯৯ এবং ১৩০৯-১০ এবং ৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৩১৪ বংগাব্দ।
দৈনিক আজাদ	ঃ ১৪ মার্চ-১৯৫৯।
সুধাকর	ঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ-ফাল্গুন ১২৯৬ বংগাব্দ (১৮৮৯খ্রীঃ)
সোম প্রকাশ	ঃ ৯ জুলাই, ২৬ নভেম্বর, ১৮৭৭, ১৪ জানুঃ ১৮৭৮; ২৬ আষাঢ় ১২৮৪ বংগাব্দ।
মাহে নও	ঃ ডিসেম্বর ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫-৬৭।
দৈনিক জনকণ্ঠ	ঃ জানুয়ারী ১৯৯৬।
বুল বুল	ঃ ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১৩৪৩ এবং ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩৪২ বংগাব্দ।
ভারত বর্ষ	ঃ ২৪ বর্ষ ১ খন্ড ৩ সংখ্যা ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রীঃ)
ঢাকা গেজেট	ঃ ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
মিহির ও সুধাকর	ঃ ১৩০২-৩ বঙ্গাব্দ ।
ধুমকেতু	ঃ বৈশাখ-১৩১২, ৩ খন্ড ১ সংখ্যা
নবনূর	ঃ ১বর্ষ ৪ সংখ্যা।

পুরানো নথিপত্র (অপ্রকাশিত) ঢাকা নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত

পুরানো নথিপত্র ঃ ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট-এর পুরানো অফিস, এডওয়ার্ড হাউসে প্রাপ্ত, ঢাকা নওয়াব এস্টেট ও নওয়াব পরিবার সম্পর্কিত পুরানো নথিপত্র। ফাইল নং-এ,বি,সি,দ্রঃ

পুরানো নথি ঃ ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট-এর পুরানো অফিসে রক্ষিত দরিয়া-ই-নূর সম্পর্কিত করেসপন্ডেন্স ফাইল, ১৯৪৭-৪৮ সাল দ্রঃ

পুরানো দলিলপত্র (অপ্রকাশিত) আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত

পুরানো দলিলপত্রঃ জাদুঘর প্রতিষ্ঠাকল্পে আহসান মঞ্জিল অধিগ্রহণ কালে সেখানে প্রাপ্ত ঢাকা নওয়াব এস্টেট ও পরিবার সম্পর্কিত পুরানো কাগজপত্র ও জমিদারির দলিলপত্র, চিঠিপত্র, খরচাদির হিসাব, দরখাস্ত, নওয়াবদের ব্যক্তিগত প্রেসে ছাপানো কাগজপত্র, বিভিন্ন কেস ও মোকদ্দমার আরজি, স্লাপ এবং বিক্রমপুর ছলিমিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য প্রকাশিত, লিফলেটপত্র, সন-১৯০৪ এবং অনুরূপ লিফলেট, মানপত্রের কপি, দ্রব্যাদির তালিকা, রশিদ, ক্যাশ মেমো ইত্যাদি কাগজপত্র (বর্তমানে জীর্ণ অবস্থায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত)

* লেঃ গভর্নরকে আঞ্জুমান -ই- ইসলাম ফরিদপুর কর্তৃক দেয়া মানপত্র (ইংরেজী) এর কপি, তাং ১৫ নভেম্বর, ১৯০৫ (আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।)
* প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স ইস্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম এর সভা শনিবার ১৪ এপ্রিল ১৯০৬-এর প্রোগ্রামের খসড়া কপি (ইংরেজী) আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।

ব্যক্তিগত স্বাক্ষাতকার গ্রহণ

* খাজা মোঃ হালিম (বয়স ৬৭ বছর), পিতা- খাজা মোঃ সেলিম, ঠিকানা-নওয়াববাড়ী, গোলপুকুরপাড়, ঢাকা। (১৯৯২-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে)।
* মরহুম খাজা লতিফুল্লাহ, (বয়স-৭৯ বছর) পিতা- নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ, ঠিকানা ড্যাফোডিল, ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা। (১৯৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে)।
* খাজা আব্দুল হালিম, (বয়স-৭৯ বছর) অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারী, পিতা- খাজা আব্দুল গফুর, ঠিকানা-নওয়াববাড়ী গোল পুকুর পাড়, ঢাকা। (১৯৯২-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে)।
* খাজা রহমান কাদর (বয়স-৭৫ বয়স), পিতা- মরহুম খাজা সুলেমান কাদর, ঠিকানা-নওয়াববাড়ী পুকুর পাড় (বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্টে থাকেন)। (১৯৯৪ খ্রীঃ)

 Dhaka University Institutional Repository

* খাজা নাজমা কাদর (বয়স-৭২বছর), পিতা - মরহুম খাজা ইসমাইল জবীহ, বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। (১৯৯৪ খ্রীঃ)
* খাজা কামর বানু হায়দার (বয়স আনুঃ-৭১বছর) পিতা-সৈয়দ আব্দুস সেলিম, ঠিকানা পরিবাগ, ঢাকা। (১৯৯৮ খ্রীঃ)
* মরহুম শাহেন শাহ জামান (বয়স-আনুমানিক ৭২ বছর) পিতা-সৈয়দ আব্দুস সেলিম, ঠিকানা পরিবাগ, ঢাকা। (১৯৯৫ খ্রীঃ)
* খাজা শফিউদ্দিন (বয়স ৬০ বছর) হেড মাস্টার, নওয়াব হাবিবুল্লাহ স্কুল, নওয়াববাড়ী পুকুরপাড়, ঢাকা। (১৯৯৭-৯৮ খ্রীঃ)
* মিয়া মোহাম্মদ আবুল হামিদ (বয়স ৭০), সাবেক অধ্যক্ষ নওয়াব সলিমুল্লাহ কলেজ, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা। (১৯৯৮ খ্রীঃ)
  বেগম বিনতে আসিফ, নওয়াব হাবিবুল্লাহর তৃতীয় স্ত্রী, নওয়াবজাদা তুফায়েলের মা (ইনি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।) বয়স আনুঃ ৮০ বছর , ঠিকানা - নওয়াব বাড়ী পুকুর পাড়, ঢাকা।

- মোঃ আফতাব উদ্দিন (বয়স আনুঃ ৭০) সাবেক চীফ ম্যানেজার, ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট, ঢাকা। (১৯৯০-৯৩ খ্রীঃ)
- মোঃ রেজাউল হক (বয়স ৫০ বছর) এ্যাসিঃ চীফ ম্যানেজার,ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড ওয়াকফ এস্টেট,ঢাকা। (১৯৯২-৯৫ খ্রীঃ)

ছবির এ্যালবাম (অপ্রকাশিত)

পুরানো এ্যালবাম ঃ ঢাকার নওয়াবদের আমলে (আনুমানিক ১৮৭০-১৯০০ খ্রীঃ) তোলা আলোকচিত্র সম্বলিত এ্যালবাম, বুড়ীগঙ্গার তীর ধরে উল্লেখযোগ্য কীর্তিকলাপ ও দৃশ্যাবলী সম্বলিত ছবি (সাদাকালো) , এছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় টিকে থাকা প্রাচীন ইমারত, মসজিদ, ইত্যাদির সাদাকালো ছবি উক্ত এ্যালবামে রয়েছে। (জীর্ণ, অস্পষ্ট, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত)

এ্যালবাম ঃ ১৮৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ আহসান মঞ্জিলের বিভিন্ন দিক থেকে তোলা সাদাকালো ছবি সম্বলিত। এছাড়াও উক্ত ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ঢাকার অন্যান্য এলাকা ও ইমারতের কিছু ছবিও দৃশ্যাবলী তাতে রয়েছে। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত।

এ্যালবাম ঃ ঢাকার নওয়াবদের বাগানবাড়ীসমূহ যেমন, শাহবাগ, দিলখুশা, বাইগুনবাড়ী, হাজিগঞ্জ দূর্গ প্রর্ভৃতি বাগানবাড়ীর ভবনাদি ও নানাদৃশ্য সম্বলিত এ্যালবাম।

এ্যালবাম ঃ ঢাকার নওয়াবদের সংগৃহীত, জলরঙে আঁকা রঙিন ক্ষুদ্র চিত্র সম্বলিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনী আমলের সাহেবদের শিকার দৃশ্যের নানা ধরনের চমৎকার ছবি এ্যালবামটিতে রয়েছে। (বর্তমানে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত।)

ব্যক্তিগত ডাইরী (অপ্রকাশিত)

- নওয়াব আহসানুল্লাহ-এর ব্যক্তিগত ডাইরী, উর্দু ও ইংরেজী., অপ্রকাশিত, (আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত) সন ১৮৭৪, ১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৯১, ১৮৯৪, ১৮৯৭, ১৯০১।
- নওয়াব আহসানুল্লাহর শিকার বিষয়ক ডাইরী (সুটিং জার্নাল), ইংরেজীতে অপ্রকাশিত (১২৭৭ বাংলা ১৮৭০ খ্রীঃ) (আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগ্রহ নং আ-৯৩.২৭৯)
- খাজা মওদুদ (ঢাকাস্থ খেলাফত কমিটির কোষাধ্যক্ষ)-এর ব্যক্তিগত ডাইরী (উর্দু অপ্রকাশিত) ১৯১৪ এবং ১৯২০-২৫ সাল (নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা মোঃ হালিমের নিকট (ঢাকা) রক্ষিত)
- কাজী কাইউমের (নওয়াব সলিমুল্লাহর শ্বশুর) ব্যক্তিগত ডাইরী, (উর্দু, অপ্রকাশিত) ১৯০৪ সাল দ্রঃ (নওয়াব পরিবারের সদস্য খাজা মোঃ হালিমের নিকট রক্ষিত)
- খাজা মোঃ শামসুল হকের ডাইরী (১৯১০-১৯৫০ সাল) অপ্রকাশিত উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় লেখা, খাজা হালিম এবং ঢাকাস্থ- তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে রক্ষিত। (জীর্ণ)
- নওয়াবজাদা খাজা মোঃ আফজাল খান বাহাদুরের ব্যক্তিগত ডাইরী, (উর্দু ও ইংরেজী, অপ্রকাশিত) ১৯০১-৩০ সাল পর্যন্ত দ্রঃ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)
- অধ্যক্ষ ব্রেনাড-এর ডাইরী থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করেছেন ঃ (১) ঢাকাঃ ব্রে'র ডাইরী, রূপান্তর ফওজুল করিম, সম্পাদনা মুনতাসীর মামুন, ঢাকা-১৯৯০ এবং (২) রতন লাল চক্রবর্তী, সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ, ঢাকা- ১৯৮৪ এর পরিশিষ্ট-'খ' দ্রঃ।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি (অপ্রকাশিত)

নওয়াব আহানুল্লাহর ব্যক্তিগত পত্র ঃ

(১) নওয়াব আব্দুল লতিফকে লেখা নওয়াব আহসানুল্লাহর পত্রের কপি(১৮৬৫-৬৭ খ্রীঃ) (ফার্সী) আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত (অপ্রকাশিত)।

(২) ১৮৬৫-১৮৬৯ সালে জমিদারি সংক্রান্ত কাজে এস্টেটের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তি বর্গের কাছে লেখা নওয়াব আহসানুল্লাহ পত্রের কপি (ফার্সী, জীর্ণ) আহসান মঞ্জিল জাদুঘর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক মাদারীপুর জামে মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোঃ আজহারকে লেখা পত্র, তারিখ ১৭ জুন ১৮৮৬, প্রকাশ করেছেন, ইলাহি বখশ, মুক্তিদূত, ঢাকা-১৯৮৮।

(৪) মাদারীপুর জামে মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোঃ আজহার কর্তৃক নওয়াব আহসানুল্লাহকে লেখা পত্র, তারিখ ৯ মার্চ এবং ১৫ মে ১৮৮৬ প্রকাশ করেছেন, ইলাহি বখশ, মুক্তিদূত, বাংলা সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৮।

(৫) ঢাকা নওয়াব এস্টেটের চীফ ম্যানেজার মিঃ ইয়াহিয়া কর্তৃক নওয়াবজাদা কে. আলিমুল্লার চরিত্র সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে ঢাকার কমিশনার মিঃ এইচ. আর. উইলকিনসনকে দেয়া গোপনীয় পত্র, তাং ২ জুন ১৯৩৭ (নওয়াব এস্টেট ওয়াকফ অফিসে কপি রক্ষিত।)

(৬) চীফ ম্যানেজারের উক্ত পত্রের উত্তরে কে. আলিমুল্লাহকে পাটনায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কমিশনারের দেয়া পত্র, তাং ৫ জুলাই ১৯৩৭ (ঢাকা নওয়াব ওয়াকফ এস্টেট অফিসে রক্ষিত।) অপ্রকাশিত।

(৭) সন্তোষের মহারাজা এম. এন. রায় চৌধুরী কর্তৃক তাঁর জ্ঞাতি জনৈক নিশিকান্ত বোসের চাকুরীর জন্য সুপারিশ করার অনুরোধ জানিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া পত্র (ইংরেজী-অপ্রকাশিত) তাং-২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রীঃ, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত।

(৮) দোল্লাই অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব কর্তৃক নওয়াবকে সম্রাট শাহজাহানের আমলের সোনার মোহর নজরানা দেয়ার তথ্য জানিয়ে চীফ ম্যানেজার কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া পত্র, (ইংরেজী, অপ্রকাশিত) তাং-৬ অক্টোবর, ১৯০৫

(৯) দিল্লীর এইচ. এম. আজমল খান কর্তৃক নওয়াবের ২৪০০ টাকা দানের সম্মতির কথা জানিয়ে নওয়াব এস্টেটের চীফ এ্যাকাউন্টেন্টকে দেয়া পত্র, (ইংরেজী, অপ্রকাশিত) তাং-৯ নভেম্বর ১৯০৬। (আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত)

(১০) ফটোগ্রাফার মিঃ ফ্রিৎজকাপ কর্তৃক বিভিন্ন সময় ছবি তোলা বাবদ ৭৪৩ টাকা ২ আনা বিলসহ নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয় পত্র। (ইংরেজী, অপ্রকাশিত) তাং ১৯ ডিসেম্বর ১৯০৬ (আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত)

(১১) নওয়াব এস্টেটের বরিশালস্থ এজেন্ট মিঃ এইচ মায়ার কর্তৃক চীফ ম্যানেজারকে দেয়া পত্র (১৯২০) এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

(১২) নওয়াব সলিমুল্লাহ কলকাতায় বসবাসকালে ১৯০৬ সালে দ্রব্যাদি রাখার জন্য যে গুদাম ভাড়া নেন, তার ভাড়া পরিশোধ না করায় গুদামের মালিক বাবু চিন্তা হরন চক্রবর্তী কর্তৃক বোর্ড অব রেভিনিউ এর সেক্রেটারীর নিকট যে অভিযোগ দায়ের করেন, তার কপি (বাংলায়) অপ্রকাশিত তাং ২১ আগস্ট ১৯০৭।

(১৩) অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে আগত ডেলিগেটরদের ফিরে যাওয়ার জন্য গোয়ালনন্দ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ নওয়াব সলিমুল্লাহ যে স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করেন, তাঁর জন্য ৯৯৭ টাকা ৪ আনা ভাড়া পরিশোধের তাগাদা দিয়ে চীফ ম্যানেজারকে লেখা ইস্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে-এর ট্রাফিক সুপারিনটেন্ডেন্ট এর পত্র (ইংরেজী, অপ্রকাশিত) তাং ২১ সেপ্টেঃ ১৯০৭, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত।

(১৪) ভাগ্যকুলের রাজা সীতানাথ রায় কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে লেখা পত্র (ইংরেজী) অপ্রকাশিত।

(১৫) ভিক্টোরিয়া ক্যারেজ ওয়ার্কর্স লিঃ লন্ডন এর ম্যানেজার কর্তৃক বিক্রির জন্য মটরগাড়ী প্রস্তুত এ কথা জানিয়ে মিঃ জেঃ ডেভিডসন, উডল্যান্ড, আলীপুর (কলকাতা) এর নিকট প্রেরিত পত্র (ইংরেজী, অপ্রকাশিত) তাং-১২ মার্চ ১৯০৬ (আ.ম. যা. রক্ষিত)

(১৬) হোসেনী দালানে আলোকসজ্জা করা এবং গাজীউদ্দিন হায়দারের মাজার মেরামতের জন্য প্রাক্কলিত টাকার অনুমোদন চেয়ে চীফ ম্যানেজার কর্নেল হডিং কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া পত্র (ইংরেজী, অপ্রকাশিত) তাং ৩০ এপ্রিল ১৯০৬ (আ.ম. যা রক্ষিত)

(১৭) ১৯০৭ সালে দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহকে প্রদ্যুৎ কুমার ঠাকুর কর্তৃক দেয়া পত্র, ইংরেজীতে, তাং- ২৪ জুলাই ১৯০৭।

(১৮) নওয়াবজাদা খাজা হাবিবুল্লাহ এবং আঃ গণি, সেন্ট পল স্কুল- দার্জিলিং-এ পড়ার জন্য ২২৬ টাকা খরচের রশিদের কপিসহ চীফ ম্যানেজার কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া পত্র (ইংরেজী) তাং -৯ অক্টোবর ১৯০৮।

(১৯) ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে লেখা পত্র (ইংরেজী) তাং- ১৮ ফেব্রুঃ ১৯০২।

(২০) ঢাকা পৌরসভা নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিশনার প্রার্থীদের খবর জানিয়ে মীর্জা ফকির মোহাম্মদ কর্তৃক নওয়াব সলিমুল্লাহকে দেয়া পত্র (উর্দুতে লেখা) তাং-৯ ফেব্রুঃ ১৯১০ (আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত)।

স্মরণিকা সমূহ

* আহসান মঞ্জিল জাদুঘর উদ্বোধনী স্মরণিকা, ঢাকা ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
* বাংলায় ভ্রমন (দ্বিতীয় খন্ড) ১৯৪০ বঙ্গাব্দ, পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে বিভাগ থেকে প্রকাশিত।
* বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত সুধীবৃন্দের পরিচিতিমূলক পুস্তিকা (স্মরণিকা) ঢাকা-১৯৭৯।
* ঢাকা মহানগরী সমিতি ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অভিষেক স্মরণিকা, ঢাকা-১৯৯৯।
* বাংলাদেশের জাতীয় যাদুঘর, ৮৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন স্মরণিকা, ঢাকা ৭ আগস্ট, ১৯৯৮।
* সমাবর্তন স্মরণিকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২ ফেব্রুঃ ১৯৯২।
* প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা, স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা, ঢাকা-১৯৮৫।
* বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, ঢাকা-২৩-২৫ এপ্রিল ১৯৯৩।

-সমাপ্ত-